মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

(১৯৩১-৪৭)

ইসরাইল খান

উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগরণ হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান সমাজে এর সূচনা হয় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। কারণ সমাজগঠনের জন্য যে সাময়িকপত্রের দরকার তা এসময়েই কার্যকরভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যপত্রিকা, সওগাত, মোসলেমভারত, নবযুগ, ধূমকেতু, সাম্যবাদী, লাঙল, সাহিত্যিক, শিক্ষা, মোহাম্মদী মোয়াজ্জিন ঐকালেই শক্তিশালী হয়।

এরপর ত্রিশের দশকে আরো কতিপয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং বিভাগ-পূর্ববর্তীকালে এই পত্রিকাগুলোই প্রধানত সক্রিয় ও নিয়মিতভাবে পাঠকমন গঠন করেছে। ১৯৩০ সালে 'পাকিস্তান' এর সম্ভাবনা সূচিত হওয়ার পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজকে ঝাঁকানি দিয়ে সজাগ করার কাজে এই সমস্ত সাহিত্য ও সাময়িকপত্রের অবিস্মরণীয় ভূমিকা লক্ষ্য না করে পারা যায় না। কিন্তু বাঙলার রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐকালের এই সমস্ত সাময়িকপত্রের বিবরণ ও মূল্যায়ন তথা ইতিহাস-লিখনের কাজ বলতে গেলে অলিখিতই ছিল।

বাঙলা তথা ভারতবর্ষের রাজ্যসমূহের পুনর্বিন্যাস, পাকিস্তানের সৃষ্টি, বাঙলা বিভাজন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন প্রভৃতি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে এবং বাংলা সাহিত্যের নতুন নতুন দিক্-দিগন্ত উন্মোচনে নেতৃত্বদানকারী মুসলিম-সম্পাদিত ও প্রকাশিত ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের পত্র-পত্রিকার অবিস্মরণীয় ভূমিকা এগ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসরাইল খান গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানীতে ১৯৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জয়নাল খান, মাতা ফাতেমা বেগম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে বিএ অনার্স (১৯৭৭) এম.এ (১৯৭৮), এমফিল প্রথম পর্ব (১৯৮৮) ও পিএইচ.ডি (১৯৯৫) ডিগ্রি লাভ করেছেন। ভারত সরকারের বৃত্তিতে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাময়িকপত্র বিষয়ে গবেষণা করেন। তাঁর আগ্রহের বিষয় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দু'শো বছরের পত্র-পত্রিকা এবং বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতি ও চিন্তা চেতনার ক্রমবিকাশের ধারা।

স্বাধীন মত ব্যক্ত করে মননশীল প্রবন্ধ এবং সাময়িকপত্রের ওপর অভিসন্দর্ভ লিখে ইসরাইল খান পাঠক সমাজে সুপরিচিত হয়েছেন। তাঁর গবেষণামূলক রচনাবলী নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের যোগান দিয়েছে। তাঁর তথ্য পরিবেশনার রীতি ও বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার চৌদ্দটি গ্রন্থ আর দুইশতাধিক বিচিত্র রচনা।

গ্রন্থগুলো হচ্ছে :
১. সাময়িকপত্র ও সমাজগঠন : বাংলাদেশের পরিস্থিতি (১৯৮৮/২০০৬) ; ২. ভাষার রাজনীতি ও বাঙলার সমস্যা (১৯৮৬/১৯৮৯); ৩. বুদ্ধিজীবীদের দ্বন্দ্ব ও সাহিত্যসমাজে অবক্ষয় (১৯৮৯) ; ৪. বন্দিবিবেক সমাজ ও সাহিত্যজগতে বৈশ্যবৃত্তি (১৯৯০) ; ৫. বাংলাদেশের রাজনীতি ও ভাষা-পরিস্থিতি (১৯৯১) ; ৬. বঙ্কিমচন্দ্র : সার্ধশত জন্মবর্ষে (সম্পাদনা, ১৯৯০) ; ৭. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান : জীবন ও চিন্তাধারা (১৯৯৮) ; ৮. পূর্ব বাঙলার সাময়িকপত্র সম্পাদনা (১৯৯৯) ; ৯. বাংলা সাময়িকপত্র : পাকিস্তানপর্ব (২০০৪) ; ১০. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি (১৯৯৯/২০০৬) ; ১১. কবি নজরুলের অসুস্থতা : তর্ক-বিতর্ক ও দলিলপত্র (২০০৫) ; ১২. সীমান্ত সংগ্রহ (সম্পাদনা, ২০০৫) ; ১৩. আচার্য আহমদ শরীফ (সম্পাদনা, ২০০৬) ; ১৪. স্বনির্বাচিত প্রবন্ধ : আহমদ শরীফ (সম্পাদনা, ২০০৬)।

www.pathagar.com

মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা
(১৯৩১-১৯৪৭)

ইসরাইল খান

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪১২/ডিসেম্বর ২০০৫

বাএ ৪৪৯৭
[২০০৫-২০০৬ গসফো : গবেষণা-২]

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি
গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক
আ.খ.ম. জাকিউল হক
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোঃ সৈয়দুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
আনওয়ার ফারুক

মূল্য
১৮০.০০ টাকা

MUSLIM SAMPADITAYA O PROKASHITYA BANGLA SAHITTAYA PATRIKA : (Muslim Edited and Published Literary Journals, by Israil Khan Published by A.K.M. Zakul Haq Director Research, Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Published : December 2005 Price : Taka 180.00 only.

ISBN-984-074506-9

www.pathagar.com

উৎসর্গ

লিখতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে আসছে একটি নাম
আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ভাবুক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক
আবুল কাসেম ফজলুল হক

একই সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি আমার নিত্যশুভার্থী, গুরুপত্নী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের প্রিন্সিপাল হাউস টিউটর
ফরিদা প্রধান
আপাকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

এই অভিসন্দর্ভটি আমি প্রণয়ন করি ভারত সরকারের আইসিসিআর স্কলারশীপে ১৯৯৩–৯৬ সময়কালে। কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তখনকার বাংলা বিভাগের প্রধান ও কলা অনুষদের ডীন, প্রফেসর নির্মল কুমার দাশ। উপাচার্য ছিলেন খ্যাতিমান প্রফেসর পবিত্র সরকার। এই মহোদয়গণের নিকট থেকে এবং কার্যক্ষেত্রে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আচার্য আহমদ শরীফ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদের কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হয়েছি ।

বাংলার মুসলমান সমাজের নবজাগরণের বাহক বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত পত্রিকাগুলোর উপকরণ সংগ্রহ, ভূমিকা নির্ণয় ও ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনার কাজ এতদিন অসমাপ্ত ছিল। ব্যাংকের শ্রম ও সময়সাপেক্ষ কঠিন চাকুরির পাশাপাশি নানা প্রতিকূলতার মধ্যে এই কাজ আমি সম্পন্ন করেছি। এতে সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। তবু আমি বিশ্বাস করি, এগ্রন্থ বাংলাদেশের ও বাঙালি সমাজের জাতীয় প্রয়োজনে কাজে লাগবে। গবেষক ও সাধারণ জিজ্ঞাসুদের জ্ঞানপিপাসা ও চাহিদা নিবৃত্ত করবে। আমি মনে করি এগ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ জাতীয় দায়িত্বই পালন করেছেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসা এই গ্রন্থের মুদ্রণ কাজ শুরু করিয়েছিলেন। প্রকাশের কাজ সম্পন্ন করিয়েছেন বর্তমান মহাপরিচালক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব আ.খ.ম. জাকিউল হক, উপপরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক জনাব সৈয়দুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক, জনাব মোঃ মাছুদুর রহমান, বাংলা একাডেমী প্রেসের মুদ্রণ কর্মকর্তা জনাব শেখ সারোয়ার হোসেন এ গ্রন্থ প্রকাশে যে আন্তরিকতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন তাতে আমি অভিভূত হয়েছি।

প্রুফ দেখার কাজে রাত জেগে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমার স্ত্রী ফারজানা ইয়াসমীন খান। নির্ঘণ্ট করে দিয়েছে কল্যাণীয় আসিফ খান অপু।

উপর্যুক্ত সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

ইসরাইল খান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

১

বিশ্বের সকল দেশের প্রায় সব ভাষার বিশেষ বিশেষ পত্র-পত্রিকা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। বাঙলার ইতিহাসেও সমাজ সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি বা বিকাশের ক্ষেত্রে বাঙলা সাময়িকপত্রের বিরাট অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের তথা বাঙালির জাতীয় জীবনে নবজাগরণ সূচিত হয়েছিলো সমাচারদর্পণ (১৮১৮) থেকে বঙ্গদর্শন (১৮৭২) বা সাধনা (১৮৯১-১৯২১) পর্যন্ত অসংখ্য সাময়িকপত্রের প্রকাশ ঘটেছিলো বলেই। সমকালীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবক্ষয় ও উজ্জীবনের ধারা কিংবা অগ্রগতির স্বরূপ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পত্রপত্রিকার অবলম্বন তাই আধুনিক কালের গবেষকদের এক বিশেষ প্রবণতা। উনিশ ও বিশ শতকের বাঙলার ইতিহাস অনুসন্ধানে এবং সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অগ্রগতির খতিয়ান প্রস্তুতকালে দেখা যায়, বাঙলার নবজাগরণ ও সাময়িকপত্র প্রায় সমার্থকরূপে চিহ্নিত হচ্ছে।

একথা প্রচলিত আছে যে, উনিশ শতকের রেনেসাঁস হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। মুসলমান সমাজে এর সূচনা বিলম্বে লক্ষ্যযোগ্য। প্রচলিত বলেই এ কথার মূল্য কম, তা নয়। কারণ, রেনেসাঁসের বাণী সমাজ অভ্যন্তরে প্রবাহিত করে দিয়েছিলো উনিশ শতকের যে সমস্ত বাঙলা সাময়িকপত্র,—তার প্রায় সবটাই প্রকাশ করেছিলেন হিন্দু সমাজপতি, সম্পাদক ও প্রকাশকগণ। উনিশ শতকে প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত পত্রপত্রিকার উল্লেখকে তাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার উদাহরণ রূপেই গণ্য করতে হবে। মুসলমান সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রপত্রিকা বর্তমান শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মুসলমান সমাজের জাগরণ সূচিত হয় এই সময়েই।

বলা আবশ্যক যে, কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) আত্মপ্রকাশ মুসলিম জাগরণকে ত্বরান্বিত করেছিলো। কাজী নজরুলের সাহিত্যচর্চার সূচনাকালে এবং কিঞ্চিৎ পরে (১৯১৮ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত ধরা যাক) মুসলমান সমাজের মধ্যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভকারী কতিপয় পত্রপত্রিকা ঝটপট প্রকাশিত হয়ে যায়। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৮) ; সওগাত (১৯১৮) ; মোসলেম (১৯২০) ; নবযুগ (১৯২০) ; ধূমকেতু (১৯২২) ; সাম্যবাদী (১৯২৩) ; লাঙল (১৯২৫) ; সাহিত্যিক (১৯২৬) ; শিখা (১৯২৭) ; মোহাম্মদী (১৯২৭) ; মোয়াজ্জিন (১৯২৮) প্রভৃতি ঐকালের মধ্যে প্রভাবশালী হয়।

এরপরে ত্রিশের দশকে আরো কতিপয় পত্রপত্রিকার প্রকাশ ঘটে—জয়তী (১৯৩০) ; প্রাতিকা (১৯৩১) ; গুলিস্তাঁ (১৯৩২) ; আল্-ইসলাহ্ (১৯৩২) ; বুলবুল (১৯৩৩) ; ছায়াবীথি (১৯৩৩) ; সবুজ বাঙলা (১৯৩৪) ; পূরবী (১৯৩৬) ; এবং চতুরঙ্গ (১৯৩৮) ; মৃত্তিকা (১৯৪১) নওরোজ (১৯৪১) ; ত্রিকাল (১৯৪২) প্রভৃতি এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সাতচল্লিশের বিভাগ পূর্ববর্তীকালে মুসলমান সমাজ থেকে প্রকাশিত খ্যাতিলাভকারী সাহিত্যপত্রিকা বলতে এগুলোর নামই করতে হয়। উপরিউক্ত পত্রপত্রিকাই প্রধানত সক্রিয় ও নিয়মিত ভাবে পাঠকমন গঠন করার উদ্দেশ্যে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে উপস্থাপিত হয়েছে।

একালে মুসলমানদের অপ্রধান সাহিত্যপত্রিকার সংখ্যাও কম নয়। দৈনিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক সংবাদ সাময়িকপত্রও যুক্তসাধনায় সামিল হয়। ১৯৩০ সালে 'পাকিস্তান'-এর বীজ

www.pathagar.com

রোপিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী দুটো দশকে মুসলমান সমাজকে ঝাঁকানি দিয়ে সজাগ করার কাজে এই সমস্ত সাহিত্য ও সাময়িকপত্রের অবিস্মরণীয় ভূমিকা লক্ষ্য না করে পারা যায় না। কিন্তু বাঙলার রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কালের সকল সাময়িকপত্রের বিবরণ লিখনের কাজ এখনো গ্রহণ করা হয়নি। অথচ বাঙলা তথা ভারতবর্ষের রাজ্যসমূহের পুনর্বিন্যাস, পাকিস্তানের সৃষ্টি, বঙ্গ বিভাগ, বাঙলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন প্রভৃতি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে এবং বাঙলা সাহিত্যের নতুন দিক্‌দিগন্ত উন্মোচনে মুসলিম সম্পাদিত এসকল সাহিত্যপত্রিকার ভূমিকা অবিস্মরণীয় এবং এর গুরুত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে অলঙ্ঘনীয়।

২

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সংবাদ সাময়িকপত্র বিষয়ে গবেষণার পথিকৃৎ জেম্‌স্ লঙ (১৮১৪–৮৭) ; কেদারনাথ মজুমদার (১৮৭৩–১৯৩০) এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১–১৯৫২)। তাঁদের অনুসরণে বিনয় ঘোষ (১৯১৭–৮০) সাময়িকপত্র থেকে সমাজচিত্র সংকলনের পরিশ্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। Report on the native press in Bengal (১৮৬৮) ; বাংলা সাময়িক সাহিত্য (১৯১৭) ; বাংলা সাময়িকপত্র (দুই খণ্ডে ১৯৩৯, ও ১৯৫১) ; সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দুই খণ্ডে ১৯৩২, ১৯৩৩) ; সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী (১৯৫০) ; সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (পাঁচ খণ্ডে, ১৯৬২,...) তাঁদের মহৎ সৃষ্টি ও কর্ম। কিন্তু বলা বাহুল্য এগুলোতে মুসলমান সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মূল্যায়ন ও বিবরণ বিস্তারিত ভাবে সন্নিবেশিত হওয়ার অবকাশ ছিলো না। কারণ, এঁদের গবেষণাকর্ম প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিলো উনিশ শতকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার পরিসরে,—তখন মুসলমানদের সাময়িকপত্র জগতে কেবল আসতে দেখা যাচ্ছে। বিনয় ঘোষ তো উনিশ শতকের কয়েকটি প্রধান পত্রিকার ওপরই কাজ করেছেন। তাঁর অবলম্বিত পত্রপত্রিকার মধ্যে রয়েছে সমাচারদর্পণ, সংবাদ প্রভাকর, জ্ঞানান্বেষণ, তত্ত্ববোধিনী, বেঙ্গল স্পেক্টেটর, সোম প্রকাশ, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি। উনিশ শতকে মুসলমানদের দ্বারা ঐরকম গুরুত্বসম্পন্ন কোনো পত্রপত্রিকার প্রকাশ সম্ভবপর হয়নি।

অতএব ঐকালের মুসলমানদের সাময়িকপত্র–সাধনার ইতিহাস প্রণয়নের গুরুত্ব ততোটা তীব্র হয়নি। তবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাময়িকপত্র' গ্রন্থে মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকাসমূহের আদি ইতিহাস যথার্থই লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের সূত্রনির্দেশ অনুসরণ করে আনিসুজ্জামান (১৯৩৭) এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯২৭) ১৮১৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সময় কালে প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সুশৃঙ্খল একটি তালিকাসহ মূল্যবান আলোচনা ও সম্পাদকীয় মতামত সংকলিত করেছেন। ফলে এঁরা দুজন মুসলিম সম্পাদিত পত্রপত্রিকার ওপর প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁদের মূল্যবান গ্রন্থ 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' (ঢাকা, ১৯৬৯) এবং 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত' (ঢাকা, ১৯৭৭)। সাম্প্রতিককালে পূর্ব ও পশ্চিম প্রদেশের বাঙালি গবেষকেরা এই ধারায় কতিপয় আধুনিক সাহিত্য–পত্রিকার (ত্রিশ দশকের) ওপর যেমন গবেষণা–নিবন্ধ ও সংলকন প্রকাশ করছেন, তেমনি পূর্বসূরি গবেষকদের ব্যবহৃত পুরনো পত্র–পত্রিকার ওপরও নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা পরিচালনা করে লিখেছেন অনেক গ্রন্থ। লক্ষ্য করলে তাই দেখা যায় উনিশ শতকের সাহিত্যিক কর্ণধারদের বংশধরেরাই বিশ শতকে বসে প্রাপ্ত নমুনা অবলম্বনে রচনা করেছেন বাঙলা সাময়িকপত্রের সুদীর্ঘ ইতিহাস। আপাতত তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে, মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা ও কাহিনীই নিম্নে আলোকিত করা যাক।

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে যাঁরা পত্রপত্রিকার জগতে স্রষ্টা কর্ণধাররূপে সক্রিয় ছিলেন, অর্থাৎ যাঁরা মুসলিম সাময়িকপত্রের ধারাকে শক্ত ভিত্তি

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন—সেইসব কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক সংবাদপত্রসেবীদের অধিকাংশই বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কায়কোবাদ (১৮৫৯–১৯৫২) ; শেখ আবুদর রহিম (১৮৫৯–১৯৩১) ; মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর, ১৮৬০–১৯৩৩) ; মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২–১৯৩৩) ; মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮–১৯৬৮) ; আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯–১৯৫৩) ; সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৫–১৯৬৫) ; মওলানা মনিরুজ্জামান এস্‌লামাবাদী (১৮৭৫–১৯৫০) ; মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (১৮৭৮–১৯৪০) ; বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০–১৯৩২) ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০–১৯৩১) ; কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২–১৯২৬) ; মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (ভোলা, ১৮৮৫–১৯৭৬) ; মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ (১৮৮৫–১৯৬৯) ; মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭–১৯৪০) ; কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯–১৯৭৩) ; ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯–১৯৩৬) ; এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০–১৯৫১) প্রমুখের অনেকেই পাকিস্তান লাভের পরও জীবন ধারণ করেছিলেন।

অতএব ৬০, ৭০ কিংবা ৮০–৯০ বৎসরের পুরনো তথ্য ও নমুনার ভিত্তিতে এঁদের পরবর্তী প্রজন্মের মুসলমান লেখক গবেষকদের হাতেই রূপলাভ করেছে মুসলিম সাময়িকপত্রের প্রথম পূর্ণাঙ্গ (পূর্ণাঙ্গ করা কি সত্যিই সম্ভব ?) ইতিহাস।

৩

যেহেতু পূর্বসূরি গবেষকদের অনুসন্ধান আলোচনার সময়সীমা ১৯৩০ সাল অবধি ; এবং ১৯৩০ সালের পূর্বে প্রকাশিত প্রধান–প্রধান পত্রপত্রিকার বিশ্লেষণমূলক বিস্তারিত আলোচনার সুযোগও তাঁদের ছিলো না ; সেহেতু অনেক ক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজনীয় সংবাদ পরিবেশন করেই তাঁরা ক্ষান্ত হয়েছেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়কালে প্রকাশিত মুসলমানদের পত্রপত্রিকার ইতিহাসও অলিখিত অবস্থায় আছে। অথচ এই কালের মোহাম্মদী, সওগাত মোয়াজ্জিন, জয়তী, গুলিস্তাঁ, বুলবুল, আল্‌–ইস্‌লাহ্‌, ছায়াবীথি, সবুজ বাঙালা, চতুরঙ্গ, মৃত্তিকা, ত্রিকাল প্রভৃতি বিশ শতকের সাময়িকপত্র–সাধনার সম্পূর্ণ ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উজ্জ্বল সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক যে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার সার্বিক ইতিহাসের পরিকল্পনাও কেউ এখনও গ্রহণ করেননি। ভারতী সবুজপত্র–কল্লোল শনিবারের চিঠি পরিচয় কবিতা সওগাত শিখা লাঙল গণবাণী ধূমকেতু সংহতি প্রভৃতি বিশ শতকের প্রথমার্ধের কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পত্রিকার ওপর বিক্ষিপ্তভাবে কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও সামগ্রিকভাবে বর্তমান শতাব্দীর সাময়িকপত্রের রূপান্তরের নানা বাঁক, এবং সাময়িক সাহিত্যে বিচিত্র বিপ্লবের বিস্তৃত কোনো ইতিহাস লেখা হয়নি। কাউকে সে–পরিকল্পনা গ্রহণ করতেও শোনা বা দেখা যাচ্ছে না।

একালে প্রকাশিত (বিশ শতকের) বাঙালির সাময়িক সাহিত্য সাধনার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬১–১৯৪১) সম্পাদিত নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' (১৯০১–১৪) থেকে আরম্ভ করতে হয়, আর মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮–১৯৫২) সম্পাদিত শেষ পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' (১৯৪৭–৫২/১৩৫৪–৫৮) দিয়ে একটি পর্বের অন্ত চিহ্নিত করতে হয়। পরের অধ্যায়ে স্পষ্টতই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পটভূমিতে দুটি ভিন্ন জাতীয় চেতনার সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাস লিখতে হবে। আজাদ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল এবং স্বাধীন ভারতের পশ্চিম বাঙলার সাহিত্য পত্রিকার পঞ্চাশ বছরের চিত্র সংগ্রহ করে বিশ শতকের সাময়িক ও সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা দাঁড় করানো যাবে। কাজটি আকারে আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে বিশাল এবং বিরাট। এর জন্য কোনো সংঘবদ্ধ গবেষকদলের দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন হবে, সন্দেহ নেই। তবে একাজে হাত দিতে গেলে দেখা

www.pathagar.com

যাবে ১৯৪৭ পর্যন্ত মুসলমান ও হিন্দুদের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, এবং বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য সংকলন। এগুলোকে আবার মতাদর্শগত ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করে কয়েকটি ধারায় ফেলে আলোচনার প্রয়োজন হবে। বিষয়ভিত্তিক বিভাগও আবশ্যক বিবেচিত হবে। কিন্তু সাহিত্যের গবেষকদের মধ্যে সাময়িকপত্র আশ্রিত (কিংবা পত্রিকার ইতিহাসের) গবেষণার পরিশ্রম স্বীকারের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান গবেষণা বিশ শতকের সাময়িকপত্র সাধনার ইতিহাসের একটি ধারার পূর্ণ ধারণা দিতে সক্ষম হবে এবং গবেষণার জগতে গুরুত্ব পাবে বলে আশা করা যায়।

৪

ইতিপূর্বে কলকাতা ও ঢাকা থেকে বিশ শতকের সাময়িকপত্রের ওপর কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে বর্তমান গবেষণার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্নভাবে দশ বিশটি পত্রিকার পারম্পর্যবিহীন মূল্যায়ন কোনো ধারারই পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেয়না,—বরং এক ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয়। কোন্ ধারার পত্রিকা কীভাবে বিকশিত হলো,—সে ধারণা পেতে খুবই বেগ পেতে হয়। বিশেষত মুসলমানদের পত্রিকার ধারণা শিক্ষিত সমাজে নাই বললেই চলে। এই পর্বের পত্রিকাগুলোর প্রকাশকালেই ঘটে যুগান্তর সৃষ্টিকারী ভারত বিভক্তির ঘটনা (১৯৪৭) এবং ইতিহাসের সব থেকে বড় প্রাপ্তি স্বাধীনতা লাভ বা ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির অবসান। সমস্ত ব্যবস্থা এমন ওলোট পালট হয় যে, সুস্থির হতে বেশ সময় লাগে এই ভূখণ্ডের মানুষদের। পূর্ববাঙলার মুসলমানেরা পাকিস্তান সম্পর্কে অল্পকালের মধ্যেই মোহমুক্ত হবার ফলে পাকিস্তান আন্দোলনকালীন পত্রপত্রিকার প্রতি তাঁরা যেনো আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। পশ্চিম বাঙলার মুসলমানেরাও মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন না বলে, ঐ-সকলের (মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী পত্রিকা ও সাহিত্যের) প্রতি বিষনজরেই তাকাতেন। যেভাবেই হোক, এই কালের সাময়িকপত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখনের পরিকল্পনা পাকিস্তান কালের মুসলিম ঐতিহ্যগর্বী মহল থেকেই গৃহীত হয়। কিন্তু শেষ করার তাগিদ 'স্বাধীন বাংলাদেশ' আমলে এসে নিস্পৃহ হয়ে পড়ে।

আনিসুজ্জামান এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলামের দুটো বইয়ের সঙ্গে ১৯৬৬ সনে প্রকাশিত পাকিস্তান পাবলিকেশনস্ এর 'মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র' মিলিয়ে পড়লে ১৯৩০ সন পর্যন্ত প্রকাশিত মুসলমানদের পত্রপত্রিকার ওপর একটা ধারণা জন্মে। আর খোন্দকার সিরাজুল হকের 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ : চিন্তা ও কর্ম' (ঢাকা, ১৯৮৪) ; লায়লা জামানের 'সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা' (ঢাকা, ১৯৮৯) ; আর সওগাত-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের (১৮৮৯-১৯৯৪) বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ' (ঢাকা ১৯৮১) এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (ও অন্যান্য) কর্তৃক সওগাতের সাহিত্যচিন্তা বিষয়ক রচনাবলির সংকলন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩) প্রভৃতি দ্বারা মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রধান চিন্তাবিদ্দের কর্মাবলির পরিচয় উদঘাটন, আর শ্রেণীবদ্ধ সূচিপত্রসহ প্রধানত শিখা ও সওগাত পত্রিকার সামাজিক ও সাহিত্যিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে সওগাত ও শিখার স্বাতন্ত্র্য গুরুত্ব যথাযথভাবে চিহ্নিত হলেও উনিশ ও বিশ শতকের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষ অবদানের আলোকে কিংবা অবিভক্ত ও অখণ্ড বাঙলার সাময়িকপত্রিকার প্রেক্ষাপটে শিখা ও সওগাতের বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন এখনও হয়নি।

বুলবুল, চতুরঙ্গ, সবুজ বাঙলা, মৃত্তিকা প্রভৃতি বর্তমান সন্দর্ভের সূচিপত্রে উল্লিখিত নানা পত্রিকার আলোচনাও চোখে পড়ে না। সাতচল্লিশ পূর্ববর্তী দুই দশকের সাহিত্য পত্রিকার মধ্যে সওগাতই বেশি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সে আলোচনার বিষয়বস্তুও সওগাতে প্রকাশিত কেবল প্রবন্ধ ও আলোচনা সমালোচনাসমূহ। সওগাতের গল্প, উপন্যাস,

www.pathagar.com

কবিতা, গানের সন্ধান কেউ নিতে চাননি। গল্প কবিতা নাটকের ক্ষেত্রে সওগাতের ভূমিকা কী ছিলো—পূর্বে প্রকাশিত ঐসকল গ্রন্থেও তা দেখানো হয়নি। অতএব ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত মুসলমানদের সংবাদ ও সাহিত্যবিষয়ক পত্রপত্রিকার ওপর নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আরো একাধিক গবেষণাকর্ম পরিচালনের পর্যাপ্ত সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার নাকরে পারা যায় না।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে সজ্ঞান-বিবেচনায় আমি এই অভিসন্দর্ভ প্রণয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করি।

এই গবেষণাকর্মকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমি মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত সকল পত্রিকার তালিকা প্রণয়ন, সূচিপত্র লিখন এবং বিশেষ বিষয়ের রচনার সারাংশের উল্লেখসহ নোট নিয়েছি। তবে সকল পত্রপত্রিকার সংবাদ জানার ও জানানোর উদ্দেশ্য ও আগ্রহ সব সময়ই আমি অন্তরে জাগ্রত রেখেছি।

৫

অনুসন্ধানে জানা যায়, একালে বাঙালি মুসলমান সমাজ থেকে আবির্ভূত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক বা সমাজসেবকদের দ্বারা ইংরেজি ও বাঙলায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, এবং দ্বিমাসিক ত্রৈমাসিক আর অনিয়মিত সাহিত্য সংকলন অনেক বের হয়েছে। মুসলমান সম্পাদিত বেশ কিছু দৈনিক পত্রিকাও বের হয় একালে,—যার মধ্যে আজাদ (১৯৩৬) ও নবযুগ (নবপর্যায়, ১৯৪১) অন্যতম। এসকল দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, সওগাত, দেশের কথা, কৃষক, চাষী, বাঙালী, নয়া বাংলা, বাংলার শিক্ষক, পল্লীবান্ধব, দরদী, মিল্লাত, ইত্তেহাদ, ইনকেলাব প্রভৃতি নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে। কিন্তু সরাসরি সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করার অভিপ্রায় এঁদের কতোটুকু ছিলো তা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। যদিও তখন 'খবর' বা 'সংবাদ' এর পরিমাণ (সাংবাদিক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য) ছিলো কম। আজকের মতো এতো অফুরন্ত খবর বা সংবাদ সেকালের সাময়িকপত্রের পাতায় স্থান পেতো না তাই 'সাহিত্য' দিয়েই সংবাদপত্রের অনেকাংশ জায়গা জুড়ে দেয়া হতো। বিশেষ করে সাপ্তাহিক পত্রিকার 'ঈদ সংখ্যা'গুলো সাহিত্যের বিবেচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে। কারণ তাতে কবিতা গল্প ও চিন্তামূলক প্রবন্ধ অনেক ছাপা হয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত আলোচ্যকালের সাহিত্যপত্রিকার প্রায় সবই আলোচনার জন্যে গ্রহণ করা হয়েছে। পরিশিষ্টে এবং অভ্যন্তরীণ বিবরণে ঐকালের দৈনিক সাপ্তাহিক অপরাপর মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্রের ভুক্তিও গ্রথিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু সমাজের অপরাপর বাঙলা সাহিত্য পত্রিকার কথাও সংক্ষেপে আলোচনা করতে হয়েছে।

বলাবাহুল্য হবে না যে, সাহিত্য নিরবলম্ব নয়। সমাজ ও মানুষ তার প্রধান অবলম্বন। আজকের যুগে মানুষ ও সমাজ বিশ্বের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নিগড়ে বাঁধা। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে সাহিত্য পত্রিকাগুলোতেও সামাজিক অর্থনৈতিক স্বার্থবোধ বা আকাঙ্ক্ষাঅভীপ্সা ব্যক্ত হয়ে থাকে। আবার পত্রিকা যিনি প্রকাশ করেন, তাঁর শ্রেণীস্বার্থকে তিনি তাঁর পত্রিকার মুখ্য উপজীব্য করে থাকেন। এক্ষেত্রে তাই বলতেই হয়,—সকল সাহিত্যপত্রিকাই একই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয় না। সেকারণে পত্রিকাগুলোকে তিনটি ধারায় ভাগ করে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিবেচ্য ও উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে কিছু পত্রিকা সাহিত্যিক উচ্চ স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতে পেরেছিলো, আর কিছু পত্রিকা তা পারেনি। কিন্তু একটা পরিমণ্ডল তৈরি

www.pathagar.com

করার জন্য প্রাপ্ত প্রধান ও অপ্রধান পত্রপত্রিকার ভূমিকা বা গুরুত্বও নির্ণয় করার প্রয়াস পাওয়া গেছে। সংবাদপত্রের পর্যায়ে পড়ে এমন পত্রপত্রিকার আলোচনা বাদ রাখা হয়েছে। তবে পরিশিষ্টে ১৯০১ থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রপত্রিকার দুটো অসম্পূর্ণ তালিকা সংযোজন করা হয়েছে। আরো সময় ও শ্রম দিতে পারলে, দুটো তালিকা দীর্ঘতর হতো। তবে প্রদত্ত বিবরণ থেকে একালের প্রধান প্রবণতাকে বুঝতে কোনোই বেগ পেতে হবে না বলে আমি বিশ্বাস করি।

মুসলিম সাময়িকপত্রকে বুঝতে হলে বাঙলা সাহিত্যের তথা সাময়িকপত্রের বিকাশের ধারাকে সামনে রাখতে হয়, আর এর ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে বাঙলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনীতি সমাজ পরিস্থিতির আলোচনাও আবশ্যিক বিবেচিত হয়ে থাকে। একারণে প্রথম তিনটি অধ্যায়ে পটভূমি তৈরি করা হয়েছে আলোচ্য এবং পূর্ববর্তীকালের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ঘটনাবলির সূত্র সংকেত উল্লেখ করে।

মুসলিম সাময়িকপত্রের মূল্যায়ন বলে ভারতবর্ষ তথা বাঙলায় মুসলিম আগমনের, ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টির এবং বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের প্রথম পর্যায় থেকে আলোচনায় অগ্রসর হতে হয়েছে। মুসলমানদের বাঙলার সাহিত্য সাধনার চিত্রকে পরিস্ফুট করার প্রয়োজনে সৃষ্টিশীলতা ও সাময়িক পত্রপত্রিকার উদ্ভাবনে হিন্দু-সাহিত্যিক সম্পাদক সমাজসেবীদের বিচিত্র কর্মের এবং সৃজনপ্রয়াসী সাহিত্যেরও মর্ম অনুসন্ধান করতে হয়েছে। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে এসবই স্থান পেয়েছে।

উপসংহারে এই গবেষণার ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে মুসলমান সমাজ থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রসমূহ বাঙলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে কী ভূমিকা পালন করেছিলো অথবা ভবিষ্যতের জন্য কী গতিপথ নির্মাণ করে রেখেছিলো, কিংবা দিয়ে গিয়েছিলো কী নির্দেশ ও পথের দিশা। বর্তমান গবেষণা প্রকাশিত হলে আমাদের জ্ঞানের ও দৃষ্টিভঙ্গির এক বিরাট শূন্য এলাকা পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

ইসরাইল খান

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ক. বাঙালি ও মুসলমান বাঙালি ১
খ. বাঙলার মুসলমান ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য ৯
গ. উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগরণ : বাঙালি মুসলমানের অবস্থান ২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলোচ্য কালের অব্যবহিত পূর্বকালের অর্থনৈতিক, সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি এবং সাহিত্য

ক. বিশ শতকের সূচনায় বাঙলার সামাজিক পরিস্থিতি ৩৫
খ. বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের বাঙলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাময়িকপত্র সাধনার পরিচয় ৪২
গ. মুসলিম সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার উদ্ভব ও বিকাশ (১৯৩০ পর্যন্ত) ৪৯

তৃতীয় অধ্যায়

আলোচ্য কালের প্রধান প্রবণতাসমূহ

ক. বাঙলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ৫৫
খ. সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক ও ভাষিক পরিস্থিতি ৬৬

চতুর্থ অধ্যায়

আলোচ্যকালে প্রচলিত ও প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকার পরিচয় ও মূল্যায়ন

৪. ক. অসাম্প্রদায়িক (সমন্বয়বাদী) প্রগতিশীল ধারা

১. সওগাত (কলকাতা, ১৩২৫–৫৫) ৮৩
২. শিখা (ঢাকা, ১৩৩৩–৩৮) ১১০
৩. জয়তী (কলকাতা, ১৩৩৭–৩৯) ১১৯
৪. প্রাতিকা (কলকাতা, ১৩৩৭) ১২৬
৫. বুলবুল (কলকাতা, ১৩৪০–৪৫) ১৩৩
৬. ছায়াবীথি (কলকাতা, ১৩৪০–৪৩) ১৫৯
৭. চতুরঙ্গ (কলকাতা, ১৩৪৫–৫৪) ১৬৫
৮. রূপায়ন (কলকাতা, ১৩৪৭–৪৮) ১৮৯
৯. ত্রিকাল (কলকাতা, ১৩৪৯–৫২) ১৯৭

www.pathagar.com

৪. খ. মধ্যপন্থী, উদারনৈতিক, মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল ধারা
১০. মোয়াজ্জিন (কলকাতা, ১৩৩৫–৫০) ২০৩
১১. গুলিস্তাঁ (কলকাতা, ১৩৩৯–৫৪) ২১৫
১২. সবুজ বাঙলা (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ১৩৪১–৪৫) ২২৯
১৩. মৃত্তিকা (কলকাতা, ১৩৪৮–৫৪) ২৩৯
১৪. পূরবী (চট্টগ্রাম, ১৩৪৩–৪৫) ২৪৮
১৫. বঙ্গভূমি (ঢাকা, ১৩৪৪–৪৫ ?) ২৫৫
১৬. শীশ্‌–মহল (কলকাতা, ১৩৪৬–৫০) ২৬২
১৭. প্রতিভা (চট্টগ্রাম, ১৩৪২) ২৬৬
১৮. নব্য বাংলা (?, ১৩৩৯) ২৬৮
১৯. রূপরেখা (কলকাতা, ১৩৩৯–৪২) ২৭০
২০. বর্ষবাণী (কলকাতা, ১৩৪২–৫৭) ২৭৬
২১. অভিযান (ঢাকা, ১৩৪০) ২৭৯

৪. গ. মুসলিম জাতীয়তাবাদী (স্বাতন্ত্র্যবাদী), ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী ধারা
২২ মোহাম্মদী (কলকাতা, ১৩৩৪–৫৪) ২৮৩
২৩. আল্‌–ইসলাহ্‌ (সিলেট, ১৩৩৯–৫৪) ৩২১
২৪. প্রভাতী (সিলেট, ১৩৪৮–৫৪) ৩৩১
২৫. আল্‌ আমান (সিলেট, ১৩৪৯–৫৪) ৩৪০
২৬. নওরোজ (দিনাজপুর, ১৩৪৮–৫৪) ৩৪৯
২৭. জাগরণ (কলকাতা, ১৩৪৭–৫৪) ৩৫৬
২৮. নয়া–জামানা (সিরাজগঞ্জ, ১৩৪৫–৫০) ৩৬২

ঘ. শিশু-কিশোরদের পত্রিকা
২৯. শিশু–সওগাত (কলকাতা, ১৩৪৪–৫৪) ৩৬৮
৩০. গুল্‌–বাগিচা (কলকাতা, ১৩৫০–৫৪) ৩৭৪
৩১. সবুজ–পতাকা (সিলেট, ১৩৪৯—) ৩৭৬

পঞ্চম অধ্যায়
উপসংহার ৮

পরিশিষ্ট
ক. নির্বাচিত গ্রন্থ–প্রবন্ধ ও পত্রিকাপঞ্জি ৩৮২
খ. অবিভক্ত বাঙলার সাময়িকপত্র (১৯০১–১৯৪৭) ৩৮৭
গ. ১৯৩১–৪৭ পর্বে প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত পত্রপত্রিকার তালিকা ৪০৭
ঘ. নির্ঘণ্ট ৪১৩
ঙ. মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকার প্রচ্ছদ ও প্রতিলিপি ৪৪১

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ক. বাঙালি ও মুসলমান বাঙালি

বাঙালি জাতির অভ্যুদয় প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা নয়। হিন্দু-বাঙালি, বৌদ্ধ-বাঙালি, জৈন-বাঙালি তথা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত বাঙালির সঙ্গে সঙ্গে 'মুসলমান-বাঙালি'ও বাঙালি-জাতি গঠনে উপাদান সরবরাহ করেছিলো। তাই বাঙালির ইতিহাস বা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসের আলোচনায় 'প্রথমেই বাঙালী জাতির উৎপত্তি ধরিয়াই আরম্ভ করিতে হয়।'

...'যতদিন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হয় নাই, ততদিন বাঙালী জাতি বলিয়া একটা কিছুর কল্পনা করা যায় না। বাঙালী জনগণের পূর্বপুরুষ যখন অন্য ভাষা বলিত, তখন তাহাদের ঠিক বাঙালী বলা চলে না।'

'বাঙালী জনগণের গঠনে কী কী উপাদান আসিয়াছে, তাহার আলোচনা কিছু কিছু হইয়াছে ও হইতেছে...কয়েকটি বিভিন্ন Race বা জাতির সমবায়ে বাঙালী জনগণ গঠিত হইয়াছে ; এবং এই গঠনকার্য আরম্ভ হইয়াছে কয় সহস্র বৎসর পূর্বে তাহা জানা যায় না।

...বাঙ্গালা ভাষা তাহার আধুনিক অর্থাৎ বাংলা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিকে ; ...খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলার সুবিখ্যাত পাল রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে ; মনে হয় সেই সময়ে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট চীন জাতীয় লোকেরা উত্তর ভারতের ও বিহারের আর্যভাষী ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে সমভাষী হইয়া যাইবার ফলে এক ভাষার সূত্রে গ্রথিত একটি বিশিষ্ট Nation বা জনগণ-এ পরিণত হইয়াছিল।

সমভাষিতাকে আশ্রয় করিয়া কিন্তু Nationhood অর্থাৎ জাতীয়তা বা এক রাষ্ট্রিকতার ধারণা তখন পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায় নাই—ভারতেও নহে।—এইভাবে বাঙালী জনগণের পত্তন হইল—বাঙালীর সংস্কৃতি তাহার আদিমরূপ গ্রহণ করিল।... আনুমানিক দশম হইতে প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ চর্যাপদকে অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষার সাহিত্যিক ইতিহাস আরম্ভ হইল।

...তুর্কীবিজয়ের পরে বাঙালী পণ্ডিতজন এবং বাঙালী জনগণ পরস্পর বিরোধী টানের মধ্যে পড়িল...ইসলাম ধর্ম আসিয়া দেশে নূতন ঝড় বহাইয়া দিল,....নূতন আগত ইসলামের সহিত সংঘর্ষ অপরিহার্য্য হইল।...শরিয়তী ও সুফিয়ানা—এই দুই প্রকারের ইসলামের মিলিত প্রভাব আসিয়া মুসলমান রাজশক্তির সহিত যোগ দিল এবং বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল। বাঙালীর জীবনে ইহার ফলে আর একটি নূতন ভাবধারা (ইসলামী ভাবধারা, বিশেষ করিয়া সূফী মতের ভাবধরা ও আদর্শ)...আসিয়া মিলিত হইল।'[১]

www.pathagar.com

বাঙলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্ষেত্রেও তুর্কীদের বিজয় তথা ইসলামের প্রসার যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলো। তুর্কি-বিজয় থেকেই বাঙলার মধ্যযুগের উন্মেষ, আর প্রাচীন যুগের অবসান। যেমন পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির পরাজয়েই আধুনিক যুগের উন্মেষ। এ যদি সত্য ও স্বীকৃত হয়, তাহলে বলতে হবে প্রাচীন যুগের অবসানের মূলে ছিল ইসলাম, যেমন মধ্যযুগের বিলুপ্তির মূলে রয়েছে য়ুরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন ও কৃৎ কৌশল।[২]

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো : তারা কোন মর্তমানবের কাছে মাথা নত করে না। তারা কেবল স্রষ্টা উপাস্যের কাছে তাদের দেহ মন আত্মা সমর্পণ করে। তাদের ভাব-চিন্তা, কর্ম-আচরণ, তাদের সব পার্থিব দায়িত্ব কর্তব্য ও বাসনা আল্লাহর অদৃশ্য অশ্রুত অভিপ্রায়ক্রমেই চলে বলে তাদের ধারণা। .

'এজন্যেই তারা উন্নত শির, অকুতোভয়, অঙ্গীকারে অনড়, সংকল্পে অটল। ভয় এবং পরাজয় কাকে বলে তারা জানে না। এক কথায় তাদের জীবন-মরণ, কর্ম-আচরণ, সবই ওই অমোঘ বিশ্বাসে চালিত। তারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করে তাদের ব্যক্তিজীবনে আল্লাহর অদৃশ্য ইচ্ছাই সর্বত্র ও সর্বক্ষণ রূপায়িত হচ্ছে।...এ হচ্ছে প্রমূর্ত ঈমান।

সেদিনকার কেরালা মালাবারের (সিন্ধুবিজয়ী, মুহম্মদ বিন কাসিম, ৭১১ খ্রি. এর ঘটনা স্মর্তব্য) আরব সৈনিক শাসক-সদাগরদের দেখে ওই এলাকার লোকের মনে হয়তো এ ধারণাই দানা বেঁধেছিল যে বিজেতাদের শক্তির উৎস ওই একক উপাস্যই। বহু দেবতার পূজারীরা তাই ওদের কাছে পরাভূত। বিজয়ী ও বীর্যবান ইংরেজদের দেখে বহু শতাব্দী পরে হয়তো এমনিভাবেই রামমোহনের মনেও জেগেছিল একেশ্বরবাদের প্রতি আকর্ষণ, তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন একক উপাস্যের মহিমা। সেদিনকার শুধু গণমানব নয়, শাহ-সামন্ত আর ধনী-মানী-বেনেও ইসলামী সাম্যে-ভ্রাতৃত্বে ও মুসলিমের বলবীর্যে এবং চরিত্রশক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম বরণ করে।'[৩]

বাংলাদেশের মুসলমানদের শ্রেণীগত অবস্থান নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। এই বিতর্ক বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রই (১৮৩৮-৯৪) সৃষ্টি করেন। তিনি লিখেছেন :

> প্রথমে কোল বংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য্য, তারপর আর্য্য ; এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।...ইংরেজ এক জাতি, বাঙালীরা বহু জাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙালী বলি (১৮৭১ সনের লোকগণনা অনুযায়ী, বঙ্কিমের কালে বাংলা-ভাষির সংখ্যা ছিলো তিন কোটি ছয় লক্ষ) তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যনার্য্য হিন্দু আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙালী মুসলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকে। বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালী অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য্য ও বাঙালী মুসলমান ; উপরের স্তরে কেবলই আর্য্য। এইজন্যে দূর হইতে বাঙলার ইতিহাস এক আর্য্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।[৪]

মুসলমান সমাজের বিকাশ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র মন্তব্য করেছিলেন :

> এখন ত দেখিতে পাই, বাঙলার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক-কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার

www.pathagar.com

বংশাবলী উচ্চশ্রেণীর হইবে, ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়, অল্প সংখ্যক রাজানুচরবর্গের বাংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।[৫]

উপরের প্রশ্নগুলোর জবাব খোঁজার জন্য নীহাররঞ্জন রায়ের (১৯০৩-৮১) আলোচনা অবলম্বন করা যেতে পারে। তিনি ত্রয়োদশ শতকে বাঙলায় ইসলামধর্ম ও মুসলিম শাসন বিস্তারের সামাজিক রাজনৈতিক শৈক্ষিক—তথা সার্বিক পরিস্থিতির যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়,—একাদশ-দ্বাদশ শতকের বঙ্গীয় শাসকশ্রেণীর সমাজকাঠামো বলবৎ রাখার কোনো শক্তিই ছিল না। নানা প্রকার দুরাচারে অবক্ষয় কবলিত ঐ সমাজ তখন ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলো। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের তৎকালীন পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন :

সেক শুভোদয়ার সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেন রাষ্ট্র ও সেন রাজসভার চরিত্র বলিয়া কিছু ছিল না। সভাকবি উমাপতিধর ও মহাকর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ মিশ্র এই চরিত্রহীনতার দুইটি দৃষ্টান্ত মাত্র। পৃথিবীর সর্বত্রই তো রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির এই একই চিত্র—প্রাচীন গ্রীসে, রোমে, অষ্টাদশ শতকের প্যারিসে, অষ্টাদশ শতকের কৃষ্ণনগরে, উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কলিকাতায়। সে-চিত্র সামাজিক দুর্নীতির, চারিত্রিক অবনতি, মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্বের, কামপরায়ণ বিলাসলীলার, শৃঙ্গার রসাবিষ্ট, অলংকারবহুল, মদির-বিধুর শিল্প ও সাহিত্যের, তরলরুচির ও দেহগত বিলাসের, অতিমাত্রায় ভেদ-বৈষম্যের, ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত বিশ্বাসঘাতকতার। একাদশ দ্বাদশ শতকের রামাবতী, বিজয়পুর, নবদ্বীপেও সেই একই ছবি দেখিতেছি।'[৬]

বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় শ্রেণীভেদ বুদ্ধির ও নানা অনিয়মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে নীহাররঞ্জন রায় বাঙলায় ইসলাম ধর্ম বিস্তারের কারণ সম্পর্কে বলেন, বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরাও সেন রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না ; এবং সেন-বর্মণ রাষ্ট্রও বৌদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব ও সহানুভূতি পোষণ করতো না। রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শও বৌদ্ধ স্বার্থবিরোধী ছিলো।

বর্ণভেদবুদ্ধি এবং এই শ্রেণীভেদবুদ্ধি একত্র হয়ে নবগঠিত বাঙলাদেশ ও জাতিকে, সেন রাষ্ট্রকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দেয়, সামন্ততন্ত্র এবং অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত আমলাতন্ত্র বিন্যস্ত সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আদর্শে ভেদবুদ্ধির দুর্বলতা, স্থানীয় আত্ম-কর্তৃত্বের দর্বলতা...'তাহার উপর বর্ণ ও শ্রেণীগত এই ভেদবুদ্ধি, সমাজাদর্শগত ভেদবুদ্ধি বৈদেশিক আক্রমণকে প্রশ্রয় দেয় নাই, সহজ করিয়া দেয় নাই, তাহা কে বলিবে?...শুধু তো এইখানেই শেষ নয়। আর্যেতর ধর্মের আচারানুষ্ঠান এবং তন্ত্র ধর্মের বিকৃতি এই সময় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্ম ও সমাজকেই স্পর্শ করিয়াছিল। এবং উভয় ধর্মেরই আচারানুষ্ঠানকে নানা প্রকার যৌনাতিশয্যে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল। বোধ হয়, তাহারই ফলে সমাজে, বিশেষ ভাবে উচ্চবর্ণ ও শ্রেণীগুলিতে নানা প্রকারের কাম ও যৌনবিলাস দেখা দিয়াছিল।...বস্তুত, যৌন আচার-ব্যবহারে কোনো প্রকার শ্লীলতাজ্ঞান এই সমাজে ছিল বলিয়াই মনে হয় না।...পাল আমলের

www.pathagar.com

শেষের দিক হইতেই তাহা দেখা দিল এবং সেন আমলে সমগ্র সমাজদেহকে তাহা কলুষিত করিয়া দিল। বিলাস ও আড়ম্বরাতিশয্যও এই সময় নাগরসমাজকে গ্রাস করিয়াছিল।[৭] উপর্যুক্ত সমাজ-পরিস্থিতির কারণেই মুসলিম শাসকশক্তির বিরুদ্ধে 'হিন্দু রাষ্ট্র শক্তিপুঞ্জ' কোনো সামগ্রিক প্রতিরোধ রচনা করতে পারেনি। 'সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এই নিম্নগামী প্রবাহকে রোধ করিবার মতন সাহস ও শক্তি, বুদ্ধি ও চরিত্র, দৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না, না সেন রাজসভায়, না বৃহত্তর সমাজে। সকলেই যেন অনিবার্য গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।'[৮]

নবদ্বীপ জয় করার একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাঙলাদেশ জুড়ে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা তৎকালীন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণামেই ঘটেছিলো। তবে লোকসংখ্যার অনুপাতে কী হারে বৃদ্ধি হচ্ছিলো, তা ঠিক পরিসংখ্যানের ভাষায় বলা সম্ভব নয়। কারণ, মধ্যযুগে লোক গণনার কোন রীতি ছিল না। সুতরাং কোন্ শ্রেণীর মুসলমান কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা আর নির্ণয় করার উপায় নেই।

মুসলমান আমলে এদেশ সম্বন্ধে যেসব ইতিহাস রচিত হয়েছে, সে সবে প্রধানত রাজবংশের উত্থান-পতনের কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে, জনসাধারণের কথা প্রায়ই স্থান পায়নি। ব্রিটিশ শাসন-আমলে ইংরেজ রাজকর্মচারী এবং পণ্ডিতগণ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রভৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে বাঙলার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সনে প্রথম 'আদমশুমারী' অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮১ সনে দ্বিতীয় এবং ১৮৯১ সনে তৃতীয় ইত্যাদি দশ বছর অন্তর নিয়মিতভাবে লোকগণনার রীতি চলতে থাকে।

১৮৭২ সনের সেন্সাস-রিপোর্ট অনুযায়ী মূল বাঙলার মুসলমানের সংখ্যা ১, ৭৬,০৯,১৩৫ এবং হিন্দুর সংখ্যা ১,৮২,০০,৪৩৮ জন। শতকরা হিসেবে হিন্দু-মুসলমানের হার যথাক্রমে ৫০.১% এবং ৪৮. ৮.%। ১৮৮১ সনের রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৫ লক্ষ বেশী হয়। ১৮৯১ সনের সেন্সাস-রিপোর্টে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ১৫ লক্ষেরও অধিক দেখা যায়।[৯]

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অধিক কেন, এ প্রশ্নের মীমাংসা পুরোপুরি হয়নি। অনুমান হয়...হিন্দু-অভ্যুত্থাণের, বিজয়ের দিনে, কৌলীন্য ও জাতি বিচারের প্রাবল্যের মধ্যেও পূর্বদেশে বৌদ্ধ মনোবৃত্তির অহিংস্রতা ও সাম্যবোধ প্রচ্ছন্ন হয়ে বেঁচে ছিলো। মুসলিম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আত্মপ্রকাশ করে পূর্ববঙ্গের ধর্মীয় রূপ বদলে দেয়। বাঙলার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে কোন দিনই সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেনি। রাজশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ইসলাম প্রচারের মধ্যে বৌদ্ধমানসের ক্রিয়া তাই সুস্পষ্ট। সেই জন্যই এ প্রান্ত প্রদেশে মুসলমানের প্রাচুর্য্য।[১০]

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেশীয় এবং ইউরোপীয় (অথবা ভিন্‌দেশীয়) পণ্ডিতগণ মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির এবং কোনো কোনো এলাকায় হিন্দু বা মুসলিম জনসংখ্যার হার কম বেশী হবার কারণ নিয়েও সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে ও প্রেক্ষিতে আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছেন। মুসলমান চিন্তাবিদদের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), হুমায়ুন কবির (১৯০৬-৬৯); মুহম্মদ এনামুল হক

www.pathagar.com

(১৯০৬-৮২) ; মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-৬৯) ; আহমদ শরীফ (১৯২১—৯৯) ; কাজী দীন মুহম্মদ (১৯২৭-) ; কাজী আবদুল মান্নান (১৯৩০-৯৪) ; ওয়াকিল আহমদ (১৯৪০-) প্রমুখ গবেষক সেসব তথ্যের বিশ্লেষণপূর্বক বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। তাঁদের গবেষণার আলোকে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) রচনার সমকালেই বাঙলাভাষী জনগণের অর্ধেক মুসলমান ছিলেন। পূর্ববঙ্গে মুসলমান ও পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু বেশি হবারও অনেক কারণ ছিলো। উন্মেষ যুগের লঘিষ্ঠ মুসলমানেরা বিত্ত ও বিদ্যার অভাবে অনুজ্জ্বলও ছিলো। আবার নবগঠিত মুসলমান-এর সমাজকাঠামোর মধ্যে ভারতীয় বর্ণবৈষম্যবাদও বিদ্যমান ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বা রক্তভিত্তিক চতুর্বর্ণের ভেদরীতি কেবল নাম পাল্টিয়ে 'আশরাফ', 'আতরাফ', 'আজলাফ', 'আরজল' প্রভৃতি নামে টিকে ছিলো। সমাজের মানুষের মধ্যে এই শ্রেণীভেদ প্রধানত 'খানদান' বা রক্তধারা দিয়ে নির্ণীত হয়েছে। বিত্ত ও বিদ্যা সমাজস্তর গঠনে প্রভাব ফেলতে পারেনি।[১১]

ইসলাম ধর্মের বিকাশের ইতিহাসকে যিনি যে দৃষ্টিতেই দেখে থাকুন, আর সামাজিক বিবর্তনের যে দুর্বল মুহূর্তেই এই ধর্ম ও সম্প্রদায় এই দেশে বিস্তৃতি লাভ করুক না কেন, এই সত্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে, একটি প্রগতিশীল ধর্ম হিসেবেই 'ইসলাম' এদেশে আদৃত ও বিকশিত হতে পেরেছিলো। আর জৈন বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ বা হিন্দুর সনাতন ধর্মের তুলনায় এটা অর্বাচীন এবং আধুনিকতমও বটে। শিক্ষার অভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানের ধর্মীয় জ্ঞান কেবল মৌখিক নির্দেশ ও সংস্কারের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিলো। একারণে ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমান ও দেশীয় হিন্দুর সংস্কৃতিতে ব্যাপক সাদৃশ্য দেখা যায়।

পক্ষান্তরে শিক্ষিতজনের মধ্যে বিদ্বেষ ও বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়। চিন্তাবিদ আহমদ শরীফ সেকালের এবং একালের শহুরে সাহিত্যে 'রাজশক্তিসম্পৃক্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে'ই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বা বিদ্বেষের পরিচয় দেখেছেন। তিনি গাঁ-গঞ্জের সাধারণ দরিদ্র অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের চিত্রও সমাজে সাহিত্যে পাওয়া যায় বলেও মন্তব্য করেন।[১২]

সৈয়দ মুজতবা আলীও (১৯০৩—৭৪) হিন্দু-মুসলমানের অসম্প্রীতির পরিচয় তুলে ধরেছেন 'বড়বাবু' শীর্ষক গ্রন্থে :

> ষড়দর্শন নির্মাতা আর্য্য মনীষীগণের ঐতিহ্যগর্বিত পুত্র-পৌত্রেরা মুসলমান আগমনের পর সাত শত বৎসর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিওপ্লাতিনিজম্ তথা কিন্দী, ফারাবী, বু, আলী সিনা (লাতিনে আভিসেনা), অল গজ্জালী (লাতিনে অল-গাজেল), আবু রুশদ্ (লাতিনে আভেরস্) ইত্যাদি মনীষীগণের দর্শনচর্চা হল তার কোনো সন্ধান পেলেন না। এবং মুসলমান মৌলানারাও কম গাফিলী করলেন না। যে মৌলানা অমুসলমান প্লাতো আরিস্ততলের দর্শনচর্চায় সোৎসাহে জীবন কাটালেন তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে।...হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি।[৩]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) হিন্দু মুসলমানের সহাবস্থান নীতি সম্পর্কে, অর্থাৎ অসম্প্রীতির বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বলেন :

> মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামী যেমন হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল, হিন্দুদের সামাজিক গোঁড়ামিও মুসলমানগণকে তাহাদের প্রতি সেইরূপ বিমুখ করিয়াছিল। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন বলিয়া ঘৃণা করিত, তাহাদের সহিত কোন প্রকার

www.pathagar.com

> সামাজিক বন্ধন রাখিত না। গৃহের অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ করিতে দিত না, তাহাদের স্পৃষ্ট কোন জিনিষ ব্যবহার করিত না। তৃষ্ণার্ত মুসলমান পথিক জল চাহিলে বাসন অপবিত্র হইবে বলিয়া হিন্দু তাহা দেয় নাই ; ইব্‌ন-এ-বতুতা এইরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সপক্ষে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুরা যেমন নিজেদের আচরণ সমর্থন করিত, মুসলমানরাও তেমনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের সমর্থন করিত। বস্তুত উভয়পক্ষের আচরণের মূল কারণ একই-যুক্তি বিচার নিরপেক্ষ ধর্মান্ধতা।
>
> কিন্তু ন্যায্য হউক বা অন্যায্য হউক পরস্পরের প্রতি এরূপ আচরণ যে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক দিন যাবৎ অভ্যস্ত হইলে অত্যাচারও গা-সহা হইয়া যায়, যেমন সতীদাহ বা অন্যান্য নিষ্ঠুর প্রথাও হিন্দুর মনে এক সময়ে কোন বিকার আনিতে পারিত না। হিন্দু-মুসলমানও তেমনি এইসব সত্ত্বেও পাশাপাশি বাস করিয়াছে, কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব তো দূরের কথা স্থায়ী প্রীতির বন্ধনও প্রকৃতরূপে স্থায়ী হয় নাই।[১৪]

এইরূপ পার্থক্যসূচিত হওয়ার কারণ মুসলমানদের ধর্মীয় আদর্শের ভিন্নতা। মুসলমানদের পূর্বেও অনেক বিদেশী ও বিধর্মী জাতি ভারতে বসতি স্থাপন করে। যেমন গ্রীক, সিথীয় (শক), পার্থীয়, মোঙ্গলীয়। কিন্তু 'তাহাদের বংশ দুই তিন পুরুষ পরেই হিন্দু সমাজে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায়,... মুসলমান-বিজয়ের পর এইরূপ মিলন ও একত্রীকরণ বন্ধ হইল। হিন্দুধর্ম ইসলামকে নিজস্ব করিয়া, মুসলমান জাতিগুলিকে হজম করিয়া ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত করিতে পারিল না। কারণ, ইসলামের মূলমন্ত্র একেশ্বরবাদ।...অতএব হিন্দু ও মুসলমান (পরে হিন্দু ও খৃষ্টান) একই দেশে শত শত বর্ষ বাস করিয়াও সমাজে জীবনে এক হইতে পারে নাই। ভারতীয় মুসলমানদের হৃদয়ের দ্বার ভারতের দিকে বন্ধ, ভারতের বাইরের দিকে খোলা।'[১৫]

বস্তুত ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ সম্পর্কে এসব উক্তিতে সত্য রয়েছে এবং তাঁদের অগ্রগতির বিলম্বিত লয়ের কারণ এগুলোই। তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে মুসলিম সমাজব্যবস্থা সত্যিই বিরাট বিপুল সদর্থক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। আচার্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪) এবং যদুনাথ সরকার বলেন : মুসলমান যুগের দেওয়া শান্তি ও ঐশ্বর্যের ফলে হিন্দী বাংলা মারাঠী প্রভৃতি নব্য-ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং সংস্কৃতের ব্যবহার প্রায় লোপ পায়।[১৬]

বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ-সমস্যার মূলে এখনও দেখা যায়, শ্রেণীস্বার্থবোধ কার্যকর রয়েছে। কালে কালে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে, সোজা কথায়, প্রাক্তন সেই শ্রেণীগত ভেদ বুদ্ধি এবং হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণাই প্রাধান্য পেয়েছে। উচ্চশ্রেণী উদ্ভূত লেখক সাহিত্যিকদের রচনায় নিম্নশ্রেণীর প্রতি তাচ্ছিল্য এবং আপন শ্রেণী সম্পর্কে গর্ববোধ উনিশ শতকেও বাঙালির চিন্তা চেতনায় ক্রিয়াশীল ছিল। বাঙালি মুসলমান কারা? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আভিজাত্য অভিলাষী মুসলমান বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে যেমন পাওয়া যায়নি, তেমনি উচ্চ শ্রেণীউদ্ভূত (আর্য্য ?) হিন্দুর কাছ থেকে সত্য পাওয়া গেলেও, তাকে মেনে নেবার মতো ঔদার্য সমাজে দেখা যায়নি।

বাঙালি মুসলমান এর অধিকাংশই যেহেতু অনগ্রসর বাঙালি বৌদ্ধ ও হিন্দুর বংশধর, সেহেতু এদেশের মুসলমান সমাজ সাধারণভাবে শিক্ষায়, মেধায়, বিত্তে, পিছিয়ে ছিলো। কিন্তু

www.pathagar.com

পেছনের থেকে সামনে যে আসা যায়—এ সত্য মেনে নেবার মধ্যে মুসলমানেরা অগ্রসর হবার প্রেরণা খোঁজেনি যেমন, তেমনি হিন্দুরাও মানবতাবাদীর বিবেচনায় পেছনের লোকেদের সম্মুখ অভিযানকে স্বীকৃতি দিতে চায়নি। বাস্তববাদী ও মানবতাবাদী হলে এই সমস্যার অস্তিত্ব বিশ শতকেও বাঙলায় থাকতো না।

বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে মুসলমানদের পশ্চাপদতার প্রসঙ্গেই উপরিউক্ত কথাটা বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। বিষয়টাকে এইভাবে যদি দেখা যায় যে, ধনে ও বিদ্যায় বহু পশ্চাতে অবস্থানকারী বাঙালি বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যের সৃজনকর্মে যতোটুকু পশ্চাতে থাকা উচিত ছিলো, ততোটুকু পশ্চাতে না থেকে, প্রায় সম মর্যাদায় পাশাপাশিই অবস্থান করেছে ; এবং ঘটনা পরম্পরায় প্রাথমিক যুগে পশ্চাতের সারির লোকেরাই (মুসলমানেরা) অবহেলিত বাংলা ভাষাকে জাতীয়-সাহিত্যের মাধ্যমরূপে গ্রহণ (চর্চা) করে এর উন্নতির পথ সুগম করে দিয়েছে।

উনিশ শতকে তাঁরাই (মুসলমানেরা), অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে বিভীষিকাগ্রস্ত এবং জ্ঞান ও বিদ্যা তথা সাহিত্যক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ শতকে সেই মুসলমানেরা আবার সাহিত্যক্ষেত্রেও নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনে সক্ষম হয়। মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ খোঁজার জন্য একালের কথায় না গিয়ে সেকালের পরিস্থিতি মনে রেখে অগ্রসর হলেই ভালো হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, কলকাতা ১৯৭৬, পৃ. ২০-৩৩।
২. আহমদ শরীফ, বাঙালির চিন্তাচেতনার বিবর্তনধারা, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ৩।
৩. তদেব, পৃ. ৪৭।
৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, নবম মুদ্রণ, কলকাতা ১৩৯২, পৃ. ৩৬১-৬৩।
৫. তদেব, পৃ. ৩৪০।
৬. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, কলকাতা ৩য় সংস্করণ ১৯৮০, পৃ. ৫৫৫।
৭. তদেব, পৃ. ৫৫৪।
৮. তদেব, পৃ. ৫৪৪-৫৫৭।
৯. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪।
১০. হুমায়ুন কবির, বাংলার কাব্য, ঢাকাই সংস্করণ, ১৯৭৬, পৃ. ১৪।
১১. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।
১২. আহমদ শরীফ, বাঙালির চিন্তাচেতনার বিবর্তন ধারা, পৃ. ১০০-১০১।

তিনি আরও লিখেছেন ; 'অন্যদিকে গা-গঞ্জের হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বে-মিলনে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানের চিত্র রয়েছে সব মনসামঙ্গলের হাসান-হোসেন পালায়, মুকুন্দুরামের চণ্ডীমঙ্গলের গুজরাট নগরে, ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলের মানসিংহ-খণ্ডে মানসিংহ-বাদশাহ্‌র লঘু উপহাসে পরিহাসে আর

www.pathagar.com

ধর্মমঙ্গলে এবং চৈতন্যচরিত গ্রন্থেও। দুঃখের যন্ত্রণার অভিঘাতে বাংলার হিন্দু-মুসলিম অভিন্ন লক্ষ্যে আপোষ ও হার্দ্যিক ঐক্য ও সংহতি কামনা করেছিল পীর–নারায়ণ সত্যের সেবক হয়ে।...'।

১৩. উদ্ধৃত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ/দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৭ ৪র্থ সং পৃ. আট–নয় (ভূমিকা)।

১৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, উপরিউক্ত, পৃ. ৩২৪–২৫।

১৫. যদুনাথ সরকার, ভারতে মুসলমান, প্রবাসী, ৩০ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ–আশ্বিন ১৩৩৭।

১৬. যদুনাথ সরকার, উপরিউক্ত।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক–প্রবন্ধ' শীর্ষক গ্রন্থেও জাতীয়তার বিকাশে মুসলিম অবদানের আলোচনা আছে।

www.pathagar.com

খ. বাঙলার মুসলমান ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, তথা উন্মেষ যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে শাসক মুসলমানদের অবদান প্রায় সর্বত্রই উচ্চমূল্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিক অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নমত লিখেছেন :

> অনেকে মনে করেন মুসলমান সুলতান ওমরাহের উৎসাহেই বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। দুইটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিলেই এই ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হইবে। বাঙলাদেশে প্রায় ছয়শত বৎসরব্যাপী মুসলমান রাজত্বে মুসলমান সুলতান ও তাঁহাদের অনুচরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক যাঁহাদের নাম জানা গিয়াছে তাঁহাদের সংখ্যা ছয়জনের বেশি নহে। দ্বিতীয়তঃ মধ্যযুগে কেবল বাঙলায় নহে ভারতের সকল প্রদেশেই—এমনকি যেখানে মুসলমানদের আধিপত্য ছিলো না এবং মুসলমান সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেইসব দেশেও স্থানীয় কথ্যভাষা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হইয়াছিল।
>
> সুতরাং বাঙলার মুসলমান সুলতানদের অনুগ্রহ না-হইলেও যে বাঙলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইত না এরূপ মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আর দেশের রাজা দেশের সাহিত্যিককে উৎসাহ দিবেন ইহাই স্বাভাবিক। ইহা না করিলে প্রত্যব্যয়, করিলে অত্যধিক প্রশংসার কোন কারণ নাই।[১]

রমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৪৮) এবং আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত History of Bengal, Vol. II এর একাংশের লেখক, অধ্যাপক আবু মহামেদ হবীবুল্লাহ্‌র এতদসংক্রান্ত উক্তিরও তুচ্ছার্থক সমালোচনা করে বলেন, হবীবুল্লাহ্ লিখেছেন যে, সুলতান হোসেন শাহের বংশের 'উদার শাসননীতির আশ্রয়েই বাঙালীর যে সাহিত্যিক প্রতিভা এতদিন রুদ্ধগতি হইয়াছিল তাহা অবরোধমুক্ত হইয়া বেগবতী নদীর মত প্রবাহিত হইয়াছিল এবং চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল'।—এই বক্তব্য অসার ও ভিত্তিহীন বলে আলোচনারও অযোগ্য। তবে 'একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং আচার্য যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত বাঙলার ইতিহাসের কোন উক্তিই অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ সাধারণ লোক যে বিনা বিচারে তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে ইহা অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যের বিষয় নহে'। এইজন্যই 'নিতান্ত অসার' হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক হবীবুল্লাহ্‌র উক্তির বিস্তৃত সমালোচনা করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন :

> হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৩৯ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার পূর্বেই চণ্ডীদাসের পদাবলী, কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বিপ্রদাস পিপিলাই, হোসেন শাহের রাজত্ব লাভের দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করেন। সুতরাং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে তিনটি প্রধান বিভাগ—অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী—তাহার প্রতি বিভাগেই উৎকৃষ্ট কাব্য হোসেন-শাহী আমলের পূর্বেই রচিত হইয়াছে। সুতরাং বাঙালী কবির সৃজনী-শক্তি যে হোসেন শাহের পূর্বেই রুদ্ধ হইয়া ছিল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। পদাবলী সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য যে চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের হাতে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে দুইখানি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে একখানি

www.pathagar.com

> মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য,-হোসেন শাহী বংশের অবসানের ৬০/৭০ বৎসর পর এবং আর একখানি-ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল—তাহারও দেড়শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং হোসেনশাহী শাসনের আশ্রয়েই যে বাংলা সাহিত্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল এই উক্তির সপক্ষে কোন যুক্তিই নাই।[২]

তিনি এ. বি. এম. হবীবুল্লাহর অপরাপর মতামতও তাঁর 'বাঙলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উপযুক্তরূপে খণ্ডন করেছেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার মোটামুটিভাবে বঙ্গে মুসলিম প্রভাব বা আগমনকে সদর্থে সহজে স্বীকার করতে চাননি। এই সময়কালের শাসকদের সম্পর্কে তিনি কিছুটা এলার্জিক ছিলেন এবং তাঁর রচনা পড়লে সহজেই তা বুঝা যায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমকালীন শাসকদের প্রসঙ্গে সদর্থক দিক্‌গুলোকেও তিনি বিনাবিচারে ছেড়ে না দিয়ে নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে যুক্তি ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্বিষ্ট সমালোচকদের আরো দু'একটি বক্তব্য উপস্থাপনযোগ্য :

বঙ্গদেশে যে-মুসলিম বিজয় সংঘটিত না হলে ত্রয়োদশ শতকে দেশীয় তথা বঙ্গীয় কথ্য ভাষায় সাহিত্যচর্চা আরও বিলম্বিত হতো—সেই মুসলিম বিজয়কেই তাঁরা বাংলা সাহিত্যকে ধ্বংসের জন্য দায়ী করে থাকেন। এই ধরনের আলোচনা থেকেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'তামস যুগ' বা 'অন্ধকার যুগের' তত্ত্বের উদ্ভব। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদারের নামে চালু 'বাঙলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের সহযোগী লেখক সুখময় মুখোপাধ্যায় তামস যুগ তত্ত্বের কারণগুলোকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেন, ১৩০১ থেকে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় আড়াই শ বছর বাঙালির সাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ কোন নিদর্শন না-পাওয়ার জন্য শাসক মুসলমানদের অত্যাচার ও হিন্দুদের গ্রন্থাদি নষ্টের অভিযোগকে স্বীকার করা যায় না :

> কারণ হিন্দুদের সাহিত্যের প্রতি মুসলমানদের আক্রোশের কোন প্রমাণ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অশান্তির সময়েও যে সাহিত্যিকের লেখনী নিশ্চল হইয়া থাকে না, তাহার বহু প্রমাণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। সতরাং আলোচ্য সময়ে বাঙলাদেশে সাহিত্যসৃষ্টির অনাবির্ভাবের কারণ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। সম্ভবত ইহার কারণ এই যে, এই সময়ের মধ্যে কোন প্রতিভাধর সাহিত্যিক আবির্ভূত হন নাই। কিছু নগণ্য লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাদের অকিঞ্চিৎকর রচনা স্বতঃই লুপ্ত ও বিস্মৃয় হইয়াছে।[৩]

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের স্পষ্ট অভিমত যদি এই হয় যে, 'হিন্দুদের সাহিত্যের প্রতি মুসলমানদের আক্রোশের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।'—তাহলে মুসলমান নৃপতিগণ যে, দেশীয় সাহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন,—এ সত্য অনেকটা প্রমাণিতই হয়ে যায়। তাছাড়া আমরা এতদিন একথাও মনে করতে চাইনি যে, 'অন্ধকার যুগ' বলতে কোনও নির্দিষ্ট কালে 'সংস্কৃতি-চর্চার' অবরুদ্ধ অবস্থাকেই নির্দেশ করে। কিন্তু সেন আমলের প্রথম দিকে সংস্কৃতি চর্চা cultural activitise যে বন্ধ ছিল না—সেকথা মনে করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে 'তামস' যুগ বা 'অন্ধকার' যুগ-এর ধারণা কারো কারো মনগড়া। ঐকালের হিন্দু পণ্ডিতদের 'সংস্কৃত' এবং মুসলিম শাসকদের তথা উচ্চস্তরের লোকেদের মধ্যে 'ফারসি' ও 'আরবি'র চর্চা অব্যাহত ছিলো। ঐকালে রচিত সংস্কৃত ও আরবি ফারসি গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়ে প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সাংস্কৃতিক ভাবে ঐ

www.pathagar.com

কালটি বন্ধ্যা, অসৃষ্টিশীল কিংবা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো না। তাছাড়া বাংলা ভাষায় শক্তিশালী কবি-সাহিত্যিক সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হননি বলে সুখময় মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন; ড. আহমদ শরীফ ভাষাতাত্ত্বিক কারণ দেখিয়ে বলতে চেয়েছেন : বাংলা ভাষা তখন সৃজ্যমান পর্যায়ে ছিলো বলে লিখিত সাহিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু মুখে মুখে ঠিকই বাংলার চর্চা হচ্ছিলো। অতএব অন্ধকার যুগের জন্য মুসলমানদের দায়ী করা যেমন ইতিহাসসিদ্ধ কাজ নয়, তেমনি মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আগ্রহী কলাকুশলী হতে চাননি এটাও ঠিক নয়। আপেক্ষিকতাকে মনে রেখে পশ্চাৎপদতার অভিযোগ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেই প্রকৃত ইতিহাস অনুসারী কাজ হয় বলে মনে হয়।[৪]

তদুপরি বলতে হয়, রমেশচন্দ্র মজুমদার এর বক্তব্য অনুদার একচক্ষু, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাড়িত। কারণ, সাধারণত দেখা যায় রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানগণ দেশের জনগণের (বুদ্ধিজীবীদের কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য) মুক্তবুদ্ধির চর্চায় এবং মাতৃভাষার অবাধ উন্নতির পথে আধুনিক কালেও প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছেন। সেন আমলে হিন্দুরাজারা হিন্দু-বাঙালির মাতৃভাষার চর্চার পথে সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিলেন। এসূত্রে হিন্দুসমাজের শাস্ত্রীর পাঁতি : 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।/ ভাষায়াং মানব : শ্রুতা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।' কিংবা 'কৃত্তিবেসে কাশীদেশে/আর বামুন ঘেঁষে/এ তিন সর্বনেশে।' —প্রভৃতি উক্তি স্মরণযোগ্য।

তাছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে নানা দেশে দেশীয় ভাষার গুরুত্ব হ্রাসের সরকারি ষড়যন্ত্রের ইতিহাসও পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১) স্বজাতি বা সমধর্মী হয়েও পশ্চিম পাকিস্তানি পাঞ্জাবি শাসকদের একই পাকিস্তানি রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী জনগণের ও সে দেশের সাহিত্যস্রষ্টাদের উপর অকথ্য নির্যাতন নিপীড়নের কথা এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির চর্চার অধিকার আদায়ের জন্য মুসলমান বাঙালির রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৭১ সনে) পরিচালনা করতে হয়েছে মুসলমানদেরই বিরুদ্ধে। এসঙ্গে স্বাধীন ভারতের হিন্দু শাসকগোষ্ঠীর বাঙালি হিন্দুর মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধেয় মনোভাবের কথাও বিবেচনা করতে পারি।

দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি অগ্রগতির লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠীর সানন্দ-সহযোগিতা স্বাভাবিক দাবি বা অধিকার হলেও, সেটা যে কতো দুর্লভ এবং সেই স্বাভাবিক নৈতিক অধিকারটাই যে বাংলা ভাষাভাষিরা দীর্ঘকাল পায়নি,—সেই না পাওয়ার দুঃখ মোচন করে দিয়েছিলো এদেশের মুসলমান শাসকবৃন্দ। কোনো দেশে পরদেশীর আক্রমণ ও উপনিবেশ স্থাপন সে দেশবাসীর সহ্য না হবারই কথা। যেমন ইংরেজ আগমন ও তাঁদের ঔপনিবেশিক কার্যক্রমকে এদেশের সুসন্তানেরা কখনও মেনে নেয়নি। যদিও তাঁদের সংস্পর্শেই 'বাঙলার নবজাগরণ' বা 'নবযুগ' সংঘটিত কিংবা ত্বরান্বিত হয়েছিলো। সে কথা ভারতবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণও করে থাকে।

কিন্তু একই ব্যাপারে অনেকে ইংরেজের প্রতি উদার এবং মুসলিম শাসকদের প্রতি অনুদার মনোভাব পোষণ করেন। যদিও মুসলিম শাসকগণ এদেশকে স্বদেশ করে নিয়েছিলেন এবং সম্পদ পাচার করে বিদেশী মুসলমানেরা ভারতের বাইরে নিয়ে যায়নি। এদিক থেকে ইংরেজ আমলের চেয়ে মুসলিম যুগ অনেকটা ভালো ছিলো বলতেই হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু এদেশের একশ্রেণীর ঐতিহাসিক কেবল একজাতীয় ভিন্‌দেশীয় বিধর্মী শাসকদের প্রতিই বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। আর্যরাও যে এদেশে মুসলমান ও ইংরেজের মতোই ভাগ্য সন্ধানে বা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য এসেছিলেন, তাঁরা সেকথাও মনে করতে চান না।

ইংরেজ আগমনের ফলে ভারতে খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার হয় এবং এদেশে আরও একটা নতুন ধর্ম সম্প্রদায়কেও প্রতিবেশী হিসেবে বাঙালিদের মেনে নিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এসব ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন জাতীয় অগ্রগতির পথেই সহায়তার নামান্তর। উন্নত দেশগুলোতে বহির্বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মেধাগুলোকে পুনর্বাসনের যে নীতি গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে,—তাতে বিষয়টাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা প্রয়োজন। এদেশে উন্নত শিক্ষিত মুসলমান নৃপতিগণের আগমন বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে গিয়েছিলো বলে অনেক মত পাওয়া যায়। এসব মত যে দেশের কল্যাণের দিকে তাকিয়েই মণীষীরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংলন্ড প্রভৃতি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর প্রতি তাকালেও। তাঁরা বিশ্বের সকল দেশের মেধাবী, কর্মী লোকেদেরকে পুনর্বাসিত করার প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রেখেছেন, কারণ তাঁরাও তাঁদের নিজের দেশের মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করেন।

সে যাহোক, অধিকাংশ ঐতিহাসিক, পণ্ডিত মুসলিম বিজয়ের অনেক সদর্থক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫–৯৪), আচার্য যদুনাথ সরকার (১৮৭০–১৯৫৮), অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬–১৯৩৯) প্রমুখ এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। সেসব ঐতিহাসিক আলোচনা সামনে রেখে বলা চলে : এটিই সরল সত্য যে, মুসলিম বিজয় যে বাংলা সাহিত্যের রুদ্ধ দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো—সেই বাংলা সাহিত্যে এদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের আগমন প্রায় একই সময়ে। বিশেষভাবে মধ্যযুগে হিন্দু মুসলমানের যৌথ সাধনা বাংলা সাহিত্যেকে দ্রুত দৃঢ়ভিত্তি তৈরী করে দিয়েছিলো। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১ম সং, ১৮৮৬) গ্রন্থে ১২০৩ থেকে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পৌনে তিনশ বছরের পর্বকে 'গৌড়ীয় যুগ' নামে অভিহিত করেছিলেন এই বিবেচনায় যে, 'উক্ত পর্বে রচিত প্রায় সব গ্রন্থকার সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই বঙ্গ ভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।'

ডক্টর সুকুমার সেনও 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : 'মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের উৎস গৌড় এবং তত্রত্য রাজদরবারে খুঁজিতে হইবে।' মহাজনের এই সকল উক্তি ও উদ্ধৃতিবলে ড. ওয়াকিল আহমদ 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থে ('বাংলা সাহিত্যের গৌড়যুগ ও সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা' শীর্ষক প্রবন্ধে) মধ্যযুগের যে সকল কবি গৌড়ের সুলতানদের নাম উল্লেখ করেছেন কিংবা স্তুতি গেয়েছেন,—তাঁদের বিস্তারিত ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, শাহ মুহম্মদ সগীর (গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের ১৩৮৯–১৪১০ সময়ে রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা'য়) ; কৃত্তিবাস (জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের ১৪১৮–১৪৩১ সময়ে রচিত 'রামায়ণ'-এ) ; মালাধর বসু (রুকনউদ্দীন বারবকশাহ্ এর ১৪৫৯–৭৪ রাজত্বকালে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-এ) জৈনুদ্দীন

www.pathagar.com

(শামুসুদ্দীন ইউসুফ শাহ্‌র সময়ে ১৪৭৪–৮১ রচিত 'রসুল বিজয়'–এ) ; বিপ্রদাস (ঐ, 'মনসাবিজয়'–এ) ; যশোরাজ খান (ঐ, 'বৈষ্ণবপদ') ; বিদ্যাপতি ও শেখ কবির (নাসিরউদ্দীন নসরত শাহ ১৫১৯–৩১ এর সময়কালে প্রণীত 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে) এবং আফজাল আলি ও শ্রীধর (আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্ ১৫৩২–৩৩ এর সময়ে রচিত 'বৈষ্ণবপদ' ও 'বিদ্যাসুন্দর'–এ) রাজানুকূল্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাছাড়া 'হিন্দুস্থানী দুজন কবি কুতবন ও যশোধার এবং ফারসি ভাষার দুজন লেখক মুহাম্মদ বিন ইয়াজান বখ্‌স ও মুহম্মদ বুদাই উর্ফ সৈয়দ মীর আলওয়ী হুসেন শাহের যশোগৌরব, সংস্কৃতি পরায়ণতা প্রজানুরঞ্জনের উল্লেখ করেছেন'।[৫]

২

প্রসঙ্গত 'মধ্যযুগ' কথাটার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশের সঙ্গে শিল্প–সংস্কৃতির বিকাশের নিবিড় সম্পর্কের কারণে বাঙলার রাজনীতি ও সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসের যুগ বিভাজনের রেওয়াজ আছে। এবং বৌদ্ধ হিন্দু যুগকে প্রাচীন, পাঠান মুগল আমলকে মধ্যযুগ এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক (ভারত বিভাগ পূর্ববর্তী) কালকে আধুনিক যুগ বলা হয়। কিন্তু কোনো কোনো গবেষক গোটা সময়ে সমাজব্যবস্থার ধরন একই রকম ছিলো বিবেচনায় 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যে কোনো ভেদ রেখা টানতে' চাননি। কোনো কোনো ঐতিহাসিক পাল সেন আমলকে early medieval period বা আদি–মধ্যযুগ বলে যেমন অভিহিত করেছেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেরও অনুরূপ নাম দেওয়া সংগত মনে করেছেন। তাঁরা বলেন :

> আমরা এও মনে করি যে, কোন কোন সুলতান শাসক হিসাবে দক্ষ হলেও শিক্ষায়–দীক্ষায়, সস্কৃতি–চর্চায় পাল–সেন রাজা থেকে উন্নত ছিলেন না। ভারতীয় সংস্কৃতি আরবীয়–ইরাণীয় সংস্কৃতি থেকে কোন অংশে হীন বা দুর্বল ছিল না। সুতরাং আমাদের ধারণা অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর প্রাচীন যুগ থাকে না—চর্যাগীতি থেকে বাউলগীতি পর্যন্ত হাজার বছরের সমগ্র রচনা মধ্যযুগের আওতায় পড়ে।[৬]

এই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান এক অর্থে উজ্জ্বলতর। ছন্দোবদ্ধ পদে রচিত আদিমধ্য ও অন্ত্যমধ্যযুগের গোটা ফসলকে বিষয়ের দিক থেকে বিচার করলে— ১. সহজিয়া বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ কাব্য ২. পৌরাণিক মহাকাব্যের অনুবাদ ৩. মঙ্গলকাব্য ৪. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ৫. বৈষ্ণব কাব্য ৬. শাক্তকাব্য ৭. জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য, ৮. শাস্ত্রকাব্য ও ৯. বিবিধ (রাগতালনামা, নীতিকাব্য ও সওয়াল সাহিত্য) ইত্যাদি শাখার সাহিত্যসম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়।

আঙ্গিকের দিক থেকে দেখলে ১. পদাবলী—যথা : চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদ, সুফীপদ, শাক্তপদ, বাউলগীতি ; ২. নাটগীতি—যথা : শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ; ৩. মহাকাব্য—যথা : রামায়ণ, মহাভারত (সংস্কৃত থেকে অনুবাদ) ; ৪. আখানকাব্য বা পাঁচালী––যথা : ক. মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, পীর–পাঁচালী ইত্যাদি ; খ. প্রণয়োপাখ্যান—ইউসুফ–জোলেখা, লায়লী–মজনু, সতীময়না—লোরচন্দ্রানী, পদ্মাবতী, গুলেবকাওলী প্রভৃতি ; গ. জীবনীকাব্য—শ্রীকৃষ্ণ–বিজয়, রসুলবিজয়, নবীবংশ, চৈতন্যজীবনী, গাজী বিজয় ইত্যাদি ;

www.pathagar.com

ঘ. জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য ; এবং ৫. খণ্ডকাব্য—জ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম ও নীতি-বিষয়ক বিবিধ কাব্য—ইত্যাদি ভাগে বিন্যস্ত কর যায়।[৭]

মুসলমানদের বঙ্গ-বিজয়ের প্রথম পর্বে দেশীয় মুসলিম সংখ্যানুপাত নগণ্য বা লঘিষ্ঠ এবং অত্যন্ত দরিদ্রশ্রেণীর ছিলো। ষোল ও সতের শতকে গণনীয় সংখ্যক মুসলমান সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় এবং কোথাও কোথাও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নিয়ে সচল হয়ে ওঠেন। তাঁদের কেউ কেউ সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত হন।

১৮৭২ সনের প্রথম 'আদম শুমারী' বা সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলমানেরা সংখ্যায় হিন্দুর সমান হতে পারেনি। বিত্তেও তাঁরা দুর্বল। বিদ্যাচর্চায় এবং কাব্য, শিল্পসাহিত্যেও তাঁরা কিছুটা অনগ্রসর। কিন্তু জনসংখ্যা অনুপাতে এবং পিছনের সারির লোকগোষ্ঠী হিসেবে তাঁরা গুণে ও পরিমাণের দিক থেকে এমনকি, সময়ের বিবেচনায় কতোটা পশ্চাৎপদ বা গৌণ, সেই বিবেচনা সহানুভূতির সঙ্গে করা হয়নি। ফলে 'হীনমন্যতা' সৃষ্টি হয়েছে মুসলমান তথা পশ্চাৎপদ সমাজের সাধারণ লোকেদের মধ্যে। কিন্তু এই বক্তব্য যদি প্রচার করা হতো যে, তাঁদের (মুসলমান) পক্ষে যা করা উচিত বা সম্ভব ছিলো, তার তুলনায় তাঁরা কম করেন নি। উপরন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের অগ্রগতি ও সাফল্য অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষীপ্রতাসম্পন্ন,—তাহলে পরিস্থিতি অন্য রকম হতো।

অন্য ভাষা ও সম্প্রদায়ের লোকেরা শতাব্দীর সাধনায় যে সাফল্য অর্জন করেছেন, সেখানে বাংলাভাষী মুসলমানেরা অর্ধ কিংবা সিকি শতাব্দীর সাধনায় সমপরিমাণ সাফল্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে মধ্য ও আধুনিক যুগের বিভিন্ন বিষয় ও আঙ্গিকের, কিংবা ধারার সাহিত্য শিল্প সাধনার পরিচয় ও গুরুত্ব কিংবা উৎকর্ষের মাত্রা অনুভব করতে গেলে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মুসলমান সমাজের মধ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে এ-পর্যন্ত যতো মনীষী গবেষকের আবির্ভাব ঘটেছে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) তাঁদের অন্যতম। বঙ্গে মুসলিম আধিপত্য বা মুসলমানদের সমাজগঠন প্রক্রিয়া ও সৃষ্টিশীল কর্মে আত্মনিয়োগ ও সাফল্য ব্যর্থতা সম্পর্কে তিনি নানান প্রবন্ধ ও গ্রন্থে মন্তব্য করে গেছেন। 'প্রাচীন মুসলিম বঙ্গ সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> বাঙ্গালার আধুনিক মুসলিম সাহিত্য ও প্রাচীন মুসলিম সাহিত্যকে একেবারে বাদ দিয়া বাঙলা সাহিত্য সাহিত্যরূপে বাঁচিতে পারে কিনা, সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, বাঙ্গালার বর্তমান মুসলমানগণ তাঁহাদের সাহিত্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে সর্বাগ্রে প্রাচীন মুসলিম সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ইহার ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।
>
> ...খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমান তুর্কীরা বঙ্গদেশ জয় করেন।...কিন্তু এদেশে মুসলমান রাজত্ব স্থায়ী হইতে ন্যূনাধিক এক শতাব্দী অতীত হইয়া গেল। এই সময়ে প্রধানত দরবেশদের দ্বারাই বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে ধীরে ধীরে ইসলাম বিস্তৃত হইতে থাকে। চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর অধীনতা-নাগপাশ ছেদন করিয়া বাঙ্গালা যখন মুসলিম শাসনের অধীনে স্বাধীনতা অর্জন করে, তখন হইতেই বাঙ্গালার মুসলিম শাসক-সম্প্রদায় নানা বিষয়ে নিজেদের স্বার্থকে বাঙ্গালার স্বার্থের সহিত এক বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে

www.pathagar.com

বাঙ্গালার মুসলমানগণ অনেক ঘরোয়া ও সামাজিক বিষয়ে বাঙ্গালার হিন্দুদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া পড়িতে থাকেন ; এবং বঙ্গদেশের সহিত নানাদিক হইতে তাঁহাদের পরিচয় ঘনীভূত হইয়া উঠিতে থাকে। এই সময় বাঙ্গালার মুসলমানগণ দেশীয় ভাষায় সাহিত্যরচনায় মন দিবার মত শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না— অন্তত এ পর্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অর্থাৎ হোসেন শাহের রাজত্বকাল হইতে বাঙ্গালার স্বাধীন মুসলমান সুলতানগণ দেশীয় ভাষার অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিদ্যাপতির কবিতায়, বৈষ্ণবদের সাহিত্যে, প্রাচীন মনসামঙ্গল গ্রন্থে প্রাচীন মহাভারত ও রামায়ণ পুস্তকে এই যুগের মুসলমান নরপতিগণের বঙ্গসাহিত্য–প্রীতির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে। ...মুসলমানগণ ধীরে ধীরে এইরূপে পরোক্ষভাবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালার মুসলমানগণ প্রত্যক্ষভাবে দেশীয় ভাষায় সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ আর বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিতান্ত 'হাতেখড়ি'র যুগ ছিল না ; কেননা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বহরম দৌলত উজীর নামক কবির 'লায়লী–মজনু' নামক গ্রন্থে যেরূপ পাকা বাঙ্গালা রচনার নমুনা পাওয়া যায়, কিছুকাল পূর্ব হইতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের হাত না পাকিলে সাহিত্যে এইরূপ বাঙ্গালার আমদানী করা ও তাহার প্রচলন হওয়া অসম্ভব ছিল।[৮]

চর্যাপদ ১৩ শতকে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালের রচনা এবং এর ভাষাও খাঁটি বাংলা নয়। খাঁটি বাংলায় সর্বজনস্বীকৃত লিখিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম নিদর্শন বাসুলির সেবক অনন্ত্য বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আর, মুসলমান–রচিত প্রথম কাব্য শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ–জোলেখা' প্রায় সমসাময়িক কালের রচনা।

অতএব বাংলা সাহিত্যের চর্চায় হিন্দু ও মুসলমানের আগমন ঘটে প্রায় একই কালে। কিছুটা তথ্য আর কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করে ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও ড. আহমদ শরীফ প্রমুখ গবেষক 'ইউসুফ–জোলেখা'কে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আমলে (১৩৮৯–১৪১০) রচিত বলে মন্তব্য করেছেন। যদিও এর ভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো প্রাচীন নয়। তবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভাষা স্মরণে রেখে এর প্রাচীনত্ব স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেন নি।[৯]

মনে হয় এই স্বীকৃতির মধ্যেও মেধা ও উন্নতচিন্তার পরিচয় আছে। কারণ, এখনও দেখি, একই কালে বিদ্যা ও প্রজ্ঞার অভাবে একজন লেখেন ওল্ড মডেলে। একজন লেখেন শতবর্ষ এগিয়ে মডার্ন প্যাটার্নে।

অতএব ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী'র ২য় খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক অধ্যাপক মনসুর মুসাও নানান সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্ধৃত করে যে লিখেছেন : 'ইউসুফ–জোলেখাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমকালে কিংবা কাছাকাছি কালে ধরে রাখে।[১০] —তাতে মনীষার পরিচয় আছে।

প্রসঙ্গত ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়ের বিপরীত বক্তব্যও এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনাকালে যে ঢংয়ের ভাষা প্রয়োগ করেছেন,

www.pathagar.com

তাতে কারো কারো মনে হতে পারে যে, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দানকে খাটো করে দেখানোর প্রাক্‌পরিকল্পনা নিয়েই 'ইউসুফ-জোলেখা'কে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহু পরবর্তীকালের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা আরবি, ফার্সি না উর্দু—এসব উনিশ ও বিশ শতকের প্রান্ত ছোঁয়া মাত্র ষাট-সত্তর বছরের পুরাতন বিতর্ক। অথচ তিনি এটাকে মধ্যযুগের আলোচনায় অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

> বাংলা সাহিত্যের মুসলমান লেখকেরা হিন্দু লেখকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত পরে অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। কারণ, বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা যে আরবী বা ফার্সী নহে—বাংলা, ইহা উপলব্ধি করিতে তাঁহাদের কয়েক শতাব্দী লাগিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও বাঙালি মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে 'হিন্দুয়ানী-ভাষা' বলিতেন, কবি সৈয়দ সুলতানের লেখা হইতে তাহার প্রমাণ মেলে।

> একথার পরেই তিনি আবার লিখছেন :

> "বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা এমন একটি নূতন বস্তু দিয়াছেন, যাহা হিন্দু লেখকেরা দিতে পারেন নাই। ধর্মনিরপেক্ষ বা লৌকিক কাব্য এবং বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক কাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁহারাই প্রবর্তন করিয়াছেন। হিন্দুরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত ধারায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রায় সবই ধর্মমূলক, কারণ হিন্দুরা সাহিত্যেকে ধর্মচর্চার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মুসলমানরা সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়া ধর্মচর্চার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেন নাই ; এইজন্য তাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষ বা বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক বিষয় অবলম্বনে বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। অবশ্য ধর্মমূলক বিষয় অবলম্বনেও তাঁহারা লিখিয়াছেন।"...

বস্তুতপক্ষে এইরকম পরস্পর সঙ্গতিবিহীন ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা হিন্দু গবেষকগণ যত্রতত্র আরও অজস্র লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সুকুমার সেন কাজী নজরুল ইসলাম ও নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের পার্থক্যই জানতেন না। তাঁরা মুসলমানদের বইপুস্তক না পড়েই সমালোচনা লিখেছেন এবং এখনও তাঁরা বাংলাদেশের বই না পড়েই দাদাগিরি করেন। এথেকে মনে হয়, এখনও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মুসলমান গবেষকদের দ্বারা প্রণয়নের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। নিচের আলোচনায় তা আরও পরিষ্কার হবে।

প্রথম মুসলমান কবি মুহম্মদ সগীর সম্পর্কে প্রফেসর সুখময় মুখোপাধ্যায়-এর বক্তব্য হলো : এঁর কাব্যের 'ভাষা হইতে এবং কাব্যের উপর জামীর (১৪১৪-৯২) ফার্সী ইউসুফ-জোলেখার প্রভাব হইতে মনে হয়, ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক। কেহ কেহ শাহ মুহম্মদ সগীরকে বাঙলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (রাজত্বকাল ১৩৯০-১৪১০ খ্রীস্টাব্দ) সমসাময়িক মনে করেন। কিন্তু এই মত কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।'[১১]

বলা দরকার, এই ঐতিহাসিক বিতর্ক সচেতন যুক্তিশীল পাঠকদের সন্দেহ নিরসন করতে পারেনি। সগীর-এর কাব্যের পরবর্তীকালে প্রচলিত পাঠে জামীর প্রভাব লিপিকর, আবৃত্তিকারকদের দ্বারা প্রক্ষিপ্তরূপে প্রবেশ করতে পারে। আবার শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার কথাও পরবর্তী লিপিকরের হাতে প্রক্ষিপ্ত উক্তি আকারে পুঁথিতে প্রবেশ করতে পারে।

www.pathagar.com

এই রকম তর্কের বিষয় অনেক থেকে যাওয়ায় 'ইউসুফ-জোলেখা' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষাতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক তুলনামূলক আলোচনাকে গুরুত্ব দেয়া সঙ্গত। আর এই বিবেচনায় দুটি কাব্য সমকালীন বিবেচিত হবে বা হয়েছে (মনসুর মুসা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিশ-পঁচিশ বছরের পুরাতন, আর ইউসুফ-জোলেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চেয়ে তুলনায় কম পুরাতন, এইরূপ পার্থক্য মেনে নেয়াই সঙ্গত। এ থেকে বাংলা সাহিত্যচর্চায় হিন্দু-মুসলমানের সহ-যাত্রার চিত্র ফুটে ওঠে। অহমিকা বা অকারণ হীনমন্যতারও তাতে অবসান ঘটে।

৩

শাহ মুহম্মদ সগীরের পরে, পনের শতকেই 'রসুল বিজয়' প্রণেতা কবি জয়নুদ্দীন আবির্ভূত হন। এইকালে কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, যশোরাজ খান, কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই প্রমুখ কবি রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ এবং বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী রচনা, মনসামঙ্গল কাব্যধারার প্রবর্তন এবং জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য রচনার রূপ ও রীতির উদ্ভাবন করেছিলেন।

পরবর্তীকালে নাথ ও সহজিয়া, ধর্মমঙ্গল, প্রণয়োপাখ্যান, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত বা কৃষ্ণমঙ্গল, মুসলিম ধর্ম সাহিত্য, জীবনীসাহিত্য, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, শিবায়ন, লৌকিক দেবতা বিষয়ক পাঁচালী, সুফীসাহিত্য, লোকসাহিত্য, সওয়ালসাহিত্য, রাগতালনামা প্রভৃতি ধারায় কাব্যচর্চা করেছেন যে সমস্ত বাঙালি কবি সাহিত্যিক তাঁদের যদি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে ভাগ করে দেখি, তাহলে, লক্ষ্য করা যায়,

ষোল শতকে : শেখ ফয়জুল্লাহ, শা' বারিদ খান, দৌলত উজীর বাহরাম খান, মুহম্মদ কবীর, শেখ পরাণ, নেয়াজ, আফজাল, সৈয়দ সুলতান, শেখ কবির, সৈয়দ মুর্তজা, ফতেহ, (ফতন), ইশান নাগর, হাজী মুহম্মদ, মুজম্মিল **প্রমুখ মুসলমান লেখকের সমকালের হিন্দু লেখকগণ হচ্ছেন :**

আদি ময়ুরভট্ট, রূপরাম, মানিকরাম, খেলারাম, মাধব কন্দলী, শংকর দেব, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, দ্বিজ, গোবিন্দ, যশোরাজ খান, পরমানন্দ, মাধব দেব, মাধবাচার্য, রামচরণ, কবিশেখর রায়, দুঃখী শ্যামদাস, কৃষ্ণদাস, রামচন্দ্র খান, পীতাম্বর রঘুনাথ অনিরুদ্ধ, রাম স্বরস্বতী, ঘনশ্যাম দাস, সঞ্চয়, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, রামানন্দ বসু, বৃন্দাবন দাস, নরহরি দাস, বাসুদেব, মাধব দাস, বংশীবদন, লোচন দাস, যদুনন্দন, অনন্ত দাস, মুরারী গুপ্ত, পরমানন্দ, পুরুষোত্তম, নরহরি সরকার, চণ্ডীদাস, চূড়ামণি দাস, জয়ানন্দ, লোকনাথ দাস, নারায়ণ দেব, মানিক দত্ত, বলরাম, দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, কঙ্ক প্রমুখ।

সতের শতকের মুসলিম কবি সাহিত্যিকগণ হচ্ছেন—দোনা গাজী, কাজী দৌলত, আলাউল, মাগন ঠাকুর, আকবর, পরাগল, মঙ্গলচাঁদ, নওয়াজিস্ খান, শরীফ শাহ্, মরদন, আবদুল হাকিম, আশরাফ, মত্তালিব, নসরুল্লাহ্ খোন্দকার, সালেহ বেগ, নাসির মাহমুদ, সৈয়দ আইনুদ্দীন, গয়াস খান, ভিকন, শেখ চান্দ, আবদুল নবী, আকিল, মীর মুহম্মদ সুফী, শেখ জাহিদ, মুহম্মদ খান, জাফর প্রমুখ।

www.pathagar.com

আর এঁদের সমসাময়িক সতের শতকের হিন্দু-সাহিত্যিক হলেন : ভবানী প্রসাদ, মানিকরাম দাস, শ্রীশ্যাম পণ্ডিত, রূপরাম, যাদবনাথ, রামদাস আদক, সীতারাম দাস, চন্দ্রাবতী, নিত্যানন্দ (অদ্ভুতাচার্য), ভবানীনাথ, শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর, ভবানন্দ, পরশুরাম, ঘনশ্যাম, যশচন্দ্র, কাশীরাম দাস, নন্দরাম দাস, নিত্যানন্দ ঘোষ, কৃষ্ণানন্দ বসু, রামনারায়ণ, হরিদাস, চন্দন দাস, রামেশ্বর নন্দী, অনন্ত মিশ্র, গঙ্গাদাস সেন, দ্বিজ রামচন্দ্র, নরোত্তম, গোবিন্দদাস কবিরাজ, বিদ্যাপতি, গোপাল দাস, ঘনশ্যাম দাস, চম্পতি, জগদানন্দ, দীন চণ্ডীদাস, গোপীজন বল্লভ, তিলকরাম দাস, উদ্ধব দাস, দ্বিজবংশীবদন, ষষ্ঠীবর সেন, বিষ্ণুপাল, কালিদাস, ক্ষেমানন্দ, রসিক মিশ্র, কবি বল্লভ, কবিচন্দ্র, সীতারাম দাস, ষষ্ঠীবর দত্ত,গঙ্গাদাস সেন, হরি রাম, দ্বিজরাম দেব, বলরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণরাম দাস, প্রাণরাম, গোবিন্দ দাস, রামকৃষ্ণ রায়, শঙ্কর, কবিচন্দ্র, দ্বিজরতিদেব, রামরাজা, বলরাম, দ্বিজ হরিদেব, কৃষ্ণরাম দাস, মুকুন্দ প্রমুখ।

আঠারো শতকের মুসলিম কবিরা হলেন : আবদুস শুকুর মুহম্মদ, মুহম্মদ আলি, রফিউদ্দীন, মুহম্মদ জীবন, নূর মুহম্মদ, শাকের মাহমুদ, সৈয়দ হামজা, গরীবুল্লাহ্, আবদুর রাজ্জাক, মুহম্মদ আলিরজা, আফজল আলি, মুহম্মদ ফসিহ্, আবদুল্লাহ্, কাজী বদিউদ্দীন, মুহম্মদ আলি, নাসিরুদ্দীন, সুলায়মান, আইনুদ্দীন, সৈয়দ নূরুদ্দীন, আবদুল করিম খোন্দকার, ফাজিল নাসির মাহমুদ, করম আলী, পীর মুহম্মদ, উজির আলি, আজমতউল্লাহ্, নূরুল্লাহ্, শেখ মনোহর, আরিফ, শেখ মনসুর, মোহসেন আলি, শেখ জেব, বলাক ফকির, ইয়াকুব, হায়াৎ মাহমুদ, আলী মুহম্মদ, আবদুল হামিদ, জিন্নাত আলী, আকিল, সেরবাজ চৌধুরী, শেখ সাদী, এতিম আলম, মুহম্মদ দানিশ, মোজাফ্ফর, মুহম্মদ দানেশ, মীর্জা কাঙালি, বক্শ আলী, কাজী দানিশ, তাহির মাহমুদ প্রমুখ।

আঠারো শতকের হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের তালিকাও দীর্ঘ,—তাঁরা হলেন : দুর্লভ মল্লিক, ঘনরাম, রামচন্দ্র, প্রভুরাম, নরসিংহ বসু, হৃদয় রাম, রামকান্ত, শংকর চক্রবর্তী, সহদেব চক্রবর্তী, ক্ষেত্রনাথ, নিধিরাম, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ, দ্বিজপশুপতি, সুশীল মিশ্র, বাণী রামধর, রামজী দাস, রামানন্দ যতী, রামানন্দ ঘোষ, রামনারায়ণ, জগৎরাম, রামপ্রসাদ রায়, দয়ারাম, ফকির রাম, রাম শংকর, রাম হাজরা, সীতাসুত, কৃষদাস, রামগোবিন্দ, ভবানীশংকর, শিবচন্দ্র, গঙ্গারাম, কল্যাণ দেব, ষষ্ঠীবর, সুবুদ্ধি রাম, সর্বাণীনন্দন, দ্বিজ তুলসী, জগন্নাথ, মতিরাম, দ্বিজ রামেশ্বর, দ্বিজ মাধবচন্দ্র, সনাতন বিদ্যাবাগীশ, প্রেমদাস, গোকুলানন্দ, চন্দ্র শেখর, শশিশেখর, দ্বিজ রঘুনাথ, কমলাকান্ত রামতনু, পাগল শংকর, গোপীবল্লভ, ভবানন চান্দ রায়, হরিদাস, হীরামণি, মনোহর, নন্দকুমার।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, প্রেমদাস, শচীনন্দন, হৃদানন্দ, রামরত্ন, পুরন্দর, নিত্যানন্দ, রামশরণ, জগন্নাথ, লবণীদাস, কৃষ্ণচরণ দাস, নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম), জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মিত্র, তন্ত্রবিভূতি, রাজসিংহ, রামজীবন, দ্বিজবানেশ্বর, দ্বিজরসিক, জানকী নাথ, মুক্তারাম সেন, লালা জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশংকর দাস, ভারতচন্দ্র রায়, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিজরাধাকান্ত, মধুসূদন চক্রবর্তী, কবীন্দ্র মদন দত্ত, নিধিরাম আচার্য, বিনয় লক্ষ্মণ, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, দ্বিজকালিদাস, দ্বিজ মণিরাম, দ্বিজ

www.pathagar.com

নরোত্তম, প্রাণবল্লভ, শঙ্কর, রুদ্ররাম, গৌরাঙ্গ, জয়রাম, ভৈরবচন্দ্র, ফকির রাম, বিকল চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকান্ত, অযোধ্যারাম, জনার্দন, বিদ্যাপতি, শিবনারায়ণ প্রমুখ।[১২]

মধ্যযুগের সাহিত্যচর্চার ইতিহাস সংক্ষেপে দেখার জন্য উপরে কবিদের নামগুলো শুধু শ্রেণীবিভাগ করে সাজানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো শাখায় হিন্দু লেখকেরা আদৌ অংশ গ্রহণ করেননি। যেমন, প্রণয়োপাখ্যান, মুসলিম ধর্ম সাহিত্য, সওয়াল সাহিত্য, সুফীসাহিত্য, ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে মুসলমান লেখকেরা অংশগ্রহণ করেননি বা কেবল হিন্দু লেখকদেরই একাধিপত্যে আছে, মধ্যযুগের এমন সাহিত্যশাখা হচ্ছে ধর্ম্মমঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত বা কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, শিবায়ন প্রভৃতি।

যৌথ অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়—লৌকিক দেবতা ও পাঁচালী কখনও বাউল গান ও লোকসাহিত্যে, জীবনীসাহিত্য, বৈষব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসাহিত্য তথা বৌদ্ধমত ও সংস্কৃতি প্রভাবিত নাথ ও সহজিয়া সাহিত্য ইত্যাদিতে।

অতএব একথা জোর দিয়েই বলা চলে, হিন্দুর ন্যায় মুসলমান সমাজেও মধ্যযুগেই মৌলিক সাহিত্য প্রতিভা জন্মগ্রহণ করেছেন। মানব জীবনের দৈনন্দিন হাসি কান্না মিশ্রিত বস্তুবাদী আধুনিক বিষয়াবলি মুসলিম রচিত সাহিত্যে চমকপ্রদ উদাহরণের সৃষ্টি করেছে। হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই শাহ্ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, শাহ বারিদ খান, দৌলত উজীর বাহরাম খান, মুহম্মদ কবীর, দোনাগাজী, কাজী দৌলত, আলাউল, মাগন ঠাকুর, আবদুল হাকিম, ওয়াজিদ খান প্রমুখের রচনা আদৃত হয়েছে।

এঁদের বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হচ্ছে ইউসুফ-জোলেখা, লাইলী-মজনু, মধু-মালতী, হানিফা-কয়রাপরী, বিদ্যাসুন্দর, সয়ফল মুলুক বদিউজ্জামাল, সতীময়না লোরচন্দ্রানী, পদ্মাবতী, সপ্তপয়কর, চন্দ্রাবতী, গুলেবকাওলী প্রভৃতি। এসবের কাব্য ও ভাবসম্পদ ঐশ্বর্যপূর্ণ ছিল। অলংকার, ভাষা, রূপক, উপমা ও জীবন চেতনা বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। হিন্দু রচিত মৌলিক সাহিত্যগুলোর মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যজীবনী সাহিত্য, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি মুসলিম সমাজে এখনও পর্যন্ত আদৃত সাহিত্য সম্পদ।

সুতরাং কোনো নতুন কথা নয় যে, দুই সম্প্রদায়ের শিল্পী সাহিত্যিকই বাংলা সাহিত্যের শক্ত মজবুত ভিত্তি তৈরির সম্পূরক কাজ করেছেন দীর্ঘ ঐতিহাসিক কাল ধরেই। আধুনিক কালে মুসলমানদের ঔজ্জ্বল্য কিঞ্চিৎ কম হলেও তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। পূর্বপুরুষের সম্মিলিত সাধনার ধনে গড়ে ওঠা ভিত্তির ওপর আধুনিক কিংবা আধুনিকতাউত্তর কবি সাহিত্যিকেরা সুরম্য অট্টালিকা গড়ার কাজে রত রয়েছেন।

উদাহরণ হিসেবে মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২) কিংবা কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) নাম কেবল উল্লেখ করতে চাই। এঁদের শিল্পের উপকরণ ও উপাদান অনেকাংশ মধ্যযুগের সাহিত্য থেকেই যে আহরিত হয়েছে,—সে কথা সমালোচকেরা বহু আগেই উল্লেখ করে গেছেন।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে তৎকালীন অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শৈক্ষিক–পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও এখানে, বর্তমান প্রসঙ্গে খুব বেশি তার দরকার আছে বলে মনে হয় না। কারণ তখনকার প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ভেতরেই সকলে সাহিত্যচর্চা করেছেন। তবে মুসলমানদের থেকে হিন্দুর আর্থিক পরিকাঠামো ভিন্ন রকম ছিলো। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বিত্তশালী বলে তাঁদের ধর্মান্তর গ্রহণের প্রয়োজন ছিলো না।

পক্ষান্তরে যাঁরা বিত্তহীন বা দরিদ্র এবং যে সমস্ত বৌদ্ধরা হিন্দুশাসনে অতিষ্ঠ ছিলেন, তাঁরাই মুসলমান হয়েছিলেন বলে এবং মুসলমান হবার পরও তাঁদের পেশার পরিবর্তন ঘটেনি বিধায়, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। অতএব ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলের ন্যায় তখনও মুসলমানেরা কিছুটা পশ্চাৎবর্তী, অনুজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছেন।

একথা আজ আর আকর্ষণীয় আলোচনার বিষয় হতে পারে না যে, তখনকার সমাজব্যবস্থার ধরন ছিলো কৃষি ভিত্তিক। কারণ বাঙলার সমাজ জীবনে নতুন নতুন উপাদান অনেক সংযোজিত হলেও, সেই কৃষি ভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই রূপান্তরিত অবস্থায় এখনও বহুক্ষেত্রে বিদ্যমান। তখন যে অধিকাংশ জনগণের মূল জীবিকা কৃষিই ছিলো, তা সহজেই বিশ্বাস হয়। নিস্তরঙ্গ সমাজ জীবনের এক পার্শ্বে, নগরে নগরে, মুষ্টিমেয় রাজণ্যবর্গের মধ্যে তখন রাজনৈতিক সংঘাত সক্রিয় ও সীমাবদ্ধ ছিলো। ক্ষমতার পরিবর্তনে বৃহত্তর জনসমষ্টি বাঙলার নিস্তরঙ্গ গ্রামে গ্রামে শান্ত পল্লীর ছত্রছায়ায় দিনযাপনের সুযোগ–সুবিধা থেকে কোনোভাবে বঞ্চিত হতো না।[১৩]

তথ্যনির্দেশ

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ/দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৯৮৭ (৪র্থ সং), পৃ. ৩৩৩–৩৫।
২ উপরিউক্ত।
৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্য', রমেশচন্দ্র মজুমদারের নামে চালু 'বাংলাদেশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড/মধ্যযুগ, কলকাতা ১৯৮৭ ৪র্থ সং, পৃ. ৩৫৭।
৪. বন্ধ্যাকরণের ধারণা অপনোদনের জন্য আহমদ শরীফের 'বিচিত চিন্তা' (ঢাকা ১৯৬৮/১৯৭৫) ও 'বাঙালী ও বাঙলাসাহিত্য' (২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৩); ওয়াকিল আহমদের 'বাঙলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' (১ম খণ্ড ঢাকা, ১৯৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ঢাকা, ১৯৯০) এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৭, ৪র্থ সং) দেখা যেতে পারে।
৫. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৯৪।
৬. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২–৬।
৭. উপরিউক্ত।
৮. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাচীন মুসলিম বঙ্গ–সাহিত্য, মাসিক মোহাম্মদী, ৬ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪০ (চট্টগ্রাম জেলা সাহিত্য–সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ), পৃ. ৫৮৬–৮৯।
৯. আহমদ শরীফ, বিচিত চিন্তা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১৬০–১৬১।
১০. মনসুর মুসা (সম্পাদক) মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩–এর মুখবন্ধে 'ইউসুফ–জোলেখা' প্রসঙ্গে আহমদ শরীফসহ মুহম্মদ এনামুল হকের বক্তব্যকে প্রমাণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনী–বিন্যাসের দুরান্বয়ী প্রতিরূপ ইউসুফ–জোলেখা কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে বলে দুটোর সাদৃশ্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তাঁর আলোচনার মর্ম ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে করেছেন বলে বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য।

www.pathagar.com

১১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্য (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ), রমেশচন্দ্র মজুমদারের নামে প্রচলিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস' ২য় খণ্ড, মধ্যযুগ, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৯২-৯৬।

১২. আহমদ শরীফ, 'বিচিত চিন্তা', পূর্বোক্ত। এই গ্রন্থের 'মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের খসড়াচিত্র' শীর্ষক প্রবন্ধের সঙ্গে সংযুক্ত 'ছকে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের খসড়াচিত্র' থেকে হিন্দু ও মুসলমান লেখকদের নামগুলো শতক অনুক্রমে পৃথক করে সাজিয়ে দেখানো হলো মুসলিম সাহিত্যিকদের অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য।

১৩. ওয়াকিল আহমদ বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৮০ এবং 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা'র ভূমিকায় এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

গ. উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগরণ
বাঙালি মুসলমানের অবস্থান

'বাঙলার নবজাগরণ' ঘটে উনিশ শতকে, এবং এর বাহন হয়েছিল বাংলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্র। এগুলোর অধিকাংশই আবার লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছিল সমাজ সংস্কার আন্দোলন-লক্ষ্যে, অথবা এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায়। উনিশ শতকে বাঙলায় যা ঘটে—তা ছিল এক কথায় অভূতপূর্ব। বাঙলাদেশের ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত তাবৎ গ্রন্থের বৃহৎ অংশই তাই উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগরণ ও সেকালের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাংলা সাহিত্যের ওপরে লেখা।[১] বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত এই সব গ্রন্থে জাগরণের এবং ঐকালের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন, স্বতন্ত্র ও স্ববিরোধিতায় পূর্ণ বহু বক্তব্য, ও বিশেষণ তাতে স্থান পেয়েছে। কেউ বলেছেন, ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের অথবা ভারতচন্দ্রের কাল থেকে এই জাগরণের সূচনা এবং এর কৃতিত্ব ইংরেজদের প্রাপ্য।[২] অনেকেই বলেছেন রামমোহন এর কার্যকাল থেকেই এর শুরু এবং জাগরণের শিল্পরূপ সাহিত্যে বিধৃত হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, প্রধানত হিন্দু কলেজের ছাত্র ও ইয়ংবেঙ্গল-এর সারথিদের কৃতিত্বে। তবে কারও কারও মতে, সাহিত্যের নবযুগের সূচনা হয় কালের স্বাভাবিক নিয়মে ;[৩] অন্যরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' সৃষ্টি হতো এবং 'নবযুগ' আসতো। ইংরেজ না-এলে হয়ত কিছু বিলম্ব হতো। তবে ইংরেজী শাসনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় সমাজের বিকাশ অস্বাভাবিক ও নানা উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও কম ছড়ায়নি। দীর্ঘ সাত শ বছর ধরে প্রচলিত সামন্ত-শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে ইংরেজ শাসকদের আগমনে। আধা-সামন্ত আধা-ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক-ব্যবস্থার পত্তন ঘটে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে ও শ্রেণী-ধর্মের বিচারে তাই উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্পদকে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন 'মধ্য শ্রেণীর সাহিত্য' বলে। একে সমগ্র বাঙালির সাহিত্য অনেকেই বলতে চাননি।[৪]

বাঙলার জাগরণের বৈশিষ্ট্য ও পরিণাম শেষ বিচারে যা-ই দাঁড়াক, এই জাগরণ ঘটিয়েছিল যে 'মধ্যশ্রেণীর বাঙলা সাহিত্য'—তাতে মুসলমানের কোনও অবদান নেই, জাগরণকালীন সমস্ত সাহিত্য শিল্পে এবং সমাজ সংস্কারে কেবল মনীষা সম্পন্ন হিন্দুদেরই একক অবস্থান। মুসলমানের উত্থান ঘটে বিশের শতকে, দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে। কাজী আবদুল ওদুদের মতে ১৯২৬ সনে 'ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সময় থেকে। প্রকৃতপক্ষে নবনূর (১৯০৩) থেকে এই জাগরণের আরম্ভ হয়। বুদ্ধির মুক্তিবাদীদের পূর্বসূরি বেগম রোকেয়া ছিলেন এই পত্রের প্রধান লেখক।

ইতিহাসের উপাদান প্রমাণ করেছে যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান প্রায় সমকালে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। পাশাপাশি মানানসই মর্যাদা-দক্ষতায় তাঁরা আধুনিকপূর্ব সময়কাল পর্যন্ত (অবক্ষয় বা যুগসন্ধির কালেও) অগ্রসর হয়েছিলেন। 'সেকালের মুসলমান যে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেছিলেন, একথা স্বীকৃত হয়েছে। লোকসাহিত্যে মুসলমানের দান হিন্দুর মতোই শ্রদ্ধেয়। ভারতীয় দার্শনিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণে কতিপয় মুসলিম বাউলের গান শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন।[৫]

www.pathagar.com

কিন্তু আঠারো শতকে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে–সঙ্গে 'দুর্ঘটনাকবলিত' হওয়ার মতো বহুকালের জন্য তাঁরা নিস্তেজ–নিষ্ক্রিয় হয়ে নবযুগের সাহিত্যসৃষ্টিক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিলেন।

বাঙালি মুসলিমের সমাজব্যবস্থার যে দিকগুলোকে সাহিত্যের মাধ্যমে পর্যালোচনাপূর্বক সংশোধনের দরকার ছিল,—সে দিক্‌গুলো কিন্তু মুসলিম সাহিত্যশিল্পী ও সমাজ সংস্কারক মনীষীদের আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় অবিশ্লেষিত ও অমীমাংসিত অবস্থায়ই পড়ে ছিল। বিশ শতকের সূচনা থেকে মুসলমান সমাজে যে ধরনের সংস্কার–আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, অনুরূপ ব্যাপার হিন্দুদের মধ্যে একশ বছর পূর্বেই শুরু হয়েছিল। সাহিত্য–সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই যে প্রায় একশ বছরের মতো পিছনে পড়ে থাকা, মুসলমান গবেষকেরা তার কারণ অনুসন্ধান করে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য খাড়া করেছেন। অধিকাংশ আলোচক মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার জন্য যেখানে ইংরেজদের 'ডিভাইড এণ্ড রুল' কে দায়ী করেছেন, সেখানে কাজী আবদুল ওদুদ এবং বিনয় ঘোষ দুজনেই প্রায় একই ধরণের যুক্তি দিয়ে অন্যরকম বলেছেন। প্রথম দিকে ইংরেজদের কাছে হিন্দু–মুসলমানের মধ্যে করুণা বিতরণে ইতরবিশেষ করার প্রয়োজন তেমন ছিল না। তাঁরা এও বলেছেন, প্রভাব–প্রতিপত্তিতে মুসলমানেরা অগ্রসর হলেও জনসংখ্যানুপাতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে ১৮৮১–র পূর্বে হিন্দু সংখ্যায় বেশি ছিল। বিত্ত ও বিদ্যার জন্য তাঁরা প্রধান সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের আগ্রহ বেশি থাকা স্বাভাবিক ছিল। ইংরেজরা এদেশে ইংরেজি–শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা নেটিভদের উন্নতির জন্য করে নি। রাজকার্য যে ধারায় চলে আসছিলো, তা–ই তাঁরা বহাল রাখতে চেষ্টা করেছিল।[৬]

এজন্য মুসলিম শাসন অবসানের পরও মুসলমানেরা প্রধানত বিচার বিভাগে, আর হিন্দুরা প্রধানত রাজস্ব বিভাগের চাকুরি করেছিলেন। মুসলমানদের শিক্ষার জন্য, মুসলমাদেরই অনুরোধে ১৭৮০ সনে 'কলিকাতা মাদ্রাসা' ; আর কাশীতে হিন্দুদের জন্য 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল,—মাদ্রাসার শিক্ষিতরা ইংরেজ সরকারের কাজী–মুফ্‌তি–আদির কাজ, আর হিন্দুরা দেশীয় ধারায় শিক্ষালাভ করে তাঁদের জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকুরি ইত্যাদি যোগ্যভাবে করতে পারবেন। দেশের লোকেরাই বাস্তব–বুদ্ধিতে ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছিলেন।[৭] ইংরেজি–শিক্ষা দিতে শাসকরা বরং ভীত ও শংকিত ছিলেন। বস্তুতপক্ষে 'বাস্তববুদ্ধির' মারপ্যাচেই বাঙালি মুসলমানেরা পিছিয়ে পড়েছিলেন এবং সেই পিছনে পড়াটা ছিল যেন তাঁদের জন্য অবধারিত, অলঙ্ঘনীয় পরিণতি।

১৭১৭–তে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙলার স্থায়ী দেওয়ানরূপে নিয়োগ লাভ করে, রাজস্ব ও প্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক রদবদল ঘটিয়েছিলেন। রাজস্বের প্রতি তাঁর সদা জাগ্রত দৃষ্টি অর্থলোলুপতায় পর্যবসিত হওয়ায়, সামন্ত ও জমিদারদের ওপর তাঁর অত্যাচার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে তাঁর প্রবর্তিত 'মাল–জামিনী' ব্যবস্থায় দেশীয় সামন্ত রাজা ও জমিদারদের পতন অনিবার্য হওয়ায় অভ্যুত্থান ঘটে নতুন রাজস্ব সংগ্রাহক ইজারাদার শ্রেণীর। এই ইজারাদারেরাই দু–তিন পুরুষের মধ্যে পুরনো জমিদারের স্থান দখল করে নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, মুর্শিদকুলী খাঁ ইজারাদার হিসাবে কেবল বাঙালি–হিন্দুদেরই নিয়োগের প্রথা চালু করেছিলেন। উচ্চস্তরের সরকারি চাকুরিতেও তিনি বাঙালি–হিন্দু নিয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এর আগে এসব কাজে নিয়োগ পেতেন উত্তর–ভারতের মুসলমানেরা। মুর্শিদকুলী খাঁর পরের বাঙলার নবাবেরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে হিন্দুদের প্রাধান্য বহাল রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু তারপরও হিন্দু-মানসিকতা থেকে মুসলিম-শাসনজনিত অস্বস্তি একেবারে দূর হয়ে যায়নি। হিন্দু জমিদারদের ওপর মুসলমান নবাবদের আর্থিক চাপ ধর্মীয় অনুভূতিতেও আঘাত দিত। সেজন্য তাঁরা মনে মনে মুসলিম শাসনের অবসান কামনা করতেন।[৮]

১৭৫১-র আগেই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদের সৌহার্দ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে ইতিহাসেও প্রমাণ পাওয়া যায়। আর মুসলমানদের রাজত্ব যে গেল—সে-চেতনা তাঁদের মধ্যে অনেকদিন ধরেই জাগেনি। একাদশ, দ্বাদশ শতকে, সেন আমলে সমাজের নৈতিক অবক্ষয় যেমন হিন্দুপ্রশাসনের পরিবর্তে বাঙলায় মুসলিম রাজত্ব কায়েম-এর পথ সুগম করে দিয়েছিল, তেমনি, নবাবী আমলের শেষ পর্বে সামাজিক, মানবিক, নৈতিক এবং সর্ব প্রকার পতন স্খলন দুর্নীতি ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের জন্য উৎসাহিত করেছিল। ১৭৫৭-তে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কয়েকটি কারণে মুসলমান সমাজ বলতে গেলে একেবারেই ভেঙে পড়ে।

১৭৬৫ সনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। এ থেকে অগাধ টাকা সংগ্রহ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। প্রতি বছর নতুন নতুন 'আমিল', 'ইজারাদার' প্রভৃতি নিযুক্ত করে, খাজনা আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকেন। প্রজাদের কাছ থেকে জমির খাজনা ছাড়াও নানা রকম 'আবওয়াব' বা বে-আইনী সেস আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই নির্মম শোষণের ফলেই ১৭৬৯-৭০ বাঙলা ১১৭৬ সনে দেশজুড়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাঙলাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ (প্রায় দেড় কোটি) লোক তখন মারা যায়। ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামগুলি জঙ্গলে পরিণত হয়। এক তৃতীয়াংশ জমি অনাবদি হয়ে পড়ে। এতদসত্ত্বেও খাজনা আদায় প্রক্রিয়া আরও জোরদার করা হয়। দুর্ভিক্ষের পরের বছর কৃষকদের কাছ থেকে পূর্বের থেকে আরও বেশী খাজনা আদায় করা হয়। মৃত বা পলাতক লোকেদের খাজনাও তার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে আদায়ের জন্য আইন করা হয়।[৯]

মুঘল আমলে বাঙলাদেশের যে ভূমিব্যবস্থা ছিল, তারই উপর ভিত্তি করে মুর্শিদকুলী খাঁ বড় বড় জমিদারদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত করেছিলেন। এতদিন তাঁরাই ছিলেন বাঙলার গ্রামাঞ্চলের শাসক। কোম্পানির বর্ধিত অর্থ লিপ্সা চরিতার্থের জন্যে ভূমি ব্যবস্থায় নানা রকম পরিবর্তন এনে বড় বড় জমিদারী নিলাম ডেকে নগদ টাকার বিনিময়ে সেসব জমিদারী হিন্দুদের কাছে (অধিকাংশ) পুনঃবন্দোবস্ত দেয়া হল। অবশেষে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন।

এই ব্যবস্থায় নতুন ভূস্বামীশ্রেণীর উদ্ভব হয় আর ঘটনাক্রমে তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু ব্যবসায়ী এবং ইজারাদার। যাঁদের নগদ টাকা ছিল তাঁরা তখন জমিদারীতে বিনিয়োগ করেছিলেন। এরপর 'হপ্তম আইন', 'পঞ্চম আইন' প্রভৃতির মাধ্যমে জমিদারদের খাজনা আদায়ের জন্য অপার ক্ষমতা দান করা হল। প্রজাদের ন্যায়বিচার পাবার অধিকারও কেড়ে নেয়া হয়। এই ব্যবস্থায় আঠারো শতকের মধ্যেই মুসলমান জমিদারের পরিবর্তে হিন্দু জমিদার, বিত্তবানশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। মুসলমান প্রজাদের অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[১০]

www.pathagar.com

এরপর আর একটি বড়ো ঘটনা ঘটল ১৮২৮ সনে, আর তার ফল, মুসলমানদের জন্য আরো মারাত্মক হল। সেটি হল Resumption proceedings বা নিষ্কর লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ও সরকারের অধিকারে আনয়ন। এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত ভূ-স্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং নিষ্কর ভূমির আয়ের উপর নির্ভর করেলেও এই আইনে সেগুলো নষ্ট এবং দেশের শিক্ষাবিদ ও বিদ্বৎসমাজ তাঁদের মর্যাদা ও জীবিকা হারিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন।

> এই নিষ্কর বাজেয়াপ্ত থেকে আট লক্ষ পাউন্ড খরচ করে বার্ষিক তিন লক্ষ পাউণ্ডের স্থায়ী আয় সরকারের লাভ হলো, অর্থাৎ ষাট লক্ষ পাউন্ড বার্ষিক শতকরা পাঁচ পাউণ্ড সুদে খাটলে যত আয় হয়, তত আয়। এই টাকার মোটা অংশ পাওয়া গিয়েছিল, মুসলমান পরিবারের অথবা মুসলমান প্রতিষ্ঠানের বাজেয়াপ্ত নিষ্কর থেকে। এর ফলে যে ভীতি ও বিতৃষ্ণার উদ্ভব হয়েছিল পল্লীর উপর, তার ছাপ চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে গেছে। আর যত প্রাচীন পরিবার এর ফলে বিনষ্ট হল, আর মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় সবই নিষ্করের আয়ে চলত, এর ফলে সে সবও মৃত্যুদণ্ড লাভ করল।[১১]

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্যের ভাষা ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি হল। ফলে দেশের সমস্ত রাজকার্য প্রধানত হিন্দু কলেজের শিক্ষিত যুবকদের করায়ত্ত হল। এদের মধ্যে মুসলমান কেউ ছিল না। ইংরেজ রাজত্বের সূচনা থেকে কংগ্রেসের স্থাপনা পর্যন্ত ইংরেজি বা আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে মুসলমানের সম্বন্ধ ছিল না। উনিশ শতকে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা মুসলমানদের মধ্যে হয়েছিল, কিন্তু তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে কীনা সন্দেহ।[১২]

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিক ডব্লিউ অ্যাডামকে বাঙলা-বিহারের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর রিপোর্ট করার জন্য এক সদস্যের তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। অ্যাডাম প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ ঘুরে বাঙলা ও বিহারের শিক্ষা পরিস্থিতি সংক্রান্ত তাঁর রিপোর্ট তিন দফায় পেশ করেছিলেন। এই রিপোর্টগুলো ও এতদসংক্রান্ত জেমস লর্ড ও অন্যান্যের মন্তব্যসহ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনাথনাথ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। মুখবন্ধে সম্পাদক রিপোর্টগুলো এর ওপর নির্ভর করে কাজী আবদুল মান্নান তাঁর 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' শীর্ষক গ্রন্থে বিভিন্ন জেলার লোক সংখ্যানুপাতে বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান উল্লেখপূর্বক মুসলিম শিক্ষা সংস্কৃতির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙলার মুসলিমদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে বর্ণনা আছে তা ভয়াবহ। মুসলমান প্রধান দিনাজপুর জেলার ৩০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২১ লক্ষ ছিল মুসলমান, অথচ তাদের জ্ঞানানুশীলনের জন্য কোন মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ইংরেজ কোম্পানি শাসন প্রবর্তনের চল্লিশ পঞ্চাশ ও ষাট বছরের মধ্যে বাঙলা ও বিহারের মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতির নিম্নমুখী গতি নিদারুণ দৈন্যদশার মধ্যে পতিত হয়। এসবই সবিস্তারের উক্ত গ্রন্থে বিধৃত আছে। আর আছে এরকম অপরাপর জেলা বা পরগণার শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনা।

কোম্পানির মনোভাব ছিল নেটিভদের লেখাপড়া শেখানোর বিরুদ্ধে। তবে খ্রীষ্টান মিশনারী এবং মানবতাবাদী উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মচারির মনোভাব ছিল শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে। নব্যপন্থী ইংরেজদের আন্দোলন সংগ্রাম ও বাস্তব কর্মযোগের পরিণতিতে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারকল্পে বিভিন্ন স্কুল কলেজ গড়ে ওঠে। মিশনারীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের নিমিত্ত

www.pathagar.com

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন স্কুল ও সোসাইটি গড়ে তোলেন। শ্রীরামপুরের মিশনারী স্কুল, উচ্চ মিশনারী সোসাইটির 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি', 'চার্চ মিশনারী এ্যাসোসিয়েশন', 'ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি', 'খ্রীষ্টান নলেজ সোসাইটি' প্রভৃতি খ্রীষ্টান-আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে এদেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটান। এঁদের চেষ্টায় বাংলা পাঠশালা ও ইংরেজী স্কুল ছাড়াও কয়েকটি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামপুর কলেজ, বিশপ কলেজ এবং ১৮১৭ তে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ এগুলোর অন্যতম।

হিন্দু কলেজ স্থাপনার সঙ্গে রামমোহন রায়ের সংশ্লিষ্টতা স্মরণে রেখেই বলা চলে যে, এগুলোর উদ্যোক্তারা ছিলেন দেশাচার, কায়েমী স্বার্থ ও বিশেষ সুবিধাবাদের ঘোরতর শত্রু। তাঁরা মনে করেছিলেন মানুষের মধ্যে সততা ও কাণ্ডজ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে পারলে সমাজ সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ করে হিন্দু সমাজে ধর্মের নামে কুসংস্কার এবং মানুষের প্রতি অবিচার দেখে তাঁরা ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছিলেন। সেসব দূর করে তাঁরা সুস্থ মানব সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের বিপক্ষে। ব্যক্তিগত ধর্মনিষ্ঠা, সামাজিক ন্যায়-বিধান ও মানব-হিতৈষা ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।

তাঁরা এই লক্ষ্যে বেশকিছু ইংরেজী এবং পরে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রও প্রকাশ করেন। এঁদের দেখাদেখি প্রগতিশীল হিন্দুরাও কতিপয় বাংলা সাময়িকপত্র সম্পাদনপূর্বক সমাজকে কুসংস্কার ইত্যাদি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এইসব পত্রিকায় নিরপেক্ষ সমালোচনায় আক্রান্ত হয়েছেন অর্থলোলুপ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা এবং রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজপতিরা। তাই ইংরেজ শাসকগণ সংবাদপত্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতা রোধ করার জন্য নিপীড়নমূলক আইন যেমন জারি করেছেন, তেমনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিগণ সমাজরক্ষা তাগিদে বের করেছেন 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও তার অনুসারী পত্রিকাগুলো। বিপরীতে প্রগতিশীল ধারায় ১৮১৮ থেকে 'সমাচারদর্পণ' হয়ে 'বঙ্গদর্শন' ও 'সাধনার' ধারার বাংলা সাময়িকপত্রের যে ঐতিহ্য গড়ে ওঠে, তাতে 'বাঙলার নবজাগরণ' ঘটে এবং বলাবাহুল্য, এইসব উদ্যোগ আয়োজনের সঙ্গে মুসলমানেরা সম্পৃক্ত ছিলেন না।

শিক্ষা বিস্তারের অপ্রতিরোধ্য প্রক্রিয়ায় সরকার অতপর সচেতনভাবে শিক্ষা-সংক্রান্ত বেশকিছু নীতি প্রণয়ন করেন। মেকলের ১৮৩৫ সনের মাইনুটস্, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের পার্লামেন্টে এক আইন করে এদেশে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দেয়া হয়। তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে শেষতক ইংরেজি শিক্ষার জন্য সরকার পদক্ষেপ নেন। তবে পাঠ্যক্রম প্রণীত হয় এমনভাবে যে, এঁরা হবেন নব্য ইংরেজ, রক্তে রঙে ভারতীয় হলেও রুচিতে মতে নীতিতে ও বুদ্ধিতে তাঁরা হবেন ইংরেজ। এঁদের সহায়তায়ই ইংরেজ এত দীর্ঘ সময় এদেশে শাসন শোষণ কায়েম রাখতে পেরেছিলেন। নইলে দেশের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী প্রজাশ্রেণীর যে সংগ্রাম ও বিদ্রোহ আঠারো শতক থেকেই ঘটে আসছিলো, সেসব সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় এদেশ থেকে ইংরেজ তাড়িয়ে আরও বহু আগেই স্বাধীনতা লাভ করা যেত।

www.pathagar.com

২

বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান সমাজের গঠন ও বিকাশ প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক পরিমণ্ডলে গৃহীত তাঁদের বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তের মধ্যেই নিহিত ছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ। খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি পূর্ণরূপে গড়ে ওঠে। কালীদাস, জয়দেব প্রমুখের উচ্চমানসম্পন্ন সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টির পর সে সমাজব্যবস্থায় (বাঙলায়) বিধর্মীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ছয়শ বছর রাজাশ্রয়হীন থাকার পরও তাই হিন্দুসমাজের প্রকর্ষ বিনষ্ট হয়নি দেখা যায়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে গড়ে ওঠা মুসলিম সমাজ (ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত) রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে (৫০ থেকে ১০০ বছর মাত্র) চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হিন্দু ও ইংরেজের চোখে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা, তাচ্ছিল্য ও করুণার পাত্রে পরিণত হয়।

মুসলমান সমাজের গঠন-প্রক্রিয়ায় দেখা গেছে যে, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র, অশিক্ষিত, হিন্দু-বৌদ্ধরাই ব্যবহারিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমান হয়েছিল। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিত্ত ও সাধনার অবকাশ তাদের ছিল না। এই সেদিন পর্যন্ত দৈন্যপীড়িত মুসলমান সাহিত্যিকেরা অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসার অভাবে অকালে মারা গেছেন অথবা আত্মহত্যা করেছেন। 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত হুমায়ুন কবিরের একটি উক্তি স্মরণীয় :

> সৃষ্টিপ্রতিভা বংশ বা সমাজ বা শ্রেণী নিরপেক্ষ। তাই একথা ধরে নেওয়া চলে যে প্রত্যেক সমাজ বা শ্রেণীতেই সমপরিমাণ প্রতিভার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু সমাজের শতকরা ৯৫ জনের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ; শিক্ষার অভাবে তার বিকাশের কোন সুযোগ নেই।[১৩]

বিত্তই যেহেতু বিদ্যালাভের একমাত্র উপায় ও প্রেরণা, সেহেতু হতদরিদ্র মুসলমানেরা বিত্ত, বিদ্যা ও শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত হয়ে পিছনে পড়েছিল। তাছাড়া 'বাংলা'ভাষার প্রতি মুসলমানদের ধারণাও নানাকারণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। উঁচুস্তরের মুসলমানেরা ফারসি, উর্দুর চর্চা করতেন। সেজন্য পৃষ্ঠপোষকতাহীন অসংগঠিত বাঙালি মুসলমানেরা বাংলা ভাষার চর্চায় নিরুৎসাহিত হন। পাশাপাশি হিন্দুদের ফারসি বা ইংরেজি ভাষাজ্ঞান অর্থ উপার্জনের সহায়ক হলেও, ঘরে তাঁরা বাংলার চর্চা করতেন। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চাও ধর্মের জন্য অব্যাহত ছিল। ফলে হিন্দুরা বাঙালি সংস্কৃতির স্বাভাবিক প্রস্রবণ থেকে রস আহরণপূর্বক বাংলা সাহিত্যচর্চায় সহজ-লভ্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণের সুযোগ থেকে মুসলমানেরা বঞ্চিত হয়েছিলেন ইংরেজদের এবং খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি জাগ্রত ঘৃণা, ভয় ও অবহেলার কারণে। কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন :

> হিন্দু ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে এত আগ্রহ দেখাল আর মুসলমান কোনো আগ্রহই দেখাল না বরং বিতৃষ্ণার পরিচয় দিল, তার প্রথম কারণ মুসলমান সমাজের পদস্থরা ছিলেন জমিদার ও উচ্চ রাজকর্মচারী আর হিন্দু সমাজের পদস্থরা কিছু সংখ্যক ছিলেন জমিদার কিন্তু বেশীর ভাগ ছিলেন ব্যবসায়ী,-ব্যবসায় সম্পর্কে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদের বেশি মিলমিশ হওয়া স্বাভাবিক। আর ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় প্রভাব প্রতিপত্তিতে মুসলমানরা বড় হলেও দেশের অধিক সংখ্যক অধিবাসী ছিল হিন্দু, তাদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের দিকে

www.pathagar.com

ইংরেজের বেশী আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত আচারে হিন্দু অনুদার হলেও অপরের ধর্মের প্রতি সে চিরদিন শ্রদ্ধাবান, কিন্তু আচারে যথেষ্ট উদার হয়েও ধর্মমতে মুসলমান অনেক বেশি গোঁড়া। বিধর্মীর ভাষা আচার এসব সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া কতকটা তার প্রচলিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাইরে।

তাছাড়া হিন্দু এতদিন ধরে যথেষ্ট অনুরাগে ফার্সির চর্চা করে আসছিল, তাই নতুন রাজার ভাষা আয়ত্ত করার কথা সহজেই সে ভাবতে পেরেছিল। কিন্তু নিজেদের প্রাধান্য সম্বন্ধে সচেতন মুসলমানদের বিজাতির ভাষার প্রতি অনুরাগী হওয়া তেমন সহজ ছিল না।[১৪]

প্রথম অবস্থায় যাই হোক, দীর্ঘদিনেও মুসলমানদের এই অনড় মনোভাবে যে কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না তার কারণ আরো গভীরে ছিল। প্রথমত মুসলমান যখন রাজত্ব হারায়, তখন তার পতন-দশা প্রায় চরমে পৌঁছেছিল। মুসলমানদের সমাজে যে পশ্চাৎপদ চিন্তা বাসা বেঁধেছিল এবং ব্যাপকভাবে সে সমাজটি হয়ে পড়েছিল সে-সম্বন্ধেও তাদের চেতনা জাগ্রত ছিল না। এমন কি রাজ্য যে তাদের নেই, সে-বোধও হয় তাদের অনেক পরে।

এরকম অবক্ষয় তখন গোটা মুসলিম জাহানেই দেখা দিয়েছিল। সর্বত্রই মুসলমানেরা খ্রীষ্টানদের কাছে পরাজয় বরণ করছিল। মুসলমান জগতের এই ব্যাপক মোহ ও নিষ্ক্রিয়তা ভাঙতে আরম্ভ করে আরব দেশে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ওহাবি মতবাদের প্রভাবে। এই মতে বলা হয়, হজরত মোহাম্মদের আদি শিক্ষার বিকৃতি সাধনের ফলেই মুসলমানদের দশা হীন হয়ে পড়েছে। আদি ইসলামে ফিরে গেলে ধর্মাচারে তাঁরা শুদ্ধ হবেন, আর তার ফলে তাদের সকল দুর্গতির অবসান হবে। ভারতে এই নতুন মতবাদ প্রচার করেন উত্তর প্রদেশের রায় বেরেলির শাহ সৈয়দ আহমদ। ১৮২৬ সনে তাঁরা শিখদের সঙ্গে যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ বলে ঘোষণা করেছিলেন। আর বাঙলার মুসলমানেরা তাতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বাঙলাদেশে তখন ওহাবি-নেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন তিতুমীর। তখন তিনি মুসলমান প্রজাদের সংবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ধর্মাচারে বিশুদ্ধ হতে হবে বলে। এই সংঘবদ্ধতার পরিণতিতে হিন্দুজমিদারদের এবং ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে আর ইংরেজ সরকার তাঁকে দমন করে ১৮৩১ সনে।

এরপর হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলন পরিচালনা করেন। এ থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলিম মনোভাব বিদ্রোহের পর্যায়ে চলে যায়। সিপাহী-বিদ্রোহসহ ১৮৫১-৫৭ সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানারকম বিদ্রোহ-সংঘর্ষ বাধে, আর ইংরেজ প্রশাসকও কঠোরভাবে তা দমন করতে বদ্ধপরিকর হয়।

এইবার হয়তো অনেকটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে, নানা ঘটনায় মুসলমান ও ইংরেজের মধ্যে যে দীর্ঘকালব্যাপী মনোমালিন্য, এমনকি শত্রুতা, মুসলমানদের সচেতন অংশে দেখা দেয়-সেইটিই হচ্ছে তাদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণার মূল কারণ।[১৫] এবং সেজন্য তারা সৃজনশীলতার ক্ষেত্রেও অনেক পিছিয়ে পড়েন।

ওহাবি বিদ্রোহের সমকালে বাংলাদেশের কৃতি সন্তান নবাব আবদুল লতীফ (১৮২৬-৯৩) কলকাতায় সুশিক্ষিত হচ্ছিলেন, ১৮৪৯ সনে তিনি ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন, ইংরেজি শিক্ষার ফলেই হিন্দু সমাজের উন্নতি ঘটেছে। আর এর অভাবে মুসলমানদের দুর্গতির অন্ত নেই। সসমাজের দুর্গতিরোধের জন্য

www.pathagar.com

তিনি বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন করেন। ১৮৬৩ সনে তিনি 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' গড়ে তোলেন ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে প্রধানত প্রচার করার লক্ষ্যে ; আর পাশ্চাত্য-শিক্ষার গৌরবময় দিক তুলে ধরার জন্যে। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে ১০০ টাকা মূল্যের পুরস্কারের একটি রচনা প্রতিযোগিতার ঘোষণা দেন। রচনাটি লিখতে বলা হয়েছিল পার্সিতে। ইংরেজিতে বিজ্ঞানাদি শিক্ষার প্রয়োজনীতার দিকে শিক্ষিত মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল মূল লক্ষ্য।

(এর আগে ১৮২৬ সনে মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের একটি উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়।) মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা ১৮৬৮ সনেও নবাব আবদুল লতিফ লক্ষ্য করেছিলেন। আবদুল লতিফ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির মাধ্যমে শিক্ষিত মুসলমানদের (পার্সী ও উর্দু ভাষায় আলোচনা হত) ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁরই চেষ্টায় ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। আর মুসলমানদের উচ্চ-ইংরেজি শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা সেখানে করা হয়।

১৮৮০ সনে ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং বেঙ্গল কাউন্সিলের তৎকালীন সদস্য সৈয়দ আমির হোসেনও মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজিতে পুস্তিকাদি লিখে বলেন : ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের উন্নতি হচ্ছে না। অথচ ইংরেজি না শিখলে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের হার ভিন্ন আর কিছু হবে না তা দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।[১৬]

ঐ প্রবন্ধে লেখক উল্লেখ করেন, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের আগে যে বিতৃষ্ণা ছিল, তা আর নেই, বরং এই আক্ষেপ শোনা যাচ্ছে যে, সময়মতো ইংরেজি না শিখে মুসলমানেরা ভুল করেছেন। সৈয়দ আমির হোসেন বলেন, শিক্ষার ব্যয় কমিয়ে মহসিন ফাণ্ডের টাকায় কলকাতা মাদ্রাসার দালানে একটি বি.এ. কলেজ খোলা হোক এবং মাদ্রাসা-শিক্ষায়ও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য আবশ্যিক বিষয়রূপে গণ্য করা হোক।

তাঁর এই প্রস্তাব সে দিনের হিন্দু পেট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান মিরার, বেঙ্গলী প্রভৃতি সংবাদপত্র এবং ইংরেজ w.w. Hunter ও সমর্থন করেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট প্রেসিডেনসী কলেজের ন্যায় (মুসলমানদের জন্য) পূর্ণাঙ্গ কলেজ করার ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা স্বল্পতার উল্লেখ করে অন্য ব্যবস্থা নেন।

বলা হয়, কলকাতার কলেজগুলোতে মুসলমান ছাত্রদেরকে স্বল্প বেতনে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ দেয়া হবে। নবাব আবদুল লতিফ-এর অন্য একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল মুসলমানদের প্রতি ইংরেজের মনোভাব প্রসন্ন ও সদয় করা। ওহাবি-মুসলমানেরা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ-পূর্ণ অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা কর্তব্য বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে ইংরেজ ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের ব্যাপকভাবে চাকুরিচ্যুত করে সেগুলোতে হিন্দুদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শুধুমাত্র হিন্দুরাই আবেদনের যোগ্য বলে উল্লেখ করা হতো।

বিপীণচন্দ্র পাল তাঁর আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন যে, ঐকালে মুসলমানেরা ব্যাপকভাবে ইংরেজ সরকারের সন্দেহের পাত্র হয়। এ-অবস্থায় নবাব আবদুল লতিফ

www.pathagar.com

মৌলানা কেরামত আলীকে দিয়ে ফতোয়া লেখান যে, ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' নয়, 'দারুল ইসলাম'—অর্থাৎ ইসলামের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন নয়, বরং বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্র, কেননা ভারতের ইংরেজ সরকার মুসলমানদের দৈনন্দিন ধর্মকর্মে কিছুমাত্র বাধা দেন না।

নবাব আবদুল লতিফের নানা ধরনের চেষ্টায় বাংলার মুসলাম সমাজে সত্যিই কিছু পরিবর্তন ঘটে। তবে মনন জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে যোগ হল আর্থিক জগতের একটি স্বাভাবিক পরিবর্তন। বহির্বিশ্বে পাটের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বাঙলার মুসলমান কৃষকদের এই পণ্যটি লাভজনক উৎপাদনের বস্তু হয়ে পড়ে। একাজে মুসলমানদের ছিল স্বাভাবিক দক্ষতা। কৃষকগণ বাঙলার মাটিতে পাট উৎপাদন করে কিছু নগদ পয়সার মালিক হয়েছিলেন এবং সন্তানদের শিক্ষার জন্য মনযোগী হয়ে ওঠেন। তাঁরা পাট ব্যবসায়ের সঙ্গেও সংযুক্ত হয়ে যান।

এ থেকে বণিকপুঁজির প্রতিও মুসলমানদের একটি ক্ষীণতম আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু 'মহাজনী' সুদী কারবার মুসলমান সমাজে ধর্মীয় দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ছিল। দরিদ্র মুসলমান সমাজের মানসিক প্রশান্তি বহাল রাখার জন্যেই সম্ভবত সমাজের নেতারা ইহজাগতিক কৃচ্ছসাধনার বিনিময়ে পরকালে বেহেশত লাভের সম্ভাবনার সাক্ষ্য দিয়ে চলতেন। 'সুদ', 'ব্যাংকিং', 'ব্যবসা' প্রভৃতি সম্পর্কে এই চেতনা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি জাগ্রত দৃষ্টির ন্যায় সচকিত হয়ে ওঠে শিখা-গোষ্ঠীর আন্দোলন কালে ১৯২৬ সনের সমকালে ও তারপরে।

মনীষী আবদুল লতিফ এবং তাঁর মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি আর, সৈয়দ আমির হোসেন ও ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন এর প্রচেষ্টার সঙ্গে মুসলমানদের হাতে কিছু অর্থ আসার ঘটনা সংযুক্ত হয়ে উনিশ শতকের শেষ দুটো দশকে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে, এবং তথ্যপূর্ণ গ্রন্থাদির বিবরণে দেখা যায় এসময় বি.এ., এম. এ. পাশ করা কিছু মুসলমান (শ'দুশোর বেশি নয়) চাকুরি প্রার্থী হচ্ছেন। বিভিন্ন দফতরে দু-চার কিংবা পাঁচ-সাত জন করে হলেও মুসলমান চাকুরী করছেন। চাকুরী করে, কৃষি থেকে লাভ করে মুসলমানেরা পুঁজি গড়ে তুলতে পারছিলেন এবং কৃষিতে বিনিয়োগ করে স্বচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন একটি শ্রেণী। এঁরাই পরবর্তী কালে বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের পত্তন করেছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ দুটি দশকে প্রকাশিত বাংলা সাময়িকপত্রে দেখা যায়, তাঁদের একাংশের প্যান-ইসলামীবাদের দিকে ঝোঁক বেড়েছে। ইংরেজ সরকারের প্রতি অত্যধিক আনুগত্য সৃষ্টি হয়েছে। আর ইংরেজি না শিখে মুসলমানেরা যে হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে—সেজন্য ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ফলে তাঁদের মধ্যে ব্যস্ততার সৃষ্টি হলো পেছন থেকে অগ্রসর হবার জন্য। এই দুই ধারার চেতনার ফলে ঐ যুগের মুসলমানরা 'স্বভাবতই সজাগ এবং স্বস্তিহীন হল'। ধর্মসংস্কারের প্রতিও কারো কারো গভীর আগ্রহ জেগেছিল। কিন্তু সমাজের ব্যাপক সংখ্যক লোককে উন্নয়নের অংশীদার করতে হলে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে একটি পরিবর্তিত প্রগতিশীল অথবা বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির দরকার সে বিষয়ে মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও সাহিত্যিকেরা সজাগ হননি। যদিও হিন্দু সমাজে এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়েছিল রামমোহনের (১৭৭২-১৮৩৩) কাল থেকেই ; এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তা একটি নতুন শক্তিরূপে সমাজে অনুভূত হয়েছিল।

www.pathagar.com

৩

প্রচলিত চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনকারী কর্মযোগী মনীষী, রামমোহন রায়ের প্রস্তাবাবলীতে যুক্তিবিচার ও মুক্তবুদ্ধির প্রয়োগে ইহজাগতিক সমস্যাসমূহকে প্রথম কার্যকরভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং ধর্মের নামে প্রচলিত সামাজিক আচার-আচরণসমূহকে সুনীতি এবং সুরুচির দিক থেকে আপত্তিকর ও ভদ্রসমাজে বহাল থাকার বিরুদ্ধে মত দেয়া হয়। বাস্তব কর্মযোগ গ্রহণপূর্বক রক্ষাণশীলতার বিরুদ্ধে রামমোহন সংগ্রাম করেছিলেন। আধুনিক শিক্ষার প্রসারে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং ইংরেজের কাছে পাশ্চাত্যশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির সুপারিশ তিনি উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর চিন্তা ও কর্ম গতানুগতিক ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হেনেছিল। কালে ইয়ংবেঙ্গল এবং ব্রাহ্মসমাজের রথি-মহারথিদের দ্বারা তাঁর চিন্তাধারাই সম্প্রসারিত হয়ে বাঙলায় ঘটেছিল নবজাগরণ।

তাই সমালোচককগণ বলেন, রামমোহনের কর্ম ও চিন্তা, উদ্যম ও বিচক্ষণতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আধুনিকতার দরজা 'দরাজ খুলে' গিয়েছিল।[১৭]

রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর আরদ্ধ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন ডিরোজিও পন্থী ইয়ংবেঙ্গল দল এবং তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৪১) তথা ব্রাহ্মসমাজের সদস্যগণ-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, প্যারিচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখের সাধনা। এঁরা হলেন উনিশ শতকের বাঙালির আধুনিকতার শিক্ষাদাতা ও সমাজ সংস্কারক।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙলার সমাজ সংস্কৃতি ও চিন্তাজগত রামমোহন বিদ্যাসাগর আর ইয়ংবেঙ্গলদের প্রাণোচ্ছল কর্মযোগের ফলে আলোড়িত, পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে মধুসূদন, প্যারীচাঁদ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক রামগোপাল ঘোষ প্রমুখের কর্ম ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য বাঙালির নবচেতনার প্রতীক হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

এই সময়ে 'এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতির মাধ্যমে সেদিনের হিন্দু-সমাজের ও ধর্মের যা যা ত্রুটি তাঁদের চোখে পড়েছিল, সে-সবেরই কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাসেসিয়েশন (১৮৫১, সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ও নীলবিদ্রোহ (১৮৫৮-৬০) বাঙালিকে নাড়া দিল। বাঙলার রাজনীতি দানা বেঁধে ওঠে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। 'নীলদর্পণ' নাটক শিক্ষিত সমাজকে আত্মনির্ভরতার চেতনায় সংযত করে দিয়েছিল।

রঙ্গলাল ও মধুসূদন প্রমুখ বাঙালির জাতীয়তাবোধকে উদ্দীপিত করেন। বাংলা সাহিত্যের কাব্য ও নাটক দুই ধারাই শাণিত করে চলল জাতীয়তার চেতনা। অবশ্য সে জাতীয়তা হলো হিন্দু জাতীয়তা। স্বদেশের গৌরববোধ হিন্দু-জাতির পুনরুত্থান, মানুষের নতুন মহিমাবোধ—সবই ভীড় জমালো এই জাতীয়তাবোধের মধ্যে। এই জাতীয় চেতনার এই সময়ের এক বিশিষ্ট রূপ 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭)। এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু জাতিকে একত্র করা, আর আত্মসম্পূর্ণতা শিক্ষা দেওয়া।

www.pathagar.com

হিন্দুমেলার বার্ষিক অধিবেশন বসতো, ১৮৮০ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। এই মেলায় হিন্দুর জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে উদ্দীপক সমালোচনা হতো। নারীমুক্তি ও নারীজাগরণ এর লক্ষ্যে রামমোহনের কাল থেকেই আন্দোলন হয়ে আসছিল। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতির মাধ্যমে বিদ্যাসাগর প্রমুখের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন ও আয়োজন আর বঙ্গদর্শন (১৮৭২) ও বাঙলার নাট্যশালা (১৮৭৩) প্রভৃতি হিন্দুর নব উদ্বোধিত জাতীয়তার বার্তা সাধারণ্যে ছড়িয়ে দিল অগ্নিশিখার মতো। এইকালে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে—আইসিএস সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে অপসারণ, আইসিএস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের বয়স ২২ থেকে ১৯–এ অবনয়ন, মফস্বলের কলেজসমূহ বন্ধ করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নিয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন হল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ঔপনিবেশিক শাসকদের এসব পদক্ষেপকে বাঙালিরা বুঝলেন তাঁদের অগ্রগতির পরিপন্থী ব্যবস্থা বলে। ইংরেজকে বাঙালি হিন্দু একদিন ভেবেছিলেন তাঁর অকৃত্রিম হিতৈষী বন্ধু রূপে। সে ধারণার উপরে ক্রমাগত আঘাত পড়তে পড়তে এতদিনে তাতে এক বড়ো রকমের ফাটল দেখা দিল।

ইংরেজের অপ্রসন্নতা ও বাধার বিরুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালির আত্মপ্রকাশের সংগ্রাম বিরাট রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করেছিল। সাহিত্য ও জাতীয় সঙ্গীত, হিন্দুমেলা, বাঙলার জাতীয় নাট্যশালা, বঙ্গদর্শন, এ সমস্তের মধ্যে জাতীয় চেতনার যে প্রকাশ–বেদনা অনুভূত হচ্ছিল, সেই প্রকাশ–বেদনা এক স্পষ্ট রূপ ধারণ করেছিল কংগ্রেস স্থাপনার সময়ে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে'র অবশ্য বিশেষত্ব ছিল। হিন্দু জাতীয়তারূপে বিকশিত হলেও ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধী ছিলনা এটি। সারা ভারতবর্ষে বাঙালি হিন্দু নেতাদের কথা প্রতিধ্বনিত হতো।

সুরেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত দেশের নবজাগরণকে যোগ্য রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে। কিন্তু উত্তর ভারতের মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদেরকে এই সরকার–বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে না করেছিলেন। মুসলমানেরা হিন্দুর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সংগঠন কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা ও চাকুরি প্রভৃতির সুযোগ গ্রহণের দিকে মনোযোগ দিলেন। বাঙলার হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ নতুনরূপ লাভ করতে শুরু করে এ থেকেও।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কিংবা নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের পর যা–ই দাঁড়াক, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ন্যায় এই নবজাগরণের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ এর দিকে তাকিয়েছিল বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে। ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় আদর্শ—সকল ক্ষেত্রে যে রূপান্তর লাভ করলো, তার মূলে এক বড় শক্তিরূপে কাজ করেছে বাঙালি হিন্দু কর্তৃক সাধিত এই নবজাগরণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যখন বাংলা সাহিত্যের সর্বোচ্চ উৎকর্ষ ঘটে চলেছে তখন বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রথম সার্থক নেতা, মনীষী নবাব আবদুল লতীফ মুসলমান বাঙালিদের মাতৃভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) যখন সারা ভারতের স্বাধীনতার বেদ–বাক্য হয়ে উঠেছিল তখন মুসলমান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন 'বিষাদ–সিন্ধু' (১৮৮৫) লিখে চলেছেন একান্ত একাগ্রতায়।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের শেষ দশক দুটিতে মুসলমানেরা হারানো মুসলিম ঐতিহ্য মন্থন করে চলেছিলেন। কেউ কেউ মুসলমানদের সমাজকে সংস্কার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। একদল হিন্দুর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠছিলেন, ভাবছিলেন হিন্দুরা মুসলমানের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। এভাবে তাঁরা স্বদেশী আন্দোলনমুখর বিশ শতকের পাদপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন। মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ-সিন্ধু ছাড়া উনিশ শতকে প্রকাশিত মুসলিম রচিত বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম আর দুটো পাওয়া যায় না। বাঙালির নবজাগরণের কালে মুসলমানেরা আত্মনিমগ্ন থাকায় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় একশ বছরের মত পিছিয়ে পড়েছিলেন। পরিতাপের বিষয় যে, আধুনিক সাহিত্য শিল্পের সৃষ্টিক্ষেত্রেও তাঁদের সে পশ্চাৎপদতা রয়ে গেছে। তবে দূরত্ব ক্রমেই কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হয়েছে যে-সমস্ত উপাদান, বিশ শতকের মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্র তার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যনির্দেশ

১. সুকুমার সেন, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী, গোপাল হালদার, অরবিন্দ পোদ্দার, কাজী আবদুল ওদুদ, আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান, কাজী আবদুল মান্নান ও ওয়াকিল আহমদ, আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ সমালোচকের ঔপনিবেশিক আমলের বাঙলাদেশ, বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং তাঁদের চিন্তা-চেতনার ধারা সংক্রান্ত আলোচনাসমূহ সামনে রেখেই কথাটি বলছি।

২ উপরিউক্ত লেখকদের আলোচনায় এই বিতর্ক রয়েছে যে, নবজাগরণের সূচনা কখন থেকে ধরা হবে। আপাতত দ্রষ্টব্য : কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত বাংলার জাগরণ, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ.২।

৩. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, কলকাতা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৭২, পৃ. ২৯-৩০।

৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক, উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৫।

৫. কাজী আবদুল ওদুদ, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, শাশ্বতবঙ্গ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫১, কলকাতা, পৃ. ৭৭।

৬. উপরিউক্ত, বাংলার জাগরণ, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ১১৩।

৭. বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ, কলকাতা, ১৯৮৭, ৩য় মুদ্রণ, পৃ. ১৫-১৮।

৮. আনিসুজ্জামান এবং আবুল কাসেম ফজলুল হকের যথাক্রমে 'মুসিলম মানস ও বাংলা সাহিত্য', ঢাকা, ১৯৬৪ এবং 'উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

৯. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৬৯, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১০. উপরিউক্ত।

১১. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ,পৃ. ১১৬।

১২ উপরিউক্ত।

১৩. হুমায়ুন কবির, আধুনিক সাহিত্য (আলোচনা), চতুরঙ্গ, সম্পাদক : হুমায়ুন কবির, ৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৫১, পৃ. ১৮১-৮৪।

১৪. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, পৃ. ১১৭।

১৫. উপরিউক্ত, পৃ. ১১৯।

১৬. উপরিউক্ত, পৃ. ১২২।

১৭. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ১৯।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি এবং সাহিত্য

প্রস্তাবনা

১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়কালের বাঙলার রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়েছে বৃহত্তর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলসমূহের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীকে সামনে নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ—এসময় খুবই সক্রিয় ছিলো। সকলেরই উদ্দেশ্য দলীয় ইস্তেহার বাস্তবায়ন করা। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, হিন্দু ও মুসলমানের মোটামুটি সংখ্যা সাম্য, ধর্ম দর্শনের বিপুল বৈচিত্র্য, সামাজিক বিকাশের আকাশ পাতাল তারতম্য বাঙলাদেশের রাজনীতিকে পরিচালিত করেছে ভিন্ন প্রকৃতিতে। বাংলা সাময়িকপত্র ও সাহিত্যও তাই ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য ও সাময়িকপত্র থেকে ভিন্ন মেজাজে আলাদা চারিত্র নিয়ে প্রকাশিত ও বিকশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্রে হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশ আলোচনা হয়েছে স্থানিক, কালিক ও ধর্মভিত্তিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

১৯৩১-৪৭ সময়ের সাহিত্য পত্রিকাসমূহের পরিচয় নিতে হলে তাই ঐ কালের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাটি বিশেষভাবেই অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু একালের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ইস্যুসমূহ প্রাণশক্তি আহরণ করেছে পূর্ববর্তী কালের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা থেকে। বিশ শতকের সূচনায় বাঙলার প্রধান সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর আলোচনা তিনটি অনুচ্ছেদে করা হয়েছে :

ক. বিশ শতকের সূচনায় বাঙলার সামাজিক পরিস্থিতি
[রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক]

খ. বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের বাঙলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাময়িকপত্র সাধনার পরিচয়

গ. মুসলিম সম্পাদিত সাহিত্যপত্রিকার উদ্ভব ও বিকাশ (১৯৩০ পর্যন্ত)।

www.pathagar.com

২. ক. বিশ শতকের সূচনায় বাঙলার সামাজিক পরিস্থিতি

[রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক]

বিশ শতকের সূচনা হয় উনিশ শতকের জাগরণের ধারাবাহিকতায় জাগ্রত হিন্দু ও মুসলমানের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংগ্রামের জের নিয়ে। এসব ঘটনা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সহায়ক ছিল। স্বভাবতই বাঙলার রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতিতে তাই নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হলো। হিন্দু ও মুসলমানের সহাবস্থানের সম্ভাবনা এতে সুদূরপরাহত হয়। ১৮৮২–তে ইলবার্ট বিল নিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এসঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় বিশ শতকের প্রথম দশকের সবচেয়ে উত্তেজক বিষয় ছিল যে স্বদেশী আন্দোলন, তারও শুরু হয় ১৮৮১–তে। জুবায়ের–এর পরিকল্পনায় কলকাতায় অনুষ্ঠিত শিল্প-প্রদর্শনীর ওপর সাপ্তাহিক 'সঞ্জিবনী'র প্রেরণাদায়ক উক্তিসমূহ সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অগ্নিমূর্তি ধারণে সহায়তা করেছিল :

> যদি পরাধীনতার বিষময় ফল দেখিতে চাও, তবে একবার ক্ষুদ্র ইংলন্ডের কলকারখানা আর ভারতের খনিজদ্রব্যগুলি দেখিবার জন্য প্রদর্শনীত প্রবেশ করিও। যদি প্রদর্শনী স্বদেশের দুরবস্থা প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত না করিল, তবে প্রদর্শনী বৃথা হইল...[১]

১৮৮৫–তে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই তাতে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। পরের বছরই কংগ্রেস কলকাতায় স্বদেশী–শিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বিভিন্ন কারণে বিশ শতকের সূচনায় কংগ্রেসই ভারতের সকল জাতি ধর্ম বর্ণ ও ভাষাভাষির সর্ব বৃহৎ জাতীয় দলরূপে ব্রিটিশের আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সরলাদেবী চৌধুরানীও 'লক্ষ্মীভাণ্ডার' নামে স্বদেশী–দ্রব্যের আড়ত খুলেছিলেন। 'ডন সোসাইটী' 'অনুশীলন সমিতি' প্রভৃতি স্বদেশমন্ত্রের বাণী প্রচার করছিল। স্বাদেশিকতার স্রোত যখন জাতির জীবনে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো বইছিলো, তখন বাঙলার তথা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকে দুর্বল করার লক্ষ্যে শাসকগণ 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে 'মুসলিম–তোষণ নীতি'র অনুসরণ করতে থাকে। মুসলমানরাও তখন শিক্ষা–দীক্ষায় কিছুটা উন্নত। অতএব তারা শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় খুশিই হয়েছিল। হিন্দুদের অধিকৃত চাকুরি প্রভৃতি মুসলমানদের জন্য স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবারও সুযোগ ছিল না। হিন্দুদের বর্ধমান শিক্ষিতের হার, বেকারের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি করছিল। হিন্দু–মুসলমান পরস্পরের প্রতিযোগী হওয়ায় ডিভাইডেশনে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। মুসলমানদেরকে বুঝানো হলো তাদের উন্নতির জন্যই বঙ্গ–ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু লর্ড কার্জনের ঘোষিত ১৯০৫–এর সেই প্রশাসনিক এলাকা পুনর্বিন্যাসের আদেশের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায় প্রবল প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ থেকেই শুরু হয় 'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন'। দুই পর্বে তা সক্রিয় ছিল ১৯৩৫ পর্যন্ত।

স্বদেশী আন্দোলনের সহায়করূপে বাঙলায় স্বদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ফলে বাঙলার অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। হিন্দু সমাজে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। ফলে তাঁদের আর্থিক বিকাশ ত্বরান্বিত হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, অধিকাংশ মুসলমান তাদের শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধ মনে করে এই আন্দোলন থেকে দূরে রইলেন, এমনকি চরম বিরুদ্ধতাও করতে লাগলেন। ১৯০৬ সনে 'স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ' বিরোধী

www.pathagar.com

আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করার জন্য নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্কে উৎসাহিত করে 'মুসলিম লীগ'ও গড়ে তোলা হলো।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাস উদ্দীপকের কাজ করে। কংগ্রেসের জাতীয় সঙ্গীত ও 'বন্দে মাতরম' আন্দোলন দমনের জন্য সরকার নানা কৌশল অবলম্বন করে। তার মধ্যে অন্যতম 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দেয়া ; আর মুসলমানদের সচেতন করে দেয়া যে এর মধ্যে পৌত্তলিকতা রয়েছে বলে এগান গাওয়া তাদের পক্ষে অনুচিত। 'বন্দে মাতরম'সঙ্গীতের প্রতি হিন্দুদের আগ্রহ প্রবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরা এর থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন। ফলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যা কিনা বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনাকে বৃদ্ধি করেছিল, তা থেকে মুসলমানেরা দূরে রইলেন না কেবল, এই আন্দোলনকে মনে করা হলো মুসলিম স্বার্থবিরোধী। ছাত্রসমাজকে দমন করার জন্য স্কুল কলেজে নানারকম নির্দেশ পাঠানো হলো। একটি সার্কুলারে বলা হলো, কোনও ইংরেজ বা মুসলমান অভদ্র আচরণের অভিযোগ করলেই গ্রেফতার করা হবে।[২]

আদালতে মুসলমানেরা নালিশ করলেই হিন্দুর শাস্তি হবে। আর ইংরেজের সমপর্যায়ে মুসলমানদের মূল্যায়ন করায় তারা আত্মম্ভরিতায়, আত্মপ্রতিষ্ঠায় আরও প্রত্যয়ী হয়ে উঠলো। মুসলমানের চোখে হিন্দু আর হিন্দুর চোখে মুসলমান হয়ে উঠলো পরস্পরের শত্রু। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাধানো হলো। ইংরেজ শাসকদের নানারকম বক্তব্য ও কাজে এই সম্পর্কের আরও অবনতি হলো। এর একটি প্রমাণ হলো তখন হিন্দুদের আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহের জন্য মুসলমানদেরকে গোয়েন্দা নিয়োগ করা হয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সহিংসতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছিলেন, তিনি এই অমানবিকতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক চারিত্রসম্পন্ন আন্দোলনকে সমর্থন করতে চাননি। ১৯০৭ সনে সুরাট কংগ্রেসে চরম ও নরমপন্থীরা বিভক্ত হওয়ার পর সরকারও চরমপন্থীদের সহিংস আন্দোলন দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে নেতাদের নির্বাসনে পাঠানোর ব্যবস্থা করলো।

অসন্তোষ দমনের জন্য বিস্ফোরক আইন, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন, প্রেস আইন, রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক সভাসমিতি সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি জারী করা হলো। পরিণামে আন্দোলনকারীগণ প্রকাশ্য পথ ছেড়ে গুপ্ত পথ ধরলেন। এই 'গুপ্ত আন্দোলন' বাঙলার ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন নামে।

শিক্ষিত বেকার যুবকদের হতাশাজনিত অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামের কৃষক শ্রমিকদের মধ্যেও। মধ্যপন্থীদের সংস্কার আন্দোলন তখন আর মানুষের মনে সাড়া জাগাতে পারছিলো না। নতুন, চরম, উগ্র নেতাদের জনপ্রিয়তা তাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। এতদিন মধ্যপন্থীরা নির্ভর করেছিলেন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর। চরমপন্থী নেতারা আন্দোলনের আহ্বান পৌঁছে দিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত, ছাত্র ও কৃষক মজুরদের ব্যাপকতর সামাজিক পরিসরে।

রাজনারায়ণ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে, বন্দেমাতরমের শিহরণে, বালগঙ্গাধর তিলকের সাংগঠনিক তৎপরতায়, গণেশ-শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে ভারতবর্ষে উগ্র স্বাদেশিকতার যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্য রবীন্দ্রনাথও ভাবনার পরিবর্তন করে প্রচার করেছিলেন

www.pathagar.com

আত্মনির্ভরতা ও আত্মশক্তির মন্ত্র। শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। 'বয়কট ইস্যু'-র ফলে ১৯০৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ এবং বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজ। ক্রমে সারাদেশে অসংখ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিপীড়নের প্রতিবাদে।

এই সময়ের স্বদেশী আন্দোলনকারী চরমপন্থীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 'কেশরি' পত্রিকায় তিলক লিখেছিলেন, জাতি হিসেবে আমরা পল্লবিত বৃক্ষ, স্বরাজ তার মূলকাণ্ড, 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' তার শাখা-প্রশাখা। অতএব স্বদেশী আন্দোলনকারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল। জনসাধারণকে তাঁরা আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পেরেছিলেন। সংগ্রামের বিস্তৃত অঙ্গনে তাঁরা টেনে অনতে সক্ষম হন এমনকি মহিলাদেরকেও। রাজনৈতিক সংগঠন ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রবর্তন করেছিলেন অনেক অভিনব পদ্ধতি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সাফল্য থেকে বাহুবলে ব্রিটিশকে এদেশ থেকে উৎখাত করার অঙ্গীকারও দৃঢ় হয়। অবশেষে সরকার কৌশল অবলম্বনপূর্বক ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রদের ঘোষণা করেন।

এই সিদ্ধান্তে মুসলমানেরা আবার ইংরেজের প্রতি অপ্রসন্ন হলেন। সন্দেহ করতে শিখালো তাঁদেরকে ইংরেজরা। অতএব মুসলমানের ইংরেজ বিরোধী মনোভাবও দানা বাঁধে ১৯১১ থেকে। তবে বাঙলার রাজনৈতিক গুরুত্ব কমিয়ে দেবার জন্য রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হলো। বাঙলার মুসলমানকে খুশি করার জন্য 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' করে দেবার ঘোষণা দেয়া হল। এবং বলা হলো, এখানে মুসলমানদেকে চাকুরীর সুযোগ দেয়া হবে। কোনো পদে মুসলমান প্রার্থী থাকলে সেখানে অন্যদেরকে নিয়োগ করা হবে না বলেও জানানো হলো। এতে হিন্দুরা আবারও, আরও ক্ষিপ্ত হলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হিন্দু সমাজের প্রবল বিরোধিতার বিবরণ আছে রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিকথাতে এবং 'বাঙলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হিন্দু সমাজের প্রতিবাদের পরিচয় পাওয়া গেলেও দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের কোনও প্রতিবাদ হলো না। কারণ সেক্ষেত্রে অবাঙালী হিন্দুদের আগ্রহ ছিল না। আঞ্চলিকতার স্বার্থে এতে বরং তাঁরা খুশিই হয়েছিলেন।

বাঙলা থেকে রাজধানী সরিয়ে নেয়ায় বাঙলার অর্থনীতি, রাজনীতি প্রকৃতির সর্বমাত্রিক স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গেলো। একারণে এক কালে যে বাঙলা সারা ভারতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল, আজ সে বাঙলার গুরুত্ব কয়েক ধাপ নিচে নেমে গেছে। ভারতের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুই তিন দশকের মধ্যেই অবাঙালি হিন্দু ও মুসলমান প্রাধান্য বিস্তার করে বসে। বাঙালি হিন্দুরা সংখ্যালঘু হবার ভয়ে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন, পরে যে অবস্থায় বঙ্গদেশের সীমানা নির্ধারিত হলো, তাতেও তাঁরাই সংখালঘু রয়ে গেলেন। ১৯৪৭ সনে সেই বঙ্গ আবারও বিভক্ত হলো ইংরেজদেরই কূট-কৌশলে এবং হিন্দুদেরই আগ্রহে। মুসলমানেরা বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় লাভবান হয়েছিলেন। তাঁরা ইংরেজ শাসকদের নিত্য-নতুন প্রতারক রূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়ে বুঝতে পারলেন কোনমতেই ইংরেজকে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব সবকিছু নতুন করে তাঁরা ভাবতে লাগলেন।

www.pathagar.com

মুসলিম মধ্যবিত্তের ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠার আর একটি কারণ ১৯১২ সনের বলকান যুদ্ধে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয়। তুরস্কের সুলতানকে ভারতীয় সুন্নী মুসলমানেরা তাঁদের ধর্মীয় নেতা মনে করতেন। ধর্মীয় টান থেকেই ডা. আনসারীর নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলমানেরা বলকান যুদ্ধে মেডিকেল টীম প্রেরণ করেছিলেন তুরস্ক বাহিনীর সেবার জন্য। কিন্তু এতে তাঁরা পরাজিতের গ্লানিই লাভ করেন। এরপর থেকে মুসলিম মধ্যবিত্ত ইংরেজ বিরোধী চেতনার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। নবগঠিত মুসলিম মধ্যবিত্তের মনে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করার যে বাসনা জেগেছিল, ইংরেজ শাসনাধীনে এবং তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থায় তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে পারছিলনা বিধায় তাঁদের চিত্তে অস্বস্তি ও বিক্ষোভ প্রবল হয়েছিল। যদিও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলাকালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে ১৯০৯ সনে সরকার পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলমানদের কিছু স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এসবে বরং তাঁদের দাবি জোরদারই হয়েছিল। ১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে গোটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুনরূপ ধারণের জন্য প্রস্তুত হয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দরুন সমাজব্যবস্থার ধরন এবং চেতনার স্তরও পাল্টে যায়। এই যুগেই ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন মহাত্মা গান্ধী (১৯১৫) এবং মুসলিম দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯১৬), আর কংগ্রেস নেতৃত্বে পিতা মতিলাল নেহেরুর স্থলাভিষিক্ত হন জওয়াহেরলাল নেহেরু।

গান্ধী-জিন্নাহ-নেহেরু সকলেই আধুনিক শিক্ষায় আলোকিত। দৃপ্ত সম্মোহনী রাজনৈতিক শক্তির ধারক ও বাহক। এঁদের সঙ্গে আছেন বাঙলার নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, এ.কে. ফজলুল হক, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ। বলকান যুদ্ধ (১৯১২), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮), সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (১৯০৮-১৮), হোমরুল-লীগ- (১৯১৬), লক্ষ্ণৌ-চুক্তি (১৯১৬), মন্টেগু-চেমস ফোর্ড সংস্কার (১৯১৭) প্রভৃতি একালের রাজনৈতিক উপলব্ধির দ্বার উন্মোচন করেই চলে। জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড (১৯১৯) সংঘটিত হবার পর সরকার বাধ্য হয়েই রাজকীয় ঘোষণা ও রাউলাট আইন পাশ করে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফত ও তৎসূত্রে অসহযোগ আন্দোলন দেশে নতুন বিপ্লবী ধারার সূচনা করে। আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে ১৯১৭-তে রাশিয়ার সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন-এর তখন নতুন প্রাণস্পন্দন লাভ এবং ভারতের কমিউ-নিস্টপার্টির প্রতিষ্ঠায় (১৯২১) পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এই তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক ইতিহাসের বিবরণ সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হলো :

১৯২২ সনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে একযোগে 'স্বরাজ্য দল' গঠন করেছিলেন। সুভাষ বসু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ অনেক যুবনেতা এই রাজনৈতিক দলে যোগদান করেছিলেন। ১৯২৩ সনের নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের নেতা হন চিত্তরঞ্জন দাশ। আবদুল করিম ছিলেন এর উদ্যোক্তা। চুক্তি অনুসারে আইন পরিষদের নির্বাচনে জনসংখ্যানুপাত ও পৃথক নির্বাচন স্বীকৃত হয়। মুসলমানদের কিছুটা সুবিধা দেওয়ায় এই চুক্তির এবং দেশবন্ধুর অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়। কিন্তু ১৯২৫ সনে দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে, কংগ্রেস নেতাদের সংকীর্ণ চিন্তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ রুদ্ধ হয় এবং হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয় পর পর তিনবার। পরবর্তী বছরগুলোতেও সাম্প্রদায়িক

www.pathagar.com

দাঙ্গার ধারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘাত ঘটানোর মধ্য দিয়ে অব্যাহত থাকে। এই সময়ে জোরদার হয় (হিন্দুদের) আর্য সমাজীদের 'শুদ্ধি' অভিযান এবং এর বিপরীতে মুসলমানদের 'তাবলিগ' ও 'তানজীম' আন্দোলন। হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম-বিদ্বেষ আর মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুর প্রতি অবিশ্বাসের এই চরম মুহূর্তে বাঙলায় ঘটে একের পর এক বহু ঘটনা। এই সময়ে মুসলমানদেরকে জয় করার জন্য 'হিন্দু-নারী অপহরণে'র জন্য দায়ী করে হিন্দুদের পত্রিকায় ব্যাপক প্রচারণা চালাতে দেখা যায়। এতে মুসলিমমনে হিন্দুর প্রতি ঘৃণা বাড়ে, কারণ বিষয়টি কোনও একক শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। অপরহরণ ধর্ষণ লুণ্ঠন এসবের পাণ্ডারা তাদেরই নিজস্ব শ্রেণীর, কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের নয় তারা।

এ সময়ে ব্যাপক ভিত্তিতে কৃষক সংগঠনও গড়ে ওঠে গ্রামাঞ্চলে। সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে এতে শ্রেণীচেতনা শাণিত হয়। বিভিন্নস্থানে রায়ত সভা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ সনে স্যার আবদুর রহিম, মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, শামসুদ্দীন আহমদ প্রমুখের উদ্যোগে প্রজা সমিতি গঠিত হয়। বগুড়ায় ১৯২৫ সনে রাজিবউদ্দিন তরফদারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠিত হয়। ১৯২৬ সনে গঠিত হয় 'কৃষক ও শ্রমিক দল'। রুশ বিপ্লবের ফলে এদেশে ধীরে ধীরে যে কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রভাব বিস্তার করছিলো, কৃষক ও শ্রমিক দল গঠনের মূলে ছিলো সেই ভাবধারার প্রভাব।[৩]

এই সময়ে বিভিন্ন জেলা মহকুমা প্রভৃতি অঞ্চলে গঠিত কৃষক সমিতির পতাকার রঙ ছিল লাল। কোনও কোনও স্থানীয় সমিতির লাল পতাকায় কাস্তে হাতুড়ির চিহ্নও ছিল। এক সময়ে 'প্রজা সমিতি' থেকে পৃথক হয়ে 'কৃষক সমিতি' এবং 'প্রজা সমিতি' আলাদাভাবে কাজ করতে থাকে। ১৯৩৪ সনে নিখিল বঙ্গ প্রজাসমিতির ঢাকা সম্মেলনে নাম বদল হয়ে 'নিখিল-বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি' হয় এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কৃষক প্রজা পার্টির কাজকর্ম শুরু হয়। এ.কে. ফজলুল হক তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সনে বিধান সভার সাধারণ নির্বাচনে এই পার্টি মুসলিম লীগকে পরাস্ত করে কৃষক প্রজা মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন।

শ্রেণী আন্দোলনের ভয়ে কংগ্রেসী নেতারা পৃথক কোনো আন্দোলন ও সংগঠন করতে দিতে চাইতেন না। বিপ্লব চিন্তা তাদেরকে আতঙ্কিত করতো। কিন্তু বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মিরা ১৯২৫-২৬ সন থেকেই কৃষকদের শ্রেণী আন্দোলন ও সংগঠন সম্বন্ধে চিন্তা করে আসছিলেন। ১৯৩৫ সনে সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করলে এর কর্মীরা কৃষক সংগঠনের কাজে মন দিয়েছিলেন।

১৯৩৪ সনে 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্যগণ কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন। এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এম. এন. রায়ের অনুগামী পার্টি ছাড়াও বামপন্থী আরো দুয়েকটি দল। বঙ্গীয়-কৃষক সভার ১৯৩৩ সনের একটি ঘোষণায় বলা হয়েছিল : 'ইহা কৃষকদিগকে তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিবে।[৪]

শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে ১৯২৮-২৯ নাগাদ বাঙলাদেশের গণআন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 'সাইমন কমিশন' নিয়ে আন্দোলন থেকে জন্ম নেয় 'স্টুডেন্টস ফেডারেশন'। কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা

www.pathagar.com

বিস্তারের দায়িত্ব নিল এই ফেডারেশন। 'বয়কট'কে কেন্দ্র করে জাতীয় নেতৃত্ব ভারতের সংবিধান রচনায় উদ্যোগী হন। তখন তাতে তাঁরা পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ১৯২৮–এর আগস্ট মাসে লক্ষ্মৌয়ে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। তাতে যোগ দিলেন কংগ্রেস, নিখিল–ভারত লিব্যারাল ফেডারেশন, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ। মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন। এবং সর্বদলীয় সম্মেলনে তা গৃহীত হয়। জনগণের নির্বাচিত আইনসভার সার্বভৌমত্ব এতে স্বীকৃত হয়েছিল।

কিন্তু সংবিধানের বিধানাবলি নিয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয় ১৯২৮ সনের ডিসেম্বরে। কলকাতার সর্বদলীয় কনভেনশনে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে এবং পাঞ্জাব ও বাঙলার প্রদেশিক কাউন্সিলে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাবৃদ্ধির দাবি তুললেন। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তাঁরাও উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। শিখেরাও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে বিশেষ প্রতিনিধিত্বের দাবি উত্থাপন করেন।

এ অবস্থায় মহাত্মা গান্ধীর ব্যবস্থাপনায় আপোসের মধ্যদিয়ে বিরোধের সমাধান করে আপাতত দলীয় ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা হলো। কিন্তু অচিরেই তা বাঞ্চাল হয়ে যায় এবং দুই ধারায় হলেও পরবর্তী কালে স্বাধীনতার সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। ১৯২৯ সনের ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির ঘন্টাধ্বনি যখন নতুন বছরকে (১৯৩০ কে) স্বাগত জানাচ্ছিলো—সেই বিরল মুহূর্তে ইরাবতী নদীর তীরে অগণিত জনতার সম্মুখে জওয়াহেরলাল নেহেরু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন এই ঘোষণা 'সহকারে যে,—আর যদি ব্রিটিশ শাসনের বশ্যতা স্বীকার করে চলা হয়, তাহলে মানুষ ও ঈশ্বরের কাছে আমাদের অপরাধী হতে হবে।'

এই বছরেই আর এক ভারতবর্ষীয় যুবক চৌধুরী রহমত আলী পরিকল্পনা করছিলেন 'পাকিস্তান'–এর। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের পর 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় আর সন্দেহ পোষণ করার কোনও কারণই রইল না।

তথ্যনির্দেশ

১. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র : সঞ্জিবনী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১১।

২. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দেমাতরম ও স্বদেশী–আন্দোলন (প্রবন্ধ), দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫।

৩. আবদুল্লাহ রসুল, ভারতীয় কৃষক সভার ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১৯–৩৯।

৪. উপরিউক্ত।

আরও সহায়ক গ্রন্থরাজি

১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ ঢাকা, ১৯৮৮।

২. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাঙলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪।

৩. আহমদ শরীফ, শিক্ষা : সেকালে ও একালে, ঢাকা ১৯৯২।

৪. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা–চেতনার ধারা, ঢাকা, ১৯৮৩।

৫. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, কলকাতা, ১৯৫৬।

৬. কাজী আবদুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ, কলকাতা, ১৯৪৯।

www.pathagar.com

৭. তারাপদ লাহিড়ী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নানা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৩।

৮. বিনয় ঘোষ, বাঙলার বিদ্বৎসমাজ, ৩য় মুদ্রণ কলকাতা, ১৯৮৭।

৯. বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে, স্বাধীনতা সংগ্রাম, (ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় অনূদিত) কলকাতা, ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৯১ ।

১০. নরহরি কবিরাজ, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা, কলকাতা, ১৯৫৭।

১১. রশীদ–আল ফারুকী, মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া, ঢাকা ১৯৮৭।

১২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাঙলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৮৭।

১৩. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ কলকাতা, ১৩৭২।

১৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংকৃতি শিল্প ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭৬।

১৫. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১–৪ খণ্ড) আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০০–১৪০৩।

১৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলকাতা ১৯৯৬।

১৭. শেখর দত্ত, তেভাগা–আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৬।

১৮. সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাঙলা সাহিত্য (১৩০৮–১৩২১), দ্বিতীয় সংস্করণ, পৌষ, ১৩৮৮।

১৯. স্বদেশী ও বিদেশী (সম্পাদকীয় আলোচনা), মাসিক মোহাম্মদী, ৬ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩৯।

www.pathagar.com

২. খ. বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি ও সাময়িকপত্র-সাধনার পরিচয়

১

ক. বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির বিশ শতকের ইতিহাসের আরম্ভ হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৈবেদ্য' ও নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' দিয়ে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স চল্লিশ পূর্ণ হয়েছে আর কাজী নজরুল ইসলামের শুভ জন্মানুষ্ঠান (১৮৯৯) সম্পন্ন হয়ে গেছে। বিশ শতকের সাহিত্য জগতের এই দুই মহাপুরুষের মধ্যমণি রূপে যিনি অবস্থান করছেন, তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৭)। নজরুলের আগেই তিনি বিপ্লবী বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে 'পথের দাবি' প্রভৃতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৩৭ সনে তাঁর তিরোধানের দশ বছরের মধ্যে 'বাঙলা উপন্যাসের দ্বিধা মুক্তি' ঘটে তিরিশের যুগের মানিক বিভূতি প্রেমেন্দ্র প্রমুখ কথা সাহিত্যিকদের কৃতিত্বে। আধুনিক বাংলা কবিতার রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের অবসানও চিহ্নিত হয় এ সময়ই।

'নৈবেদ্য' কাব্যে তথা তৎকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার ধারায় সেদিন যে স্বদেশ চেতনা প্রকাশ পায়, তা সেদিনের স্বদেশী আন্দোলনকে বেগবান করেছিলো। কত কর্মী ও সাহিত্যিক যে সেদিনে এ দ্বারা জীবনের নতুন ব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তার ইয়ত্তা নেই।[১]

সাহিত্য-স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব ও শ্রেণীচরিত্রের বিশ্লেষণকারী সমালোচকগণ লক্ষ্য করেছেন, মানুষের জীবনই চিরকাল শিল্প সাহিত্যের উৎসরূপে কাজ করেছে। অর্থাৎ মানুষের জীবনই শিল্পীর ইন্দ্রিয় স্নায়ু ও মস্তিষ্কে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে শিল্পের ও সাহিত্যের সৃষ্টিকে সম্ভব করে তুলেছে। সাহিত্য শিল্প তাই মানব জীবনের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তখনকার বাস্তব জীবনে দেখা গিয়েছিলো স্বদেশী আন্দোলনরত হিন্দু, আর আত্মসচেতন মুসলমান—মনের দিক থেকে ক্রমাগত ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এ সময়ের জাগ্রত দেশাত্মবোধে ছিল হিন্দু-ঐতিহ্যগর্ব। মুসলমানদের কাছে তা পাল্টা মুসলিম-ঐতিহ্যে জাগ্রত হবার প্রেরণা নিয়ে হাজির হয়েছিলো। এই সময়ের বিচিত্র ঘটনা ভারতবর্ষের সংবাদপত্রকেও নতুনরূপ দান করেছিলো। আন্দোলন, বিপ্লব, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনা ও অভ্যুত্থান দ্বারা আলোড়িত বিশ শতকের ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রশ্নসমূহ ব্যাপকভাবে বিশ্লেষিত হয়। 'ডন', 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম', 'সঞ্জীবনী', 'আনন্দবাজার' প্রভৃতিসহ হিন্দু ও মুসলমানের ঐ কালের চালু পত্রিকাগুলোতে স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রাম এমন রূপ পরিগ্রহ করে যে, সরকার সংবাদপত্র দলন অভিযানকে আরও বলশালী করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পত্রিকার সংখ্যা বেড়েই চলে। (গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিশ শতকের প্রথমার্ধের পত্রিকার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা সংযুক্ত আছে)।

নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন এবং উনিশ শতকের ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত ভারতী, সাহিত্য, প্রভৃতি ; আর প্রবাসী, ভাণ্ডার, নব্যভারত, সুপ্রভাত, বসুধা, বান্ধব, আরতী, অর্চনা, মানসী ও স্বদেশীতে যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়—আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে তা এক মূল্যবান সম্পদ। কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, রজনীকান্ত সেন, গোবিন্দচন্দ্র রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার,

www.pathagar.com

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, অতুলপ্রসাদ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রমণীমোহন ঘোষ, রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত, জীবেন্দ্র কুমার দত্ত, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় যে সাহিত্য সম্পদ সংযোগ করেন তা-ই বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রধানতম উপকরণ।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সখারাম গনেশ দেউস্কর, শিবনাথ শাস্ত্রী, দেবপ্রসন্ন রায় চৌধুরাণী, বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নিখিলনাথ রায় যে-সমস্ত প্রবন্ধ এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, গঙ্গাচরণ নাগ, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ গল্প ও উপন্যাস লিখে বাঙালির চিত্তলোককে বিকশিত করেছিলেন।[২]

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙালি সাহিত্যিক ও পত্রপত্রিকার সম্পাদকগণ যে-ভাবে নতুন নতুন পত্রপত্রিকার প্রকাশ ঘটিয়ে সৃজনধর্মী এবং স্বদেশপ্রেমমূলক সাহিত্য শিল্প গল্প উপন্যাস কবিতা ও গানের দ্বারা 'বাঙ্গালার দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন'—প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের বৃহত্তর বিপ্লবে, 'যে কোনও কারণেই হউক তাঁহারা ঠিক সেভাবে সাড়া দেন নাই। একমাত্র কবি নজরুলই ছন্দে ও গানে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন'। এজন্য একালের আন্দোলনসমূহের চারণকবি ও সার্থক রূপকার নজরুলকেই 'বলা যাইতে পারে'। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন :

> বাঙলাদেশের মত অনড় জড় দেশকে জাগাইবার জন্য যে আবেগময় উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্যার প্রয়োজন ছিল কবি নজরুলের মধ্যে তাহার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। বিদগ্ধজনের সংযম ও সূক্ষ্মতা তাহাতে ছিল না, হয়তো বন্যার আবিলতা ছিল কিন্তু তাহাতে কিছুই আসে যায় না। কূলভাঙ্গা আবেগের ধাক্কায় এই অনড় জাতিকে প্রাণ স্পন্দনে চকিত হইয়া উঠিতে আমরাই দেখিয়াছি। কবি নজরুল ইসলামের 'বিষের বাঁশী' এই থর থর প্রাণ স্পন্দনগুলোর গান। ইহার আঘাত সরকার সহ্য করিতে পারেন নাই।[৩]

খ. উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষীগণ কার্ল মার্কসের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী না-হলেও মার্কসীয় ধন-সাম্যের আদর্শ তাঁদেরকে আকৃষ্ট করেছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে মার্কসীয় চিন্তাধারা কংগ্রেসের সদস্যদের একাংশের মধ্যে, পরে সারা ভারতে ছড়িয়েছিল। দেশের বাইরেও ভারতীয়রা সংঘবদ্ধ তৎপরতা আরম্ভ করেছিলেন। প্রমাণ 'বার্লিন কমিটি' (১৯১৫-১৮)। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই রুশ-বিপ্লব সংঘটিত হয় (১৯১৭) এবং তা ভারতীয়দের সমর্থন লাভ করে।

তাসখন্দে ১৯২০ সনের ১৭ অক্টোবর এবং ভারতে ১৯২১-এ ভারতীয় বিপ্লবীদের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। কমিউনিজম-ভীত ইংরেজ শাসক প্রথমাবধিই এর প্রতি বিরূপ ও সতর্ক ছিলেন। তাঁরা গান্ধী ও জিন্নার মাধ্যমে অহিংস ও চরকার, আর ইসলামের ধোয়ায় এদেশবাসীর দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ত্রিশের দশকে

www.pathagar.com

বাঙলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যে সোভিয়েট বিপ্লব ও রুশ-সাহিত্যের চর্চা ব্যপ্তি লাভ করে এবং কমিউনিস্টরা একটি উদীয়মান শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৩০ সনে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি' আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাঙলা সাময়িক-সাহিত্যেও সমাজবাদ, মার্কসের মূলনীতি, রুশ বিপ্লবের বাস্তব অভিজ্ঞতা, লেনিনের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সোভিয়েট সমাজের গঠনপদ্ধতি, সাফল্য এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা, নতুন সমাজ গড়ার প্রকল্প ও সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশ পেতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী পীড়নে নিষ্পেষিত ভারতীয়দের মনে স্বভাবতই জাগ্রত হয়েছিল সামাজিক পুনর্গঠনের এবং শোষণ অবসানের সংগ্রামী প্রেরণা। শুধু বাংলা পত্রিকাই নয়, 'হিন্দুস্থান রিভিউ', 'মডার্ণ রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকায়ও এ আদর্শ প্রচারিত হতো।[৪]

'বাংলা সাময়িকপত্রে রুশ-বিপ্লবের সাদর সমর্থন বিপুল আকার ধারণ করে ১৯১৭-১৮ সনেই। দৈনিক বসুমতি (১৭ নভেম্বর, ১৯১৭), সাপ্তাহিক মোহাম্মদী (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮), প্রবাসী, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, সংসঙ্গী, বিজলী, শঙ্খ, ধূমকেতু,সংহতি, ঢাকার বাঙলার বাণী এবং কল্লোল, প্রগতি, পরিচয়, অগ্রগতি, নোয়াখালীর 'দেশের বাণী' প্রভৃতি নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে মার্কসবাদকে প্রসারিত করার কাজ করেছে। লাঙ্গল এবং গণবাণী প্রকৃতই কমিউনিস্ট পত্রিকা ছিল। 'লাঙ্গল' রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভ করেছিল। এদেশে কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রচারের কাজে লাঙলই সম্ভবত প্রথম সার্থক বাংলা সাময়িক পত্রিকা। মুসলিম মনীষীরাও মার্কসবাদের চর্চায় পিছিয়ে ছিলেন না। মনীষী আবুল হুসেনের 'বাঙলার বলশী' গ্রন্থ তার বড়ো প্রমাণ।

গ. বিশ শতকের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-ভাবনায় প্রগতিশীল ধারার নেতৃত্বদান করে 'সবুজপত্র' (১৯১৪), কল্লোল (১৯২৩), প্রগতি (১৯২৭), শিখা (১৯২৭), কালিকলম (১৯২৭), ধূপছায়া (১৯২৭) প্রভৃতি। আরো একগুচ্ছ পত্রিকা সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অগ্রগতির সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে উল্লেখযোগ্যতা অর্জন করে প্রধানত বঙ্গদর্শন-ভারতী-সবুজপত্র-কল্লোল-শিখার ধারাকে পুষ্ট করার কৃতিত্বে। এই সমস্ত সাহিত্য-পত্রিকা প্রাণরস আহরণ করে জয়দেব, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখের কালজয়ী সৃষ্টিসম্ভার থেকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব সাহিত্যের প্রাণসম্পদ ও স্পন্দনও তাঁরা স্বীকার করে নেন। ফলে সাহিত্যশিল্পের দর্শনে, চিন্তাচেতনায় বিপ্লব ঘটে। রবীন্দ্রপরবর্তীকালের সাহিত্যের নতুন সুরটি বেঁধে দিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। আলো ও আঁধারের রহস্য মিতালীর মধ্যে একটি বিদ্যুৎ ঝলকের মতোই তিনি বাঙলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন : 'আমাদের জল ভারানত নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সাহিত্য জীবনের মধ্যে এই বিদ্যুৎ ঝলক এক তীব্র জ্বালাময় জ্যোতির প্রকাশ ঘটালো। তাতে জীবনের পুঞ্জিভূত বেদনা ও মদির বিহ্বল স্বপ্ন মুহূর্তের মধ্যে স্বচ্ছ ও লঘু তরল হয়ে গেলো। এই কর্মে 'সবুজপত্র' তাঁর হাতিয়ার হয়েছিল।[৫]

বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাচক্রের ভাবাবর্তে বাঙালির মনোজগতের ভিত্তিভূমি ধ্বসে গিয়েছিলো। এই কারণেই তখন বাঙলাদেশে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয়েছিল মানসিক সংগঠনের। বর্তমান দুনিয়ার বাতিলকৃত হৃদয়-ধর্মের স্থলাভিষিক্ত বুদ্ধিবাদ, যুক্তিশীলতা এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে মূলমন্ত্র করে সবুজপত্র যুগগত বুদ্ধিবাদকে, মননশীলতাকে বাঙলাদেশে প্রচার

www.pathagar.com

করেছে। তাছাড়া বিশ শতকের বাঙলাদেশে আবিষ্কার হলো গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, প্রগতিবাদ, যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবি। প্রগতিবাদ প্রচারে সহায়তা করেছে কল্লোল প্রভৃতি এবং সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করেছে লাঙল-গণবাণী-সংহতি-পরিচয় প্রভৃতি। সবুজপত্র প্রগতিশীলতার যে ধারা সাময়িকপত্রে যোজনা করে দিয়ে যায়, বিশ শতকের গোটা প্রথমার্ধে সেটাও ছিল প্রধানতম একটি ধারা। হিন্দু ও মুসলিম পুনরুত্থানবাদী ধারার পাশাপাশি সৃজনশীলতা ও চলিষ্ণুতার বিবেচনায় এই স্বতন্ত্র ধারার কথাও মনে রাখতে হয়—যদিও মার্কসবাদী ধারার সঙ্গে সবুজপত্রের ধারার কাজকর্ম, সৃজন-পোষণের মিল রয়েছে।

কিন্তু একটি সূক্ষ্ম অমিলও এতে বর্তমান বলে বিশ শতকের সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রবণতার আলোচনায় সবুজপত্র কল্লোল প্রগতি-কালিকলম পরিচয়-অগ্রগতি-কবিতা চতুরঙ্গ প্রভৃতির স্বকীয়তামণ্ডিত ধারাটির কথা আলাদাভাবেই মনে রাখতে হয়। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণের এক বৃহৎ অংশ হিন্দু-পুনরুত্থানবাদীদের প্রত্যুত্তরে যেমন মুসলিম-জাগরণবাদী সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা করেছেন, তেমনি সবুজপত্র-কল্লোলের ধারার চেতনা দ্বারাও পুষ্টিলাভ করেছেন প্রগতিবাদী চিন্তাবিদেরা। শিখা-বুলবুল-সওগাত-চতুরঙ্গ-মৃত্তিকা প্রভৃতি পত্রিকার আলোচনাই একথার প্রমাণ দেবে।

২

উনিশ শতকের হিন্দুজাগরণের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় কিভাবে মুসলিম সমাজের ভেতরে চঞ্চলতা ফিরে এল, গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সে কথা বলা হয়েছে। পত্র-পত্রিকা বের করে বাঙালি মুসলমানেরা সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা তথা মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় তাঁরা দক্ষতা দেখাতে পারেন নি। ১৯৩০ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে এই বিতর্ক অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে চলেছিলো যে, তাঁদের মাতৃভাষা কি হওয়া উচিত-উর্দু না বাংলা ! ১৯২৭ সনে প্রকাশিত 'শিখা' এবং ১৯৩৩ সনের 'বুলবুলে'ও এই বিতর্ক চলে বলে অনুমান করা চলে যে, বাংলা সাহিত্যচর্চায় মুসলমানেরা কেনো দক্ষতা দেখাতে দেরী করেছিলেন।

তাছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের কালে হিন্দু মুসলমানের পক্ষ পৃথক হয়ে পড়ায় আর বঙ্কিম সাহিত্যে তা প্রকটভাবে প্রকাশ পাওয়ায় মুসলমানেরা তাঁকে সহজভাবে নিতে পারেননি। কারণ বঙ্কিম সাহিত্যের সত্যকার প্রতিপাদ্য মানবতা হলেও তিনি ছিলেন প্রবল ভাবে হিন্দুত্বের প্রচারকও। একালে তাঁর প্রচারক ভূমিকাই কার্যকর ভাবে অনুসৃত হয়েছে। ফলে হিন্দু সমাজে প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা কীর্তন যেমন হয়েছে, তেমনি এই একই কারণে তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে নিন্দাও কুড়িয়েছেন। বঙ্কিম বিরোধিতার প্রচণ্ডতা আরম্ভ হয় বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাবার পরে, এর লিখিত সমালোচনা চলে কবি মোজাম্মেল হক থেকে আরম্ভ করে ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ইদ্রিস আলী পর্যন্ত। অনেকেই অকথ্য ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রকে গালিগালাজ করেছেন। ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন বঙ্কিম-সমালোচনার সিরিজ বের করেছিলেন খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে।

'আনন্দমঠ বা নন্দের ফন্দী' (১৯২২)-র প্রচ্ছদে লেখা ছিল : 'দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ/রাজবুদ্ধির অর্জন/দাসবুদ্ধির বর্জন—বঙ্কিম-সমালোচনা যে পড়িবে, সেই করিবে'। নিবেদনে বলা হয়েছিল-'...যেন হিন্দু রচিত কোন গ্রন্থ মুসলমানদিগকে পড়ান না হয়। আর

www.pathagar.com

যদি একান্তই পড়ান হয় তবে হুজুগ উঠিলে সে দোষ তোমার'। ডা. সৈয়দ আবুল হোসেনের বঙ্কিম–সমালোচনার নমুনা রয়েছে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের ওপর ছোট ছোট স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশ করে ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হয়। উল্লেখ্য, বঙ্কিম বিদ্বেষী আবুল হোসেনের পাঁচটি বইই বের হয় ১৯২২ সনে, আর একটি ১৯২৭ সনে। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'রায়–নন্দিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৯২৮ সনে। ১৯৩৮ সনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অনুসারি বুদ্ধিজীবী লেখকেরা মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে আনন্দমঠের বহ্নুৎসব করেন কলকাতায়। মুসলমানদের বঙ্কিম বিদ্বেষের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই ঘটনায়, মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে। কংগ্রেসী মুসলমানেরা এই সমস্ত ঘটনাকে অনুমোদন করতে পারেননি।

পশ্চিমবঙ্গ বহরমপুরের রেজাউল করিম (১৯০৩–৯৫) এবং কাজী আবদুল ওদুদের ন্যায় পণ্ডিতবর্গ সেদিন এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে লিখেছিলেন অনেক। কাজী আবদুল ওদুদের 'শাশ্বতবঙ্গ' গ্রন্থে এবং রেজাউল করিমের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমানসমাজ' এ মুসলমানদের এই নিন্দনীয় কাজের সমালোচনা করা হয়েছে। হিন্দু সমাজের একশ্রেণীর লেখক বুদ্ধিজীবীও (প্রধানত তরুণ) বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। 'অগ্রগতি' পত্রিকায় 'বঙ্কিম কি মারা গেছেন?' শীর্ষক একটি কড়া সমালোচনা লিখেছিলেন নির্মলঘোষ দস্তিদার। এই লেখার কারণে মামলা দায়ের হয় কলকাতার কোর্টে। 'দৈনিক আজাদ' এটি পুনর্মুদ্রণ করে এবং মামলার বিষয়েও তাঁরা ইন্টারফেয়ার করেন।[৬]

তবে হিন্দু–মুসলমানের মিলনের জন্যও চেষ্টা কম হয়নি। কাজী নজরুল ইসলাম, প্রমথ চৌধুরী, কাজী আবদুল ওদুদের রচনার উল্লেখ করলেই এঁদের প্রচেষ্টার কথা মনে আসে। অপ্রধান লেখকেরাও এতে অংশগ্রহণ করেছেন—শ্রীবিপিনচন্দ্র সরকার 'দেশের গীতি' নামে বই লিখে প্রকাশ করেছিলেন (১৩৩০ কলকাতা)। 'হিন্দু মুসলমান' শীর্ষক গানটির কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করলেই এ–ধারার সাহিত্যপ্রয়াসের স্বরূপ বোঝা যায় : 'হিন্দু মুসলমান, দেশের কল্যাণ/যদি কর বাসনা ; ভাই ভাই মিলি শুদ্ধ নিরিবিলি,/মনে প্রাণে মেশ না'।[৭]

হিন্দু–মুসলমানের বিরোধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন অনেক লেখক সাহিত্যিক, আবার সম্প্রীতি বর্ধনের চেষ্টাও করেছেন বহু জনে। একালে (১৮৭০–১৯৩০) মুসলমান সমাজে সাহিত্যিকদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায়, হিন্দুদের মধ্যেও উনিশ শতকের ধারায় লেখকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেই চলে। সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধীর দে প্রমুখের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ ও আলোচনাদিতে হিন্দুদের রচিত সাহিত্যের বিশদ বিবরণ সুলভ। মুসলমান সাহিত্যিকদের কর্ম ও সৃজনের বিবরণ দিয়েছেন মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আহমদ শরীফ, কাজী দীন মুহম্মদ, কাজী আবদুল মান্নান, আনিসুজ্জামান, ওয়াকিল আহমদ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ।

১৯৩০ পর্যন্ত যেসমস্ত মুসলিম লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁদের শ্রেণীকরণ করা আছে নানা দৃষ্টিকোণে মুসলিম গবেষকদের গ্রন্থাদিতে। ফলে বিস্তৃত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বলা যায়, প্রধান ও অপ্রধান প্রায় দেড় শতাধিক মুসলিম কবি সাহিতিক সাংবাদিক বাংলা সাহিত্যের মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রভূমি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মীর মশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী' ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, আর এ

www.pathagar.com

ধারায় লিখেছিলেন পরে পরে যাঁরা তাঁরা হলেন—কায়কোবাদ, শেখ আবদুর রহিম, মোজাম্মেল হক, আকরম খাঁ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বেগম রোকেয়া, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, ডা: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, এস. ওয়াজেদ আলি, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, নজীবর রহমান, শেখ ফজলুল করিম, কাজী ইমদাদুল হক, একরামুদ্দীন, শেখ হবিবর রহমান, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, শেখ মুহম্মদ ইদ্রিস আলী, খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ, মুহম্মদ হেদায়েতউল্লাহ, সৈয়দ এমদাদ আলী, ফজলুর রহীম চৌধুরী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, মিসেস এম. রহমান, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, শেখ আবদুল জব্বার, মুহম্মদ বরকতুল্লাহ, কাজী আকরম হোসেন, ইব্রাহীম খাঁ, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম, মাহবুবউল আলম, ওহীদুল আলম, দিদারুল আলম, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, জসীমউদ্‌দীন, মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল ফজল, হুমায়ুন কবির, আবদুল কাদির, মুহম্মদ আজরফ, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার, শামসুন্নাহার মাহমুদ, আকবরউদ্দীন, কাজী কাদের নওয়াজ, বেনজীর আহমদ, বন্দে আলী মিয়া প্রমুখ।

এই তালিকা দীর্ঘতর করা চলে আগেই বলা হয়েছে। তবে সে প্রয়োজন নেই, এখানে মুখ্য প্রয়োজন কেবল এটাই স্পষ্ট করে তোলা যে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাংবাদিকতা, সাময়িকপত্র প্রকাশ এবং বিভিন্ন সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক সংগঠন (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রভৃতি, বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ওয়াকিল আহমদ, খোন্দকার সিরাজুল হক, রেজোয়ান সিদ্দিকী ও অন্যান্যের প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলি) ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে প্রতিভা দক্ষতা নিয়ে একযোগে কাজ আরম্ভ করায় বাঙলার জাগরণে মুসলমানদের অংশগ্রহণ লক্ষ্যযোগ্য, শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে ত্রিশের প্রান্তে এসে। কাজী আবদুল ওদুদ 'বাঙলার জাগরণ' শীর্ষক গ্রন্থে ১৯২৬ সনে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র চিন্তা ও কার্যাবলির মাধ্যমে রামমোহন রায় কর্তৃক সূচিত নবজাগরণের সাধনায় বাঙলার মুসলমানেরা সামিল হলেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, ১৯০৩ সনে 'নবনূর' প্রকাশের মাধ্যমে মুসলমানদের এই জাগরণের সূচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশের পর যেমন ঘটেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, তেমনি ১৯২৬ সনে এবং তারপরে মুসলিম জাগরণে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

তথ্যনির্দেশ

১. কাজী আবদুল ওদুদ, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, শাশ্বতবঙ্গ, ঢাকা ১৯৮৩ (২য় ব্রাক সংস্করণ), পৃ. ৭৪।

২ সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৩০৮–১৩২১), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা পৌষ, ১৩৮৮, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩. সজনীকান্ত দাস, 'বিশের বাঁশী', গুলিস্তাঁ, ৪ বর্ষ, নজরুল সংখ্যা, ১৩৫২।

৪. সাঈদ উর রহমান, বাঙলায় মার্কসবাদী চিন্তার বিকাশ ও প্রসার (প্রবন্ধ) বাঙালীর চিন্তাধারা : আধুনিক যুগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০, এবং

www.pathagar.com

ক. বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লোক শক্তির উৎস, লোক শক্তির উন্মেষ, কলকাতা, ১৩৮৭।

খ. সুশোভন সরকার, বাঙলা সাময়িকপত্রে রুশ বিপ্লবের প্রথম দশক, প্রসঙ্গ ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৩।

গ. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা ১৯৭৭।

ঘ. আমজাদ হোসেন, বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২১ নভেম্বর, ১৯৮৬।

ঙ. আহমদ শরীফ, বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৭।

৫. অজিতকুমার ঘোষ, বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, কলকাতা ১৯৬৮, পৃ. ৪১১-২৫।

৬. আশু চট্টোপাধ্যায়, কল্লোল যুগের পরে, কলকাতা, ১৯৯৩ এবং এতদসঙ্গে ইসরাইল খান প্রণীত তিরিশের দশকের সাহিত্যান্দোলন ও সাপ্তাহিক অগ্রগতি, (প্রবন্ধ) লোকায়ত, ঢাকা, ১৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৫ দ্রষ্টব্য।

৭. বিপিনচন্দ্র সরকার, দেশের গীত, রঘুনাথগঞ্জ, ১৩৩০ (ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতায় সংরক্ষিত)। এবং আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত, 'বঙ্কিমচন্দ্র সার্ধশত জন্মবর্ষে', ঢাকা ১৯৯০।

www.pathagar.com

২.গ. মুসলিম সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার উদ্ভব ও বিকাশ
(১৯৩০ পর্যন্ত)

বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাময়িকপত্র সাধনার ধারায় দেখা যাচ্ছে, মুসলমানের অংশগ্রহণ ঐ সময়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে প্রকাশিত, মুসলিম সম্পাদিত সাহিত্যপত্রিকাগুলো বাংলা সাহিত্যের বিকাশে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে—তার পশ্চাৎভূমি তৈরি করেছিলো যে-সকল ক্ষীণপ্রাণ, অব্যবসায়ী, সংবাদ প্রধান পত্রিকা, সে সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করা হয়েছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ অর্জন (১৯১৩), সবুজপত্র (১৯১৪), কল্লোল (১৯২৩), প্রগতি (১৯২৭) প্রভৃতি যখন প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় হিন্দু সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এক অর্থে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এমনকি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে ভারতবর্ষের উড়িষ্যা, কেরালা, কন্নড় প্রভৃতি অঞ্চলে, অপরাপর ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি এবং নতুন নতুন পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে, তখন মুসলমানদের প্রথম বিখ্যাত আধুনিক পত্রিকা 'সওগাত' এ পরামর্শ দেয়া হচ্ছিলো মুসলিম সাহিত্যিক, নব্য লিখিয়েদেরকে যে, যাঁর যাঁর মেধার বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষেত্র নির্বাচন করে যেন তাঁরা সাহিত্য রচনা করেন। অচিরে যাতে মুসলিম লেখকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে বাংলা কবিতা, গল্প, উপন্যাস নাটক ও প্রবন্ধ সাহিত্যে সাফল্য অর্জন করতে পারেন। যদিও এই সময়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, কাজী আবদুল ওদুদ, এস. ওয়াজেদ আলি, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখ মনীষী স্বকীয় সাধনা বলে সারা বাঙলার সাহিত্যামোদীদের কাছে এবং শিক্ষিত সমাজে সাহিত্যিকের সুনাম অর্জন করেছেন এবং ১৯৩০ সনে কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতার অ্যালবার্ট হলে সর্বশ্রেণীর বাঙালি কর্তৃক সংবর্দ্ধিত হয়েছিলেন।

কিন্তু সার্বিকভাবে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের সাহিত্যিক অবদান তখনও ছিল প্রায় এক নিঃশ্বাসে বা এক বৈঠকে বলে শেষ করার মতো। ১৯৩০ সনের পর আর এই অবস্থা রইলো না। প্রয়োজন হলো বহুমুখী বিশ্লেষণের। তবে এর পশ্চাতে রয়েছে অনবদ্য ভূমিকা মুসলিম সম্পাদিত কতিপয় সাময়িকপত্রের। সেসবের বিবরণও সহজলভ্য এখন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১–১৯৫২), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও আনিসুজ্জামানের গবেষণাগ্রন্থাদির কল্যাণে।

একথা সুবিদিত যে উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগরণ মুসলমান সমাজকে স্পর্শ করেনি, এই জাগরণ কর্মে তাঁদের অবদানও ছিল অতি নগণ্য। বাঙলার জাগরণের মহাপুরুষ, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের প্রধানতম বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮–৯৪) বঙ্গদর্শন (১৮৭২) প্রকাশের সময় পর্যন্তও মুসলমান সমাজ থেকে কোনো সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এর দু বছর পর ১৮৭৪ সনে বঙ্কিম প্রভাবিত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮–১৯১২) তাঁর স্ত্রীর নামানুসরণে 'আজিজন নেহার' সম্পাদন ও প্রকাশ করেছিলেন। দুটো পত্রিকার নামকরণেই চেতনার তারতম্য ও বৈলক্ষণ্য প্রতিভাত হয়। এর

www.pathagar.com

আগে মুসলমানদের তিনটি পত্রিকা প্রকাশের তথ্য রয়েছে—১৮৩১ সনের 'সমাচার-সভারাজেন্দ্র', ১৮৪৬ সনের 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' এবং ১৮৬১ সনের 'ফরিদপুর দর্পণ'।

উনিশ শতকে বের হয় আর যে সমস্ত পত্রিকা সেগুলো হলো-'পারিল বার্ত্তাবহ' (১৮৭৪, পাক্ষিক সংবাদপত্র) ; মহাম্মদি আখবার (১৮৭৭, অর্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র) ; মুসলমান (১৮৮৪, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র) ; আখবারে এসলামীয়া (১৮৮৪, ধর্ম বিষয়ক মাসিক) ; ইসলাম (১৮৮৫, মাসিক সাহিত্যপত্র) ; মুসলমান বন্ধু (১৮৮৫, মাসিক) ; আহমদী (১৮৮৬, ধর্ম ও সমাজবিষয়ক, পাক্ষিক) ; নব সুধাকর (১৮৮৬, সাপ্তাহিকী) ; হিন্দু-মোসলমান সম্মিলনী (১৮৮৭, মাসিক) ; গুরুচরণ (১৮৮৯, সাপ্তাহিকী) ; সুধাকর (১৮৮৯, সাপ্তাহিকী); ভারতের ভ্রম নিবারণী ত্রৈমাসিক পত্রিকা (১৮৮৯) ; হিতকরী (১৮৯০, পাক্ষিক) ; ভিষক দর্পণ (১৮৯১, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক) ; ইসলাম প্রচারক (১৮৯১, ধর্ম ও সমাজবিষয়ক মাসিক) ; মিহির (১৮৯২, বিবিধ বিষয়ের মাসিক) ; হাফেজ (দু পর্বে প্রকাশিত হয় শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায়-প্রথমে ১৮৯২-এ, পরে ১৮৯৭-এ। কোনোবারেই স্থায়ী হয়নি। তবে সম্পাদকের নামডাক ও সাহিত্যিক-কৃতিত্বের জন্য 'হাফেজ' ইতিহাসে স্থায়িত্ব লাভ করেছে) ; টাঙ্গাইল হিতকরী (১৮৯২, সাপ্তাহিক) ; মিহির ও সুধাকর (১৮৯৫, সাপ্তাহিক) ; কোহিনূর (১৮৯৮, মাসিক সাহিত্যপত্র) ; প্রচারক (১৮৯৯, মাসিক) ; ইসলাম (১৯০০, ধর্মবিষয়ক মাসিক) ; লহরী (১৯০০, মাসিক) ; নূর অল ঈমান (১৯০০, ইসলামী পত্রিকা) ; ইসলাম রবি (পূর্বোক্ত) প্রভৃতি।[১]

উনিশ শতকে প্রকাশিত উপরিউক্ত পত্রিকার অধিকাংশই সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। অধিকাংশই ছিল ক্ষীণকায়, স্বল্পপ্রাণ, সংবাদধর্মী এবং মফস্বল থেকে প্রকাশিত। তবে মোটেই না থাকার চেয়ে কিছু একটা থাকা ভাল—এই বিবেচনায় মুসলমানদের কালিক চাহিদা পূরণ করে খ্যাতি অর্জন করেছিল সুধাকর, হিতকরী, ইসলাম প্রচারক, মিহির, হাফেজ, কোহিনূর প্রভৃতি। বিশ শতক আরম্ভ হবার পূর্ববর্তী এক দশক কালের মধ্যেই এগুলো প্রকাশিত হয়। এবং বিশ শতকের সূচনার দশকটি ছিল মুসলিম সম্পাদিত পত্রপত্রিকার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। এই সময়ে উপরিউক্ত পত্রিকাগুলো নতুন প্রাণশক্তি ও জীবন ভাবনা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিলোই, এর সঙ্গে যুক্ত হলো সোলতান (১৯০১) ; নবনূর (১৯০৩) ; বাসনা (১৯০৮) ; সাপ্তাহিক মোহাম্মদী (১৯০৮) প্রভৃতি।

বঙ্গভঙ্গ নিরোধ আন্দোলন সফল হবার পরে (১৯১১) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধচলাকালীন সময়ে মুসলমান সম্পাদিত পত্র পত্রিকার জগতে যেমন, তেমনি মুসলিম সাহিত্যিকদের মনোজগতেও একটা ধাক্কা লাগে। সকলে যেন হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে যান। মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) এই পরিস্থিতিতে লিখেছিলেন :

> কুক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য গগণের ভাস্কর 'নবনূর' এর জীবন দায়িনী হৈমচ্ছটা অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে।—সেই হইতে এই যে দিনে দিনে 'একে একে নিবিছে দেউটী'—আর তাহা জ্বলিল না! তারপর হাস্য প্রভাসিত 'সুধাকর' পুঞ্জ পুঞ্জ কাদম্বিনীর অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়াছে, শক্তি শেখর 'সোলতান' নির্বাসিত ও সমাহিত হইয়াছে, বাস বিলসিত 'বাসনা'র কোমল মধুর দাম আতপতাপে শুকাইয়া পড়িয়াছে। এমনি করিয়া ধীরে-ধীরে যে অবসাদের অন্ধকার বঙ্গীয় মোসলেম গগণ ঘিরিয়া কালরাত্রির সৃজন করিয়াছে, তাহার মোহ ও আবেশ, জড়তা ও সুপ্তি, বিষের ন্যায় সাহিত্যিককে নিঃসঙ্গ করিয়া

www.pathagar.com

রাখিয়াছে। কুঞ্জকাননের কলকণ্ঠ কোকিলের স্বর লহরী স্তব্ধ হইয়াছে ;...বঙ্গীয় মোসলেমের যে সাহিত্য কানন আজ বিচিত্র...সমৃদ্ধ দেখিতে আশা করিয়াছিলাম, তাহা কোন্ দোষে এত শীঘ্র শুষ্ক হইয়া গেল? জানি না, মুসলমান সাহিত্যিক ও লেখকগণ কি কারণে এত শীঘ্র সাহিত্য সাধনা পরিত্যাগ করিয়া...আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন ও আত্মগোপন করিয়াছেন।...[২]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নানান পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিয়োজিত শ্রেষ্ঠ শিল্পী সাহিত্যিকদের কর্মগুলোকে সামনে রেখে মুসলমানদের নিশ্চেষ্ট ঔদাসীন্যে ব্যথাতুর মনীষীর আক্ষেপ :

'চারিদিকে বঙ্গ সাহিত্যের নানাদিক প্রসারিণী গতি, বিবিধ বিচিত্র রঙ্গ, নিত্যনূতন কলাশিল্পের শোভা স্পন্দনের মধ্যে মোসলেম লেখকবৃন্দের এই নিশ্চেষ্ট উদাসীন ভাব কি বেদনাদায়ক।...যাঁহাদের লেখনীর অপূর্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া হিন্দু সাহিত্যক মণ্ডলী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন ;...তাঁহারা কোথায় প্রস্থান করিলেন?...বঙ্গব্যাপিয়া কি আজ অসংখ্য সাহিত্যপত্রিকা বিদ্যমান নাই?'

...ইচ্ছা থাকলে প্রবাসী, ভারতী, কোহিনূর, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি মাসিকের পৃষ্ঠায় লিখে যাঁরা 'কল্যাণসাধন' করতে পারতেন, তাঁরা নিষ্ক্রিয় থেকে 'ঘোরতর পাপ' এবং 'অমার্জনীয় অপরাধ' করছেন বলে মন্তব্য করে এয়াকুব আলী চৌধুরী তাঁদেরকে, মাতৃভাষার চর্চায় মনোযোগী হবার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারণ, 'চিরদিন মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় এবং সাধনায় জাতি উঠিয়াছে, এখনও উঠিবে।'[৩]

এই ধরনের অনুপ্রেরণাদায়ক রচনাবলিতে যেন ফল হলো। কালের স্বাভাবিক নিয়মেই মুসলমান সমাজে আশ্চর্যজনক এক পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেল। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কতিপয় মুসলমানের কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হলো—যার মূল্য সকলেই স্বীকার করলেন। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬) সাহিত্য ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করায় মুসলমানদের হীনমন্যতা দূরীভূত হতে আরম্ভ করলো। এই দশকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধানতম নেতা কমরেড মুজফফর আহমদ (১৮৮৯–১৯৭৩) এবং বাঙলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাঙলা এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৩–১৯৬২) বাঙালি মুসলমানের সামনে মেধার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে তাঁদের উজ্জীবিত করে তুললেন।

মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর, ১৮৬০–১৯৩৩); আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১–১৯৫৩) ; মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮–১৯৬৮) ; ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল (১৮৭২–১৯১৭) ; মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫–১৯৫০) ; সৈয়দ এমদাদ আলি (১৮৭৫–১৯৫৬), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০–১৯৩২) ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮২–১৯৩১) ; কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২–১৯২৬) ; ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫–১৯৬৯) ; মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (ভোলা, ১৮৮৫–১৯৭৬) ; ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯–১৯৩৬) ; মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৯–১৯৯৪) ; এস. ওয়াজেদ আলি (১৮৯০–১৯৫১) ; শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯০–১৯৬২) ; প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪–১৯৭৮) ; গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭–১৯৬৪) প্রমুখ সাহিত্য ও সংস্কৃতি–জগতে সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন এবং পশ্চাৎপদ মুসলমানদের প্রতি অগ্রবর্তী সুশিক্ষিত হিন্দু সমাজের সচকিত দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হলেন।

নজরুলের কবিতা বিদ্রোহীর প্যারোডি লিখে মোহিতলাল মজুমদার এবং জসীমউদ্‌দীন, নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, শামসুন্নাহার প্রমুখের রচনা ছেপে কল্লোলগোষ্ঠী ; নজরুলের

www.pathagar.com

প্রতি স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের অনেক মুসলিম স্রষ্টাদের অগ্রগমন ও সুদৃঢ় অবস্থানকে জানান দিয়ে ছিলেন। এর ক' বছর পর, তাঁরা আরও অগ্রসর হয়ে বলতে সাহস করলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানেরাও কোনকালেই পিছিয়ে ছিলেন না। একাজে সহায়তা করলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর আবিষ্কৃত মুসলিম রচিত মধ্যযুগের পুঁথি সাহিত্য দ্বারা। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁদেরকে শক্তি যুগিয়েছিলেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' লিখে (১৮৯৬)।

আর এসবই বহন করতে সৃষ্টি হয়েছিলো মোসলেম হিতৈষী (সাপ্তাহিকপত্র, ১৯১১–২১) ; ইসলাম আভা (ময়মনসিংহ, ১৯১৩) ; আল এস্‌লাম (১৯১৫–২১) ; আহলে হাদিস (১৯১৫, দীর্ঘজীবী পত্রিকা) ; ইসলাম দর্শন (১৯১৬) ; মসজেদ (১৯১৭) ; বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৮–২৩) ; সওগাত (১৯১৮–২১ ; ১৯২৬–১৯৭৬ ; সাধনা (১৯১৯–২৩) ; বঙ্গনূর (১৯১৯–২১) ; নূর (১৯২০) ; আঙ্গুর (১৯২০) ; ইসলাম দর্শন (১৯২০–২৬) ; মোসলেম ভারত (১৯২০–২২) ; শিক্ষক (১৯২০–২৩) ; নবযুগ (১৯২০–২১) এবং দেবর্ষি দরবার (১৯২০–২২) প্রভৃতি পত্রিকা। এগুলোর কয়েকটি ধর্মীয় আদর্শ প্রচারক, গোড়া রক্ষণশীল আদর্শের সমর্থক ; আবার কতকগুলো সরকার বিরোধী এবং কৃষক মজুরদের সেবার ধর্ম নিয়ে প্রকাশিত।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত 'আল্‌ এস্‌লাম' ধর্মীয় নামের হলেও সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি সকল বিষয়েই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দ্বারা সমাজের বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

লক্ষণীয় যে, বিশ শতকের সূচনায় যাঁরা জড়তা অসম্পূর্ণতা নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের জগতে ছিলেন পিছনের সারিতে, কয়েক বছরের ব্যবধানে তাঁরা নবযুগের মতো সমাজতান্ত্রিক আদর্শানুগ একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের কৃতিত্ব দেখালেন ১৯২০ সন নাগাদ। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় ১৯২১ সনে দৈনিক সেবক প্রকাশিত হয়েছিল এবং সরকার বিরোধী রচনার জন্য পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সম্পাদক কারারুদ্ধ হন। এরপর একই সম্পাদকের নেতৃত্বে প্রকাশিত হয় দৈনিক মোহাম্মদী। বিপ্লব ও সংগ্রামের দশকে ১৯২১ থেকে মুসলিম সম্পাদিত পত্রপত্রিকার জগতে আবার নবপ্রাণ সঞ্চার হলো। দৈনিক সোলতান (১৯২২) দৈনিক তরক্কী (১৯২৬) ; দৈনিক হানাফী জামায়েত (১৯২৬) ; দৈনিক আমির (১৯২৯) ; দৈনিক রাষ্ট্রবার্তা (১৯৩০) প্রভৃতি কতিপয় দৈনিকই মুসলমানেরা এ দশকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯৩৬ সনে মুসলমানের সম্পাদনায় 'দৈনিক আজাদ' প্রকাশিত হয়েছিল—যার সঙ্গে তুলনা করা চলে প্রথম দিকের 'আনন্দবাজার' পত্রিকার। 'আনন্দবাজার' যেমন হিন্দুদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধানতম মুখপত্র ছিল, তেমনি 'আজাদ' সাতচল্লিশ পূর্ববর্তী সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধানতম দৈনিক মুখপত্র ছিল। 'দি মুসলমান', 'দি পীস', 'সার্ভেন্ট অব হিউম্যানিটি' (১৯৩২–৪০), প্রভৃতি ইংরেজি পত্রিকাও তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন। সকল প্রকার পত্রিকা প্রকাশের অভিজ্ঞতা পূর্ণ হয় তাঁদের ত্রিশের দশকে। স্মরণীয় যে, ১৯২১ সনে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি কার্যক্রম শুরু করে। বিশ্বজোড়া শ্রমিক মজদুর শ্রেণীর যে নতুন জাগরণ,— তাঁর ফলে ধর্মীয় পরিচয় ছাড়া খাঁটি বাঙালি নাম ধারণ করে মুসলিম সম্পাদনায় প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয়েছিল দেবর্ষি দরবার, নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙল, গণবাণী, সাম্যবাদী প্রভৃতি পত্রিকা। এঁদের লক্ষ্য ছিল 'ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যসাধন এবং কৃষক মজদুর সেবা'। পশ্চাৎপদশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্য থেকেই মার্কসীয় মতাদর্শ সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বাণী প্রচারের জন্য সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিশেষ অবদানটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল ভাবে উপস্থাপন করা দরকার। কারণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ মুসলমানদের দৈন্যই সর্বত্র লক্ষ্য করে থাকেন।

১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে নতুন মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে উঠবার পথ প্রশস্ত হয়। এই দশকেই ঢাকা কেন্দ্রিক বুদ্ধিরমুক্তি আন্দোলন এবং 'শিখা' (১৯২৬) প্রতিষ্ঠিত হয়। 'শিখা' নামটিও লক্ষণীয়—বাঙালি, বিপ্লবী ও প্রগতিভাবাপন্ন। ১৯২১-৩০ সময়ে প্রকাশিত, মুসলিম সম্পাদিত পত্র পত্রিকার নামগুলোও এক নজরে দেখা যেতে পারে—এতে বোঝা যায়, মুসলমানেরা জাতীয়তাবাদী, বিপ্লবী, আলোকঅভিসারী হয়ে উঠছেন ; যেমন নারী শক্তি (১৯২২) ; সোনার ভারত (১৯২৩) ; বাহাদুর (১৯২৩) ; দেশের কথা (১৯২৪) ; সত্যাগ্রহী (১৯২৪) ; যুগবাণী (১৯২৪) ; তরুণপত্র (১৯২৫) ; সৌরভ (১৯২৫) ; লাঙল (১৯২৫) ; যুগের আলো (১৯২৬); খাদেম (১৯২৬) ; দরদী (১৯২৬) ; হিন্দু মুসলমান (১৯২৬); অভিযান (১৯২৬); গণবাণী (১৯২৬) ; সাহিত্যিক (১৯২৭) ; জাগরণ (১৯২৮) ; তরুণ (১৯২৮) ; সঞ্চয় (১৯২৮) ; জয়তী (১৯৩০) প্রভৃতি।

১৮৩১ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত মুসলমান সম্পাদিত প্রকাশিত ও পরিচালিত পত্রিকার সংখ্যা জানা মতে ১৫৬। এর মধ্যে একই পত্রিকার একাধিক উল্লেখও রয়েছে।[৪] সে জন্য কম সংখ্যক হতে বাধা নেই। আবার অজ্ঞাত পত্রিকা আবিষ্কৃত হলে সংখ্যা বাড়তেও পারে। কিন্তু সেসব বিতর্ক প্রায় মূল্যহীন। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালিরা সাহিত্যের বিকাশ ছাড়া যে সমাজ জাগবে না, আর সাহিত্যের জন্য দরকার সাময়িক পত্রিকা—এই বোধ থেকে পত্রিকার ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন —যার ফলে আজকে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের এই অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে।[৫]

প্রথমদিকের পত্রিকাসমূহের মধ্যে নবনূর, কোহিনূর, আল্-এস্লাম, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, মোসলেম ভারত প্রভৃতি দখল করে আছে সুউচ্চ মর্যাদার আসন। লাঙল, গণবাণী, নবযুগ, ধূমকেতু প্রভৃতির নাম প্রগতিশীলতার ইতিহাসে বারে বারে উল্লেখ পেয়ে থাকে। নজরুলের প্রসঙ্গে উচ্চারিত হয় মুসলিম সম্পাদিত কয়েকটি পত্রিকার নাম—সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মোসলেম ভারত, মোহাম্মদী এবং উপরিউক্ত কতিপয় পত্রিকা। ফলে একথা বলা চলে যে, উনিশ শতকে সাময়িকপত্র সাধনার ক্ষেত্রে মুসলমানেরা যে শূন্যতা, পশ্চাৎপদতা ও মাতৃভাষা বাংলার চর্চার ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন, বিশ শতকে এসে তাঁরা তা সুদে-আসলে পুষিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। আর এরই পরিণতিতে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে মুসলমানেরা অনেকটা হাস্যকর হলেও, হিন্দু রচিত সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সওগাত মোহাম্মদীসহ বহু পত্রিকার আলোচনায় (পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এসকল বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. পত্রিকাগুলোর আলোচনা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাংলা সাময়িকপত্র, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০০, পৃ. ৩৯ ; কাজী আবদুল মান্নান প্রণীত উনিশ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিম মানস, সাহিত্য পত্রিকা (ঢা. বি.) শীত সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃ. ৫৩ এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলামের সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা, ১৯৭৭–এর 'পরিশিষ্ট' ও আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম বাঙলার সাময়িকপত্র' ঢাকা, ১৯৬৯ প্রভৃতি অবলম্বনে লিখিত।

২ মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান লেখক, কোহিনূর, আষাঢ়, ১৩১৮। উদ্ধৃত : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী, ঢাকা ১৩৭০, পৃ. ১৮।

৩. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত' শীর্ষক গ্রন্থের পরিশিষ্টে এবং আনিসুজ্জামান 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' শীর্ষক গ্রন্থে ১৫৬টি মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকার উল্লেখ করেছেন। তবে অনেক পত্রিকার বার্ষিক, শিশু, মহিলা সংখ্যা এবং সাপ্তাহিক থেকে মাসিকে পরিবর্তনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রমিক নম্বরে ভুক্তি রয়েছে।

৫. কাজী আবদুল মান্নান, উপরিউক্ত, পৃ. ৫১।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আলোচ্যকালের প্রধান প্রবণতাসমূহ

ক. বাঙলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

(১৯৩১-৪৭)

১

১৯৩১-৪৭ সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন সব ঘটনা অতিদ্রুত ঘটে চলে যে, দুটি পৃথক রাষ্ট্রে রূপ নিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হয়ে যায়। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের কথাই প্রথমে ধরা যাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দার ওপর বাঙলার সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে ১৯২৯ সনের বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী সংকটেরও প্রভাব পড়ে। কৃষি পণ্যের মূল্য পড়ে যাওয়ায় কৃষক সমাজ সর্বশান্ত হয়ে যায়, এবং ফলে মহাজনী শোষণ চরমরূপ নেয়। বাংলার চাষীদের দেনার পরিমাণ ছিলো একশ কোটি টাকা। দরিদ্রতম কৃষকদের জমাজমি সব কেন্দ্রীভূত হয় জোতদার মহাজনদের কাছে। পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ও শিল্প নীতির ফলে বেকার কারিগর এবং শিল্প শ্রমিকরাও কৃষিতে যোগ দেয়। ফলে কৃষি-সম্পৃক্ত সমাজের অবস্থা চরম নৈরাজ্যমূলক হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও তীব্র সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় ১৯৪৩-৪৫ সনে বাঙলাদেশে ভয়াবহ মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রজারা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়। জমি নির্ভর জনসংখ্যা বেকারত্বের চাপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে জোতদারী প্রথা সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয় এবং তিন ভাগের এক ভাগেরও বেশী জমি বর্গা প্রথায় চাষাধীনে চলে যায়। বর্গাচাষীরা শোষিত ও অত্যাচারিত হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, দিনমজুর লাগানোর চেয়ে ভাগচাষী ব্যবস্থা জোতদারদের জন্য অনেক বেশি লাভজনক পন্থা হয়ে দাঁড়ায়। ভাগচাষীকে দিনমজুরের চেয়েও বেশী মেহনত করতে হয়। এই জঘণ্য প্রথায় ভাগচাষী পরিবারকে আষ্ঠে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে জাতীয় মুক্তির প্রত্যাশা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। তেভাগা আন্দোলনসহ সমস্ত কৃষক বিদ্রোহের কারণ ছিল এইই।

কৃষক-বিদ্রোহ সংঘটনের মূলে ছিল বঙ্গীয় কৃষক সভার সাংগঠনিক তৎপরতা। ১৯৩৩ সনের মার্চে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। এতে ইন্ধন জোগাচ্ছিলেন কমিউনিস্টরা। কৃষকদের মধ্যে সংগ্রামী শ্রেণীচেতনা জাগ্রত হওয়ার কারণেই সারা ভারতে অসংখ্য আঞ্চলিক কৃষক সভা গড়ে ওঠে এবং সম্মিলিত কৃষক আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই সময়ে শ্রমিক কারিগর ও কৃষকদের আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করেছিল। ১৯২১ সনে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হবার পর বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের পুনর্জাগরণ যে-ভাবে ঘটেছিল, এই সময়ে তা নানা রূপে ব্যাপকতা লাভ করে। শ্রমিক

www.pathagar.com

আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, কমিউনিস্ট কার্যাবলি, হিন্দু মুসলমান বিরোধ এই সমস্তই দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছিলো বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল বলে।[১]

২

১৯২৯ সনের লাহোর–কংগ্রেসের প্রস্তাবের সমালোচনা করে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 'একথা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না যে ১৯২৯ সনের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ভারতে জাতীয় কংগ্রেস পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া দিল।' তাঁর মতে ১৯৪৭ সনে অখণ্ড বাঙলাদেশ রাষ্ট্রগঠনের শেষ আশাও কংগ্রেসের ভুল সিদ্ধান্তে ভণ্ডুল হয়ে যায়।[২] কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নাটক এ সময়ে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য দলসমূহের কার্যাবলিও ছিল এই দুইটি দলকে শক্তিশালী করে তোলার সহায়ক।

১৯২৯ সন নাগাদ গান্ধী কংগ্রেসের রাজনীতিতে একাধিপত্য বিস্তার করে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কল্পে প্রস্তাব করেছিলেন যে, যেহেতু মতিলাল নেহেরুর রিপোর্টে প্রস্তাবিত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান শিখ, মুসলমান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ সন্তোষজনক মনে করে না, সেহেতু কংগ্রেস এই আশ্বাস দিচ্ছে যে, 'ভবিষ্যতে কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির নিকট সম্পূর্ণ সন্তোষজনক না–হলে কংগ্রেস তা গ্রহণ করবে না। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, 'ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল'। কারণ মুসলমানদের দাবি ক্রমশ্ই স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে পৌঁছেছিল।

১৯৩০ সনের ১২ নভেম্বর থেকে ১৯৩১ সনের জানুআরি পর্যন্ত লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস দল এতে যোগদান করা থেকে বিরত ছিল। ১৯৩১ সনের ৭ সেপ্টেম্বর লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে। ব্রিটেনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এলেও ভারতের শাসন পদ্ধতিতে গুরুতর পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না শাসকগণ। তাই তাঁরা মহাত্মাগান্ধীর পূর্ণ স্বরাজ সংক্রান্ত বক্তৃতায় কর্ণপাত করলেন না।

প্রথম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশরক্ষা, অর্থনীতি, সামরিক ও বৈদেশিক নীতির ওপর ব্রিটেনের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে দ্বিতীয় বৈঠক সমাপ্ত হয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসাও তখন হয়নি। অস্পৃশ্য ও অনুন্নত হিন্দু, দেশীয় খ্রীষ্টান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও মুসলমানেরা একজোটে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন—শিখ ও বর্ণ–হিন্দুরা তার প্রতিবাদ করলেন। মহাত্মা গান্ধীও অনুন্নত হিন্দুদের পৃথক ভোটাধিকারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। আম্বেদকর যুক্তভোট মেনে নিয়েও অনুন্নত শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যপদ সংরক্ষণের দাবি জানালেন। গান্ধী তাতেও আপত্তি জানালে এ–সমস্যা সমাধানের ভার ইংরেজ গবর্নমেন্টের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাল্ড ১৯৩২ সনের ১৭ আগস্ট ঘোষণা করেন যে,

১. মুসলমান, শিখ ও ভারতের ইউরোপীয় সম্প্রদায় পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে তাঁদের নির্দিষ্ট–সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন।

২. হিন্দুরা সকলেই সাধারণভাবে তাঁদের জন্য রক্ষিত আসনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যপদ কেবল অনুন্নত শ্রেণীর জন্যই সংরক্ষিত

www.pathagar.com

থাকবে, তাতে কেবলমাত্র অনুন্নত শ্রেণীই ভোট দিতে পারবেন। তবে সকল হিন্দু একমত হয়ে কোন ব্যবস্থা নিলে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তা অনুমোদন করবে।

এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত হলেও মহাত্মা গান্ধী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ১৯৩২ সনের ১৮ আগস্ট হঠাৎ করে এর প্রতিবাদ স্বরূপ 'আমরণ অনশনব্রত' ঘোষণা করেন। এ নিয়ে সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। গান্ধীর অনশন ব্রতের প্রেক্ষিতে 'পুনা-চুক্তি'তে অনুন্নত শ্রেণী দুদিক থেকেই লাভবান হলেন।

প্রথমতঃ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় তাঁদের সদস্যসংখ্যা দ্বিগুণ হলো।

দ্বিতীয়তঃ পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের সুবিধাও একেবারে লোপ পেলো না।[৩]

১৯৩০-৩৫ সময়ের রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখযোগ্য দিক হলো কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দলাদলি, গান্ধী-আরউইন চুক্তি এবং আইন অমান্য আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুসহ অনেক নেতা, বুদ্ধিজীবী, গান্ধী-আরউইন চুক্তির কঠোর সমালোচনা করেন। দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে একক প্রতিনিধিরূপে গান্ধীকে প্রেরণের সিদ্ধান্তেরও নিন্দা করা হয়। লন্ডন থেকে বৈঠক শেষে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধী আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র, জওয়াহেরলাল নেহেরু প্রমুখ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। পুনাচুক্তির সংবাদ প্রকাশিত হলে বর্ণহিন্দুরাও অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু মুসলমানেরা হিন্দুদের এই মনোভাবের নিন্দা করেন। কারণ চুক্তির শর্তানুসারে বাঙলার ব্যবস্থাপক সভায় আশি জন সাধারণ হিন্দু সদস্যের মধ্যে তপশীলভুক্ত জাতির মধ্য থেকে ত্রিশ জন সদস্য নির্বাচনের কথা ছিল, পূর্বে যার সংখ্যা ছিল দশ। মোট দুইশ পঞ্চাশ জনের মধ্যে সাধারণ ভাবে নির্বাচিত হিন্দু সদস্যের সংখ্যা আশির বেশী হবে না—এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিক্ষুব্ধ হিন্দু নেতারা 'কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টি' গঠন করেন। এতে সাম্প্রদায়িক তথা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে।

৩

১৯৩৩ সনে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে সাময়িকভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সুভাষচন্দ্র পুনরায় কারারুদ্ধ হলে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তাঁকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ইউরোপে যেতে হয়। পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তিনি ইউরোপে কাটিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৩ সনে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যু ঘটে যায়। পরের বৎসর থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে বাঙলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটে।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পরে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেসী গান্ধীদলের নেতা হন। বিধানচন্দ্র রায় এবং নলিনীরঞ্জন সরকার বাঙলাদেশে কংগ্রেসের নেতা রূপে আবির্ভূত হন। বিধান রায় শরৎ-সুভাষ ভ্রাতৃদ্বয়ের বন্ধু ছিলেন। ১৯৩৪ সনে গান্ধীর সহায়তায় বিধান রায় স্বরাজ্য দল পুরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পান। তিনি ১৯৩৫ সনে বাঙলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন এবং পরপর দুবার তিনি এই পদ অধিকার করেন। তিনি কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যও নির্বাচিত হন। কিন্তু এই সময় বিধানসভার প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে শরৎ বসু ও সুভাষ বসুর সঙ্গে বিধান রায়ের ঘনিষ্ঠতা হ্রাস পায়।

www.pathagar.com

বিশ ও ত্রিশের দশকে এম. এন. রায়, মুজফফর আহমদ, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের সাহিত্যিক তৎপরতা এবং ধূমকেতু লাঙল–সংহতি–গণবাণী প্রভৃতি পত্রিকা ও মুজফফর আহমদের 'বাঙলা কৃষক ও শ্রমিক সমিতি' (১৯২৪–২৫) প্রভৃতির মাধ্যমে বাঙলার রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের গভীর প্রভাব বিস্তারের ইতিহাস স্মরণযোগ্য।

> '১৯৩৫ হইতে ১৯৪০ সনের মধ্যে বাঙলাদেশের মুজফফর আহমদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সোমনাথ লাহিড়ী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কমিউনিস্টগণ কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙলার প্রাদেশিক অথবা জিলা কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিলো কংগ্রেসের সোস্যালিষ্ট পার্টিতে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে কংগ্রেসেও শক্তিশালী হইবেন। ১৯৪০ সনে তাঁহারা সোস্যালিষ্ট দল হইতে বিতাড়িত হন এবং ১৯৪১ সনে কংগ্রেসের সহিতও বিরোধ ঘটে।[৪]

১৯৩৪ সনের কেন্দ্রীয় বিধান সভার নির্বাচনে কংগ্রেসের ভেতর থেকে সৃষ্ট 'বাঙলা জাতীয় দল' (Bengali Nationalist Party) আশাতীতভাবে সাফল্য লাভ করে। 'ইহার ফলে মুসলমানদেরও রাজনীতিক ক্ষেত্রে হিন্দু–সম্প্রদায় হইতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রয়াস বৃদ্ধি পাইল।'[৫]

এই সময় বাঙলাদেশে মুসলিম লীগের প্রাধান্য বেশি ছিল না। স্বতন্ত্র বাঙলা মুসলিম দল (Bengali Muslim Party) অধিকতর শক্তিশালী ছিল। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত 'কৃষক–প্রজা দল'। এই সময় মুজফফর আহমদ ও অন্য কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতা মুসলমানদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করছিলেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাও এতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলো। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন :

> ১৯২৯ সনে স্বরাজ্য দল বিধান সভা বর্জন করার ফলে বাঙলার বিধান সভায় মুসলমান দল সরকারী কর্মচারী ও হিন্দুদের মধ্যে লিবারেল ও সরকারের অনুরক্ত সদস্যদের সহায়তায় শাসন–কার্য পরিচালনা করে প্রাথমিক শিক্ষা, স্থানীয় সায়ত্ত্বশাসন এবং দরিদ্র প্রজাদের ঋণদায় থেকে মুক্তি দান প্রভৃতি লোকহিতকর অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলো। 'মুসলমানগণ বাঙলাদেশে সংখ্যাধিক্যের বলে নূতন শাসন–ব্যবস্থায় নিজেদের সুখ–সুবিধা বাড়াইবার যে শক্তির পরিচয় এই প্রথম পাইল, তাহাই ক্রমশ তাহাদিগকে পাকিস্তান অর্থাৎ পৃথক স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্যের দাবিতে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল।'...[৬]

এই যুগেই বাঙলার বাইরে মুসলমানদের পৃথক রাজ্যের কথা গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছিলো। ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অধিবেশনের সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ কবি মুহম্মদ ইকবাল তাঁর ভাষণে পাঞ্জাব, উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে একটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের প্রস্তাব করেছিলেন। তখন বাংলাদেশ মুসলমান রাজ্য হিসাবে কল্পিত হয়নি।

মুসলমান বাঙালি নেতারা প্রায় কেউই তখন 'পাকিস্তান' বা অনুরূপ মুসলমান রাজ্য হিসাবে বাংলাদেশকে কল্পনা করেন নি। তখন সকলেই হিন্দু–মুসলমানের মিলিত বঙ্গদেশই কল্পনা করতেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যানুপাতিক অধিকার চাচ্ছিলেন। হিন্দুরা কুক্ষিগত অনধিকার কিছুটা ন্যায়ত ছাড়তে স্বীকৃত হলে বাঙলার রাজনৈতিক–ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও

www.pathagar.com

রাজ্য–ব্যবস্থা অন্যরূপ হতো। বাঙালি মুসলমানেরা যখন তাঁদের প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে তর্কে পেরে উঠছিলেন না, বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুরা তখনকার বাঙলায় সংখ্যালঘিষ্ট হলেও অখণ্ড ভারতীয় রাজনীতিতে নিজেদেরকে সংখ্যালঘু ভাবতেন না। অধিকন্তু ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বাঙলার মুসলমানদের প্রাধান্য মানতে চাইতেন না।

এমন অবস্থায় নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির জন্যেই সর্ব ভারতীয় মুসলমানরাও একত্র আন্দোলন করতে বদ্ধপরিকর হন। এবং তাঁরই জন্য তাঁরা 'পাকিস্তানের' ফাঁদে পা দিলেন। বঞ্চিত বাঙালি মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গ হয়ে অন্তর্ভুক্তির চিন্তা করেছিলেন। এই কারণেই, কাশ্মীরকেও মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল।[৭]

৪

কংগ্রেসী নেতাদের কাছে বাঙলার রাজনীতি স্বতন্ত্র ভাবে বিবেচিত হতো। কারণ, সম্ভবত মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দুনেতৃবর্গ যেরূপ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রয়োগ ঘটাতেন, বাঙলার ক্ষেত্রে তাঁরা তার ব্যত্যয় ঘটাতে দ্বিধা করতেন না। তাঁদের আশঙ্কা ছিল বাঙলার মুসলমানেরা সবসময় শাসন ক্ষমতায় কর্তৃত্ব করবেন। ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এই আশংকাই শক্তি জুগিয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন প্রয়োগের পরে প্রদেশগুলোতে সায়ত্বপ্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এবং ১৯৩৬ সনের নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী ১৯৩৭ সনের ব্যবস্থাপক সভা গঠন কালে দেখা গেল বাঙলার একজন মুসলমান, দরিদ্র কৃষক প্রজার নেতা রূপে (এ.কে. ফজলুল হক) মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। তখন অবশ্য সারা ভারতবর্ষেই মুসলিম জাগরণ, হিন্দু নেতৃবর্গের কাছে চরম গাত্রদাহের কারণ হয়ে উঠেছে।

এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো, বাঙলার শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর জাগরণ, এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় একদিন জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর মুসলিম নেতৃবৃন্দ রাজনীতি করতেন কলকাতায় বসে। এঁদের রাজনীতি, আদর্শ ও কৃষ্টির সঙ্গে বাঙলার জনসাধারণের বা মধ্যবিত্তের কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ভোটাধিকার সম্প্রসারণের ফলে বাঙলার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ক্রমশ নবউদ্ভূত মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর হাতে চলে যায়। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

১৯৩৬ সনের নির্বাচনে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি, ইউনাইটেড মুসলিম দল, নিউ মুসলিম মজলিশ এবং মুসলিম লীগ অংশগ্রহণ করে। এই সময় মুসলিম লীগ সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় কিছুটা প্রগতিবাদী ও গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। কারণ তাঁদের লক্ষ্য ছিল ফজলুল হক পরিচালিত কৃষক প্রজা সমিতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা। তখন মুসলিম লীগের শাখা–প্রশাখা গ্রামান্তরেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৫৯ টি, কৃষক প্রজা পার্টি ৫৮ টি এবং কংগ্রেস ৬০টি আসন লাভ করে। ফজলুল হক চেয়েছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে। কিন্তু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে মুসলিম লীগের সঙ্গেই কোয়ালিশন করতে হলো। ফলে বাঙলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগ আরও প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পেয়ে যায়। কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টি কোয়ালিশন সরকার গঠন করলে মুসলিম স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে, পক্ষান্তরে

www.pathagar.com

প্রজাপার্টি আর মুসলিম লীগ কোয়ালিশন করলে মুসলিম স্বার্থ প্রাধান্য পাবে,—এই বিবেচনায় মুসলিম লীগ ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রীরূপে মেনে নিয়ে কৃষক-প্রজা পার্টির কার্যসূচি কিছু কিছু হজম করতে বাধ্য হয়।

বস্তুত মুসলমান কৃষক সমাজকে দলীয় প্রভাব-বলয়ে আনয়ন ছিল তখনকার মুসলিম লীগের বড় কৃতিত্ব। ১৯৪৪ সনে লীগ বাঙলার বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। কৃষক সমাজই বাঙলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। মুসলিম সংহতির নামে এবং আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির আশায় তখন মেতে উঠেছিল এই জনগোষ্ঠী। মুসলিম জাগরণের এবং তাদের প্রভাব বৃদ্ধিতে এ. কে. ফজলুল হকের অবদানও অপরিসীম। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে 'ঋণ-শালিসী বোর্ড' স্থাপন (১৯৩৮), 'প্রজা-স্বত্ব আইন' (১৯৩৯), 'মহাজনী আইন' (১৯৪০), 'কৃষিখাতক আইন,' কর্পোরেশনে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন, ফ্লাউড কমিশন গঠন, বিপ্লবী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান এবং সিরাজউদ্দৌলার নামে কলঙ্কলেপনকারী হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ প্রভৃতির কারণে আর সাম্রাজ্যবাদী ও জমিদারী শোষণ থেকে মুক্তির আনন্দে, এবং আরও উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় মুসলমানসমাজ সেদিন উজ্জীবিত হলো।

অবশ্য পরবর্তীতে মুসলিম লীগের প্রতি অনানুগত্যের কারণে সেই হক সাহেবকেও তাঁরা নিন্দাবাণে জর্জরতি করেন, আর ১৯৪৬ সনে তাঁরা মুসলিম লীগকে নিরঙ্কুশ জয়ী দলে পরিণত করেছিলেন।[৮] এর পেছনেও কার্যকর ছিল জিন্নার কূটনৈতিক চাল। তিনি জানতেন, মুসলিম অধ্যুষিত বাঙলার রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সেজন্য যে ফজলুল হকের কারণে মুসলিম লীগ জনপ্রিয় একক রাজনৈতিক দলে পরিগণিত হয়েছিল এবং যাঁকে দিয়ে ১৯৪০ সনের 'লাহোর-প্রস্তাব' নামে 'পাকিস্তান' এর দাবি উত্থাপন করিয়েছিলেন, তাঁকেই তিনি বাঙলার রাজনীতিতে দুর্বল নিষ্ক্রিয় করে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্রিটিশের 'ডিভাইড এণ্ড রুল' এর অনুসরণ করে বাঙলাতেও বাঙালি মুসলমান রাজনীতিকদেরকে বিভক্ত করে রাখতেন। মনে রাখা দরকার যে, মন্ত্রীসভা গঠনের অল্পদিনের মধ্যেই মন্ত্রীসভার স্থিতিশীলতা ও মুসলিম সংহতির লক্ষ্যে এ.কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেছিলেন এবং তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলেন। তখনকার মুসলিম লীগে সভাপতি পদে এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৯]

৫

১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধকালে গৃহীত সরকারী নীতিকে কংগ্রেস সমর্থন করেনি। ভারতের সাতটি হিন্দু-প্রধান প্রদেশের মন্ত্রীসভাকেও কংগ্রেস পদত্যাগ করতে বলে। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে জিন্নাহ্ দ্বি-জাতিতত্ত্বকে সক্রিয় করেন এবং তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯৪০ সনের মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

কংগ্রেস-সমর্থিত পত্র-পত্রিকা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। ১৯৪১ সনের মাঝামাঝি জাপান বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সরকার এতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভের জন্য তৎপর হয়। শাসন পরিষদে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের গ্রহণ করার প্রস্তাব পাঠানো হয়। সরকার কর্তৃক একটি সমর পরিষদ গঠন করে বলা হলো ভারতের প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীগণ পদাধিকার বলে উক্ত সমর পরিষদের সদস্য

www.pathagar.com

হবেন। কংগ্রেসীরা মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের পর, মুসলিম প্রধান বাঙলা, আসাম, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে মুসলিম লীগের মন্ত্রীসভা কাজ করছিলো। ফলে তাঁরাই সমর পরিষদের সদস্য হলেন।

কিন্তু ইতিপূর্বে জিন্নাহ্ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, মুসলিম লীগের দাবি স্বীকার না করা পর্যন্ত মুসলিম লীগ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সরকারকে সহায়তা করবে না। সরকারের কাজকর্মের প্রেক্ষিতে জিন্নাহ্ প্রধানমন্ত্রীদের সমর পরিষদ ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ফজলুল হক জিন্নার নির্দেশ মতো কাজ করতে রাজি হলেন না। হক–জিন্নার মধ্যে গুরুতর মতানৈক্য সৃষ্টির পর ১৯৪১ সনের আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় ফজলুল হকের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রদেশের লীগমন্ত্রী ও নেতৃবৃন্দ ফজলুল হককে জিন্নার সঙ্গে আপোষ করার পরামর্শ দিলেন। শেষ পর্যন্ত হক সাহেব ১৯৪১ সনের ২৮ অক্টোবর সমর পরিষদের সদস্যপদ পরিত্যাগ করেন।

তবে তিন সপ্তাহের মধ্যে 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' নামে তিনি নতুন দল গঠন করেন। এই পার্টি গঠনের জন্য তিনি কৃষক–প্রজা পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরও কয়েকটি ছোট দলকে সমন্বিত করেছিলেন। ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা থেকে মুসলিম লীগের মন্ত্রীগণ পদত্যাগপূর্বক খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে 'মুসলিম লীগ' নামে বিধান সভায় স্বতন্ত্র একটি দল গঠন করলেন। এর কদিন পরেই (১৭ ডিসেম্বর ১৯৪১) ফজলুল হক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে 'শ্যামা–হক মন্ত্রীসভা' গঠন করেন। ১৯৪৩ সনের মার্চ পর্যন্ত এই মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় ছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন :

> হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ বাড়াইয়া ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখার জন্য গবর্ণমেন্ট মুসলিম লীগের রাজনীতিক প্রভাব বাড়াইতে সচেষ্ট ছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ফজলুল হকের পরিবর্তে মুসলিম লীগের প্রভাব ও ক্ষমতা যাহাতে বাড়ে তাহার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করিতেন। সুতরাং ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাঙলার মন্ত্রীসভা যাহাতে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রে ক্ষমতাচ্যুত না–হয়, এইজন্য শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন।...মুসলিম লীগের পরিবর্তে বাঙ্গালী হিন্দুদের সহযোগিতায় মন্ত্রীসভা গঠনের সপক্ষে ফজলুল হকের মনেও যে আর একটি যুক্তি ছিলো তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। ফজলুল হক অদূরদর্শী ও অব্যবস্থিতচিত্ত হইলেও তাঁহার মধ্যে কয়েকটি প্রশংসনীয় গুণও ছিল। ভারতের বৃহত্তর রাজনীতিক পটভূমিকায় বাঙলার স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বাঙলার রাজনীতি গঠিত করিতে চেষ্টা করিত। উভয়েই এইজন্য বাঙলার প্রাদেশিক রাজনীতিতে অযথা হস্তক্ষেপ করিত। ফজলুল হক মনে করিতেন যে, ইহা অন্যায় ও অসঙ্গত এবং কোন প্রদেশের সমস্যা সম্পর্কে যথাসম্ভব প্রাদেশিক নেতৃত্বের মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কর্তব্য।
>
> ...দুঃখের বিষয়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দু ব্যতীত আর কেহই যেমন গান্ধী প্রভাবিত কংগ্রেসের এই নীতি রোধ করিতে চেষ্টা করেন নাই,—ঠিক তেমনি ফজলুল হক ব্যতীত আর কোনও মুসলমান নেতাই জিন্নাহর প্রভাবমুক্ত মুসলিম লীগের অনুরূপ নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন নাই।...দুঃখের বিষয়, প্রাদেশিক ব্যাপারে গান্ধী ও জিন্নার হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকিয়া বাংলাদেশের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে।[১০]

www.pathagar.com

৬

শ্যামা-হক মন্ত্রীসভায় নয়জন মন্ত্রীর মধ্যে চারজন ছিলেন হিন্দু এবং পাঁচজন মুসলমান। শরৎবসুর গ্রেফতারের জন্য তাঁকে রাখার সিদ্ধান্ত বাতিল হয়। ফরওয়ার্ড ব্লকের দুইজন, হিন্দু মহাসভার ড. শ্যামাপ্রসাদ এবং তফশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি ছিলেন ঐ মন্ত্রীসভায়। মুসলিম লীগ একে 'হিন্দু-মন্ত্রীসভা' আর কংগ্রেস 'মুসলমান-মন্ত্রীসভা' হিসাবে সুনজরে দেখে নাই। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দী সমগ্র বাঙলাদেশ ব্যাপকভাবে সফর করেন। ক্রমে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা তথা ফজলুল হক মুসলিম মধ্যশ্রেণী ও ছাত্রদের আস্থা হারাতে থাকেন। মুসলিম পরিচালিত পত্রপত্রিকায় হক সাহেবকে নিয়ে ব্যঙ্গ কৌতূকও প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়ে ভারতের রাজনীতিও নতুন রূপ গ্রহণ করে।

যুদ্ধকালীন সিভিল ডিফেন্স বিভাগের দুনীর্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা, জিন্নাহর কলকাতা আগমন উপলক্ষে ১৪৪ ধারা জারি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সেই উপলক্ষে পুলিশের গুলিবর্ষণ ; স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপসের ভারত আগমন ; গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৪২ সনের 'ভারত ছাড়ো' (quit India) আন্দোলন ও সে-উপলক্ষে দমননীতি ও কংগ্রেস সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা, নেতাজী সুভাষ বসুর রহস্যজনক অন্তর্ধান এবং 'আজাদ-হিন্দ ফৌজের' কার্যক্রম ; মেদিনীপুরের কংগ্রেস-আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ প্রভৃতিতে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।

বাঙলাদেশে তখন (১৯৪২-৪৫) দারুণ খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। এর মোকাবিলার মতো জনসমর্থন হক-মন্ত্রীসভার ছিল না। ফজলুল হকও অতঃপর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফলে নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ বাঙলার শাসনভার গ্রহণ করে। এর অল্পদিনের মধ্যেই ১৩৫০-এর ভয়ঙ্কর মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আনুমানিক ৫০ লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। দুর্ভিক্ষের জন্য মুসলিম লীগ সরকারের ব্যর্থতাই দায়ী হয়। তদুপরি ১৯৪৪ সনে ভয়াবহ বস্ত্র সংকটও দেখা দেয়। নরনারীর লজ্জা নিবারণ দুরূহ হয়ে পড়ে। ১৯৪২ সন থেকে প্রাচ্যে ব্রিটিশ বাহিনীর ক্রমাগত ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতে থাকে। জাপানীদের অগ্রগতি অপ্রতিহত ভাবে চলতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার ভারতের এই সংকটময় মুহূর্তে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্‌কে ভারতে পাঠান। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিলো ভারতের স্বাধীনতার অঙ্গীকার ও দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট যুদ্ধকালীন সহযোগিতা লাভ ইত্যাদি। কিন্তু ক্রিপস্‌ প্রস্তাব কংগ্রেস ও লীগের নিকট বিভিন্ন কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়। কংগ্রেস 'অখণ্ড ভারত' নীতিতে অটল ; লীগ পাকিস্তান দাবিতে অনড়। ইতিমধ্যে ১৯৪৫ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর জয় হয়। যুদ্ধশেষে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়লাভ করে। ভারতীয় রাজনীতিতে এই নির্বাচনী ফলাফল বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। শ্রমিক দল ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে সহানুভূতিশীল এবং ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে আস্থাশীল ছিলো। সেইজন্য নতুন প্রধানমন্ত্রী মি. এ্যাট্‌লী ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৬ সনের জানুয়ারি মাসে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মার্চ মাসে (১৯৪৬) প্রাদেশিক

www.pathagar.com

বিধান সভার নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় লীগের পতাকা তলে 'পাকিস্তান' দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়।

এই সময় সুভাষ বসু-শূন্য বাঙলার হিন্দু-রাজনীতি তথা ফরওয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস দুর্বল শক্তিহীন হয়ে পড়ে। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের জের হিসাবে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ সরকারের দমননীতির শিকার হন। তদুপরি ১৯৪৩ সনে মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত হয়। মৌলানা আকরম খাঁ সভাপতি ও আবুল হাশিম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, আকরম খাঁ ও তাঁর আজাদ-মোহাম্মদী গ্রুপের প্রচারে এবং জিন্নাহ্র অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে মুসলিম লীগ তখন বাঙলার রাজনীতিতে মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলো। যদিও মুসলিম লীগের মধ্যে খাজা নাজিমউদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্ব নিয়ে তীব্র দলাদলি ছিলো। কিন্তু সময়ের কারণেই তখন জনগণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছিলো। তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত জনগণ তখন স্বাধীনতার নামে পাগল। এই সময় প্রগতিশীল নেতা আবুল হাশিম, কলকাতার মুসলিম নেতা সোহরাওয়ার্দী, সংবাদপত্রসেবী আকরম খাঁ, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম এবং কমিউনিস্ট পার্টির সকল সম্প্রদায়ের সদস্য একযোগে স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে প্রচারণা চালানোর ফলে ক্ষুদ্র দল উপদলের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

'পাকিস্তান' ও 'ভারত' এর 'স্বাধীনতা'র জন্য জনগণ উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ফজলুল হকের মতো নেতাকেও দল ছাড়া কোনো মূল্য, গুরুত্ব মুসলমানগণ দিতে চায়নি। তাছাড়া হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় দুটি শ্রেণীতে মানুষ তখন কেবল 'হিন্দু' আর 'মুসলমান' হয়ে পড়েছিল। 'কমরেড'গণও তখন 'হিন্দু কমরেড' অথবা 'মুসলমান কমরেড' ছাড়া অন্য কিছু নন। ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১২২টি আসনের মধ্যে ১১৭টি আসনেই জয় লাভ করলো। ফজলুল হক এবং অন্য দু'চারজন কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বের কারণেই জয়লাভ করেন। বঙ্গীয় বিধান সভায় অতঃপর লীগ দলীয় সদস্যরা সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। অন্যান্য প্রদেশেও লীগের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। মোট ৫০৭ টি প্রাদেশিক আইনপরিষদ সদস্যের মধ্যে মুসলিম লীগ ৪৭২ টি আসন দখল করে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম লীগ মুসলমানদের সকল আসনেই জয় লাভ করে। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ, বিপ্লব এবং বিচিত্র ঘটনায় ভারতে আর যে শাসন টিকিয়ে রাখা যাবে না তা উপলব্ধি করলো ব্রিটিশ সরকার।

১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরেই ২৫ জুন থেকে তাঁরা ভারতের সিমলায় বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। এই বৈঠকে ব্রিটিশ প্রস্তাবের মধ্যে অনেক 'প্রগতিমূলক' কথা থাকলেও বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। বলা হল, ভাইসরয় ও ব্রিটিশ প্রধান সেনাধ্যক্ষ ছাড়া এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বাকী সকল সদস্য হবে না ভারতীয়। সরকারীভাবে ভাইসরয়ের বিশেষ ক্ষমতাগুলো তাঁর হাত থেকে নিয়ে নেয়া হবে না। তবে সে ক্ষমতা তিনি 'অযৌক্তিকভাবে' ব্যবহার করবেন না। কাউন্সিলে বর্ণ হিন্দু ও মুসলমানদের হার হবে সমান সমান। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সমতার যে দাবি মুসলিম লীগ এতদিন করে আসছিল তার প্রতি ব্রিটিশ নীতির সমর্থন এই প্রথম সরকারিভাবে ঘোষিত হল।

অবশ্য বলা হল যে, 'কোন সাংবিধানিক চুক্তি জোর করে আদায় করা বা চাপিয়ে দেয়া প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। এই বিষয়েই আলোচনা হবে সিমলায়। কিন্তু জিন্নার অনমনীয়

www.pathagar.com

মনোভাব ও তাঁর প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন সিমলা বৈঠককে ব্যর্থ করে দেয়। জিন্না আরও বললেন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মুসলমান সদস্যেরা শুধু মুসলিম লীগের দ্বারাই মনোনীত হতে পারবেন। তখন মীমাংসা আলোচনা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রাজি হলেন না। 'বিভাজন ও শাসন' নীতির চরমরূপ দেখা গেল সিমলা বৈঠকে।[১১]

১৯৪৬ সনের নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী কাজ হবে মর্মে সিমলা কনফারেন্সে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেই সূত্র অনুসারে স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান গঠন সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য ১৯৪৬ সনে ব্রিটেনের শ্রমিক দল 'মন্ত্রীমিশন' নামে একটি প্রতিনিধি দল ভারতে প্রেরণ করেন। ১৯৪৬ সনের এপ্রিল মাসে জিন্নাহ দিল্লীতে মুসলিম লীগের নির্বাচিত সদস্যদের এক কনভেনশনের আহ্বান করেন। এই 'দিল্লী কনভেনশনের' উদ্দেশ্য ছিলো 'ক্যাবিনেট মিশন'কে 'পাকিস্তান' দাবির যৌক্তিকতা বুঝানো। নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের ভাবী রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং তা অর্জনের জন্য দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। লীগের পক্ষ থেকে মন্ত্রীমিশনকে জানানো হয় যে, একমাত্র লীগই ভারতের দশ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। সুতরাং তাঁদের পাকিস্তান দাবি না মানা হলে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হবে না। উল্লেখ্য যে, জিন্না লাহোর প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়েছিলেন জনপ্রিয় বাঙালী নেতা এ.কে. ফজলুল হককে দিয়ে। আর মন্ত্রীমিশনে পাকিস্তানীদের পক্ষে ওকালতি করিয়েছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দিয়ে। কারণ বাঙলাদেশের মুসলমানরাই ছিলেন ভারতের মধ্যে সংঘবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১৯৪৬ সনের প্রাদেশিক নির্বাচনে বাঙলা ও সিন্ধু প্রদেশ ব্যতীত অন্য কোনো মুসলিম প্রধান অঞ্চলে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারেনি। 'মুসলিম লীগ' বলতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগই বুঝাতো। তাঁদের সমর্থন ছাড়া পাকিস্তান–আন্দোলন সফল হতে পারে না যে সুচতুর আইনজীবী মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ তা বুঝেছিলেন। তাই বাঙলাদেশের তখনকার জনপ্রিয় মুসলিম লীগ দলীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের মাধ্যমে ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবের 'মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের' পরিবর্তে 'রাষ্ট্র' কথাটি উপস্থাপন করা হয়। যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্বপাকিস্তান একটি শক্তিযোগান্দার নতুন উপনিবেশ হিসেবে সংযুক্ত থাকে। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যেও অবাঙালী হিন্দু নেতা গান্ধী–নেহেরু প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিভেদাত্মক মনোভাব বহাল থাকলো।

মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা লীগ ও কংগ্রেস উভয়েই গ্রহণ করলেন। কিন্তু পরিকল্পনার ব্যাখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিল। পাকিস্তান অর্জনের জন্য ১৯৪৬ সনের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন দিবস' পালন করে। এই উপলক্ষে কলকাতায় ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। পাঞ্জাব, উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বিহার এবং বাঙলার নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধী দলবলসহ চলে আসেন। ওয়াভেল নির্বাচনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতের অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

অবশেষে দর কষাকষির পর কংগ্রেসই ১৯৪৬ সনের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। মন্ত্রীসভার কর্ণধার হন জওয়াহেরলাল নেহেরু। মুসলিম লীগও অক্টোবর ১৯৪৬ এ মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়। তবে তাঁরা স্থির করেন সংবিধান রচনায় তাঁরা অংশ নেবেন না। ১৯৪৭ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ১৯৪৮ এর জুনের মধ্যেই ভারতবর্ষের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেয়া হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের বন্দোবস্ত করার জন্য তখন ভারতের ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন।

কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বিরোধ চলছেই। মাউন্টব্যাটেন এ অবস্থায় আপোষ করার লক্ষ্য মুখ্য দেখিয়ে প্রস্তাব করেন নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। তবে দেশকে দুভাগ করা হবে। পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং পূর্ববাঙলা ও আসামের সিলেট জেলা নিয়ে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হবে—যার নাম হবে পাকিস্তান। ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় থেকেই পাকিস্তানও স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বলে গণ্য হবে। প্রস্তাবে বলা হল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও শ্রীহট্টের জনসাধারণের অভিপ্রায় গণভোটের মাধ্যমে জানা হবে।[১২]

একালের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা হলো বাঙলা ও পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা। ভারতের সর্ববৃহৎ দুটি প্রদেশকে আর্থিক, সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে পঙ্গু করে দেয়ার জন্য ব্রিটিশ, অবাঙালি নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ও লীগের সাম্প্রদায়িক নেতারা মিলে হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলের নামে দেশ দুটোকে দ্বিখণ্ডিত করেন এমনভাবে যে, সারাজীবন এখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা টিকেই থাকবে। কারণ নিরঙ্কুশভাবে মুসলমানের বা হিন্দুর অধিবাস রূপে বাঙলাকে ভাগ করা যায়নি পাঞ্জাবকেও না।

হিন্দু ও মুসলমান বাঙালি দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের এখন বাসিন্দা। ধর্মের পীড়নে ও কারণে দেশত্যাগ করে তাঁদের অনেকে 'মোহাজের' ও 'উদ্বাস্তু'র অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সয়েছেন। চরমভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। এই কালের রাজনীতির বহুমুখী আলোচনার তাই অন্ত নেই। কিন্তু এই সমস্যার অস্তিত্ব থাকতো না, যদি স্বাধীন বঙ্গদেশ গঠনের চেষ্টা সফল হত।

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য আব্দুল্লাহ রসুল প্রণীত কৃষক সভার ইতিহাস (১ম সংস্করণ) কলকাতা, ১৯৮২ এবং শেখর দত্ত প্রণীত তেভাগা আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৮৬। এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে।
২ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাঙলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা ২য় সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ. ৩২৫ ও ৪০২-৩।
৩. উপরিউক্ত।
৪. উপরিউক্ত, পৃ. ৩৪৩।
৫. উপরিউক্ত, পৃ. ৩৪৪।
৬. উপরিউক্ত, পৃ. ৩৪৫।
৭. উপরিউক্ত। এই সূত্রে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ১৯২৩ সনে অসহযোগ আন্দোলন সমাপ্ত হবার পর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-বিরোধের অবসানের নিমিত্ত লালালাজপত রায় ১৯২৫ সনেই ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুটি স্বতন্ত্র মুসলিম প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন।
৮. আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ২৫৪।
৯. এ.বি. এম. মাহমুদ, 'বাঙলার রাজনীতি ১৯৩৭-৪৭', বাঙলাদেশের ইতিহাস, মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য প্রণীত, ঢাকা, ১৯৭৭, ১৯৮১, পৃ. ৫৪৯-৫০।
১০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাঙলাদেশের ইতিহাস, উপরিউক্ত, পৃ. ৩৫৫-৫৬।
১১. বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে, স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ. ২৮৮-৯৩।
১২. উপরিউক্ত, পৃ. ২৯৪।

www.pathagar.com

খ. সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক ও ভাষিক পরিস্থিতি
(১৯৩১-৪৭)

এ-কালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমন পূর্ববর্তীকালের আর্থ-সামাজিক ঘটনাবলির জের, তেমনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সেকালের সাংস্কৃতিক জগতের নিয়ন্ত্রক ছিলো। কোনও কালের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সেকালের সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়। ফলে বাঙলাদেশের বহুধর্ম ও সংস্কৃতি ভাষা সমস্যারও সৃষ্টি করেছে। একালের সাংস্কৃতিক ঘটনাবলি, সাহিত্যিক নমুনারাজি এবং বাঙলাভাষার রূপ নির্ণয়ক বিতর্কগুলোর পরিচয় নিলে সে কথাই প্রমাণিত হয়।

বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবন বিকশিত হতো প্রধানত ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ভিত্তি করে। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের সাহিত্যে শিল্পেও তার রঙ লাগতে থাকে। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান হতে আরম্ভ করে রাজনীতিক ইস্যু ভিত্তিক। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, হিন্দু মহাসভা, মোহামেডান লিটারেরি এসোসিয়েশন, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, স্বরাজ্য দল, ফরওয়ার্ড ব্লক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, মোহামেডান, মোহনবাগান প্রভৃতির বিকাশ বা কার্যক্রমের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে বুঝতে বাকি থাকে না, রাজনীতি আর সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে পার্থক্য সামান্য।

বস্তুতপক্ষে বাঙালির সাংস্কৃতিক তৎপরতা ত্রিশের দশকে রাজনৈতিক কারণেই বহুমাত্রিকতা অর্জন করে। কংগ্রেস ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে; মার্কসীয় মতাদর্শ প্রভাবিত সংগঠন ও দলগুলো শ্রমজীবী, শোষিত শ্রেণীর মুক্তির লক্ষ্যে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চাচ্ছে; আর মুসলমানেরা স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখছে—এই তিনটি প্রধান প্রবণতা পরিচালিত করেছে একালের সাংস্কৃতিক জগতকে।

এসবের রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক-সম্মেলনের গুরুত্ব মনে রাখলে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তবে শিক্ষিত সমাজ, তথা সাহিত্যিক শিল্পীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সাহিত্য সম্মিলনীগুলোর ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। সৃজনশীল ও মননশীল সাহিত্যিক শিল্পীরাই প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক পটভূমি প্রস্তুত করেন। তাঁরা যুক্তিতর্ক উপমাসহ সাহিত্য শিল্পের দ্বারা পাঠক শ্রোতাদের মনকে সংশোধিত, পরিমার্জিত এবং চেতনাঋদ্ধ করেন বলেই তাতে রাজনীতির ফসল ভাল ফলে।

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার লক্ষ্যে হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমান্তরালে একালে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্মেলন যতগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাঁর কিছু কিছু বিবরণ গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। মুসলমানদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ হলেও আলোচ্য-কালের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের ওপর কোনো প্রবন্ধ বা গ্রন্থ লিখিত হয়নি। যদিও বিক্ষিপ্তভাবে অনেক সংগঠনের বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রাগ্রসর হিন্দু সমাজের অনুকরণে মুসলমানদের মধ্যেও নানান সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে, সে কথা আমরা জেনেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর কলকাতার পাশাপাশি ঢাকাও সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে বিকশিত হয়।

www.pathagar.com

১৮৬৩ সনে প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটী, ১৮৭৮ সনের সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন এবং কলকাতা মোহামেডান ইউনিয়ন (১৮৯৩), মহামেডান রিফর্ম এ্যাসোসিয়েশন (১৮৯৬), বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি (১৮৯৯), বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাসমিতি (১৯০৩), বেঙ্গল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন (১৯০৬), ইণ্ডিয়ান মুসলমান এ্যাসোসিয়েশন (১৯০৭), বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লীগ (১৯০৯), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১), আঞ্জুমনে ওলামায়ে বাঙ্গালা (১৯১৩), আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম (১৯১৬), বেঙ্গল মোসলেম ফেডারেশন (১৯২১) প্রভৃতির কার্যক্রম এ কালে অব্যাহত ছিল। এগুলোর তাৎপর্য রয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্যক্রমসমূহ এবং ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের (১৯২৬–৩৬) দশটি বার্ষিক অধিবেশন।[১]

কলকাতাকেন্দ্রিক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ হিন্দুদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ দীর্ঘ, এবং সেগুলোর কথা সকলের মোটামুটি জানা। মুসলিম সাময়িকপত্রের আলোচনায় মুসলমানদের কাজের বিবরণই দিই।

আলোচ্যকালে বাঙলার প্রতিটি জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ে মুসলিম লীগের সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৩৪-৪৭ সময়ে বাঙলার মুসলিম অধ্যুষিত সকল স্থানে এর সংগঠন অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। এসব সংগঠন মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক চেতনা সঞ্চারের দায়িত্ব সম্পন্ন করে।

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট মুসলিম এ্যাসোসিয়েশনের (১৯২০) ব্যাপক ভূমিকার কথা। এর আগে নবাব সলিমুল্লাহ্ 'ঢাকা প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি' গড়ে তোলেন। ১৯৩৬ সনে দি স্টার অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় উপরিউক্ত সংগঠনের ৩০০টি শাখা প্রশাখার তথ্য জানা যায়। এঁদের সমন্বিত সংগঠন ছিল 'ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট মুসলিম ফেডারেশন'।[২]

পাকিস্তান প্রস্তাব (১৯৪০) গ্রহণের পর, ১৯৪২ সনে কলকাতায় গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' (১৯৪২)। এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গড়ে ওঠে ঢাকায় ১৯৪৩ সনে।

প্রগতিশীল সংগঠনের মধ্যে উল্লেখ্য ১৯৩৬ সনে লক্ষ্ণৌতে গঠিত 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' এবং কলকাতার 'বঙ্গীয় লেখক সংঘ'র কথা। এর শাখা 'প্রগতি লেখক সংঘ' ঢাকায় ১৯৩৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সনে ঢাকার গেণ্ডারিয়া হাইস্কুলের মাঠে কাজী আবদুল ওদুদের সভাপতিত্বে এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ সনে জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের পটভূমিতে গঠিত হয় 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' এবং ঢাকার ব্যাপটিস্ট মিশন হলে অনুষ্ঠিত হয় 'সোভিয়েট মেলা'—যার উদ্বোধন করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।[৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম অধ্যাপক ও ছাত্রদের সলিমুল্লাহ্ হল, ফজলুল হক হল ও ঢাকা হল প্রভৃতির সাংস্কৃতিক কার্যক্রমগুলোও এখানে স্মরণীয়। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন :

> ...হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুদের এবং আলীগড় কলেজ ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের মুসলমানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যেরূপ

www.pathagar.com

উন্নতির কারণ, তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঠিক সেইরূপই উন্নতি সাধন করিয়াছে।... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা সবিস্তারে আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে পাকিস্তানের বীজ বহুদিন পূর্ব হইতেই দেশের মাটিতে রোপিত হইয়াছিল।[৪]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বস্তুতপক্ষে মুসলিম মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। কারণ মুসলমানদের অধুনা বিস্তৃত বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান সম্মিলনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেদিন যে জাগরণ সূচিত করে—তার তুলনা উনিশ শতকের হিন্দুদের নবজাগরণের সঙ্গেই করা সঙ্গত। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয়শ্রেণীর মুসলমানই সেদিনের হিন্দুদের মতো দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তর্কবিতর্ক সমালোচনার মাধ্যমে নিজেদেরকে সংশোধিত, সচকিত ও সংস্কৃত করে তুলেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এর অধিকাংশ ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন অমুসলিম, তথাপি এর জ্ঞানালোকের তীব্র কিরণ বিচ্ছুরিত হওয়ায় মুসলিমরা আলোকপ্রাপ্ত হয়ে উঠলো। মুসলিম পরিবারের সন্তানেরা এখানে বাঙলার জাগরণের ইতিহাস পাঠে মুক্তবুদ্ধির চর্চায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। শিখা গোষ্ঠীর 'বুদ্ধির মুক্তি'বাদীদের কথাই ধরা যাক। এঁদের আলোচনা বা প্রবন্ধাদি সেদিনের সাময়িকপত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। এঁদের চিন্তা চেতনার প্রভাব পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম মানসে প্রতিভাত হয়েছে। রক্ষণশীলেরাও এঁদের প্রভাবে উদারনৈতিক হয়ে উঠেছিলেন।

ত্রিশের দশকে ঢাকা ও বাইরের অন্যান্য শহরে অনুষ্ঠিত মুসলমানদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কিছুটা পরিচয় নেয়া যাক। চট্টগ্রাম মোহামেডান এডুকেশন সোসাইটির কার্যক্রম এবং বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষকদের কিংবা শিক্ষাবিষয়ক সম্মেলন মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। এঁরা মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক, যুগোপযোগী এবং ইংরেজি স্কুলের সমান্তরালে আনার পক্ষপাতি ছিলেন। আবুল হুসেনের 'বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা' শীর্ষক গ্রন্থ এসবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল। এই সময়ের সাংস্কৃতিক সংগঠনের ইতিহাস লিখিত না হওয়ায় একালের সাময়িকপত্রে প্রকাশিত, এবং সম্মেলনে পঠিত, আলোচনাসমূহের পাদটীকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, শিখা গোষ্ঠীর সম্পূরক সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে 'আল মামুন ক্লাব' বেশ কয়েকটি অধিবেশন বা সম্মেলনের আয়োজন করে। আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, ফজিলাতুন্নেসা প্রমুখের আলোচনা ছিল এর প্রধান বিষয়বস্তু।

'বঙ্গভূমি' (১৩৪৪) পত্রিকায় 'পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজ' এর ১ম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত ড. দীনেশচন্দ্র সেন এর একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এই পত্রিকা থেকে জানা যায়, চাঁদপুরে 'মুসলিম যুবক সমিতি'র একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় (১৯২৭ সনে প্রতিষ্ঠিত ?)। বুলবুল পত্রিকা থেকে জানা যায় (১৩৪০) কাজী নজরুল ইসলামকে 'চট্টগ্রাম বুলবুল সোসাইটি'র পক্ষ থেকে মানপত্র দেওয়া হয়। বুলবুলের দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (১৩৪১) 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মিলনী'তে প্রদত্ত স্যার এ. এফ. রহমানের বক্তৃতার সারমর্ম ছাপা হয়। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের 'চট্টগ্রাম জেলা সাহিত্য সম্মিলনী'র সভায় পঠিত, প্রবন্ধও দেখা যায় বুলবুলের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায়। ঐ পত্রিকায় ইব্রাহীম খাঁর একটি

www.pathagar.com

বক্তৃতাও ছাপা হয়, (কার্তিক, ১৩৪৩)–যা তিনি 'উত্তরবঙ্গ মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে'র দিনাজপুর অধিবেশনের সভাপতিরূপে বলেছিলেন।

দিনাজপুরের নাজিমউদ্দীন হল সোসাইটির পক্ষ থেকে ১৯৪২-৪৭ সময়ে বেশ কটি সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান জেলা ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি, হুমায়ুন কবির যে বক্তৃতা করেন, তাও বুলবুলের উপরিউক্ত সংখ্যায় ছাপা হয়। 'পূরবী' সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চট্টগ্রামে দুতিন বছর চালু ছিল। একটি সম্মেলনে কাজী আবদুল ওদুদ ভাষণ দেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত খাদেমুল এনছান সমিতির কয়েকশ শাখা-প্রশাখা বাঙলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার প্রায় সর্বত্র সক্রিয় ছিল। এঁদের (খাদেমুল এনছান সমিতি) সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্ম অবিভক্ত বঙ্গীয় সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার লাভ করে। ১৯৩২ থেকে ১৯৪৭ (এবং তার পরও) পর্যন্ত সিলেটের 'কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ' এর নিয়মিত সাপ্তাহিক মাসিক ও বার্ষিক সাহিত্য সভা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। 'পাকিস্তান'এর দাবি সোচ্চার হওয়ার পর 'আসাম বাঙলা ছাত্র ফেডারেশন' সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু করে। সিলেটের 'প্রভাতী'র মতো এসবের অনেক মুখপত্র ছিল।

মুসলিম সাময়িকপত্রে 'ঢাকায় নবী দিবস' অনুষ্ঠানের কর্মসূচির বিবরণ ছাপা আছে। সবুজ বাঙলার শ্রাবণ, ১৩৪২ সংখ্যায় জানা যায়, কলকাতা থেকে মাইক্রোফোন ও লাউড্ স্পীকার ভাড়া করে এনে ঢাকার 'চুড়ি হাট্টা মুসলিম যুবক সমিতি' মহাসমারোহে 'নবীদিবস' পালন করে। এই অনুষ্ঠান এত গৌরবর্জনক ও সাফল্যমণ্ডিত হয় যে, পূর্ববঙ্গে এত বিরাট ও ব্যাপকভাবে কোনো অনুষ্ঠানই আগে হয়নি বলে পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়।

কাজী আবদুল ওদুদের 'শাশ্বতবঙ্গ' শীর্ষক গ্রন্থে যে 'ফাতেহা দোয়াজ দাহাম' শীর্ষক প্রবন্ধটি সংকলিত আছে, তা তিনি ঐ ধর্মীয় সভায় পাঠ করেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায়, মুসলমানদের পয়গম্বর, হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর জন্ম ও মৃত্যু উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্যও সমাজে দেখা দিয়েছিল। এইকালে মুসলমানেরা রমজান মাসের ছুটিকে পূজোর ছুটির মতো দীর্ঘ করার প্রস্তাব করেছিলেন। 'সবুজ বাঙলা' মুসলমানদের নামের আগে 'শ্রী' ব্যবহারেরও বিরোধিতা করে। মুসলমানদের অধিকার সচেতনতার ও আত্মসম্মানবোধে জাগ্রত, শাণিত হওয়ার পরিচয় এটা। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক 'শ্রী' ও 'পদ্ম'র বিতর্ক 'মোহাম্মদী', 'সওগাত', বুলবুল, গুলিস্তাঁ প্রভৃতি ঐকালের মুসলমানদের প্রায় সকল কাগজে পর্যাপ্ত পাওয়া যায়।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও হাজী মোহাম্মদ মহসীন স্মরণেও মোহাম্মদী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। সওগাত বুলবুল ও অন্যান্য সাময়িকপত্রে এ বিষয়ে অনেক বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণের আন্দোলন প্রভৃতি মুসলমানদের অপবাদ স্খালনের এবং আত্মমর্যাদাশীল জাতি রূপে প্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রাম রূপে পরিচায়িত হয়েছে। তাঁদের শক্তির মহড়া প্রদর্শিত হলো ১৯৩৮ সনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে কলকাতায় 'আনন্দমঠের বহ্নুৎসব'-এ। এবং 'বন্দেমাতরম'-সঙ্গীতের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলনে।

১৯৩৭ সনে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে কংগ্রেসের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম'-এর মুসলমানদের জন্য আপত্তিকর দুটো চরণ বাদই দিয়ে দেওয়ার

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 'আনন্দবাজার' পত্রিকা এ-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে। ঐকালের হিন্দু সম্পাদিত পত্র পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের এই কর্মকে নিন্দা করা হয়। 'মোহাম্মদী' পত্রিকা তথা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নেতৃত্বাধীন সাংস্কৃতিক মহল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ও নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক থেকে মুসলিম বিদ্বেষ পূর্ণ রচনা বর্জনের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। মোহাম্মদীর 'ইউনিভার্সিটি সংখ্যা'য় যুক্তি দিয়ে মুসলমানদের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। অন্যান্য সকল মুসলমান সাধ্যমতো তাঁদের অবস্থানে থেকে মোহাম্মদীর এই আন্দোলনকে সমর্থন ও শক্তি জুগিয়েছে। সওগাতও হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম-বিদ্বেষ সমর্থন করেনি। করার কারণও ছিল না। কারণ, কিছুটা অসতর্কতা ও অজ্ঞতাতো হিন্দু-মহামতিদের ছিলই।

'আনন্দমঠের বহ্নুৎসব' করা হলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে যাঁরা মনীষী, ঋষি মনে করেন, তাঁরা ঢাকা, কলকাতা ও সারা বাঙলা তথা ভারতে বঙ্কিম জন্মশতবর্ষ পালন করেন গভীর আবেগে ও শ্রদ্ধায়। মনীষী রামমোহনের স্মৃতিশতবার্ষিকীও (১৯৩৩) পালিত হয় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং কলকাতায়। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা প্রগতিপন্থী তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র ও রামমোহনের মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করেন যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে। রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বহু সভা-সম্মিলনে কাজী আবদুল ওদুদ, রেজাউল করিম, হুমায়ুন কবির, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ অভিভাষণ ও প্রবন্ধ পাঠ করেন সদর্থক অনুরাগীর মন নিয়ে। রেজাউল করিম, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯৪৪ সনে। এসবই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত সহায়ক পাঠ্য পুস্তক ছিল। এতে মুসলমানদেরকে অপরিণামদর্শী, সাম্প্রদায়িক রূপেই সারা দেশের ছাত্র কৃষকদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর ফল কিন্তু ভালো না হয়ে বিচ্ছেদ বা বিভেদ নিশ্চিত করেছে। দূরত্বই বেড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সম্পর্কে বিশ্বভারতীতে তিনদিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন (১৯৩৫) এবং মনীষী কাজী আবদুল ওদুদকে সেই সেমিনারে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের 'মুখবন্ধ' নিয়ে ১৯৩৬ সনে তা 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' নামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তবু ১৯৪৬ সনে মুসলিম লীগের 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন'-এর প্রয়োজন তিরোহিত হয়নি। মুসলমানদের জাগরণে ঈর্ষান্বিত, বিদ্বিষ্ট হিন্দু বাঙালিরা সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতৃত্বের উস্কানীতে মুসলমানদের সঙ্গে আপোষের প্রয়োজনীতা বোধ করেনি।[৫]

বাঙালি মুসলমানরাও পশ্চিমা অবাঙালি (জিন্না প্রভৃতি) নেতাদের উস্কানীতে হিন্দুদের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপনের দিকে না গিয়ে স্বকীয় ক্ষমতায় বেশী আস্থাশীল হয়ে উঠেছিলেন। বাঙলার মুসলমানেরা যে রাষ্ট্রীয় সুযোগের সমান দাবিদার, সেসব কথা বুঝাবার বিচিত্র প্রয়াশ রয়েছে একালের সাময়িকপত্রে : যেমন রাজস্ব কারা কতো দেয়, জনসংখ্যার হার কত, মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছনে পড়ার কারণ কি ইত্যাদি। এসব কথা বলার নৈতিক শক্তি যুগিয়েছিল শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়ায়। তাছাড়াও বিশ্বযুদ্ধ দুটোর মধ্যবর্তী সময়ে (১৯১৪-৩৯) মুসলমান সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। অবিভক্ত বাঙলার রাজধানী কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র

www.pathagar.com

নির্বাচিত হয়েছিলেন দুজন মুসলমান—শেরে বাঙলা এ. কে. ফজলুল হক ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। অবিভক্ত বাঙলার দুতিনজন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন মুসলমান, যেমন এ.কে. ফজলুল হক (১৯২৪) এবং স্যার আজিজুল হক (১৯৩৪)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রথম মুসলিম ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন এসময়েই–লে. কর্নেল হাসান সোহরাওয়ার্দী (১৯৩০) এবং স্যার আজিজুল হক (১৯৩৮–৪২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন উপাচার্য হন মুসলমান সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং স্যার এ. এফ. রহমান।

কৃষক প্রজা আন্দোলনের সূচনা হয় শেরে বাঙলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৯১৫ সনে। ১৯২৯ সনে বিচারপতি, স্যার আবদুর রহিমের সভাপতিত্বে গঠিত হয় নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি—যার সদস্য অধিকাংশই মুসলমান এবং এর দ্বারা তাঁরা যথেষ্ট সচেতন ও স্বাধীনতাকামী, উচ্চাভিলাষী হয়েছিলেন। এরই পরিণতিতে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত কার্যত অবিভক্ত বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বা প্রশাসক ছিলেন মুসলমান।

গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমানরা যখন অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তখনই হিন্দু সম্পাদিত পত্র পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত অভদ্রজনোচিত সমালোচনা করা হয়েছে এবং বলা দরকার যে, এই সমালোচনা ছিল ছিদ্রান্বেষীর দৃষ্টিতে লিখিত বিষোদগার মাত্র। একালের মুসলিম সাময়িকপত্রে হিন্দু সম্পাদিত পত্র পত্রিকার অযৌক্তিক অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে। ফলে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাগুরুর দল ভারী করার জন্য অবাঙালি হিন্দুদের নেতৃত্বাধীন লেজুড় হতে লজ্জাবোধ করেনি। বাঙলা ভাষার ভিত্তিতে বঙ্গ প্রদেশ গঠনের কতিপয় হিন্দুনেতার প্রস্তাব তাই সমর্থন পায়নি।

১৯৩৬ সনে 'দৈনিক আজাদ' স্থাপিত হয়। ১৯৩৯ সনে মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় নেতাদের মধ্যে ঐক্য সংঘটিত হলো। আর এই সনেই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পরিষদের (সমিতির) ৬ষ্ঠ–৭ম অধিবেশন পালিত হলো কলকাতায় জুবিলী উৎসব ও ঈদ উৎসব রূপে। ১৯৪০ সনে তো লাহোরে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব অনুমোদনই করে। এরপর পাকিস্তান বাস্তবায়নের আন্দোলন চলে ১৯৪৭ পর্যন্ত।

অতএব একালের সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও ভাষিক কার্যক্রম, আন্দোলন, জনমত সংগঠন প্রক্রিয়া—সবই চলেছে এই পাকিস্তান প্রস্তাবের রাজনৈতিক ইস্যুকে সামনে রেখে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম জাগরণ বাস্তবায়নের এবং প্রতিরোধের প্রয়াসই ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা বা চালিকাশক্তি।

২

বাঙালি মুসলমানকে স্বতন্ত্র আবাসভূমি গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছিল সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্য আসাতেও। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তিত্বরা যখন সাফল্য ও দক্ষতার সঙ্গে কার্যসম্পাদন করছিলেন, আর বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রেও যখন মুসলমানেরা হিন্দুদের কাছেও গ্রহণযোগ্য, উৎকৃষ্ট সাহিত্য শিল্প, সঙ্গীত সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন,—তখন মুসলিম সমাজে বিরাজমান হীনমন্যতাবোধ অপসারিত হতে আরম্ভ করে। তাঁরা যে অযোগ্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, অবহেলার পাত্র, এমন ধারণা আর তাঁরা পোষণ করতে চাইলেন না। বৃহত্তর হিন্দু সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

গৌরব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (যদিও তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন) পাশাপাশি তাঁরা কাজী নজরুল ইসলামকে দেখাতে ও দেখতে পেয়ে সন্তোষ লাভ করলেন। নজরুলের ইসলামিক গানে সারা বাঙলার মুসলিম অফুরন্ত প্রেরণা লাভ করে। যেমন—

১. ও মোর রজমানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাকিদ॥

২. দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে তুইও তার প্রাণ প্রদীপ জ্বাল॥

৩. কোথায় তখত তাউস, কোথায় সে বাদশাহী।
কাঁদিয়া জানায় মুসলিম ফরিয়াদ য়্যা এলাহী॥

৪. জাগে না সে জোশ লয়ে মুসলমান।
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান॥

৫. মোহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়।
ওয়া হোসেনা ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায়॥

৬. শহীদী ঈদগাহে দেখ্ আজ জমায়াত ভারি।
হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারি॥

৭. সাহারাতে ফুটল রে রঙিন গুলে-লালা।
সেই ফুলেরই খোশ্‌বুতে আজ দুনিয়া মাতোয়ালা॥

৮. আল্লা আমার প্রভু আমার নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়॥

৯. ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এল নবীন সওদাগর।
রজনীসব আয়, আয় গুনাহগার, নতুন করে সওদা কর॥ এবং

১০. বক্ষে আমার কাবার ছবি
চক্ষে মোহাম্মদ রসুল।—ইত্যাদি।[৬]

এসকল গান যখন রেডিও ও গ্রামোফোনে আব্বাসউদ্দীন কে. মল্লিক প্রমুখের কণ্ঠে গীত হয়েছে, তখন মুসলমানেরা একই সঙ্গে পেতেন ধর্মীয়, শৈল্পিক সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক, মুসলিম জাতীয়তাবাদী দেশাত্ববোধক আস্বাদন। স্বাধীনতা সংগ্রামের তথা বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রেরণামূলক সঙ্গীত সাহিত্যে ইত্যাদিও তাঁদের রয়েছে, এই অভিজ্ঞান তাঁদের অনুভূতিতে বিচিত্র বিক্রিয়া সংঘটিত করতো। তাঁদের মনে জেগে উঠত একসঙ্গে অনেক অনেক বিচিত্র সব ছবি ও কথা।

অবশ্য ত্রিশের দশকের পূর্বে মুসলিম সাহিত্যিক, মনীষীবৃন্দ তাঁদের জাতীয় জীবনে সাহিত্যের অমৃতধারার মাধ্যমে জাগরণ সৃষ্টি তথা সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও ভাষিক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যে আন্দোলন পরিচালনা করে আস্‌ছিলেন, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের সাহিত্যিক উৎকর্ষ ছিলো তারই ফসল বা পরিণতি। বিশ শতকের প্রথম থেকেই এ আন্দোলন পরিচালিত হয়ে আসছিলো মুসলিম সাহিত্যিক সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ঐ কালের (এবং এ কালেরও) সাহিত্যপত্রিকাগুলো পরিচালিত হয়েছে সমাজের কল্যাণকামী বিভিন্ন অঙ্গনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দ্বারা। তাঁরা আবার একই সঙ্গে সকল ক্ষেত্রেরই প্রধানতম ব্যক্তিত্বও। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আকরম খাঁ,

www.pathagar.com

ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ইব্রাহীম খাঁ, মুজফফর আহমদ, নজরুল ইসলাম, মুহম্মদ নাসিরউদ্দীন, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্, সৈয়দ আবদুর রব প্রমুখের কথা স্মরণ করলেই উপর্যুক্ত বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭]

'আল্ এস্লাম', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি ঐ কালের সাময়িকী সমূহের ভূমিকা বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণের ইতিহাসে কি জন্য উল্লেখ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত তা নিচের কয়েকটি উদ্ধৃতিই উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

১. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানের পশ্চাৎপদতায় ব্যথিত হয়ে ক্ষোভের সঙ্গে ১৯১৬ সনে লিখেছিলেন :

> আজ অর্ধ শতাব্দীরও বেশী হইল আমাদের সমাজে বাংলার প্রচলন হইয়াছে...কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আজও আমাদের বাংলা সাহিত্য তেমন করিয়া গড়িয়া উঠিল না—যাহাতে এই বিশাল ও বিপুল জনসংঘের প্রাণে জীবন রসধারা সঞ্চার করিতে পারে।...আমাদের শিক্ষিত লোকদিগের প্রাণের স্পন্দন ও ভাবের প্রবাহ নিতান্তই দুর্বল ও ক্ষীণ।...প্রতিভা আমাদের খুবই আছে—কিন্তু হায় ! সেই প্রতিভা বিকাশের কোন ক্ষেত্র নাই ; পরামর্শ দাতা নাই এবং চেষ্টাও নাই, চিন্তাও নাই।[৮]

তিনি প্রতিভা বিকাশের জন্য সাধনা, আলোচনা, গবেষণা ও উৎসাহের উৎসবের গুরুত্ব বর্ণনা করেন। পরামর্শ দেন পত্রিকা প্রকাশ করতে, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সমিতি গড়ে তুলতে। বলেন, তাহলেই মুসলমানদের পক্ষে সাহিত্যক্ষেত্রে উন্নতি করা সম্ভবপর হবে। আর স্পষ্ট করে (বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই) ইংরেজি ও আরবি জানা অভিজাত (আশরাফ) মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন : মাদ্রাসাগুলোতে বাংলা ভাষার বহুল চর্চার ব্যবস্থা আবশ্যকীয়। তাতে আরবী শিক্ষা প্রাপ্তদের দ্বারাও 'বাংলা সাহিত্যগঠনের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা হইতে পারে'। এবং এ-ভাবে কাজ শুরু হলেই

> ইনশাল্লাহ্ দশ বৎসরের মধ্যে জাতীয় সাহিত্যের সঞ্জিবনী-ধারা সমাজদেহে তর তর করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সেই সাহিত্যের পুণ্যপ্রবাহে আমাদের জাতীয়জীবনতরণী নূতন শক্তি ও তেজের পাল উঠাইয়া ছুটিতে থাকিবে এবং ক্রমশ যশ, সম্পদ, ধন, মান প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির উপকূলে যাইয়া 'মঞ্জেল' হাসিল করিতে সমর্থ হইবে।[৯]

২. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, বাঙালি মুসলমান অর্থগত বিবেচনায় দরিদ্র নয় বটে, তবে সে সাহিত্যে দরিদ্র। যে জাতির সাহিত্য সম্পদ নাই, তাকে সভ্য বলা চলে না। বাঙালি মুসলমানকে হিন্দুরা যে যে কারণে ঘৃণা করে, তার মধ্যে প্রধান হল সাহিত্যিক দারিদ্র্য। "সাহিত্যিক হিন্দু অসাহিত্যিক মুসলমানকে ঘৃণা করিবেইত।...বর্তমান যুগে বাঙালি মুসলমান...যদি অলস হইয়া বসিয়া থাকে...তবে বাঙলার বক্ষে তোমার স্থান নাই। জাননা কি যোগ্যতমের রক্ষাই প্রকৃতির নিয়ম? তোমাকে বড় হইতে হইবে। তোমাকে তোমার অগ্রজের সমান বড় হইতে হইবে।"

মুহম্মদ শহীদুল্লাহও জাতির উন্নতির জন্য অনেক পরামর্শ দেন। তিনি মুসলমানের ছাত্র পাঠ্য পুস্তকের অভাবের কথা বলেন। হিন্দু-মুসলমানের ভারসাম্যহীন অবস্থা সৃষ্টি হয়, এমন ইতিহাসেরও নিন্দা করেন। নিজেদের ইতিহাস লেখার জন্য তিনি মুসলিম লেখকদেরকে পরামর্শ প্রদান করে বলেন :

www.pathagar.com

যে মুসলমানকে ভারতে ইতিহাসের জন্মাদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আজ সেই মুসলমান বাঙলাদেশে ইতিহাসের চর্চা ছাড়িয়া দিয়াছে। জাতির প্রাচীন ইতিহাস... আত্মসম্মান জাগাইয়া দেয়,...উচ্চাকাঙ্ক্ষা আনিয়া দেয়...আমাদের সন্তানদিগকে ভবিষ্যতের জন্য উপযোগী করিতে হইলে, এখন হইতে আমাদিগকে জাতীয় ইতিহাসের আলোচনায়...উপযুক্ত পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতে হইবে।[১০]

তিনি বলেন, জাতীয় জীবন গড়তে হলে সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত এবং কতিপয় অনুকরণীয় আদর্শ খাড়া করতে হবে। খালি প্রেমকাহিনী লিখলে ফল হবে না। 'মুসলমানের উপন্যাস ও নাটকের ভিতর একটি মুসলমানী গন্ধ থাকা চাই। নচেৎ জাতীয় জীবনের জন্য সে উপন্যাস, সে নাটক বৃথা।...কাব্য ও খণ্ড কবিতায়ও এসলামিক ভাব থাকা চাই।'

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে বলেন, 'মুসলমান গ্রন্থকারদিগকে একটি আদর্শ চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া' জাতীয় ও নৈতিক জীবন গঠনে এবং প্রতিভার পরিচয় দানে সক্ষম হতে হবে। যদি এসব কোনো লেখকের রচনায় না থাকে 'তবে তাহার লেখনী বৃথা'।[১১]

উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহ কিন্তু নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বের (১৯১৬ সনের)। ১৯২০ সনে কাজী নজরুলের আবির্ভাব। দুতিন বছর পরে কল্লোলে (১৯২৩) জসীমউদ্‌দীনের কবিতাও ছাপা হয়। ১৯২৬-২৭ সন নাগাদ হুমায়ুন কবির, সৈয়দ মুজতবা আলী, মুহম্মদ এনামুল হক, কুদরত-এ-খুদা, এ. এফ. রহমান, স্যার আজিজুল হক, আবদুল কাদির প্রমুখ আধুনিক, মেধাবীদের আবির্ভাব ঘটে। শিখা-গোষ্ঠীর কথা বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কাজী নজরুলের নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানেরা সচকিত, সুস্পষ্ট জাগরণ সৃষ্টি করতে সত্যিই সফল হলেন। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে ১৯২৫ সনে নজরুলের কাছে এক পত্রে এই আহ্বান জানিয়েছিলেন যে, মনে এবং সাহিত্য সম্পদে দরিদ্র মুসলমানকে জোরে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে, পথে আনতে হবে। বাঙালি মুসলমানের প্রত্যাশা যে, ইসলামের প্রাণবাণী নজরুলের কণ্ঠে ইসরাফীলের সিঙ্গার মতো প্রতিধ্বনিত হয়ে মুসলমানকে জাগ্রত করে তুলবে, আর মুসলিম-সাহিত্য-রাজ্যের খালি সিংহাসন তিনি দখল করবেন।[১২]

জবাবে নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, 'আপনাদের আহ্বানের আগেই আমার ক্ষুদ্র শক্তির সবটুকু দিয়ে এদের জাগাবার চেষ্টা করেছি—শুধু যে লিখে তা নয়, আমার জীবনী ও কর্মশক্তি দিয়েও।...আমি জানি যে, বাঙলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্মজাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজ রুদ্ধ।'

তিনি বলেন হিন্দু-মুসলমানের অশ্রদ্ধা দূর করতে না-পারলে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না,...একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে। কিন্তু ইসলামের 'সভ্যতা শাস্ত্র ইতিহাস' এ সমস্তকে কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার নয় কি?[১৩]

১৯৩২ সনে কাজী নজরুল ইসলামের বয়স যখন মাত্র চৌত্রিশ, তখন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র পঞ্চম অধিবেশনের উদ্বোধনের দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন 'মহাশ্মশান'এর কবি কায়কোবাদ। খুব জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্দীপিত মুসলমানেরা এই সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত করেন। ঐ বারই সাহিত্য ইতিহাস,

www.pathagar.com

দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাখার পৃথক অধিবেশন বসে বিভিন্নজনের সভাপতিত্বে। সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে কাজী আবদুল ওদুদ ও ড. কুদরত-ই-খুদা (১৯০০-৭৭)।[১৪]

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) ; ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) ; শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) ; বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) প্রমুখ পরলোক গমন করছেন। যুক্তিবাদী মানবতাবাদী ধারার প্রধান লেখক ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান এবং আবুল হুসেন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, নজরুলের নেতৃত্বে মুসলিম তরুণ প্রতিভারা কল্লোল-প্রগতি-ধূপছায়া-পরিচয়-কবিতা-অগ্রগতি-দেশ প্রভৃতি পত্রিকার পাশাপাশি আধুনিক ধ্যান ধারণায় পুষ্ট সওগাত, জয়তী, বুলবুল, প্রাতিকা, সবুজ বাঙলা, ছায়াবীথি, মৃত্তিকা, চতুরঙ্গ ইত্যাদি বের করা শুরু করলেন, রচনা করতে রইলেন নিরন্তর কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, একাঙ্কিকা, নাটক, নকসা ইত্যাদি।

এসবে প্রত্যাশিত মাত্রায় না হলেও (বিতর্ক থাকতে পারে, থাকবেও) পর্যাপ্ত রূপায়িত হলো মুসলিম জীবনচিত্র, মুসলমানী অনুভূতির শৈল্পিক ব্যঞ্জনা। মুসলমানদের ধর্মীয় এবং (সঙ্গে সঙ্গে) আন্দোলন উন্মুখর অনুভূতির এমন সাহিত্যিক প্রকাশ বিশের দশকের পূর্বে আর পাওয়া যায়নি।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে উৎকৃষ্ট সুরে গীতযোগ্য গান পরিবেশিত হচ্ছে একজন মুসলিমেরই কণ্ঠে, তা লিখেছেন মুসলমান কবি, প্রকাশিতও হয়েছে মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্রে-যাঁরা তাঁদের সমকালীন, পরিচিত, শুভানুধ্যায়ী। মুসলিম-মানসের ক্ষুধা তৃষ্ণার পানাহার তাঁরা রীতিমতো সরবরাহ করে ও পেয়ে সহসাই হৃষ্ট-পুষ্ট পুলকিত হলেন,—এর সঙ্গে আনন্দ ও গর্ববোধ সংযোগ করলো খেলার মাঠের এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের বিজয়ের ও সাফল্যের ঘটনারাজি। এ কালের সাহিত্যপত্রিকার পাতায় খেলাধুলার এবং সাংস্কৃতিক ঘটনার সচিত্র সংবাদ পরিবেশনের প্রবণতা আমাদেরকে একথাই বলতে উদ্বুদ্ধ করে। সাহিত্য পত্রিকাসমূহ সেকালে সমান তালে রাজনীতিরও চর্চা করতো, যেমন এখনও করে, একথা বলাই বাহুল্য।

১৯৪৭ পূর্ববর্তী আধুনিক কবি সাহিত্যিকদের সিনিয়ারিটি লিস্ট বা মেধাতালিকা দিতে গেলে দ্বিরুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আলোচনার খাতিরে বলতে হয় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী আবদুল ওদুদ, ইব্রাহীম খাঁ, এস. ওয়াজেদ আলি, আবুল হুসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, জসীমউদ্‌দীন, রেজাউল করিম, হুমায়ুন কবির; সৈয়দ মুজতবা আলী, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, শামসুন্নাহার, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, আবু রুশদ প্রমুখের সাহিত্যিক প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সকল সম্প্রদায়ের পাঠকের কাছেই গ্রহণযোগ্য, আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। স্কুলের পাঠ্য বইয়ে জসীমউদ্‌দীনের কবিতা দীর্ঘদিন পঠনীয় ছিল। সবুজপত্র, কল্লোল, প্রগতি, পরিচয়, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায়ও মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের রচনা স্থান পেয়েছে। নজরুল ইসলামের রচনা প্রকাশের আগাম বিজ্ঞপ্তি কল্লোল কবিতা প্রভৃতিতেও দেখা গেছে। অতএব মুসলমানদের আত্মপ্রত্যয়ী হতে আর বাধা ছিল না।

www.pathagar.com

'দৈনিক আজাদ' (১৯৩৬–৮৬) এতে বেশী করে ইসলামি রঙ লাগাতে আরম্ভ করে। 'হিন্দু–মুসলমানের বিরোধ' ও 'অবাঞ্চিত ব্যবধান' বিষয়ে সেমিনার, আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই প্রেক্ষাপটেই। ফলে মুসলমানদের মধ্যে অখণ্ড ভারত এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমির পক্ষ ও বিপক্ষ দুটি ধারার চিন্তক ও সমাজকর্মীর সৃষ্টি হয়। শিখা গোষ্ঠীর মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনকারীদের মূল বক্তব্য ছিলো 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।

১৯৪৭ সন পর্যন্ত রামমোহন–বিদ্যাসাগর–রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী বুদ্ধির মুক্তিবাদীদের ধারাটি সক্রিয় থাকলেও ক্রমেই পাকিস্তানবাদী চিন্তাধারা রাজনীতিতে যেমন, তেমনি সাহিত্যেও প্রবল হতে থাকে। এ থেকেই ভাষা সংক্রান্ত বিতর্কও বেগবান হয় এবং ইসলামি শব্দ ও চেতনা সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষের শক্তি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল প্রমুখ এমনকি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও তাতে যোগ দিয়েছিলেন।

৩

সাহিত্যে সমৃদ্ধি আনয়ন ও জাগরণ ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাষা সম্পর্কেও বাঙালি মুসলমানেরা সচেতন হন এবং বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। ক্ষোভের সঙ্গে ড. শহীদুল্লাহ লিখেছিলেন : 'কি পরিতাপের বিষয়, আমাদের শিশুগণকে প্রথমেই রাম শ্যাম গোপালের গল্প পড়িতে হয়।'[১৪]

হিন্দুদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তাঁরাও লেখাতে সংস্কৃত সাহিত্যজাত ব্যঞ্জনা এবং তার কাব্যালঙ্কার জোর জবরদস্তিমূলক প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। মুসলমানেরা তখন বাংলা–উর্দুর বিতর্কে তেমন জোর পাচ্ছেন না। তাঁরা বাংলাকেই বাঙালি মুসলমানের প্রধানতম অবলম্বনীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে তাতেই মুসলমানি ভাষা ও অলঙ্কার প্রয়োগের ব্যাপারে উৎসাহী হলেন। তাঁরা বললেন, তাঁদেরও রয়েছে আরব ইরান আফগানিস্তানের সংস্কৃতির তথা ইসলাম ধর্মের ও দর্শনের উত্তরাধিকার।

হিন্দুরাও বাঙলাদেশ তথা বাংলাভাষা তাঁদেরই, এই চেতনায় বাংলাভাষা থেকে মুসলমানি উৎপাত উৎখাতে বিতাড়নে তৎপর হলেন। নজরুলের ওপরও তাঁরা খড়গহস্ত হয়ে বল্লেন, ওঁর কাব্য দুর্বোধ্য, ভাষা ও উপমা অচেনা! নজরুলকে তাই মীমাংসার সুরে ব্যাখ্যা দিতে শুনি :

> বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না–হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে ও বাদ দিলে বাংলা ভাষার অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরেজি সাহিত্য হতে গ্রীক পুরানের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাংলা সাহিত্য হিন্দু–মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব–দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়,—হিন্দুরও তেমনি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে নিত্যপ্রচলিত মুসলমানি শব্দ তাঁদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু–মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাঁদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দুর দেব–দেবীর নাম নিই।[১৬]

'মুসলিম সাহিত্য' সম্পর্কে তিনি বলেন, তবুও তা ('মুসলিম সাহিত্য') সকল জাতিরই হবে কারণ মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য বা মুসলিম ভাবাপন্ন সাহিত্য 'সাহিত্য'ই, মুসলিমের

www.pathagar.com

ধর্মীয় শাস্ত্রীয় সাহিত্য তা নয়। কারণ সকল লেখকেরই সাহিত্যের বহিরঙ্গে 'একটা ধর্ম থাকবে নিশ্চয়। ইসলাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্য রচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইসলাম কেন, কোন ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না। ইস্‌লামের সত্যকার প্রাণশক্তি : গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকার বাদ।'[১৭]

ত্রিশের দশকে মুসলমানি বাংলা বনাম হিন্দুয়ানী বাংলার বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে সরকারি চাকুরে অন্নদাশংকর রায় ছদ্মনামে (লীলাময় রায়) খুব ক্ষোভের সঙ্গেই লিখেছিলেন (১৯৩৪) :

> মুসলমানরা আমাদের নাম রেখেছেন হিন্দু। সে নাম আমরা সগৌরবে বহন করে আসছি, কোনো আপত্তি করিনি....রক্তে মুসলমান নই বলে কোনো কোনো মুসলমানের চেয়ে কম মুসলমান নই আমরা।...মুস্কিল বেধেছে মাদ্রাসার পাঠ্য-পুস্তক থেকে শেখা মুসলমানী শব্দ নিয়ে। আমরা বলছি, যত মুসলমানী শব্দ নিয়েছি তাই কিছু কম নয়। আমরা যত মুসলমানী কথা বলি তত বাঙলার মুসলমানরাও বলেন না, বোঝেন না।... আমরা যখন তাঁদের সঙ্গে কথা বলি, তখন তাঁরা দয়া করে আমাদেরই মতো করে বাক্যালাপ করেন। আমাদের গায়ে লাগে যখন তাঁরা বাংলা সাহিত্য নাম দিয়ে মূল্যবান আরবী কেতাব লেখেন।[১৮]

বেশ বড় ও ব্যাঙ্গাত্মক এই লেখায় ('সবুজ বাঙলা'র আলোচনা' দেখা যেতে পারে) অন্নদাশংকর রায় মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন (১৯৩৪) :

> হে মুসলমান, তোমার পিতৃকুল যাই হোক তোমার মাতৃকুল হিন্দু। তোমার মাতৃভাষা বাঙ্গালী হিন্দুর ভাষা। তোমার মাতামহীর ভাষা সংস্কৃত। যে কারণে তোমার বাড়ীর স্ত্রী লোকেরা শাড়ী পরেন, সেই কারণে তোমাকেও সংস্কৃত পড়তে হবে। উপরন্তু আরবী, ফার্সী, ইংরেজি পড়তে পারো, কিন্তু গোড়াতে পড়তে হবে ইতিহাসে যে ভাষাকে বাঙলা বলা হয়েছে সেই ভাষা ও তার বিবর্তন হয়েছে যার থেকে সেই সংস্কৃত ভাষা। স্বদেশের ট্রাডিশ্‌নকে অগ্রাহ্য করে বিদেশের কালচারকে আবাহন করা হচ্ছে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া। আরব পারস্য তোমার প্রপিতামহের স্বদেশ হলেও তোমার স্বদেশ নয়, যেমন আমেরিকানের স্বদেশ নয় ইংলন্ড। স্বদেশের বুনিয়াদের উপর যদি তাকে স্থাপন করতে পারো তবেই তুমি স্বদেশের তথা স্বসম্প্রদায়ের বিজয়-স্তম্ভ নির্মাণ করতে পারবে। নতুবা পরিচয় দিতে থাকবে তোমার বিজিত মনোবৃত্তির, তোমার ন ঘরকা ন ঘাটকা নীতির।[১৯]

'বুলবুল' পত্রিকা যখন প্রকাশিত হয়, (১৩৪০-৪৫/১৯৩৩-৩৮), তখনই চলছিল এই বিতর্ক। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর মতামত চেয়ে পাঠালেন বুলবুল-এ প্রকাশের জন্য। প্রমথ চৌধুরী লিখলেন :

> ...বুলবুল সম্পাদক জানতে চেয়েছেন যে বাঙলা ভাষায় ফারসী ও আরবী শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে আমার মত কি? আমার মত এই যে, ফারসী ও আরবী শব্দ কেটে দিলে বাঙলা ভাষা বলে কোনও একটা ভাষাই থাকে না।...সুতরাং সে সব কথা বাঙলা ভাষা থেকে বহিষ্কৃত করলে আমাদের মুখের কথাও বন্ধ, লেখাও বন্ধ হয়। যদি এমন কোনও কাণ্ডজ্ঞানরহিত হিন্দু সাহিত্যিক থাকেন, যিনি ফারসীর পরিবর্তে তাঁর সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে চান, তাহলে তাঁকে বলি সংস্কৃত ভাষায় সে জাতীয় প্রতিশব্দ নেই।...অতএব গোলযোগের সৃষ্টি হবে। বাঙলার প্রত্যেকের ও প্রত্যহের নিত্য ব্যবহৃত অনেক কথার কুল-শীলের খবর ইউরোপে খুঁজতে হয়, দেদার পর্তুগীজ শব্দ বাঙলা ভাষা

www.pathagar.com

আত্মসাৎ করেছে। ফরাসী শব্দ ও ওলন্দাজ শব্দও অনেক আমাদের ভাষায় আছে। বাঙলা ভাষার বর্তমান ঐশ্বর্য্যও এই কারণেই।

সুতরাং শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত লেখকেরা যখন এই বিদেশী শব্দগুলিকে অস্পৃশ্য করতে চান, তখন তাঁরা বাঙলা ভাষার অঙ্গহানী করতে চান, এ কাঁটা তাঁরা বাঁচতে পারবেন না। তবে একটি কথা এ স্থলে বলা আবশ্যক ; নূতন করে ফারসী ও আরবী শব্দ আমাদের ভাষায় আমদানী করার কোন প্রয়োজনও নেই ; অবসরও নেই। নূতন নূতন যে সব শব্দ বাঙলায় ঢুকবে সে সবই ইংরেজী শব্দ।...একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, যাঁরা বাঙলাকে প্রায় সংস্কৃত করে তোলবার প্রস্তাব করতেন। যদি তাঁদের অনুরূপ কোনও সম্প্রদায় মুসলমান সমাজেও থাকে, তাহলে বীরবলের একটি পুরানো উক্তি এখানে উদ্ধৃত করে দিই। বীরবল বলেছিলেন : 'এ দোটানায় পড়ে বেচারা বঙ্গস্বরস্বতী কাশী যাই কি মক্কা যাই স্থির করতে না-পেরে চলৎশক্তি রহিত হবেন।'[২০]

১৩৪১ বঙ্গাব্দে কানপুরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' শাখার সভাপতির অভিভাষণে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন :

বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে...এক নূতন যুগসন্ধি দেখা দিয়াছে।... বিংশ শতকের এই প্রথমার্ধে মুখ্যত ইংরেজের রাজনীতির চালের প্রভাবে বাঙ্গালী মুসলমানকে প্রকৃত মুসলমান বানাইবার চেষ্টায় ও আশায় নূতন ভাবে ভারতীয় ইসলামী সংস্কৃতির অর্থাৎ আরব ও পারস্যের ইসলামী সংস্কৃতির উত্তর-ভারতীয় বা উর্দু অনুকরণের আবাহন...বাঙ্গালী হিন্দুর ভালো লাগিতে পারে না—কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত মনোবৃত্তিকে দরদের সঙ্গে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। ...সাগ্রহে প্রার্থিত মুসলমান বাঙ্গালী সংস্কৃতি ...কিভাবে দেখা দিবে এবং তাহাতে সত্য শিব ও সুন্দরের প্রকাশ কিভাবে হইবে, তাহার কথা ভাবিয়া কেহ আতঙ্কিত, কেহ পুলকিত, কিন্তু তাহার স্বরূপ কেহই জানে না, অনুমানও কেহ করিতে পারিতেছে না। সে জিনিস আসিলে, তাহার সহিত বাঙ্গালী হিন্দু সংস্কৃতির একটা আপস অবশ্যম্ভাবী হইবে ; কারণ, একই দেশের মধ্যে, রক্তে ও ভাষায় ও ইতিহাসে এক, এমন জাতির দুই ধর্ম সম্প্রদায় দুইটি বিভিন্ন ও প্রতিস্পর্ধী রাষ্ট্র রূপে থাকিতে পারে না।...আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে যদি বাঙ্গালা ভাষাকেও আমরা হিন্দীর মতো দুইটি ধর্মের ভাষা করিয়া তুলিয়া দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির ভাষাতে রূপান্তরিত করিতে না চাই-...তাহা হইলে লিপি এক রাখিয়া যথেষ্ট পরিমাণে Laisses faire অর্থাৎ 'রুচি অনুসারে চল' এই নীতি পালন করিতে হইবে। অর্থাৎ, মুসলমান লেখক আবশ্যক মনে করিলে আবরী ফারসী শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার করিবেন এবং বিশেষ করিয়া ইসলামী ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক এই প্রকার শব্দ হিন্দুদেরও শিখিয়া লইতে হইবে। কিছু আরবী ফারসী শব্দ যদি এইভাবে ভাষায় আসিয়া যায়, তাহার জন্য চিন্তিত হইবার বিশেষ কিছু নাই ; শব্দগুলি আসিবে প্রথম দিকে বিকল্প ব্যবহার্য্য প্রতিশব্দ রূপে (প্রচলিত বাঙ্গালা-সংস্কৃত ও প্রাকৃতজ শব্দ হিন্দু ও অন্য লেখকেরা ব্যবহার করিতে থাকিবেন) ; শক্তিশালী মুসলমান লেখক সেইরূপ আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া সাহিত্যে সত্যকার রস সৃষ্টি করিতে পারিলে সেই শব্দগুলি সকলেই মানিয়া লইবে।...জাতি শিক্ষায় যত উন্নত হয়, তাহার মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য তত কমিয়া যায়, ভাষা তত এক হইয়া যায়। বাঙ্গালাদেশে যদি সেই প্রার্থনীয় অবস্থা না আসে, যদি এই ভাবে ধর্মকে আশ্রয় করিয়া দুইটি বিভিন্ন রচনাশৈলী পাশাপাশি অবস্থান করে,... যতদিন না আমরা এক সংস্কৃতি ও এক রাষ্ট্রীয় আদর্শের অচ্ছেদ্য পাশে মিলাইয়া লইতে পারি, ততদিন এই অবস্থানকে পরাধীনতার আর একটি নিগড় বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।[১৯]

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত তিনি মন্তব্য করেন : 'তবে আমার মনে হয়, এই অবস্থা চিরকাল ধরিয়া চলিবে না। Blood is thicker than water–যে মনোভাবের ফলে অনাবশ্যক আরবী–ফারসী শব্দের দিকে কোনও কোনও বাঙ্গালী মুসলমান লেখকের ঝোঁক দেখা যাইতেছে, তাহার কিছুটা পরিবর্তন হইবেই।...আরবী ও ফারসী জগতের সংস্কৃতির হাওয়া যদি বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর মনে বহাইতে পারা যায়, তাহাতে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিই লাভবান হইবে।'[২২]

উপরিউক্ত মন্তব্যে সত্য কি পরিমাণে ছিল, আজকের সমগ্র বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে তা বুঝতে কারো বাকী থাকে না। বস্তুত সংস্কৃত ও আরবি ফারসির স্থলে প্রমথ চৌধুরী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশিত পথেই বাংলা সাহিত্য মডার্ন ও আলট্রামডার্ন বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদী আধুনিক স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে না কি?

অবশ্য নজরুলের নির্দেশিত সকল দেশ ও ধর্মের—শাস্ত্রীয়–সাহিত্যের কথা এখানে ধর্তব্য নয়। সৃজনশীল, সর্বজনীন বাংলা সাহিত্য এখন উত্তরাধুনিক, স্মার্ট, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক আর মানবতাবাদের প্রচারক ও সংগঠক।

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ওয়াকিল আহমদ প্রণীত 'কলিকাতার মুসলমান সভা–সমিতি', বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন, ১৯৯৪ পৃ. ২৯–৮০।

২. ওয়াকিল আহমদ, 'ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট মুসলিম এসোসিয়েশন', বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, অষ্টম খণ্ড, ডিসেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ১১২–১৭।

৩. সাঈদ উর রহমান, পূর্ব বাঙলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৪–২৬।

৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাঙলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৮–২৪৯, ও ৫২৬।

৫. এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য স্মরণীয়। দ্রষ্টব্য 'বাঙলাদেশের ইতিহাস' এবং তাঁর স্মৃতিকথা।

৬. আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীতে এই গানগুলো সংকলিত আছে। বর্ণানুক্রমে এগুলো খোঁজা খুবই সহজ। এগুলো তাঁর জনপ্রিয় ইসলামী গান। এরকম অনেক আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণাদায়ক, বিদ্রোহী, বিপ্লবী কবিতা গান সংগীত ও সাহিত্যেরও অভাব নেই তাঁর রচনাবলীতে।

৭. পত্রিকার লেখক সূচিতে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। তাছাড়া পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখিত লেখকদের নামসমূহ এই তালিকায়ও উল্লেখ করতে হয়, সেজন্য আপাতত বর্জন করা হলো।

৮. ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সাহিত্য ও জাতীয় জীবন (প্রবন্ধ), আল্–এস্লাম, আষাঢ়, ১৩২৩, পৃ. ১২৯–১৩৫। (উদ্ধৃত : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'প্রবন্ধ–সংগ্রহ', ১৯৬০ থেকে চালু, পৃ. ১৩৯–৪৭)।

৯. উপরিউক্ত।

১০. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা (প্রবন্ধ), আল্–এস্লাম, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ (উদ্ধৃত উপরিউক্ত 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', পৃ. ১৪৮–৫৭।)

১১. উপরিউক্ত।

১২. ইব্রাহীম খাঁ ও নজরুলের পত্রালাপ, নওরোজ ও সওগাতে ছাপা হয়। আপাতত দেখা যেতে পারে উপরিউক্ত 'প্রবন্ধ–সংগ্রহ', পৃ. ১৮৫–২০০। অথবা 'লোকায়ত' পত্রিকায়।

১৩. উপরিউক্ত।

১৪. খোন্দকার সিরাজুল হক প্রণীত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ : চিন্তা ও কর্ম', বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪ শীর্ষক গ্রন্থে এর কিছু বিবরণ আছে। সওগাত ও মোহাম্মদীতেও অধিবেশনের বিবরণ ও পঠিত বা আলোচিত বিষয়গুলো মুদ্রিত আছে। মোহাম্মদীতে বিরূপ সমালোচনা আছে।

www.pathagar.com

১৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, উপরিউক্ত।

১৬. কাজী নজরুল ইসলাম, ১২ পাদটীকার পত্রালাপ দ্রষ্টব্য, নজরুল-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ পৃ. ২৮৬–৮৭ এও দেখা যেতে পারে।

১৭. নজরুল রচনাবলী, উপরিউক্ত, পৃ. ২৮৪।

১৮. অন্নদাশংকর রায়, মাদ্রাসী বাঙলা, সবুজ বাঙলা, নারায়ণগঞ্জ, ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪১, পৃ. ১১৫–১৭।

১৯. উপরিউক্ত।

২০. প্রমথ চৌধুরী, বাঙ্গালা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ, বুলবুল, ৩ বর্ষ, ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩, পৃ. ৮২।

২১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস (বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা), কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৩৭–৩৯।

২২. উপরিউক্ত।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলিম সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকাসমূহের পরিচয় ও মূল্যায়ন

প্রস্তাবনা

আলোচ্যকালের বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য), মুসলমান সমাজে পত্রিকা প্রকাশের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়, তার ফলে শতাধিক পত্রিকার নাম আমরা পাই যা পরিশিষ্ট গ তে দেখা যাবে। এই পত্রিকাগুলো ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করেছে। সেকালে এগুলোর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকাও গৌণ ছিল না। কিন্তু সমস্ত পত্রিকার ফাইল সুসংরক্ষিত নয়। আর সবগুলোর নামও টিকে নেই। গৌণ বা মুখ্য ভূমিকার জন্যই সেগুলোর সব কটি একাল পর্যন্ত টিকে থাকেনি, খ্যাতিও লাভ করেনি। তাছাড়া এর অনেকগুলো ধর্মীয় পত্রিকা। সাহিত্যিক মান সেগুলোর নেই বল্লেই চলে। বেশ ক'টি আছে দৈনিক সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক। প্রধানত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই সেগুলো প্রকাশিত হয়েছে। বছরে দু'চার সংখ্যা উন্নত মানের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে 'ঈদ সংখ্যা' জাতীয় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আর সেগুলোর কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হয়েছে, ফলে বেশ কিছু নতুন নামও জানা যাচ্ছে। অনেকের স্মৃতিকথা থেকে এবং প্রধান প্রধান পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকেও কিছু নাম পাওয়া গেছে। সে সবের ভিত্তিতে ১৯৩১-৪৭ সময়কালে প্রকাশিত মুসলিম সম্পাদিত পত্রপত্রিকার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা করা গেলেও (পরিশিষ্ট গ দ্রষ্টব্য) গুরুত্ব বিবেচনায় সূচিপত্রে উল্লিখিত ৩১টি পত্রিকার আলোচনা ও ইতিহাসই লেখা হয়েছে বর্তমান অধ্যায়ে।

রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ভূমিকা পালনের প্রবণতা লক্ষ্য করে তিনটি বিভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন :

৪. ক. অসাম্প্রদায়িক (সমন্বয়বাদী) প্রগতিশীল ধারা

১. সওগাত (কলকাতা, ১৩২৫-৫৫)
২. শিখা (ঢাকা, ১৩৩৩-৩৮)
৩. জয়তী (কলকাতা, ১৩৩৭-৩৯)
৪. প্রাতিকা (কলকাতা, ১৩৩৭)
৫. বুলবুল (কলকাতা, ১৩৪০-৪৫)
৬. ছায়াবীথি (কলকাতা, ১৩৪০-৪৩)
৭. চতুরঙ্গ (কলকাতা, ১৩৪৫-বর্তমানেও চালু)
৮. রূপায়ন (কলকাতা, ১৩৪৭-৪৮)
৯. ত্রিকাল (কলকাতা, ১৩৪৯-৫২)

www.pathagar.com

৪. খ. মধ্যপন্থী, উদারনৈতিক, মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল ধারা

১০. মোয়াজ্জিন (কলকাতা, ১৩৩৫–৫০)
১১. গুলিস্তাঁ (কলকাতা, ১৩৩৯–৫৪)
১২. সবুজ বাঙলা (নারায়ণগঞ্জ, ১৩৪১–৪৫)
১৩. মৃত্তিকা (কলকাতা, ১৩৪৮–৫৪)
১৪. পূরবী (চট্টগ্রাম, ১৩৪৩–৪৫)
১৫. বঙ্গভূমি (ঢাকা, ১৩৪৪–৪৫ ?)
১৬. শীশ্-মহল (কলকাতা, ১৩৪৬–৫০)
১৭. প্রতিভা (চট্টগ্রাম, ১৩৪২)
১৮. নব্য বাংলা (?, ১৩৩৯)
১৯. রূপ-রেখা (কলকাতা, ১৩৩৯–৪২)
২০. বর্ষবাণী (কলকাতা, ১৩৪২–৫৭)
২১. অভিযান (ঢাকা, ১৩৪০)

৪. গ. মুসলিম জাতীয়তাবাদী (স্বাতন্ত্র্যবাদী), ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী ধারা

২২. মোহাম্মদী (কলকাতা, ১৩৩৪–৫৪)
২৩. আল্ ইসলাহ্ (সিলেট, ১৩৩৯–৫৪)
২৪. প্রভাতী (সিলেট, ১৩৪৮–৫৪)
২৫. আল্ আমান (সিলেট, ১৩৪৯–৫৪)
২৬. নওরোজ (দিনাজপুর, ১৩৪৮–৫৪)
২৭. জাগরণ (কলকাতা, ১৩৪৭–৫৪)
২৮. নয়া জামানা (সিরাজগঞ্জ, ১৩৪৫–৫০)

৪. ঘ. শিশু-কিশোরদের পত্রিকা

২৯. শিশু সওগাত (কলকাতা, ১৩৪৪–৫৪)
৩০. গুল্ বাগিচা (কলকাতা, ১৩৫০–৫৪)
৩১. সবুজ পতাকা (সিলেট, ১৩৪৯—)

উল্লেখ্য, যে পত্রিকাগুলোকে অসাম্প্রদায়িক, সমন্বয়বাদী ও প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর উদারনৈতিক মানবতাবাদী চারিত্র্যও যেমন আছে, তেমনি রয়েছে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী বৈশিষ্ট্য। আবার যেগুলোকে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেগুলোর মানবতাবাদী প্রগতিশীল উদারনৈতিক বৈশিষ্ট্যও আছে। কিন্তু এগুলো 'স্বাতন্ত্র্যবাদী' বলে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এঁদের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মাত্রাগত প্রভেদ রয়েছে 'সমন্বয়বাদী' ধারার পত্রিকাগুলোর সঙ্গে। মধ্যপন্থী বলা হয়েছে তাঁদেরকে, যাঁরা সমন্বয়বাদী এবং স্বাতন্ত্র্যবাদী নন উগ্র ভাবে। তবে তাঁদের রয়েছে স্ব সম্প্রদায়ের ত্বরিৎ অগ্রগতিসাধনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর বাংলা সাহিত্য চর্চায় আধুনিক মনস্কতার পরিচয় দানের আগ্রহ ও কৌতূহল।

আলোচনার সুবিধার জন্যই এ ভাগ, এটিই যে চূড়ান্ত তা বলা উদ্দেশ্য নয়।

www.pathagar.com

ক. অসাম্প্রদায়িক (সমন্বয়বাদী) প্রগতিশীল ধারা

১. সওগাত

(কলকাতা, ১৩২৫–৫৫)

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮–১৯৯৪) সম্পাদিত 'সচিত্র মাসিকপত্র সওগাত' বাঙালি মুসলমানের জাগরণের কালে তাঁদের মেধা ও মননের, শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে। সওগাতের একটি সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল—রাজনীতি বর্জিত সাহিত্য হতে পারে না। জীবনের সর্বমাত্রিক সমস্যার সমাধান সাহিত্যের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।[১]

অতএব মুসলিম বাঙলার বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সংগ্রামের মুখপত্রও ছিল 'সওগাত'। সমালোচকেরাও একমত যে, মুসলমানের সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় মেধা ও মুক্তবুদ্ধির যে দীপ্তি এখন লক্ষ্য করা যায়,—তার স্ফূরণ ঘটেছিল মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের হাতে, সওগাতের পৃষ্ঠাতে। আবুল ফজল লিখেছেন (১৯৭৯) :

> আমাদের সাহিত্য নির্মাণে, সাহিত্য সৃষ্টিতে এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর অবদান তুলনাহীন।...তাঁর মত আত্মনিবেদিতপ্রাণ মানুষ আমাদের মধ্যে বিরল বল্‌লইে চলে। জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন না-হলে আমরা অনেকেই লেখক হিসাবে গড়ে উঠতে পারতাম কিনা সন্দেহ। অনুকূল ক্ষেত্র ছাড়া কিছুই জন্মে না, কিছুই সৃষ্টি হয় না—সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়।...নাসিরউদ্দীন বহুযুগের সমন্বিত এক ব্যক্তিত্ব। তিনি একটি ইতিহাস।[২]

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তৎকালীন ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা) জেলার চাঁদপুর থানার পাইকারি গ্রামে জন্মলাভ করেন। তাঁর পিতা মাতা যথাক্রমে আবদুর রহমান ও আমেনা বিবি। হরিণা গ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেন, কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ করা হয়নি আর্থিক ও পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণে। সংসারের প্রয়োজনে তিনি প্রথমে লঞ্চের (স্টীমার) টিকেট মাষ্টাররূপে এবং পরে ওরিয়েন্টাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে কাজ করেছিলেন। এভাবে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করে তিনি মন দিয়েছিলেন একটি উন্নত মানের সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশে।

আত্মকথায় তিনি লিখেছিলেন, স্কুলে পড়াশোনার সময়ে হিন্দুছাত্রদের কাছে প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পড়তে চেয়ে অপমানিত হয়েছিলেন। বন্ধুরা নাকি তাঁকে বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে এরকম সাহিত্যপত্রিকা কেউ বের করতে পারে না তো পড়ার এত সখ কেন ?[৩]

মুসলমান সমাজে ভালো সাহিত্যপত্রিকার অভাব মোচনের জন্যই তিনি অর্থ উপার্জনের মতো ব্যবসাবাণিজ্য ভাল বুঝা সত্ত্বেও সাহিত্য ও সাহিত্যিক সৃষ্টির ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনার অসীম যোগ্যতাও তাঁর ছিল। মাসিক, সাপ্তাহিক ও বার্ষিক সওগাত এবং সাপ্তাহিক 'দেশের কথা', 'শিশু সওগাত' এবং 'সওগাত সাহিত্য মজলিশ' প্রভৃতির মাধ্যমে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে মুসলিম সাহিত্যের অন্যতম স্থপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন তিনি।

বস্তুত দীর্ঘজীবন লাভ করায় জীবিত অবস্থাতেই মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাময়িক-সাহিত্য জগতের এক কিংবদন্তী পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। অসংখ্য পদক, পুরস্কার ও

www.pathagar.com

সংবর্ধনা তিনি লাভ করেছেন পরবর্তীকালের সাহিত্যিক সাংবাদিক ও সামাজিকগণের কাছ থেকে। ১৯৭৯ সালে তাঁকে বাংলাদেশ সরকার 'একুশে পদক' দিয়ে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ভূষিত করেন। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণও তাঁকে সংবর্ধিত করেন।

বাঙালি মুসলমান সমাজের বিকাশের যে পর্যায়ে সওগাত প্রকাশিত হয়েছিল, তা ছিল এক কথায় 'আইয়ামে জাহেলিয়াতের' মত। 'সচিত্র' পত্রিকা হবে শুনে বহুলোকে তাঁকে তিরস্কার করেছিল। কিন্তু অজ্ঞতা, কুসংস্কারচ্ছন্নতা, সংকীর্ণতা, ধর্মান্ধতার যুগে প্রতিটি বিষয়ে চিন্তার কুটিল গ্রন্থি উন্মোচনে সওগাত সম্পাদক ছিলেন আপোষহীন। এর লেখকগণও ছিলেন উন্মুখ, উন্মুখর। সমাজ ও মানুষকে বহুপ্রকার সঞ্জীবনী সাহিত্যসুধা তাঁরা পান করিয়েছিলেন। এরই ফলে আমাদের সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছেন প্রথম শ্রেণীর একদল সৃজনশীল সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, কবি ও সাংবাদিক। কিন্তু পদে পদে বাধা ও বিড়ম্বনা বিব্রত করেছে তাঁদেরকে। সে ইতিহাসও লেখা হয়েছে সম্পাদক কর্তৃক, 'বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ' শীর্ষক বিশাল গ্রন্থে, প্রগতিশীল সাহিত্যের ইতিবৃত্তে। প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাঁকে (নাসিরউদ্দীনকে) শারীরিক নির্যাতনও করেছে। এইরূপ নির্যাতন নিপীড়ন ভোগ করেছেন বাঙলার শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান প্রমুখ। এখনও বাঙালি মুসলমান ধর্মীয় গোঁড়ামীতে আচ্ছন্ন হয়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে (শিল্পী–সাহিত্যিক–চিন্তাবিদ) নাজেহাল করেন।

তবে, সেকাল ও একালের এই দুই যুগের মধ্যে মাত্রাগত তারতম্য অবশ্যই রয়েছে। সেকালে 'সুদ' হারাম বলে মুসলমানেরা গ্রহণ করতো না, অথচ দাদন নিয়ে বহুগণ অর্থ তারা মহাজনদের দিয়েছে। 'ভিক্ষা' করেছে, কিন্তু অর্থকরী কাজ করেনি। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন লিখেছেন, তৎকালীন মুসলমান সমাজের বিভিন্ন কার্যকলাপ ও আচার ব্যবহার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এত নিম্ন স্তরের ছিল যে, সেগুলি তাঁর মনকে পীড়িত করে।

আত্মজীবনীতে আরও লিখেছেন তিনি, মুসলমানেরা মাতৃভাষা বাংলা শেখানোর পরিবর্তে কোমলমতি বালক বালিকাদেরকে আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষা মুখস্ত করাতো। পবিত্র কোরানকে দুর্বোধ্য করে রেখে, এর ভুল অর্থ প্রচারের মাধ্যমে এক শ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী অশিক্ষিত মুসলমানদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতো। আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক কাজের নিন্দা করতো। মুসলমান সমাজে এজন্য ভিক্ষুকের সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুসলমানেরা বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষার প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন করতো। তাদের সাহিত্যের অভাব ছিল। মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা ছিল না। তারা কঠোর অবরোধ প্রথায় আবদ্ধ ছিল। সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ, শরীর চর্চা এবং খেলাধুলার প্রতি তাদের অনীহা ও নিষেধাজ্ঞা ছিল। স্বসমাজের এইরূপ দৈন্যদশাই তাঁকে আধুনিক যুগের উপযোগী একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

অতএব পত্রিকার মাধ্যমে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করাই তাঁর টার্গেট হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার মুসলমানদের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া পাওয়া গেল না। তাঁরা বল্লেন, 'গল্প, উপন্যাস আর ছবি নিয়ে ও ধরনের কাগজ বের করার জন্য উৎসাহ দেয়া যায় না।' —এ থেকেই বুঝা যায়, মুসলমান সমাজে মুক্তবুদ্ধির ধারক পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা কতোটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

www.pathagar.com

সমাজে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা না থাকায় যুগোপযোগী সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা প্রচার লাভ করতো না। এইরূপ পরিস্থিতিতে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সকল প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে সচিত্র মাসিকপত্রিকা বের করেছিলেন ১৯১৮ বাঙলা ১৩২৫ সনে।

কিন্তু প্রথমে তিনি একাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সাড়ে তিন বছর চলে বন্ধ হয়ে গেলো সওগাত। ১৩৩৩ (১৯২৬) সনে পূর্ণ উদ্যমে মাসিক সওগাত আবার বের হলো। গড়ে উঠলো 'সওগাত সাহিত্য মজলিশ' (১৯২৭)। এরপরে সাপ্তাহিক সওগাতও নিয়মিত বের হতে আরম্ভ করে (১৯২৮)।

এভাবেই নাসিরউদ্দীন ও তাঁর সওগাত গোষ্ঠীর লেখকদের পঁচিশ বছরের অক্লান্ত সাধনায় এদেশকে উপহার দিয়েছিলেন প্রথম সারির একদল সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পীর সাহিত্য ও শিল্প সম্ভার। তিনিই প্রথম সমবেত করেছিলেন মুসলিম বাঙলার প্রগতিশীল, মুক্তবুদ্ধির তরুণ তরুণীদের,—যাঁরা 'বিমূঢ়', অসহায় ছিলেন গোঁড়া অন্ধদের সাম্রাজ্যে।

এঁরা নির্ভীকচিত্তে সংস্কার মুক্তির আন্দোলন করেছেন, প্রগতির পক্ষে আহ্বান জানিয়েছেন নিরন্তর তাঁদের রচনাবলির মাধ্যমে। এঁরাই বর্তমান বাংলাদেশের প্রগতিশীলতা ও মুক্তবুদ্ধির পথিকৃৎ, সাহিত্যজগতের প্রথম প্রজন্ম।[৪]

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন পত্রিকা বের করার জন্য অর্থসংগ্রহ নিমিত্ত প্রথমে (১৯১৮) কলকাতার সামর্থবান মুসলমানদের নিয়ে একটি কোম্পানি গঠন করেছিলেন। শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ফাণ্ড সংগ্রহ করে সেই কোম্পানির পক্ষ থেকে পত্রিকা বের করে সমাজসেবা করবেন—এ ধরনের চিন্তা যে তরুণের মাথা থেকে বের হয়েছিল, তিনি যে সামান্য ব্যক্তি নন, তা কল্পনা করা যায়। সওগাতের পৃষ্ঠায় এই শেয়ার বিক্রির বিজ্ঞপ্তি ও উদ্দেশ্য বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। কোম্পানির নাম ছিল 'মোসলেম প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড'।

উপরে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, 'মোসলেম সাহিত্য সমিতি' নামে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। এর তিন বছর আগে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোজাম্মেল হক প্রমুখের উদ্যোগে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' গঠিত এবং ১৯১৮ থেকে ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এসবই প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই সামান্য।

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন প্রভৃতির সময়ে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্যক্রম তেমন সুবিপুল ছিল না। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের 'মোসলেম সাহিত্য সমিতি'ও সমাজের প্রাণশক্তির অভাবে সফলতা লাভ করলো না। কিন্তু ১৯২৬ সনে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গড়ে ওঠার পরে-পরে, কলকাতায়ও 'সওগাত সাহিত্য মজলিশ' সরগরম হয়ে উঠেলো। নজরুল ইসলাম ছিলেন এর মধ্যমণি।

সওগাত সম্পাদক প্রথম পর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে, মোসলেম সাহিত্য সমিতিতে পঠিত ও আলোচিত ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাসমূহ সওগাতে প্রকাশ করা হবে। সওগাতের একটি বিজ্ঞাপনে (প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ১৯১৯) বলা হয় :

> প্রাচীন মোসলেম সভ্যতার ইতিবৃত্তসমূহ সর্বাগ্রে আলোচিত হইবে। আলোচনার সুবিধার জন্য এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থান হইতে মূল্যবান পুস্তক সমূহ সংগ্রহ করা হইবে।[৫]

www.pathagar.com

মুসলমানদের সভ্য, উন্নত করার জন্যই 'মোসলেম সভ্যতার ইতিবৃত্ত' সাহিত্যিক শৈল্পিক কায়দায় উপস্থাপনের দরকার ছিল। ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে বললে মুসলমানেরা 'নাস্তিকের কাজ' বলে পরিহার করে চলবে। মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে তার আলোকে বা সাহায্যেই মুসলমানদেরকে জাগ্রত, যুক্তিবুদ্ধি সমুন্নত করে তুলতে হবে—এই চেতনা থেকেই দেখা যায় মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, বেগম রোকেয়া, এস. ওয়াজেদ আলি, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী—সকলেই ইসলাম ধর্মের প্রাণ অনুসন্ধান করেছেন এবং যুগোপযোগী ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে 'আধুনিক' করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মওলানা আকরম খাঁর 'সমস্যা ও সমাধানে' সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ের ফৎওয়াও বিনা তর্কে মুসলমান পাঠকসমাজ গ্রহণ করে নেয়নি।

'সচিত্র মাসিক পত্রিকা সওগাত' নামের মধ্যে 'সচিত্র' কথাটা মুসলমান সমাজে ছিল এক কথায় 'অভিনব'। হজ্ব করার জন্য দু'এক কপি ছবি তোলা প্রয়োজন হলেও মুসলমানেরা সেজন্যও 'পাপ' হলো কীনা চিন্তা করতেন। এই সেদিন পর্যন্তও এ–নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই সমাজের এক মুসলমান কর্তৃক সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত রীতিমতোই বিপ্লবাত্মক ছিল। এই পত্রিকার পূর্ব নির্ধারিত 'সম্পাদকীয় নীতিমালা' ছিল আরও আনন্দদায়ক। এরকম সুশৃঙ্খলভাবে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে, যথাযথ সামর্থ্য ও দক্ষতা নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের প্রচেষ্টা মুসলমানদের মধ্যে আগে চোখে পড়েনি। সম্পাদক লিখেছেন, সওগাতের সম্পাদকীয় নীতি ছিল :

১. লেখকগণকে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ এবং মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাসমৃদ্ধ রচনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে ;
২. প্রথম শ্রেণীর মাসিকের আদর্শে প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি এবং ছবি দ্বারা পত্রিকার অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা হবে ;
৩. সমাজের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করা হবে ;
৪. পত্রিকার প্রতি পাঠক সাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য বিবিধ বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ এবং মুসলিম জগতের সচিত্র বিবরণ নিয়মিত প্রকাশ করা হবে ;
৫. নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণমূলক প্রবন্ধাদি এবং 'চিত্রে মহিলা জগৎ' বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করে মহিলাদেরকে সাহিত্য সাধনা ও সমাজসেবা মূলক কাজে উৎসাহিত করা হবে ;
৬. নতুন সাহিত্যিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তরুণ লেখকগণের রচনা প্রকাশ করে তাঁদের উৎসাহিত করা হবে ; এবং
৭. নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সম্পাদকীয়–নীতি গ্রহণ করা হবে।[৫]

পত্রিকার আয়োজন উদ্যোগ এবারে কিছুটা পোক্ত হলেও মুসলমান সমাজে প্রগতিশীল লেখকের অভাববশত সওগাতের পরিকল্পনা অনুযায়ী রচনা সংগ্রহ করা বেশ কষ্টকর ছিল। তাছাড়া শিল্পীরও অভাব ছিলো। ছবিসহ পত্রিকার বের করতে হলে চিত্রশিল্পীর একান্ত প্রয়োজন। মোহাম্মদ নসিরউদ্দীনের ইচ্ছা ছিল সওগাতের জন্য মুসলমান শিল্পীর সহযোগিতা গ্রহণ ; কিন্তু বহু অনুসন্ধান করেও তখন বাঙালি মুসলমান চিত্রশিল্পীর খোঁজ পাওয়া সম্ভব হলো না। ছবি আঁকা গুনাহ্র (পাপ) কাজ, এই কুসংস্কারের ফলে তখনও মুসলমানদের মধ্য থেকে এক্ষেত্রে কেউ আবির্ভূত হননি। মুসলমানদের বাংলা হরফের প্রেস সমস্যাও ছিলো।

www.pathagar.com

সারা কলকাতায় রঙীন প্রচ্ছদ ও হাফটোন ছবিসহ পত্রিকা ছাপাবার উপযুক্ত মুসলমান মালিকানার প্রেস একটিও ছিলো না।

অতএব তাঁকে পত্রিকা প্রকাশের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ হিন্দু লেখক, শিল্পী, প্রেস ও কর্মীর উপর নির্ভর করতে হয়েছিলো। তাছাড়া তখনকার বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী (১৯১৪-১৮) আর্থিক সামাজিক মন্দাও চলছে। মুসলমান সমাজের সাময়িক পত্রিকা পরিস্থিতিও প্রতিকূল ছিলো। তখনকার মুসলিম সাময়িকপত্রগুলো ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে তর্ক বিতর্ক দলাদলিতে লিপ্ত। পরস্পরের প্রতি বিদ্রুপ ও গালিবর্ষণ ছিলো কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রধান বিষয়। কোনো পত্রিকাকে ভারতী প্রবাসী প্রভৃতির মতো সাংগঠনিক ভিত্তিতে দাঁড় করাবার গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রচেষ্টা তখনো গৃহীত হয়নি। এমতাবস্থায় মুসলমান লেখকদের রচনা যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করে অনেক হাপটোন টাইপ ও রেখাচিত্রসহ সওগাতের যাত্রা শুরু হয়েছিল।[৬]

মুসলিম সম্পাদিত কোনো পত্রিকায় এর আগে মানুষের ছবিসহ নানাবিধ একরঙা ও তিনরঙা হাফটোন ছবি এবং কার্টুন বা ব্যঙ্গ চিত্র ছাপা হয়নি। কিন্তু চিরাচরিত বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে নাসিরউদ্দীন সওগাতে প্রাতঃস্মরণীয়, ঐতিহাসিক, বিদুষী ভদ্রমহিলাদের ছবি এবং কার্টুন চিত্র ছাপতে শুরু করলেন। এই পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম মুসলিম নেতৃবৃন্দের সভাসমিতির বিবরণসহ ছবি ছাপানো হয়েছিলো।[৭]

১৩২৫ এর প্রথম সংখ্যা সওগাতে যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছিল বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, শ্রীমতী মানকুমারী বসু, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মদ কে. চাঁদ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জলধর সেন, কায়কোবাদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এস্‌লামাবাদী, ভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী, ওসমান আলী, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, পাঁচুলাল ঘোষ, ফজলুর রহিম চৌধুরী, রসময় লাহা, আবদুল গফুর, ব্রজমোহন দাস, চণ্ডীচরণ মিত্র প্রমুখ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বেগম রোকেয়ার 'সওগাত' শীর্ষক কবিতাটি প্রচ্ছদের পরেই প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল—

জাগো বঙ্গবাসি।
দেখ, কে দুয়ারে
অতি ধীরে ধীরে করে করাঘাত।
ঐ শুন শুন !
কেবা তোমাদের
সুমধুর স্বরে বলে সুপ্রভাত।[৮]

সওগাতের প্রথম সংখ্যা হাতে করে সম্পাদক নাসিরউদ্দীন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে কবি বলেছিলেন : 'সওগাত, নামটি বড় সুন্দর হয়েছে।' সওগাতের পাতা উল্টাতে উল্টাতে তিনি বলেছিলেন : 'মুসলমান সমাজ থেকে যে এরূপ একখানা সুন্দর সচিত্র মাসিক পত্রিকা বের হতে পারে এটা আমার ধারণা ছিল না।' সওগাতের দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য খুশি হয়ে তিনি লিখে দিয়েছিলেন 'পথের সাথী' :

অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক
তখন আমি ছিলাম শয়ন পাতি।
বিশ্ব তখন তারার আলোয় দাঁড়ায়ে নির্বাক

www.pathagar.com

ধরায় তখন তিমির গহন রাতি।
ঘরের লোকে কেঁদে কইল মোরে,
'আঁধার পথ চিন্‌বে কেমন করে'
আমি কইনু, 'চল্‌ব আমি নিজের আলো ধরে'
হাতে আমার এই ত আছে বাতি।[৯]

সওগাত প্রথমে সম্পাদক কর্তৃক ৮ জাকারিয়া ষ্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং প্রিয়নাথ দাস কর্তৃক ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট, ১৪৮, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। 'অগ্রহায়ণ ১৩২৫' চিহ্নিত প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২ ডিসেম্বর ১৯১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮, মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০, দাম পাঁচ আনা। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ১০০০ কপি মুদ্রিত হয় ; পরে তা ১৫০০ তে পৌছায়। মুদ্রণসংখ্যা বেড়ে কখনো কখনো ১৭৫০ ও ২০০০ ও হয়েছে। শুধু শেষ দিকে তা নেমে এসেছে ১০০০ এ। সপ্তম সংখ্যা থেকে প্রকাশের ঠিকানা ২৮৫/৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট। মুদ্রক টি.সি. দাস, চেরী প্রেস, ৯৩/১ এ বহুবাজার ষ্ট্রীট। তৃতীয় বর্ষে মুদ্রাকর বদল হয়েছে দুবার। দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের নামের ওপরে যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের নামও যুক্ত ছিল। ৩ বর্ষ ৫ সংখ্যার মুদ্রক এম. রায়, আর. মনো প্রেস, ৩৭০ আপার সারকুলার রোড। তৃতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যার (প্রকাশকাল ১০ এপ্রিল ১৯২২) পরে পত্রিকা দীর্ঘ দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয় ১৯২৬ সনে।[১০]

সওগাতের উদার ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এর পৃষ্ঠাতেই সুপ্রত্যক্ষ। 'এই দৃষ্টিভঙ্গিই, সে কালের পটভূমিতে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় পরিচালিত সম্পাদিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে 'সওগাত'কে বিশিষ্ট করে রেখেছে।[১১] মুসলিম প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেলেও এর উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে কম গুরুত্ব দেয়া চলে না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সংখ্যায় ঐতিহাসিক ভাবে খ্যাত কতিপয় মুসলমান মহিলার পরিচয় দান করেছেন। প্রথম পর্বের সওগাতের সাহিত্যিক তাৎপর্য নিরূপণের জন্য এর একটি প্রতিবেদন—'বর্তমান বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংগ্রহ করেছিলেন অনেক কবির জীবনী। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করেছিলেন বঙ্গদর্শন সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনও প্রথম মুসলমান সাহিত্যিকদের ছবিসহ পরিচিতি ছাপাতে শুরু করেন।

দীর্ঘস্থায়িত্বের দিক থেকেও সওগাত 'মুসলিম বাঙলার সাময়িকপত্র' জগতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাঙলার অসংখ্য অখ্যাত, হবু-খ্যাত কবি-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার আবিষ্কারক ও উৎসাহদাতা সওগাত-সম্পাদক নাসিরউদ্দীন এর অবদান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী (১৯৭৯ সনে) :

> বঙ্কিমচন্দ্রের কাল হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত যত সাময়িক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে কোন কোন অতি পুরাতন মাসিক নমুনাস্বরূপ দেখিয়াছি, কতকগুলি নিয়মিত পাঠক হিসাবে পড়িয়াছি, আর কতকগুলিতে নিজের লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। সে হিসাবে স্বীয় ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা হইতে সংক্ষেপে এটুকু বলিতে পারি বাঙলার পুরাতন ও নূতন শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যে, বৈশিষ্ট্যে, অনুপম রুচিজ্ঞানে, সম্পাদনা

www.pathagar.com

কুশলতায়, স্থায়িত্বে সওগাত অন্যতম। শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্রিকা প্রবাসী ভারতবর্ষ প্রভৃতি এত দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।"[১২]

'সওগাত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নানা অনুসঙ্গে বহুভাবে ব্যবহৃত একটি নাম। সওগাত যখন বের হয় কাজী নজরুল ইসলামও তখন পল্টনে থেকে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর নতুন লেখা গল্প ও রচনা তিনি সওগাতেই পাঠালেন। পত্রালাপের মাধ্যমে, সম্পাদকের সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর আন্তরিক সৌহার্দ্য। কলকাতা ফিরে (যুদ্ধশেষে) তরুণ, বেকার চালচুলোহীন কবির সঙ্গে যাঁদের স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সওগাত–সম্পাদক তাঁদের মধ্যে প্রধানতম। দ্বিতীয়বার (১৯২৬) সওগাত যখন বের হয় তখন নজরুল সওগাতের শুধু নন, সারাবঙ্গের বিতর্কিত কবি হয়ে উঠেছেন। 'বিদ্রোহী' বের হবার পরেই গোলাম মোস্তফা এবং মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ বয়োজ্যেষ্ঠরা নজরুলকে রঙ্গ–ব্যঙ্গ করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

গোলাম মোস্তফা ফাল্গুন ১৩২৮ (১৯২২ ফেব্রুয়ারি, ৩ বর্ষ, ৪) সংখ্যা সওগাতে বিদ্রোহীর প্রেক্ষিতে লিখেছিলেন 'নিয়ন্ত্রিত'। 'বিজলী' সাপ্তাহিকে 'বিদ্রোহী' ছাপার পরে মোহিতলাল প্রমুখের প্যারোডি রচনার ঘটনাবলি মুজফ্ফর আহমদ প্রমুখ নজরুল জীবনীকার, স্মৃতিকথার লেখক, ঐতিহাসিকেরা আলোচনা করেছেন। এখানে সেসব পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কেবল সওগাতের সূত্রটা ধরা যাক : গোলাম মোস্তফা নজরুলকে বলেছিলেন—

'ওগো বিদ্রোহী বীর
সংযত কর, সংহত কর উন্নত তব শির।
বিদ্রোহী?—শুনে হাসি পায়!
বাঁধন হারার কাঁদন কাঁদিয়া বিদ্রোহী হতে সাধ যায়?
সে কি সাজেরে পাগল, সাজে তোর?
আপনার পায়ে দাঁড়াবার মত কতটুকু তোর আছে জোর?
ছি ছি লজ্জা! ছি ছি লজ্জা?
তোর কোথা রণ–সাজ –সজ্জা?

তোর কোথা অনুচর, অশ্ব পদাতি সৈন্য? শুধু হাহাকার, শুধু আঁখি ধার, শুধু দৈন্য!' ইত্যাদি।১৩

উপরিউক্ত সকল লেখকের বক্তব্য বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা দানের ঘটনা থেকে বোঝা যায়, সওগাত প্রথম থেকেই মুক্তবুদ্ধি চর্চায় দ্বিধাহীন ছিল।

মুসলমান মহিলাদের সুন্দর ছবি ছেপে সওগাত প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর 'মোহাম্মদী'র সম্পাদকীয় নিবেদনে এঁদেরকেই (শিখা ও তার সহকর্মী সওগাত এবং প্রবাসীও বটে) চিহ্নিত করা হয়েছিল জাতীয় তাহ্‌জিব–তমদ্দুনের ধ্বংসকারী হিসেবে। আর নজরুল দিয়েছিলেন উৎসাহ—'করিও না ভয়', বলে—

'আবার কি আঁধি এসেছে হানিতে
ফুলবনে লাঞ্ছনা?
দু'হাত ভরিয়া ছিটাইছে পথে
মলিন আবর্জনা?
করিও না ভয়, হবে হবে লয়

www.pathagar.com

আপনি এ উৎপাৎ....মোরা যুবদল, সকল আগল
ভাঙিতে চলেছি ছুটি,...'।

সওগাতকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন তিনি,—'তোমারে দিয়াছি মোদের পতাকা/তুমি পড়িও না লুটি।'[১৪]

নজরুল যেমন সওগাত সম্পাদককে লুটিয়ে না পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, নাসিরউদ্দীনও তেমনি নজরুলকে উঠিয়ে দিতে কার্পণ্য করেননি। মনে করি যদি, আজ বিস্ময়ই লাগে—মাত্র একত্রিশ বৎসর বয়সের নজরুলকে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কলকাতার এলবার্ট হলে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল ! এই সভার সভাপতি ছিলেন আচার্য পি. সি. রায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এস. ওয়াজেদ আলি, আর সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দীন। নজরুলের আর্থিক দুর্দিনে ফান্ডও তিনিই সংগ্রহ করেছিলেন।

বিশেষ মহিলা সংখ্যা বের করে নারী জাগরণের জন্য নিবেদিত বিশ্ব-নেতৃবৃন্দের বাণী ও বক্তব্য প্রচার করে সওগাত এদেশের মুসলিম নারীদের সংকোচের বিহ্বলতা কাটিয়ে দিয়েছেন। বেগম রোকেয়া, ফজিলাতুন্নেসা, শামসুন্নাহার, সুফিয়া কামাল প্রমুখের সাহিত্য ও চিন্তাধারার প্রচারণায় সওগাত যে অবদান দেখেছে, তার অনেক মূল্য। আধুনিক ভাবসম্পন্ন এই সকল মহিলাদের যে সব কবিতা ও গল্প, উপন্যাস সওগাত ছেপেছে—মহিলাদের ছবি ছাপার থেকেও সেসব কম বিপ্লবাত্মক ছিল না।

এঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদীর পৃষ্ঠায়ও মহিলাদের রোমান্টিক কবিতা, আধুনিক গদ্য, কথাসাহিত্য ছাপা হয়েছে। 'জয়তী'তে ১৯৩১ এ আবুল ফজলের কল্লোল প্রভাবিত যে গল্পটি উদ্ধৃত হয়েছে—এর পটভূমিতে সওগাত কি কেনোই সাহস ও শক্তি জোগায়নি? হ্যাঁ জুগিয়েছে। সওগাত কল্লোল ও কালিকলম এর তারুণ্যের সহযাত্রী ছিল। ১৯২৬ থেকে মাসে ১২টি বিশাল বপুর মাসিক সওগাত ; ১৯২৮ থেকে 'সাপ্তাহিক সওগাত' ; এবং 'বার্ষিক সওগাত' (১৩৩৩) এ যতো লেখককে ক্ষেত্র করে দেয়া হয়েছিল, তা করা না হলে, মুসলমান সমাজের লেখকদের অগ্রগতি আরও পিছিয়ে থাকতো—তা স্বীকার করে গেছেন নজরুল সমকালীন প্রথম সারির মুসলিম, লেখক, বুদ্ধিজীবীরা (যেমন আবুল ফজল : ১৯৭৮)—যার কিছু দলিল 'সওগাত : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সংবর্ধনা সংখ্যা', ১৩৮৬ তে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আষাঢ় ১৩৩৩ এ নবপর্যায়ে সওগাত এর সম্পাদকীয় ছিল নিম্নরূপ :

> রহমানুর রাহিম আল্লাহতা'লার কৃপায় আজ 'সওগাত' আবার নবজন্ম লাভ করিল। সওগাত যখন প্রথম বাহির হয়, বঙ্গীয় মোসলেম সমাজ ইহাকে সাদর অভিনন্দন করিয়াছিলেন ; নবীণ প্রবীন সাহিত্যিক মণ্ডলী ইহার সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম, বুঝিবা আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে চলিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্য যে, অনতিদীর্ঘকাল পরেই নানা অপ্রত্যাশিতপূর্ব কারণে 'সওগাতের' প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।
>
> আমাদের ত্রুটী বিচ্যুতি যাহা ছিল, তাহার দায়িত্ব অস্বীকার করি না ; কিন্তু আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, বিষম প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে আমাদের পরাজয় ঘটিবার পূর্বে 'সওগাতের' প্রচার বন্ধ করিতে আমরা সম্মত হই নাই। মানুষের সঙ্কল্প যতই

www.pathagar.com

সাধু হোক, চেষ্টা যতই আন্তরিকতাপূর্ণ হোক, প্রতিকূল ঘটনাস্রোতের প্রচণ্ডগতি রোধ করিয়া দাঁড়ানো তাঁহার সাধ্যাতীত। এই জন্য আমাদের শত অক্ষমতার জন্য আমরা 'সওগাতের' পাঠক সাধারণের নিকট লজ্জিত থাকিলেও ইচ্ছাকৃত গুরু অপরাধে অপরাধী নহি।

যাহা হৌক, পুরাতন কাহিনীর আবৃত্তি করিয়া কোনো লাভ নাই। বর্তমান সময়ে মুসলমান সমাজে একখানিও উল্লেখযোগ্য মাসিক সাহিত্যপত্র নাই। নানা অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে, মুসলমান সমাজ যেন আজ এই অভাব উপলব্ধি করিয়াছে। তাই চারদিক হইতে কেবল একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা-বাণী ধ্বনিত হইতেছে। মুসলমানের যাহা নাই এবং যাহা না থাকাতে পরের দ্বারে ভিখারীর বেশে গিয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহার সবগুলিই আমাদের চাই। এই সর্বব্যাপী আকাঙ্ক্ষার একটী মাত্র দিক পূরণ যদি আমাদের দ্বারা সম্ভবপর হয়, এই ভরসায় দ্বিধাহীন চিত্তে আমরা পুনর্বার, 'সওগাত' হস্তে সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইলাম।

যে কার্য্যে পূর্বে একবার বিফলকাম হইয়াছি, তাহাতে পুনর্বার উদ্যোগী হইতে আমাদের দ্বিধা না হওয়ার কারণ এই যে, আমরা জানি, বিফলতাই সাফল্যের ভিত্তি।...সমাজ যদি পূর্ণ সহানুভূতির সহিত আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহা হইলে আমরা কোনক্রমেই পশ্চাৎপদ হইব না।...

মুসলমান সমাজ একান্তই দরিদ্র, সুতরাং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাহারা উদ্যম ও উৎসাহহীন। এ অবস্থায় সওগাতের ন্যায় একখানি ব্যয়বহুল মাসিকপত্র পরিচালনা মোসলেম যুবক ও প্রচারক সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতীত অসম্ভব বলিলেই চলে।[১৫]

সওগাতের উপর্যুক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে, মুসলিম সাহিত্যসাধনা, তথা জীবনবোধের ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য সওগাত ছিল দৃঢ় সংকল্প। জনৈক আলোচক একে মূল্যবোধের সংগ্রাম বলেও অভিহিত করেছেন। এই সংগ্রামী প্রত্যয় দেখে বিশ শতকের প্রথম বছরে (১৯০১) প্রকাশিত বিখ্যাত 'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদক, মনস্বী সৈয়দ এমদাদ আলী সওগাতের আত্মপ্রকাশে খুশি হয়ে লিখেছিলেন 'শুভাশীষ',—

এস সওগাত ; আজ তোমায় নূতন করিয়া আশীর্বাদ ও অভিনন্দন করি। অতীতের সকল গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া আজ তুমি আবার নূতন উৎসাহ ও উদ্যমে তোমার নবীন কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, তোমার এ যাত্রা সফল হউক—বিজয় যাত্রা হউক।

বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ শিক্ষায় অনুন্নত ; সুপ্তিতে মগ্ন। তোমার সকল প্রাণ দিয়া তাহার মধ্যে শিক্ষার সুপ্রচার কর, তাহার সুপ্তি ভাঙ্গিয়া দাও।

সাহিত্যের ভিতর দিয়াই জাতির জীবন গঠিত হয়। নবচেতনার উন্মেষ হয়। তুমি নবচেতনার পশরা লইয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিতরণ কর। বলিয়া দাও তাঁহাদের,—সকল পাপ, সকল দুর্নীতি ও সকল অহংকার তাঁহাদের বিসর্জন দিতে হইবে। ধর্ম ও কর্মকে তাঁহাদের বরণ করিয়া লইতে হইবে। ধর্মের অনুসরণ ও কর্মের অনুগমনের ভিতরেই তাঁহাদের সকল উন্নতি নিহিত রহিয়াছে।

বাঙ্গালার মুসলমানের সাহিত্য আজ ম্রিয়মাণ, পঙ্গু, অবসাদগ্রস্ত। সৈয়দ আলাওল, দৌলত কাজী, সৈয়দ মুর্তুজা, সৈয়দ হামজা, শাহ গরিবুল্লাহ প্রভৃতি মনীষা-সম্পন্ন কবিগণ যে মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনকার্য্যে ও জীবনপণ করিয়াছিলেন, সে সাহিত্য আমাদের অবহেলায় ও অনাদরে বড় হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার প্রাণের ভিতরে যে জীবনীশক্তি বাঙ্গালার মুসলমানের দান করা উচিত ছিল, যে সম্পদ তাহাদের উপহার দেওয়া কর্তব্য ছিল, তাহা তাঁহারা করেন নাই। তাই তাঁহারা পড়িয়া আছেন, উঠিবার সাধ্য নাই।

www.pathagar.com

কিন্তু বাঙ্গালার মুসলমানকে সাহিত্যের জীয়ন কাঠির স্পর্শ লাভ করিয়া উঠিতেই হইবে। পড়িয়া তাঁহারা থাকিবেন না, মরিয়া তাঁহারা যাইবেন না। এই বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিতর দিয়াই তাঁহাদিগকে সমাজের প্রাণে নবজাগরণের শিহরণ পহুঁছাইতে হইবে। সওগাত! এই পতিত সমাজের সাহিত্যকে উন্নত করিবার ভার আজ তোমার উপরেই পড়িয়াছে। তোমাকেই এ কাজ করিতে হইবে। তুমি ক্ষুদ্র, তুমি নগণ্য সত্য, কিন্তু তোমার সাধনা যদি একনিষ্ঠ হয়, তুমি যদি নিজ কর্তৃত্বে অটল হও, অবহেলা ও অপমানের ভিতর দিয়া যদি তুমি বাঙ্গালার দরিদ্র মুসলমানের উন্নতি চেষ্টাকেই জীবনের ব্রত করিয়া লও, তাহা হইলে তোমার বিজয়ের দিন যে অদূরবর্তী তাহাতে কোন সংশয় নাই।

তুমি ইসলামের অভ্যুদয়ের ইতিহাস স্মরণ করিয়া তোমার এই নবজীবনের যাত্রা আরম্ভ কর। সম্মুখে গভীর অন্ধকার রাত্রি দেখিয়া ভয়ের কোন কারণ নাই। রাত্রির অবসানেই ঊষার সমাগম।...মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যের মুষ্টিমেয় সেবকগণ, ভুলিয়া যাও তোমরা তোমাদের দীনতার কথা। তোমাদের দীনতার কালিমা যেদিন মুছিয়া যাইবে, সেদিন সুদূরে নহে,...ইসলামের খাঁটি পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়ার ফলেই পতিত হইয়াছি। আমরা সে পথ আবার খুঁজিয়া লইব। সেই আমাদের চলার পথ, অন্য পথ নাই। আসুরিক শক্তির ভিতরে মুক্তি নাই, মুক্তি জ্ঞানানুসরণে, তৃপ্তি জ্ঞানানুসরণে।[১৬]

সওগাত সত্যিই পতিতসমাজের সাহিত্যকে উন্নত করার দায়িত্ব পালন করেছিল। সওগাতের সাহিত্যিক অবদান পর্যালোচনা করার জন্য প্রকৃতপক্ষে বিস্তৃত পরিসর প্রয়োজন। তবে সংক্ষিপ্ত আলোচনায়ও যে সওগাতের মুখ্য বক্তব্য ও মূল সুর ধরা যাবে না, তা নয়। বার্ষিক সওগাতের পরিচয়টিই নেয়া যাক,—বার্ষিক সওগাত ১৩৩৫ সাহিত্য সম্পদে যে কী পরিমাণ জনপ্রিয় হয়েছিল তার পরিচয় একটি বিজ্ঞাপনে রয়েছে। 'প্রথম সংস্করণ মাত্র ১৫ দিনে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র ১০ দিনে নিঃশেষিত হইয়াছে। বার্ষিক সওগাত ৩য় সংস্করণ ছাপা হইতেছে। আজই অর্ডার দিয়া নাম লিষ্টভুক্ত করিয়া রাখুন।'

বাংলা একাডেমী ঢাকাতে সংরক্ষিত সওগাতের ৪ (১৩৩৩) বর্ষের চৈত্র সংখ্যার সূচিপত্রের বিপরীত পৃষ্ঠায় এই বিজ্ঞাপনটি ছাপা আছে। যে বাঙালি মুসলমানেরা প্রথম শ্রেণীর একটি মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, সেখানে সাহিত্যমাসিক থেকে যাত্রারম্ভের প্রথম বছরেই (১৩৩৩) 'বার্ষিকী' বের করার মতো দুঃসাহস সম্পাদকের কী করে হয়েছিল, তা 'বার্ষিক সওগাত' হাতে নিলেই বোঝা যায়। বস্তুতপক্ষে অমন পরিপাটি মুদ্রণ, যুগোযোগী সাহিত্য সম্পদ এ পূর্ণ পত্রিকাখানি হট কেকের মতো পাঠকপ্রিয় না হয়েই পারে না।

এই সংখ্যায় 'বার্ষিক সওগাত' নামে নজরুল ইসলাম যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তা তাঁর 'জিঞ্জির' এর প্রথম রচনা হিসেবে মুদ্রিত হয়। 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মুজিবর রহমান এবং মোহাম্মদী সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ শুভেচ্ছাবাণীতে একে 'অসাধ্য সাধন' বলেন।

ঐ সংখ্যায় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 'বাঙ্গালার মুসলমান' শামসুন্নাহার 'নারী জাগরণী', আবুল হুসেন 'সুফী হাসিম', মোহাম্মদ সানাউল্লা 'আয়া সোফিয়া', কাজী আবদুল ওদুদ 'ফাতেহা ই দোয়াজদহম' এবং মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ 'তৈমুর' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

একরামউদ্দিন এর উপন্যাস 'নতুন মা', নজরুল ইসলাম-এর বিখ্যাত কবিতা 'খালেদ', ইব্রাহীম খাঁর নাটক 'মর্ম্মর স্বপ্ন', শাহাদাৎ হোসেন এর কবিতা 'উপেক্ষিত', গোলাম কাসেম

www.pathagar.com

এর গল্প 'অসচ্চরিত্র', আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন এর সমকালীন সামাজিক বিষয়ের ব্যঙ্গ রচনা 'একটি সভার রিপোর্ট', শেখ ফজলুল করিম এর ব্যঙ্গ রচনা 'গুণ্ডার অভিনয়', বেগম রোকেয়ার সমাজচিত্র 'তিন কুড়ে', আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না'র বিখ্যাত গল্প 'হুজুর কেবলা' (সামাজিক নকশা) প্রভৃতি ছাড়াও এতে 'মুসলিম সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পরিচয়' শিরেনামে বাঙালি মুসলমান শিল্পীসাহিত্যিকদের পরিচয় ও তাঁদের কাজের মূল্যায়নসহ জীবনীর আবশ্যকীয় তথ্য ছাপা হয়।

মুসলমানদের সাহিত্যিক জীবনে ইতিহাস রচনার কাজ এই প্রথম সংঘটিত হলো। মুসলমানদের সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, এম. আবদুর রহমান প্রমুখ এবং 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'বুলবুল' এই কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলেই মুসলমানদের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস', 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' প্রভৃতি রচিত হয়েছিল।

'বার্ষিক সওগাত' এ নবীন আফগানিস্থান, নবীন পারস্য ও নবীন তুরস্কের সচিত্র বিবরণ দেয় হয়। আরও ছিল 'বিলাতে ইসলাম প্রচার' এর সচিত্র প্রতিবেদন। এগুলিতে মুসলিম জাগরণের বিশ্বানুভূতির সঙ্গে মিলেছিল বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণের আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায়। সমালোচিত হয়েছিল বাঙালি মুসলমানের অন্তর্জীবন। 'আয়না'র লেখক আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল কালাম শামসুদ্দীনের কলমে মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতা, অন্ধতা, অজ্ঞতা ও পাপাচারের সমালোচনা হয়েছিল শিল্পীর দক্ষতায়। এসবের বিস্তৃত বিবরণ ও উদাহরণ আজ নিষ্প্রয়োজন।

'মহিলা সংখ্যা' ঘোষণা দিয়ে মাসিক সওগাত এর কয়েকটি বিশেষ সংখ্যাই বের হয়। এ ছাড়া প্রায় প্রতি সংখ্যায় 'জানানা মহফিলে' পুরুষ ও মহিলা লেখকদের দ্বারা নারীমুক্তি, নারী প্রগতি, সাহিত্যে-শিল্পে মুসলিম মহিলাদের কৃতিত্ব প্রভৃতির পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে।

মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার অপসারণের জন্য যুক্তিবুদ্ধির চর্চা ছিল এর লক্ষ্য। কার্তিক ১৩৪০ (১০ বর্ষ, ১ সংখ্যা) 'মহিলা সংখ্যা' সমূহের একটি। —এতে কবিতা লিখেছিলেন বেগম সুফিয়া এন, হোসেন, কুমারী মলিনা হালদার, কামিনী রায়, শ্রী বিমলা দেবী, শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি. এ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, শামসুন্নাহার ইউসুফ, শ্রী প্রসন্নময়ী দেবী, শ্রী সুষমা দেবী, শ্রীমতী রাধারানী দেবী।

প্রবন্ধ লেখেন রাজিয়া খাতুন, 'ইসলামে নারীর স্থান' ; মিস্ আছিয়া মজিদ বি.এ. 'শিক্ষা' ; মিসেস কে, আহমদ 'স্পার্টান নারী ; শ্রী সরলাবালা সরকার 'নারীজাতি ও রাজনীতি'; কুমারী শ্রীমতী ছায়াদেবী 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত' ; শ্রী নীহারবালা দেবী 'গালিচার কথা' ; শ্রীমতী অনুরূপা দেবী 'সমস্যা' প্রভৃতি বিষয়ে।

এছাড়া গল্প লিখেছিলেন শ্রী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, রাবেয়া খাতুন, শ্রীমতী আশালতা দেবী, কুমারী জাহানআরা বেগম চৌধুরী, বেগম সুফিয়া এন. হোসেন, শ্রী প্রতিভা সেন বি. এ. প্রমুখ।

www.pathagar.com

'অতীতের বাঙালী মহিলা কবি' শিরোনামে সচিত্র পরিচিতিমূলক আলোচনায় স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রমীলা নাগ, সরোজকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, উমা পাঞ্চজিনী বসু, কামিনী রায় স্থান লাভ করেন।

'রাশিয়ার আধুনিক নারী'র সচিত্র পরিচয়ও দেয়া হয়। বিদেশের বিদূষী মহিলাদের সচিত্র বিবরণে আরও বিশ্ব নারী নেতৃবৃন্দ ও শিল্পীদের পরিচয়ও পাওয়া যায়। সম্পাদকীয় আলোচনায় মিসেস এনি বেশান্তর পরলোকগমন উপলক্ষে তাঁর মহিমা বর্ণনা করা হয়।

'খেলাধুলায় নারী' বিভাগেও সচিত্র সুলিখিত আকর্ষণীয় আলোচনা রয়েছে। 'রূপ ও ছবি' বিভাগে সৌন্দর্য চর্চায় উৎসাহমূলক সুন্দর মুখের ছবি ছাপা হয়।[১৭]

সওগাতের উপরিউক্ত সংখ্যার উল্লিখিত লেখক তালিকা থেকে এর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়।

এরূপ আর একটি সংখ্যার পরিচয় দেয়া যাক। ভাদ্র ১৩৩৬ ৭ বর্ষ, ১ সংখ্যার প্রথম রচনার লেখিকা এবং বাঙলার মুসলমান সমাজে উচ্চ ডিগ্রিধারী মহিলাদের মধ্যে প্রথম মিস ফজিলাতুন্নেসা[১৮] (১৯০৫–৭৭) তাঁর—'মুসলিম নারীর মুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন,

> 'এই 'মুক্তি' শব্দটি বলতে এখানে আত্মার মুক্তিই বুঝায়। আত্মার মুক্তি অর্থে স্বাধীন ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে সমাজের ও জগতের কাজে নিয়োজিত করে নিজের বিচার ও বিবেক বুদ্ধি দ্বারা নিজেকে চালিত করাই বুঝায়। ধর্মগ্রন্থ এবং সাধু বাক্য প্রভৃতিকে আমি বিচার বুদ্ধি বিকাশের সহায়ক উপায় বলেই মনে করি। এগুলোর দ্বারা বিচার বুদ্ধি আড়ষ্ট হয়ে গেলে এদের প্রকৃত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়।...নারীত্ব ভুলে গিয়ে, নিজের আমিত্ব ভুলে গিয়ে, শুধু ভোগ্যবস্তু হয়ে থাকা আর নারী সহ্য করবে না।'

ঐ সংখ্যায় আরও লিখেছিলেন মিসেস আর. এস. হোসেন 'বেগম তায়েবজীর সহিত সাক্ষাৎ' ; সৈয়দা জয়নব খাতুন 'বঙ্গ মুসলিম পল্লী নারী' ; নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী 'আমাদের কাজ' এবং ওমদাতন্নেসা খাতুন 'কোন্ মোল্লায় অভক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ।

'কোন মোল্লায় অভক্তি'র লেখক বলেন :

> '...আমাদের অভক্তি কেবল অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত ধর্মব্যবসায়ী মোল্লার প্রতি।...দুই হাজার মোল্লায় মুসলিম সমাজের যে গৌরব রক্ষা করিয়াছে, একা সৈয়দ আমীর আলী সাহেব ইংরেজী ভাষায় The sprit of Islam লিখিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইসলামের উপকার করিয়াছেন।'[১৯]

এই সংখ্যাটি বাঙলার মুসলমান মহিলা সাহিত্যিকদের একত্র সমাবেশ হিসেবেও বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। কারণ এর আগে এরূপ উদ্যোগ দ্বারা অবরোধবাসিনী মুসলিম মহিলাদের উৎসাহিত করার সম্মিলিত উদ্যোগ ছিল না।

মুসলিম মহিলাদের উন্নতির অন্তরায় চিহ্নিত করে একজন লেখিকা এই সংখ্যায় লিখেছিলেন—'...নারী সমাজেরই এক অঙ্গ। সুতরাং নারী শক্তিকে পঙ্গু করিয়া রাখিবার দরুন সমাজের এক অঙ্গ বিকল হইয়া পড়িয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।'[২০]

সম্পাদকীয় আলোচনায় 'মেয়েদের শিক্ষা ও অধিকার' সম্পর্কে বলা হয় :

> '...নারী সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রকার আলাপ আন্দোলন স্থগিত রাখিয়া তাই আজ পুরুষের জন্য একান্ত করণীয় হইয়া উঠুক—তাহাদিগকে (নারীদিগকে) শিক্ষিত করিয়া তোলা। তাহা

www.pathagar.com

হইলেই নারী নিজেদের প্রাপ্য ইসলামদত্ত প্রকৃতিদত্ত অধিকার বুঝিয়া লইবার যোগ্যতা ও শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিবে।'[২১]

'পর্দা বনাম অবরোধ' শীর্ষক আলোচনায় বলা হয় :

'...যে নারী অন্ধকার গৃহকোণে অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় বাইরের সকল প্রকার আলো হাওয়া হইতে বঞ্চিত থাকিয়া অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতেছে, তাহার এই জীবন জগতের জন্য কতখানি অকল্যাণবাহী, তাহা সহজেই অনুমেয়।'[২২]

'ধর্মের নামে নির্যাতন' সম্পর্কে বলা হয় :

...পল্লী–নারী অশিক্ষিত স্বামীর হস্তে যেরূপ অমানুষিক ভাবে অত্যাচারিত হয়, তাহার তুলনা নাই। অথচ এক শ্রেণীর জীব নারীর উপর এই সমস্ত অত্যাচারকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সমর্থনও করিয়া থাকে।[২৩]

বস্তুতপক্ষে মুসলমান সমাজের এই দুর্দশার অবসান ছিল সওগাতের তাবৎ লেখকের ঐকান্তিক সাধনা। 'বার্ষিক সওগাতে'র একজন লেখক ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেন—

...আজ এ দেশের মুসলমানের অবস্থা কি? বাইরের একটা প্রথা মাত্র তাহারা মানিয়া চলিয়াছে, অভ্যাসের বশেই মানিয়া চলিয়াছে।'

কিন্তু তাঁরও পরামর্শ ছিল আধুনিক বৈষয়িক শিক্ষালাভ করার পর 'জীবনকর্মে উন্নতিলাভ করিতে হইলে আমাদের পরাধীনতা বিদূরীত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এজন্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমানদিগকেও রাজনৈতিক মুক্তি সাধনার আন্দোলনে যোগদান করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, মুসলমান সমাজের একদল অদূরদর্শী লোক জনসাধারণকে ভ্রান্তপথে পরিচালনা করিয়া তাহাদিগকে বিদেশী আমলাতন্ত্রের অনুরাগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহাদের এবংবিধ চেষ্টার ফল অন্তত মুসলমান সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে না। এদেশে মুসলমানেরাই কৃষি ও শিল্পী, তাহারাই উৎপাদনকারী ও সমাজের প্রয়োজন পূর্ণকারী। দেশের পরাধীনতার ফলে তাহাদেরই সর্বনাশ হইতেছে। সুতরাং দেশের মুক্তি সাধনে মুসলমান সমাজেরই স্বার্থ সর্বাপেক্ষা অধিক।[২৪]

সওগাত দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে এবং তাঁদের এই রাজনীতি ছিল সাম্প্রদায়িক ক্ষীণদৃষ্টির বিরোধী। তবে মুসলিম স্বার্থবিরোধী ঐকালের সমস্ত বিতর্কে সওগাত অংশগ্রহণ করেছে। যেমন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ কার্যাবলী এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে হিন্দু সম্পাদিত পত্রপত্রিকার বিরূপ সমালোচনার জবাব দান, 'শ্রী ও পদ্ম', 'বন্দেমাতরম', 'শুদ্ধি আন্দোলন' প্রভৃতি এবং সিরাজ–স্মৃতি রক্ষা, মুসলমান সংখ্যাগুরু কীনা, এসব বিতর্কই তাঁরা করেছেন অপরাপর মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকার মতোই। কিন্তু এই আলোচনাগুলো মাসিক পত্রিকার উপযুক্ত সাহিত্যিকগুণ ও মানসম্পন্ন ছিল, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার মতো জলো তরল উস্কানীমূলক আলোচনা তাঁরা করতেন না। ঐসব রচনা ছিল মননশীলতার পরিবর্ধক, সৃজনশীল বিশ্লেষকের আলোচনা। মাসিক বসুমতীর সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক কাজের সমালোচনার মাধ্যমে সওগাতের এই সাহিত্যিক শৈল্পিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া যায় :

'মাসিক বসুমতী' একখানা ব্যবসায়ী মাসিকপত্র। সাহিত্য সাধনা অপেক্ষা ব্যবসা করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কোন একটা উদ্দেশ্য ও আদর্শ ইহার নাই। প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি ইহার

www.pathagar.com

পূর্ববর্তী কাগজগুলিতে যে ভাবে পাঁচ ফুলের সাজি সাজাইবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে, ইহাতেও সেই গড্ডালিকা প্রবাহ দৃষ্ট হয়। তফাৎ এই যে, উপরোক্ত দুইখানা কাগজে প্রবন্ধাদি নির্বাচনে যেরূপ সাবধানতা পরিলক্ষিত হয়, ইহাতে সে বালাই নাই। অবশ্য প্রতিযোগিতার জন্য ভাল ভাল রচনা যে ইহাতে একেবারেই দেওয়া হয় না,তা নয়। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অমৃতলাল প্রভৃতি লেখকদের ভাল ভাল রচনাও সংগ্রহ করিয়া মাঝে মধ্যে ইহাতে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু সর্বদিক দিয়া ইহার সম্পাদন প্রণালী লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায়—যাহা পাওয়া যায়, তাহাই নির্বিচারে ছাপানোই ইহার সম্পাদন নীতি।...

বসুমতীর 'সাময়িক প্রসঙ্গ'র রাজনীতি-ঘটিত ঘটনাসমূহ সম্বন্ধীয় সম্পাদকীয় আলোচনার ওপরে সওগাতের মন্তব্য : মাসিক সাহিত্যে প্রকাশ্য এই সমস্ত সাময়িক আলোচনা উন্নত ধরনের হওয়া দরকার। 'দৈনিক ও সাপ্তাহিকে যে শ্রেণীর মন্তব্য প্রকাশিত হইয়া থাকে, মাসিকে সে শ্রেণীর হাল্‌কা ভাবের মন্তব্য প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে। বরং তাহাতে মাসিকের গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব ক্ষুণ্ন হয়। এ বিষয়ে 'প্রবাসী'র আলোচনার আদর্শ প্রসংসার্হ। অবশ্য আজকালকার 'প্রবাসী'র আলোচনার কথা বলিতেছি না। কিছুদিন পূর্বপর্যন্ত 'প্রবাসী'র আলোচনার যে আদর্শ ছিল, তাহার কথাই বলিতেছি।'

সওগাতের সমকালীন (১৯২৬-৪৭) 'প্রবাসী'র আলোচনার প্রসঙ্গে বলা হয় এগুলো 'দৈনিকের তরল আলোচনায় পরিণত হইয়াছে।' সওগাতের মতে মাসিক বসুমতীর আলোচনাও এর থেকে উন্নত শ্রেণীর নয় :

> 'দৈনিক বসুমতী' মুসলিম-বিদ্বেষের জন্য বিখ্যাত। আজকাল এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসম্মাদের দিনে মুসলিম-বিদ্বেষ হিন্দু সমাজে খুব বিকায়। সুতরাং চরম ব্যবসাদার 'বসুমতী' এই সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। ...সর্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি যে মাসিকের উদ্দেশ্য, তাহাতে এই জঘণ্য ব্যবসা বৃত্তি দেখিলে কাহার না দুঃখ হয়?[২৫]

বসুমতীর ন্যায় 'প্রবাসী'রও কঠোর অথচ সংযত দূরদর্শী সমালোচনা করেছে সওগাত। '...আমরা বহুদিন যাবত প্রবাসী পড়িয়া আসিতেছি। ইহাতে নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশিত হয়। কিন্তু সম্প্রতি...বৈলক্ষণ্য...ইহার মতামতে ও সম্পাদনে একটা অসংযত ও অব্যবস্থিতচিত্ত মানসিকতার পরিচয়ই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে উঠিতেছে...'।

নজরুল ইসলামের 'সর্ব্বহারা' কাব্যের ওপর প্রবাসীর মতামতের প্রেক্ষিতে বলা হয় : 'সমালোচকের যে রসজ্ঞতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় এই সমালোচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বস্তুতই বাঙ্গালার কাব্যরসগ্রাহীদিগকে অবাক করিয়াছে।' প্রবাসীর মত কাগজেও যে কাব্য-সমালোচনার নামে বিদ্বেষপ্রসূত গরল উদ্‌গীরিত হয়, তা ভাবতে সওগাতের কষ্ট লাগে। প্রবাসীর জবাবে সওগাত তাই বলে :

> ...নজরুল ইসলাম শুধু কবি নন, আমাদের মতে তিনি একজন যুগ প্রবর্ত্তক কবি। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ যুগ প্রবর্ত্তক কবি আর দুইজন হইয়া গিয়াছেন, একজন মাইকেল আর একজন রবীন্দ্রনাথ। যুগপ্রবর্ত্তক কবি আমরা তাঁহাদিগকেই বলি, যাঁহারা কাব্য সাহিত্যের একটা নূতন চেহারা এবং তাহাতে একটা নূতন প্রাণ আনিয়া দেন। অসামান্য প্রতিভা ও নূতন দৃষ্টি না থাকিলে কাহারও দ্বারা একাজ সম্ভবে না। ...রবীন্দ্রনাথের পরে কাব্যে নূতন দৃষ্টির পরিচয় পাই আমরা নজরুল ইসলামের রচনার ভিতর। রবীন্দ্রনাথের...কবিতা পড়িয়া

www.pathagar.com

আমাদের মনে হইয়াছিল, ইহাই কাব্যের চরম....ইহা কাব্যসাহিত্যের পক্ষে এক দাস মানসিকতা। এই দাস মানসিকতা হইতে কাব্য সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়াছেন নজরুল ইসলাম। যুগপ্রবর্ত্তক প্রতিভাসমূহের কাজই এই।[২৬]

সওগাত অবশ্য বলে যে, নজরুল ইসলামের কাব্য ধারণা ও কবিতা রচনার ভিতরে অনেক দোষত্রুটি থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাঁর অবদানও নগণ্য, কিন্তু তিনি 'কাব্যসাহিত্যে নূতন রূপ ও প্রাণ আনিয়াছেন'। বাংলা কাব্য সাহিত্যে তাঁর 'রুদ্র' ও 'সাম্যের' সাধনা নতুন এবং এর দ্বারা বাঙলা কাব্য সাহিত্য একটি নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে। এজন্য তাঁর অনুকরণকারীর দলও তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ উৎসর্গ করে নজরুলকে 'কবি' হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। অথচ প্রবাসীর আলোচনায় 'নজরুলকে কবি সমাজ হইতে একেবারে খারিজ' করে দেয়া হয়েছে। প্রবাসী নজরুলকে 'অসম্বদ্ধ প্রলাপভাসী' বলে অভিহিত করেছিল।

'শনিবারের চিঠি'তেও নজরুলের কবিতার ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কিত বিরূপ সমালোচনায় প্রতিভাবিধ্বংসী আক্রমণ করা হয়েছিল। সওগাতের সমালোচক এ প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রবাসী' যে নজরুলের কবিতা বুঝতে পারেনা 'হেঁয়ালী' বলে মনে হয়, এ-কি তাঁর দোষ? গুণগ্রহণে অক্ষম ব্যক্তিরাই নিজেদের নির্বুদ্ধিতাকে দোষ না দিয়ে দায়ী করে গুণীকে। প্রবাসীর আলোচক লিখেছিলেন যে, 'যাঁহারা চণ্ডীদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিদের রচনা পড়িয়া বাংলা ভাষার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এই নূতন ভাষা অবোধ্য।[২৭]

আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগ ব্যাপারে প্রবাসী ও শনিবারের চিঠির জবাবে সওগাতের সমালোচক বলেন, 'নজরুল ইসলামের কবিতার রস মাধুর্য্য উপভোগ করিতে হইলে কতকগুলি আরবি ফারসি শব্দের সহিত আগে পরিচিত হইতে হইবে।' তা না করে 'সনাতন বিদ্যা' নিয়ে তাঁর কবিতা বুঝতে গেলে তা হেঁয়ালী মনে হতেই পারে। তাছাড়া 'অগ্নিবীণা'র গর্জন বাংলাদেশের চির পরিচিত সনাতন, নিষ্করুণ ঢাকের বাদ্য নয়, কাড়ানাকাড়ার রক্তোত্তেজক গম্ভীর ধ্বনি—একথা তো ঠিকই। আরবি, পারসি শব্দের প্রয়োগ বাংলা ভাষায় মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র থেকেই হয়ে আসছে।

> 'বাঙ্গালাদেশ শুধু হিন্দুর নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যও হিন্দুর একচেটিয়া নহে, বাঙ্গালা ভাষার উপরেও একমাত্র হিন্দুর দখলই সাব্যস্ত হয় নাই। সুতরাং চণ্ডীদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আলাওয়াল প্রভৃতি মুসলমান কবি ও পুঁথিসাহিত্য-রচয়িতাদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যের দফ্তর হইতে খারিজ করিলে চলিবে কেন? ইঁহাদের রচনার ভিতরে বিস্তর আরবী ফারসী শব্দ ও বাক্যবিন্যাস রহিয়াছে ; সেগুলি আধুনিক বাঙ্গালী হিন্দুর অবোধ্য হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে তাহা উৎখাত করা সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালা ভাষা একটা মিশ্রভাষা ; বহু বিদেশী ভাষার শব্দ ইহাতে প্রবেশ করিয়া ইহার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। তাহা তাড়াইবার চেষ্টা এদেশ হইতে মুসলমানদিগকে তাড়াইবার চেষ্টার মতই অসম্ভব।... সাহিত্য সর্বজনীন জিনিষ হইলেও ইহার প্রকাশভঙ্গীতে জাতিত্বের গণ্ডীগত একটা বিশিষ্টতার ছাপ পড়িবেই। সুতরাং এজন্য 'প্রবাসী'র আফসোস নিষ্ফল। প্রতিভা আপনার নিজস্ব পথ কাটিয়া চলিবেই।'[২৮]

সওগাত তারুণ্য, প্রগতি, সর্বাধুনিক ও সর্বাগ্রগামী চিন্তা চেতনার পরিপোষক ছিল। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' প্রভৃতি তরুণদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী, বিতর্কিত, কখনও

www.pathagar.com

নিন্দিত প্রগতিশীল, বস্তুতান্ত্রিক ধ্যান ধারণায় আস্থাশীল, পত্রপত্রিকাগুলোর সমালোচনায় তার সে পরিচয় বিধৃত। কল্লোল (ভাদ্র, ১৩৩৪) সম্পর্কে সওগাতে বলা হয় :

> একখানি সুসম্পাদিত মাসিকপত্র। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের ভাল চিত্রশিল্পী বলিয়া নাম আছে। 'কল্লোল' সম্পাদন দেখিয়া মনে হয়, দীনেশবাবু শুধু ভাল চিত্রশিল্পী নহেন, ভাল পত্রিকা সম্পাদক এবং রসজ্ঞ সাহিত্যিকও বটে।
> কল্লোল নূতন দলের মাসিক ; বাঙ্গলার তরুণদের ভাব, আদর্শ, ইত্যাদি ইহার রচনাদিতে প্রতিফলিত হয়। এই জন্য বুড়োর দল কল্লোলের প্রতি ভারি চটিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহারা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির দ্বারা তরুণদিগকে ও তাঁহাদের আদর্শকে বিদ্রুপ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন। এই বুড়োর দলের জরাজীর্ণ প্রচেষ্টাকে যে সমস্ত কাগজ সমর্থন করিতেছেন, তন্মধ্যে 'প্রবাসী' অগ্রণী।
>
> সম্প্রতি 'বিচিত্রা' নামক নব প্রকাশিত মাসিকও তাঁহার দোসররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এজন্য 'কল্লোল' বা তরুণদল ও তাঁহাদের সমর্থকদের আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। কারণ যুগে যুগে এইরূপই হইয়া আসিয়াছে। নববলদৃপ্ত তরুণের আবির্ভাবে পুরাতন দল নিজের সঙ্কটাপন্ন অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার জন্য বরাবরই এইভাবে ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া আসিয়াছে। তাহাতেও তরুণের গতি ব্যাহত হয় নাই ; বাধা পাইয়া তরুণের গতি আরো বেগবতী হইয়াছে মাত্র এবং জীর্ণ পুরাতন হাস্যাস্পদ হইয়া অন্ধকারের কোণে মুখ লুকাইয়াছে।

কল্লোলের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতাদি সুনির্বাচিত ও সুখপাঠ্য বলে সওগাতে মন্তব্য করা হয়। 'ডঙ্কানিনাদী সুবিপুল কলেবর মাসিক পত্রাদির ন্যায় ইহাতে trash দ্বারা স্থানপূরণের কোনরূপ চেষ্টা নাই।' 'ডাকঘর' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলো সম্পর্কে বলা হয় এগুলো 'অতি চমৎকার ও সুলিখিত'।[২৯]

'কালিকলম' (শ্রাবণ, ১৩৩৪) সম্পর্কে বলা হয় : 'কালিকলমও তরুণদের আর একখানা মাসিক। ইহাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতাও মোটের উপর সুপাঠ্য বলা যাইতে পারে। তবে ইহার কোন কোন লেখায় আর্য্যামীর আস্ফালনের মিথ্যা গোঁড়ামী মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ বোধ হয়, ইহা স্বদেশীযুগের নেতা শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের দলের কাগজ বলিয়া। পাঠকগণ অবগত আছেন, হিন্দুস্বরাজ স্থাপনোদ্দেশেই এদেশে স্বদেশী আন্দোলন গজাইয়া উঠিয়াছিল। এ দলের মতামত ইহাতে প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহাতে আর্য্যামীর আস্ফালন অল্পবিস্তর থাকিবেই। এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ লিখিত 'বিচিত্রা' শীর্ষক রাজনৈতিক আলোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নলিনী বাবু স্বদেশীযুগের একজন পাণ্ডা। তিনি সুলেখক...কিন্তু তাঁহার লেখায় সেই যুগের বিশেষত্বের ছাপ পড়িয়াছে।"[৩০]

স্বদেশী আন্দোলনকে তাঁরা হিন্দুস্বরাজ স্থাপনের প্রয়াসরূপে উল্লেখ করেছেন—হয়ত নলিনীকিশোর গুহর সাম্প্রদায়িক বলে প্রতিভাত রচনাকে প্রতিহত করার জন্যই। অন্যত্র কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে সওগাত ভিন্নরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছে, বস্তুতপক্ষে সেটা তার মূল স্পিরিট।

'বিলাতী বর্জন ও মুসলিম সমাজ' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> দুঃখের বিষয় স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী-বর্জন আন্দোলনের ন্যায় একটী দেশহিতকর প্রচেষ্টাতেও মুসলমানেরা খুব অধিক সংখ্যায় অথবা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত যোগ দিতেছেন

www.pathagar.com

না।...ইহা ভারতীয় মুসলিম সমাজের সর্বব্যাপী উদাসীনতার ফল। দেশ ও সমাজের পক্ষে কল্যাণজনক কোনো কার্য্যেই মুসলমানদের অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ মুসলমান সমাজের মূর্খতা। ...তাঁহারা বিদেশীবর্জন আন্দোলনের মধ্যে 'হিন্দুদের লাভ' এবং 'মুসলমানদের লোকসান' আবিষ্কার করিয়া তাহা অশিক্ষিত মুসলমানদের গলাধঃকরণের জন্য তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন। ...সুতরাং মুসলমান সমাজের মধ্যে যাঁহারা দেশ ও সমাজের সত্যিকার কল্যাণ কামনা করেন, তাহাদিগকে অন্ধ মূর্খদের 'রাজত্ব' ভাঙিবার জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে ; মুসলমানেরা যাহাতে বিলাতী জিনিস বর্জন করিয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করে সেজন্য তাহাদের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে।[৩১]

আসলে এ ধরনের বৈপরীত্য লেখক ও আলোচকদের 'চিন্তার স্বাধীনতা' স্বীকার করার জন্যই ঘটেছে। সওগাত এর সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে এই বক্তব্য, আলোচনা মিলিয়ে পাঠ করলেই প্রমাণিত হয় যে, সম্পাদকীয় নীতিমালার ব্যত্যয় তাঁরা ঘটাননি। চিন্তার স্বাধীনতায় যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াবার জন্য পত্রিকা বার করেন না এবং 'সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা'কে ঘৃণা করেছেন সব সময়। প্রমথ চৌধুরীর ৭০তম জন্মদিবসে (২০ ভাদ্র ১৩৪৮) যে সম্বর্ধনা দেয়া হয় তাতে কোনো মুসলমান সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অথচ সওগাত মনে করে যে, 'পাণ্ডিত্য ও গণসাহিত্যের প্রবর্ত্তক হিসাবে 'বীরবল' মুসলিম বাঙলারই অধিকতর সম্বর্দ্ধনার অধিকারী।'

শুধু প্রমথ–সম্বর্ধনা নয়, ইতিমধ্যে (শরৎ, রবীন্দ্র, প্রফুল্লর স্মৃতিতে) যতগুলি সাহিত্যিক ও কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠান হয়েছে (১৯৪১ পর্যন্ত) তার কোনটাতেই মুসলিম সাহিত্যিক ও চিন্তানায়ককে আহ্বান করা হয়নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজে কাজী আবদুল ওদুদকে বিশ্বভারতীতে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। হুমায়ুন কবির, আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ, এমনকি নজরুল ইসলামের নামটা পর্যন্ত সাহিত্যিকদের তালিকায় তাঁরা (হিন্দু উদ্যোক্তাগণ) অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এর কারণ কী? এঁরা কি সাহিত্যেও 'হিন্দুস্থান' ও 'পাকিস্তান' প্রবর্ত্তন করতে চান? সম্পাদক মন্তব্য করেন, রাজনৈতিক সাম্প্রয়দায়িকতা সাহিত্যে আনা ঠিক হবে না।[৩৩]

'বিচিত্রা' আশ্বিন, ১৩৩৪ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'তিনপুরুষ' এর প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয় এবং হুমায়ুন কবির এর একটি প্রবন্ধে ইংরেজ সাহিত্যিক যোহান বোয়ারের প্রতিভার পরিচয় দেয়া হয়। এই রচনা (হুমায়ুন কবিরের) সম্পর্কে নূরী বলেন, লেখায় শক্তির পরিচয়, সাহিত্যিকোচিত রসবোধ ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি প্রশংসার যোগ্য। 'কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই শ্রেণীর বিশ্লেষণমূলক রচনার ভাষা আরও প্রাঞ্জল হওয়া দরকার। লেখক অনেক কথা বুঝাইতে চান, কিন্তু ভাষার দোষে তাঁহার আলোচনা সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইতেছে না।...'[৩৪]

সাহিত্য সমালোচনায় সাহিত্যিক সূক্ষ্মদর্শীর পরিচয় সওগাতের পাতায় পাতায় রয়েছে। 'উত্তরা' (আশ্বিন, ১৩৩৪)য় প্রকাশিত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখিত 'সাহিত্যের নব–কলেবর' শীর্ষক আধুনিক সাহিত্যের উৎপত্তি ও গতি সংক্রান্ত নিপুণ রচনাটির প্রশংসা করেও সওগাতের আলোচক বলেন, এই প্রবন্ধে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় নবীন সাহিত্য রচকদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে তাঁদের কৃতিত্বের আলোচনা করেছেন। 'কিন্তু আমাদের মনে হয় এই নব সাহিত্য রচকদের মধ্যে পুরোহিত যিনি, রাধাকমল বাবু তাঁহার নামই উল্লেখ

www.pathagar.com

করেন নাই। কেন করেন নাই, তাহা আমরা বিশেষ অনুধাবন করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের মতে নজরুল ইসলামই এই নব সাহিত্যের অগ্রদূত। নজরুল ইসলামই মানবমনের চিরন্তন বেদনার বাণীকে সাহিত্যে আমদানী করিয়াছেন। সুতরাং যিনি এই নব সাহিত্যের প্রবর্ত্তক রাধাকমল বাবু তাঁহার নাম বাদ দিয়া এ মূল্যবান আলোচনার অনেকখানি অঙ্গহানি করিয়াছেন।'[৩৫]

'বঙ্গবাণী'তে (পৌষ, ১৩৩৪) প্রকাশিত 'সাহিত্য ধর্ম' বিষয়ে নরেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ প্রকাশিত হলে সওগাত রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছিল এই ভাষায় :

> নরেশচন্দ্রের প্রতি লেখা রবীন্দ্রনাথের এক পত্রে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ নরেশচন্দ্রের চরিত্রে আক্রমণ করিয়াছেন। বুড়ো বয়সে মানুষের বুদ্ধির গোলমাল হয়, এরূপ একটা কথা আছে। কিন্তু এই বুদ্ধিভ্রষ্টতা যে এক ভদ্রলোককে আর একজন ভদ্রলোকের চরিত্রের প্রতি কদর্য্য ইঙ্গিত করিয়া প্ররোচিত করিতে পারে, তাহা আমাদের জানা ছিল না। বিশেষত 'তারুণ্যে'র দাবীদার রবীন্দ্রনাথ যে এইভাবে নিজেকে খেলো করিতে পারেন, তাহা বিশ্বাস করা খুবই মুশ্কিল। কিন্তু মুশ্কিল হইলেও তাহাই হইয়াছে, অন্তত এই চিঠিখানা দেখিয়া তাহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের এই অধঃপতনে আমরা যার পর নাই ব্যথা বোধ করিতেছি। সমগ্র বাঙ্গালা তাঁহাকে সাহিত্য গুরুর আসনে বসাইয়া রাখিয়াছে। তাঁহার মত লোকের এরূপ সূক্ষ্মচর্ম্মী হওয়ার দৃশ্য বাঙ্গালীকে দেখিতে হইল ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।...এখানেই শেষ নহে,—দেখিতেছি তাঁহার সাহিত্য শিষ্য তরুণদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যও তিনি কোমর বাঁধিয়া নামিয়া পড়িয়াছেন। নতুবা তিনি সাহিত্য সম্রাটের সুউচ্চ সিংহাসন ছাড়িয়া 'শনিবারের চিঠি'র গালাগালির গালিচায় আসিয়া অধিষ্ঠান করিবেন কেন?[৩৬]

সওগাতের রাগ-অনুরাগ পছন্দ-অপছন্দ বোঝার জন্য আর একটি নমুনা দিই। কল্লোলে (চৈত্র, ১৩৩৪) বুদ্ধদেব বসুর 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধটি 'প্রগতি' থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হয়। এ সম্পর্কে সওগাত বলে : 'প্রবন্ধটি অতি সুন্দর এবং বাঙ্গলার তরুণ সাহিত্যিকদের ইহা পড়া উচিত।...লেখকের বক্তব্য যে যুক্তিযুক্ত তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।'[৩৭]

> সওগাতে তৎকালীন বাঙলার সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা সক্রিয় ছিলেন এবং প্রগতিপন্থী, তাঁদের প্রায় সকলেই লিখেছেন। ১৯১৮ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত সওগাতে কবিতা লিখেছেন বা অনুবাদ করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া, মানকুমারী বসু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শাহাদাৎ হোসেন, রসময় লাহা, জীবেন্দ্র কুমার দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ফজলুর রহিম চৌধুরী, ভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী, কায়কোবাদ, চণ্ডীচরণ মিত্র, গোলাম মোস্তফা, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, সরসীবালা বসু, কালিদাস রায়, শেখ ফজলুল করিম, মোহাম্মদ শহীদুল্লা (হাফিজের গজল অনুবাদ), স্বর্ণকুমারী দেবী, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, সুফিয়া এন. হোসেন, জসীমউদ্‌দীন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, মলিনা হালদার, কামিনী রায়, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, আবদুল কাদির, ফজলুর রহমান, শৈলবালা দেবী, রাবেয়া খাতুন, বন্দে আলি মিয়া, মহীউদ্দীন হাবীব, মনিরউদ্দীন চৌধুরী, আমিনুদ্দীন, আবুল হোসেন, আজিজুর রহমান, সদরুদ্দীন, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, নির্মলেন্দু ঘোষ, হীরালাল দাশগুপ্ত, কে. এম. শমসের আলি, এম. সিরাজুদ্দীন চৌধুরী সাহিত্যরত্ন, শামসুদ্দীন হায়দার, মাহমুদ লস্কর, গোলাম কুদ্দুস, শওকত ওসমান, আজহারুল ইসলাম, সৈয়দ আবদুল মান্নান, হাফিজা বেগম, হোসনে আরা বেগম, সুজাতা ঘোষ, সৈয়দা ফেরদৌস মহল

www.pathagar.com

সিরাজী, সৈয়দ আলী আহসান, মতিউল ইসলাম, সৈয়দ আবুল হুদা, বেগম জেবু আহমদ, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্, কামাল চৌধুরী, ফতেহ লোহানী, ইমাউল হক, খোন্দকার নূরুল ইসলাম, শ্রী সুনির্মল বসু, কাজী আকরম হোসেন, এ.এম. বসির, নূরউদ্দীন মাহমুদ, শাহেদ আলী, বিজয় দাশগুপ্ত, সৈয়দ আলী আশরাফ, এ. কে. এম. নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ, হাবীবুর রহমান, গোলাম সোলায়মান, সৈয়দ নূরউদ্দীন, কে. এম. শাজেদুল ইসলাম, জাহান আরা আরজু, ফাতেমা রউফ, আবদুল হাই মাশরেকী, ওহিদুল আলম, মোহাম্মদ আবদুল হক, সানাউল হক, মুখ্‌খারুল ইসলাম, আশরাফ সিদ্দিকী, নাজমুল হুসেন, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, আবদুল গণি হাজারী, চৌধুরী ওসমান, সিদ্দিক আহমদ খান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আশরাফ হুসেন, মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ, চৌধুরী ওসমান, দেলওয়ার হোসেন, সেলিনা পন্নী প্রমুখ রয়েছেন।

কাজী নজরুল ইসলামের একাধিক রচনা সওগাতের প্রায় প্রতি সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। নজরুল বিরোধী, মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু লেখকদের রচনাও এতে ছাপা হয়েছে। মোহাম্মদী–গ্রুপের সঙ্গে সওগাতের প্রতিযোগিতা থাকলেও মোহাম্মদী ও সওগাতে সকল মুসলিম লেখকই রচনা দিয়েছেন। তবে 'সওগাত' তরুণদলের, নজরুলের এবং কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখের, আর মুসলিম সাহিত্য সমাজের আদর্শের বিপক্ষে কথা বলে নি। বরঞ্চ পক্ষে যোগ দিয়ে গোঁড়াদেরকে প্রতিহত করতে চেয়েছে এবং সেজন্য প্রবল প্রতিহিংসাপরায়ণ আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। [হাসান হাফিজুর রহমান অবশ্য লিখেছেন, সওগাতও শিখা গোষ্ঠীর লেখকদের অনেক লেখা সাহস করে না–ছেপে ফেরত দিয়েছে। দ্র. আলোকিত গহ্বর, ১৯৭৭] যে 'মূর্খ মুসলমান'দের উন্নতির জন্য সওগাত–এর এই জীবনপণ সংগ্রাম—সেই মূর্খরা যে এরূপ করবেন, তা হয়ত সওগাত কর্তৃপক্ষ জানতেন, জানতেন কাজী নজরুল, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন প্রমুখও। কারণ চিকিৎসক রোগীর কল্যাণ কামনায় মেজর অপারেশন কঠিনচিত্তে নির্দ্বিধায় করলেও রোগী আর্ত চিৎকার করে থাকে। কখনও ডাক্তারকে গালিও দেয়। সওগাত কর্তৃপক্ষ বাঙালি মুসলিম জীবনের কল্যাণ কামনায় কতোটা আন্তরিক ও গভীর সত্যসন্ধী ছিলেন, তার পরিচয় দেবার জন্য 'বাঙ্গালীর ভক্তি সংকট' প্রবন্ধের উল্লেখ করতে চাই। এই রচনায় মুসলমানদেরকে যুক্তিবাদী হবার জন্য বলা হয়। অকারণ ও অতিভক্তি বর্জন আশু প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করা হয়। ভক্তি যুক্তিবোধকে খর্ব করে। যুক্তি ছাড়া বুদ্ধির বিকাশ নাই। আর বুদ্ধি ছাড়া মুক্তি অসম্ভব—শিখা গোষ্ঠীর মহাজনদের মহতী প্রয়াসই ফুটে ওঠে সওগাতের এই শ্রেণীর আলোচনায়—

> ...ভক্তি জিনিসটা খুব উঁচু, কিন্তু নিছক ভীতিতে কোন কাজ হয় না। খাঁটি সোনায় যেমন অলঙ্কার তৈরি হয় না, তার সঙ্গে খাদ মেশাতে হয়, সেইরূপ ভক্তির সহিত জ্ঞানের খাদ মেশাতে হবে। বাঙ্গালীর হৃদয় আছে, বাঙ্গালী উদার প্রকৃতির। বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের সহিত হৃদয়ের যোগ ঘটে নাই ; এই দুটা বৃত্তি যেন দুই বিভিন্ন পথে চলেছে। বাঙ্গালীর কোমলপ্রাণতা ও উদারপ্রকৃতির সহিত জ্ঞানের সাধনা যুক্ত হলে বাঙ্গালী জগতে একটা মহাজাতি রূপে পরিগণিত হবে।[৩৮]

শুধু ভক্তির অপকারিতা সম্পর্কে বলেই শেষ করা হয়নি, বলা হয়েছে মুসলমানের গৃহে আনন্দও দরকার, কেবল নিরানন্দ একেশ্বরবাদী ধর্মচর্চা যে মুসলমানের সুকুমার, শৈল্পিক সত্তার বিকাশ ঘটাচ্ছে না, তা 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ' শীর্ষক প্রবন্ধে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম মনীষী মুক্তবুদ্ধির অন্যতম প্রবক্তা ড. কাজী মোতাহার হোসেন

www.pathagar.com

বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে বলেছেন, "যে সমাজ প্রাণ খুলে আনন্দ করতে পারে, তার মধ্যে সংকোচ, দ্বিধা বা ভীরুতার বন্ধন নেই—সে সমাজ বলবান, স্বাধীন, প্রাণময়। সে-সমাজের গৃহে আনন্দের ফোয়ারা ছোটে ; বাহিরের প্রত্যেক কাজে তেজ ও উৎসাহ প্রকাশ পায়। তার মন সরস ও সচেতন। সেই সমাজের আনন্দ-রসেই প্রতিভার জন্ম হয়। আমরা একট চোখ মেললেই দেখতে পাই, যাদের আনন্দ আছে, তারাই জীবন্ত—তারাই পৃথিবী শাসন করছে। যাদের আনন্দ নেই, তারা ত মৃত।"

বাঁচার মত বাঁচতে হলে, জীবনকে সার্থক সুন্দর উপভোগ্য করতে হলে আনন্দরসে অভিষিক্ত হবার পথ ধরতে হবে, তাহলেই সমাজে প্রতিভার জন্মলাভ ঘটবে, মুসলমানেরা জগতে ধন্য ও বরেণ্য হবে। অথচ মুসলমান সমাজে এই আনন্দ ও সাংস্কৃতিক সুকুমার বৃত্তির চর্চার নিতান্ত অভাব। 'এইজন্য মুসলমান যেন একটু matter of fact বা কাটখোট্টা ধরনের হয়।'[৩৯]

কাজী নজরুলের প্রথম ও শেষ রচনা সওগাতে ছাপা হয় বলে সওগাত গৌরব অনুভব করে। প্রথম পর্বে তাঁর 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' (১/৭), 'রাক্ষুসী' গল্প এবং 'নিত্য আমায় আড়াল করি/আমার হাতের লেখা দিয়ে' ; 'দুধে আলতায় রঙ যেন তার' ; 'তোমাদের দান তোমাদের বাণী/পূর্ণ করিল অন্তর' ; 'জাগো জাগো নব আলোকে/জ্ঞানদীপ্ত চোখে....' ; 'তরুণ অশান্ত কে বিরহী' ; 'স্নিগ্ধশ্যামবর্ণা/এস মালবিকা' ; 'এল ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত' ; 'গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়' ; 'প্রিয়া রূপ ধরে/এতোদিনে এলে/আমার কবিতা তুমি' ; 'নূরজাহান, নূরজাহান ! সিন্ধু নদীতে ভেসে' ; 'অপরূপ সে দুরন্ত' ; 'শক্তিমানের শক্র কোথায়?/পর্বত বাধা তৃণ সমান' ; এবং 'আমারে লইয়া তব খেলা আজও হল নাক শেষ,/ আজ বেলা অবসান—ক্লান্তি মানি হে/ক্লান্ত ! অশেষ।' —প্রভৃতি সহ অনেক রচনা সওগাতে ছাপা হয়েছে।

নজরুলের 'জনসাহিত্য সংসদের শুভ উদ্বোধনে' দেয়া অভিভাষণ 'জনসাহিত্য' ; বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির পঞ্চম অধিবেশনের 'উদ্বোধন গীতি' ; ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে গাওয়া গান ইত্যাদি এবং কলকাতার এলবার্ট হলে নজরুল ইসলামের সংবর্ধনা সভার সম্পূর্ণ বিবরণী, মানপত্র প্রভৃতি—আর, বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অবদান সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের লেখা অনেক আলোচনা এই পত্রে ছাপা আছে।

নানান প্রেক্ষাপটে সওগাত বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে বিতর্কের উর্ধে স্থান নিয়েছে। তবে একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, সে হলো, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন—এই শ্রেণীর বা দলের লেখকদের রচনা সওগাতে ছাপা হয়নি। যেমন হয়েছে চতুরঙ্গে। তবে ইতোপূর্বে বর্ণিত কবিদের অনেক ভালো ভালো কবিতা ও গান এক সমৃদ্ধিশীল সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমন ফররুখ আহমদের বিখ্যাত 'ডাহুক' কবিতাটি সওগাতেই ছাপা হয় :

রাত্রিভর ডাহুকের ডাক/এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দীঘি অতল সুপ্তির ;/
দীর্ঘরাত্রি একা জেগে আছি।/ ছলনার পাশা-খেলা আজ পড়ে থাক/
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি/ কান পেতে শোন আজ ডাহুকের ডাক।/'[৪০]

'সওগাত'এ মুসলমান লেখকদের গদ্য, কথাসাহিত্য, কবিতা ও নাটক—আর বিতর্কমূলক, বিশ্লেষণাত্মক রচনা প্রকাশের যে মানদণ্ড ছিল, তাতে লেখকগণ সচেতনভাবেই কলম

www.pathagar.com

ধরতেন। সওগাতে লিখ্ছেন একথা মনে রেখে লিখতে গেলে লেখকদের চিন্তার যুক্তির এবং প্রকাশের সাবলীল শিল্প সুষমা স্বভাবতই বেড়ে যেতো।

সম্পাদক ব্যক্তিত্ব দ্বারা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সওগাতের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের এই অগ্রগতি বা কল্যাণসাধন করেছিলেন। মুক্তবুদ্ধির চর্চা, স্বাধীন মত প্রকাশ এবং মুসলিম জীবনের অপরিচিত বিষয় অনভিজ্ঞতা সওগাতের সাহিত্য ধারণ, লালন ও পোষণ করেছিল বলে এতে মুসলমান সমাজের তথাকথিত ধর্মীয় অনুশাসনে নিষিদ্ধ বিষয়েও গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখিত ও মুদ্রিত হয়েছে। সওগাতের ২৫ বছরের (১৯১৮–২১ = ৩ বছর + ১৯২৬–৪৮ = ২২ বছর) সংখ্যাগুলোতে অনেক গল্প, উপন্যাস, নাটক ছাপা হয়েছে। যেমন মবিনউদ্দীন আহমদের 'পলিটিক্স' (নাটক, ২৩/১১) ; অজিতকৃষ্ণ বসুর 'চোর' (নাটক, ২৭/৩) ; মুনীর চৌধুরীর 'একাঙ্কিকা' (২৭/৬) ; 'বেশরিয়তী' (১৯/৯) ; ইবরাহীম খাঁর—'কাফেলা' (নাটক, ২৮/৫) ; সোফিন চৌধুরীর 'তাসের ঘর' (উপন্যাস, ধারাবাহিক, ২৭/৭ থেকে) ; মুফাখখারুল ইসলামের 'মুরশিদ' (নাটক, ২৮/১২) ; শওকত ওসমানের উপন্যাস 'জিন্দান' ; আবুল মনসুর আহমদের 'জীবন ক্ষুধা' ও আবুল ফজলের 'প্রেমের উপহার' ও 'অসম্ভব নয়' শীর্ষক উপন্যাস ইত্যাদি।

এছাড়া শতাধিক লেখকের গল্প, কথা–সাহিত্যও প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন জলধর সেন, সৈয়দ এমদাদ আলী, একরামদ্দীন (কাচ ও মণি), মওলা নওয়াজ, গোলাম কাসেম, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এইচ. জে. নূর আহমদ,বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়, এম. নাসিরউদ্দীন, মুহম্মদ ওয়াজেদ আলী, সৈয়দ মরতুজা আলী, গোলাম মোস্তফা, মিসেস এম. রহমান, মতিনউদ্দীন আহমদ, কাজি আফসারউদ্দীন আহমদ (নিখিলেশের নির্যাতন, ৯/৩) ; ইবনে মুসা, জাহান আরা বেগম চৌধুরী, সুফিয়া এন. হোসেন, প্রতিভা সেন, আবদুস সালাম, বজলুর রহমান, মহীউদ্দিন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, এ.বি.এম. হবীবুল্লাহ, সিরাজউদ্দীন আহমদ, আবু জাফর মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, আহসান হাবীব, খালেকদাদ চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, আবু রুশদ, মফিজউল হক, সফুরা আহমদ, লায়লা হক, খুরশিদ জাহাঁ বেগম, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, গোলাম কুদ্দুস, জুলফিকার হায়দার, রশীদ করীম, তালিম হোসেন, মুনীর চৌধুরী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, হামেদ আহমদ, আশাপূর্ণা দেবী ও মাহবুবউল আলম।

চিন্তামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন বিচিত্র বিষয়ে সওগাতের লেখকগণ। যেমন—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাহান আরা) ; খোন্দকার গোলাম আহমদ (মোসলেমতত্ত্ব) ; আবদুল করিম (সাহিত্য বিশারদ তখন হননি) (ইসলামাবাদ) ; ইসমাইল হোসেন সিরাজী (বোগদাদচিত্র ; আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা ; সিসিলদ্বীপের মুসলমানগণের জ্ঞান চর্চা) ; গোলাম মোস্তফা (বীরাঙ্গনা খাওলা) ; একরামদ্দিন (প্লাঙ্কেট রহস্য) ; এম নাসিরউদ্দীন (জাতীয় মহাসম্মেলন); মোহাম্মদ কে. চাঁদ (মোসলেম নীতিশাস্ত্র) ; শাহাদৎ হোসেন (অতীতে যুগের মোসলেম রমণী) ; সৈয়দ আহমদ চৌধুরী (শরাফতের পরিণাম) ; ফজলুর রহিম চৌধুরী (আরবের সারা রাজ্য ; সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাস ; হেজাজের পূর্ব ইতিহাস ; এয়মন রাজ্যের প্রাচীন কাহিনী) ; এসলামাবাদী (মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার) ; রাধাচরণ দাস (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খেয়ার আলোচনা) ; আবদুল ওয়াহেদ (সামাজিক উন্নতির অন্তরায় ও প্রতিকারের উপায়চিন্তা)।

www.pathagar.com

এবং চণ্ডিচরণ মিত্র : (মোগলযুগের আগ্নেয়াস্ত্র) ; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (সমাজের উন্নতি ; পাপ ও পুণ্য ; চরিত্রের মূল্য ; নারী মাধুরী ; মহৎ জীবন) ; এয়াকুব আলী চৌধুরী (সমালোচনা) ; আবদুল গফুর সিদ্দিকী (ব্যবসা–বাণিজ্য) ; মোহাম্মদ–চরিত্রের মূল্য ; নারী মাধুরী ; মহৎ জীবন) ; এয়াকুব আলী চৌধুরী (সমালোচনা) ; আবদুল গফুর সিদ্দিকী (ব্যবসা–বাণিজ্য) ; মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেন (সমালোচনা) ; আজিজুর রহমান (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জীবনী) ; ও আলি (পথ কোন্ দিকে ?) ; ডাক্তার ফজলুর রহমান খানসুর (প্রাচীন মোস্লেম সভ্যতা) ; মোজাম্মেল হক (জাঁহাঙ্গীর শাহের রাজ্যাভিষেক ও দৈনিক জীবন) ; নূরুন্নেহার খাতুন (নারী জাতির শিক্ষা) ; অশ্বিনীকুমার সেন (আকবর বাদশাহের সন্তান–সন্ততি) ; বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায় (দিল্লীতে দিন কয়েক) ; অমৃতলাল শীল (মোগল যুগের স্ত্রীশিক্ষা ; হজরত আলী মরতুজা) ;

কাজী মোতাহার হোসেন (ধর্ম্মের বাহ্যরূপ ও আদর্শরূপ ; পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ; গ্যালিলিও ; শিক্ষিত মুসলমানের কর্তব্য, ১১/১ ; আনন্দ ও মুসলমান গৃহ) ; এম নাসিরউদ্দীন (আফ্রিকায় ইসলাম ; আধুনিক তুরস্ক) ; তরিকুল আলম (ওমর খৈয়াম ; নারী) ; মিসিস আর. এস. হোসেন (শিশু–পালন) ; মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (বাঙ্গালার মুসলমান, স্ত্রী–শিক্ষা ; মোল্লাদের প্রভাব ও শিক্ষিত সমাজ ; কথিকা : কাঁচা ও পাকা, রাজর্ষি ওমর, মোহাম্মদ আলি ; ধর্মীয় শাসন ; তাঁতীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (৯/৩) ; শ্রী যোগেশচন্দ্র দত্ত (আরব জাতির জ্ঞানচর্চা) ; শাহাদাৎ হোসেন (আল্ আজহার) ; মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (ধ্রুব কোথায়, ক্রমশ:) ; শ্রী ব্রজমোহন দাস (ব্যবসায় বাঙ্গালীর হাত পাকান) ; মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ (পারস্য ও রেযা খান) ; জসীমউদ্‌দীন (ডাক্তার আর. আহমদ) ; চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান (হুমায়ুন নামা) ; কাজী আবুল হোসেন (রবীন্দ্র স্মৃতি, ৭০তম জন্ম উৎসব উদযাপনের পরে) ; ফাতেমা খানম (তরুণের দায়িত্ব) ; সৈয়দ মোকাররম আলী বি. এ. বি.টি. (মুনশী শেখ আবদুর রহীম) ;

মুহম্মদ বরকতুল্লাহ (পুস্তক–সমালোচনা) ; আফতাবউদ্দীন আহমদ (বিলাতে ইসলাম প্রচার) ; সিরাজুল ইসলাম (পর্দা না অবরোধ) ; এস. ওয়াজেদ আলি (এভারেস্ট পর্ব্বতের কথা ; বাঙ্গালী মুসলমান) ; মোতাহের হোসেন চৌধুরী (আদেশপন্থী ও অনুপ্রেরণাপন্থী, ৯/৩, কার্তিক ১৩৩৯) ; রিনেসাঁস : গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে পঠিত ; সভ্যতা ও তার বিকিরণ (ক্লাইভ বেলের অনুসরণ); সৈয়দ হাম্মদ আলী (অতীতে ভারতের গ্রাম) ; অধ্যাপক কাজেমউদ্দীন আহমদ (মুসলিম দর্শন—বঙ্গীয় মু. সা. সম্মেলনে, দর্শন শাখার সভাপতির অভিভাষণ) ; রাজিয়া খাতুন (ইসলামে নারীর স্থান : খালেদা এদিব খানম) ; মিসেস কে. আহমদ (স্পার্টান নারী) ; শ্রী সরলাবালা সরকার (নারী জাতি ও রাজনীতি) ; শ্রীমতি ছায়া দেবী (স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত) ; শ্রী নীহার বালা দেবী (গালিচার কথা) ; শ্রীমতী অনুরূপা দেবী (সমস্যা) ;

শামসুন্নাহার (ম্যাডাম কুরী ; নারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ; আমাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ; কৃষ্ণনগর মহিলা সম্মিলনে সভানেত্রীর অভিভাষণ) ; শ্রী মন্মথনাথ সরকার (চীনে কৃষক জাগরণ ; বর্ণমালার উৎপত্তি ও সভ্যতার বিকাশে উহার স্থান) ; সাদত আলী আখন্দ (হাজী মোহাম্মদ মোহসেন ; লালটুপী, দাউদ খাঁ) ; আনোয়ার হোসেন (সুফী মতবাদ, ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধের অনুবাদ) ; এস. মাহমুদুর রহমান (বলসেভিজম ও ইসলামিক সমাজতন্ত্র) ;

www.pathagar.com

কুমারী আছিয়া মজিদ বি. এ. (নবযুগের শিশু) ; কুমারী সকিনা কেরামত (আদর্শ মানুষ) ; রেণু বালা মিত্র (নেপোলিয়ামের প্রেমে) ; শান্তি দেবী (ফায়ার দেশ) ; ড. প্রফুল্লকুমার মিত্র (জৈব রসায়ন) ; অধ্যাপক কাজী আকরাম হোসেন (আব্বাসীয় যুগ) ; এস. এ. হামিদ (মুসলিম সমাজে ভিক্ষুক সমস্যা) ; মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বাহাই ধর্ম্ম) ; মৌলবী মোক্তার আহমদ সিদ্দিকী (ফেকাহ্‌র উদ্ভব ও পরিণতি) ;

কাজী আবদুল ওদুদ (সাহিত্যের স্বরূপ ; রবীন্দ্রনাথ ; একেরমান ও সাবের সঙ্গে গ্যেটের আলাপ) ; মোহাম্মদ আকবর উদ্দীন (প্যালেস্টাইন বিদ্রোহের অন্তরালে) ; মোহাম্মদ মকসুদ আলী উত্তাপ যন্ত্রের আদি ইতিহাস ও কার্যপদ্ধতি) ; খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন (বাঙলার পল্লী অঞ্চলের আর্থিক সমস্যা) ; সৈয়দ আবদুল মজিদ (গবর্ণমেন্ট নিয়ন্ত্রিত লটারী) ; একরামুল হক (বাঙলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় পাণ্ডুয়া) ; আমিনউদ্দীন আহমদ (স্যার মোহাম্মদ ইকবাল) ; আকবর আলি এম.এস.সি. (গণিতবিদ আবদুল ওয়াদা) ; ফজলুর রহমান (আলোচনা : বিচিত্র বিবাহ–প্রথা) ; আমিন আহমদ (অপরাধ ও অপরাধীর গোড়ার কথা) ; আবদুল আলি (ভারতে বিমান চলাচলের ইতিহাস) ; হবিবর রহমান (রহস্যাবৃত সুন্দরবন) ;

মোহাম্মদ আকরম খাঁ (মোসলেম সংস্কৃতি, ১৯৩৯ সনের ব. মু. সা. সম্মেলনের অভিভাষণ) ; ইউসুফ আলী (রাষ্ট্র বিজ্ঞানে প্রাচীন মনীষীদের দান) ; ড. মুহম্মদ কুদরৎ–এ–খুদা (রসায়নের অন্তর্নিহিত রহস্য) ; অধ্যক্ষ ইবরাহিম খাঁ (স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দুটী কথা ; সাহিত্যের আদর্শ) ; আবুল হোসেন (আদেশের নিগ্রহ, ফিকা ফোবিয়া, মুসলিম কালচার—পিকথলের অনুবাদ) ; প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের এনাটমি, শিল্প ও শিল্পী) ; আবদুল কাদের (ক্রুসেডের ইতিহাস) ; এম. আবদুর রহমান (মিসেস এম. রহমান) ; কাজী আবদুর রশিদ (সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী) ; আহমদুর রহমান (হজ্বযাত্রীর চিঠি) ; কাজী সিরাজুল ইসলাম (গ্রীসের পত্রশিল্পে পুরাতত্ত্বের ব্যবহার) ; আমিন আহমদ (আধুনিক অপরাধতত্ত্ব) ; রমেন্দ্ররায় চৌধুরী (স্যার অলিভার লজ) ; ফজলুর রহমান (ফিরোজ শাহের রাজস্বনীতি) ; জহুর হোসেন বি.এ. (দক্ষিণ আফ্রিকার কলাশিল্প)।

আবদুল আলীম চৌধুরী (দাক্ষিণাত্যের অতীত–গৌরব) ; মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (শান্তিসংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক বিষয়ের আলোচনা) ; কাজী আতিকুর রহমান (চন্দ্রের ভবিষ্যৎ); গোলাম কাসেম (ফটোগ্রাফি) ; ফজলুল করিম (খিলজী বাদশাহদের বংশ পরিচয়) ; মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ (মিসরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি) ; কাজি মুজিবর রহমান (ভূমিকম্প) ; মোসলেম উদ্দীন আহমদ (সংগ্রামরত চীনের বৈপ্লবিক সংস্কার) ; আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (পর্দাপ্রথার উৎপত্তি) ; শ্রী সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত (মরমী কবি ইকবাল) ; মজহারউদ্দীন ভূঁইয়া (পাণ্ডুয়ার মোসলেম কীর্তি) ; আজহারুল ইসলাম (আইনের গতি ও পরিণতি) ; আবদুল কাদির (সবহারাদের কবি রবীন্দ্রনাথ) ; লীলাময় রায় (মর্ত্ত হইতে বিদায়) ; মুহম্মদ হবিবুল্লাহ (নবাব খাজা আবদুল গনি ; বাঙ্গালার বাজেট) ; আকিমুন নেসা আহমদ (রাষ্ট্রপতি ইসমত পাশা ; পূর্বভারতীয় ফেডারেশনের ঐতিহাসিক ভিত্তি) ; মুস্তাফিজুর রহমান (মোতাজেলাবাদের গোড়ার কথা) ; মোহাম্মদ আফতাব হোসেন (উত্তরবঙ্গে–প্রজা–বিদ্রোহ) ; আদুর রহিম (সুলতান সেকান্দর আলী) ; মিসেস এ হাসান

www.pathagar.com

(আদর্শ জননী) ; আনোয়ারা চৌধুরী (ভূপালের বেগম ; প্রাচীন সাহিত্যে নারী-চরিত্র) ; ইলা সেন (বিশ্বশান্তি ও নারী) ; সাহেরা খাতুন বি. এ. (কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল) ; রাবেয়া হায়দার (আমাদের শিক্ষার স্বরূপ) ; জোবেদা ফররোখ্ বি. এ. (ইসলামী দৃষ্টিতে নারী) ;

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (আধুনিকা) ; তহমিনা হক (মেয়েদের শিক্ষা) ; কুমারী রিয়া হক (পর্দা ও অবরোধ) ; আকলিমা খাতুন (আধুনিক মুসলিম সাহিত্য) ; হুসনা বানু খানম (বিজ্ঞান ও সাহিত্যে নারীর দান) ; সৈয়দা ফাতেমা সাদেক (ইসলামে নারীর স্থান) ; সতী গঙ্গোপাধ্যায় (পেগু) ; বেগম দিল আফরোজ (সমাজে নারী ও পুরুষ) ; হামিদা খাতুন (আমাদের শিশু সাহিত্য) ; কুমারী শমসী চৌধুরী এম.এ. (দাতব্য প্রতিষ্ঠান) ; শ্রী কমলা দেবী (প্রসূতি কল্যাণ) ; রাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (ধারণা-শক্তি আবিষ্কার) ; খোদেজা খাতুন (ল. অব এ্যাসোসিয়েশন) ; সোহরাব আলী খান চৌধুরী (বিজ্ঞানের আধুনিক গতিধারা) ; সবিতা গুহ (কবিতার বিষয়বস্তু) ; এ.কে. শামসুল আলম (আমাদের গাঁয়ের ভাষা) ; নাছিমউদ্দীন আহমদ (সয়াবীন) ;

আবদুল কাদির (মুসলিম লীগের জন্ম) ; নূরুল আলম চৌধুরী (প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রের পর্দাপ্রথা) ; মনোরঞ্জন বড়াল (পৃথিবীর ওজন) ; গোলাম কুদ্দুস (ডিটেকটিভ উপন্যাস) ; চৌধুরী এ.কে. এম. ফজলুল হক (শিল্পী) ; মুনীর চৌধুরী (সতেরো শতাব্দীর 'হেয়কেয়ি' কবিতা) ; রশীদ করীম (শিল্পী ; ওবায়দুল্লাহ রওশনাবাদী (ভারতে মুসলিম বিজয়ের যোগসূত্র) ; আবু নয়ীম মোহাম্মদ বজলুর রশীদ বি. টি. (ঋতুসঙ্গীত) ; আলী আশরাফ চৌধুরী (অতীতের মুসলিম সামরিক প্রথা) ; আবদুল হাই (প্রাচ্যের অগ্নিপুরুষ) ; মোহাম্মদ মতিয়র রহমান (সোভিয়েট রাশিয়ার মুসলিম নারী) ; অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই (ভারতচন্দ্রের মানসিংহ) ; কাজী আবদুর রশিদ (ইসলাম প্রচারের আদি যুগ) ; মিসেস মেহেরুন্নেসা খানম (এতিমখানা, মন্বন্তর এর প্রেক্ষাপটে রচিত) ; মোমতাজউদ্দীন আহমদ (দার্শনিক ইব্‌নে রুশদ) ; শ্রী মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (শিল্প ও সমাজ), জহিরুল হক (প্রাচীন রাশিয়ান সাহিত্য) ; খুরশিদ জাহান বেগম (আমাদের স্বাধীনতা) ;

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (আমাদের জাতীয় সাহিত্য) ; আছিয়া খাতুন (মুতাজিলা মতবাদ) ; ড. মুয়াইয়াদুল ইসলাম (আমাদের ইতিহাস) ; কাজী হাশমৎউল্লাহ্ (গুরু নানকের যুগ) ; বেগম তসলিমা ইসলাম (নজরুল ইসলাম) ; দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (যুদ্ধ ও শান্তি) ; গোলাম আহমদ (জাগতিক ধর্ম) ; ফাতেমা মুহিবুস সামাদ (সোভিয়েট সাহিত্যের কাঠামো) ; অজিতকৃষ্ণ বসু (বিজ্ঞাপন ও সাহিত্য) ; বসুধা চক্রবর্তী (নূতন ধান) ; সরদার ফজলুল করিম (মধ্য এশিয়ার মুসলমান ; যুদ্ধ : মন্বন্তর ও বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ ; সাহিত্যে সমস্যাটা কি ?) ; এ. এফ. এম. আবদুল জলীল (আলাউদ্দীন খিলজি ও মার্কেট কন্ট্রোল) ; ইসলামের পূর্বে জগতের অবস্থা, ইসলামে স্ত্রী স্বাধীনতা) ;

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (বিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ; কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য) ; মাহবুব জামাল জাহেদী (খাদ্য-সমস্যা ; মত ও পথ ; কৃষি-সমস্যা ; শিল্প-সর্বস্ব নীতি) ; অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রসুল (মুসলিম শাসনে অমুসলিম প্রজার স্থান) ; আবদুল মতিন (পাঁচ হাজার বছর পরে) ; প্রভাত দাস (সমাজ ও অর্থনীতি) ; কামালউদ্দীন (ফেলিস্তিনের গেরিলা দল) ; ব্রজেন ভট্টাচার্য (রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র) ; আখতার হুসেন (আগস্ট ১৯৪৬) ; মোহাম্মদ মতিয়র রহমান (আগা নার্গিস বানু) ; অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী (ফেলিস্তিনের সমস্যা ; ইন্দোনেশিয়ার মুক্তি-সংগ্রাম) ;

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল হক (সনেটের টেকনিক) ; কাজী নূরুল ইসলাম (নজরুলের বাল্য রচনা) ; ফররুখ আহমদ (ইকবাল প্রসঙ্গে) ; মোখলেছুর রহমান (শিশু সাহিত্যের আদর্শ); মোহাম্মদ আবদুল হাকিম (বাদশা আওরঙ্গজেবের সংবাদপত্র) ; মোহাম্মদ ফায়েজউদ্দীন (শিক্ষা পরিস্থিতি ; বাঙলার শিক্ষক ও শিক্ষা) ; হাবীব উর রহমান (কংগ্রেস ও ফ্যাসিজম); আলাউদ্দীন আল আজাদ (গণসাহিত্য) ; এস. ওয়াজেদ আলি (ইবনে খালদুনের সমাজ বিজ্ঞান) ; আবদুল মওদুদ (বাংলায় দ্বৈতশাসনের এক পৃষ্ঠা, ইংরেজ আমলে মুসলমান) ;

মীজানুর রহমান (কোরানের শিক্ষা ; একবালের চিন্তাধারা) ; ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (মোহাম্মদ শাহের আমলে দিল্লীর তাহ্জিব) ।

বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সওগাত এর সাফল্যজনক ভূমিকা সকলেই স্বীকার করেন। তাঁদের আন্তরিকতার পরিচয় নেবার জন্য শুধু এখানে ১৯৩০–৩১ সনের সন্ধিক্ষণে সওগাতের 'তরুণদের সাহিত্য সাধনা' শীর্ষক একটি সম্পদকীয় বক্তব্যের সার সংকলন করে দিতে চাই—

সম্পাদক বলেন, 'মুসলান সমাজে বাংলা সাহিত্যের প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে, এটা আনন্দের। আগে যাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলাকে অগৌরবের মনে করতেন, তাঁদের পরিবারের অনেক তরুণ বাংলা সাহিত্য চর্চায় নেমেছেন, সবই 'কল্যাণের দ্যোতক'। 'কিন্তু মুসলমানদের নবজাগ্রত এই শুভবুদ্ধির মধ্যেও একটি বড় দুর্লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তরুণদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্য ক্ষেত্রে নামিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে না। আমাদের নূতন লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই কবিতা, গান, গল্প ও উপন্যাস রচনায় ইচ্ছুক, কিন্তু দু'একজন ছাড়া আর কেউই তাহাতে তেমন শক্তির পরিচয় দিতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ কি? আমাদের মনে হয় আমাদের তরুণদের অনেকে নিজেদের জন্য ক্ষেত্র নির্বাচনে ভুল করিতেছেন।'

যার যার স্বাভাবিক শক্তি অনুযায়ী ক্ষেত্র নির্বাচনপূর্বক সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে সওগাত সম্পাদক তাই বলেন, অন্যথায়, 'তাঁহাদের নিজেদেরও সাফল্য লাভ হইবে না, মুসলমান সমাজও তাঁহাদের দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে না।'[৪১]

তথ্যনির্দেশ

১. সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৫ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ ('শতাব্দীর সাহিত্যব্যক্তিত্ব: মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন', প্রচ্ছদকাহিনী ছিল)।

২ উপরিউক্ত, ১৯।

৩. বিলাতের এক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিনিধি, শ্রী এম. সি. দত্তের পরামর্শে এবং সহযোগিতায় ওরিয়েন্টাল সিকিউরিটি লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চাঁদপুরের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করেন ১৩১৭ বঙ্গাব্দে, ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে, তখন নাসিরউদ্দীনের বয়স বাইশ বছর। সূত্র : সওগাত, অগ্রহায়ণ–পৌষ, ১৩৮৬, পৃ. ৬৫।

৪. এ বিষয়ে আল ইসলাহ্ ও মোহাম্মদীতেও লেখকেরা আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন যে, হিন্দু সমাজ অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি বেশি! 'আল মুসলিম' পত্রিকায় এম. আনোয়ারা বেগম (পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ এর মাতা) ১৯২৬ সনে লিখেছিলেন যে—হাড়ি-পাতিল অর্থাৎ মাটির জিনিস তৈরির কুমোরের কাজ, বেতের জিনিস তৈরির ঋষি-মুচির কাজ, ধোপার কাজ সবই হিন্দুদের অধিকারে দিয়ে দেয়া হয়েছে। না-খেয়ে, হিন্দুর দ্বারে ভিক্ষা করে

www.pathagar.com

মুসলমান, তথাপি ঘৃণায় বা অবজ্ঞায় সে সব কাজ করে না। তিনি লিখেছিলেন, মুসলিম সমাজের আর্থিক দৈন্য দূর করার জন্য লাভজনক যে কোনো ব্যবসাই করা যেতে পারে! মুসলমানদের মধ্যে কতো প্রকার বিভ্রান্তি যে ছিল তার দলিল ঐকালের পত্রিকার পাতায় রয়েছে।

৫. ১৩২৬ সনের ভাদ্র সংখ্যার শেষে মুদ্রিত দুইতিন পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন ও আবেদনে নাসিরউদ্দীন সাহেবের সমাজের উন্নয়নের জন্য কাতর ব্যাকুলতা ধরা পড়েছে। তাঁর সামর্থ অতি স্বল্প, কিন্তু সমাজের জন্য কিছু করা দরকার। সংগঠন শক্তি ও উদ্ভাবনাবুদ্ধিবলেই তিনি ধাপে ধাপে নিজ সংকল্প বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন। সওগাত কি ভাবে গড়ে উঠলো তাঁর ইতিহাস জানার জন্য প্রথম পর্বের পৃষ্ঠাগুলো পাঠ করা দরকার। মুসলমান সমাজ নিয়ে তিনি কী ভাবে ভাবিত, চিন্তিত; কিংবা সাফল্যের এবং সার্থকতার পরিকল্পনা ও স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে দেখে তিনি কতোটা উদ্দীপিত হন, তাও এতে প্রতিফলিত আছে।

৬. সওগাত, 'মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন জাতীয় সম্বর্ধনা সংখ্যা', অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৮৬, পৃ. ৬৮।

৭. উপরিউক্ত।

৮. বেগম রোকেয়া, সওগাত (কবিতা), সওগাত, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫, পৃ. ১। উল্লেখ্য, তখন বেগম রোকেয়ার নাম মিসিস আর. এস. হোসেন ছাপা হতো।

৯. সওগাতের মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন জাতীয় সম্বর্ধনা সংখ্যা, ১৩৮৬ থেকে উদ্ধৃত।

১০. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ২৫৬-৫৭।

১১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত, সাহিত্যপত্রিকা (ঢা: বি:) শীত ১৩৮৭, পৃ. ৭০।

১২. আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, সওগাত-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এর জাতীয় সম্বর্ধনা উপলক্ষে (১৯৭৯), সম্বর্ধনা সংখ্যা ১৩৮৬, পৃ. ৩৫।

১৩. গোলাম মোস্তফা, নিয়ন্ত্রিত, সওগাত, ৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৮।

১৪. কাজী নজরুল ইসলাম এর 'হবে জয়' রচনার পটভূমি লিখেছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, দ্রষ্টব্য : সওগাত, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৮৬, পৃ. ৯৭।

১৫. বিবিধ প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়), মাসিক সওগাত, আষাঢ় ১৩৩৩।

১৬. সৈয়দ এমদাদ আলী, শুভাশীষ, সওগাত, ৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৩।

১৭. লেখকদের নামগুলো পত্রিকায় যেভাবে ছাপা হয়েছিল, সেভাবেই উল্লেখ করা হলো।

১৮. ফজিলাতুন নেসা ১৯০৫ (মতান্তরে ১৮৯৯) সনে জন্মগ্রহণ করেন বর্তমান টাঙ্গাইল জেলায়। ১৯২৫ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (ডিসটিংশনসহ) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিত-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে বিলেত গমন করেন। নজরুল ইসলাম এই ভদ্রমহিলার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ফজিলাতুননেসা ঢাকার ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ১৯৪৮-৫৭ সময়ে। মুক্তবুদ্ধির প্রবর্তক ও প্রচারক এই ভদ্র মহিলা বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিতে শহীদ মিনার নির্মাণে বাধা দিয়েছিলেন, এটা অবাক করে। তবে সরকারী চাকুরীর নিয়মে তিনি বাধা দিয়েছিলেন কীনা তাও সহর্মিতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। তাঁর প্রথম জীবনের কার্যাবলি মুসলমানদের গর্বের এবং অনুসরণের যোগ্য ছিল।

১৯. ওমদাতন্নেসা খাতুন, কোন মোল্লায় অভক্তি, সওগাত, মহিলা সংখ্যা, ৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৬।

২০. আয়েষা আহমেদ, মুসলিম সমাজের উন্নতির অন্তরায়, উপরিউক্ত।

২১. সম্পাদকের দফতর, সওগাত মহিলা সংখ্যা, উপরিউক্ত।

২২. উপরিউক্ত।

২৩. উপরিউক্ত।

২৪. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, বাঙ্গালার মুসলমান; বার্ষিক সওগাত, ১৩৩৩, পৃ. ৭।

২৫. সাময়িক সাহিত্য (মাসিক বসুমতী-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪) সওগাত, ৫ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ. ২৮১-৮৩।

www.pathagar.com

২৬. নূরী, সাময়িক সাহিত্য (প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সংখ্যার আলোচনা) সওগাত, ৫ বর্ষ, ২ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৪, পৃ. ১৮২–৮৫।

২৭. বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।

২৮. উপরিউক্ত।

১৯. সাময়িক সাহিত্য, সওগাত, আশ্বিন, ১৩৩৪, পৃ. ৩৭১।

৩০. উপরিউক্ত।

৩১. বিলাতী বর্জন ও মুসলিম সমাজ, সম্পাদকের দফতর, সওগাত, চৈত্র, ১৩৩৬, পৃ. ৫৫৮।

৩২ 'চিন্তার স্বাধীনতা' শীর্ষক সম্পাদকীয় আলোচনাটি বড় চমৎকার। এ দেশের নবীন ও প্রাচীন পন্থীদের মনোভাবের সমালোচনা করে বিপ্লবের পক্ষে মতামত দেয়া হয়েছে। 'বিপ্লব' ভয়ের কিছু নয়। দ্র. সওগাত, ৫ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৪, পৃ. ৬৯৭।

৩৩. সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, উপরিউক্ত, আশ্বিন, ১৩৪৮(১৯৪১), পৃ. ১০৩৮।

৩৪. নূরী, সাময়িক সাহিত্য, উপরিউক্ত, ৫ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৪, পৃ. ৪৫৬।

৩৫. সাময়িক সাহিত্য, উপরিউক্ত ৫ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৩৪।

৩৬. উপরিউক্ত।

৩৭. উপরিউক্ত, ৫ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৫, পৃ. ৯১৬।

৩৮. শ্রী মন্মথনাথ সরকার, বাঙ্গালীর ভক্তিসংকট, উপরিউক্ত, ৫ বর্ষ, ২ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃ. ১৪৬।

৩৯. কাজী মোতাহার হোসেন, আনন্দ ও মুসলমান গৃহ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, পৃ. ৫৩৫।

৪০. ফররুখ আহমদ, ডাহুক (কবিতা), উপরিউক্ত, ২৬ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৫১, পৃ. ৪১।

৪১. তরুণদের সাহিত্য সাধনা, সম্পাদকের দফতর, উপরিউক্ত, বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭, পৃ. ৬৫৬–৫৭।

www.pathagar.com

২. শিখা
(ঢাকা, ১৩৩৩-৩৮)

বাংলাদেশ ও ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বৎসমাজের কাছে ১৯২৬ সনে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও এর মুখপত্র বার্ষিক 'শিখা'র পরিচয় বিস্তৃত করে বলবার অপেক্ষা রাখে না।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী ঐহিক চিন্তার স্ফুলিংগ থেকে বাঙালি সমাজে যে আলোকপন্থী একদল লেখক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ভবিষ্যৎ জীবনে চলবার দিশা লাভ করেছিলেন, তাঁদের সকলের প্রয়াস চিহ্নিত হয়েছে 'বাংলার জাগরণ' বলে। এই জাগরণের অন্যতম ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক, কাজী আবদুল ওদুদও মুসলমান সমাজের রামমোহন বলে সম্মানিত, মনীষী আবুল হুসেনসহ কতিপয়ের উদ্যোগে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গঠিত হয়েছিল। প্রতি বৎসরে এর অধিবেশন বসতো। সেখানে ঢাকার বাইরে থেকেও অতিথি আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নাম হলেও হিন্দু-সমাজের আলোকপন্থী মনীষীরাও এখানে আমন্ত্রিত হতেন।

এই সমাজের অধিবেশনে কাজী নজরুল ইসলাম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান গেয়ে গিয়েছিলেন ১৯২৭ সনে। ১৯৩৬ সনের দশম বার্ষিক অধিবেশনে অতিথি হয়ে এসেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দেয়া অভিভাষণটি আনন্দবাজার, বিচিত্রা, বুলবুল, সওগাত, মোহাম্মদী ও জাগরণে ছাপা হয়েছিল। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মুসলমান-সম্পাদিত পত্রপত্রিকায় প্রচুর বাক্-বিতণ্ডা হয়। বর্ষবাণীর সম্পাদিকা জাহানআরা চৌধুরীর কাছে লেখা শরৎচন্দ্রের ছোট্ট চিঠিটাতেও বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজ বিষয়ে কিছু কথা শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,—তা নিয়েও অনেক আলোচনা হয়।

তখন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ উৎকট হয়ে উঠেছিল বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' বিষয়ে সেমিনার-এর আয়োজন করেছিলেন (১৯৩৫), কাজী আবদুল ওদুদ তিন দিনব্যাপী সেমিনারে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখবন্ধসহ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ থেকে তা ১৯৩৬ সনে পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু মুসলমান সমাজের এক বৃহদাংশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে আস্থাশীল, উদার, মুক্তবুদ্ধির অনুসারী কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী আনোয়ারুল কাদির প্রমুখের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন।

মোহাম্মদীতে কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের অধিকাংশ বক্তব্যেরই প্রতিবাদ করা হয়েছে। এঁদেরকে রামমোহন বিদ্যাসাগরের অন্ধ অনুকারী বলে গাল-মন্দ করা হয়েছে। শিখাগোষ্ঠী আয়োজিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদি একাধিক মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। (আবার সব রচনা ছাপার সাহস সওগাতও দেখাতে পারেনি, সে-কথা মনে রেখেই বলছি), সমাজের সাহিত্য সভা ও আলোচনাচক্রে পঠিত সব রচনা শিখা ছাপাতে পারেনি। শিখা ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত গোষ্ঠীর লেখকদের রচনা ও বক্তব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত, সচকিত ও সংশোধিত হয়েছেন ঐকালের প্রায় তাবৎ মুসলিম ভাবুক।

www.pathagar.com

সেই ভাবনার বিপক্ষে রক্ষণশীলেরা হৈ চৈ করে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে প্রাণের হুমকি দিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল মুক্তবুদ্ধির চর্চা,—সে ইতিহাসও বাংলাদেশ, ভারতের পণ্ডিতেরা আলোচনা করেছেন, বই বা প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করেছেন।

অতএব এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। সাময়িকপত্রিকার আলোচনার খাতিরে 'শিখা'র বর্ণনাই এখানে মুখ্য বিষয়। তবে 'শিখা'র প্রভাবটাই আমরা বড় করে দেখব। তাঁদের প্রকাশিত পত্রের ওজন, আকার, আকৃতি সামান্য—মাত্র পাঁচটি রয়েল সাইজের বার্ষিক পত্র, যার এক একটার পৃষ্ঠা সংখ্যাও একশ ত্রিশের বেশি নয়।

শিখার প্রথম সংখ্যাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল থেকে আবদুল কাদের প্রকাশ করেছিলেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের তরফ হতে'। মুন্সী আহমদ আলী কর্তৃক ইসলামিয়া প্রেস, সাত রওজা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রাপ্তিস্থান-এর ঠিকানা দেয়া হয়েছিল অধ্যাপক আবদুল আজিজ তালুকদার, মজিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ও কলকাতা। প্রকাশকাল চৈত্র ১৩৩৩ (১৯২৭), পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩৬। মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০, দাম আট আনা।

পঞ্চম খণ্ডটি সৈয়দ ইমামুল হোসেন কর্তৃক মডার্ন লাইব্রেরী, ৭৪ নবাবপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩৮, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম বর্ষের শিখার সম্পাদক ছিলেন আবুল হুসেন, পরের দুটির কাজী মোতাহার হোসেন, চতুর্থটির আবদুর রশীদ এবং পঞ্চম খণ্ডর আবুল ফজল। পত্রিকার মটো ছিল—'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট,—মুক্তি সেখানে অসম্ভব।'

কাজী আবদুল ওদুদ 'বাংলার জাগরণ' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন : বাংলার মুসলিম সমাজে উদার মানবতাবাদী প্রথম সাহিত্যিক বেগম রোকেয়া, কাজী ইমদাদুল হক ও লুৎফর রহমানের চিন্তাধারা ওহাবী প্রভাবমুক্ত ছিলো। তাঁদের আবির্ভাব ঘটে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙলার রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে যখন উদার বীর্যবন্ত জাতীয়তার রূপ পরিগ্রহ করেছে, তখন। সাহিত্যক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পরে ১৯২৬ সনে প্রকাশিত শিখা-গোষ্ঠীর মন্ত্র ছিলো Emancipation of the intellect বা 'বুদ্ধির মুক্তি'। এই মন্ত্র তাঁরা লাভ করেছিলেন বহু জায়গা থেকে, বিশেষত রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, রমা রোলাঁ, কামাল পাশা, সেখ সাদী, এবং হজরত মুহম্মদ এর কাছ থেকে।[১]

এঁদের মধ্যে তিনজন—বিশেষত কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী আনোয়ারুল কাদির ও আবুল হুসেন ইসলাম ধর্ম ও হজরত মুহম্মদের জীবনী এবং কোরান-হাদীসের প্রগতিশীল ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন মানুষের উন্নতির অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে এবং ইচ্ছা করলে 'সে হজরত মোহাম্মদের চেয়েও বড়ো হতে পারে।' 'যুগধর্ম ধর্মগুরু ও ধর্মশাস্ত্রের জননী। জীবনের বহু ভঙ্গিমতায় সে যুগধর্মের প্রকাশ। যে ধর্মশাস্ত্র এই প্রকাশলালায়িত যুগধর্মকে অস্বীকার করে সে ধর্মশাস্ত্র মানুষের কাজে না লেগে কীটের খাদ্যে পরিণত হয়।'[২]

আবুল হুসেন পঞ্চম বর্ষের প্রথম অধিবেশনে (৩১ আগস্ট ১৯৩১, লিটন হলে, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র সভাপতি) হজরত মোহাম্মদের জীবনের ওপর এক আলোচনায় বলেছিলেন তাঁর,

> জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারকে Justify করে মুসলমানদের আর কোন লাভ নেই, তাঁকে বিচার করতে হবে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে। ইতিহাসের এক অতীত যুগে, ভিন্ন আবেষ্টনে, তিনি জন্মেছিলেন—সেখানে বসে তিনি যে জীবন যাপন করেছেন, যে শিক্ষা

www.pathagar.com

দিয়েছেন, তার থেকে এই যুগে এই দেশে বসে আমরা যতটুকু আলো পাই আমাদের জীবন চলার পথে আমরা তাই শুধু নেব। তা না করে আমরা যদি তাঁকে শুধু পদে পদে justify করতে চাই তাহলে তাঁকেও বোঝা হবে না, আমরা নিজেরাও শুধু বিড়ম্বিত হব। কোন একটা আদর্শের প্রতিমাকে আঁকড়ে ধরে থাকা ইসলামের শিক্ষা নয়। মুসলমানের জীবনে প্রতিমা-ভঙ্গের যে শিক্ষা সে শুধু মাটীর প্রতিমা-ভঙ্গের শিক্ষা নয়, আদর্শের প্রতিমা-ভঙ্গেরও বটে।[৩]

কাজী আবদুল ওদুদ বলেন, হজরত মোহাম্মদ শেষ পয়গম্বর কিনা, কোরান ফেরেশতার মারফৎ অহিরূপে নাজেল হয়েছিল কিনা আজিকার দিনে এই সব আমাদের বড় সমস্যা নয়—আমাদের সমস্যা হচ্ছে, এই যুগে এই আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দাঁড়িয়ে হজরত মোহাম্মদের জীবন ও কোরান থেকে আমরা আমাদের জীবনে কতখানি পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি। নানা দুঃখ দ্বন্দ্বপূর্ণ মানবজীবনকে কল্যাণের অভিসারী করবার চেষ্টা কোরানে আছে। হজরত মোহাম্মদের বিরাট ব্যক্তিত্ব যেন আমাদের চোখ ঝলসে না দেয়—হজরত মোহাম্মদের জীবনের কোন ঘটনা যদি আমরা আমাদের জীবনে না নিতে পারি তবে তা পরিহার করতে যেন আমাদের এতটুকু দ্বিধা না হয়।[৪]

কাজী আবদুল ওদুদ 'সম্মোহিত মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলমান সমাজের তৎকালীন দুর্দশার কারণ বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন, 'আজ আমাদের বুদ্ধি নিঃসাড় হয়ে পড়েছে—আমরা স্থূল বিশ্বাসে জড়িয়ে গিয়ে বুদ্ধির ঘরে তালা দিয়ে রেখেছি। কয়েকটি ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা দুনিয়ার এত ভাঙ্গাগড়া, পরিবর্তন, আবর্তন কিছুতেই সাড়া দিতে চাই না। ইসলাম আজ শত শত বৎসর ধরে চলেছে নানা দেশ, নানা আবহাওয়া, নানা জাতির মধ্য দিয়ে—তাতে তাকে দেশ কালের প্রভাবে কিছু কিছু স্বরূপ বদলাতে হয়েছে। আজ আমরা তা না স্বীকার করে ইসলাম, ইসলাম বলে ধর্মের জোশ ও বড়াই প্রকাশ করি। আজ আমাদের ইসলামের গৌরব রক্ষা করতে হলে যুগধর্মের সত্যকে আশ্রয় করতে হবে এবং সেই সত্যে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।'[৫]

মুসলিম সাহিত্য সমাজের পক্ষে শিখা মুসলমানদেরকে গতানুগতিক পথ থেকে ফিরাবার সাধনা করেছে। তাঁদের চিন্তার বিষয় ছিল জীবনের সর্বমাত্রিক, বিরাজমান সকল ধরনের সামাজিক সমস্যা ও গলদ বা রোগের কারণ নির্ণয় ও তাঁর পথ তথা সমাধান নির্দেশ করা। '...এ সমাজ (মু. সা. সমাজ) কোন একটী বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ' ছিল না কিংবা এ কোনও 'এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গঠিত' হয়েছিল না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল 'সাহিত্য সৃষ্টি' করা। 'আর সে সাহিত্যে মুসলমানের প্রাণ ও জীবন ফুটিয়ে তোলাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল?'[৬]

শিখার লেখক তালিকায় রয়েছেন, স্যার এ. এফ. রহমান, কাজী নজরুল ইসলাম, খান বাহাদুর মৌলভী তসদ্দক আহমদ, মি. মাহমুদ হাসান, খানসাহেব মৌলভী আবদুর রহমান খাঁ, মুন্সী হাবিবুল্লা, অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ, মৌলবী আবদুল কাদির, খানবাহাদুর মৌলভী কমরউদ্দীন আহমদ, মৌলভী আবদুস সালাম খাঁ, অধ্যাপক রকিবউদ্দীন আহমদ, শ্রী করুণাকণা গুপ্তা, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, মৌলভী কাজী আনোয়ারুল কাদির, মৌঃ আবদুল মঈদ চৌধুরী, মৌলভী আতাউর রহমান, অধ্যাপক এ. কে. আহমদ খাঁ, মিস ফজিলাতুন্নেসা এম. এ., মৌলভী আবুল হুসেন (অধ্যাপক), মৌলবী আবুল ফজল, কে.

www.pathagar.com

সি. মুখার্জী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম সাহিত্য সম্মেলন : আমার অভিজ্ঞতা, ইংরেজি ভাষায় লিখিত)।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল মোজাফফর আহমদ, অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন, অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার, অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগো। মৌঃ মোঃ আবদুর রশীদ, মৌঃ মোখতার আহমদ সিদ্দিকী, মৌঃ আকবরউদ্দীন, মিঃ ফসিহ, অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ, মৌঃ বেলায়েত আলী খাঁ, মৌঃ নাজিরুল ইসলাম, মৌঃ শামসুল হুদা, মৌঃ মোসলেম উদ্দীন খাঁ, মৌঃ মোহাম্মদ কাসেম, মৌঃ আবদুস সালাম খাঁ, মৌঃ আনোয়ার হোসেন, ড. সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন, খান বাহাদুর নাছিরউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কামালউদ্দীন, ফাতেমা খানম, প্রিন্সিপাল শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক নাজিরউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক আবদুর রব চৌধুরী, হাকিম হাবিবুর রহমান, আলী নূর, মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ, অধ্যাপক আবদুল হাকিম, আবুজোহা নূর আহমদ, ডা. শামসুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবদুল ওহাব এম. এ. প্রমুখ।

লেখক, আলোচক, সভা ও সম্মিলনের সভাপতি, প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথি হিসাবে আগত পাঁচ বছরের আরও অনেক চিন্তাশীলের বক্তৃতা বা আলোচনা ও পঠিত প্রবন্ধের মূল বক্তব্য শিখায় সংকলিত সম্পাদকের রিপোর্ট বা বার্ষিক বিবরণীতে পাওয়া যায়। এতে সংক্ষেপে তৎকালীন বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের সার সংকলিত হয়েছে বলে মনে করা সঙ্গত হবে।

যদিও অনেকে এটাকে 'সাহিত্য পত্রিকা' বলতে দ্বিধা করবেন, কারণ, এতে গতানুগতিক সাহিত্যপত্রিকা বা মাসিকের মতো গল্প কবিতার সুসমন্বয় করা হয়নি, কিন্তু 'সাহিত্য' তো কেবল গল্প কবিতাই নয়, জীবনের কথাই সাহিত্য, জীবনের সর্বমাত্রিক প্রয়োজন ও অকৃত্রিম বেদনাজাত অভিব্যক্তিই যেহেতু সাহিত্য, সে বিবেচনায় জ্ঞানের সকল শাখাই সাহিত্যের অন্তর্গত হয়েছে। এই বিবেচনায় শিখা উন্নত সাহিত্য পত্রিকাসমূহেরও শ্রেষ্ঠ আদর্শের এক তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্য পত্রিকা।

সম্পাদকের কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছিল যে, এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো 'চিন্তা চর্চা করা'। শ্রেষ্ঠ চিন্তা উন্নত সাহিত্যের অবলম্বন। অতএব শিখাকে সাহিত্য পত্রিকা না-বলে উপায় নেই। প্রকাশকের নিবেদনেও বলা হয়েছে—"...সত্যিই পরিপুষ্ট চিন্তাই সাহিত্যের খোরাক জোগায়।... শিখার প্রধান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন সাধন।'

শিখার সংখ্যাগুলোতে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলো সমাজের দারুণ দৈন্য ও অভাবের প্রতিবিম্ব। এতে অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করা হয়েছে। 'কিন্তু আমরা মনে করি, সমাজের প্রকৃত সহৃদয় সুহৃদবর্গের কেহই সেই অপ্রিয় সত্য হজম করতে নারাজ হবেন না—কারণ নিতান্ত আত্মীয় যে সেই ত আঘাত দিতে পারে।'

প্রকাশক 'সাহিত্যিক' বিবেচনার কথা মনে রেখেই বলেন, 'প্রবন্ধগুলি কাহারও কাহারও নিকট নীরস মনে হবে—বিশেষতঃ যখন তাঁরা দেখবেন এ সংখ্যায় কোন হাল্‌কা গল্প নাই বা মিষ্টি কবিতা নাই। সেজন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্রুটী স্বীকার করি, কেননা আমাদের দুঃস্থ সমাজের বর্তমান অবস্থা চিন্তা করলে আনন্দের হাসির পরিবর্তে বেদনার অশ্রুতে জীবন ভরে উঠে।'[৭]

www.pathagar.com

শিখার লেখকগণ সমাজের ত্রুটি নির্দেশ করতে গিয়ে যত প্রকার সমস্যা ও কারণ নিরূপণ করেন, তার মধ্যে প্রধান কারণ হিসাবে বলা হয়, বাঙালির অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে ইংরেজ আমলের শিক্ষা প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানেরা দূরে থেকে অবনতির শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছে। বাঙলা ভাষার প্রতি বিরাগও তাঁদের অগ্রগমনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

শিখার লেখকগণ সমাজের ত্রুটি নির্দেশ করতে গিয়ে যত প্রকার সমস্যা ও কারণ নিরূপণ করেন, তার মধ্যে প্রধান কারণ হিসাবে বলা হয় বাঙালির অতীত–স্মৃতি রোমন্থন করে ইংরেজ আমলের শিক্ষা–প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানেরা দূরে থেকে অবনতির শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছে। বাঙলা ভাষার প্রতি বিরাগও তাঁদের অগ্রগমনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা। সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের (১৯২৭) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তৎকালীন প্রভোস্ট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন উপাচার্য স্যার এ. এফ. রহমান বলেন,

> সত্যের মত সাহিত্যও সীমাবদ্ধ নয়। যেমন পৃথিবীর সাহিত্যে আমার অধিকার আছে, তেমনি আমাদের সাহিত্যও সত্য হলে পৃথিবী তা আপন করে নেবে। জাতীয় জীবন–সংগ্রামে সাহিত্য একটি অস্ত্র। যুদ্ধের সময় জাতীয়–সঙ্গীত (National anthem) যে কাজ করে শান্তির কালে সাহিত্যও ঠিক সেই কাজ করে। যে জাতির পরিবর্তন নাই, তার কোন ইতিহাস নাই। যে জাতিতে সাহিত্য চর্চা নাই তারা নিজেদের ইতিহাসের উপর সমাধি মন্দির তুলে দিয়েছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বাঙালি মুসলমানের মনোভাব ফুটে উঠেছে মুসলমান সমাজের উঁচু তলার মানুষ এ. এফ. রহমানের এই বক্তব্যে :

'আমারই জীবনে এমন একটা সময় দেখেছি যখন নিজের ভাষাটা না জানাই সভ্যতার চিহ্ন বলে ধরা হতো', কিন্তু যে 'মুসলমানের উৎসাহে বাংলা সাহিত্যের এত উন্নতি', সেই মুসলমান যদি এখন আবার 'বাংলা সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন তবেই তাঁরা জাতীয় কীর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পারবেন।' তিনি মনে করেন, 'আধুনিক মুসলমানদের সাহিত্যবিমুখ হওয়া আর জাতিকে খর্ব করা ও সর্বনাশের পথে তুলে দেওয়া এক কথা।'[৮]

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক খান বাহাদুর মৌঃ তসদ্দুক আহমদ বি.টি. সভাপতির অভিভাষণে স্পষ্ট করেই বলেন, 'বাঙ্গালা যে আমার মাতৃভাষা সে কথাটা আপনাদের সমক্ষে জোর গলায় বলিতে আমার একটুও দ্বিধা বোধ হয় না। কারণ তাহা না–হইলে আমার নিজের মা–কেই অস্বীকার করিতে হয়। এতটা অধোগতি আপনাদের আশীর্বাদে এখনও আমার হয় নাই। তবু নাকি শুনি এই বাঙ্গালাদেশে এমনও অনেক মুসলিম আছেন যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন। তাঁহারা নাকি বলেন, 'শরিফ' অর্থাৎ সদ্বংশজাত মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে মাতৃভাষাটাকে না বদ্‌লাইলে চলিবে না।'[৯]

তিনি বলেন, 'সাহিত্যের' মাপকাঠিতে বাঙালি মুসলমান 'আজ পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজ অপেক্ষা কত দরিদ্র।...সাহিত্যের অমৃতধারা আমাদিগকে নানা জ্ঞানে পুষ্ট করিতে পারিত... আমরা অর্বাচীনের ন্যায় তাহা অবহেলা করিয়া আসিয়াছি। আজ আমরা অপরাপর সম্প্রদায়ের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হই, কিন্তু আমাদের দুরবস্থার জন্য যে আমরাই প্রধানতঃ

www.pathagar.com

দায়ী...' তবে দূরে ঠেলে রাখার জন্য যে বাঙলা সাহিত্য আমাদের অনাত্মীয় মনে হয়, তাকে আমাদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য হারালে মুসলমান বলে পরিগণিত হওয়া যাবে না। 'সাহিত্য যখন সকলেরই সম্পত্তি, তখন সকলেই তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিবার সমান অধিকারী... হিন্দু ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের অংশ পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন,... আমরা আমাদের অংশ দিই নাই... ক্রমেই আমাদিগকেই অধিকতর পরিমাণে দিতে হইবে। তখন আমরা বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলিম দুই ভাই একই ভাষা-জননীর পীযূষধারা পান করিয়া বলিয়ান হইব।'[১০]

কাজী আবদুল ওদুদ 'সাহিত্য-সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধেও বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য-স্বল্পতার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, এর ফলে তাদের চিত্তের স্বাভাবিক বিকাশ বা স্ফূর্তিও ঘটেনি। 'তারা যে বড় জোর অর্ধ বিকশিত মানুষ। তারা কি করে হবে মুক্তিপথ যাত্রী?' লেখক বলেন, মুসলমানেরা ললিতকলার চর্চাকে দূরে সরিয়ে রেখেও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। মুসলমান কৃষক-চাষীরা বাঙলার মোট অধিবাসীর এক বৃহদাংশ। লোকসংগীতের মাধ্যমে তাঁরা 'অভাবগ্রস্ত জীবনে আনন্দ ও তৃপ্তি' পেয়েছেন, 'কিন্তু মানুষের অন্তরের বেদনার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন আমাদের আলেম সম্প্রদায় শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে... এই গানের ফোয়ারা বন্ধ করে দিয়েছেন।'[১১]

আবদুল কাদের (কাদির) তাঁর 'লোক-সঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধে আবহমান বাঙলার সেই সঙ্গীত সম্পদেরই পর্যালোচনা করেন।

'বাঙালি মুসলমানের আর্থিক-সমস্যা' বিষয়ে আলোচনায় লেখক রকিবউদ্দীন আহমদ বলেন, 'বিগত দুই শত বৎসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ আমরা এমন এক স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি যাহার চারি পাশেই অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার। মুসলিম এখন শক্তিহীন, নির্বীর্য্য।'

মুসলমানের কৃষি শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং ধর্ম ও কর্মের 'একতান বিশিষ্ট পুষ্টি সাধন করিতে হইলে, প্রত্যেকটি যুবককেই ধ্বংসের উপরে তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে হইবে'। 'এই বাঙলাদেশে অন্যের যাহা অধিকার মুস্‌লিমের তার চেয়েও বেশি অধিকার আছে।... এতদিন পরে হৃতসর্বস্ব মুসলিম যুবক বাঙলার লুপ্ত গরিমা পুনরুদ্ধার করিতে সামান্য চেষ্টাও করিবে না? জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিপুল সম্ভার বুকে নিয়া পার্শ্বে এত বড় একটা হিন্দু সমাজ উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে, আর মুসলিম পরশ্রী-কাতর চিত্তে, নির্বাক নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া থাকিবে? তাহারও আশা আছে, ভবিষ্যত আছে; সেই ভবিষ্যতের দ্বার উদঘাটন করিতে যাইয়া হয় সে রুদ্রতেজে জাগিয়া উঠিবে, না হয় চিরতরে আত্মদান করিবে।'[১২]

মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম চিন্তাবিদ, কাজী আনোয়ারুল কাদিরের 'বাঙালী মুসলমানের সামাজিক গলদ', প্রবন্ধটি নানা অপ্রিয় সত্যের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। 'লোকসমাজে সগর্বে দাঁড়িয়ে এমন করে টানা সোজা উলঙ্গ ভাষায় আমাদের সমাজের অন্তরালে লুক্কায়িত নানা অপ্রিয় ব্যাপার সম্বন্ধে খুলে বলবার দুঃসাহস দেখিয়ে কাজী সাহেব সেদিন মজলিসের বিরাগভাজন হয়েছিলেন বটে', কিন্তু শিখা গোষ্ঠীর আশা ছিল—'এই দুঃসাহসের পরিণাম

www.pathagar.com

একদিন সুখকর হবেই—কারণ এতে আমাদের সমাজের সারথিগণ হয়ত সত্ত্বরই ঐ সমস্ত সামাজিক রোগসমূহের প্রতিকার বা নিরাময় করবার জন্য বদ্ধপরিকর হবেন।'[১৩]

কাজী আনোয়ারুল কাদির তাঁর 'সামাজিক গলদ' এর বিবরণে মুসলমান সমাজের বহুবিবাহের শাস্ত্রীয় অনুমোদন ও অকারণ ধর্মভীতির ফলে ঘটা অমানবিক ও অযৌক্তিক ঘটনাসমূহের বর্ণনা দিয়ে বলেন, সমাজপতি বলে বিবেচিত ব্যক্তিরা ধর্মের এবং সংস্কারের নামে অনেক সময় অন্যের রূপবতী স্ত্রীকেও হাতিয়ে নিয়ে যায়। সেজন্য অশিক্ষা ও বুদ্ধির মুক্তি না ঘটাই দায়ী।

লেখক বলেন, আমাদের 'যোগ্য' হওয়ার কতকগুলি অন্তরায়ের প্রধান হচ্ছে 'আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীনতা। আমরা বিদ্যা চাই না, জ্ঞানের মর্যাদা বুঝি না, সাহিত্যের সমাদর করিনি, তাই আমাদের মধ্যে বিদ্বান নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক নাই।'

> আমরা দান ভালবাসি তাই আমাদের মধ্যে দাতা আছে এবং দাতা আছে বলেই ভিক্ষুকের অভাব নাই। সেইরূপ আমরা যদি শিক্ষা ভালবাসিতাম তবে শিক্ষাদাতা, শিক্ষিত জন ও শিক্ষান্বেষী কোনটীর অভাব হত না।

মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মাদ্রাসা থেকে পাশ করে আমাদের যুবকগণ জীবনসংগ্রামে কতটুকু জয়লাভ করতে সক্ষম হবে? 'বুদ্ধির মুক্তি না হলে ধর্মশিক্ষা হতে পারে না। ধর্মের আদেশ ও নিষেধ পালন করার জন্য বুদ্ধির দরকার। বুদ্ধির অভাবে আমাদের ভিতর প্রকৃত ধর্মভাব লোপ পেয়েছে। এখন গোঁড়ামিই আমাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।' গোঁড়ামির কারণেই আমরা ধর্মের বিধিনিষেধগুলোর কতকগুলোর সহজ অর্থ করে নিয়েছি। এইরূপ সহজ অর্থ করার দরুনই যে আমাদের এই দুর্দশা তা লেখক পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেন।

আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রতি বিদ্বেষ আমাদের সমাজের অন্যতম গলদ। গান বাজনা নিয়ে বাড়াবাড়িও একটি গলদ। আমাদের মসজিদের সামনে হিন্দুরাই পাপ অর্জন করবেন, সেজন্য মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে আত্মাহুতি দেবার দরকার পড়ে না। নিজেদের ধর্মের অনুসরণ করে প্রচার আদর্শ সৃষ্টি করতে হবে। আবার মুসলমানেরা গান বাজনার আসক্তি পরিহার না করে অন্যকে গান বাজনা পরিহারের উপদেশ দিলে শুনবে কেন?[১৪]

তাছাড়া গান বাজনা সম্পর্কেও মুসলমানদের কুসংস্কার দূর হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে মনস্বী 'শিখা' সে-কথাও বলতে চেয়েছে ড. কাজী মোতাহার হোসেন-এর লেখনীতে : মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিকে চেপে রাখা যায় না, কোন না কোন প্রকারে তার প্রকাশ হবেই—এই যুক্তির ওপরে তিনি বলেন : 'ধার্মিক মুসলমানগণ প্রায় কোন সময়েই সঙ্গীতকে প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। তথাপি দেখিতে পাই, উচ্চকণ্ঠে সুললিত স্বরে আজান দেওয়া হয়, কেরাত করিয়া সুমিষ্ট স্বরে কোরাণ শরিফ পাঠ করা হয়। ইহা ছাড়া পরমার্থ সম্বন্ধীয় গজল, কাওয়ালি প্রভৃতির অন্ত নাই। মিলাদ শরিফে যে প্রকারে দরুদ পড়া হয়, এবং হজরতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য যে ওজনে সম-স্বরে 'সালাম আলায়কা' পড়া হয়, তাহাকে নিশ্চয়ই সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রকারেরাও 'আমোদে নিয়ম-নাস্তি হিসাবে বিবাহের সময় দফ বাজাইয়া গান করা জায়েজ রাখিয়াছেন। ইহা হইতে অন্তত

www.pathagar.com

এটুকু প্রমাণ হয় যে নানারূপ সামাজিক ও ধর্মনৈতিক বিধি নিষেধের ভিতরেও অনুষ্ঠানপ্রিয় মুসলমানগণের স্বাভাবিক সঙ্গীতস্পৃহা চারিতার্থ করিবার যৎসামান্য পন্থা আছে।'[১৫]

মাদ্রাসায় নূতন জ্ঞান দেয়া হয় না, যে জ্ঞান দ্বারা সভ্যতায় অগ্রগামী হতে ছাত্ররা অনুপ্রেরণা পাবে। আরবি পার্শী না বুঝে পড়লেও পুণ্য সঞ্চার হয়—এই জাতীয় কুসংস্কার ত্যাগ করে ছেলেমেয়েরা যদি দেশী (বাংলা) ভাষা শিক্ষা করে, তবে জীবনকে স্থিত ও উন্নত করতে পারবে।—এই বক্তব্য নিয়ে লেখা হয়েছিল মমতাজউদ্দীন আহমদ এর 'শিক্ষা সমস্যা' রচনাটি। 'আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত' শীর্ষক প্রবন্ধে শরিয়ত ও বিজ্ঞানকে একই সঙ্গে অনুসরণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সুদের ওপর থেকে মুসলমানদের ধারণা পাল্টাতে চেয়েছিলেন লেখক। তবে নারীর পর্দা তুলে না দেওয়ার পক্ষেই মত দেওয়া হয়। 'স্ত্রীলোকের কার্যক্ষমতা প্রকৃতির বিধান অনুসারেই সীমাবদ্ধ। জীবজগতে পুরুষের প্রাধান্য অনিবার্য।'

তবে সম্পাদকীয় টীকায় (সম্পাদক আবুল হুসেন) বলা হয় : 'লেখকের পর্দ্দার নূতন ব্যাখ্যায় আমাদের কিছু আপত্তি আছে। তিনি নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্যই ব্যস্ত—কিন্তু পুরুষের সতীত্বও যে পক্ষান্তরে আবশ্যক, সেকথা ভুলিলে চলিবে না। পুরুষের জন্যই নারীর উপর যত নির্যাতন। মোটকথা নারীর স্বাধীনতার সীমা তার জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। সেই জ্ঞান সর্বাগ্রে চাই। তখন পর্দ্দা আপন সীমা ঠিক করবে।'[১৬]

'নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধের মূল বক্তব্য মুসলমান সমাজে শিল্প হিসেবে একে প্রচলন করার পক্ষে। সুদ ও রেবার বিষয়ে আলোচনা করে মুসলমানদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বাস্তবমুখী পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়। মোটামুটি ভাবে মুসলমান সমাজের দৈন্য ও গলদের বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণে অনুসন্ধান ও প্রস্তাব ছিল শিখার পাঁচটি সংখ্যাতে। বিশেষত অর্থে, শিক্ষায় ও সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের যে দৈন্য তারই বিস্তৃত আলোচনা, সমালোচনা এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। শিখার লেখকদের মূল বক্তব্য ছিল জীবনের নানা ক্ষেত্রে মুসলমানের দীনতা হীনতা পশ্চাৎপদতার অবসানকল্পে, উন্নতির লক্ষ্যে 'সর্বপ্রথমে চাই সে সব অন্তর দিয়ে অনুভব করা। আজ সকল প্রকার দৈন্য সম্বন্ধে আমরা সজাগ নই বলে আমাদের দুর্দ্দশার সমাপ্তি হচ্ছে না।'

মুসলমান সমাজের লোকেদের অন্তরে জীবনের স্বাদ পৌঁছে দিয়ে তাঁদেরকে জগত ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তোলার জন্যে—শিখার আলোচনা থেকে শিক্ষিতরা বুঝতে পেরেছিলেন, 'মুসলমানের উন্নতি ইংরেজের নিকট আর্জি পেশ—অথবা হিন্দুর প্রতি ঈর্ষা পোষণের মধ্যে নেই, আছে স্বসমাজের জন্য মুসলমানেরই সত্যিকার ভালবাসা ও পরিশ্রমের মধ্যে।'[১৭]

তথ্যনির্দেশ

১. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ১৯৩-৯৫।

২ আবুল হুসেন এর একটি বাণী—উদ্ধৃত, শিখা, প্রথম সংকলন, ১৩৩৩, পৃ. ২০।

৩. আবুল হুসেনের প্রবন্ধের সারাংশ। পঞ্চম বার্ষিক বিবরণী, শিখা, পঞ্চম বর্ষ, ১৩৩৮, পৃ. ২০।

৪. কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধের সারাংশ, উপরিউক্ত।

৫. কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধের সারাংশ, সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী, শিখা, প্রথম বর্ষ, ১৩৩৩ পৃ. ২৬।

www.pathagar.com

৬. বার্ষিক বিবরণী, শিখা, পঞ্চম বর্ষ, ১৩৩৮, পৃ. ২৭।

৭. প্রকাশকের নিবেদন, শিখা, প্রথম বর্ষ, ১৩৩৩।

৮. এ. এফ. রহমান, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, শিখা, প্রথম বর্ষ, ১৩৩৩, পৃ. ৫।

৯. তসদ্দুক আহমদ, সভাপতির অভিভাষণ, উপরিউক্ত, পৃ. ৮–১৩।

১০. উপরিউক্ত, পৃ. ১০।

১১. কাজী আবদুল ওদুদ, সাহিত্য–সমস্যা, উপরিউক্ত, পৃ. ৩২।

১২. রকিব উদ্‌দীন আহমদ, বাঙালী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা, উপরিউক্ত, পৃ. ৪৯–৫৬। (লেখকেরা বাঙলা ভাষা ও দেশের নাম ং ও ঙ দুটো বর্ণ দিয়েই লিখেছেন।

১৩. বার্ষিক সম্মেলনের বিবরণ, পরিশিষ্ট, শিখা, প্রথম বর্ষ, ১৩৩৩, দুই আনা।

১৪. কাজী আনোয়ারুল কাদির, বাঙালী মুসলমানের সমাজিক গলদ, উপরিউক্ত, পৃ. ৫৭–৫৯।

১৫. কাজী মোতাহার হোসেন সঙ্গীতচর্চ্চায় মুসলমান, উপরিউক্ত, পৃ. ৭৩।

১৬. শিখা, প্রথম বর্ষ, ১৩৩৩, পৃ. ৯৮। আবদুর রশীদ–এর 'আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত' শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকা দ্র.।

www.pathagar.com

৩. জয়তী
(কলকাতা, ১৩৩৭-৩৯)

'জয়তী'র সম্পাদক কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-৮৪) 'শিখা'র প্রকাশক ছিলেন। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রাবস্থায় তিনি 'শিখা' পত্রিকা ও 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর অন্যতম ও প্রধানতম সদস্য হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা চেতনায় কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, নজরুল ইসলাম এর প্রভাব সুপ্রচুর। সে কারণে জয়তীকে 'শিখা'র ধারার, মুক্তবুদ্ধির সংগ্রামের সহযোগী সাময়িকী হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে এবং তা সঙ্গতও বটে।

'জয়তী'র লেখক তালিকা ও রচনাসমূহের শ্রেণীকরণ ও বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে 'শিখা' ও 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র রথী সারথিদের জীবন সাধনার বহুমাত্রিক বিকাশের ও প্রকাশের চিহ্ন জয়তী ধরে রেখেছে। স্বদেশী আন্দোলনের ধারায় বাঙলা ও ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম দানা বেঁধেছিল ১৯৩০ নাগাদ, জয়তীর পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়স্ক তরুণ সম্পাদককে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করেছিল সে-ধারায়, জয়তীর আলোচনাসমূহে তাই-ই প্রতীয়মান হয়।

আবদুল কাদির তখন কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। কবি, সম্পাদক, গবেষক, সমালোচক ও শিল্প-বিশ্লেষক হিসেবে যিনি কালে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন, তিনি ঢাকার সাহিত্যসমাজে যোগ্য আসন লাভ করার পরও ছুটে গিয়েছিলেন বাঙলার নবজাগরণের সূতিকাগার ও সাহিত্য-সংস্কৃতির রাজধানী কলকাতায়। সেখানকার সাহিত্যসমাজের অন্ধি-সন্ধির সঙ্গেও তিনি যুক্ত হন গভীর ভাবে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, কল্লোল গোষ্ঠী—সকলের সঙ্গেই তিনি প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে তুলেছিলেন। অনুশীলন ও সৃজনশীলতার দক্ষ সমন্বয় ঘটায় আবদুল কাদিরের রচনা সে-বয়সেই ঝরঝরে ভাষা ও চিন্তা প্রকাশের শৈল্পিক দক্ষতায় প্রস্ফুটিত হতে পেরেছিল।

'জয়তী' প্রকাশ করেই তিনি তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব কাজী আবদুল ওদুদকে ঢাকায় প্রেরণ করেন। প্রমথ চৌধুরীর লেখা চেয়ে চিঠি লেখেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও 'জয়তী'র সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য রচনা প্রেরণের অনুরোধ করেন।

অতএব 'জয়তী' সহজেই সেকালের সাহিত্যসমাজে একটি উন্নত মানের মাসিকের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। পত্রিকার আদ্যোপান্ত পৃষ্ঠা উল্টে, রচনাসমূহ পাঠ করে, সে-ধারণা যে-কারোরই হবে তাতে সন্দেহ নেই।

জয়তীর প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩৭ এ প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের নাম প্রথমে 'আবদুল কাদের' বানানে লেখা হয়েছিল। তিনি জয়তীর পৃষ্ঠাতেই 'কাদের' থেকে 'কাদির' হয়েছিলেন। কার্যালয় ছিল ২৪-বি বুদ্ধ ওস্তাগার লেন, পোস্ট অফিস আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য সডাক দু টাকা চার আনা। প্রতিসংখ্যা তিন আনা। সম্পাদক আবদুল কাদের কর্তৃকই প্রকাশিত হয়। মুদ্রাকরও তিনিই। ছাপা হতো মেটকাফ প্রেস, ১৫ নয়নচন্দ্র দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা থেকে। দুকলামে ছাপা প্রবাসী, প্রভৃতি মাসিক পত্রের সাইজে সাদা, ভালো কাগজে, নির্ভুল বানানে, সুসম্পাদিত হয়ে বের হলো যে 'জয়তী' তার আয়ু হয়েছিল দু'বছরের কিছু বেশি।

www.pathagar.com

আনিসুজ্জামান লিখেছেন তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এর প্রচার রহিত হয়ে যায়।[১] প্রাপ্ত সংখ্যাসমূহ পরীক্ষা করে দেখা যায় প্রথম বছরে ২৮৬ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় বছরের নয় সংখ্যা পর্যন্ত ১২০ পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছে। তারপর বন্ধ। তাও অনেকগুলো যুগ্ম–সংখ্যা ছিল বলে অনিয়মের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবে না জয়তীও।

জয়তীর–একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবেদনে গতানুগতিক পন্থা বা রীতিতে কোনও 'কৈফিয়ৎ' দিয়ে বলেননি যে আমরা এই কারণে পত্রিকা বের করছি ইত্যাদি। 'সম্পাদকের পাঁজি'তে 'স্বাদেশিকতা ও মুসলমান' শীর্ষক রচনায় 'স্বাধীনতা–আন্দোলন' বিষয়কর আলোচনায় দেশের সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বর্ণনার মধ্য দিয়েই সম্পাদকীয় উদ্দেশ্য ও পত্রিকার চারিত্র্য প্রকটিত করে তোলা হয়েছে। সম্পাদকের বক্তব্যের সূত্র ছিল ইতিহাসের অনেক গভীরে। লেখক বলেন, রাজা রামমোহনের পর থেকে 'বহু সংগ্রাম, বহু বিক্ষোভ, বহু নৈরাশ্যের মধ্যদিয়া বাঙলার তথা ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজভুক্ত বহুকর্মী দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মিলিত প্রচেষ্টাতেই আজ ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন এত বিস্তৃত ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।'

কিন্তু হিন্দুসমাজের পাশাপাশি বসবাস করেও কেন যে ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ 'বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে পূর্ণভাবে যোগ দিতে বা তৎপ্রতি সহানুভূতিশীল হইতে পারিতেছেন না, কেন যে মুসলমান সমাজে অন্ততঃ দুই চারিটীও স্বদেশ–হিতৈষী গগনচুম্বী প্রতিভা জন্মগ্রহণ করিতেছেন না,—তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে আমাদের পূর্ব ইতিহাস, পরিপার্শ্ব, প্রয়োজন ও বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথা পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে হয়...মুসলমান জনসাধারণের মনোভাব ও জীবনগতি আশাজনক নহে, তাহাদের আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তনই সম্ভবপর হইতেছে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন কোনো প্রতিভাবান স্বদেশপ্রেমিকও এ–সমাজে আবির্ভূত হইতেছেন না—যিনি বহু বিরুদ্ধতায় অবিচলিত থাকিয়া এই সমাজকে অনধীন জীবনের সন্ধানী করিয়া তুলিতে পারেন।'[২]

সম্পাদক দীর্ঘ আলোচনায় বলেন, রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্য যে এদেশের মুসলমানেরা 'কোনদিন আয়োজন করে নাই—একথা সত্য নহে'। কিন্তু সেসমস্ত আয়োজন বহু মোহ–ব্যস্ততা–সঙ্কুল ছিল বলে জয়যুক্ত হতে পারেনি। 'অধিকন্তু আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকৃত' করে দিয়েছে। সেই বিকৃতিই আজ পর্যন্ত সত্যকার স্বদেশ হিতৈষণার মন্ত্রে দীক্ষিত হবার পথে প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করে চলেছে।

ওহাবীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাঁরা ইংরেজ বিদ্বেষও প্রচার করতেন। ইংরেজের সভ্যতা ও রীতি নীতি, ইংরেজী শিক্ষা সবকিছু থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়াতে হিন্দু থেকে মুসলমানেরা পিছনে পড়ে গেল। আবার যখন হিন্দুরা স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করলেন, মুসলমানেরা তখন ইংরেজমুখী হয়ে পড়ে রইলো। বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময় মুষ্টিমেয় মুসলমান যোগ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা গণ্য করার মতো নয়। অসহযোগ–খেলাফত আন্দোলনের দেশপ্রেম তখন জাগ্রত হয়নি।

দেশের মুক্তি প্রয়োজন—আমাদের জীবনকে সহজভাবে বিকশিত করার জন্য আমাদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি, মুক্তজ্ঞান লাভ, সভ্য জীবন যাপন, কোনো কিছুই পরিপূর্ণরূপে সম্ভবপর

www.pathagar.com

হইতেছে না—কোনো বিদেশী সরকার আমাদের পথে বহু বাধা সৃষ্টি করিতেছে, অতএব আমাদের চাই রাষ্ট্রীয় মুক্তি। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, কোনো প্রকার মোহ দ্বারা পরিচালিত না হইয়া, আমাদের নেতৃবৃন্দ দেশের মুক্তি সংগ্রামে নামিতে পারিতেছেন না বলিয়াই আমাদের চিত্তের আজ এই বিকৃতি।[৩]

জয়তীর মাধ্যমে সম্পাদক চেয়েছিলেন পূর্ব্বেকার দোষ ত্রুটি সংশোধন করে কল্যাণ-সাধনায় ব্রতী হওয়ার পথ প্রস্তুত করতে, সত্যকার স্বদেশ সেবকবৃন্দের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করতে। জয়তীকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তিনিও লেখেন :

> আমি 'জয়তী'কে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করছি। কারণ যাদের মনের এবং প্রাণের শতদলে এই অগ্নির মেয়ে মহাশক্তি 'জয়তী' জন্মাচ্ছে, রূপ নিচ্ছে, তারা হচ্ছে মুক্তির উপাসক। তোমরা মানো কেবল দুটি জিনিষ, উপরে ভগবান আর নিচে তাঁর সন্তান মানুষ—অমৃতের পুত্রকন্যাদের এক মহাপরিবার। তোমাদের 'জয়তী' হোক সর্ব্ববিজয়নী অগ্নি-শিখা, সেই পূত অগ্নিতে পুড়ে খাক্ হোক যত জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, পুরোহিত, মোল্লা, কুল, বংশ, যত বাধা-ভেদ দম্ভ-অভিমান—মানুষকে যা 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' করেছে, হিংসার বেদনা জাগিয়েছে, বারবার মুক্তির পূর্ণ আদর্শকে ব্যর্থ করেছে। 'জয়তী'র এক হাতে সৃষ্টির কমল ও শঙ্খ অন্য হাতে বন্ধন ছেদনকারী অসি। আকর্ণ চোখে তার স্বপ্ন—মানুষের অনাদি কালের স্বর্গ রচনার স্বপ্ন, রক্ত-অধরে তার দৃঢ় নিষ্ঠার মৃদু হাসি, অনবদ্য তিলোত্তমা-তনুতে তার সত্যের স্বর্নাভ শিকার বসন, অলক্তরঞ্জিত চরণে তার মানব-প্রেমের অভিসার। 'জয়তী'র এই রূপ আমি ধ্যানে দেখেছি। এস, নব-যুগের নবীন মুসলিম, নূতন জগত রচনায় 'জয়তী'র শঙ্খ হাতে নাও।[৪]

আবদুল কাদির বুদ্ধির মুক্তিবাদী ও নজরুল-অনুরাগী, অতএব তাঁর সম্পাদিত 'জয়তী'র প্রধান লেখক মুক্তবুদ্ধির অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী, সেবক বাঙলার তরুণ প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলাম জয়তীর প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনাটির লেখক। তাঁর কবিতা 'পথে'—'কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে। /হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্বুদ, জোছনা-সোনায় রাঙে।'

এরপর মনীষী আবুল হুসেন-এর প্রবন্ধ 'আল-মামুন'। শিখা গোষ্ঠীর তথা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঢাকা মুসলিম হলের বর্ধমান হাউসের আল মামুন ক্লাবের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম অধিবেশনে লেখক এটি পাঠ করেছিলেন। এর মূল বক্তব্য মনীষী আল মামুনের চিন্তাধারার পরিচয় দান। খলিফা আল-মামুন ছিলেন বাগদাদের খলিফাদের মধ্যে 'অগাষ্টস্'—যাঁর হাতে ইসলাম এক নতুন রূপ ও শক্তি লাভ করেছিল। আমাদের বর্তমান সমাজজীবনে ইসলাম যে রূপ নিয়ে সকলের মনে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে তুলেছে, তাতে আজ আল-মামুনের কীর্তির দিকে দৃষ্টি দিলে অনেকটা আশা ও উৎসাহ লাভ করা যাবে বলে লেখকের বিশ্বাস ছিল। তিনি জয়তীতে আরও লিখেছিলেন, 'আমাদের রাজনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ। এই রচনাটি শিখার পঞ্চম সংখ্যায়ও (১৩৩৮) ছাপা হয়েছিল।

প্রায় প্রতি সংখ্যায় একাধিক লেখা ছাপা হয়েছে মাত্র দুজন—কাজী নজরুল ইসলাম ও কাজী আবদুল ওদুদ-এর। প্রথম সংখ্যায় নজরুলের অন্য লেখাটি হচ্ছে—'জাগো নারী, জাগো বহ্নি-শিখা।/জাগো স্বাহা সীমান্তে রক্তটীকা॥/দিকে দিকে মেলি তব রসনা...'।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে 'রুবাইয়াৎ ই হাফিজ' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। অন্যান্য সংখ্যায় নজরুল ইসলামের যেসব কবিতা ও গান ছাপা হয়, তাহলো : 'মার্হাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল আরাবী' ; 'আমি তুরগ ভাবিয়া মোরগে চড়িনু/সে লইল মিঞার ঘরে' ; 'ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান/আসিবে আজি বন্ধু মোর' ; 'নবীনচন্দ্র—অঞ্জলী পুরিয়া মম ভাগীরথী-নীরে' ; 'এরি লাগি তুই পথ চেয়ে কিরে বসে ছিলি মুসাফের'।

কারাগারের গান—'তিমির বিদারী অলঘ-বিহারী কৃষ্ণ কুমারী আগত ঐ' ; 'কারা পাষাণ ভেদি জাগো নারায়ণ' ; শিশু যাদুকর—'পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর' ; 'কুসুম-কুমার শ্যামল-তনু হে ফল দেবতা লহ প্রণাম'; 'প্রিয় তুমি কোথায় আজি কত সে দূর' ; 'নাচিছে নটনাথ শঙ্কর মহাকাল।/লুটাইয়া পড়ে দিবারাতির বাঘছাল' ; 'দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ পাথার/ঘনশ্যাম তোমারি নয়নে' ; 'তুমি কোন পথে এলে, হে মায়াবী কবি, বাজায়ে বাঁশের বাশরী' ; 'ভোরের হাওয়া, এলে ঘুম ভাঙাতে কি/চুম-হেনে নয়ন পাতে'। ; 'দেখে যারে, দুলা-সাজে/সেজেছেন মোদের নবী' প্রভৃতি।

আর বেশি লিখেছেন কাজী আবদুল ওদুদ, তাঁর অনেক চিঠি 'জয়তী'তে ছাপা হয়েছে। এই সমস্ত চিঠিতে 'জয়তী'র রচনাগুলোর সমালোচনা করা হয়েছে, আর কাজী আবদুল ওদুদ সম্পাদকের বিভিন্ন বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত বা একমত পোষণ করে সুন্দর ও সাবলীল ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছেন, ফলে আলোচিত বিষয়টি সম্পর্কে বহুকৌণিক বিশ্লেষণে পাঠকের বোধ অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি ভিত্তি পেয়েছে, তীক্ষ্ণ হয়েছে। প্রশ্ন জেগেছে পাঠকের মনে, উত্তর নিশ্চয়ই তাঁরা সন্ধান করে উপকৃত হয়েছেন, 'কালের' ও 'কাজের' কথাই ছিল এঁদের প্রিয় আলোচ্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬ সনে ঢাকায় গিয়েছিলেন। তখন কাজী আবদুল ওদুদ 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠের ভূমিকা' লিখেছিলেন। 'জয়তী'র প্রথম সংখ্যায় নতুন করে তিনি 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠের ভূমিকা' লিখলেন। পরের সংখ্যা থেকে তাঁর পত্র, 'খেলাধুলা' শীর্ষক উপন্যাস এবং প্রবন্ধ একাধারে প্রকাশিত হতে থাকে। কাজী আবদুল ওদুদের 'গ্যেটে' বিষয়ক আলোচনাও 'জয়তী'তে ধারাবাহিক প্রকাশ করা হয়। 'জ্ঞান ও প্রেম' শীর্ষক প্রবন্ধটিও 'জয়তী'র। মাসিক মোহাম্মদীর আক্রমণের প্রেক্ষিতে লেখা তাঁর পত্র ও সমালোচনাও 'জয়তী'তে ছাপা হয়েছে। অর্থাৎ মোহাম্মদীর আক্রমণের বিপরীতে কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে 'জয়তী'ও ছিল। 'দিদারুল আলম স্মৃতি বার্ষিকী'র রচনাসহ তাঁর বেশকিছু প্রবন্ধ 'জয়তী'কে সামনে নিয়ে লিখেছিলেন কাজী আবদুল উদুদ সাহেব, তাঁর এইসব রচনার মূল চেতনা ও প্রেরণা সম্পর্কে নিজেই এক পত্রে লিখেছেন :

> 'প্রিয় আবদুল কাদির, তোমার ফাল্গুন-চৈত্রের 'জয়তী' আজও পেলাম না। কেন, তা বুঝতে পারছি।... দুঃখ তোমার যথেষ্ট। কিন্তু ভুলে যাও আজ সেসব কথা।... আজ ইচ্ছা হচ্ছে তোমার সঙ্গে কিছু আলাপ করতে। সে আলাপ সার্থক হোক।
>
> 'কি প্রসঙ্গ শুরু হবে? খুব কাজের কথা—নির্বাচন-প্রসঙ্গ। কাজের কথা নিয়ে আলাপ করতে আমার বড় আনন্দ। মন যেন ওর ভিতরে অনেকখানি সুন্দর জায়গা পায় 'যেমন-খুসী-ঘুরে' বেড়াবার জন্যে। আমার বন্ধুদের অনেকেই হয়ত স্বীকার করবেন না যে, আমি কাজের লোক। তাঁদের প্রতিবাদ বা সমর্থন কিছুই করতে চাই না। তবে আমার নিজের মন আমি খানিকটা জানি—কাজের কথা আমার প্রিয় কথা।'[৫]

www.pathagar.com

সেদিন কাজী আবদুল ওদুদ 'নির্বাচন-সমস্যা ভিন্ন বড় কাজের কথা আমাদের সামনে হয়ত আর নাই' বলে মনে করেছিলেন। কেউ কেউ হিন্দু-মুসলমানের সমস্যাকে বড় করে দেখতে চাইবেন, এই প্রশ্নের আলোকে নিজেই তিনি বলেন, এক সময় তাঁরও মনে হতো যে ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ত তাই-ই, কিন্তু তখন তাঁর মত বদলে গেছে, তিনি (ওদুদ) মনে করেন, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এমন এক জটিল ও সুবৃহৎ ব্যাপার যে তাকে নানা সমস্যায় ভাগ করে দেখলে তবেই মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার বলে গণ্য হতে পারে।

> 'একটা দেশের সাহিত্য-সমস্যার যেমন সমাধান হতে পারে বিভিন্ন সাহিত্যিক যদি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য লেখনী-চালনায় ব্যাপৃত হন তবেই, তেমনিভাবে দূর ও নিকট-অতীতের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় ইত্যাদি নানা সমস্যা যেখানে তাল পাকিয়েছে সেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যাও কেবল তখনই সমাধানের পথে আসতে পারে, যখন এইসব বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন কর্মী ব্যাপৃত হতে পারবেন।'

কেবলমাত্র 'ওঠো', 'জাগো' বললে কোনও ফল হবে না। অতএব নির্বাচন বিরোধ রূপ স্বল্পায়তন সমস্যা আপাততঃ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার সব চাইতে যোগ্য বিষয়। সৌভাগ্যক্রমে আজ মুসলমানের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হয়েছে আর এই দুই দলই যে আন্তরিক ও খাঁটি দল, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের বাদানুবাদের তীব্রতায়। 'সোজা কথায় বলে ফেলা ভালো যে, আমি 'মিশ্র-নির্বাচন মুসলমানের জন্য অবমাননাকর। স্বতন্ত্র নির্বাচন দেশে কি উপকার সাধন করেছে? কাজী আবদুল ওদুদ উপসংহারে বলেন :

> মসজিদের সামনে বাজনা, গো-কোর্ব্বানি, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ইত্যাদি নিয়ে মুসলমান বহুদিন পর্যন্ত হিন্দুর সঙ্গে লড়ছে, আজ যদি মিশ্র-নির্ব্বাচন সে স্বীকার করে তবে তাকে হার স্বীকার করতে হলো এই যাঁদের চিন্তা তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য—হার স্বীকার ত বটেই ; কিন্তু সুন্দর-ভাবে হার স্বীকার করতে পারার দাম সংসারে বাস্তবিকই কম নয়। আমি মুসলমানকে হার স্বীকার করতেই বলছি, এই হার স্বীকার সে যদি সর্বান্তকরণে করতে পারে তবে দেশ ধন্য হবে, সেও ধন্য হবে, কেননা কেবল তাতে করেই তার বর্তমান মানসিক অবসাদ ও অস্বস্তি কেটে যাবে, তার সমস্ত চিত্ত সৃষ্টিপ্রবণ হবে, সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর দেশকেও সৃষ্টি প্রবণ হতে অনেকখানি সাহায্য করবে।[৬]

আবুল ফজল কয়েকটি গল্প লেখেন 'জয়তী'তে। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষিত, মৌলবীর পুত্র হয়েও মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং 'শিখা'র এক সংখ্যার সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর গল্পে ছড়িয়ে ছিল মুক্তবুদ্ধির ছটা, যুক্তি উপস্থাপন এবং কুসংস্কারের বুকে সজোর আঘাত।

'বিংশ শতাব্দী' শীর্ষক একটি গল্পের কটি উক্তি :

> ...ফরিদ হঠাৎ বলিয়া উঠিল—কি লতীফ মিঞা, বড় ত বলেছিলেন, খোদা আছে, নামাজ রোজা করুন—পাস হয়ে যাবেন। খামকা আপনার কথা ধরে রহিম পরিশ্রম করে মরল। ছ'মাস ধরে আপনাকে বোঝাচ্ছি, খোদা-টোদা কিছু নেই, আপনি তবুও বুঝবেন না ! হামীদ ত নামাজ রোজার ধারও ধারত না, আপনারা তাকে নাস্তিক বলে গাল দিতেন, অথচ দেখলেন তো-বি-সি-এস-এ সে-ই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গেল, আর রহিম নামাজ-রোজা করে সাব-ডেপুটীও হতে পারল না।[৭]

লেখা পড়া না-করে দোয়া কালাম পড়লে আর পানি পড়া খেলে যে পরীক্ষায় পাস করা যায় না, একথা দ্বারা কর্ম না করে বড় হওয়া যায় না-সেই যুক্তিই বোঝাতে চাওয়া হয়েছিল

www.pathagar.com

পরকাল ও ঐশী গায়েবী রহমতে বিশ্বাসী দরিদ্র মুসলমানদের। উন্নতির উপায় কী—এসব প্রশ্নে আবর্তিত হয়েছেন সেকালের ধর্মীয়-মোহমুক্ত সকল আধুনিক মুসলিম লেখক।

আবুল ফজল 'কবিতার কাটা' (গল্প ১/২) ; মেয়েলোক (একাঙ্ক নাটক, ১/৩) ; 'খেয়ালের খেলা' (গল্প, ১/৫) ; 'মায় ভূখা হুঁ' (গল্প, ১/৬) ; 'পরদেশিয়া' (গল্প, ১/৯-১০) ; 'একটি সকাল' (একাঙ্ক নাটিকা, ১/১১-১২) ; মরা তারা (ধারাবাহিক উপন্যাসধর্মী গল্প, ২/১-৩ থেকে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত) প্রভৃতি লিখে মুসলিম কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারে অনেক নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেন—এইসব চরিত্র ধর্মীয় গোঁড়ামি, কু-সংস্কার প্রভৃতি থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে, হচ্ছে বা হয়েছে। 'মায় ভূখা হুঁ' গল্পের একটি মারাত্মক সাহসী উক্তি : 'মানুষ খোদার হাতের নয়, ক্ষুধার হাতের পুতুল।'[৮]

তাঁর একটি গল্পের কটি লাইন :

> ...বাতিটি আমার কামরায় সরিয়ে ধীরে ধীরে প্রথম তোমার শয্যা পার্শ্বে বসলাম—আরও ধীরে ধীরে তোমার দুখানি তুলতুলে গালের উপর আমার ক্ষুধিত অধর স্থাপন করলাম। তারপর ততোধিক কচি ঠোঁটের সঙ্গে আমার ঠোঁটের স্পর্শ...তারপর সাকীর শয্যাপার্শ্বে গেলাম। হাতড়িয়ে তার গাল দুখানিতে হাত দিলাম—তারপর চুম্বনের পর চুম্বনেও যে আমার ওষ্ঠের সর্ব্বভূক ক্ষুধা নিবৃত্ত হতে চায় না—। তারপর ধীরে ধীরে....একটী করে ব্লাউজের বোতাম খুললাম।...দেখি এতদিন যেখানে শুধু বোঁটা ছিল। সেখানে ফুলের কলি দেখা দিয়েছে। ধীরে ধীরে এই অস্ফুট ফুলকলি দুটিতে চুম্বন দিলাম।

উপরিউক্ত বর্ণনা ১৯৩০ সনে (আবুল ফজলের) একজন মাদ্রাসা শিক্ষায় তালিমপ্রাপ্ত মুসলিম লেখকের। এ থেকে বোঝা যায়, স্বজ্ঞানপ্রাপ্ত সচেতন তরুণ লেখকেরা সাহিত্যের চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধেই নয় কেবল, কথাসাহিত্যেও বিপ্লব-সাধন করতে চেয়েছেন। 'কল্লোল' ও ত্রিশের দশকের সাহিত্যচিন্তার প্রতিফলন ও প্রভাব মুসলিম সাহিত্যে এই প্রজন্মের লেখকেরা, সার্থকভাবে সন্নিবেশিত করেন—যাঁদের শ্রেষ্ঠতমজন হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। রোমান্টিকতা, বস্তুবাদিতা, আধ্যাত্মিকতা, যুক্তিবাদিতা—সকল রকম বাদের কিংবা চিন্তার সফল প্রয়োগে স্বরচিত বাংলা সাহিত্য ও অনূদিত বিশ্বসাহিত্য দ্বারা নজরুল ও তাঁর অনুসারি আধুনিক মুসলমানেরা ঐকালের সাময়িকপত্রকে পুষ্ট করে তুলেছিলেন—'জয়তী' তারই একটি ছোট্ট নিদর্শন।

'জয়তী'তে মুসলিম সাহিত্য সমাজের সভাপতি ও অতিথিদের অভিভাষণ যেমন ছাপা হয়েছে, তেমনি কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আনওয়ারুল কাদির, জসীমউদ্‌দীন, গোলাম মোস্তফা, মাহবুবউল আলম, রিজাউল করীম, কাদের নওয়াজ, মনীষী ডাক্তার লুৎফর রহমান (প্রবন্ধ, সার্থক জীবন), নাজিরুল ইসলাম (মোহাম্মদ সুফিয়ান), কামালউদ্দীন, এম. নাসির আলী, অধ্যাপক আবদুর রব চৌধুরী, খানবাহাদুর নাসিরউদ্দীন আহমদ, হাকিম হাবিবুর রহমান, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, আবদুল কাদির, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল ফজল, জসীমউদ্‌দীন, আনোয়ারুল কাদির, আবুল হুসেন এবং অন্যরা লিখেছেন। হিন্দু লেখকদের তালিকাটা নিম্নরূপ :

প্রবোধ কুমার সান্যাল (গল্প, যোগ-বিয়োগ) ; সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (কবিতা) ; হেমচন্দ্র বাগচী (কবিতা) ; মোহিতলাল মুজমদার (কবিতা) ; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

www.pathagar.com

(কবিতা) ; ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (প্রবন্ধ : হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ১/৪) ; প্রণব রায় (কবিতা) ; রামেন্দু দত্ত (কবিতা) ; দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কবিতা, প্রাতিকা)।

প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি বইয়ের সমালোচনা (ভৈরবী চক্র), আর একটি কবিতা লিখেছিলেন—'মোর সাজাহান কাঁদিয়া গড়ুক তাজমহল' শিরোনামে—"কাগজের বুকে বিঁধে কলমের রূঢ় নখর/আমার অশ্রু হল আজ ভাই কালো আখর/কবিতা হায় !"[৯]

এঁদের সমকালীন কবি আবদুল কাদির এর একটি কবিতা জয়তী থেকে উদ্ধৃত করা যায়,—

স্ফুরিত প্রবাল ওষ্ঠে রচি' কবে চুম্বনের চিতা
বলেছিনু—'তুমি মোর কাব্যলক্ষ্মী, অক্ষয় কবিতা।'
অধর ঈষৎ কুঞ্চি' রক্তশূণ্য পাংশু হাসি হেসে'
গাঢ়তর আলিঙ্গনে বেঁধেছিলে আমারে আবেশে,
সূক্ষ্ম চীনাংশুক ভেদি' ঈষদুষ্ণ দেহের সুরভি
আমার ক্ষুধার আগে ধরেছিলে ইন্দ্রধনুচ্ছবি,
লীলায়িত তনুলতা স্তন-পুষ্প মঞ্জরীর ভারে,
নুইয়া পড়িয়াছিল অনিন্দিত নিতম্ব সম্ভারে।[১০]

তথ্যনির্দেশ

১. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, ঢাকা, ১৯৬৯ (১ম সংস্করণ), পৃ. ৫৫০।
২. সম্পাদকের পাঁজি (সম্পাদকীয়), জয়তী, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৭, পৃ. ৩৭-৪০।
৩. উপরিউক্ত।
৪. শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অভিনন্দন (আশীর্বাদ), উপরিউক্ত, পৃ. ৪০।
৫. কাজী আবদুল ওদুদ (আবদুল্লাহ্-আল আজাদ ছদ্মনামে), নির্বাচন-প্রসঙ্গ, উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ১১-১২ যুগ্মসংখ্যা, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩৭, পৃ. ২৮১-৮৪।
৬. উপরিউক্ত।
৭. আবুল ফজল, বিংশ শতাব্দী (গল্প), উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৭, পৃ. ১৩।
৮. উপরিউক্ত।
৯. প্রেমেন্দ্র মিত্র, মোর সাজাহান কাঁদিয়া গড়ুক, উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ১১-১২-সংখ্যা।
১০. আবদুল কাদির, পুরাতনী (কবিতা), উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৩৭, পৃ. ২২৫।

www.pathagar.com

৪. প্রাতিকা

(কলকাতা, ১৩৩৮)

বাঙালি মুসলমান লেখকদের প্রচেষ্টায় কলকাতার 'খিদিরপুর ইয়াং মোসলেম এ্যাসোসিয়েশনে'র জন্ম হয় ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে। এর সম্পাদক ছিলেন আবদুল খালেক। এই এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগেই ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রয়াত মনীষী সৈয়দ আমীর আলীর নামে এক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই লাইব্রেরীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে, শিক্ষা বিস্তার করা। 'ইয়াং মোসলেম এ্যাসোসিয়েশনে'র তত্ত্বাবধানে উক্ত লাইব্রেরীতে পাক্ষিক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হতো।

পাশাপাশি কলকাতার বহুবাজারের একটি বাড়িতে সাহিত্যালোচনার জন্য কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩–৭৬), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭–১৯৭৮) ; মুহম্মদ এনামুল হক (পরে ডক্টর ১৯০৬–৮২), আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০১–৫৯), মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার (১৯০৬–৯৬), কবি আবদুল কাদির (১৯০৬–৮৪), কবি বেনজীর আহমদ (১৯০৩–৮৩) ; নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ান প্রমুখ সাহিত্যিক সংস্কৃতিসেবীগণ সমবেত হতেন। কবি বেনজীর আহমদের প্রচেষ্টায় উপরিউক্ত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান দুটি একত্রীভূত হয়ে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গ সাহিত্য সংসদ' নাম ধারণ করে। এই সংসদ এর মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা মনোনীত হয়েছিলেন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ। 'বঙ্গ সাহিত্য সংসদ'–এর উদ্দেশ্য তাঁদের মুখপত্র 'প্রাতিকা'য় 'বার্ষিক কার্যবিবরণী'র অংশ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে :

> সাহিত্য দরদীদের লইয়া একটি আসর জমাইবার জন্য বঙ্গ সাহিত্য সংসদের সৃষ্টি হয়। সকল প্রকার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ বর্জিত হইয়া সাহিত্যকে শুধু সাহিত্যের দিক হইতেই আলোচনা ও প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এই সংসদের প্রতিষ্ঠা। ধর্ম বিরোধিতা বা রাজনীতিকে এড়াইয়া চলা এই সংসদের উদ্দেশ্য নহে। ধর্মভাব ও রাজনীতি লইয়া যদি কোথাও সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাহা যেমন এই সংসদের আলোচনা ও প্রচারের বিষয় অন্যদিকে ধর্মরাজনীতি পরিবর্জিত হইয়া যদি কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয় তবে তাহাও এই সংসদের আলোচ্য ও প্রচারের বিষয়। এক কথায় 'বঙ্গ সাহিত্য সংসদ ধর্ম সংসদ বা রাজনৈতিক সংসদ নহে।

সংসদ পাঁচটি সাহিত্যসভা ও একটি মহিলাসভার আয়োজন করে। 'আমাদের কথা' শীর্ষক সম্পাদকীয় থেকে তা জানা যায়। উপরিউক্ত বক্তব্যে এঁদের চিন্তা ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা মুক্ত ছিল বলেও প্রতীয়মান হয়।[১]

এই 'বঙ্গ সাহিত্য সংসদ' থেকেই ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদ হবীবুল্লাহ (বাহার), নাজিরুল ইসলাম (মুহম্মদ সুফিয়ান) ও আবদুল খালেকের সম্পাদনায় বার্ষিক সাহিত্যপত্র 'প্রাতিকা' বঙ্গ সাহিত্য সংসদ ও খিদিরপুর ইয়াং মোসলেম এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগে সৈয়দ আমীর আলী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। মূল্য আট আনা। বঙ্গ সাহিত্য সংসদ, ১৪ এ গোরাচাঁদ লেন, কলকাতার ঠিকানায় ছিল। প্রাতিকা সৈয়দ আমীর আলী লাইব্রেরী ৩৯ মোমিনপুর রোড, খিদিরপুর থেকে মোসলেম উদ্দীন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং এ.সি. সরকার কর্তৃক ক্লাসিক প্রেস ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত হয়। কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি রচনা এতে ছাপা হয়।—দুটি গান (থাক সুন্দর

www.pathagar.com

মিথ্যা আমার/ছলনা মধুর তব মন।" এবং 'কে দুয়ারে এলে মোর তরুণ ভিখারী/কি যাচে ও আঁখি বুঝিতে যে নারি॥") এবং একটি প্রবন্ধ—'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য'।

কাজী আবদুল ওদুদ-এর 'বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ' শীর্ষক উৎকৃষ্ট একটি প্রবন্ধ এবং একালের প্রধান তরুণ মুসলিম সাহিত্যিকদের প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি 'প্রাতিকা'র ঐশ্বর্যবৃদ্ধি করেছিল। লেখক ও রচনা সূচিটির দিকে দৃষ্টি দিলেই পত্রিকাটির মান সম্পর্কে ধারণা জন্মে : নজরুল ইসলাম-উপরিউক্ত গান ও প্রবন্ধ। কাজী আবদুল ওদুদ-বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ (প্রবন্ধ)। জসীমউদ্‌দীন—(আজি পুষ্পের জন্মের তিথি (কবিতা) ; একা (কবিতা) ; হুমায়ুন কবির—বন্ধু (কবিতা)।

প্রয়াত মুসলিম বাঙলার প্রধানতম চিন্তাবিদ সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) মৃত্যুতে বিহ্বল, আবেগতাড়িত মুসলিম তরুণেরা সৈয়দ আমীর আলী লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন। সেই একই চেতনাবশে প্রাতিকায় সৈয়দ আমীর আলীর ওপর চারটি রচনা মুদ্রণ করা হয়েছিল। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ, এস. ওয়াজেদ আলি, দীনেশচন্দ্র সেন আবুল হোসেন (হুসেন)।

এছাড়া মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী—ধর্মীয় শাসন (প্রবন্ধ) ; আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন—বাঙ্গালা সাহিত্য ও মুক্তবুদ্ধি (প্রবন্ধ), খান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন—রহস্যময়ী (কবিতা) ; অধ্যাপক বিনয় সরকার—নব শিক্ষার নূতনত্ব (প্রবন্ধ, শিক্ষা বিষয়ে) ; ফজলুর রহমান—দেওয়ান এ জেবুন্নিসা (কাব্যানুবাদ) ; আবুল ফজল—গল্পের নমুনা (গল্প) লিখেছিলেন।

শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়—উপন্যাস ও কাব্যে প্রেম (প্রবন্ধ) ; আবুল মনসুর আহমদ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (প্রবন্ধ) ; সাদত আলী আখন্দ—ঈশা খাঁ (প্রবন্ধ) ; নাজিরুল ইসলাম—তরুণ ও প্রাচীন সাহিত্য (প্রবন্ধ) ; এনামুল হক (মুহম্মদ)—বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভবের মূলে সুফী প্রভাব (প্রবন্ধ) ; মহীউদ্দীন—অনন্ত যৌবন চাই (কবিতা) ; ডক্টর কুদরত-ই-খুদা—জলের জীবন-কথা (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ) ; কাজী কাদের নওয়াজ—হাফেজ হইতে (কাব্যানুবাদ) ; মিস্ জাহানআরা চৌধুরী—কেমন জব্দ (গল্প) ; বন্দে আলী মিয়া—শানিকদহের চর (কবিতা) লিখে প্রাতিকার লেখকসূচির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন।

আরও আছে সম্পাদকীয়—'আমাদের কথা'। সুফিয়া এন. হোসেন-এর 'পূর্ণতা' শীর্ষক কবিতা। আবদুর রশীদের প্রবন্ধ 'ধর্ম ও বর্তমান রুষিয়া'। প্রাতিকার সূচিপত্রের শীর্ষে লেখা হয়েছিল এর প্রায় 'সবগুলি লেখাই বঙ্গ সাহিত্য সংসদে পঠিত বা পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়'।

'প্রাতিকা'র সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের উত্তুঙ্গ-মুহূর্তে (১৯৩১—) এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল মানবভাবনা। মনীষী কাজী আবদুল ওদুদ 'বাঙলা সাহিত্যের প্রধান চিন্তানায়ক ও স্রষ্টাদের চিন্তা ও সৃষ্ট শিল্প-র মূল্য গুরুত্ব, সামাজিক প্রভাবের আলোকে বিশ্লেষণ করে যে মতামত উপস্থাপন করেন—তাতে একথা বলা চলে যে, সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে সুলিখিত এমন চিন্তাশীল গদ্য খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। এ ধারার রচনা যদি, বাঙলা ভাষায়, বাঙলা সাময়িকপত্রে প্রভাব বিস্তারক্ষম লেখকেরা প্রচুর পরিমাণে লিখতেন, তাহলে বাঙালির জাতীয়তার স্বরূপ ও তার বাস্তব প্রয়োগ ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করতো।

www.pathagar.com

কাজী আবদুল ওদুদ প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবি-সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গ এ আলোচনার অন্তর্গত করেন নি। তিনি বাঙলার জাগরণের এক প্রধান রূপকার। উনিশ শতকের বাঙালি চিন্তাবিদ, লেখক সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তাঁর যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞামণ্ডিত মতামত—তাতে সত্যিই চিন্তার খোরাক অপরিমেয় মেলে।

রামমোহন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার পর্যালোচনা করে আবদুল ওদুদ দেখাতে চান যে, রামমোহন অবশ্যই প্রধান দিক্‌দর্শক, কিন্তু নিকটতর কালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই 'একালের বাংলা সাহিত্যে জাতীয় জীবনের সমস্যার আলোচনার সূচনা' করেন।

> ...ভূদেবের স্থান বাংলার জাতীয় জীবনের সমস্যার আলোচনার ইতিহাসে খুব উচ্চে এই জন্য যে এইসব বইতেই ('সামাজিক প্রবন্ধ' ; 'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি) হিন্দুত্বকে বিস্তারিত ভাবে যুক্তিতর্কের দিক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করা হয়েছে, প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করবার চেষ্টাও হয়েছে যুক্তি তর্কের সাহায্যেই, বিশেষত সুপরিচিত হিন্দু মুসলমান সম্যসার সমাধানের অভিনব চেষ্টাও এইসব গ্রন্থে আছে।

কিন্তু 'নব বাঙালীত্বের স্রষ্টা' বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে 'সংকীর্ণ হিন্দুত্বের অভিমান' প্রবল ছিল। 'স্বভাবদত্ত প্রতিভার তীক্ষ্ণ চঞ্চল আলোকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের অনেক কিছুই তাঁর চোখে প্রতিভাত' হলেও হয়ত কোন এক দুর্জ্ঞেয় কারণে 'সমগ্র ভাবে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি মহান বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না।' বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এই রূঢ় বাক্য কাজী আবদুল ওদুদ উচ্চারণ করেছিলেন কেন—তার ব্যাখ্যা তিনি ঐ প্রবন্ধেই দিয়েছেন :

> বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সৃষ্টিধর্মী ঠিক নয় যদিও প্রদীপ্ত—এ-কথাটি আপাতত অনেকের কানে রুঢ় শোনাতে পারে, কিন্তু সেদিন হয়ত দূরে নয় যেদিন তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্তরাও বলবেন—জাতীয় জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্ব অস্বীকার না-করলে কাল ও পরিবেষ্টনের সঙ্গে দ্বন্দ্বই হবে বাঙালীর ভাগ্য। বাঙালী বলতে আমরা জাতিধর্মনির্বিশেষে বাংলাদেশের সব লোকই বুঝছি। মুসলমানদের অনেকে বলতে চান বটে তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধী, কিন্তু যেভাবে তাঁরা তাঁর বিরোধিতা করতে প্রয়াস পান তা প্রকৃতই তাঁর অনুকরণ। সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়ত্বই বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্র, সে-মন্ত্রের মোহ কাটিয়ে উঠবার মতো মানসিকতা আজো দেশের কোনো সম্প্রদায়েরই হয়নি।[২]

'রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করতেও ছাড়েননি রবীন্দ্রানুরাগী কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি লিখেছেন :

> ...কিন্তু তবু সত্য যে জাতীয় জীবনের উৎকর্ষসাধনে রবীন্দ্র-প্রতিভা আশানুরূপ কার্যকরী হয়নি। ভূদেবের স্বস্তি, বঙ্কিমচন্দ্রের উগ্রতা, কেশবচন্দ্রের ভাবোন্মত্ততা, বিবেকানন্দের খেয়ালিত্ব, জাতীয় জীবনের জন্য এ সমস্তেরই অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ; কিন্তু তিনি যে কবি, মানুষের ও প্রকৃতির সভায় চির-আনন্দময় গায়ক, এই বোধ কর্মীর যোদ্ধৃবেশ গ্রহণে বারবার তাঁর ভিতরে কুণ্ঠা এনে দিয়েছে। এতে তাঁর সাহিত্যের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং এক হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছে—আত্মপ্রকাশে ব্যস্ত মানুষের সমাজে এ-কুণ্ঠা কত দুর্লভ—কিন্তু কবির সমসাময়িক বাঙালী জীবন কিছু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৈকি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সার্থকতা তুলিত হতে পারে সুফী-সাহিত্যের সার্থকতার সঙ্গে। সুফী-

www.pathagar.com

সাহিত্য বহু দেশের বহু ব্যক্তির মনোজীবনে আশ্চর্য সুফল ফলিয়েছে, তবু বৃহত্তর সমাজজীবনে সে সাহিত্যের প্রভাব আশানুরূপ সুন্দর নয়।[৩]

কিন্তু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ পোষণ করেছেন অন্যরকম ধারণা। 'জাতীয়তা'র প্রসঙ্গ বিবেচনায় কালের দাবির সহায়ক চিন্তাই শরৎচন্দ্রকে এই গৌরব লাভের অধিকারী করেছে। তিনি লিখেছেন :

...সমাজজীবনে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ কিছু সুস্পষ্ট করতে প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর প্রতিভাবান শিষ্য শরৎচন্দ্র ; আর একার্যে কিছু সাফল্যও তিনি অর্জন করেছেন। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ, 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস না হতে পারে, একদেশদর্শিতাও তাতে যথেষ্ট, তবু একালের সর্বকল্যাণরোধী হিন্দুত্ব-অভিমান ও তারই পেছনে-পেছনে-আসা মুস্লিমত্ব অভিমান তাঁর হাতে আঘাত খেয়েছে, তাতে দেশের মোহমুক্তির কিছু সহায়তা হবে আশা করা যেতে পারে।[৪]

দুজন মুসলমান লেখকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেন : 'শরৎচন্দ্রের ধরনের পরিচ্ছন্ন চিন্তা তাঁর সমকালবর্তী দুইজন মুসলমান সাহিত্যিকের ভিতরেও ফুটেছে—একজন কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) এবং অপরজন লুৎফর রহমান (ডাক্তার মোহাম্মদ, ১৮৮৯-১৯৩৬)। শুধু এঁদের ত্রুটি এই—দেশের আম দরবারে আসন গ্রহণ করে কথা বলতে এঁরা পারেননি অথবা সাহস করেন নি।[৫]

সবকিছু মিলিয়ে তাঁর উপসংহার এই যে, 'যাকে বলা যেতে পারে সুব্যবস্থিত বীর্যবন্ত জাতীয় জীবন তার আয়োজন একালের বাংলার সাহিত্যে ও জীবনে কম হয়েছে... কিন্তু কিভাবেই বা এ ত্রুটির স্খালন সম্ভবপর?'

লেখক লক্ষ্য করেন—

এ সম্বন্ধে কাগজে পত্রে সভা-সমিতিতে শুধু জল্পনা-কল্পনাই চলতে পারে, 'সত্যকার কর্মারম্ভ অপেক্ষা করছে নবভাবোদ্দীপ্ত কর্মীর' উপর। কিন্তু সেই কর্মীর আবির্ভাব হবে কবে? তিনি আপাতত প্রস্তাব করেন তাই :

সত্যকার জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্যে দুটি কর্ম ও চিন্তাধারার কথা সহজেই মনে পড়ে—প্রথমটি, হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান-চেষ্টা, দ্বিতীয়টি, জাতীয় জীবন সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা। শিক্ষা ও স্বরাজ-সাধনা অর্থনৈতিক সমস্যার অন্তর্গত করে ভাবাই সঙগত, আর সে ভাবে না ভাবলে শিক্ষা ও স্বরাজসাধনা হয়ত শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে ভাববিলাসের ব্যাপারই রয়ে যাবে। আমি নিজে এই শেষোক্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান চেষ্টাই আপাতত বেশী প্রয়োজনীয় মনে করি।...[৬]

কাজী নজরুল ইসলাম 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে দুটো ধারার আলোচনা করে দেখান প্রগতিশীল সাহিত্যের সম্ভাবনা : 'এক রূপে সে শেলীর Skylark-এর মত, মিল্টনের Brids of Paradise-এর মত এই ধূলি-মলিন পৃথিবীর উর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না ; ... আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে—ধূলি-মলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে, স্বর্গকে চায় না, তা নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরা কে ফেলে সুন্দরের স্বর্গলোকে যেতে চায় না।...দুই দিকেই বড় বড় রথী-মহারথী। একদিকে নোগুচি, ইয়েটস্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি dreamers স্বপ্নচারী, আর দিকে গোর্কি, যোহার্ন বোয়ার, বার্নার্ড শ', বেনাভাঁতে প্রভৃতি।[৭]

www.pathagar.com

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন 'বাঙ্গালা সাহিত্য ও মুক্তবুদ্ধি' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখের চিন্তাধারার কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে অনেকে গ্রহণ করতে অসম্মত হবেন এমন অনেক কথা বলেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বক্তব্য চিন্তার খোরাক জোগায়। নতুন সৃষ্টির প্রেরণা পাওয়া যায়। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলামের সমসাময়িক, মোহাম্মদী ও আজাদ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি মুসলিম বাঙলার সাংবাদিকতা জগতে স্বকীয় মর্যাদাবান জায়গা জুড়ে রয়েছেন। মওলানা আকরম খাঁর তিনি সহযোগী ও সহকারী ছিলেন। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সেকালে। মোহাম্মদীতে চাকুরী করলেও তিনি ছিলেন সওগাত ও প্রাতিকারও লেখক। বুদ্ধির মুক্তি ও প্রগতিশীলতার প্রতি তাঁর স্বভাবজাত কৌতূহল ও আনুগত্য ছিল। নিজে গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। বিদেশী উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করেও তিনি সুনাম অর্জন করেন। সমালোচনায় তিনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপনে পারদর্শী ছিলেন যে, তা তাঁর এই প্রবন্ধটিও প্রমাণ করে।

বুদ্ধির মুক্তি কোন্ কোন্ স্রষ্টার সৃষ্টিতে কীরূপে প্রতিভাত হয়েছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য বুদ্ধির গতিশক্তি জোগালেও 'তাহা ভাবপ্রবণ অধিকাংশ বাঙ্গালী গ্রহণ করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয়না। সম্পূর্ণরূপে মধ্যযুগীয় প্রকৃতি অতিক্রম করিতে না পারিলেও রবীন্দ্র-সাহিত্য যে অনেকটা আধুনিকতামুখী, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না।'

বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি মুক্তবুদ্ধির লেখক বলতে চাননি। হিন্দুত্বের সাধনাই ভারতের মনুষ্যত্বের সাধনার পথ—এচিন্তা 'ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য।... এ মধ্যযুগীয় সংস্কার-প্রবণতার কথা,—মুক্তবুদ্ধির সহিত এর বিশেষ সংস্রব নাই।'

লেখকের বক্তব্য হচ্ছে : 'বিশেষ সংস্কার বা বিশ্বাসের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তা চিরন্তন নয়, তাছাড়া

> এযুগে বুদ্ধিই মানব জীবনের একমাত্র পরিচালক শক্তি। হিন্দুত্বের সাধনার সঙ্গে ভারতবর্ষের—বাঙ্গালার বহু লোকের মতবিরুদ্ধতা আছে। এমতাবস্থায় সাময়িকভাবেও মনুষ্যত্ব সাধনার এ আদর্শ এখানে কি করিয়া গৃহীত হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই জন্য ইহাকে এ দেশের সনাতন বৈশিষ্ট্য আখ্যা দেওয়া শুধু ভ্রমাত্মক নহে, নিরর্থক।[৮]

শরৎচন্দ্রের দরদী শিল্পীসত্তা সমাজের বহুসংস্কারের অন্তঃসারশূণ্যতা ও হাস্যকরতা নির্মমভাবে দেখাতে সক্ষম হয়। কিন্তু 'তা সত্ত্বেও তাঁকে সম্পূর্ণরূপে...মুক্তবুদ্ধিসম্মত' বলা চলে না। বাঙলার জীবনের 'পারিপার্শ্বিকতা এ সম্বন্ধে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে মোহমুক্ত হইতে দেয় নাই। ভারতীয় হিন্দুত্বের গভীর সংস্কার যে-কোনো কারণে হউক, তাঁহার বুদ্ধির উপর জয়ী হইয়াছে।'

প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনা পূর্বক লেখক বলেন, তাঁর 'রচনাকে মোটের উপর মুক্তবুদ্ধ রচনা বলা যাইতে পারে—যদিও তাহা অনেকটা চিন্তাবিলাস ছাড়া আর বিশেষ কার্যকরী কিছু নয়। তা না হউক, তবুও তাঁর রচনা কিছু সংখ্যক নবীন লেখকের সাহিত্য সাধানায় মুক্তবুদ্ধির একটা প্রেরণা যোগাইতে পারিয়াছিল,

www.pathagar.com

...নজরুল ইসলামকে মুক্তবুদ্ধ বলা যাইত পারে না, তাঁর সাহিত্যেও মার্জিত বুদ্ধির হয়ত খুবই অভাব আছে। কিন্তু একদিক দিয়া তাঁর সাহিত্য বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধির উন্মেষে খুবই সহায়তা করিয়াছে।...'তীব্র আবেগ আছে, কিন্তু কোনো প্রকারের প্রচলিত সংস্কারের মোহ নাই। এই দিক দিয়া তিনি একেবারে 'বিদ্রোহী'। সর্ববন্ধনমুক্ত মানবতার জন্য তিনি পৃথিবীর সব-কিছুর বিরুদ্ধে সাহিত্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। মানবতা-সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর এই বিদ্রোহ বাঙ্গালা সাহিত্যের তরুণ সাধকদের মনের গোড়ায় একটা তীব্র আঘাত হানিয়াছে। ফলে তাদের চিন্তা-জগৎ সবিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়া একটা বিরাট পরিবর্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিবর্তন-বোধের পরে পরেই তরুণ সাধকদের মন সুস্থ অবস্থায় সর্ব সংস্কারমুক্ত বুদ্ধির অপরিহার্য আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে।'[৯]

নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন, তাঁর সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যের আর একটা বড় উপকার করেছে, সে হল ভক্তি ও দাস্যপ্রবণ 'বাঙ্গালার চিত্ত'কে নজরুল-সাহিত্য কুঠারাঘাত করেছে। কুসংস্কার থেকেও বাঙ্গালীর চিত্তকে যে মুক্ত করা দারকার তা তিনি করেছিলেন। সমালোচক লক্ষ্য করেছেন :

> বর্তমানে যে-সমস্ত তরুণ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের চিত্তই বেশ সংস্কারমুক্ত—চিন্তাধারা মুক্তগতিসম্পন্ন...ইঁহাদের অগভীর চিন্তাধারার পিছনেও মুক্তচিত্তের এমন একটা সুষমা আছে, যাহা ইতিপূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে বড় বেশী পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এব্যাপারে বিস্ময়ের সহিত একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। সৃষ্টির দিক দিয়া মুসলিম সাহিত্যিকদের রচনা যে নগণ্য, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। এক নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কারো বিশেষ সৃষ্টি-ক্ষমতা নাই। যে-সমস্ত মুসলিম তরুণ সাহিত্যিকদের রচনা সম্বন্ধে আমরা আশান্বিত হইয়াছি, তাঁহাদের রচনাতেও সৃষ্টি-ক্ষমতা বিশেষ ফুটিয়া উঠে নাই। এই দিক দিয়া হিন্দু তরুণ সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁহাদের তুলনাই হইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মুসলিম তরুণ সাহিত্যিকগণের রচনায় চিন্তার দিক দিয়া মুক্তবুদ্ধিচিত্তের প্রকাশ যতটা দেখা যায়, আধুনিক হিন্দু-তরুণ-সাহিত্যে তাহা ততটা দেখা যায় না। তাঁহারা যত মুক্তবুদ্ধ হইতেই চেষ্টা করুন না কেন, তাঁহাদের বুদ্ধির গোড়ায় যেন কেমন একটা বাঁধন থাকিয়া যাইতেছে। আধুনিক মুসলিম তরুণ সাহিত্যিকদের অনেকেই এ বিষয়ে অনেকটা মুক্ত।[১০]

এর কারণ হিসেবে তিনি অনুমান করেছেন হিন্দুমনে যুগযুগ সঞ্চিত কুসংস্কারের প্রভাব বেশী। আর মধ্যযুগীয় মুসলিম মনের পারিপার্শ্বিকতায় ধর্মোন্মাদনার প্রতিপত্তি বেশী। ধর্মোন্মাদনা কুসংস্কারের মতো দৃঢ়মূল অনুভূতি নয়, ধর্মোন্মাদনা ঝড়ের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে যেমন, তেমনি তা চলে (থেমে) যেতেও পারে। কিন্তু কুসংস্কার কাটিয়ে ওঠা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। 'তাও আমার মনে হয়—বুদ্ধির মুক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইলে মুসলিমের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা যত সহজে হইতে পারে, হিন্দুর পক্ষে তাহা তত সহজে হইতে পারে না। এই জন্য এ-অনুমান করা অসঙ্গত নয়—মুসলিম মন সচেতন হইলে এই দিক দিয়া হিন্দুমনের গতিধারাকে অল্প সময়েই অনেকটা ছাড়াইয়া যাইতে পারে।'

'বাঙ্গালা সাহিত্য ও মুক্তবুদ্ধি'র আলোচনায় লেখক সচেতন ছিলেন যে, উৎকৃষ্ট বুদ্ধিই উন্নত সাহিত্য নয়। কিন্তু মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্য মানবজীবনে বেশী 'শুভফল দায়ী হইতে

www.pathagar.com

পারে'। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুক্তবুদ্ধির স্থান বিশেষ ছিলনা, তাই জীবন-সাধনায় বাঙ্গালী বেশী-কিছু অগ্রসর হইতে পারে নাই—তার অকৃত্রিম মুক্তিকামনা বার বার ব্যর্থতা বহন করিতে বাধ্য হইয়াছে।'[১১]

প্রাতিকার মুসলিম লেখকগণ চিন্তা, বুদ্ধি ও মুক্তির অন্বেষায় ব্যগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে আবেগ অনুভূতি ও সুকুমার বৃত্তির চর্চায়ও আস্থাশীল ছিলন। তাঁদের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা ও কথাসাহিত্যসমূহ এর পরিচয় দেয়। কোনো কোনো আলোচনায় যেমন ললিতকলার আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তেমনি পত্রপত্রিকা ও পুস্তকের প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ, ভেতরের চিত্রায়ণ, মুদ্রণ-সৌকর্য এসবের প্রতিও মনোযোগ দিয়েছেন। ত্রিকাল, প্রাতিকা, চতুরঙ্গ, ছায়াবীথি, মৃত্তিকা প্রভৃতি পত্রিকার কথা মনে হওয়াতেই একথা বলতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

হুমায়ুন কবির চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু কবিতা রচনায় তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে তিনি রোম্যান্টিক প্রবণতার কবি, অন্তত ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ততো বটেই। পঁচিশ বছর বয়সে হুমায়ুন কবিরের লেখা প্রাতিকার 'বন্ধু' শীর্ষক কবিতার কটি চরণ :

বন্ধু ; তোমারে আমি যদি ভালবাসি,
তুমি যদি মোরে ভালবাস প্রতিদানে
জীবনে আমার ঝলিবে আলোক হাসি
ভুবন আমার ভরিয়া উঠিবে গানে।[১২]

তথ্যনির্দেশ

১. 'বঙ্গসাহিত্য সংসদ'এর বার্ষিক কার্যবিবরণী, প্রাতিকা, প্রথম বর্ষ, ১৩৩৮, পৃ. ৮৩-৮৪। খোন্দকার সিরাজুল হক প্রণীত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম' শীর্ষক গ্রন্থে (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ১০৮) এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে।

২ কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ, প্রাতিকা, উপরিউক্ত, পৃ. ২-৬। প্রবন্ধটি 'শাশ্বতবঙ্গ' গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

৩. উপরিউক্ত।

৪. উপরিউক্ত।

৫. উপরিউক্ত।

৬. উপরিউক্ত।

৭. কাজী নজরুল ইসলাম, বর্তমান বিশ্বসাহিত্য, প্রাতিকা, উপরিউক্ত, পৃ. ৮-১০। আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

৮. আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, বাঙ্গালা সাহিত্য ও মুক্তবুদ্ধি, প্রাতিকা, উপরিউক্ত, পৃ. ৫৮-৬০।

৯. উপরিউক্ত।

১০. উপরিউক্ত।

১১. উপরিউক্ত।

১২. হুমায়ুন কবির, বন্ধু (কবিতা), প্রাতিকা, উপরিউক্ত, পৃ. ১১।

www.pathagar.com

৫. বুলবুল

(কলকাতা, ১৩৪০–৪৫)

প্রস্তাবনা

প্রগতিশীল বাংলা সাহিত্য-পত্রিকার ইতিহাসে 'বুলবুল' এক বিশেষ উজ্জ্বল স্থান দখল করে আছে। বিশ শতকের প্রধান বাংলা সাহিত্য পত্রিকাসমূহ : প্রবাসী, পরিচয়, সওগাত, মোহাম্মদী এবং তৎকালে প্রচলিত অপরাপর প্রথম শ্রেণীর সাময়িকপত্রের মধ্যে বুলবুল যুগের উপযোগী চিন্তাচর্চায়, জীবনের বহুমাত্রিক বিকাশের সাধনার যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে—তার তুলনা মেলে খুব কম। 'বঙ্গদর্শনে'র ধারায় গুটিকয়েক জাগরণপন্থী পত্রিকার মধ্যে বুলবুলের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালির জাতীয় সংকট ও সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য জাত-সম্পাদকের যোগ্যতা দক্ষতা ও দূরদর্শিতা নিয়েই উদ্যোক্তাগণ এ-কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাঁদের আমন্ত্রণে বাংলা সাহিত্যের প্রধান চিন্তক, ও শিল্পী-সাহিত্যিকেরা বুলবুলের সাধনাকে ফলপ্রসূ ও জয়যুক্ত করার জন্য সমন্বিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে তৎকালীন প্রধান মানবতাবাদী লেখক ও বিদ্বৎসমাজ সংযুক্ত ও একাত্ম হয়েছিলেন সহোদর ভাই-বোন দুই কৃতি বাঙালি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে। এর সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ হবীবুল্লাহ ও শামসুন্নাহার। পত্রিকা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুলবুলের অন্যতর সম্পাদক শামসুন্নাহারকে প্রথমে 'শ্রদ্ধাস্পদাষু' সম্বোধন করে পত্রের পাঠ প্রস্তুত করেছিলেন। পরে 'কল্যাণীয়াসু' করেন।[১] এ-থেকে অনুমান হয় 'বুলবুল' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

সম্পাদক-পরিচিতি

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার (১৯০৬–৬৬) ও শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮–৬৬) বাঙালি মুসলমান সমাজের দুই প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। কাজী নজরুল ইসলামের অমর সাহিত্যের সঙ্গেও এই দুই ভাইবোনের নাম স্থায়ী হয়ে আছে। কেবল নজরুল-স্মৃতি ও সাহিত্যের সংশ্লিষ্টতাগুণেই নয়, এই দুই চিন্তাবিদ ও কর্মী মনীষী নিজ নিজ কর্মবলেও বাঙলার মুসলিম সমাজে সম্মানের আসন লাভ করেছেন। শামসুন্নাহার-এর কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের একটি বৃহৎ হল-এর নামকরণ হয়েছে 'শামসুন্নাহার হল'। একই কারণে তাঁর নামে বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয়। বেগম রোকেয়ার নামের সঙ্গে নারীজাগৃতির সাধনার ইতিহাসেও শামসুন্নাহারের নাম সমভাবে উচ্চারিত হয়।

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার ত্রিশের দশক থেকেই মুসলিম-সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও রাজনীতির ইতিহাসের এক কীর্তিমান পুরুষের সম্মান লাভ করে এসেছেন। বাঙলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এঁদের উভয়ের ওপর মূল্যবান অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন্নাহার নোয়াখালি জেলার অধিবাসী 'বাঙলার আজিজ' নামে খ্যাত খানবাহাদুর আবদুল আজিজের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী। কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

'বাংলার আজিজ' নামে কবিতা লিখে এই মহান পুরুষের ঐতিহাসিকতাকে মূল্য দিয়ে গেছেন। নোয়াখালীর মুসলমান বাঙ্গালীদের মধ্যে আবদুল আজিজ প্রথমে গ্রাজুয়েট হন (১৮৬৬)। তাঁর পিতৃকুলও বাংলার আধুনিক শিক্ষিতদের অন্যতম। তাঁদের বাবা-মা উভয়েরই পূর্বপুরুষ সরকারের উচ্চ-চাকুরে আইন-ব্যবসায়ী কিংবা রাজনীতিক ছিলেন। তাঁদের পিতামাতার নাম নুরুল্লাহ চৌধুরী ও আসিয়া খাতুন। শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন পরিবারে তাঁদের জন্ম হলেও অতি শৈশবেই (যথাক্রমে তিন ও এক বছর বয়সে) তাঁরা পিতৃহীন হন। পিতার মৃত্যুর পর মাতামহ আবদুল আজিজ বি. এ-র প্রতিপোষণে বাহার-নাহার লালন-পালন ও শিক্ষা পান। ১৯২৮ সনে মুহম্মদ হবীবুল্লাহ কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র থাকা কালে কলেজের ক্রীড়া-টীমের ক্যাপ্টেন ও কলেজের সাহিত্য বার্ষিকীর সম্পাদক ছিলেন। এই পটভূমিতে ১৯৩১ সনে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য বার্ষিকী 'প্রাতিকা'র তিনি অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার ক্রীড়াপ্রীতির এবং সংগঠন শক্তির স্বীকৃতি স্বরূপ কলকাতার বিখ্যাত 'মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে'র অধিনায়ক নির্বাচিত হন। তাঁরই নেতৃত্বে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ত্রিশের দশকে মুসলিম জাগরণের অন্যতম স্তম্ভ, মুসলমানের প্রিয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সারা ভারতে নাম করতে সক্ষম হয়। ১৯৩২ সনে ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস পরীক্ষায় মুহম্মদ হবীবুল্লাহ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশ বিভাগ তাঁর বিরুদ্ধে খারাপ রিপোর্ট করায় তাঁর আর সরকারি চাকুরিতে যোগ দেয়া হয় নি।

মুহম্মদ হবীবুল্লাহর চাচা মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ চৌধুরী ওরফে চুন্নু মিয়া মতাদর্শের দিক থেকে 'কমিউনিষ্ট' ছিলেন। ১৯৩৫ সনে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (আপার হাউস) সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কৃষক সমিতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কমরেড মুজফফর আহমদ চুন্নু মিয়ার বন্ধু ছিলেন (মুজফফর আহমদ নোয়াখালির লোক)। অপর দিকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্বাধীনতাকামী সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে হবীবুল্লাহ বাহারের সম্পর্ক ছিল। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অন্যতম কর্মী (চট্টগ্রামের) অনন্ত সিং তাঁর নিকটতম বন্ধু ছিলেন। বাহার-নাহারের নিকট আত্মীয় ড. আহমদ শরীফ লিখেছেন :

> "তাঁর পারিবারিক প্রভাবই তাঁর চরিত্র নির্মাণ ও জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। নানা-নানী ও মা-খালাদের থেকে তিনি দুটো সম্পদ লাভ করেছিলেন—একটি সাহিত্যপ্রীতি এবং অপরটি নৈতিকচেতনা।... আড্ডাবাজ বাহারের আদর্শবাদ ছিল অনাবিল ও অটল।...তাই এই প্রাণবন্ত প্রবল পুরুষের জীবনে কোন নৈতিক উচ্ছৃংখলতা ছিল না, ছিল না কোন কাপট্য বা মিথ্যাচার। আদর্শ চরিত্র ও মহৎ জীবনের অনধ্যানেই তাঁর জীবন কেটেছে। তাঁর রচনাবলীর অধিকাংশই তাই চারিত্র্যপূজার ও কীর্তিমান পুরুষের কর্মের অনুধ্যানের নিদর্শন।"[২]

ধর্মভাব ও আদর্শবাদ তাঁকে অতীত ও বর্তমানের মুসলিম জীবন সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় উৎসাহী করেছিল। কিন্তু তাঁর স্বধর্ম ও স্বধর্মীপ্রীতি বিধর্মীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট করেনি। তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রত্যাশী, অসাম্প্রদায়িক মানুষ।

সাহিত্যিক হিসেবে মহৎ জীবনের আলোচনার মাধ্যমে নৈতিকচেতনা আদর্শানুগত্য ও মহৎভাব জাগানোর সচেতন প্রয়াস ছিল তাঁর। লেখক হিসেবও তিনি পাঠককে সহজেই মুগ্ধ করতে জানতেন। তাঁর দেখবার দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। রসিকের দৃষ্টিতে তিনি জীবন ও জগৎকে প্রতিবেশ ও প্রতিবেশীকে প্রত্যক্ষ করেছেন।[৩]

www.pathagar.com

হবীবুল্লাহ বাহার মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রচারক, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত সাম্প্রদায়িক দল 'মুসলীম লীগে' যোগদান-এর এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা হওয়ার পরও চিন্তা ও রচনায় উগ্র সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা আচ্ছন্ন হননি। তিনি বাঙ্গালীর সমন্বিত লোক-সংস্কৃতিতে আস্থাবান ছিলেন। সকল শ্রেণী ও মতের লেখকের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করতেন। কর্মহীন বিপন্ন লেখকদের সহায়তায়ও তিনি এগিয়ে এসেছেন। পাকিস্তান হবার পরেও প্রতিভাবান কমিউনিস্টরা তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করেছেন।

নোয়াখালী থাকতেই মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ 'বুলবুল পাবলিশিং হাউস' স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, বন্ধু সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে আর্থিক সহায়তা করার জন্যই 'বুলবুল' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কেউ কেউ নজরুলের পুত্রের নামের সঙ্গেও সঙ্গতি খুঁজে বুলবুলের ইতিহাসের সঙ্গে কিংবদন্তী জুড়তে চান।[৪]

আবার কেউ কেউ সেসব খণ্ডনেরও প্রয়াস পেয়েছেন।[৫] কিন্তু আমার মনে হয় এসব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার থেকে বুলবুলের সম্পাদকীয় উদ্দেশ্য আদর্শ ও পত্রিকায় অভিব্যক্ত দর্শন তথা আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুসন্ধান অনুধ্যানই একালের প্রধানকর্ম। কারণ, সমাজদরদীর মনের দুর্বলতা ও মহৎ আকাঙ্ক্ষার পরও সাহিত্য-শিল্পের মাপকাঠিতে মূল্যবান, রুচিস্নিগ্ধ না-হলে তা কেউ বেশিদিন মনে রাখে না। উত্তর পুরুষ চায় দালিলিক প্রমাণ ও সমাজে তার প্রভাবের কার্যকরতার বিবেচনা।

'বুলবুল' এর চারিত্র্য ও ভূমিকা অনুধাবনের জন্য হবীবুল্লাহ বাহারের ব্যক্তিজীবনের দু'একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। কলকাতাস্থ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র তিনি দীর্ঘদিন যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। এই সমিতির ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-সম্মেলন ও অধিবেশনগুলোর নেপথ্যে তাঁর ভূমিকা কার্যকর ছিল। তখনকার অন্যান্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনসমূহের সব কটির সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন-'সিরাজদ্দৌলা স্মৃতি কমিটি'র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। হাজী মুহম্মদ মহসীন স্মৃতি বার্ষিকী উদ্‌যাপনের বেলায়ও তাঁর ভূমিকা ছিল। এসব কারণে পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে তাঁর ব্যস্ততা বাড়তেই থাকে।

বুলবুল ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রত্যাশী। কিন্তু যখন দেখা গেল সে চেষ্টা বৃথা,—উভয় পক্ষই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশই ঘটিয়ে চলেছেন ; তখন বুলবুলেই মুসলিম স্বার্থে অনেক মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করতে হয়েছে। এতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, বুলবুলের পাতাতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি স্থাপনের সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়েছে। ১৯৩৮ সনে পত্রিকা বন্ধ হয়, কেউ কেউ আর্থিক কারণে বন্ধ হয় বলে অনুমান করেন। তবে তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব পত্রিকা চালাতে চাইলে সম্ভবপর হতো না—এটা মনে হয় না। তিনি আসলে রাজনীতিতে বেশি সময় দিচ্ছিলেন।

১৯৪৪ সনে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (আপার হাউস) সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঐ বছরেই তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদকও নির্বাচিত হন। পোর্ট হজ্জ কমিটির সদস্যরূপেও তিনি চার বছর (১৯৪৪-৪৮) দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সনের

www.pathagar.com

সাধারণ নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী রূপে বিপুল ভোটাধিক্যে নোয়াখালি থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৬ সনে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রশমনের জন্যে নোয়াখালি আসেন। ১৯৪৭ সনে 'আজাদ পাকিস্তান' স্থাপিত হলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমৃত্যু তিনি বর্ণাঢ্য, কর্মব্যস্ত, সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে তৎপর জীবন-যাপন করেন।

রাজনীতিতে সম্পৃক্ত থাকার পরও হবীবুল্লাহ বাহার ছিলেন কবি নজরুলের মতোই মনে-মননে একজন রোমান্টিক ভাবাপন্ন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। ১৯৬৬ সনে তাঁর জীবন অকালেই বলা চলে, অবসান হয়।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে মরু ভাস্কর, ওমর ফারুক, সৈয়দ আমীর আলী, সৈয়দ আহমদ, সলিমুল্লাহ, কবি ইকবাল, আগা খাঁ, কায়েদে আজম, মুহম্মদ মহসিন, মুহম্মদ আলী প্রভৃতি জীবনী ; মিশর বিজয়, বন্দীবীর, হিরণ রেখা, রাজস্বনীতি, পাকিস্তান, ইতিহাসের আহ্বান প্রভৃতি ইতিহাসমূলক গ্রন্থ এবং গুলিস্তাঁ, ওমর খৈয়াম, সেকালের তিনজন কবি, আমাদের সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, দিদারুল আলম, সাহিত্য সমিতির কথা, সাহিত্য সমিতির ইতিহাস, উত্তরাধিকার, কলম্বোর চিঠি, শিক্ষাবিজ্ঞান, জেনেভা থেকে লিখছি, বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলন, যক্ষ্মাবিরোধী অভিযান প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকা সেকালে বহুল প্রচলিত ছিল। একালের গবেষকদের কাছেও সামাজিক বিকাশের ইতিহাসের আকর উপাদান হিসেবে তাঁর কোনও কোনও গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে।

বুলবুলের যুগ্ম-সম্পাদক মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহারের কনিষ্ঠ সহোদরা মহীয়সী শামসুন্নাহার (১৯০৮-৬৪) রক্ষণশীলতার ঐকালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে মেট্রিক পাস করেন। কলকাতা থেকে ১৯২৮ ও ১৯৩২ সনে আই. এ ও বি.এ. পাশ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর ১৯৪২ সনে তিনি আবার প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বাংলায় এম.এ. এবং ১৯৪৪ সনে এম.বি.ই. লাভ করেন। ১৯৪৩ সনে তিনি বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে যোগদান করেছিলেন। অতঃপর তিনি কলকাতার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল, লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ ও ঢাকার ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে (বাঙলার) অধ্যাপনা করেন। বেগম রোকেয়ার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করে তিনি নারীমুক্তি আন্দোলনের দীক্ষা নেন। আজীবন তিনি এ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের নেত্রী হিসেবে তাঁর নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরূপেও তিনি পরিচিতি অর্জন করেন। ১৯৬০-৬৪ সময়ে তিনি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে তিনি বহুবার প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন এবং সেসবের ওপর সুন্দর সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করে সুনাম অর্জন করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'পুণ্যময়ী' (১৯২৫) ; 'রোকেয়া জীবনী' (১৯৩৭) ; 'শিশুর শিক্ষা' (১৯৩৯) ; 'নজরুলকে যেমন দেখেছি' (১৯৪৮) ; 'ফুল বাগিচা' ; 'আমার দেখা তুরস্ক' ইত্যাদি।

www.pathagar.com

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও এদেশের যে কয়জন নারী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন—তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে তিনি দেশের কীর্তিমানদের সঙ্গে সম্মানিত আসন লাভ করেছেন। বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি বুলবুলের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পত্রিকা পরিচিতি

'বুলবুল' এর ইতিহাস বর্ণনাকালে বাংলা একাডেমী (ঢাকা) থেকে প্রকাশিত অন্যতর সম্পাদক মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহারের জীবনী-গ্রন্থের (১৯৮৭) প্রাসঙ্গিক আলোচনাংশের বক্তব্য পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলে না। জীবনীকার প্রখ্যাত সাহিত্যিক, আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-৯০) নিজেও ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে কলকাতার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী, সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি লিখেছেন বুলবুল পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্য-প্রেরণা ছিল মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে আর্থিক সহযোগিতার অভিপ্রায়। ওয়াজেদ আলী 'মাসিক মোহাম্মদী'র চাকুরী ছেড়ে বেকার হয়ে পড়েন, কিন্তু তিনি দান-গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন না। সাহিত্যিককে উপযুক্ত কাজ দেবার জন্য তিনি কলকাতায় বুলবুল পাবলিশিং হাউস পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং হবীবুল্লাহ বাহারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়াজেদ আলী কয়েকটি বই লেখেন। লেখকের সম্মানী স্বরূপ ওয়াজেদ আলীর খুলনার বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে দেয়া হতো। জীবনীকার লিখেছেন : বুলবুল পাবলিশিং হাউসের আয় থেকে বাহার নিজেও প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহ করতেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, বুলবুলকে কেন্দ্র করে যে একটি সাহিত্যচক্র গড়ে ওঠে, তাতে মুসলমান সাহিত্য সমাজের নতুন নতুন সদস্যরা যেমন, আবু রুশদ, শওকত ওসমান, আবুল হোসেন, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব প্রমুখ একত্র হতেন। কালে তাঁরা বাংলা সাহিত্যে নিজেদের আসন করে নিতে সক্ষম হন।

১৯৩৭ সনের ১৫ মার্চ নির্বাচনে শেরে বাঙলা এ.কে. ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টি থেকে মুসলিম লীগের স্যার নাজিমউদ্দিনকে পরাজিত করে জয়লাভ করলে বুলবুল কার্যালয়ে এক প্রীতি সম্মেলনে হক সাহেবকে শ্রদ্ধা ও সংবর্ধনা জানানো হয়। বুলবুলের প্রীতি-সম্মিলনীতে উপস্থিত ব্যক্তিদের নাম দেখলেই এর সামাজিক সংযোগ প্রমাণিত হয় : এ.কে. ফজলুল হক, সৈয়দ নওশের আলী, শামসুদ্দীন আহমদ, খান বাহাদুর শামসুদ্দীন আহমদ, ডক্টর সানাউল্লা, সৈয়দ জালালউদ্দীন হাশেমী, মোজাম্মেল হক, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, নবাবজাদা হাসান আলী, খান বাহাদুর কাজী ওবায়দুল বারি, আয়নুল হক খাঁ, আশরাফুজ্জামান খাঁ, আশরাফুদ্দিন চৌধুরী, শহীদুদ্দীন মোহাম্মদ, ডাক্তার ওয়াহীদুদ্দীন মাহমুদ, আবদুল্লাহ রসুল, মোহাম্মদ ফয়জুল্লা প্রমুখ।[৬]

বুলবুলের ন্যায় মুসলমান-সম্পাদিত এমন উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা কৃচিৎ চোখে পড়বে। সম্পাদকবৃন্দ অন্ধতা কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন বলে তখনকার সর্বাধিক খ্যাত প্রধান বাঙালি লেখকদের ভালো রচনাসমূহের একত্র সমাবেশ এতে ঘটাতে পেরেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশেও বুলবুলের মতো উচ্চমানসম্পন্ন পত্রিকা চোখে পড়ে না। এই পত্রিকার সম্পাদনায় সম্পাদকগণ যে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন জীবনীকার তাকে প্রবাসী ও

www.pathagar.com

ভারতবর্ষের মনস্বী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন প্রমুখের কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৭]

বুলবুল প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা 'বছরে তিনবার' নিয়মে বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৪০ চিহ্নিত হয়ে প্রকাশিত হয় ফুল শোভিত প্রচ্ছদে। 'অগ্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকার ন্যায় প্রতি পৃষ্ঠায় ব্লকে যুগল বুলবুল পাখির চিত্র দ্বারা তাঁরা জাগরণের ও মিলনের কুঞ্জন ধ্বনিত করতে চেয়েছিলেন, সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> কুঁড়ির বুকে ঘুমিয়ে বিচিত্র বর্ণগন্ধের উৎসব-লক্ষ্মী। তার উদ্দেশে বুলবুলের কণ্ঠে গান : আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে/সখি জাগো, জাগো!
>
> বুলবুলের কণ্ঠ-চিরে কেন জাগে এই গান, এ জিজ্ঞাসার আনন্দে গোলাপ-বালারা নৃত্য করেছিল, কিন্তু এর জবাবে সত্যিই তাদের প্রয়োজন ছিল না কোনদিন।
>
> বুলবুল কবির মনের মণি-কোঠায় যে স্বপ্ন-পরী তার রঙীন পাখা মেলে, তার দেহের মদির গন্ধ ছড়িয়ে এক মায়া রাজ্য রচনা করেছিল, সঙ্গীত-মুখরিত বনানীত সবুজ মহিমার মাঝখানে কুঁড়ির বুকে তাঁরই নবজন্ম—কামনা করেছিল বুলবুলের তৃষাতুর কণ্ঠের গান।
>
> উপরে দিগন্ত উদার আকাশ, নিম্নে অনন্ত প্রসারিত সবুজের আস্তরণ—এর মাঝখানে বাধাবন্ধনহীন মুক্তির লীলা ছন্দে তার চিত্ত দোদুলনৃত্যে দুলে উঠেছিল ; আর তার মনের সেই অপূর্ব সুন্দর সম্ভাবনার আভাস ফুটে উঠেছিল তার চোখের মায়ায়, তার কণ্ঠের সঙ্গীতে। গান তার সার্থক হল সেই দিন ; যেদিন তার মনের বনের কামনা মাটীর মায়ায় নেমে এলো শ্যাম ধরণীর পুষ্প-বীথিকায় ফুটন্ত গোলাপ হয়ে।
>
> নিষ্ঠুর ঝঞ্ঝাবাতে বুলবুলের দেহ ক্ষতবিক্ষত হতে পারে, ব্যর্থতার নির্মম প্রহরণে কণ্ঠ তার বিদীর্ণ হতে পারে ; —সে জন্যে বুলবুলের মনে ভাবনা ছিলনা কোনদিন। সে গান করে আপন মনে—আপনার ভাবে পাগল হয়ে ; কারণ ওই তার জীবন, ওই তার ধর্ম।
>
> তার গানের ভাষা জুগিয়েছেন যেসব স্বপ্নলোকচারী বন্ধুরা তার, তাঁদেরকে তার অন্তরের প্রীতি সম্ভাষণ।[৮]

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশের তথ্য দেয়া হয় "৯০/৩ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা মাস পয়লা প্রেস হইতে শ্রী শশধর ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ কর্তৃক ২৩ ক্রিমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।" পরে পত্রিকা যখন মাসিক হয় (৩য় বর্ষ থেকে) বুলবুল, ৬৩ বহুবাজার ষ্ট্রীটের দি এলায়েন্স প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। মুহম্মদ হবীবুল্লাহকে উল্লেখ করা হত 'ম্যানেজিং এডিটর' হিসেবে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা'র যেমন মটো ছিল—('জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট—মুক্তি সেখানে অসম্ভব') বুলবুলেরও তেমনি মটো ছিল। নানাভাবে তাঁরা এইরূপ বহুউক্তি উদ্ধৃত করে মুক্তবুদ্ধির সাধনা তথা emancipation of intellect -কে প্রধান ব্রত হিসেবে প্রচার করেছেন। বস্তুত বুলবুল শিখারই বিস্তৃত ও পল্লবিত বিকাশ ও প্রকাশ। বুলবুলে শিখা ও মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তকদের বক্তব্য ও বাণী বিস্তৃতভাবে মাসে মাসে উপস্থাপন করে শিখার থেকে বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করা হয়েছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, শিখা প্রধানত মুসলিম সাহিত্য সমাজের কার্যবিবরণী ও সভায় পঠিত রচনা প্রকাশ করেছে একালের 'বার্ষিক রিপোর্ট' এর মত। বুলবল ছিল সাহিত্য পত্রিকা—যার তুলনা বঙ্গদর্শন ও তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে করা চলে।

www.pathagar.com

No true progress can there be where there is no freedom—freedom from the shackles of priestcraft ; freedom from the bondge of superstition ; freedom from the fetters of authority—secular of otherwise. Naught but can emancipated intellect can seek, strive and achieve. No power could bend him to submission ; no glitering gewgow could lead him away from the path of duty"

কাজী আবদুল ওদুদের একটি রচনার নিচে ('রামমোহন রায়' ১/৩) উদ্ধৃতি আকারে লেখা :

> 'যে লেখার ভিতর প্রচলিত সামাজিক মনোভাবের অতিরিক্ত কিছু নেই, সে লেখা সাহিত্য নয়। তাই এ কথা জোর করে বলা চলে যে, সাহিত্যরাজ্যে হিন্দু শুধু হিন্দু নন, তার অতিরিক্ত কিছু, এবং মুসলমানও শুধু মুসলমান নন, তার অতিরিক্ত কিছু। এই অতির দেশই সকল সাহিত্যিকের স্বদেশ।'

প্রথম বর্ষের শেষ সংখ্যার সম্পাদকীয় বক্তব্যও এতদসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : কারণ, এতেই পত্রিকার উদ্দেশ্য বিবৃত :

> আমরা আজ বর্ষ শেষে শুধু এই নিবেদন করব যে বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনের পরিচয় হবে 'বুলবুল'...। নব নব জ্ঞানের আলোকে মানুষ মানুষের সঙ্গে তার সহজ ঐক্যের আবেদন পায়—আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সম্মিলিত হবে, ছন্দোময় জীবন-যাপন করার জন্যে সুন্দরের পথ বেয়ে মুক্তির গান গেয়ে বন্ধনহারা বিহঙ্গের মতো অগণিত নর-নারী শোভাযাত্রা করবে।...আমাদের বর্তমান যদি বা অতিশয় দৈন্যের লজ্জায় মলিন, কিন্তু সে আমাদের আশা-অভিলাষের তুচ্ছতার পরিচায়ক নয়। এক উদার মহামহিম ভবিষ্যতের ছবি বিশ্বমানুষের মনকে নতুন চিন্তায় প্রবুদ্ধ করেছে, তাকে নতুন প্রাণের রসে সঞ্জীবিত করে তুলেছে। সেই মনোবলের মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের পথ বুলবুল-এর। তার সম্বল নিষ্কলুষ পবিত্র সংকল্প, জীবনাদর্শে দৃঢ় গভীর প্রত্যয় এবং দেশের বিদগ্ধ চিত্তের আনন্দ সাহচর্য। বাঙালী মুসলিমের জীবনযাত্রার আদর্শ ও পদ্ধতির শোচনীয়তা অতি সহজেই চক্ষুষ্মান মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের বিশেষ সাধনা : একে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে মেলানো। অতীতে যে বিপুল জলধারা সাগরের সঙ্গে যোগপ্রবাহ হারিয়ে পঙ্কিল মৃত্যুর সম্ভাবনায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছে তার পথের বাধাবন্ধ কেটে আবার সেখানে দুর্বার স্রোত সঞ্চার করা অতি কঠিন কথা জানি, তবু সমাজের প্রকৃষ্ট চিত্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই ব্রত উদ্‌যাপনের অভিলাষ আমাদের।[৯]

'বুলবুল' প্রথম সংখ্যা নব্বই পৃষ্ঠায় বের হয়। মাসিক হলে ৮০-৮৪ পৃষ্ঠায় নেমে আসে। এর বার্ষিক মূল্য ছিল চার টাকা। প্রতি সংখ্যার মুল্য ছয় আনা। ১৩৪০ সনে চতুর্মাসিক হিসেবে ৩টি সংখ্যা বের হয়। দ্বিতীয় বর্ষে ১৩৪১ সনে ত্রৈমাসিক হিসেবে ৪টি বের হয়। কিন্তু আর্থিক কারণেই হয়তো তৃতীয় বর্ষে, ১৩৪২ সনে পত্রিকা প্রকাশিত হয় না। এক বছর অন্তে ১৩৪৩ সনে পূর্ণ উদ্যমে মাসিক পত্রিকা হিসেবে বুলবুল পুনঃপ্রকাশিত হয় এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ বাঙলা রচনাদিতে পূর্ণ হয়ে নিয়মিত দুবছর দুমাস-এ ২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর ১৩৪৫ সনের আষাঢ়ে ১৯৩৮ সনের জুন-জুলাই নাগাদ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভে, বাঙলার রাজনৈতিক তরঙ্গ উত্তাল হলে সম্পাদকদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়, সব মিলিয়ে পত্রিকা প্রকাশের পথে বড়

www.pathagar.com

অন্তরায় সৃষ্টি হয়। আর্থিক কারণে পত্রিকা বন্ধের কথা বললেও,[১০] সাম্প্রদায়িক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার কথাও স্মরণযোগ্য[১১]। নচেৎ পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থা পরিচালনা তাঁদের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া এসব ছিল মুসলিম জাগরণের সাংগঠনিক কাজ। এগুলো তিনি আন্তরিক ভাবেই করেন, ফলে পাকিস্তান হলে তাঁকে মন্ত্রিত্বও অর্পণ করা হয়।

বুলবুল ও বাংলা সাহিত্য

বুলবুল যে কারণেই বন্ধ হোক, যে ক'বছর বেরিয়েছে তা সমান উন্নতমানের রচনাবলিতে পূর্ণ হয়েই হয়েছে। এতে সমকালীন জ্বলন্ত (বার্নিং ইস্যু), গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্ত বিতর্ক সংঘটন করা হয়েছে, তাতে ঐকালের সামাজিক সমস্যা সংকটের মূল্যবান দলিল হয়ে আছে বুলবুল। এতে তখনকার হিন্দু–মুসলমান প্রধান বাঙালি লেখকবৃন্দ মুক্ত হস্তে লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) ; প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮–১৯৪৬) ; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬–১৯৩৮) ; শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০–১৯৭৭) ; আচার্য যদুনাথ সরকার (১৮৭০–১৯৫৮) ; অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪–২০০২) ; কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬) ; আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯–১৯৫৩) ; কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪–১৯৭০) ; মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬–১৯৫৪) ; সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৫–১৯৫৬) ; কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭–১৯৮১) ; কাজী আনওয়ারুল কাদির (১৮৮৭–১৯৪৮) ; আবুল হুসেন (১৮৯৭–১৯৩৮) ; মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩–৫৬) ; জসীম উদ্‌দীন (১৯০২–৭৬) ; আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭–১৯৭৯) ; মাহবুবউল আলম (১৯০০–৮১) ; হুমায়ুন কবির (১৯০৬–৬৯) ; আবুল ফজল (১৯০৩–৮৩) প্রমুখ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রধান স্থপতিদের অধিকাংশ আন্তরিক ভাবে সংশ্লিষ্ট হতে চেয়েছিলেন। লেখা দিয়ে এই পত্রিকার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে বাঙলার সবচেয়ে দুর্যোগময় সংকটকালে জরুরি যুগোপযোগী চিন্তাচর্চার প্লাটফরম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

শুধু চিন্তাচর্চার পত্রিকাই বুলবুল ছিল না। শিল্পকলা ও সুকুমার সাহিত্যের বিকাশেও এর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এর প্রথম সংখ্যার লেখকসূচির দিকে তাকালেও এ–কথার প্রমাণ মেলে। প্রথম রচনাটিই ছিল কাজী নজরুল ইসলামের একটি গান—'পাষাণ গিরির বাঁধন টুটে/নির্ঝরিণী আয় নেমে আয়/ডাকছে উদার নীল পারাবার/ আয় তটিনী আয় নেমে আয়।'

একই সংখ্যায় তাঁর তিনটি গান ছাপা হয়। অপর দুটি হলো : 'তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ/ডুবিয়া যাই এখন' এবং 'তুমি বর্ষায় ঝরা চম্পা, তুমি যূথিকা অশ্রুমতী'।

বলা আবশ্যক যে, বুলবুল অবিভাজ্য বাঙলা সাহিত্যের,অসাম্প্রদায়িক, প্রাগ্রসর উদার মুক্ত চিন্তার বিকাশে আস্থাশীল হলেও তাঁরা মুসলিম জাগরণের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ছিল দুর্বল সবল মুসলমান ও হিন্দুর অসম সাধনার পরিবর্তে সবল জাতির তুষ্ট উভয় অঙ্গ হিন্দু–মুসলমানের যৌথ–সাধনার দ্বারা বাঙলা ও বাঙালির উজ্জীবন, অগ্রগতি সাধন। কিন্তু এই সাধনা নির্বিঘ্ন হতে পারেনি। একশ্রেণীর জাগরণে অপর শ্রেণী ঈর্ষান্বিত হন, কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগায় হীনচেতা কতিপয় বুর্জোয়া হিন্দু দরকষাকষি করে ভ্রাতৃভাবাপন্ন পরিবেশের তুলনায় বিদ্বিষ্ট সম্পর্কপূর্ণ দুটি পৃথক জাতিসত্তার বোধকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যান যে, দেশটাকেই দু'ভাগ করে ফেলতে কটা দিন মাত্র বাকী তখন।

www.pathagar.com

১৯৩০ সনে চৌধুরী রহমত আলী ও কবি স্যার মুহম্মদ ইকবাল ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির (পাকিস্তান)পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা পেশ করে ফেলেছেন। মুসলিম লীগের সাংগঠনিক তৎপরতা ক্রমাগত নতুন প্রাণ পাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে 'বুলবুল' বের হয়েছিল (১৯৩৩) মনে করলে এর প্রতিটি লাইনের আদর্শিত ব্যঞ্জনা নতুন চেতনার সঞ্চার করে : 'পাষাণ গিরির বাঁধন টুটে/নির্ঝরিণী আয় নেমে আয়'— এক অর্থে ঘুমন্ত বাঙালি মুসলমানকে চল্ চল্ চঞ্চল ধারায় প্রবহমান হবার উদাত্ত আহ্বান।

আপরাপর রচনায়ও বাঙালির বিশেষ মনন–সাধনার চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

প্রথম সংখ্যার অন্যান্য রচনা হলো : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'যুগের মন' ; কাজী আনওয়ারুল কাদিরের 'শিক্ষিতা নারীর বিবাহ' ; আবুল হুসেন–এর 'মুসলিম কালচার ও উহার দার্শনিক ভিত্তি' ; শামসুন্নাহর–এর 'শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা' ; মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা' ; আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'প্রাচীন মুসলিম সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য' ; আদেলা খানম–এর 'মিসেস আর. এস. হোসেন' প্রভৃতি।

মাহবুব উল আলমের বিখ্যাত উপন্যাস 'মোমেনের জবানবন্দী'র প্রথম কিস্তি এবং আবুল মনসুর আহমদের নক্শা—'আহলে সুন্নত' ; সাদত আলী আখন্দের ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা 'দায়ুদ খাঁ' এবং মুজীবুর রহমান খাঁ–র আলোচনা 'ওয়াল্ট হুইটম্যান' বুলবুলের প্রথম সংখ্যাতেই ছাপা হয়।

তাছাড়া, ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির' পঞ্চম অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও তাতে পঠিত, আলোচিত বিষয়গুলোও বিস্তৃত ভাবে এতে পরিবেশিত হয়। এ সভায় অভ্যর্থনা সমিতির মুখপাত্র সৈয়দ এমদাদ আলী ও কবি কায়কোবাদের দেয়া বক্তব্য বুলবুলে ছাপা হয়। কাজী আবদুল ওদুদ সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসেবে যে অভিভাষণ উপস্থাপন করেন, তাও এতে মুদ্রিত হয়। ইতিহাস শাখার সভাপতি অধ্যাপক জহুরুল ইসলামের আলোচনা, দর্শন শাখার সভাপতি অধ্যাপক কাজেম উদ্দীন আহমদের আলোচনা এবং বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ড. কুদরৎ–ই–খুদার বক্তব্য—সব মিলিয়ে বুলবুলকে যেরূপ ভাবসম্পদ ও সাহিত্য–ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ও পুষ্ট করে তোলা হয় তা রবীন্দ্রনাথকেও আশান্বিত করে,—তিনি লেখেন :

> বুলবুল পত্রখানি পড়ে আশন্বিত হলুম।
>
> আত্মবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃবিদ্বেষে দেশের হাওয়া যখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, সেই পরম দুর্যোগের দিনে নিষেধের বাণী যে ধ্বনিত হোতে পারল একে আমি শুভক্ষণ বলে মনে করি। আপনার বিকাশ যখন আপনিই ঘটাতে বসি তখন তাকেই বলে মহতী বিনষ্টি। বাইরের আঘাত থেকে দেহের পরিত্রাণ অসাধ্য নয়, কিন্তু দেহে যখন সাংঘাতিক মারীকে মর্ম্মস্থানে পোষণ করে, আপনার মৃত্যুবিষ আপনার মধ্য থেকেই উদ্ভাবিত করে তোলে, তখনি পরম শোকের দিন উপস্থিত হয়। সেই শোচনীয় দশা আজ আমাদের। আমাদের দুঃখ আমাদের লজ্জা চরম সীমার দিকে চলেছে, আমরা স্পর্ধা করে আত্মসাতের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। সর্বনাশের মদমত্ততায় আত্মবিস্মৃত দেশের উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে তোমরা শুভবুদ্ধির আহ্বান নির্ভয়ে ঘোষণা করো, ঈশ্বরের প্রসন্নতা তোমাদের উদ্যোগকে গৌরবান্বিত করবে।[১২]

www.pathagar.com

বিশ ও ত্রিশের দশকে তুরস্ক প্রভৃতি দেশে আনোয়ার পাশা, জগলুল পাশা, কামাল পাশা প্রমুখ প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের আদর্শ দ্বারা এদেশের মুসলমানদের মধ্যে প্রগতিশীলতার প্রতি যে ঝোঁক দেখা দিয়েছে—তার সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> আমি পারস্য ইরাক ইজিপ্টে ভ্রমণ করে এসেছি। বহু শতাব্দীর মোহান্ধকার ভেদ করে সর্বত্রই নবপ্রভাতের আলোক আজ প্রকাশিত, সর্বত্রই সেখানকার নানা লোকের মুখে শুনে এলুম, ভারতবাসীর অন্ধতার প্রতি ধিক্কার। স্পষ্ট উপলব্ধি করেছি আজকের দিনে নবজীবনের উৎসাহে উদ্দীপ্ত সমস্ত প্রাচ্য মহাদেশের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই আমরা মুক্তির ক্ষেত্রে কাটাগাছ রোপন করতে বসেছি। এই মূঢ়তার অপমান সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে আজ অনাবৃত অথচ হতভাগ্য দেশে এর প্রতিকার দুঃসাধ্য। এই দুর্ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাতে দেশের নির্বোধ জড়ত্বে বেদনা সঞ্চার আরম্ভ হয়েছে তোমাদের এই পত্রে তারই লক্ষণ সূচিত। তাই আনন্দের সঙ্গে আজ আমি আমার অভিনন্দন প্রেরণ করছি। কৃতজ্ঞ দেশের আশীর্বাদে তোমাদের উদ্যম জয়যুক্ত হোক।[১৩]

প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন : '...বুলবুলের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অতঃপর বুলবুল পেয়েছি ও পড়েছি, এবং পড়ে খুশী হয়েছি। বিশেষ খুশী হয়েছি এই কারণে যে, সবগুলি লেখাই আপনার স্ব-সম্প্রদায়ের লেখকদের। এই রকম একটি কাগজ থেকে ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমানদের নব মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের নব-মনোভাব যে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে গড়ে উঠ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—যেমন আমাদের হিন্দুদেরও হয়েছে। আমরা হিন্দুরাও একেবারে পূর্ব সংস্কার বর্জিত নই, এবং নূতন মুসলমান লেখকরাও তা হতে পারেন না। এবং হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। কারণ চিন্তারও progress সামাজিক ধর্মমত ও আচারকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। ইউরোপের মহা মহা Free thinker কি খ্রীস্টান ধর্মের প্রভাবমুক্ত?'

বুলবুলের মুসলমান লেখকদের ভাষা-স্টাইল সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বলেন :

> বুলবুলের ভাষা স্টাইল, অর্থাৎ যে ভাষায় আমরা পাঁচজনে লিখি, সেই ভাষাতেই 'বুলবুলের' লেখকেরা লিখেছেন। আর অনেকে যে সাধুভাষার মায়া কাটিয়েছেন তা দেখে খুশী হলুম। কারণ বাঙালীর মনোভাব বাঙলাতেই পুরোপুরি প্রকাশ করা যায়। একটিমাত্র লেখক শুধু আমাদের কাছে অপরিচিত বহু আরবী অথবা ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। যে বিষয় তিনি লিখেছেন, সে বিষয়ে হয়তঃ এসব কথার প্রয়োজন ছিল ; কিন্তু অত অপরিচিত বিদেশী কথা বাঙলার গায়ে খাপ খায় না। যদিচ লেখকের প্রতি কথার অর্থ বুঝতে পারিনি, তবুও লেখাটি আদ্যোপান্ত পড়েছি, কারণ লেখাটি আগাগোড়া ফুর্তি করে লেখা। আশা করি দিন দিন বুলবুলের শ্রীবৃদ্ধি হবে।[১৪]

বুলবুলের প্রথম সংখ্যার লেখক তালিকার দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায়, ঢাকার বুদ্ধির-মুক্তি আন্দোলনের অনেকে এর সঙ্গে প্রথম থেকেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মোহাম্মদী-সওগাত-শিখা-জয়তী-বুলবুল তখন প্রাচ্যের তুরস্ক প্রভৃতি দেশের প্রগতিশীলতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমান সমাজের অন্ধতা কুসংস্কারের প্রতি আচ্ছন্নতা ইত্যাদি জড়ত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য প্রকৃত প্রস্তাবেই মিশনারী উদ্যমে কাজ করে চলেছে। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬-১৯৩৮) ; 'সওগাত সাহিত্য মজলিশ' (১৯২৭-৮৮) ; বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' (১৯১১-৪৪) ; 'বুলবুলের সাহিত্যিক আড্ডা (১৯৩৩-৪০)' সব

www.pathagar.com

মিলিয়ে বাঙলার বিদ্বৎসমাজে মুসলমানদের মধ্যেও যে নবজাগরণ–এর মন্ত্র সাড়া তুলেছে তা স্পষ্টই অনুভূত করিয়েছিল। এই পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় লিখেছিলেন :

আজিজুর রহমান, আবদুল কাদির, ইমাউল হক, কামালউদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, কারুণাময়ী বসু, খলিল জিবরান, জসীমউদ্‌দীন, জ্যোতির্মালা দেবী, দিলীপ কুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, নিশীকান্ত রায় চৌধুরী, প্রণব রায়, ফররুখ আহমদ, ফজলুর রহমান, বন্দে আলী মিয়া, বেনজীর আহমদ, মহিউদ্দীন, মণীন্দ্র দত্ত, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মোহিতলাল মজুমদার, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুফি মোতাহার হোসেন, শওকত ওসমান, শাহাদাৎ হোসেন, শামসুল হুদা, সুফিয়া এন. হোসেন, হুমায়ুন কবির, আহসান হাবীব প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যুগলপাখী' (স্বপ্নগগন, পথের চিহ্নহীন'), 'শরৎচন্দ্র', 'হিন্দুস্থান', 'জগদীশ চন্দ্র' প্রভৃতি কবিতা ছাড়াও 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'আধুনিক বাংলাকাব্য', 'আবদুল্লাহ', 'সঙ্গীতের প্রাণধর্ম' প্রভৃতি গদ্য–রচনা ও চন্দননগর সাহিত্য–সম্মিলনীর উদ্বোধনী ভাষণ ('সাহিত্য সম্মিলন' শিরোনামে) বুলবুলে ছাপা হয়। মোহিতলাল মজুমদারের স্বরচিত ও ফার্সী থেকে অনুবাদিত অনেক কবিতা ও পত্র বুলবুলকে সমৃদ্ধ করেছে।

বুলবুলে নজরুল ইসলাম এর কবিতা গানই সংখ্যায় বেশী, তিনি ২/৩টি করে লেখা প্রায়ই পাঠাতেন, মাঝে মধ্যে বাদ পড়েছে, তবে বিস্তৃত সূচিপত্রে দেখি একটি, দুটি, তিনটি কিংবা চার–পাঁচটি করে কবিতাও তাঁর একসংখ্যাতে ছাপা হয়েছে। কোনো সংখ্যায় কবিতার সঙ্গে গদ্য, পত্রও আছে। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় তাঁর পাঁচটি কবিতা ও গান ছাপা হয়েছে। এসমস্ত কবিতা ও গানের মধ্যে আছে পথ ভোলা বুলবুলি, সাত ভাই চম্পা, ক্ষমা করো হজরত, আমি যদি আরব হতাম, যদি আমায় আমি হারাই/যেয়ো না নাথ হারিয়ে, আমার গানের বুলবুলি, শরৎচন্দ্র, এসো ফিরে প্রিয়তম এস ফিরে প্রভৃতি গজল ও গান। ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে নজরুলের সঙ্গীত–সাধনার স্বর্ণ–কালেই বুলবুল বের হয়।

জসীমউদ্‌দীনের পল্লী কবিতা—'কৃষাণীর ঘর', 'পরাণবন্ধু' প্রভৃতি কলকাতার নাগরজীবনে নতুন আমেজ দিচ্ছিলো, তাছাড়া মুসলমান কবির এমন অকৃত্রিম কবিত্বশক্তির নমুনা তৎকালের পত্রপত্রিকায় ছিল বিরল। 'ও তুই যারে আঘাত হানলি মনে/সেজন কি তোর পর,/সে ত তোরি তরে কেন্দে কেন্দে/বেড়ায় দেশান্তর।'[১৫]

হুমায়ুন কবির ত্রিশের আধুনিক কবিদের সঙ্গে পরে আর প্রতিযোগিতা করেননি, কাব্য–চর্চায় নির্বিঘ্ন ও নিরন্তর ছিলেন না তিনি। তবু তাঁর এই তারুণ্যদীপ্ত আধুনিক কবিতা তখন চমক সৃষ্টি করেছিল :

> ...আগুনের শিখা নিভে আসে ধীরে ধীরে, আবার আগুন জ্বালো,
> আঁধার শীতল ভুবনে দীপ্তি জাগাক রক্ত–আলো।
> সে আলোক পানে নিমেষ বিহীন নয়ন মেলিয়া চাহি
> ভবিষ্যতের সাধনা স্বপন অনলে ফেলিছে ছায়া,
> ধূসর আকাশ, আঁধার ধরণী, পরাণে স্বপ্ন মায়া।[১৬]

এছাড়া তাঁর (হু ক.) 'মুক্তি', 'অপচয়' প্রভৃতি স্বরচিত কবিতা এবং 'মহদ্দসে হালী'–র অনুবাদ ধারাবাহিক ছাপা হয় বুলবুলে। মোহিতলাল মজুমদারের অনুবাদ (ফারসী ও ইংরেজী থেকে) বুলবুলের কাব্য–সম্ভারের মূল্যবান সংযোজন। যেমন 'রূপের খবর' : 'ভোরের বেলায় বলে বুলবুল/গোলাপে মিনতি করি,/চাঁদ ধুয়ে দেছে ও–মুখ তোমার/জানি তাহা, সুন্দরি।'[১৭]

'ফেরদৌসী–বন্দনা' শীর্ষক কবিতায় ফারসী কবিতার প্রতি কবি মোহিতলালের অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে :

হাজার বছর আগে—ভাবিতে বিস্ময় মানি, হে ফেরদৌসী-কবি !
সারা প্রাচী স্তব্ধ যবে, অস্ত প্রায় কাব্য রবিচ্ছবি,...
তোমার সাধনা–বলে জাগিয়া উঠিল হর্ষে কবেকার প্রাচীন ঈরাণ !...
জাতির গৌরব–গাথা বিরচিলে গর্ব্বোৎফুল্ল প্রাণে,
আপনি হইলে ধন্য, ধন্য হল স্বজাতি তোমার।[১৮]

'বুদ্ধির মুক্তি'–বাদি মোতাহের হোসেন চৌধুরী রবীন্দ্র–প্রভাবিত কবি, তাঁর দুটি ছোট কবিতার কয়েকটি চরণ :

বুদ্ধিরে তব মনের দুয়ারে দ্বারী করে রেখ ভাই,
জীবনের পথে চলো সাবধানে, ক্ষতি তাহে কিছু নাই।
তবু মাঝে–মাঝে দ্বারীরে সরায়ে মুক্তি দিও হে তারে,—
খেয়াল–খুশীতে বাড়ে যেন তব আনন্দ–পরমাই॥[১৯]

তাঁর 'মুসলমান' শীর্ষক কবিতা :

তুমি নহ ধরণীর, আকাশেরও উর্দ্ধে তব স্থান ;
স্বরগ–দুয়ারে নিতি চলে তব জয়–অভিযান।
তোমার চরণ–ঘায়ে ছুটে যেই ধূলিকণা রাশি,
আকাশে তারকা হয়ে আসে তারা অনির্ব্বান হাসি।[২০]

তখনকার তরুণ কবি ফররুখ আহমদ–এর কবিতা :

তখন রাতির বুকে জেগেছিল আনন্দ স্বপন,
গাঢ় তিমিরের বৃন্তে পূর্ণিমার শ্বেত পদ্ম যেন,
বিকশিয়া শুভ্রতর দলগুলি,—মধুরাত্রি হেন[২১]

আহসান হাবীব 'দারিদ্র্য' শিরোনামে নজরুল ইসলামের 'দারিদ্র্য' কবিতার প্যারোডি লিখেছিলেন নজরুলের প্রিয় বুলবুলে—

হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করনি মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ তিক্ত অপমান।
কন্টকের তীব্র হান, ব্যথার অনল/
দহে মোর দুটি স্নিগ্ধ আঁখির কমল।
বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তব, শুভ্র সুকুমার
মধুছন্দা, মুকুলিত অন্তর আমার,
জ্বলে গেছে, পুড়ে গেছে, পড়ে আছে ছাই—
রিক্ত মন কাঁদেরে আজি, নাই কিছু নাই।[২২]

বুলবুলে গল্প, উপন্যাস, নক্‌শা লিখে কথাসাহিত্যে মুসলিম জীবনচিত্র উপহৃত করে সমৃদ্ধিসাধন করেছিলেন অনেক কীর্তিমান বাঙালি সাহিত্যিক। এঁদের মধ্যে 'মোমেনের জবানবন্দী'র লেখক মাহবুবউল আলমের কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। অন্নদাশংকর রায় এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান গবেষককে বলেন, প্রথম পাঠেই তিনি চমৎকৃত, মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'চতুরঙ্গে' তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশিত মোমেনের জবানবন্দীর আলোচনায়ও সেকথা উল্লেখ

www.pathagar.com

করেছেন। আবুল ফজলের 'জীবন তীর্থ' উপন্যাসও ধারাবাহিক ছাপা হয় বুলবুলে। এটি মুসলমান সমাজকে প্রগতিশীলতার প্রভাব কিভাবে উদ্বুদ্ধ, চঞ্চল করে তুলেছে—তারই শৈল্পিক দলিল। এই উপন্যাসটির নাম পাল্টে 'জীবনপথের যাত্রী' হিসেবে কয়েকবার ছাপা হয়েছে পরবর্তীকালে। আবুল মনসুর আহমদের 'জীবন ক্ষুধা' শীর্ষক উপন্যাস, আবুল কালাম শামসুদ্দীন কর্তৃক টুর্গেনিভের উপন্যাসের অনুবাদ 'দুই বন্ধু' এবং স্বকীয় রচনা 'জসীম' ধারাবাহিকভাবে এই পত্রে ছাপা হয়। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর অনুবাদে তুর্কী সাহিত্যিক খালেদা এদিব খানম এর উপন্যাস 'স্মার্ণানন্দিনী' এবং জেক গল্পের অনুবাদ 'মায়াজাল' (১/৩) ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'সাফল্য' (১/১) ; কাজী আবদুল ওদুদের নবতর বিষয়ের আলেখ্য 'খেলাধুলা' বুলবুলেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

উপরিউক্ত রচনাসমূহ ছাড়াও যাঁরা গল্প উপন্যাস প্রভৃতি গদ্যচর্চায় বুলবুলের সমৃদ্ধি সাধন করেন, তাঁরা হলেন—অন্নদাশংকর রায়, (লীলারায় নামে) আবুল হাসানাৎ, আবু আহমদ ফজলুল করিম, আবু রুশ্‌দ, আশরাফুজ্জামান খাঁ, আজিজুল হাকিম, আইনুল হক খাঁ, আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ, ডা. এন. জেড. খান, দিদারুল আলম, মহিউদ্দীন, মোহাম্মদ মোদাব্বের, মুহম্মদ আবদুস সালাম, মোহাম্মদ সিদ্দিক খান, সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রশিদ আহমদ, আহসান হাবীব প্রমুখ।

এই সমস্ত লেখার আবেদন নানাভাবে সমাজে এখনও রয়েছে। মুসলমান সমাজের অন্তর্জীবনের গভীর পরিচয় এতে ফুটে উঠেছে। অভিব্যক্ত হয়েছে বাঙালি মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংস্কৃতি-ভাবনার স্বরূপ। বুলবুলের পৃষ্ঠা ছাড়া এর অনেক রচনা ঐকালে প্রকাশের সুযোগ পেতো বলে মনে হয় না।—কারণ তথাকথিত মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের সংকুচিত আদর্শবাদের মাপকাঠিতে সেগুলো ছাড়পত্র পেতো না। পেলেও সম্পাদকের কাঁচিতে লেখকদের মৌলিকসত্তার ঘটানো হত অবসান। লেখকদের নিজের ভাবনা-চিন্তায় বিশ্বস্ত-প্রত্যয়ী থেকে লিখবার উৎসাহ দিয়ে 'বুলবুল'-ই এই সাহিত্য-সম্ভার সৃজন করেছে চলা চলে।

বাংলা সাহিত্যে কম আলোচিত অনেক বিষয়ে বুলবুলের মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী লেখকেরা যুগোপযোগী, প্রগতিবাদী, মনন ও চিন্তাশীল রচনা লিখেছেন অনেক। নারী-স্বাধীনতা বা নারীমুক্তি ; শিশুর শিক্ষা, শিশুর স্বাস্থ্য এসবও বাদ যায়নি। সার্বিকভাবে বাঙালির তথা মুসলিম বাঙালির শিক্ষা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে এতে। 'মুসলমান শিক্ষার ইতিহাস', 'আমাদের শিক্ষা সমস্যা ; 'শিক্ষার কথা' প্রভৃতি রচনায় শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্লেষণ এবং আলোচনা-সমালোচনাসহ পথ নির্দেশনা আছে।

কামাল উদ্দীন এবং শামসুন্নাহার বিবাহ, নারী-পুরুষের সম্বন্ধ এমনকি যৌনবিদ্যা বা যৌনবিজ্ঞান সম্পর্কে যেমন গভীর সৃজনশীল আলোচনা করেছেন, তেমনি সলমা রওশন জাহান (কামাল উদ্দীনের ছদ্মনাম) পর্দা-প্রসঙ্গে বিদগ্ধ আলোচনার অবতারণা করেছেন। শিক্ষা ও বেকার সমস্যার আলোচনাও তিনি করেছেন। শিশুর সেক্স-এডুকেশন সম্পর্কে শামসুন্নাহার বলেন : '...মোটের ওপর যৌনশিক্ষা যখনই আরম্ভ হোক—পিতামাতার সহযোগিতায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে এ-শিক্ষা পরিপূর্ণ হওয়া চাই যৌবনের সীমায় পা দেবার আগেই—যেন সহজভাবে, নির্বিকারচিত্তে বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবে তারা এ-শিক্ষা গ্রহণ করবার অবকাশ পায়।.....'

www.pathagar.com

বুলবুলের সম্পাদিকা আলোচ্য প্রবন্ধের লেখিকা উপসংহারের এই বক্তব্যে পত্রিকার আদর্শও যেন খানিকটা বিবৃত করেছেন : '...যাঁরা এর যুক্তিযুক্ততা অনুভব করতে পারবেন, তাঁদের দেখতে হবে যেন এ-বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট আলোচনা হয়।'[২৩]

'ছাত্ররাজনীতি ও ছাত্রসমাজ'—এই বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ অনেক আলোচনা হয়েছে বুলবুলে। 'আমাদের ছাত্র আন্দোলন' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছেন শামসুর রহমান। মেধাবি ছাত্র ও অধ্যাপক, রাজনীতিক হুমায়ুন কবির ঐ সময়ের বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য সম্মেলন, এবং ছাত্রদের সংগঠন ইত্যাদিতে অনেক ভাষণ দেন, সে-সবও এ-পত্রে গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয় (৩ বর্ষ, ৭ সংখ্যা ও ৪ বর্ষ ৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এসবের সামাজিক ও সাহিত্যিক মূল্য অনেক।

'সাহিত্য প্রসঙ্গে'ও তিনি প্রাজ্ঞ আলোচনা উপস্থিত করেছেন (১/৩)। ডি-এইচ-লরেন্স সম্পর্কে বুলবুলে সুপরিসর প্রবন্ধ লিখেছেন (৩/১)। এদেশে, বাঙলা ভাষায় আলোচনার ক্ষেত্রে হুমায়ুন কবির এ বিষয়ে পথিকৃতদের অন্যতম বিবেচিত হবেন। তিনি ইংলন্ডে লরেন্স-এর সাহিত্য নিয়ে বিতর্কের সমকালে নিজে উপস্থিত থেকে দেখেছেন ; সেসবের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে আধুনিক সাহিত্যের দর্শন বিষয়ে লিখেছেন, বলেছেন, শিখিয়েছেন পর্যাপ্ত। সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখের সঙ্গে হুমায়ুন কবিরও ত্রিশোত্তর আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, নানাভাবে,—বুলবুল ছিল তাঁর এক উপায়।

ম্যাক্সিম গোর্কি, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে নানাজনে মূল্যবান সমালোচনা করেছেন, দীলিপকুমার রায়, হুমায়ুন কবির এঁদের অন্যতম। শরৎচন্দ্র ও কবি ইকবালের মহাপ্রয়াণের পর বুলবুলের বিশেষ সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথের রচনাও ছাপা হয়েছে। ঐকালের সাময়িকপত্রে যা দেখেছি, তাতে গোর্কি, শরৎচন্দ্র ও ইকবাল এবং বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে বুলবুল এর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের আলাদা সাহিত্যিক তাৎপর্য ধরা পড়েছে। কারণ এঁদের একজন হিন্দু, একজন মুসলিম মনীষী, আর একজন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের গণ-সাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যের এই পর্বে নতুন মাত্রা সংযোজনের ক্ষেত্রে বুলবুলের মূল্য তাই ভিন্ন মাত্রায়ও স্বীকৃত হবে। শুধু এ সবই নয়, 'ন্যুডিজম' সম্পর্কেও বুলবুলে (মুজীবুর রহমান খাঁ, ২ বর্ষ, কার্তিক-পৌষ, ১৩৪১) আলোচনা হয়েছে। আর ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের তাৎপর্য বিষয়ে উচ্চাঙ্গের আলোচনা করেছেন বুলবুলের লেখক আচার্য যদুনাথ সরকার। তিনি 'ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন,

> ... ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলিলে ভুল হইবে। ইতিহাস প্রণালীতে বিজ্ঞান হইলেও বাহ্য কলেবরে এবং অন্তরের উদ্দেশ্যে সাহিত্য কলা। এই সত্য না মানিলে মহা ক্ষতি হয়, ঐতিহাসিকের জীবনব্যাপী শ্রম পন্ড হয়। ইতিহাসকে যে আর্য্যগণ ইতিকাব্য নাম দেন, সেটা বিদ্রূপের বিষয় নহে, এই নামের মধ্যে একটি নিগূঢ় মানব-সত্য নিহিত আছে। ব্যক্তি-বিশেষকে ঘিরিয়া কাল্পনিক উপকরণ লইয়া কাব্য রচিত হয়, অথচ ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয় জনসমষ্টির উত্থানপতন, দেশের উপর দশের জননায়কের প্রভাব এবং ইহার উপকরণ সত্য—মানবের চেষ্টায় যতটুকু সত্য খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহাই। কিন্তু যে-আকারে ইতিহাস গ্রন্থটিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহার যে অন্তর্নিহিত যন্ত্রটিকে বাক্যে পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে হইবে, তাহার কথা ভাবিলে ইতিহাস ও কাব্যকে একই শ্রেণীর সাহিত্য বলা উচিত।[২৪]

www.pathagar.com

উর্দু-বাঙলা তর্ক ও প্রমথ চৌধুরী

বুলবুলে সামাজিক সমস্যামূলক চিন্তা চর্চা করেছেন যাঁরা তাঁরা হলেন,—বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কিংবা মুসলমান সমাজের উত্থান ও জাগরণের অন্যতম পুরুষ আনওয়ার উল কাদির, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, কাজী আবদুল ওদুদ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, শামসুন্নাহার, হুমায়ুন কবির, কামালউদ্দীন, সাদত আলী আখন্দ, ইব্রাহীম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ। অন্নদাশংকর রায়, প্রমথ চৌধুরী ও সুশোভন সরকারের আলোকসম্পাতকারী অনেক প্রবন্ধ, আলোচনাও বুলবুলের প্রাণ-সম্পদের পরিচায়ক।

বিষয়-বৈচিত্র্যেও বুলবুল অতুলনীয়। আনোয়ার উল কাদিরের 'শিক্ষিতা নারীর বিবাহ' (১/১) ; 'উর্দু বাংলা তর্ক ও বাঙালী মুসলমান' (১/২) ; এবং 'উর্দু বাংলা ও বাঙালী মুসলমান' (১/৪) শীর্ষক প্রবন্ধত্রয় বাঙালি সমাজের বাঙলাভাষার প্রতি মনোভাবের বিশ্লেষক এবং মুসলমানদের বাঙলা ভাষা ও সাহিতচর্চায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

তাঁর আলোচনার সূত্রে প্রমথ চৌধুরীও বুলবুলের বাঙলা-উর্দু তর্কে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে একটি পত্র লেখেন, তা বুলবুলের প্রথম বর্ষ তৃতীয় সখ্যায় ছাপা হয়। পরে 'উর্দু বনাম বাংলা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লেখেন তাও ঐ সংখ্যায়ই (১/৩) ছাপা হয়। আর একটি 'বীরবলের পত্র' নামে ছাপা হয় দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায়। 'বাঙ্গালা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ' শীর্ষক প্রবন্ধটি ছাপা হয় তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায়। পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় তাঁর আরও একটি পত্র ছাপা হয়। দেখা যায়, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরী বুলবুলের সঙ্গে আন্তরিক সাহিত্যিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী মাঝে-মধ্যেই পত্রে বুলবুলের সমালোচনা করেছেন, বুলবুলে তা ছাপা হয়েছে। এতে পত্রিকা মর্যাদাবান হয়েছে। বুলবুলের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরই এ-পত্রিকা প্রমথ চৌধুরীর নিকট উপহার পাঠানো হয়। উত্তরে প্রমথ চৌধুরী জানান :

> বুলবুলের জন্য কিছু লিখতে আমার একটু সঙ্কোচ হয়। কারণ আমার প্রবন্ধসমূহেরই উদ্দেশ্য না হোক, ফল হচ্ছে emancipation of intellect.কিন্তু আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা এই যে, মানুষ সহজে eamncipated হতে চায় না। ফলে অনেক কাল ধরে আমার স্ব-সম্প্রদায় আমার প্রতি এই দোষারোপ করেছেন যে আমি ধর্মনীতি ও সমাজবিদ্বেষী—সে অপবাদ অবশ্য আমাকে আজকাল আর কেউ দেয় না,—যদিচ বাঙলার হিন্দু ভদ্র সম্প্রদায় তিন পুরুষ ধরে ইংরেজী শিক্ষিত।
>
> সুতরাং আপনার কাগজে কিছু লিখতে হলে অতি সতর্ক হয়ে লিখতে হবে, যাতে সে লেখা কোনও লোকের গায়ে না লাগে।... আমার কলম, আমার বিশ্বাস, এতদিনে সতর্ক হবার বিদ্যে শিখেছে। আমার ইচ্ছে আপনার কাগজে 'উর্দু বনাম বাঙলা'র যে আলোচনা শুরু হয়েছে সেই সম্পর্কে দু'কথা লিখি। উর্দু অবশ্য জানিনে, কিন্তু বাঙলা আমি জানি। সুতরাং এ তর্কে যোগ দেবার আমার... অধিকার আছে। আপনি যদি অনুমতি করেন ত আমি এ লেখায় হাত দিতে পারি।[২৫]

বুলবুলের বাঙলা-উর্দু বা উর্দু-বাঙলা বিতর্কের সূচনা হয় প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত আনোয়ার উল কাদিরের 'উর্দু বাঙলা তর্ক ও বাঙ্গালী মুসলমান' শীর্ষক আলোচনার দ্বারা। এ প্রবন্ধে তিনি বলেন, বাঙালি মুসলমান সমাজ প্রকৃত প্রস্তাবে এই তর্কে লিপ্ত থেকে

www.pathagar.com

না–বাঙলা, না–উর্দু কোনো ভাষারই চর্চা করছেনা 'এবং তার ফলে আমাদের চিন্তাশক্তি ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে।' তিনি বলেন :

> যে জাতির মন ভাব–সম্পদে ভরা, তাদের ভাষা নিয়ে তর্ক উঠ্‌তেই পারে না। ভাষা ভাবের বাহন মাত্র। মনে যখন ভাবের বন্যা আগত হয় তখন কোন্‌ জাতীয় ভাষায় মনের ভাব বেরিয়ে আসবে, সে বিচারের অবসর থাকে না। যদি বাইরে থেকেই আগে ভাগে বিধি নিষেধের বাঁধ বেঁধে দেওয়া হয়, তা হলে ভাবরাজি ভেতরে আট্‌কে থাকে এবং সেখানেই দম বন্ধ হয়ে মারা যায়।
>
> বাঙ্গালী মুসলমানদের যাঁরা পথ–প্রদর্শক, যাঁরা উর্দু ও বাঙলা নিয়ে তর্ক করছেন, তাঁরা কয়েক কোটী মানব–সন্তানের চিন্তাশক্তির বিষয় না-ভেবে শুধু ভাষার বিচারে ব্যস্ত। তাঁরা ভাবের আদান প্রদানই যে ভাষার মূল উদ্দেশ্য একথা ভুলে যাচ্ছেন। তাতে করে অসুবিধে হচ্ছে—কয়েক কোটী মানব সন্তানের হৃদয়ের সুখ–দুঃখ, আশা–আকাঙ্ক্ষার গতিরোধ হচ্ছে। সহজে যে ভাষায়ই হোক তাদের ভাবরাজিকে প্রবাহিত হতে বাধা দেওয়া ভালো কাজ হচ্ছে না।... তাই মনে হয়, যাতে ভেতরে ভাববার শক্তি জাগে, যাতে ভাবের আদান–প্রদানের অসুবিধে না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য থাক্‌লে উর্দু ও বাঙলা নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে না।[২৬]

এই লেখার প্রেক্ষিতে প্রমথ চৌধুরীর যে লেখা পরের সংখ্যায় ছাপা হয়, তাতে তিনি বলেন :

> 'বুলবুলে', উর্দ্দু বনাম বাঙলার যে তর্ক উত্থাপন করা হয়েছে—সে বিষয়ে দুটি কথা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনে, যদিচ আমি জানি যে এ বিষয়ে কথা কওয়া আমার পক্ষে এক হিসেবে অনধিকার চর্চা করা হবে।...এখানে এই কথাটি আমি বলতে চাই যে, বাঙলা ভাষা সম্প্রদায় নিরপেক্ষ বাঙালীর ভাষা।... অবশ্য ধর্মকর্ম পূজাপাঠ সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমানরা পৃথক পৃথক শব্দ ব্যবহার করেন এবং হিন্দু ধর্মের কথা অধিকাংশ সংস্কৃত, আর মুসলমান ধর্মের কথা বোধ হয় অধিকাংশ আরবী। বলাবাহুল্য এসব কথা সংখ্যায় অতি স্বল্প এবং তাদের স্পর্শে বাঙলা ভাষা দুটি বিভিন্ন ভাষা হয়ে যায়নি।[২৭]

প্রমথ চৌধুরী স্পষ্ট করেই বলেন, বাঙলা ভাষা শুধু আমাদের মত শিক্ষিত লোকের ভাষা নয়, দেশশুদ্ধ নিরক্ষর লোকের মুখের ভাষাও। সুতরাং সম্প্রদায় বিশেষের কাছে উর্দু যে বাঙলার স্থান অধিকার করবে, এ আশা করা বৃথা। কোনও দেশের অতীতকে মুখের কথায় উঠিয়ে দেওয়া যায় না। আর অতীতই দেশভাষা গড়েছে।

তিনি বলেন, এ হেন প্রস্তাব যাঁরা করেন, তাদের মনোভাবই ঠিক বোঝা যায় না। প্রথমত উর্দু একটি Classical Language নয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মের ভাষা আরবী ও সাহিত্যের ভাষা ফারসী ; এ উভয় ভাষার উপর মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক, —যেমন গ্রীক ল্যাটিনের উপর ইউরোপীয়দের শ্রদ্ধা আছে এবং সংস্কৃত ভাষার উপর হিন্দুদের শ্রদ্ধা আছে।

কিন্তু উর্দুত ওশ্রেণীর ভাষা নয়। প্রথমত এভাষা অতি প্রাচীন নয়, কেবলমাত্র পুঁথিগত ভাষাও নয় ; কিন্তু বাঙলারই মত একটি প্রাদেশিক প্রচলিত মৌখিক ভাষা।[২৮]

'হিন্দু–মুসলমান' বিতর্ক ও অন্নদাশংকর রায়

উনিশ ও বিশ শতকের সাময়িকপত্রে 'হিন্দু–মুসলমান' সম্পর্কের ওপর অনেক আলোচনা বা তর্ক–বিতর্ক ছাপা হয়েছে, কিন্তু বুলবুলের মত মনীষা–সম্পন্ন বক্তব্য ও বিতর্ক খুব কম

www.pathagar.com

সাময়িকপত্রেই স্থান পেয়েছে। এই বিতর্কগুলোর ওপরই একটি দীর্ঘ আলোচনা বা গবেষণা কর্ম পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু এখানে যেহেতু বুলবুলের পরিচয় ও ভূমিকা কেবল নির্ণয় করা হচ্ছে—সেই হেতু বিতর্কের একটি মানচিত্র আঁকার চেষ্টা করা হলো মাত্র।

প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক যে, আলোচ্যকালে বাঙালি মুসলমান সমাজে জাগরণের সূচনা হয় অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের পরে তুরস্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রে খিলাফত ধারণার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীলতার লক্ষ্যে যে বিপ্লব সাধিত হয়, তার প্রভাবে। হিন্দু সমাজের দেখা দেখি মুসলমান বিদ্বৎ সমাজে যে প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছিলো,—তা ধর্মভীরু অশিক্ষিত মুসলমানের ভারে ন্যুব্জ, উগ্র ধর্মীয় চেতনার প্রতাপে অতীষ্ঠ সমাজের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারছিলো না।

কিন্তু এই সময়ে, বিশেষত ১৯২৬ সনের ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাংগার পরবর্তী সময়ে শিক্ষিত প্রগতিশীল সমাজকর্মী ও লেখক-সাহিত্যিকদের সামনে প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে সংঘটিত প্রগতিশীল আন্দোলনের নমুনাসমূহ অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিল। তাঁরা মুসলিম রাষ্ট্রনেতা, নেত্রী ও লেখকশিল্পীদের চিন্তা ও কর্মের সচিত্র প্রতিবেদন ছেপে বাঙালি মুসলমানদেরকে পরোক্ষভাবে সংস্কৃত, সংশোধিত ও নবজীবনে অবগাহনের আহ্বান জানাতে পেরেছিলেন। তবে পুরাতন, প্রতিক্রিয়াশীল মহলের বিরোধিতা তখনও প্রবল ছিল, কোথাও কোথাও তা চরম রূপও নিয়েছিল (ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের মনীষী আবুল হুসেনকে দৈহিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করার এবং ক্ষমা প্রার্থনার ঘটনা স্মর্তব্য), কিন্তু ক্রমান্বয়ে সে-ধারার সমান্তরালে প্রগতিশীলতার ধারা উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। অন্তত ঐকালের মুসলিম-সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে প্রগতিশীল ধারার জোটবদ্ধ সংগ্রাম ও সাধনা দেখে তাই-ই মনে হয়। (আমাদের দেশে সকল লেখাই সাহস করে ছাপা যায়, এমন পরিস্থিতি কোনও কালেই ছিল না, হয়নি-সেকথা মনে রেখেই বলছি। এ-প্রসঙ্গে হাসান হাফিজুর রহমানের আলোকিত গহ্বর শীর্ষক বইয়ের এতদসংক্রান্ত আলোচনাও দ্রষ্টব্য।)

যদিও পাকিস্তান সৃষ্টির পরে, পাকিস্তান আমলে কেউ কেউ ও চল্লিশের দশকের মুসলিম মানবতাবাদী, প্রগতিশীলদের ধারা ক্ষীণ, দুর্বল হয়ে যায় বলে উল্লেখ করে থাকেন, তথাপি আমার মনে হয় সে-ধারণা ঠিক নয়। কারণ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা অসাম্প্রদায়িক, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিক ছিলেন—তাঁরা উভয়েই হিন্দু-মুসলমানের পৃথক আভাসভূমি গঠনের পক্ষেই ও সময়ে কাজ করেছেন। বিষয়টি সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিবেচ্য। দুচারজনের ব্যতিক্রমী সাধারণ আবেদন নিবেদনের ঘটনাকে বেশি গুরুত্ব দিলে ইতিহাস বিচারে ভুল হয়।

যাহোক, বুলবুলে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের অনুরাগী জাগরণপন্থী প্রগতিশীল মুসলমান সাহিত্যিকদের কথা বলার মুক্তমঞ্চ তৈরি হয়েছিল—এটাই বড় ঘটনা। ঐকালের সকল প্রধান ঘটনার, চিন্তাধারার এবং বিতর্কের দলিল বুলবুল। দুটো ধারার সমন্বয় কেউ করতে চাননি বলে অন্নদাশংকর রায় এই পত্রিকায় তাঁর মুক্তবুদ্ধির আলোকে ঝলমল অসাম্প্রদায়িক যুক্তিবাদী বিতর্কসমূহ নিঃসঙ্কোচে পাঠিয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য মনস্বী অন্নদাশংকর রায়ও বুলবুলের উদ্যোক্তাদের মনের কাছের মানুষটি ছিলেন। প্রথম সংখ্যা থেকেই বুলবুলের সঙ্গে তাঁরও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বুলবুলের

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলমান বিতর্কের পরিচয় লাভের প্রাক্কালে তাঁর এই উক্তি (পত্র)টি উল্লেখ্য : তিনি লিখেছেন :

> বুলবুল আমি যথাসময়ে পেয়েছি, পড়েছি ও চমৎকৃত হয়েছি। প্রায় প্রবন্ধেই অসাধারণ সংযম রক্ষিত হয়েছে এবং মনীষা প্রকট হয়েছে অধিকাংশ প্রবন্ধে। বন্ধুমণ্ডলে আমি এই পত্রিকাখানির প্রচুর প্রশংসা করেছি। প্রথম সংখ্যার লেখক লেখিকারা সকলে মুসলমান সম্প্রদায়ের। সেইজন্যে আমার ধারণা ছিল যে মুসলমান সম্প্রদায় এই পত্রিকার দ্বারা আপনার বিশিষ্ট বাণী নিবেদন করবে। বিদগ্ধ মুসলমানের চিত্ত কোথাও এমন করে স্ফূর্ত হতে দেখিনি। 'এই পত্রিকাখানি সম্পূর্ণ আমাদের'—একথা মনে করলে যে স্ফূর্তি সেই স্ফূর্তি—বুলবুলের প্রথম সংখ্যায় লেখক লেখিকাকে প্রবুদ্ধ করেছিল বলে অনুমান হয়। বুলবুলে হিন্দুর রচনা থাকলে ঐ স্ফূর্তি অন্তর্নিহিত হবে কিনা চিন্তা করবেন।[২৮]

অন্নদাশংকর রায় ঐ পত্রে আরও বলেন : তবে এমন একটি পত্রিকার প্রয়োজন আছে যাতে হিন্দু-মুসলমান প্রাণ খুলে আলাপ করতে পারলে আজকের দিনের অন্ধকার বহু পরিমাণে অপসৃত হতো। আলেয়ার পিছনে ছুটোছুটি করা যাদের পেশা তারা তাই করুক। কিন্তু তপস্যা যাঁদের আলোকের তাঁরা কেন পরস্পরের প্রতি অভিমান পোষণ করে অন্ধের সঙ্গে অন্ধ হবেন? 'বুলবুল' যদি মিলনদূত হয়ে শান্তির বার্তা শোনায় তবে দেশের এই বেদনার্ত মুহূর্তে তার আবির্ভাব ইতিহাসের অন্তর্গত হবে।[৩০]

অন্নদাশংকর রায়ের মূল্যায়নে একটি নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে, তাহলো : হিন্দুর পত্রিকা হিন্দুর রচনায় বেরুবে, আর মুসলমানের পত্রিকা মুসলমানের রচনায় ভরে থাকবে—এমনই রীতি চলে আসছিলো সাময়িকপত্রে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান উভয়েই 'অকপটে' 'প্রাণখুলে আলাপ করতে' পারার মত পত্রিকা হিন্দু-মুসলমান কেউ-ই প্রকাশ করতে চাননি—অথচ তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রত্যাশা করেছেন!

বুলবুলের হিন্দু-মুসলমান বিতর্কপঞ্জিতে দেখা যায় অন্নদাশংকর রায় প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যার পর, চারটি রচনা লেখেন যথাক্রমে 'হিন্দু-মুসলমান : পশ্চাৎদৃষ্টি'; 'হিন্দু-মুসলমান : বহির্দৃষ্টি'; হিন্দু-মুসলমান : সম্যগ দৃষ্টি' এবং 'হিন্দু-মুসলমান : সমাজের গঠন' শিরোনামে।

এগুলো ছাপা হয়েছে প্রথম বর্ষের তৃতীয় (পৌষ-চৈত্র ১৩৪০) ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় (বৈশাখ-পৌষ, ১৩৪১) সংখ্যায়। তাছাড়া তৃতীয় বর্ষ ১০ম সংখ্যায় (মাঘ, ১৩৪৩) তাঁর 'ভারতীয় মুসলমান' শীর্ষক রচনাটি ছাপা হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য : যা 'অবাঞ্ছিত ব্যবধান' নামে ছাপা হয়, সেই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অন্নদাশংকরও অনেকের মতো আলোচনায় অংশ নিয়ে বিতর্ককে ঘণীভূত এবং মনীষাসমৃদ্ধ করেছিলেন। মীজানুর রহমান, কাদের নওয়াজ, ইব্রাহীম খাঁ, কাজী আবদুল ওদুদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ সেই বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক রচনার উত্তর-প্রত্যুত্তরেও একটি বিতর্ক সংঘটিত হয়। এতেও অন্নদাশংকর রায়, সৈয়দ এমদাদ আলী, সলমা রওশন জাহান, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ অংশ নিয়ে দীর্ঘদিন বিতর্কটিকে প্রাণবন্ত, চলিষ্ণু রাখেন।

হিন্দু-মুসলমান ও ভারতের জাতিগঠন সমস্যার ওপর ছোটো বড়ো প্রায় ৩৫টি নিবন্ধ-প্রবন্ধ ও পত্র প্রকাশিত হয়। এই আলোচনার ঐতিহাসিক মূল্য এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

www.pathagar.com

মোহিতলাল মজুমদারও 'ধর্ম ও সমাজ' সম্পর্কে চিঠিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক একটি আলোচনাও এতে ছাপা হয়। এইসব আলোচনার বিস্তৃত পরিচয় দিতে হলে পরিসর অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যায়।

কাজী আবদুল ওদুদ রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' বিষয়ে তিনটি বক্তৃতা করেন (১৯৩৫), তাও বুলবুলে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন নিয়ে ছাপা হয়েছিল। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ এ বিষয়ে, এবং 'ধর্ম সম্বন্ধে' অনেক দীর্ঘ ও গভীর আলোচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে এইরূপ মনীষাসম্পন্ন আলোচনা ইতোপূর্বে ছিল না।

শ্রী অন্নদাশংকর রায়ের 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক আলোচনাগুলোর সারমর্ম অনুধাবন করলে এর একটি ধারণা পাওয়া যায়। তিনি 'পশ্চাৎদৃষ্টি' শিরোনামের প্রথম আলোচনায় আর্যদের আগমন থেকে মুসলমান আগমন পর্যন্ত বিভিন্ন জাতি বা ধর্মের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্কীয় দ্বন্দ্ব ও মিলন-বিরোধের পরিচয় দেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের সমাজ-কাঠামো কোনো বিজেতাই বদলাতে চাননি, রামানুজও নন। যে তরুণ শক্তি দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে,—রামানুজের সময়ে তারাও সন্ন্যাসী হলো। ফলে গৃহীদের মধ্যেও জন্মালো একটা হীনমন্যতাবোধ। এই হীনমন্যতাবোধের সুযোগে অনায়াসে মুসলমানেরা এদেশের রাজা হয়ে বসেন।

তিনি বলেন, মুসলমানেরা যদি কেবল দেশের মাটি দখল করতেন তবে একদিন তাঁরা শক হুনদের মতো ক্ষত্রিয় হয়ে যেতেন। মাটি নিয়েই তাঁদের সাধ মিটত। কিন্তু দেশের চিত্তের ওপর তাঁদের আগমনের সাড়া পড়ল। এই সাড়ার ফল হলো দুটি—মুসলমান হবার ফলে তাঁদের হীনমন্যতা দূর হয়ে (সবাই সমান, বা আমিও উন্নত) 'বনস্পতি-মনোভাব' হয়ে দাঁড়ালো।

ঐ আলোচনার উপসংহারে তিনি বলেন, 'মুসলমানের সঙ্গে ভারতীয় সাধনার বন্ধুতা ত সহজেই হলো, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধ মিটল না, আজো মেটেনি।'[৩১]

দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি দেখান যে, ইংরাজ, পার্সী প্রভৃতির জাতীয় বৈশিষ্ট্য কিরূপ। বহু ফরাসী, ওলন্দাজ, জার্মান, রাশিয়ান রক্তের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ইংরেজ হয়ে গেছে। রক্তের মিশ্রণকে ইংরাজ ক্ষতিকর মনে করেনি। তারা ধর্মবিশ্বাসের ঐক্যও দাবি করে না। কেউ মুসলমান হলেও তার জাত যায় না। ইংরাজ ও অন্-ইংরাজে প্রভেদ ধর্মগত নয়, রক্তগত। ইংলন্ডের স্বকীয় ট্রাডিশনকে আপনার করলে আপনাকে সেই ট্রাডিশনের বাহক করলে, ইংরাজের মত ভাবলে, ইংলন্ডের স্বার্থকে প্রথমে স্থান দিলে পার্সী বা ইহুদী থেকেও ইংরাজ হওয়া যায়। কিন্তু এর সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করলে দেখা যায় ভারতবর্ষের কোনো জাতিরই আদিম সত্তা অপরিবর্তিত নেই, তবু 'আমরা হিন্দুরা ভারতবর্ষের সমগ্র ঐতিহ্যকে দাবী করে থাকি।... আমাদের হিন্দুদের প্রধান গর্ব এই যে, আমরা তেমন একটা জাতি। আমাদের কৌলিন্য অবশ্য ঝুঁটা। রক্তের বিশুদ্ধি কাল্পনিক। একদিন আমাদের ভ্রান্তি ছিল যে আমরা অমুক অমুক ঋষির গোত্র।

www.pathagar.com

লেখক বলেন : 'একই দেশে একাধিক ঐতিহ্য সম্ভব নয়। একদিন না একদিন সবাইকে মূল স্রোতে ভাসতে হবে।' তৎকালীন হিন্দুত্ববাদীদের নতুন প্রচারণা সম্বন্ধে তিনি রসাত্মক আক্রমণ করেন : "তবে কারুর কারুর নূতন ধারণা, হিন্দুর হিন্দুত্ব তার ধর্মবিশ্বাসে।...সেই সংজ্ঞা যদি কোন জাপানী বা আমেরিকান গ্রহণ করে, তবে সেও নাকি হবে হিন্দু ! তার মানে হিন্দুত্ব ভারতবর্ষের বাইরে টিকতে পারে।' তিনি বলেন, নবমতবাদীরা ভুলে যান যে, 'হিন্দুরা' বা 'আর্যসমাজীরা' তাদের জাতীয় প্রকৃতি বদলাতে পারে না। এবং জাতীয় প্রকৃতি যদি বেঁচে থাকে, তবে একদিনে ধর্মের ভেক বদলানো কাপড় ছাড়ার মতই সোজা। দেশের মূল স্রোত হলো, ঐতিহ্য। প্রত্যেক দেশেরই স্বকীয় ঐতিহ্য আছে। কেউ তা রাখতে পেরেছে, কেউ পারেনি। ভারতের ঐতিহ্য কি—তার সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা বৃথা। কোন জীবন্ত জাত নিজেদের সংজ্ঞা দেয় না। মরণের সংজ্ঞা আছে, জীবনের নেই। আমরা বহমান, আমরা বিদ্যমান।... পৌর্বাপর্য্য রক্ষা করে হিন্দুসমাজও বারবার সংস্কৃত হয়েছে। প্রত্যেক জীবন্ত সমাজের রীতি এই।'

মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের মুসলমানদেরকে ইংলন্ডের ইহুদীদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তাঁরাও এঁদের স্বাতন্ত্র্য রাখতে চান। এঁরাও ঠিক ওঁদেরই মত আত্মপরিচয় দেবার সময় এক জোড়া কথা বলেন,—'ব্রিটিশ ইহুদী', 'ভারতীয় মুসলমান'। ইদানীং দেখা যাচ্ছে 'বাংলা মুসলিম কথাসাহিত্য' ; 'ইহুদী ছোট গল্পের' বই বেরিয়েছে ইত্যাদি।[৩২]

মুসলমানের পশ্চাৎদৃষ্টি বলতে তিনি বোঝাতে চান এদেশের হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েই তারা বাইরের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ঐতিহ্যগুলোকে নিজের মনে করে, আর হিন্দুদের কীর্তি ঐতিহ্যকে পর মনে করে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েই বলবেন যে, মুহম্মদের পূর্বে ও পরে আরব পারসিক... ইত্যাদিদের যেখানে যত কীর্তি আছে, সব আমার আপন লোকের। আর ঐ যে কোনারকের সূর্য্যমন্দির, ওটা হচ্ছে আমার হিন্দু ভাইদের।... ধরা যাক কোন নিম্ন বর্ণের হিন্দুর পরিবর্তে হরিহর মুখুজ্যে নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তিনিও কি বলবেন যে আশুতোষ মুখুজ্যের কীর্ত্তি, আমার হিন্দু ভাইদের কীর্তি আর আমাদের কীর্তি কামাল পাশার জয়?

> এই যে বহির্দৃষ্টি, আর ঐ যে পশ্চাৎদৃষ্টি—এতেই হিন্দু-মুসলমানকে মিলতে দিচ্ছে না। দেবে কিনা, তাই আমাদের ভাবনা। হিন্দুর পশ্চাৎদৃষ্টি না থাকলে তার কিছুই থাকে না। যার পশ্চাৎদৃষ্টি নেই, তার ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টিও নেই। সে মুহূর্ত্তজীবী। হিন্দুর পশ্চাদ্‌দৃষ্টি গেলে ভারতবর্ষ হয় একটা ভৌগোলিক আখ্যা।...আর মুসলমানের বহির্দৃষ্টি না থাকলে ইসলামের মূল আদর্শ ক্ষুণ্ন হয় হয়ত।

মুসলমানের ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে আর একটি জিনিস আছে। মুসলমান বিশ্বাস করেন যে, সব মানুষ মিলে এক জাতি। এদের সবাইকে একটি ভাষা, একটি ধর্মগ্রন্থ, এক আইন, একই আচার ইত্যাদির দ্বারা একাকার করা ইসলামের উদ্দেশ্য। এদেশের ইতিহাসেও দেখা যায়, ধর্মনেতারা সে চেষ্টাই করেছেন। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীকে একচ্ছত্রাধীন করার স্বপ্ন ইসলামের ইতিহাসের তিন চারশত বছরের মধ্যে ভেস্তে গিয়েছিল। তারপর কেবল সংখ্যা বৃদ্ধিই হয়েছে—তা সে বিবাহের দ্বারা হোক বা দীক্ষার দ্বারাই হোক।

www.pathagar.com

...কোন মুসলমান কি বাস্তবিক আর ভাবেন যে সব মানুষ এক জাতি? বা সবাইকে এক ধর্মে, এক সমাজে বাঁধতে পারা কি সম্ভব?... কিন্তু এখনো অসংখ্য মুসলমান আছেন, যারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী দেশগুলিকে ভাই ভাই রূপে দেখবার আশা রাখেন, পরিকল্পনাও করেন। কামাল পাশা খেলাফৎ তুলে দেবার পর এঁদের অনেকে অখন্ড মুসলমান সম্প্রদায় বা প্যান ইসলাম ছেড়ে তার জায়গায় স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলির ঘরোয়া উন্নতিতে মন দিয়েছেন—কামালের অনুকরণে। ঐক্যের বদলে প্রগতি হচ্ছে লক্ষ্য।

যেটিই লক্ষ্য হোক, এখনো একথা সমান সত্য যে মরক্কো থেকে কেনিয়া পর্যন্ত যেখানে যত মুসলমান আছে, তাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে যে-নীতিই অবলম্বন করুন না কেন, তাঁরা অপরের প্রতি সেই একই মনোভাব পোষণ করেন। পোকা ঘুড়ার ধারণা, ইবন সাউদ তাঁর সোদর ভাই, আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রাম সম্পর্কে ভাই। ইংলন্ডের ইহুদীরও ঠিক এই মনোভাব। তা সত্ত্বেও ইংলন্ড পরাক্রান্ত। মুসলমানকে নিয়ে আমরাও পরাক্রান্ত হবার আশা রাখি। নিরাশার হেতু নেই। তবে পরাক্রান্ত হওয়া এক কথা। সুসমঞ্জস্য হওয়া অন্য। তা কি সম্ভব?[৩৩]

অন্নদাশংকর রায় 'সম্যগ্ দৃষ্টি'তে ভারতীয় খ্রীষ্টানদের মননধারার পরিচয় দেন। তিনি বলেন, ভারতীয় খ্রীষ্টানরা এদেশে প্রথম শতাব্দী থেকেই আছেন এবং তাঁরা নিজেদেরকে ভারতীয় বলে ভাবেন। ইউরোপীয়দের মত তাঁরা কেবলমাত্র ধর্মবিশ্বাসে খ্রীষ্টান। ভারতের হিন্দুদের সম্পর্কে তিনি বলেন, খ্রীষ্টানরা যেমন প্রথম শতাব্দীতে মালাবারে আসেন সীরিয়া থেকে, তেমনি আরব, পারসিকরাও এদেশে বাণিজ্য ও যুদ্ধ ইত্যাদি উদ্দেশে এ দেশে এসে বসবাস করে ভারতবার্ষীয় হয়ে গেছেন। 'আমরা হিন্দুরা এঁদেরও বংশধর।'

আরব, আফগান, তুর্কীস্থানী ও মুঘলদের সাম্রাজ্য স্থাপনের ঐতিহাসিক সূত্রে তিনি বলেন, ছয়—সাত শ বছরের মুসলমান রাজত্বে বিদেশী রক্ত যা এসেছে তাকে তার আগের দুই-তিন হাজার বছর ধরে আসা বিদেশী রক্তের চেয়ে বেশী বলবার কারণ নেই। সংস্কৃতি যা এসেছে তার সম্বন্ধেও সেই কথা। কত আরব পারসিক গ্রীক গ্রীকবংশীয় শক কুশান হুন্ তিব্বতী চীনা মগ আর্য দ্রাবিড় আদিম রইল একদিকে, অন্যদিকে দাঁড়াল আফগান তুর্কীস্থান আরব পারসিক ও তাদের দ্বারা ইসলামে দীক্ষিত পূর্বোক্ত বংশীয়রা। দুই পক্ষের নাম হয়েছে 'হিন্দু' ও 'মুসলমান'। এই নামকরণও কৃত্রিম। কারণ আরবী ভাষায় হিন্দু শব্দের অর্থ ভারতীয়। এদেশের মুসলমান—উভয় পক্ষই ভারতীয়। তিনি প্রশ্ন করেন, আরবী ভাষায় যেহেতু ভারতীয় হচ্ছে হিন্দু আর তাঁরা যখন হজ করতে গিয়ে নিজেদেরকে ভারতীয় বলেন, তখন কি তাঁরা প্রকারান্তরে নিজেদেরকে হিন্দু বলেই পরিচয় দেন না?

তাহলে আমরা যাকে হিন্দু মুসলমান সমস্যা বলছি সেটা মুসলমান-অমুসলমান সমস্যা। মুসলমান বলতে যদি কেবল ধর্ম সম্প্রদায় বোঝাত, তাহলে এ সমস্যা নিবদ্ধ থাকত ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে; আর তাহলে এ সমস্যা তেমন প্রকট হত না। আর ভারত যদি স্বাধীন দেশ হত তাহলেও এর মধ্যে রাজনীতি থাকত না। "কিন্তু স্বরাজের সাধনায় একে আবশ্যক বিবেচনা করায় এ হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ভাগ-বাটোয়ারার বিতন্ডা। তার ছোঁয়াচ লেগে জীবনের অন্যান্য অঙ্গ চুলকাচ্ছে; যেন সে একটা বিছুটির ডাল।

সাহিত্যেও স্বাতন্ত্র্যের দাবী নানা বিকৃতি ঘটাচ্ছে। শিক্ষাতে ত তার বীভৎস আকৃতি। মাদ্রাসা মক্তবের কথা নাই ধরলুম, ইংরাজি বিদ্যালয়েও নামাজের সুবিধার জন্য আলাদা ক্লাস,

www.pathagar.com

খাওয়া ও থাকার বন্দোবস্ত ছেড়ে খেলার বন্দোবস্তও আলাদা। মুসলিম টীম নাহলে মুসলমান খেলবেন না। পাঠ্য পুস্তকের বাংলা ভাষা নিয়েও তাই বিতর্ক অস্বাভাবিক নয়।

উপসংহারে লেখকের মন্তব্য : হিন্দু ও মুসলমানের মিলন হবে, কিন্তু সে সময় এখনও আসেনি। তাঁর এই সদর্থক (positivist) দৃষ্টিভঙ্গি বিরোধের মধ্যেও মিলনের প্রত্যাশী হয়ে হিন্দু-মুসলমানকে একত্রে বসবাস করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

> মহেঞ্জোদারোর যুগ থেকে বেদের যুগ এক হাজার বছর, বেদ থেকে বুদ্ধদেব এক হাজার, বুদ্ধ থেকে কালিদাস এক হাজার বছর, কালিদাস থেকে আকবর এক হাজার। আকবরের যুগ থেকে এখনো এক হাজার বছর হয়নি, যখন হবে তখন অর্থাৎ সাতশ বছর পরে ভারতের সামাজিক বিভেদ থাকবে না বলে আশা করা যাক। তার আগে যদি হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান পার্সী প্রভৃতির মিলন সম্ভব হয় তবে তা হবে একটি মাত্র উপায়ে, ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারত সন্তানের চিত্তে ভারতের ঐতিহ্যের ও ভারতের ভবিষ্যতের প্রতি মমতার সঞ্চারে। এর জন্য ঐক্যের প্রয়োজন নেই, এরই থেকে ঐক্য একদিন আসবে।[৩৪]

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং ভারতে জাতি গঠন সমস্যা সম্পর্কে বুলবুলে বিভিন্ন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয় বর্ষে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর লেখা নিয়ে যে বিতর্কের সূচনা হয়, দেশের খ্যাতনামা অনেকেই তাতে যোগ দিয়েছিলেন। চতুর্থ বর্ষে (কার্তিক ১৩৪৪, পৃ ৪৮৪-৮৬) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'ভারতে এক জাতি গঠন' শীর্ষক প্রবন্ধে দেশের আর একটি জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

সম্পাদক নোট দিয়ে বলেন, এই লেখাটির ওপরও পাঠকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। জাতি গঠন, মুসলমানদের ভারতীয় নাম গ্রহণ, জাতীয় উৎসব, জাতীয় পোষাক, ভাষা ও লিপি সমস্যা—এসব নিয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আলোচনা করেন। কিন্তু ঐ কালের পূর্বে ও পরে সাময়িকপত্রে এসব বিষয়ে খুব বেশী আলোচনা হয়েছে বলে দেখা যায়নি। ড. শহীদুল্লাহ একাই পাকিস্তান আমলে দুএকবার এবিষয়ে কথা বলেছিলেন কিন্তু সেসব তেমন আলোচিত হয়নি। বুলবুলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন :[৩৫] 'যখন দুইটি জাতি বর্ণমদে মাতিয়া উঠে, তখন শান্তির মধুর বাণী তাহাদের অনিচ্ছুক কানে ঠাঁই পায় না। আজিকার দিনে আমার কথায় কান দেবেন কিনা জানি না।'[৩৬]

এই কথা যে কালে উচ্চারিত হয়--সেইকালের মিলন প্রত্যাশী বাঙালি মুসলমানেরা নানাভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান চেয়েছেন, ছাত্রদের সভামঞ্চে বক্তৃতা করে বলতে চেষ্টা করা হয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতার হীনতা থেকে বাঙালির মুক্তি আবশ্যক ; আক্ষেপ করে বলবুলের লেখক বলেন :

> ...বাংলাদেশে আজ যে ছাত্র-সম্মিলনের পরে ছাত্র-সম্মিলন, তার মধ্যে আজি বুদ্ধির এই বিজয়াভিযানের ইশারা খুঁজে বেড়াই—দেখতে চাই যে বাংলার বিক্ষুব্ধ নবজাগ্রত যৌবন আজ কোন কিছুই অন্ধভাবে মেনে নিচ্ছে না—বারে বারে তার কণ্ঠে এক প্রশ্ন, বারে বারে তার একই জিজ্ঞাসা—মুক্তির পথ কোথায়? আমাদের মনের যে যৌবন আজ জেগেছে, তারই আলোড়নে বাংলার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত এ ছাত্র আন্দোলন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, আমাদের বুদ্ধির বিজয়-অভিযান কি জীবনের সমগ্র দিককে আজও স্পর্শ করেছে? সমাজ, শাসনতন্ত্র, শিক্ষা, ধর্ম এবং মানুষের বিভিন্ন অধিকারের কথা কি আমরা

www.pathagar.com

যৌবনের উদার নির্মল দৃষ্টি দিয়ে দেখি? রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের কাম্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য—মানুষের সঙ্গে মানুষের সাম্যকে অস্বীকার করে কি স্বাধীনতার সৌধ গড়া যায়? জাতিভেদ আজও যে সমাজব্যবস্থার অঙ্গ, পর্দা প্রথার আজও যেদেশে প্রচলন, সে দেশের যৌবনকে কি আমরা পূর্ণভাবে জাগ্রত বলতে পারি?

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে আজ সাম্প্রদায়িক সমস্যা দিন দিন উগ্রতর হয়ে উঠ্ছে—কিন্তু রাজনৈতিক এবং সামাজিক বুদ্ধিহীনতার এতবড় নিদর্শন কি অন্য কোন দেশে আছে? আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা মানুষের নিম্নতম অধিকারের সমস্যা। স্বাধীনতার দাবী যেখানে মেটে না, ক্ষুধার যে দেশে অন্ন জোটে না, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে পদে পদে অপমানিত, সে দেশে কি সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে সবচেয়ে বড় করে দেখা যুক্তিসগত ? বুদ্ধির মুক্ত আলোকে যদি আমরা এ সমস্যার বিচার করি, তবে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে, আমাদের স্বাধীনতার আদর্শকে চাপা দেওয়ার জন্যই আজ এ সমস্যাকে এত বড় করে সাজানো হচ্ছে।[৩৭]

যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করবেন, পাঠ করবেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করবেন—তাঁদের সাম্প্রদায়িক হীনতামুক্ত যুক্তিবাদী মননশীল মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে তৈরি করা, তথা সুন্দর সুষম মানবিক সমাজগঠনের ক্ষেত্রে বুলবুল যে কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল—তা এর পৃষ্ঠা উল্টালেই প্রতীয়মান হয়।

ঐকালে দুই পক্ষই সাহিত্যের নামে, সাহিত্যের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে হানাহানির পটভূমি তৈরি করেছিলেন। বুলবুল এর সম্পাদকীয় বিভাগে ('কলস্রোতা' নামে) সেসবের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তথা আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সে কংগ্রেস ও মুসলমান সমাজের সম্পর্ক বা মুসলিম লীগের কার্যাবলিই হোক অথবা 'বন্দেমাতরম' ও 'শ্রী ও পদ্ম' বিতর্ক কিংবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট পাঠ্য বিষয় নিয়েই হোক–অথবা হিন্দু মুসলমান যে কোন সম্প্রদায়ের পণ্ডিত, সাহিত্যিক বা রাজনীতিকের পক্ষপাতদুষ্ট, অদূরদর্শী অথবা তাৎক্ষণিকতা তাড়িত অসচেতন উক্তির কুফল সম্পর্কেই হোক—বুলবুল নিঃসঙ্কোচে পাল্টা বক্তব্য উপস্থাপন করেছে।

এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কে মুসলমান সমাজের বিকাশ ঘটেছে। বুলবুল মুসলমান সম্পাদিত পত্রপত্রিকাগুলোতে এবং পাশাপাশি প্রচলিত হিন্দু সমাজের সাহিত্য পত্রিকায় যাতে অসম–ভাবনা–ভাবিত রচনা প্রকাশিত না হয় এবং দেশের মুক্তি আন্দোলন যাতে বিলম্বিত ক্ষতিগ্রস্ত না–হয়, সে ব্যাপারে প্রহরা–প্রটেকশন দিয়েছে। এতদিনে সাহিত্যজগতে উপযুক্ত প্রতিপক্ষ তৈরি হওয়ায় বাংলা সাহিত্য যে—নতুন পথ নিয়েছিল বা পেয়েছিল—তাতে কোন সন্দেহ নেই। লেখক সমাজকে সচতন হতে শিখিয়েছে এই বিতর্ক ও প্রতিবাদ।

মহা–বিদ্বিষ্ট দুই সম্প্রদায়ের হানাহানি মেটাতে মধ্যপন্থার যুক্তিবাদী মুক্তবুদ্ধির সাধক মনীষীদের আবির্ভাবও ত্বরান্বিত হয়েছে বুলবুলে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাঙলায় যুক্তিবাদী জাগরণপন্থী মানবতাবাদী ধারার সাহিত্য সৃষ্টিতে বুলবুল তৎকালে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল—একালে বসে সে কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. বুলবুল উপহার পেয়ে পড়ে শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৩৩ সনের ৭ নভেম্বর পত্রিকার ঠিকানায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পত্র পাঠান—তার প্রথম খসড়ায় শামসুন্নাহারকে 'শ্রদ্ধাস্পদাষু' বলে সম্বোধন করেন। তবে প্রেরিত পত্রে 'কল্যাণীয়াসু' লেখা হয়। প্রথম খসড়ার পত্রটি রবীন্দ্র-ভবনের মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। 'রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে ভুঁইয়া ইকবাল পত্রটির প্রতিলিপি পুরো উদ্ধৃত করেছেন। তবে বুলবুলের প্রথম বর্ষ তৃতীয় (পৌষ-চৈত্র, ১৩৪০) সংখ্যা ও তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৪৩) পুরো ও অংশত এই চিঠি ছাপা হয়। ১৩৯১ সনের 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা'য় এটি ছাপা হয় 'রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ চিঠি' নামে। সূত্র : রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র, ভুঁইয়া ইকবাল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৪৮।

২ আহমদ শরীফ, 'হবীবুল্লাহ বাহার স্মরণে', জীবনে সমাজে সাহিত্যে (২য় সংস্করণ), ঢাকা ১৯৭৪, পৃ. ১৮২-৮৫।

৩. উপরিউক্ত।

৪. আবু জাফর শামসুদ্দীন, হবীবুল্লাহ্ বাহার, বাংলা একাডেমী, ঢাকার (১৯৮৭) জীবনীগ্রন্থে (পৃ. ২৭, ৩৩) ওয়াজেদ আলীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

৫. সুকুমার বিশ্বাস, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৪ সংখ্যায় 'সাময়িকী বুলবুল : ভিন্ন মত' শীর্ষক প্রবন্ধে ওয়াজেদ আলী সম্পর্কে অনুরূপ বলেছেন। তবে তিনি কবি নজরুলের ছেলের নামে পত্রিকার নামকরণের বিষয়ে যুক্তি দিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। (১২৫-২৯)।

শামসুল হক 'পরিক্রম' পত্রিকায় (৪ বর্ষ, ৯-১১ সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ ২২-২৬) 'হবীবুল্লাহ্ বাহার ও বুলবুল পত্রিকা' শীর্ষক রচনায় এটিকে পাকিস্তানবাদী পত্রিকারূপে চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের পুত্রের নামের সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজতে চেয়েছেন। তবে 'বুলবুল' নজরুলের প্রিয়তম পত্রিকা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বুলবুলের প্রীতিসম্মিলনী' (১৩৪১) এবং চতুর্থ বর্ষের সূচনা উপলক্ষে ব্যক্ত প্রতিক্রিয়ায় সেসব অকপটে ব্যক্ত হয়েছে। নজরুলের যে রচনাটির জন্য কবির সঙ্গে বুলবুলের সম্পর্ক খোঁজা হয়, তাহলো :

'বুলবুলের চতুর্থ বার্ষিক জন্মোৎসব এল। বাঙলাদেশে সাপ্তাহিক মাসিক সবরকম পত্রেরই পরমায়ু বৃক্ষপত্রেরই মত খুব জোর এক বৎসর। এদেশের সাহিত্যপত্রিকার মৃত্যুর হার বাঙালী শিশুর চেয়েও অধিক। 'বুলবুল' এখন শুধু যে চলছে তা নয় তার মুখে বাণীও ফুটেছে—আর সে বাণী আধো-আধো নয়। তার চলায় ভাষায় কোথাও আর জড়তা নেই। আজ তার এই জন্মোৎসবে আমার লেখা কবচ তাবিজের প্রয়োজন ছিল না, তবু,... 'বুলবুল' এর সাথে আমার স্বর্গত প্রিয়তম আত্মজের স্মৃতি বিজড়িত। এই বুলবুলিস্তানের গুল্‌-বনে আমার এমন কোনো দান নেই, যাতে এর একটা কুসুম বিকাশেরও সহায়তা করেছে, তবু ওর নামের জন্যই ওর ওপর আমার হৃদয়ের টান নিত্য জোয়ারের মত। "বুলবুল" সাহিত্যে শিল্পে তাজা-বতাজার গান শুনিয়েছে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মন্ত্র-সঙ্গীত গেয়েছে। তার কণ্ঠে আরো বহু বৎসর এই মিলনের গান, আনন্দের সুর ঝংকৃত হোক, 'বুলবুল' শতায়ু হোক, এই প্রার্থনা।' (নজরুল ইসলাম, বর্ষারম্ভে, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৪, পৃ. ১-২)।

৬. 'বুলবুল' প্রীতি-সম্মিলনী'র বিবরণ 'বুলবুলের চৈত্র ১৩৪৩ সংখ্যায় ছাপা আছে, পৃ. ৯৫২-৫৪। হবীবুল্লাহ বাহার-এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-প্রীতি রাজনীতির মধ্যেও প্রকট ছিল। তিনি শেরে বাঙলা এ.কে. ফজলুল হক সাহেবকে নির্বাচনে জয় লাভের পর সংবর্ধনা জানানোর কালে বলেন, 'হক সাহেবের আজিকার জয় তারুণ্যের জয়। আমাদের ভাবী প্রধানমন্ত্রী চির তরুণ,...কৃষক-প্রজা পার্টির উদ্ভবে এদেশে তরুণ মনের পরিচয় সুস্পষ্ট। মাননীয় হক সাহেব ইহার নেতা। সত্যই আজ বাঙলার তরুণ দল তাঁহাকে তাঁহাদের জয়-নিশান বহন করিবার অধিকার দান করিয়াছে। এই অধিকারের গৌরব শুধু তাঁহার একার নয়, আমাদের,—সমগ্র দেশের। পটুয়াখালিতে হক সাহেবের জয় সূচিত হইয়াছে। স্যার নাজিমুদ্দিন পটুয়াখালীবাসীদের হৃদয় জয় করিতে পারেন নাই, কেননা তাহাদের অন্তরের কুঞ্জিকা তাঁহার হাতে ছিল না ; যে-ভাষায় পটুয়াখালির মানুষ কথা কয়, স্বপ্ন দেখে, কাঁদে তার সঙ্গে তাঁহার গভীর

www.pathagar.com

অপরিচয়। হক সাহেবের আকাশের মতো উদার প্রাণ আছে, হয়তো সুউচ্চ ব্যক্তিত্বও আছে, কিন্তু এসকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাঁহার বাঙালীত্ব। তিনি সর্বতোভাবে বাঙালী, বাংলা তাঁহার মাতৃভাষা ; বাঙলার—বাঙালীর চিত্তে তাঁহার সহজ গতি। তাই আজ আমরা বাঙলা সাহিত্যের সেবক রূপে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই।'

৭. আবু জাফর শামসুদ্দীন, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার (জীবনী-গ্রন্থ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৩, ৩৬।

৮. বুলবুলের কথা (সম্পাদকীয়), প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৪০।

৯. সম্পাদকীয়, 'বুলবুল', প্রথম বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৪০।

১০. সুকুমার বিশ্বাস, সাময়িকী বুলবুল : ভিন্নমত, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৪, পৃ. ১২৬।

১১. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, উদ্ধৃত, সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত।

১২. ১ সংখ্যক পাদটীকার পত্র দ্রষ্টব্য।

১৩. পূর্বোক্ত।

১৪. প্রমথ চৌধুরী, বীরবলের পত্র (সম্পাদককে লিখিত), বুলবুল, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৪০, পৃ. ১৬৬।

১৫. জসীমউদ্‌দীন, পরাণ বন্ধু (কবিতা), বুলবুল, দ্বিতীয় বর্ষ,দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৪১, পৃ. ১৮৫।

১৬. হুমায়ুন কবির, শীতের দেশে (কবিতা), বুলবুল, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৪১, পৃ. ২৭-২৮।

১৭. মোহিতলাল মজুমদার, রূপের গরব (কবিতা), বুলবুল, উপরিউক্ত, পৃ. ১১।

১৮. উপরিউক্ত, ফেরদৌসী-বন্দনা (কবিতা), উপরিউক্ত, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৪১, পৃ. ২০৫-৭।

১৯. মোতাহার হোসেন চৌধুরী, বুদ্ধির মুক্তি (উর্দু থেকে অনূদিত কবিতা), বুলবুল, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৩, পৃ. ৬।

২০. উপরিউক্ত, মুসলমান, উপরিউক্ত, পৃ. ৩৮।

২১. ফররুখ আহমদ, অপ্রয়োজন (কবিতা), বুলবুল, তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৪, পৃ. ৩৫৫।

২২ হবীব, (আহসান হাবীব), দারিদ্র্য (কবিতা), বুলবুল, চতুর্থ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৩, পৃ. ৫২৪।

২৩. শামসুন্নাহার, শিশুর শিক্ষা (সেক্স এডুকেশন), বুলবুল, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৪১, পৃ. ২৪৭।

২৪. স্যার যদুনাথ সরকার, ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব, বুলবুল, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৪১, পৃ. ২৬৩। .

২৫. শ্রী প্রমথ চৌধুরী, পত্র, বুলবুল, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৪০। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর পত্রের অংশবিশেষ বুলবুলের বিভিন্ন সংখ্যায় ছাপা হয়েছে 'প্রশস্তি' রূপে, তাঁর একটি উক্তি নিম্নরূপ : "তোমাদের কাগজে যে একজন মুসলমান লেখক এমন বাঙ্গালা লিখছেন, তা দেখলে বাস্তবিক খুশী হওয়া যায় ও জাতির ভবিষ্যতের জন্য আশা হয়।" —বুলবুল, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

২৬. কাজী আনওয়ারুল কাদির, উর্দু বাঙলা তর্ক ও বাঙ্গালী মুসলমান, বুলবুল, ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৪০, পৃ. ১০৭-১১৩।

২৭. প্রমথ চৌধুরী, উর্দু বনাম বাঙলা, বুলবুল, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৪০।

২৮. উপরিউক্ত।

২৯. অন্নদাশংকর রায় এর এই পত্রটি ('লীলাময় রায়' নামে) বুলবুল-এর তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-১৩৪৩ এর প্রথম পাতায় 'প্রশস্তি' শিরোনামে ছাপা হয়। এই পত্রের একই পাতায় রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত পত্রটির প্রথম অংশও পুনর্মুদ্রিত হয় 'প্রশস্তি' নামে।

www.pathagar.com

৩০. অন্নদাশংকর রায়ের উপরিউক্ত পত্র, ২৮ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩১. অন্নদাশংকর রায়,হিন্দু-মুসলমান : পশ্চাৎদৃষ্টি, বুলবুল,প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৪০, পৃ. ১৯০-৯৩।

৩২. উপরিউক্ত, বুলবুল, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৪১, পৃ. ৩-৮।

৩৩. উপরিউক্ত,

৩৪. উপরিউক্ত, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৪১, পৃ. ১১০-১১৪।

৩৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ডক্টর), ভারতে একজাতি গঠন, বুলবুল, চতুর্থ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৪-৮৬।

৩৬. উপরিউক্ত,

৩৭. হুমায়ুন কবির, বুদ্ধির সাধনা, বুলবুল, চতুর্থ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৪, পৃ. ৪৭৪-৭৭।

www.pathagar.com

৬. ছায়াবীথি

(কলকাতা, ১৩৪০-৪৩)

'ছায়াবীথি' পত্রিকাটির সন্ধান কেউ আজ আর রাখেন না। কিন্তু এই পত্রিকাটি কলকাতা থেকে ১৯৩৩ সনে একজন মুসলমান সপ্রতিভ তরুণ সম্পাদনা করেছিলেন। এর পৃষ্ঠাগুলো উল্টে যাঁরা মুসলমানদের সাহিত্য প্রয়াসের ব্যাপারে গৌণ ধারণা পোষণ করেন, তাঁরা খুশি হবেন। কেউ সহজে বিশ্বাস করতে চাইবেন না যে এটি মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্র। এর ছাপা, গেটআপ, মেকআপ, অলঙ্করণ, মুদ্রণ পারিপাট্য, আর শিল্পসম্মত উপস্থাপনের সম্পাদকীয় বৈশিষ্ট্য এক কথায় ছিল চমৎকার।

'ছায়াবীথি'র প্রথম বর্ষের সংখ্যাগুলো অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি। ঢাকার বাংলা একাডেমীতে শহীদুল্লাহ গবেষণা কক্ষের ক্যাটালগে ছায়াবীথির নাম থাকলেও তা খোয়া গেছে। খোন্দকার সিরাজুল হকের 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্য কর্ম' (১৯৮৪) গ্রন্থের পাদটীকায় (১৬৯ পৃষ্ঠায়) ছায়াবীথির প্রথম বর্ষ ৯ম সংখ্যার ৫৯০-৯৬ পৃষ্ঠার তথ্য ব্যবহারে বোঝা যায়, ১২ সংখ্যায় প্রথম বর্ষে প্রায় হাজার খানেক পৃষ্ঠা বের হয়। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে ছায়াবীথির দ্বিতীয় বর্ষের কয়েকটি সংখ্যা আছে। এর একটি পৃষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ইউনিয়নের কমনরুমের গোল সিল রয়েছে। এ-থেকে মনে হয় এর কোন লেখক বা পাঠক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, পরবর্তীকালে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে জমা দিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে এর কয়েকটি সংখ্যা দেখার সুযোগ হলো।

পত্রিকাটির সাইজ চতুরঙ্গের মতো। এক কলামে সুন্দর ছাপায় দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা রাখে এর শিরোনামগুলোও। পূর্ববাঙলার নারায়ণগঞ্জ থেকে একই সময়ে প্রকাশিত 'সবুজ বাঙলা'র ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪১ এ ছায়াবীথির বিজ্ঞাপনটির ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

> ছায়াবীথি/সচিত্র মাসিক পত্রিকা/আপনার সবচেয়ে প্রিয় কবি, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিকগণের রচনা পড়িবার পিপাসা একমাত্র ছায়াবীথি পাঠেই নিবৃত্ত হইতে পারে। বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলির ভিতরে ছায়াবীথি ইতিমধ্যেই একটি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। ছায়াবীথির বিশেষত্ব অতি আধুনিক সাহিত্য—বর্তমান দুনিয়ার আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার আলোচনা এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বি শিল্পীর আঁকা ছবি। বার্ষিক চার টাকা আট আনা। অথবা ষান্মাসিক দুই টাকা চার আনা ব্যয়ে..., সম্পাদক নাজিরুল ইসলাম এম. এ. বি.টি. এফ-আর-ইকন-এস। অফিস ৭৯/১, লোয়ার সার্কুলার রোড, ইন্টালী, পোঃ কলিকাতা। বৈশাখ হইতে ছায়াবীথি সম্পূর্ণ নূতন রূপ লইয়া বাহির হইতেছে।[১]

'ছায়াবীথি'র প্রথম সংখ্যা কার্তিক ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় বলে জানা যাচ্ছে। প্রাপ্ত সংখ্যাসমূহে ২৯ নং কালিদাস সিংহের লেন, কলকাতা ফিনিক্স প্রেস থেকে এন. ইসলাম দ্বারা মুদ্রিত ও ৭৯/১ লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে এন. ইসলাম দ্বারা প্রকাশিত হবার তথ্য আছে। দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৪১ সনে প্রকাশিত হয়। ছায়াবীথি দি এলায়েন্স প্রেস, ৬৩ বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত হয়ে ৭৯/৩ বি লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে প্রকাশিত হবার (দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪১) তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে। অতএব ঠিকানা বারে বারে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে মুদ্রণ সৌকর্য ও মান ক্ষুণ্ণ হয়নি।

www.pathagar.com

এন. ইসলাম (জন্ম : ১৯০৬ মৃত্যু ১৯৮২) বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পরবর্তীকালে 'নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান' নামে খ্যাতি ও অখ্যাতি দুটোই কুড়িয়েছিলেন। তিনি 'জীবনের জয়যাত্রা' ও 'দুর্বিপাক' নামক উপন্যাস, 'সোনালী স্বপন', 'পয়সা' ও 'স্বর্গীয় পলিটিক্স' নামক গল্পগ্রন্থের লেখক। 'বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস' (১৯৫০) নামের এক বই লিখে যশ ও অপযশের ভাগি হয়েছিলেন। যশ এজন্যে যে তাঁর আগে কোনো মুসলমানই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এত বড় (৪৬৬ পৃ:) সুখপাঠ্য বই লেখেননি, অপযশ এ-জন্য যে, তাঁর বইটিতে এমন অনেক মতবাদ তিনি প্রচার করতে চেয়েছেন যা কল্পনাপ্রসূত।[২] তবে সাহিত্যালোচনায় তিনি মৌলিকত্ব দেখাতে সক্ষম হন। এই মৌলিকতা তাঁর সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনায়ও পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের তীব্রতা সুফিয়ানের চিন্তাধারা পাল্টে দিয়েছিল সম্ভবত। কিন্তু ছায়াবীথি একটি উদার, প্রগতিশীল এবং সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীবাদী পত্রিকা ছিল। স্বরাজের প্রচারণাও তাঁর পত্রিকায় রয়েছে এবং বলা আবশ্যক যে, গান্ধীর মতাদর্শের প্রচারণা, স্বরাজ ও ইংরাজের শাসনব্যবস্থার সমালোচনা, গান্ধী-আরউইন এর চুক্তির সমালোচনা এবং নৈতিকতা ও ধর্মদর্শন, আর সাহিত্যশিল্পের প্রগতিশীল চিন্তা ছায়াবীথির পৃষ্ঠার ঝলকিত সৌকর্য।

কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, আবদুল কাদির, মোহাম্মদ আজরফ, এ. সবুর, মহীউদ্দীন, আশরাফুজ্জামান, কাদের নওয়াজ, মুহম্মদ এনামুল হক, সুফিয়া এন. হোসেন, বন্দে আলী মিয়া, মুহাম্মদ আজহার উদ্দীন, কে. এম. শমসের আলী, ইমাউল হক, মহবুব, কাজী আবদুল ওদুদ, সিরাজুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, মনসুরউদ্দীন, আহমদ মনির—এসকল প্রথম শ্রেণীর তরুণ ও অতি তরুণ মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের রচনার সঙ্গে প্রায় সমসংখ্যক হিন্দু-লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত 'ছায়াবীথি' বের হয়েছে (মাসে-মাসে)।

'ছায়াবীথি' নামটিও সুন্দর, বাঙালি সংস্কৃতি-সঞ্জাত শব্দ, কোনো ধর্মীয় চিহ্ন এতে নেই; নাম শুনে বোঝার উপায় নেই এটি হিন্দু না মুসলিম-সম্পাদিত। যেমন বোঝা যায় না সোনার বাংলা বা সবুজ বাংলা, মৃত্তিকা, শিশু-সাথী ইত্যাদির নাম থেকেও। মনে রাখা দরকার যে, ছায়াবীথি ১৯৩৩ সনে বের হয়েছিল। তখন জসীমউদ্‌দীনের বয়স ত্রিশ, নজরুল ইসলামের ৩৪-৩৫ আর সম্পাদক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, হুমায়ুন কবির ও মুহম্মদ এনামুল হকের ২৬-২৭ বৎসর বয়স। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সঙ্গে যৌথভাবে এনামুল হকের 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে ছায়াবীথিতেই প্রকাশিত হয়েছিল (২/২ ও অন্যান্য সংখ্যায়)।

হুমায়ুন কবিরের 'সাহিত্যের উপাদান' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল পৌষ ১৩৪১ সংখ্যার প্রথম রচনা হিসাবে। কাজী নজরুল ইসলামের—'ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি,/করুণ-চোখে চেয়ে আছে, সাঁঝের ঝরা ফুলগুলি।' এবং 'তোমার হাতের সোনার রাখী/আমার হাতে পরালে' ছাপা হয়েছিল যথাক্রমে অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন (২/২ ও ২/৫) ১৩৪১ সংখ্যায়।

আবদুল কাদিরের 'সঙ্গীত-চর্চ্চা' শীর্ষক রচনাটি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও গবেষণামূলক, এর চেতনা বুদ্ধির মুক্তিবাদীর—প্রগতিপন্থীর। তিনি শিখা, মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকায় মুসলমানের জন্য সঙ্গীত-চর্চা সিদ্ধ ও হালাল কীনা বিষয়ক বিতর্কের সূত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরির চেষ্টা করেছেন এই মর্মে যে,

www.pathagar.com

কোনো শিল্পের পরিশীলন বাঞ্ছনীয় কীনা তাহা নির্দ্ধারণের জন্য কি শাস্ত্রানুমোদনের প্রয়োজনীয়তা আজ বাস্তবিকই আছে? আর্টে মানব চিত্তের ঘটে আনন্দময় মুক্তি, আর্টের চরম ও শ্রেষ্ঠতম হইতেছে ধর্ম্ম। অতএব কোনো আর্টের চর্চায় যে ধর্ম্মের নিষেধাজ্ঞা থাকিতে পারে ইহা বিশ্বাস করা চলে না।

তিনি তাঁর আলোচনায় স্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে, 'সঙ্গীত চর্চ্চার মূলে আছে সুরের স্বাদ, কথার নয়। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে গানের Content (আধৃত বস্তু) কি?' সে-প্রসঙ্গেও বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেন। সাহিত্যের মতো সঙ্গীতেও ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজমের সমস্যা আছে, কিন্তু নীতি বা দুর্নীতির প্রশ্ন সেখানে নেই। 'বস্তুত সঙ্গীতের আলোচনা হইবে তার রসবস্তু ও গঠন-রীতির আলোচনা ; ধর্ম্মনীতির তূলাদণ্ডে কোনো শিল্পানুশীলনের বিচার অবাঞ্ছনীয় বই কি।[৩]

'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনাও ছায়াবীথিতেই আবদুল কাদির শুরু করেন।

রাশিয়ান লেখক আন্তন চেখভের গল্প অনুসরণে কাহিনী নির্মাণের চেষ্টা আছে এতে। মতিলাল দাশের নাটক 'মাতৃহারা' উপন্যাসও ছাপা হয়েছে ছায়াবীথিতে ধারাবাহিক ভাবে। এটি ছিল কবিতা গল্প সমৃদ্ধ। 'সংগীতে শ্লীলতা' বিষয়ে কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির ও নাজিরুল ইসলামের মনোজ্ঞ আলোচনা একই সঙ্গে স্থান পেয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদের 'গ্যেটে' বইয়ের অনেকাংশ এতে ছাপা হয়। এইচ.জি. ওয়েলস্ এর গল্পের অনুবাদ, আর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লুই পিরানডেলো (Luigi Piran Dello) ও তাঁর নাটকের ওপর আলোচনা আছে।

স্যার আবদুল্লাহ সুরাবর্দ্দীর মৃত্যুতে দীর্ঘ আলোচনাও আছে ছায়াবীথিতে কারণ, তিনি কৃতীপুরুষ ছিলেন। মুসলমানদের 'নেই'র মধ্যে বড় একটি উজ্জ্বল তারকা ছিলেন তিনি। মাদাম খালেদা এদিব খানুমের ওপরও আলোচনা স্থান পেয়েছিল এতে। স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষা, মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র শিক্ষার দাবী, মুসলমানের ধর্ম ও আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি কবিতা-গল্পের সুসমন্বয় 'ছায়াবীথি'কে সেকালে শিক্ষিত পাঠকের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল,—একথায় সত্যিই অতিরঞ্জন নেই।

দর্শনের ছাত্র মোহাম্মদ আজরফ 'ধর্ম্ম ও নৈতিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৯৩৩ সনে লিখেছিলেন—-অথচ এই নৈতিকতার বিষয়টি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'তাহা হইলে দেখিতে পাই এক হিসাবে নৈতিকতার উপর ধর্ম বিরাজ করিতেছে—কারণ নৈতিক জীবনে যে সত্য সুন্দর আমাদের আদর্শ (idal) তাহার উপর অগাধ বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমরা ধর্ম্ম জীবনে এই রূপ সত্তায় বিশ্বাস করি। নৈতিক জীবনে যাহা আদর্শ তাহাই ধর্ম্মজীবনে বাস্তব (actual)হইয়া পড়ে। আমাদের নৈতিক জীবনের আদর্শ যাকে ঠিক বলিতে গেলে, বলিতে হয় সত্য শিব ও সুন্দর, (The Truth the Beautiful and the Good) তাহাকে আমাদের জীবনে ফুটাইয়া তোলা আমাদের নৈতিক জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু এই আদর্শকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না বলিয়া আমাদের নৈতিক জীবনে দুঃখ বা বিষাদের ছায়া পড়ে।[৪]

ইমাউল হক এদেশের অপ্রধান কবিদের অন্যতম বিবেচিত হন। আবুল হোসেন, শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের

www.pathagar.com

বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তিনি বিদগ্ধ ছিলেন না। তখনকার পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত মুসলিম কবিদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, তিনি প্রেমের ব্যাপারে 'ভালমন্দ' জ্ঞানকে প্রকট রাখতে চান না। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ বাঙলার আধুনিক শিক্ষিত এক তরুণের সরল স্বীকারোক্তি ফুটে বেরিয়েছে ইমাউল হকের 'ভালবাসা' শীর্ষক কবিতায়—

> ভাল যে বাসনা তাই বলনা খুলিয়া,/মিছামিছি কেন তুমি কর তার ভান;/প্রেমের আলোকে সখি, রাঙা যার হিয়া/তার কি থাকিতে পারে ভাল-মন্দ জ্ঞান?[৫]

'শিক্ষার উদ্দেশ্য' সম্পর্কে এঁদের মনোভাব, অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাদানই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। সেজন্য তাঁরা আলোচনার প্রথমেই ব্যঙ্গচ্ছলে বলেন :

> শিক্ষার উদ্দেশ্য যাঁহারা মনে করেন শিক্ষার্থীকে পরপারের জন্য প্রস্তুত করা তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার পক্ষপাতী। যাঁহারা মনে করেন শিক্ষা এই জীবনের সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ, তাঁহারা ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষপাতী নহেন। এই মত বিভিন্নতার মূলে আছে ব্যক্তি বিশেষের, জাতি বা ধর্ম্ম বিষয়ে ভাব প্রবণতা। কিন্তু শিক্ষা বিজ্ঞান এবং শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য কোন বিশেষ ভাব প্রবণতাকে খুশী করা নয়—বরং এমন কোন ব্যবস্থা নিরূপণ যাহাতে প্রত্যেকেই অভীষ্টিত ফল লাভ করিতে পারেন। শিক্ষা-বৈজ্ঞানিকের মতে শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন সে যে কোন অবস্থায় নিজেকে পরিপার্শ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ভালোভাবে চালাইতে পারে। এই শিক্ষালাভের ফলে পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থী ধর্মপ্রবণ কর্মী অথবা যাহা হইতে ইচ্ছা করে তাহা হইতে পারিবে। সবদিকের পথ তাহার কাছে খুলিয়া দেওয়া হইবে, ভিতর হইতে সে যাহা হইতে চায় তাহাই বাছিয়া লইবে। শিক্ষার্থীকে এইভাবে প্রস্তুত করিতে হইলে তাহার জন্য প্রয়োজন তাহার সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি, ধর্মীয় অথবা পরকালের জ্ঞান বৃদ্ধি নয়।
>
> ধর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে ধর্মভাবাপন্ন করিয়া তোলা। অনেকেই আশা করেন শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় আচরণ শিখাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহা আদৌ সম্ভব কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। বিষয়ের আলোচনা দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধির কাজ স্কুলে সহজেই করা যাইতে পারে। কারণ তাহাতে কোন বিশেষ শিক্ষকের প্রয়োজন নাই। যে কোন শিক্ষক —যাহার শিক্ষকতা ব্যাপারে কিছু দক্ষতা আছে তিনিই শিক্ষার্থীকে—...প্রকৃতজ্ঞান (কিভাবে লাভ করা যায় তাহা) বলিয়া দিতে পারেন ; কিন্তু তাহার ধর্মীয় চরিত্র গঠন করা তাহার পক্ষে অত সহজ নয়। কারণ, কথা শুনিয়া চরিত্র গঠন হয় না—চরিত্র গঠিত হয় উন্নত ব্যক্তির চরিত্রের উদ্দীপনায়। শিক্ষকের উন্নত ধর্ম্মীয় চরিত্র শিক্ষার্থীকে যে ভাবে চরিত্র গঠন করিতে সাহায্য করিবে তাঁহার উপদেশ তাহা করিবে না। ধর্ম শিক্ষা দিতে যাঁহারা ব্যস্ত তাঁহারা ভুলিয়া যান সব স্কুলে ধর্মপ্রাণ উন্নতচরিত্র শিক্ষক পাওয়া সম্ভব নয়। ধর্ম জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত যিনি নহেন তাঁহার ধর্ম কতকগুলি শুষ্ক কথামাত্রে পর্যবসিত হইবে। শিক্ষার্থীর জীবনকে তাহা বিশেষ আন্দোলিত করিবে না।[৬]

'মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র শিক্ষার দাবী' শীর্ষক আলোচনায় বলা হয় : 'সাম্প্রদায়িক স্কুল, পাঠশালা বা মক্তব খুলিয়া শিক্ষার্থীকে যে ধর্ম ভাবাপন্ন করিবার সম্ভাবনা নাই তাহা উপরের আলোচনায় দেখা গিয়াছে। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের একশ্রেণী এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিই অধিক মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন।'

বলা চলে, শিক্ষার্থীদের কল্যাণচিন্তা করে যে ধর্মশিক্ষার পক্ষাবলম্বন করা হয়, প্রকৃতপক্ষে বিষয়টা সে রকম নয়। 'সাম্প্রদায়িক স্কুল, মক্তব ও পাঠশালার বহুসংখ্যক

www.pathagar.com

বেতনভোগী শিক্ষকের চাকুরিই তাহাদের প্রধান বিবেচনার বিষয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মশিক্ষা প্রকৃতপক্ষে কিছু হোক আর নাই হোক অন্তত একথা মিথ্যা নয় যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যই বহু মুসলমান শিক্ষক অন্ন পাইতেছেন। এই আর্থিক সংকটের দিনে এতগুলি লোকের অন্ন সংস্থানের কথা ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

> শুধু যে শিক্ষকই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে অন্ন সংগ্রহ করিতেছেন তাহা নহে। বহু অযোগ্য লেখক, যাঁহাদের পুস্তক কোনদিন শিশুদিগের হাতে দেওয়া উচিত নহে—তাঁহারাও মক্তব মাদ্রাসার নামে নিজেদের পুস্তক, বেশ চালাইতেছেন। বাজারের অন্যান্য ভাল ভাল পুস্তকের সঙ্গে তুলনা করলে এই সমস্ত পুস্তক কোন দিনই পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারিত না। কিন্তু মক্তব মাদ্রাসার জন্য আরবী, ফারসী মিশ্রিত এক স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টি করিয়া ইঁহারা ধর্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেছেন বলিয়া প্রচার করিতেছেন এবং সেই প্রচারের ফলেই তাঁহাদের পুস্তক চলিতেছে। এই সমস্ত লেখকদের শিক্ষা-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক কোনদিন ঘটে নাই। সুতরাং সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়ে এবং অল্প সময়ে শিশুর জ্ঞান বিকাশের কথা ইঁহারা তত বেশী ভাবেন না, যতটা ভাবেন তাহার মস্তিষ্কে কতগুলি দুষ্পাচ্য শব্দ ঢুকাইয়া দিতে।

এই শিক্ষাপদ্ধতির ফলেই মুসলিম সমাজে শিক্ষার হার কমে আছে। উচ্চশিক্ষায় মুসলমান সম্প্রদায়ের ছাত্র যে অনেক কম তাতো সর্বজনবিদিত। কিন্তু তার নানা কারণ থাকলেও, নিম্নশিক্ষায় মুসলমান ছাত্র হিন্দুর সন্তানদের তুলনায় অনেক বেশী। পড়ালেখা আরম্ভ করে মক্তবের শিক্ষাপদ্ধতির কারণে মুসলিম শিক্ষার্থীর বিদ্যায়তন ত্যাগ করে চলে যাওয়াটা অন্যতম।

> 'মক্তবগুলি শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না—বরং তাহাদের দুষ্পাচ্য আরবী, ফারসী শব্দ, একই সময়ে তিনচারটি ভাষা শিক্ষা, তাহার সহিত আবার খানিকটা অঙ্ক, কিছু পরিমাণ ভূগোল ও মানসাঙ্ক এবং পড়া তৈরী না হইলে মাষ্টার মহাশয়ের নির্দ্দয় বেত্রাঘাত শিশুর মনে বিদ্যালয় সম্বন্ধে কোন প্রকার আনন্দ জন্মানোর চাইতে বিভীষিকা জন্মায় অনেক বেশী। তাই একটি বৎসরও যাইতে না যাইতে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তাহার ঘুচিয়া যায়। ফলে তাহার সাধারণ শিক্ষালাভত হয়ই না—যে ধর্ম শিক্ষার জন্য এত তুমুল প্রচার সেই ধর্মশিক্ষাও আরবী কায়দার কয়েকটি অক্ষর পরিচয়েই শেষ হইয়া যায়।'[৭]

'ধর্ম ও আর্থিক অবস্থা' শীর্ষক আলোচনায় বলা হয়, 'আর্থিক অবস্থার সমাধানের হীন লক্ষ্যে যে অগণিত শিশুকে বলিদান করা হয়, তা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।'

> মুসলমান বেকারের কোন ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহার জন্য অন্য পথ আবিষ্কার করা প্রয়োজন। কিন্তু সমাজের ভবিষ্যৎ বংশধরদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে পুরিয়া—তাহাদের মাসিক চারি টাকা বেতনের ব্যবস্থা করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। বর্তমান অর্ধ শিক্ষিত মক্তবের শিক্ষকদিগকে রক্ষা করিতে হইলে ভবিষ্যতের অগণিত সমাজ সভ্যকে বেকার হইয়া থাকিবার পথ খুলিয়া দেওয়া, সমাজ বা ধর্ম কাহারো পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে। আধুনিক শিক্ষা যে শুধু বিজ্ঞানসম্মত তাহাই নহে—আর্থিক দিক দিয়াও তাহা অধিকতর লাভজনক। ধর্মের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ট (যদিও ধর্ম-ধ্বজীরা মনে করেন অর্থই সকল অনর্থের মূল)। দরিদ্রের ধার্মিক হইবারও উপায় নাই। ইসলাম সুদ দেওয়া এবং গ্রহণ করা উভয়কেই হারাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। ধার্মিক মুসলমান এই উভয়ের কোনটিই করিতে পারে না। কিন্তু কয়টি দরিদ্র মুসলমান বাঙলাদেশে আছে যাহারা এই ধর্মাদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিতে পারিয়াছে?—সদা সত্য কথা কহিবে ইহা ধর্মের

www.pathagar.com

আদেশ—কিন্তু টাকা ধার লইয়া প্রতিশ্রুত সময়ে শোধ দিতে, প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখিতে পারে এরূপ দরিদ্র মানুষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি? —প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার ক্ষমতা এবং সুদ না দেওয়ার ক্ষমতা ধর্ম শিক্ষার দ্বারা কোনদিন আসিবে না—তাহা আসিবে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য হইতে। সুতরাং সমাজের লোকগুলিকে যদি ধার্মিক করিয়াই গড়িতে হয় তবে তাহারও জন্য প্রয়োজন মক্তবের আরবী ফারসী শিক্ষা নয়, বরং এমন কোন শিক্ষা যাহাতে শিক্ষার্থী সহজে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করিতে পারে।[৮]

তথ্যনির্দেশ

১. সবুজ বাঙলা, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪১ এর একটি বিজ্ঞাপনের ভাষা।

২. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ঢাকা, ১৯৬৪ (২য় সংস্করণ), পৃ. ২৪৭।

৩. আবদুল কাদির, সঙ্গীত চর্চ্চা, ছায়াবীথি, অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ (২ বর্ষ, ২ সংখ্যা), পৃ. ৮২-৮৭।

৪. মোহাম্মদ আজরফ, ধর্ম ও নৈতিকতা, ছায়াবীথি, ২ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪১, পৃ. ৩৪৭-৫০।

৫. ইমাউল হক, ভালবাসা (কবিতা), উপরিউক্ত, পৃ. ২৮০।

৬. কলস্রোতা (সম্পাদকীয়), উপরিউক্ত, পৃ. ৩৯১।

৭. উপরিউক্ত, পৃ. ৩৯৩।

৮. উপরিউক্ত।
['কলস্রোতা' বুলবুল-এরও সম্পাদকীয় বিভাগের নাম ছিল।]

www.pathagar.com

৭. চতুরঙ্গ

(কলকাতা, ১৯৩৮—এখনও চালু আছে)

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'চতুরঙ্গ' এক অক্ষয়, উজ্জ্বল আসন দখল করে আছে। ত্রিশের দশকের প্রান্তে গিয়ে যে-কটি সাহিত্যপত্রিকা টিকে ছিলো এবং নতুন করে প্রকাশিত হলো,—তার মধ্যে 'চতুরঙ্গ' এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করে নিল। সবুজপত্রের ধারায়, কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-ধূপছায়া-পরিচয়-ভবিষ্যৎ-অগ্রগতি-কবিতা—ইত্যাদির মধ্যে তখন কেবল 'পরিচয়' ও 'কবিতা' চলছে। আর মোটামুটিভাবে ব্যবসা-প্রধান মাসিক সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে তখন প্রবাসী, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, মানসী ও মর্মবাণী, মোহাম্মদী, সওগাত ইত্যাদি চলছিল বটে, তবে 'চতুরঙ্গ'ই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে এমন আর কোন্ পত্রিকাটির নাম করা চলে যে, বাংলায় প্রকাশিত যদি দশটি ভাল গল্প বেছে নিতে হয়, তাহলে দেখা যাবে তার মধ্যে হয়ত আটটি গল্পই প্রকাশিত হয়েছিলো চতুরঙ্গে। আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ—এঁদের প্রত্যেকেরই শ্রেষ্ঠ গল্পটি কোনো না কোনো সময়ে 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত হয়েছিলো।

ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৪৫ (১৯৩৮ সনের অক্টোবর) এ। আশির দশক পর্যন্ত ত্রৈমাসিক নিয়মে চলে, মাসিক হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: হুমায়ুন কবির ও বুদ্ধদেব বসু। তৃতীয় বর্ষ থেকে হুমায়ুন কবির একক সম্পাদক হন। প্রকাশক কে. সি. ব্যানার্জী। মুদ্রিত হতো : মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১/২ দুর্গা পিতুরি লেন, কলকাতা থেকে। কর্মাধ্যক্ষর ঠিকানা দেওয়া হয় ; ৫ ম্যাঙ্গো লেন, কলকাতা। চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা থেকে কর্মাধক্ষ-র ঠিকানা ৩৬ আহিরি পুকুর রোড, কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০। এক বছরে প্রকাশিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫৮। মূল্য প্রতি সংখ্যা বারো আনা। বার্ষিক সোয়া তিন টাকা। এই ঠিকানা থেকে প্রকাশের সময় কর্মাধ্যক্ষর নাম বলা হয়নি, সম্ভবত তখন আতাউর রহমান (১৯১৯-৭৭) নেপথ্যে চতুরঙ্গ পরিচালনা করেছেন।

স্বাধীন দেশের আবহাওয়ায়, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতায় এবং হুমায়ুন কবিরের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়ে পড়া বা ব্যস্ত থাকার যে কোনো কারণেই হোক পরবর্তীকালে বারে বারে সম্পাদক পরিবর্তন হলেও, সাতচল্লিশ পূর্ববর্তী আলোচ্য ১০ বছরে তা ঘটেনি।

যা হোক, চতুরঙ্গের কর্ণধার আতাউর রহমান কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা 'নবযুগ'-এরও প্রকাশক ছিলেন। 'ত্রিকাল' বার্ষিকীও তিনি বের করেন (১৯৪২)। হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে ওৎপ্রোতভাবে সংযুক্ত ছিলেন তিনি। ইউনাইটেড স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন তাঁরই (আতাউর) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির (১৯০৬-৬৯)। সহ-সম্পাদক আতাউর রহমান। আতাউর রহমান পরবর্তীকালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনে'র সভাপতি হয়েছিলেন। এ.কে. ফজলুল হক, মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও হুমায়ুন কবিরের সান্নিধ্যে থেকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সংগঠিত করার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[১]

www.pathagar.com

কিন্তু সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বঙ্গ (ভারতও) বিভক্ত হয়ে গেলে, ১৯৪৭ সনের পর আতাউর রহমান পূর্ববঙ্গে না-এসে ভারতেই থেকে যান। উল্লেখ্য, তাঁর পৈত্রিক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা শহর, পাবনার স্থানীয় স্কুল ও এডওয়ার্ড কলেজে তিনি পড়ালেখা করেছিলেন। কলকাতার ছাত্রজীবনে তিনি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের সদস্য ছিলেন। সেন্ট জেভিয়ার্ড কলেজে পড়ে, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগে এম.এ. পড়াশোনা করেন। তখন তিনি রাজীতিতে গভীরভাবে সংযুক্ত। কৃষক আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৪২ এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ, আত্মত্যাগী ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর কাছে জীবন, শিল্প এবং রাজনীতি—কোনো ভিন্ন প্রান্তের অভিধা ছিলো না। 'তিনি মনে করতেন শিল্প এবং রাজনীতি বাদ দিয়ে জীবন চর্চা অর্থহীন। তাঁর কাছে চতুরঙ্গ ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি ছিল এই জীবন চর্চারই ভিন্নতর প্রকাশ। যেমন ছিল ইউনাইটেড স্টুডেনটস অ্যাসোসিয়েশন, এবং পরবর্তী কালে ১৮ মীর্জাপুর স্ট্রীটের বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশন।...'[২]

'চতুরঙ্গ' সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নৃপেন্দ্র সান্যাল লিখেছেন : "চল্লিশের দশক ছিল নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। কলকাতার জীবনে তখন দুরন্ত প্রবাহ। সাহিত্য, রাজনীতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ভাল ছবি ও থিয়েটার। অর্থাৎ মানুষের মনের বিকাশকে নানাদিক থেকে পরিচালিত করার বিশাল আয়োজন। এবং এই বিকাশকে পরিকাঠামোগত সাহায্য করেছে দুটি পত্রিকা—'চতুরঙ্গ' ও 'পরিচয়'। এই দুই পত্রিকাই ছিল সমকালীন চিন্তাধারার প্রতিভাস। 'চতুরঙ্গ' যেমন সাহিত্য, রাজনীতি ও সাহিত্য-সমালোচনায় একটি নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—'পরিচয়' নিয়েছিল একটি বিশিষ্ট ভূমিকা। 'পরিচয়' ছিল মার্কসবাদী সাহিত্যপত্রিকা। সাহিত্যের মতবাদ সমৃদ্ধ অন্য একটি মাসিকপত্র। এছাড়া আরও তিনটি পত্রিকা তখন প্রকাশিত হতো। বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'সাহিত্যপত্র', বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নিরুক্ত'—

নৃপেন্দ্র সান্যাল চতুরঙ্গ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আতাউর রহমান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> ...সেই চল্লিশের দশকের পড়ন্ত বছরগুলোতে যখন আমার সঙ্গে আতাউর রহমানের পরিচয় হল, পরে আরও ঘনিষ্ঠ হল, তখন থেকেই দেখেছি চতুরঙ্গের তিনি শুধু কর্ণধারই ছিলেন না—ছিলেন প্রাণ পুরুষ। লেখা সংগ্রহ, লেখার সম্পাদনা, বিভিন্ন আলোচনা ; যেমন সাহিত্য, নাটক, বেতার ও সঙ্গীত সম্পর্কিত, সেগুলির যথাযথ বিন্যাস—সমস্তই তিনি এক হাতে করতেন। এমনকি পত্রিকা চালানোর জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজও। চতুরঙ্গে কে না লিখেছেন ?[৩]

তাছাড়া অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রথম উপন্যাস 'নয়নতারা', কমলকুমার মজুমদারের বিখ্যাত গল্প 'মল্লিকা বাহার' এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প 'বস' চতুরঙ্গে ছাপা হয়।

হুমায়ুন কবিরের পরিচয় প্রদান করার তেমন আবশ্যক হয় না এ কারণে যে, কৃতী ছাত্র, অধ্যাপক, সমালোচক, ঔপন্যাসিক, রাজনীতিবিদ, সরকারী উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক অধিকর্তা, মন্ত্রী—সকল ক্ষেত্রেই তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

বহুগ্রন্থ প্রণেতা হুমায়ুন কবিরকে ভারতবর্ষের বিদ্বৎসমাজের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়া তাই বাতুলতা। তিনি ফরিদপুরের জমিদার খানবাহাদুর কবিরউদ্দিন ও তাঁর পত্নী বেগম

www.pathagar.com

সাজেদা খাতুনের চতুর্থ সন্তান, পুত্রদের হিসাবে দ্বিতীয়। ১৯২৬ সনে হুমায়ুন কবির কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ থেকে বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৮ সনে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পান। সরকারী বৃত্তি নিয়ে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। অতঃপর এবং সেখান থেকে মডার্ণ গ্রেটস–এ ১৯৩১ সনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে দেশে ফিরে আসেন।

ছাত্রজীবন থেকেই নেতৃত্বের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিলো এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতা নির্বাচিত হতেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ছাত্রদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কোনো ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে ঐ পদ লাভ করা খুব সহজ ছিল না। ১৯৩২ সালে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। দর্শনের উপর বাংলায় প্রথম বই লেখার কৃতিত্বও তিনি অর্জন করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হয়েও তিনি পড়াতেন ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন ও শিক্ষানীতি। কলকাতা, মহীসুর, অন্ধ্র ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রীর এক্সটারনাল একজামিনার ছিলেন। ১৯৩৭ থেকে, ১৯৪২ পর্যন্ত তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, আম্মামালাই বিশ্ববিদ্যালয় ও এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন।

শিক্ষকতার সাথে সাথে অধ্যাপক কবির রাজনীতি ও সাহিত্য চর্চায় সময় দিতেন। সম্পাদনা আরম্ভ করলেন ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ'। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির মনোনয়নে। ১৯৪৪ সনে ভারতীয় রেলওয়ে অ্যাডজুডিকেশন বোর্ডের সদস্য হয়ে সিমলা গমন করেন। ১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগের পর মৌলানা আবুল কালাম আজাদ শিক্ষামন্ত্রী হলে অধ্যাপক কবিরকে ভারতের জয়েন্ট এডুকেশন এডভাইজার এর পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। ১৯৫০ সনে তিনি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৫২–৫৫ সনে ভারতের শিক্ষাসচিব এবং বিভিন্ন উচ্চতর মর্যাদার পদ অলংকৃত করেন।

'চতুরঙ্গ' প্রকাশনা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেন : 'পরিচয়ের' প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা হিসাবে 'চতুরঙ্গ' বের করেছিলেন হুমায়ুন কবির।[৫]

আবু রুশদ এর বক্তব্য আশ্রয় করে হুমায়ুন কবিরের জীবনীকার শাহরিয়ার ইকবাল লিখেছেন : 'পরিচয়ের সাহিত্যসভায় (সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্যামবাজারস্থ বাড়ীতে) গমনাগমনের সময় থেকেই হুমায়ুন কবির 'পরিচয়ে'র মত একটি উচ্চমানের সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের কথা চিন্তা করছিলেন। ১৩৪৫ এ তা বাস্তবায়িত হলো।...অনেক তরুণ মুসলিম লেখক তখন ভাল পত্রিকায় লেখা ছাপানোর সুযোগ পাচ্ছিলেন না। চতুরঙ্গ তাঁদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলো।'[৬]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে যে মর্ম প্রকাশিত হয়েছে, চতুরঙ্গের দশ বছরের কার্যক্রম বিচর বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার সত্যতা নির্ধারণ করলেই,—বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে

www.pathagar.com

মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকা হিসেবে চতুরঙ্গ কতোটা ভূমিকা পালন করেছিল,—তার প্রমাণ কিছুটা পাওয়া যাবে। প্রথমত একটি বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে যে, চতুরঙ্গ শ্রেষ্ঠ গল্পসমূহের বেশির ভাগ প্রকাশ করার গৌরব অর্জন করেছে। দ্বিতীয়ত মুসলমান লেখকদের রচনা প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা চতুরঙ্গ দূর করতে চেয়েছে।

এখানে প্রশ্ন : মুসলমানদের অনেকগুলো নিয়মিত পত্রিকা থাকার পরও চতুরঙ্গ 'মুসলমান লেখকদের কোন্ শ্রেণীর রচনা প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও কোন্ শ্রেণীর রচনা প্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চেয়েছিল ? সেজন্য চতুরঙ্গে মুসলমানদের কি লেখা প্রকাশ পেয়েছে তা দেখা দরকার। আর শুধু কি গল্প? চতুরঙ্গে প্রকাশিত অপরাপর রচনাগুলোর মর্ম মর্যাদাই বা কী?

আবুল হোসেন বলেছিলেন, চতুরঙ্গ পুস্তক সমালোচনা ও আধুনিক সাহিত্যের আলোচনার যে আদর্শ স্থাপন করে, তাও পরবর্তীকালে প্রকাশিত পত্র পত্রিকাগুলো অনুসরণ বা অনুকরণ করেছে। এদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বিনির্মাণে চতুরঙ্গ মডেল এর মর্যাদা লাভ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, মুসলিম সম্পাদিত একটি পত্রিকা আধুনিক কালে প্রকাশিত হিন্দু–সম্পাদিত যাবতীয় পত্রিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটি পত্রিকার (পরিচয়) সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মানসে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সাহস কতোখানি কার্যকর হয়েছিল, তাও বিবেচ্য। সেই প্রতিযোগিতা কী কোনো হীনমন্যতার প্রকাশ ঘটিয়েছে?

না, হিন্দু সম্পাদিত পত্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে তখনকার শ্রেষ্ঠ আধুনিক হিন্দু লেখকদের সুনির্বাচিত রচনাসমূহ অকাতরে গ্রহণ ও মুদ্রণ করে সম্পাদনার যোগ্যতা নিশ্চিত করেছে যেমন, তেমনি অসাম্প্রদায়িক মার্কসবাদী, সৃজনশীল সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে সুনাম অর্জন করেছিল। এখানে মুসলমান সম্পাদকের প্রতিযোগী মানসিকতা বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ ঘটিয়েছে, সন্দেহ নেই।

এমন একটি পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় অন্যান্য ট্রেডিশন্যাল মাসিকীর ন্যায় 'ঘোষণা', 'নিবেদন', 'কৈফিয়ৎ', 'সম্পাদকীয়' বা 'সম্পাদকের পাঁজি' বা 'দফতর হইতে' ধরনের কিছু ছিলনা। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনাটি ছিল সুশোভন সরকার–এর প্রবন্ধ 'সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি ও পরিণতি'। দ্বিতীয় রচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নারী' শীর্ষক কবিতা —'স্বাতন্ত্র্য স্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ। সে-আনন্দ রস/রূপ ধরেছিল রমণীর ধমনীতে/ধরণীতে/তুলেছিল চাঞ্চল্যের দোল,/মদির হিল্লোল,/তাহারি সংকল্পচ্ছবি বিধাতার মনে/আছে তাঁর তপস্যার সংগোপনে।'[৭]

পরবর্তী রচনাগুলো যথাক্রমে বিষ্ণু দে (কবিতা, মুদ্রা রাক্ষস) ; জীবনানন্দ দাশ (কবিতা, ফুটপাথে—'অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে ;/কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে....') ; হেমচন্দ্র বাগচী (কবিতা, অনাবশ্যক) ; সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কবিতা, বিরোধ—'নিরাপদ এই নীড়ে বাঁধলাম নিজেকে/জানালায় নীল আকাশ দিলাম টানিয়ে'...) ;

বুদ্ধদেব বসু (কবিতা, ব্যাঙ্ : বর্ষায় ব্যাঙের ফূর্তি। বৃষ্টি শেষ, আকাশ নির্বাক ; ....ব্যাঙেদের ডাক...')

এবং হুমায়ুন কবিরের বিখাত গ্রন্থ 'বাংলার কাব্য'র প্রথম কিস্তি 'অল ইন্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে'—টীকা থেকে বুঝা যায়, বাংলার কাব্য ১৯৩৮ এরও আগে লেখা এবং রেডিওতে পাঠ ও প্রচার শুরু করেছিলেন।

www.pathagar.com

চতুরঙ্গের পরবর্তী সংখ্যাগুলোয় 'বাংলার কাব্য' গ্রন্থের বাকী অংশ ছাপা হয়েছিল। প্রথম সংখ্যায় যুগ্ম সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর কবিতা বাদেও তাঁর একটি দীর্ঘতর প্রবন্ধ 'রাজনীতি সংস্কৃতি ও শান্তি' ছাপা হয়। এই রচনাটিকে সম্পাদকীয় উদ্দেশ্যরূপে গণ্য করে পাঠ করা যায় :

> অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে কবি কি শিল্পীর পক্ষে রাজনীতির চর্চা অবৈধ। পেশাদার রাজনীতিকের প্রতি সাহিত্যিকের অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা জগতে সাহিত্যের সূত্রপাত থেকেই পাওয়া যায়। রাজনীতির সঙ্গে কূটবুদ্ধি, গুপ্ত ষড়যন্ত্র, বিবেকহীন আত্মবৃদ্ধি ও পরের সর্বনাশ, এসব জিনিসই জড়িত হয়ে এসেছে, এবং সেটা অন্যায়ও নয়। শিল্পীর মন যে এতে বিদ্রোহ করবে, সেটাও স্বাভাবিক। সুতরাং, ওসব ব্যাপার নিকৃষ্টশ্রেণীর হীনবুদ্ধি-লোকদের জন্য, এই বিশ্বাসে নির্ভর করে শিল্পীরা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র জগতে বাস করে এসেছেন। রাজনীতির প্রতি শিল্পীমনের অবজ্ঞা মিশ্রিত ঘৃণা আনাতোল ফ্রাঁন্স অতি সুন্দর প্রকাশ করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর এক চরিত্রকে দিয়ে বলিয়েছিলেন, I am not so devid of talent, madam, as to take any interest in politics.[৯]

অবশ্য এরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। সমসাময়িক সমাজের তীব্র সমালোচনা ও নতুন মানব সমাজের পরিকল্পনা, উভয়ই সাহিত্যিকের প্রদেশভুক্ত।...ইংরেজি সাহিত্যের অনেক-এর সৃষ্টি 'প্রত্যক্ষভাবেই রাজনৈতিক'। সুইফ্‌ট রাজনৈতিক কর্মীও ছিলেন, 'কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে যাঁরা একেবারেই উদাসীন, সংখ্যা হিসেবে ধরলে তাঁরাই অনেক বেশি। অবশ্য যে-কোনো লেখকই সমাজজীবনকে বিশ্লেষণ ও পরোক্ষে শোধন করেছেন, কিন্তু সে আলাদা। এখানে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সচেতনতার কথা হচ্ছে।'[১০]

১৯৩৮ সনে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনসহ চতুর্মুখী স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তুঙ্গ অবস্থায় প্রগতি, কবিতা ও অন্যান্য পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক এবং একাধারে বহুজনের ঈর্ষার পাত্র ও বিতর্কিত, আলোচিত সাহিত্য ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধদেব বসু চতুরঙ্গের সম্পাদক হিসাবে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শান্তি অর্থাৎ স্বাধীনতা, প্রয়োজনে সংগ্রাম—এইসব ব্যাপারে কী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন, চতুরঙ্গের প্রথম সংখ্যা থেকে, সে কথার মর্ম দীর্ঘ হলেও একটু আমাদের গ্রহণ করা দরকার। কারণ, এই প্রথম সংখ্যার রচনাবলি দ্বারা বেঁধে দেয়া সুরই ছিল চতুরঙ্গের সমস্ত রচনা দ্বারা সম্মিলিত সঙ্গত, এবং কোরাস।

বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, এটাই আমরা দেখতে পাই যে, জনতার কোলাহল এর বাইরে স্বতন্ত্রজগতে আত্মআশ্রয়ী শিল্পীর সংখ্যাই বেশি। অন্তত খুব সম্প্রতি ইউরোপের সমস্ত লেখক যেরকম প্রকাশ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে নেমেছেন, এমন বোধ হয় পৃথিবীতে আগে কখনো দেখা যায়নি। এর কারণ কী? কেনো শিল্পীরা তাঁদের 'স্বতন্ত্র জগত' থেকে বের হয়ে এসে রাজপথে জনতার ভীড়ের সঙ্গে একাত্ম হলেন? আত্মরক্ষা ছাড়া এর উদ্দেশ্য বা কারণ আর কিছুই নয়। কেননা 'শিল্পীর স্বাধীনতা' ও 'স্বতন্ত্র জীবন' আজকের জগতে ঘোরতর বিপদগ্রস্ত। তার সর্বনাশ হয় হয় অবস্থা। 'রাজনৈতিক প্রচার কার্যে না নামলে ও জয়ী না-হলে—তাঁদের অস্তিত্বই বহুযুগের মতো সমূলে উৎপাটিত হতে পারে—ইউরোপের লেখকেরা আজ সেটা নিষ্ঠুর ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। যাতে তাঁরা বেঁচে থাকতে পারেন এবং সাহিত্য সৃষ্টির অক্ষুণ্ণ অবসর ও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেন, তারই জন্যে তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা এবং এ চেষ্টা তাঁরা শুধু লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমেই চালাচ্ছেন না, তরুণ ইংরেজ লেখকদের

www.pathagar.com

অনেকেই স্বেচ্ছায় সৈনিক জীবন বরণ করেছিলেন, তাঁদের দুজন নিহতও হয়েছেন বলে জানি। লেখা ও বক্তৃতা অর্থাৎ প্রোপাগান্ডার মূল্যও অনেক। পলরোবসনের বরাতে তিনি বলেন,

> আজকের দিনের শিল্পীকে শুধু শিল্পচর্চা নিয়েই থাকলে চলবে না, জগতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় নিজেকে সঁপে দিতে হবে, নয়তো সমস্ত শিল্প ও সাহিত্যের বিনাশ ধ্রুব।...একথা মোটেই অযৌক্তিক মনে হবে না বিশ্বের দিকে তাকালে।...সুতরাং সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁরা আস্থাবান, সংস্কৃতির রক্ষণ ও বিকাশ যাঁরা প্রয়োজন মনে করেন, ফ্যাসিষ্ট বর্বরতাকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট না-হয়ে তাঁদের আজ উপায় নেই।...[১১]

রাজনীতি সংস্কৃতি ও শান্তির বহুমুখীবিচার বিশ্লেষণে পূর্ণ উক্ত দীর্ঘতম প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেন, শিল্পীর পক্ষে রাজনীতি করা মহাবিরক্তিকর হলেও অন্য উপায় নেই বলে তাঁকেও রাজনীতিতে যোগ দিতে হবে, নিছক আত্মরক্ষার প্রেরণায়। মনে রাখতে হবে যে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মাঝামাঝি কোনো রাস্তা আজ নেই, মাঝামাঝি রাস্তা বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটায়।

> পৃথিবী এখন কালের সঙ্গমস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে। এসময়ে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকেরই চোখ খোলা রেখে চারিদিকে তাকিয়ে নিজের বিশ্বাস গঠন করা কর্তব্য। যাঁরা আপোষ করবার চেষ্টায় লোকের দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করে দেবেন, তাঁরা আজ সমগ্র মানবজাতির অনিষ্টই করবেন। যুদ্ধের কারণ দূর না-হলে, যুদ্ধ দূর হবে না, এবং পৃথিবীতে সর্বত্র ধনোৎপাদনের উপায় সমস্ত সমাজের লোকের হাতে না-এলে যুদ্ধের কারণও দূর হবে না। যুদ্ধ উপনিবেশের জন্য, উপনিবেশ দরকার জিনিস বেচতে, একমাত্র সমাধান হয় যদি স্বদেশেই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুর খদ্দের জোটে।... এবং এ-ব্যবস্থা সাম্যবাদী সমাজেই সম্ভব। যাঁরা বলেন, সাম্যবাদই জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের একমাত্র উপায়, সব দিক ভেবে দেখতে গেলে তাঁদের কথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না। তা ছাড়া, একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজেই Lust for power-এর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি সম্ভব।[১২]

অনেকে মনে করতে পারেন, 'পরিচয়' এর সঙ্গে 'প্রতিযোগিতা' করার জন্য চতুরঙ্গ বের করা হয়েছিল বলে সুধীন্দ্রনাথ ও পরিচয় গোষ্ঠীর বা তাঁদের আড্ডার মধ্যে অপ্রীতিকর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। একদম তা নয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত চতুরঙ্গের প্রথম সংখ্যারই অন্যতম লেখক। তিনি কবিতা নয়—কষ্টকর, দীর্ঘ, চিন্তাশীল প্রবন্ধই লিখেছিলেন পরিচয়ের সহযোগী চতুরঙ্গের জন্যে 'প্রগতি ও পরিবর্তন' শিরোনামে—। ফ্রয়েড, মার্কস প্রমুখের দর্শন, মনস্তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার পরে তিনি লিখেছিলেন, মনোবিকলনে ধরা পড়ে যে, মানুষ মাত্রেই পরিবর্তন বিমুখ।

অথচ প্রতিনিয়ত না বদলালেও, সে বাঁচতে পারে না। যে জগতে তার বাস, সেখানে স্থিতিতো অনুকল্প বটেই, এমনকি এক যোগবিভূতির কিংবদন্তী বাদ দিলে, শুধু আধি দৈবিক উৎপাতই তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় না। নিজের দেহবিকারেও সে সদাসর্বদা অস্থির। ফলত বিবর্তনে মনের আদিম অদ্বৈত ঘুচিয়ে সে আজ অচৈতন্যের উপরে চাপিয়েছে আত্মবিপর্যয়ের তত্ত্বাবধান আর চৈতন্যকে নিযুক্ত করেছে অবস্থান্তরের নিয়ম নিরূপণে ; এবং তার বিশ্বাস যে বুদ্ধির দিগ্বিজয়ে বাধা না পড়লে, সে অচিরে বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে এরকম এক কার্যকারণ শৃঙ্খলার সন্ধান পাবে যে চরাচরের ওলট পালট আর তাকে প্রাণে মারবে না, ভবিষ্যতের সংসারযাত্রাও তার মন জুগিয়েই চলবে।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য, তার এ–আশা একেবারে বিফলে যায়নি। বহিঃপ্রকৃতি যদিও কোনদিনই তার কাল্পনিক হেতুবাদের তোয়াক্কা রাখে না, তবু বারংবার ঠেকে ঠেকে সে এখন প্রকৃতির ধরন অল্পবিস্তর বুঝতে শিখেছে এবং এই অনিশ্চয় অভিজ্ঞতার কল্যাণে তার সভ্যতাও আপাতত সমৃদ্ধ।

কিন্তু এত ভুগেও তার স্বভাব শোধরায়নি, তার অন্তর পুরাণ পুরুষ বিপ্লবের ঠিক আগের মতোই সন্ত্রস্ত : এবং থামা অসম্ভব বলে, এই আতঙ্ক সত্ত্বেও যেমন অগত্যা তার পায়ের বিরাম নেই, তেমনি সাধ–থাকলেও, অবচেতন প্রতিবন্ধকের প্রতিপক্ষে এখনো অধিকাংশ মানুষেরই সাধ্যে কুলোয়া না। এই জন্যেই আধুনিক সমাজে মনোব্যাধির প্রাদুর্ভাব এত বেশী ; এবং বিশেষজ্ঞদের মতে হিস্টিরিয়া শুধু অবলাদের প্রবলাস্ত্র নয় ; অনেক সময় পুরুষের কাছেও রোগের ভান স্থিতিস্থাপকতার চেয়ে অধিক প্রীতিকর।[১৩]

প্রথম সংখ্যায় গল্প লিখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (বোমা) ও আবুল মনসুর আহমদ (নেহাত গল্প নয়)। লক্ষণীয়, প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক বাদে মাত্র দুজন মুসলমান লেখকের নাম পাওয়া যায়,—আবুল মনসুর আহমদ এবং ইস্‌রাৎ হোসেন জুবেরী। ইস্‌রাৎ হোসেন জুবেরী উর্দু লেখক, এটি অনুবাদ করে ছাপানো হয়। তাঁর অনূদিত লেখাটি 'উর্দু ভাষার উদ্ভব' বিষয়ে।

চতুরঙ্গে মুদ্রিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের পাশাপাশি আবুল মনসুর আহমদের যে গল্পটি ছাপা হয়, সেটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পসমূহের একটি। 'আদু ভাই' নামে এটি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যুগযুগ ধরে সাহিত্যরস–পিপাসু পাঠক সমাজ ও ছাত্রছাত্রীদের তৃপ্তি দিয়েছে।

হুমায়ুন কবিরের 'বাংলার কাব্য' বাংলা–সমালোচনা সাহিত্যের সম্ভবত শ্রেষ্ঠ দশটি বইয়ের অন্যতম বিবেচিত হবে। অতএব মুসলমান লেখকদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ প্রকাশের দিকেই চতুরঙ্গ–সম্পাদক হুমায়ুন কবির বা আতাউর রহমান মনোবিবেশ করেছিলেন।

হিন্দু ও মুসলমান লেখকদের সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠা করে অকারণে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের জয়যাত্রা ঘোষণা বা সাম্প্রদায়িক–সম্প্রীতি প্রতিপালন চতুরঙ্গের উদ্দেশ্য ছিল না। বলাবাহুল্য চতুরঙ্গ সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করেছে।

আর একথা যদি মনে রাখি যে, পরিচয়ের মতোই চতুরঙ্গ মার্কসবাদী চিন্তা–চেতনা প্রকাশের সৃষ্টিশীল মুখপত্র ছিল, তাহলে সহজেই এর চরিত্র সপ্রকাশ হয়ে ওঠে। এর সাহিত্য আলোচনার বিভাগটিও ছিল বাংলা সাহিত্যে ভারতীয় অপরাপর সাহিত্যের পরিচয় উপস্থাপন ও সংযোজন ঘটানো।

বিশ্বসাহিত্যের রস বিতরণ, চেতনা–প্রবাহের মাধ্যমে রক্তকণিকার মতো বিভিন্ন দেশের ভাষার সাহিত্যের রূপ, রস, উপমা, প্রতীক, জীবনদর্শন ও সাহিত্যবোধ সক্রিয় করে তোলা। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সকল শাখাতেই তাঁরা সাহিত্যিক শৈল্পিক পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে সঙ্গীত, সিনেমা, চিত্র ও ভাস্কর্য সকল কিছুরই উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন সৃজনশীল সমালোচনার মাধ্যমে।

www.pathagar.com

এই জন্য দেখা যায় প্রতিটি সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ স্থান আলোচনা সমালোচনার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের মতোই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। পুস্তক-সমালোচনা বিভাগে কখনও কখনও দশ বারোটি বইয়ের আলোচনাও এক সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। এই সমস্ত পুস্তক সমালোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মতোই পূর্ণাঙ্গ ও প্রাজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিল।

এর অধিকাংশ ছিল আবার অবাঙালি সাহিত্যিকদের রচনা। বিশেষ করে ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের সমালোচনায় চতুরঙ্গ যে ভূমিকা পালন করে, তা জানা মতে অপর কোনও সাময়িকপত্রে দেখা যায় না। পরিচয়, কবিতা, নিরুক্ত, প্রভৃতি ছাড়া বিশ্ব সাহিত্যের এত বাংলাকরণ চোখে পড়বে না। শুধু পুস্তক সমালোচনাই নয়, অনুবাদের মাধ্যমেও বাংলা সাহিত্যে আধুনিক জীবনবাদী সাহিত্য ও মার্কসীয় চিন্তা চেতনা ও শিল্পভাবনার আত্মীকরণ এক বিস্ময়কর ঘটনা। বুদ্ধদেব বসু, হুমায়ুন কবির এবং আরো কতিপয় মনীষী একাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

চতুরঙ্গের কয়েক সংখ্যায় যুগ্ম সম্পাদক থেকে পরে সরে গেলেও বুদ্ধদেব বসু চতুরঙ্গের প্রধানতম লেখকদের অন্যতম ছিলেন। বেনামীতে 'বর্তমানের ইংরাজী সাহিত্য' আলোচনাটি হয় হুমায়ুন কবির নয়তো, বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন। আলোচনা বিভাগে পদ্মনাথন্ এর 'তামিল গদ্য' শীর্ষক রচনারও বাংলা ভাষ্যও বেনামীতে ছাপা হয়।

হেমেন্দ্রলাল রায় নিয়মিত 'সংগীত' বিভাগের আলোচনা লেখেন। 'সিনেমা'র আলোচনাটি প্রায়ই বেনামীতে প্রকাশিত হতো। পুস্তক সমালোচনা বিভাগে পাঁচটি বইয়ের সাহিত্যশিল্প-সজ্ঞান আলোচনার মধ্যে রয়েছে অতুলচন্দ্র গুপ্তের প্রবোধেন্দু ঠাকুর কর্তৃক বাণভট্টের কাদম্বরীর বাংলা তর্জমার সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়ের' আলোচনা লিখেছেন অশোক মিত্র। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় করেছেন বিষ্ণু দে'র 'চোরাবালি'র ; চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় হুমায়ুন কবির প্রণীত 'অষ্টাদশী'র ও হেমচন্দ্র বাগচীর 'মানস-বিরহ'র ; সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'পঞ্চমী ও অন্যান্য গল্পের' আলোচনা।

প্রথম সংখ্যা চতুরঙ্গের পূর্ণাঙ্গ একটি বিবৃতি দেয়ার চেষ্টা করা হলো উপরে। এতে স্পষ্ট যে বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, তামিল, সঙ্গীত, সিনেমা, কাব্য, কথা-সাহিত্য, প্রবন্ধ, সমালোচনা সমস্ত বিষয়ই চতুরঙ্গ একটি সংখ্যাতে ধারণ ও প্রযোজনা করতে চেয়েছে। একারণেই কি নামকরণ করা হয়েছিল 'চতুরঙ্গ'? 'চতুরঙ্গ' নামকরণটি সার্থকই বলা চলে। শুধু একটি সংখ্যায় নয় হুমায়ুন কবির, আতাউর রহমানের জীবৎকালে প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি সংখ্যার ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য।

কোনো কোনো গল্প, সমালোচনা, প্রবন্ধের লেখকদের জীবন-ভাবনা, সামাজিক-দর্শন ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণে সংকীর্ণতা, দুর্বলতা এসব রয়েছে, কোনো কিছুই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়, কিন্তু বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, আলোচনা-সমালোচনা এসবের মাধ্যমে যে সাহিত্য ও চিন্তার রূপ-রীতি, যুক্তি ও দর্শন হৃষ্ট, পুষ্ট, সমৃদ্ধ, সঠিক দিক-নির্দেশিত হয়ে থাকে—তাতে সন্দেহ কি? এই নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত সাহিত্য-সাধনাই চতুরঙ্গের নিদর্শন, যা সচরাচর মেলে না।

www.pathagar.com

২

চতুরঙ্গের দশ বছরের রচনাবলি ও রচয়িতাদেরকে যদি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, আলোচনা, সমালোচনা, শিল্প, সিনেমা ও সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ করা হয় —তাহলে সংক্ষেপে একটি চিত্র তুলে ধরা যাবে। হিন্দু ও মুসলমান লেখকদেরকে আলাদা ভাবে নির্ণয়ের যুক্তি নেই, কারণ শিল্পী, লেখক, সাহিত্যিকের জাত একই।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাসে 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে, আর এ-বিতর্ক বাংলা সাহিত্যের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিয়ে ঝগড়া থেকেও বটে।

হিন্দুর সাহিত্য ও মুসলমানের সাহিত্য—এই কথাগুলোর মধ্যে সম্পত্তির ভাগাভাগি ও উত্তরাধিকারীর বিবাদের মতো বিষয়টি যেহেতু সক্রিয়, এবং বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি-সাধনের শ্রমে মুসলমানেরা অন্তত পঞ্চাশ বছর পিছনে—এই ধারণা প্রচলিত থাকার কারণেই এভাবে দেখা এবং বলা যে, চতুরঙ্গে মুসলমান লেখক কতোটা অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন, কিংবা মুসলমান কর্তৃপক্ষ (সম্পাদক) 'মুসলমান' বলেই তাঁদের প্রতি কতোটা দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন, অথবা বাংলা সাহিত্যের অসাম্প্রদায়িক বিকাশটাই মুখ্য বিবেচিত হয়েছিল কিনা?

আগে চতুরঙ্গের মুসলমান লেখকদের প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিবরণ দেয়া থাক : —

আলী আশরাফ লিখেছিলেন : মোহনচাঁদ করম চাঁদ গান্ধী (৫/১)। আবু সয়ীদ আইউব—আধুনিক বাংল কবিতার ভূমিকা (১/৪) ; সাহিত্যে যৌন প্রসঙ্গ ও বর্তমান সমাজ (৫/৪)। আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন—সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে ভারতীয় রাজনীতি (২/২)। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্-বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজবিবর্তন (২/৪) এবং বাঙ্গলার মুসলমান (৬/২)। আর্থার কোয়েসলারের—রুশ কূটনীতির স্বরূপ—অনুবাদ করেন সম্ভবত হুমায়ন কবির (৭/৪)। ইউসুফ মেহের আলীর রচনা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৫/২)। উইলিয়ান ক্যাস্টওয়েল স্মিথ-এর লেখা থেকে অনুবাদ করেন—হুমায়ুন কবির (?) মুঘল সাম্রাজ্যে গণবিদ্রোহ (৮/৪)। কাজী আবদুল ওদুদ রচনা করেন—সংস্কৃতির কথা (৪/২)ও গ্যেটে (৫/১)।

জমিরউদ্দিন আহমদের লেখার নাম—ভারতবর্ষের ইতিহাস (১/৪) এবং সাহিত্য ও সম্পত্তি। ডগলাস রীড এর 'প্রলয়ের দশদিন' বাংলায় চতুরঙ্গে ধারাবাহিক ছাপা হয়। এটিও সম্ভবত হুমায়ুন কবির অনূদিত। 'ফিরিস্তা' ছদ্মনামে কোনো মুসলিম লেখক লেখেন—ট্রটস্কিবাদ (৩/১)। মীরণ চৌধুরীর রচনা—চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ (১/৪)। সাহেদ সোহরাওয়ার্দীর একটি উৎকৃষ্ট রচনা—অক্সফোর্ডে রবীন্দ্রনাথ (৪/১)। সেকেন্দর চৌধুরী—সমাজতন্ত্রবাদ ও ভারতবর্ষ (৬/৩)। সৈয়দ মুজতবা আলীর—মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের (১/৪) ও পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (১০/১ ও ১০/২)। হুমায়ুন কবির স্বনামে লেখেন—বাঙলার কাব্য (১ম সংখ্যা থেকে কয়েক সংখ্যায়) ; উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস (১/৩) ; সাহিত্যের উপাদান (২/৩) ; রবীন্দ্রনাথ (৩/৪) ; মুসলিম রাজনীতির হেরফের (৫/৩ ও ৫/৪) ; ভারতবর্ষ ও সমাজতন্ত্রবাদ (৬/১) ; মার্কসবাদ ও ভবিষ্যৎ (৭/১) ; ঐতিহাসিক জড়বাদ (৭/৩) ; শরৎচন্দ্র (৮/৩) ; এবং শ্রমিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ (৯/১) এবং অনুবাদ

www.pathagar.com

করেন স্বাধীনতার সংগ্রাম (ওয়েন্ডেল উইলকীর অনুবাদ, ৬/২) ; গিলবার্ট বেকারের—চীনে সংগ্রাম ও সংস্কৃতি (অনুবাদ, ২/৩) : পলম্যাট্রিক এর বার্লিন (অনুবাদ ১০/৩) ; স্টিভেন স্পেন্ডর এর অনুবাদ—ইংরাজী কাব্যে অডেনের স্থান (২/২) ; লুইসয় লরার অনুবাদ সমাজতন্ত্রবাদ ও বিপ্লব (৫/৩) ; লুইফিসার এর অনুবাদ—গণতন্ত্রের অপমৃত্যু (৫/৪)।

পাশাপাশি দেখা যায় অন্যান্য লেখকেরা কি লিখেছেন। অন্নদাশংকর রায়—আমাদের স্বাধীনতা (৯/৪) ; অমিয় চক্রবর্তী—মহাত্মাগান্ধী (৭/৪) ও শিল্পদৃষ্টি (৯/৪) ; অজিত দত্ত—সঙ্গীত ও বিনয় (৬/৪) এবং আমাদের শিশু সাহিত্য (৯/২)। অচ্যুত গোস্বামী তাঁর স্বনামখ্যাত উপন্যাসের আলোচনাগ্রন্থ 'বাঙলা উপন্যাসের ভূমিকা' চতুরঙ্গে প্রথম ছাপেন (৩/৩) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়—সাহিত্য বিচারের ভূমিকা (৫/১)। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়— এম. এন. পক্রভস্কির ইতিহাস মূলক রচনার অনুবাদ, (৪/১)। ধনিকের আবির্ভাব—কার্লমার্কসের 'ক্যাপিট্যাল' এর অনুবাদ (১/২)। গৌরীশংকর রায়—জমি, জমিদারী ও জাতীয় সম্পত্তি (২/৪)। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়—য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ভূমিকা (৯/২ থেকে ধারাবাহিক)। সন্তোষকুমার—জে. ডি.বার্নাল রচিত বিজ্ঞানের রূপান্তর শীর্ষক লেখার অনুবাদ, (৪/৩)। তারকচন্দ্র রায়—যাজ্ঞবল্ক্য ও প্লেটো (১০/২)। দিলীপকুমার বিশ্বাস—বিপ্লবী রামমোহন (৭/২) ; পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ (৮/৩)। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—সমালোচনা প্রসঙ্গে (৮/৪) এবং বিজ্ঞানবাদের ইতিকথা (১০/২)।

নবেন্দু বসু—প্রবাসী বাঙালী ও রস-সাহিত্য (২/৩)। নীলিমা দেবী—ভারতীয় নারীর বেশভূষা (৩/১)। নিখিল চক্রবর্তী—সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ। নীহাররঞ্জন রায়ের বিখ্যাত 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা'র রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের পরিণতি অংশ (১/২) ; 'বাঙালীর ইতিহাস' এর বাঙ্গালীর ইতিহাসের কাঠামো : আদি পর্ব (৩/২) ও বাংলায় হিন্দুরাজত্বের অবসান (৬/৩)। পঞ্চানন চক্রবর্তী—ভারতের স্বর্ণরপ্তানী (১/৩)। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—কারাকাহিনী (৭/৩)। বুদ্ধদেব বসু—রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শান্তি (১/১) ; লেখার ইস্কুল (১/৪), আড্ডা (৬/৪) ; বটকৃষ্ণ ঘোষ—অহিংস অসহযোগ (১/৩) ; শিক্ষা ও সমাজ (২/২) ; কান্টীয় স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষণজ্ঞান (৩/২) ; মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ (৬/৩) ; মার্কসীয় জড়বাদ ও সমাজতন্ত্র (৭/২) ; বিমলচন্দ্র সিংহ—আধুনিক সাহিত্য : কাব্যে নবযুগ (৩/২) ; সমাজ ও সাহিত্য (৪/৪) ; সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের গোড়ার কথা (৬/২) ; ইতিহাসের শিক্ষা ও ভারতের রাজনৈতিক কর্মসূচী (৭/৪)। বিনয়েন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতের শাসনতন্ত্রের নূতন ভিত্তি (৫/২) ; ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো কল্পনা (৬/১)।

ভারতী সারভাই—বন্দীর চিঠি—টেসাকে লেখা আর্মস্ট টেলরের চিঠির বক্তব্যের সূত্র ধরে (৬/১)। মানবেন্দ্রনাথ রায়—লিও ট্রটস্কি, (৩/১)। লীলা মজুমদার—ছোটগল্প (২/৪)। শ্যামল কৃষ্ণ ঘোষ—সোভিয়েট ছায়াচিত্র ও নাটক (৩/৩) ; শ্রীচন্দ্র সেন—ভারজিনিয়া উলফ। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—সাম্প্রতিক কবিতার ঢং(৩/৪)। সঞ্জয় ভট্টাচার্য—ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি (৪/৪) ; মার্কসবাদ (৬/৪) ; দ্বান্দ্বিক জড়বাদ (৭/৩) ; অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি (৯/১) ; রাজনীতি ও সাহিত্য (৯/৩)। সুশোভন সরকার—সাম্যবাদের উৎপত্তি ও পরিণতি (১/১) ; গণতন্ত্রের সংকট (১/২)। সুবোধ ঘোষ—ভারতীয় ফৌজের রূপান্তর (১০/১) ; সুধীরকুমার চৌধুরী—ঐক্যসাধনা (১০/৩)। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—প্রগতি ও পরিবর্তন (১/১) । সুপ্রভা রায়—সোভিয়েট রাশিয়ায় নারী (৭/১)।

www.pathagar.com

কবিতা লিখেছিলেন

বিষ্ণু দে (পাঁচ সংখ্যায়) ; জীবনানন্দ দাশ (অন্তত ১০ সংখ্যায়) ; হেমচন্দ্র বাগচী (দুই সংখ্যায়) ; আশরাফ সিদ্দিকী (৯/২) ; সুভাষ মুখোপাধ্যায় (দুই সংখ্যায়) ; সৈয়দ মুজতবা আলী (১০/৩) ; বুদ্ধদেব বসু (অন্তত এগার সংখ্যায়) ; সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দুই সংখ্যায়) ; নজরুল ইসলাম (একটি কবিতাই দেখা যায় তাঁর প্রকাশিত হয় চতুরঙ্গে, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায়—'জাগো অমৃত পিয়াসী চিত') ; অজিত দত্ত (তিন সংখ্যায়) ; সমর সেন (চার সংখ্যায়) ; জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১/২) ; বিরাম মুখোপাধ্যায় (৮/৪) ; হরপ্রসাদ মিত্র (অন্তত নয় সংখ্যায়) ; কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (অন্তত সাত সংখ্যায়) ; হুমায়ুন কবির (দুই সংখ্যায়, তিনি চতুরঙ্গে কবিতা বেশি প্রকাশ করেন নি, এখানে প্রবন্ধ, অনুবাদ ও আলোচনা, আর পুস্তক-সমালোচনা—অর্থাৎ গদ্যই বেশি) ; বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (দুই সংখ্যায়) ; নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১/৪) ; ফররুখ আহমদ (একটি, ৬/২) ; সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (একটি, ২/২) ; কিরণশংকর সেনগুপ্ত (একটি ২/২) ; বিভূতি চৌধুরী (অন্তত দুটি সংখ্যায়) ; গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় (একটি, ২/৩) ; বিশু মুখোপাধ্যায় (পুশকিনের অনুবাদ, ২/৩) ; সঞ্জয় ভট্টাচার্য (অন্তত দশ সংখ্যায়) ; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সংবর্ত, ৩/১) ; প্রেমেন্দ্র মিত্র (দুই সংখ্যায়) ; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (অন্তত চার সংখ্যায়) ; অমিয় চক্রবর্তী (অন্তত পাঁচ সংখ্যায়, উর্বর্বসীসহ) ; সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (অন্তত পাঁচটি) ; অরুণকুমার মিত্র (দুই সংখ্যায়) ; মণীন্দ্র রায় (দুই সংখ্যায়) ; গোলাম কুদ্দুস (অনন্ত পাঁচ সংখ্যায়) ; আবু নাসের (একটি, ৩/৩) ; সুধীরকুমার চৌধুরী (অনন্ত পাঁচ সংখ্যায়) ; প্রমথনাথ বিশী (প্রাচীন পারসিক থেকে অনুবাদ, ৪/১) ; বেনজীর আহমদ (একটি, ৪/৩) ; নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (৪/৪) ; দিনেশ দাশ (তিন সংখ্যায়) ; বীরেন্দ্রকুমার মিত্র (৯/২) ; এবং আবুল হোসেন (চার সংখ্যায়) ।

উপরিউক্তদের মধ্যে মুসলিম কবি মাত্র নয়জন। তাঁদের কবিতাও সংখ্যায় কম।

লীলাময় রায় (অন্নদাশংকর) এর একাঙ্ক নাটক 'বুলি' প্রকাশিত হয় ৪/২ সংখ্যায়। বুদ্ধদেব বসুর একাঙ্ক গীতিনাট্য—'অনুরাধা রায়'ও চতুরঙ্গে প্রকাশিত। আবু রুশদের দুটি গল্প,—একটি অনুবাদ খাজা আহমদ আব্বাস-এর চড়ুই পাখীর (৪/৩) ও স্বকীয় 'বকশিস' (৪/২) ; আবু নাসেরের গল্প—অসমাপ্ত (১/২) ও মর্জিনা (২/২) ; অমিয়ভূষণ মজুমদারের—নন্দরানী (৯/৩) ও উদ্বাস্তু (১০/১) ; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর—ক্লোজআপ (১/৪) ; মাটি (৩/২) ; আকাশ (৪/৪) ; শাঁখা (৫/২) ; যতন বিবি (৬/২) ও আসামী (৭/৩) প্রভৃতি গল্প এবং সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথামূলক বিখ্যাত উপন্যাস—'যাত্রী' (ধারাবাহিক, ১০/২ থেকে...) ; প্রেমেন্দ্র মিত্রের ময়লা মলাট (১০/২ থেকে ধারাবাহিক) ; নতুন বাসা (১/৪) ; বুদ্ধদেব বসুর (হতাশা, ১/২ ; সুপ্রতিম মিত্র ১/৪ ; প্রফেসর, ৫/২ ; দাম্পত্য আলাপ, ৬/১ ; প্রেমের কবিতা, ৭/২ ; আমরা তিনজন, ৯/১ ; কালো হাওয়া ৪/৩ ও অন্যান্য ; তিথিডোর ৯/২ থেকে....) ইত্যাদি কথাসাহিত্য চতুরঙ্গের পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করে।

এছাড়া গল্প লিখেছিলেন—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (দ্বিতীয়া, ১/৩) ; কমল মজুমদার (তেইশ, ১০/৩) ; জ্যোতির্ময় রায় (পাড়া ও পড়সী, ২/১ ; তমসা, ৬/২) ; জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (শালিক কি চড়ুই, ১০/১) ; তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (পিঞ্জর, ৩/১,

www.pathagar.com

বরসলাগের মাঠ, ৯/১); তপতী রায় (জাত, ৯/৪); নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (শিল্পী , ৯/২) ; নরেন্দ্রনাথ মিত্র (রস, ৯/৪ ; জৈব, ১০/৩) ; পরিমল রায় (বালিশের ওয়াড়, ৭/২) ; প্রবোধকুমার সান্যাল (ক্যামেরাম্যান, ৩/১ ; বিষ, ৬/১) ; প্রতিভা বসু (অনর্থক, ১/৩) ; ফজলুল হক (বুড়ী মা, ৬/২ ; মাছ ধরা, ৭/৩) ; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (বেশ কটি—বোমা, ১/১ ; মানুষ কাঁদে কেন, ২/৩ ; মালি, ৩/২ ; ধনজন যৌবন, ৪/১ ; শত্রুমিত্র, ৭/৪, ছেঁড়া, ৮/৩ ; নীচু চোখে ; দু'আনা আর দু'পয়সা, ১০/২) ; মণিন্দ্র রায় (মানুষ কাঁদে না কখন, ৩/৩) ; মনোজ বসু (মোংলা, ৬/৪ ; ধারাবহিক, ৮/৩) ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিড়ম্বনা, ৫/২ ; কয়লা ভাঁটা, ৬/৪) ; বিমল মিত্র (দড়ি, ৮/৪) ; রজত সেন (অরণ্য, ২/৪ ; রাহু, ৫/৪) ; রমাপদ চৌধুরী (শিশুমেধ, ৯/১ ; তিন তারা, ১০/২) ; লীলাময় রায় (মন মেলে তো মনের মানুষ মেলেনা, ৪/৪ ; হেঁয়ালি, ৭/১) ; ফিরোজ কবির (শার্ল নদিয়ের, নসিকার অনুবাদ, ৩/৪) ; শৈলেন ঘোষ (নীলাঞ্জন ৭/৪) ; সুধীর কুমার চৌধুরী (মানুষ ও দেবতা, ২/২) ; সঞ্জয় ভট্টাচার্য (ফসল, ২/৩ ; দাম, ৩/৩ ; অবান্তর, ৪/২ ; সুরু, ৬/৩ ; জীবন মৃত্যুর কাহিনী, ৭/১ ; অপরাধ, ৮/৪) ; সরোজকুমার রায় চৌধুরী (জনতা, ২/৪ ; সিগারেটের টুকরো, ৫/৩) ; সুবোধ ঘোষ (গোত্রান্তর, ৩/৪) ; অনধিকার প্রবেশ, ৫/১ ; এবং শতভিষা, ৬/১ থেকে ধারাবাহিক, ৮/১০ কিস্তিতে) ; সুধীন্দ্র প্রামাণিক (ক্ষুধার ভাষা, ৪/১) এবং সন্তোষকুমার ঘোষ (ষষ্ঠকন্যা, ৫/৪)।

বিভিন্ন বিভাগে বর্তমানের ইংরেজি সাহিত্য, বিভিন্ন দেশের বিশেষ কারো বা কোনো শাখার কিংবা বিশ্বসাহিত্যের আলোচনা ; বাংলা সাহিত্যের গতিবিধির ওপর, বর্তমান বাংলা সাহিত্য-পর্যায়ের আলোচনা ; শিশুদের বই, সিনেমা, সঙ্গীত, রেডিও, নাটক ও নাট্যমঞ্চ বা যাত্রা শিল্প ও পুস্তক-সমালোচনা বিভাগেও অংশ নিয়েছেন অনেক লেখক। এঁদের মধ্যেও বুদ্ধদেব বসু অন্যতম, ৮/১০টি প্রত্যক্ষ আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি ফরাসি ভাষার বিভিন্ন লেখকের বই ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোচনা করেন তিনি। বুদ্ধদেব বসুর আলোচনা বা রচনার সঙ্গে গুণবাচক বিশেষণ না লাগালেও বোঝা যায়, তিনি কী ধরনের আলোচনা লিখতেন।

হেমেন্দ্র লাল রায় বিভিন্ন সংখ্যায় সঙ্গীত বিভাগের রচনা লিখতেন। চিদানন্দ দাশগুপ্ত এবং 'আ', নামে একজন (ছদ্মনাম ?) সাম্প্রতিক সিনেমার পর্যালোচনা সমালোচনা করতেন। বিষ্ণু দে, মিনহাজ (এটিও ছদ্মনাম ?), অনিল আচার্য, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, মীরণ চৌধুরী, হীরালাল গদীওয়ালা (গুজরাটি সাহিত্যিক, অনুবাদে উপস্থিত) ; ইবনে বতুতা, অজিত দত্ত, মণিলাল সেনশর্মা, রাসবিহারী লাল, অমল দত্ত, নীলিমা দেবী (আর্টের ওপর), শচীন্দ্র সেন, নারায়ণ চৌধুরী (অনেক আলোচনা, অন্তত ১৪/১৫টি সংখ্যায়, সঙ্গীতের, নাটকের এবং বিচিত্র বিষয়ের ওপর। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য-শিল্পের আলোচক) ; অমিয়কুমার, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, হুমায়ুন কবির প্রমুখ চিত্র-শিল্প ও বিভিন্ন বিষয়ের বিদেশী, ইংরেজি বইয়ের সমালোচনা প্রচুর লিখেছেন।

আরও লিখেছেন : বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মিনতি দেবী, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, তিমিরবরণ, নীরদ, শওকত ওসমান, জড়ভরত, অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য (তিনিও হুমায়ুন কবিরের মতোই অনেক আলোচনা লেখেন) ; প্রতিভা বসু, রঞ্জন মজুমদার, আবুল হোসেন, সুরেশ মৈত্রেয়, গোপাল ভৌমিক, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অজিত কুমার গুহ, অমর

www.pathagar.com

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভা রায়, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জহিরউদ্দিন আহমদ, নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (অনেক সমালোচনা লিখেছেন) ; প্রবোধচন্দ্র সেন, দীপঙ্কর চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সীতাংশু আচার্য, সুধাংশু আচার্য, সমর সেন, রমেশ আচার্য, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, ইবনে বতুতা, সমশের আলি, এবং সুধাময় ভট্টাচার্য, মিনতি দেবী, আবু রুশদ, সত্য দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুধাময় রায়, জীবনানন্দ দাশ, মনীশ ঘটক, আবদুল মালেক, সৌরিন্দ্র মিত্র, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, নাজমুল হোসেন, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সুকুমার দত্ত, আকবর কবির, আবদুল আলি, ইলা দেবী, অরুণ ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনুজ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অনিল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বাগচী, রবি চক্রবর্তী, বিশু মুখোপাধ্যায়, অমিয়কুমার স্যান্যাল, অমল দত্ত, আবুল ফতিহ্, করালীকান্ত বিশ্বাস, ফজলুল করিম, পূর্ণেন্দু গুহ্, পুর্ণেন্দু সেন, রজত সেন, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরিস্তা, মায়া চক্রবর্তী, শচীন সেন, নরেশ গুহ্, রাসবিহারী দাস, ফিরোজ কবির, জেবুন্নেসা বেগম, হরপ্রসাদ মিত্র, আর্যকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদর্শন রায়, সুর দাস, নির্মল ভৌমিক, রমা গোস্বামী, রমাপদ চৌধুরী, নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ।[১৪]

৩

চতুরঙ্গের সাহিত্যদৃষ্টি ও সাহিত্য চিন্তা উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত লেখকদের নাম এবং তাঁর সঙ্গে উল্লিখিত রচনার শিরোনাম থেকেই সহজে উপলব্ধি করা যায়। তবু পত্রিকা জগতের এক বিশাল মহীরুহ চতুরঙ্গের বাংলা সাহিত্যচর্চার নমুনা, মতামত প্রভৃতি থেকে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। আর, বাংলা সাহিত্যকে তাঁরা কীরূপে দেখতে চান, আমাদের সাহিত্যিক ধ্যান ধারণায় কী কী অনুসঙ্গ যোগ করতে চান, তাও বোঝা যাক।

চতুরঙ্গর লেখকেরা বিশ্বসাহিত্য-ইতিহাস-সংস্কৃতিকে কীরূপে ও জ্ঞানে উপস্থাপিত করেছেন এবং তাতে কীরূপ ভ্রান্তি বাসা বেঁধেছে পাঠকসমাজে, সাহিত্যকে শিল্প সম্মতভাবে পরিবেশন করে পাঠকের রসবোধ ও জ্ঞানের পরিধিকে সুবিস্তৃত করেছে কতোটা, সে-সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

১৩৪৫ এর চৈত্র সংখ্যার 'বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক সম্পাদকীয় পর্যালোচনায় বাঙ্গালার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি উন্মোচিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গতানুগতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় পাঠক সমাজের অনুভূতিকে খোঁচা মারা হয়েছে। শুধু সেকালে নয়, একালে, এখনও পর্যন্ত প্রায়, জীবিত সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের রেওয়াজ দেখা যায় না। জীবিতকালে তাঁরা কী করেন, কিভাবে বাঁচলেন, লিখলেন, লিখবেন—সে-খবরটি পর্যন্ত রাখা হয় না।

কিন্তু মৃত্যুর পরে তাঁর সব লেখা, কাজই মূল্যবান হয়ে পড়ে। আবার বিপরীত প্রবণতাও দেখা যায়, বড়, মহৎ কবি-সাহিত্যিক হিসেবে সাহিত্যসমাজে, বা ইতিহাসে অনেককে উল্লেখ করা হয়—কিন্তু তাঁদের রচনাবলির প্রামাণ্য সংস্করণ পাঠকসমাজে সুলভ রাখা হয়না ; আর অকাল-প্রয়াত কবি-সাহিত্যিকদের বেলায়তো কথাই নেই—তাঁরাসমেত

www.pathagar.com

তাঁদের সমুদয় রচনাই কালের অতল গর্ভে হারিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে চতুরঙ্গের সমালোচনা :

> ....বাসি মড়ার প্রতি পক্ষপাত এ-দেশের কোনো কোনো বিশিষ্ট অঞ্চলে সাহিত্যসেবা নামে কথিত। অর্থাৎ একজন লেখক যতদিন না বেশ সম্ভ্রান্ত রকমের বাসি মড়া হতে পারলেন, ততদিন সাহিত্যের সরকারি পাণ্ডাদের কাছে তাঁর অস্তিত্ব নেই। এবং এ যোগ্যতা একবার অর্জন করতে পারলে আর কিছু দরকার করে না ; শুধু এরই জোরে যে-কোনো নিকৃষ্ট লেখক বিদ্বজ্জনের সম্মান ও মনোযোগের অধিকারী হন। জীবন ও জীবিতের প্রতি আমাদের ভয় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তবে সাহিত্যই বোধ হয় তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ-স্থল।

বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করা হয়—এপর্যন্ত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে 'গবেষণা'র নামে যা পাওয়া গেছে, তা বোধ হয়, ভাষাতত্ত্বের, নয়তো সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা, নয়তো প্রাক্-মাইকেলী যুগের গ্রাম্য-গীতির সংগ্রহ। বাংলাদেশের ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্রাম্যগীতির খাতির খুব বেশি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণব কবিদেরও দাম চড়া ; বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ আবহাওয়ায় 'বাংলা সাহিত্য' বলতে গাথা, ছড়া ও কীর্তনই বোঝায়, এই রকম একটা ধারণা হওয়া অসঙ্গত নয়। অন্যদিকে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' নামে ক্ষণজীবী প্রতিষ্ঠানটি আছে, তা কেন আছে, না-থাকলে ক্ষতি কী, তার অস্তিত্বেরইবা কোনো পরিচয় পাওয়া যায় কিনা. সাহিত্যিক মহল থেকে এইরকম একটা প্রশ্ন তোলবার এখন সময় এসেছে।'

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সমালোচনা করে বলা হয় :

> উনবিংশ শতকের কোনো-কোনো লেখকের তৈলচিত্র ঝুলিয়ে রাখলে এবং খান কয়েক পুরোনো বই আলমারিতে সাজিয়ে রাখলেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর মতো বৃহৎ একটি আখ্যালাভের যোগ্যতা হয় কিনা সেটাও ভেবে দেখবার বিষয়। এই প্রতিষ্ঠানের যেটুকু ক্রিয়াকলাপ তাও যথেষ্ট রকমের বাসি মড়া নিয়ে। জীবিতের সংশ্রব এ অতি সাবধানেই এড়িয়ে চলে। অপেক্ষাকৃত টাটকা মড়ার সঙ্গেও এর বিশেষ যোগাযোগ নেই ; সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্বন্ধে কোনোরকম খোঁজ খবরই এই ধূলি-ধূসর, শবগন্ধী প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।... এককালে আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে মড়াকান্নার প্রথা প্রচলিত ছিলো, সম্প্রতি লক্ষ্য করছি, সেটা গেছে। এতে অবশ্য উল্লসিত হবার কিছু নেই। কেননা মড়াকান্না দূর হবার কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, কোনো সাহিত্যিক মারা গেলে কারুরই কিছু এসে যায় না। এখন আমাদের দেশের সাময়িকপত্রিকাগুলোর মধ্যে কতগুলো তো সিনেমা কোম্পানির রক্ষিত, অন্য কয়েকটি পুরোপুরি রাজনৈতিক ; এবং ভালো, অর্থাৎ মানসিক বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির পাঠ্য যে দু'একখানি পত্রিকা আছে, তাদের আবার বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে গিয়ে এটা মনে থাকে না যে বাংলাদেশও বিশ্বের অংশ।

রসিকতা করে বলা হয়, এমন কোনো লোক যদি থাকেন যে, তিনি কেবল বিশেষ শ্রেণীর পত্রিকার পাঠক, তাহলে তাঁর কাছে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর অজ্ঞাতই থেকে যাবে। 'তিনি যদি অতি তরুণ হন, তাহলে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় কে, বা কী-কী বই লিখেছেন, তাও তাঁর অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব নয়। এই অবজ্ঞার ভাবটা প্রত্যেক বাঙ্গালি লেখককেই আপমান করে....। আমরা আজকাল সাহিত্য সম্বন্ধে এতই হৃদয়হীনভাবে উদাসীন যে সাহিত্যিককে এই অতি সাধারণ সম্মান দিতেও আমরা ভুলে যাচ্ছি। টাটকা শব

www.pathagar.com

সম্বন্ধেও আমাদের আগ্রহ নেই। এই তো সেদিন আর-একটা আঘাত পেলুম 'রামধনু' সম্পাদক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্বন্ধে আমাদের শিশু পত্রিকাগুলোর স্বল্পভাষিতায়।...'[১৫]

সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায় প্রমুখের রচনাবলি সংরক্ষণের প্রয়াস গৃহীত না-হওয়ায় দুঃখ করে বলা হয়, এতে আমাদের শুধু সাহিত্যিক শুভবুদ্ধির নয়, ব্যবসাবুদ্ধিরও অভাব বোঝা যায় ; কেননা সে-সব বই হতো উভয় অর্থেই সোনার খনির সামিল। আমরা এত বড়ো বর্বর যে অন্য যে-কোনো সভ্য দেশে যে-সব লেখা অমূল্য রত্ন বলে বিবেচিত হতো, সে-সব বইয়ের আকারে প্রকাশ করবার গরজ পর্যন্ত আমাদের নেই।'

একে 'ক্রিমিনাল নেগলেজেন্সি' না 'অপার নির্বুদ্ধিতা' বলা হবে সে প্রশ্ন রেখে সম্পাদক বলেন, 'পুরনো মন্দির সংরক্ষণের জন্য আইন আছে, কিন্তু সাহিত্য সংরক্ষণের দায়িত্ব কার? কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কোনো সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান, কোনো শাসনতন্ত্রই এ দায়িত্ব নেবে না ; আস্তে আস্তে আমাদের সাহিত্যের অনেক কীর্তিই শুধু এই কারণে লুপ্ত হয়ে যাবে যে-কোন ব্যক্তি সেগুলো মুদ্রাযন্ত্রের কবলিত করবার পরিশ্রমটুকু না করলে।'

আলোচক দীর্ঘতর রচনায় উল্লেখ করেন, এরকম আরো আছে। গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁদেরও কোনও বই পাওয়া যায় না। এমনকি মধুসূদন দত্ত পড়তে হলেও বসুমতীর দারস্থ হতে হয় ; এই মহাকবির এখন পর্যন্ত কোনো প্রামাণ্য সংস্করণ বেরুলো না। দীনবন্ধু সম্বন্ধেও সেই কথা। প্রাক-রবীন্দ্রসাহিত্য, বসুমতী সিরিজে যা নেই, তা পড়বার ইচ্ছে হলে শুধু বই সংগ্রহ করতেই আপনাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে।

অকালপ্রয়াত কবিদের (সুকুমার সরকার, নীলিমা দাস প্রমুখ) প্রসঙ্গে বলা হয়, পাশ্চাত্যে দু'চারটি ভালো কবিতার রচয়িতাদেরও রচনাবলি প্রকাশ করা হয় শুধু দু'চারটি ভালো পংক্তিকে অক্ষয় করে রাখবার জন্য। কিন্তু আমাদের দেশের প্রতিশ্রুতিশীল অকালপ্রয়াতদের রচনা মাসিকপত্রের পাতাতেই থেকে যায় বা লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যায়, কিন্তু এগুলো সংরক্ষণ জরুরি।

> 'এতই দুর্ভাগা আমরা যে কলকাতায় সকলের অধিগম্য এমন একটি লাইব্রেরী পর্যন্ত নেই, যেখানে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত বই ও সাময়িকপত্র সংরক্ষিত হয়, অথচ আমাদের শাসকরা ছাপাখানা থেকে প্রত্যেক বই ও পত্রিকা তিন কপি করে নিচ্ছেন।'

পাশ্চাত্য-সাহিত্যজগতের প্রত্যক্ষদর্শী অভিজ্ঞ পণ্ডিত কবি সম্পাদক এভাবে দেশের সাহিত্যরীতি ও সংস্কৃতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে ভুরি ভুরি নজির উপস্থাপন করেছেন চতুরঙ্গের সকল বক্তব্যে। তিনি যা বলেন তার মূলকথা হলো সাহিত্যসমাজকে সচেতন ও দূরদর্শী আর দায়িত্বশীল হতে হবে সকল দিক থেকে। এবং দেশীয় পশ্চাৎপদ, অবক্ষয়ধর্মী চিন্তাধারার পরিবর্তন করতে হবে—সাহিত্যিক সম্পদে ঐশ্বর্যশালী হতে হলে। আমাদের অবজ্ঞা ও অজ্ঞতার কারণে অনেক 'শ্রেষ্ঠ রচনাও অনায়াসে হারিয়ে যাচ্ছে, আমরা চুপ করে বসে বসে দেখছি। সুতরাং চতুরঙ্গের পরামর্শ :

> ...যাঁরা ভালো লিখছেন বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ এই যে তাঁরা যেন দয়া করে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন, এবং জীবৎকালেই তাঁদের সমস্ত রচনার নির্ভুল ও প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। আরো অনুরোধ যে, তাঁরা যেন প্রত্যেকেই একটি করে আত্মজীবনী

www.pathagar.com

লিখে যান, কেননা প্রাণান্ত পরিশ্রম করেও বাঙ্গালি লেখকদের জীবন সম্বন্ধে কোনো তথ্য সংগ্রহ অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে ; এমনকি অনেক ক্ষেত্রে জন্মের তারিখটা পর্যন্ত জানা যায় না। এ-পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কোনো ইতিহাস কি ঐ জাতীয় অন্য কোনো গ্রন্থ বেরোয়নি যেখানে প্রাচীন থেকে আধুনিক পর্যন্ত সমস্ত লেখকদের আর কিছু না হোক, জন্মের তারিখটা অন্তত পাওয়া যায়। এইভাবে আর কতদিন চলবে।[১৫]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন বছর আগে চতুরঙ্গ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ বাংলা ১৩৪৬ থেকে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ উদ্যোগ নেয় 'রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনার একটি নূতন সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের' এবং ২৭ খণ্ডে সমাপ্ত রবীন্দ্ররচনাবলির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সনের আশ্বিন মাসে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রয়াসের প্রশংসা করেও নিজের দুর্বল রচনাগুলোকে পরিত্যাজ্য করতে চান এবং বলেন,

'ভুরিপরিমাণ যে-সকল লেখাকে আমি ত্যাজ্য বলে গণ্য করি আপনাদের সম্মিলিত নিবন্ধে সেগুলিকেও স্বীকার করে নিতে হবে। আমার লজ্জা চিরন্তন হয়ে যাবে এবং তাতে আমার নাম-স্বাক্ষর থাকবে। অর্থাৎ ভাবীকালের সামনে যখন দাঁড়াব তখন গাধার টুপিটা খুলতে পারব না। আপনারা তর্ক করে থাকেন, ইতিহাসের আবর্জনা দিয়ে যে গাধার টুপিটা বানানো হয়, ইতিহাসের খাতিরে সেটা মহাকালের আসরে পরে আসতেই হবে। কবির তাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়। ইতিহাসও বহু অবাস্তবকে বর্জন করতে করতে তবে সত্য ইতিহাস হয়। মানুষের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের দেহে যে একটা লম্বমান প্রত্যঙ্গ ছিল সেটাকে সর্বদা পশ্চাতে যোজনা করে বেড়ালে মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয় না, একথা মানব সন্তানমাত্রেই স্বীকার করে থাকে।'[১৭]

কিন্তু হুমায়ুন কবির চতুরঙ্গে তাঁর সমালোচনায় বলেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ যে-স্থান অধিকার করে আছেন, আর কোন দেশের সাহিত্যে কোন সাহিত্যিক তা করেছেন বলে জানি না। অন্য অনেক সাহিত্যেও মহাকবির পরিচয় পাই,—তাঁদের সাধনায় সাহিত্যের মোড় ফিরে গেছে,...রবীন্দ্রসাহিত্যে যুগধর্ম মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্য সাহিত্যিকেরা ইতিহাসে গৌরবময় স্থান অধিকার করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস। তাই রবীন্দ্ররচনাবলীর নতুন সংস্করণের জন্য আমরা বিশ্বভারতীর কাছে কৃতজ্ঞ। কেবল তাই নয়, অনেক পুরানো রচনা তাদের প্রাক্তন রূপে প্রকাশিত না হয়ে বিভিন্ন সংস্করণে অল্পবিস্তর যে পরিবর্তন হয়েছে, তাদের মধ্যে বর্তমানে যে পাঠ রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত সেই ভাবেই প্রকাশিত হলো। তাতে কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা অনেক ; কারণ প্রাক্তন রচনায় যে সহজ প্রবাহ, পরবর্তী সংস্করণে সর্বত্র তার উৎকর্ষ হয়না।

বর্তমান সমালোচকের বিশ্বাস যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাগ্রন্থ প্রকাশের কালানুক্রম অনুসারে অপরিবর্তিতভাবে প্রকাশিত করলে এ রচনাবলী সংগ্রহের মূল্য আরো বেশী হবে। ভূমিকায় কবির যে আপত্তির উল্লেখ করা হয়েছে, সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁর মূল্য খুব বেশী নয়। কারণ কাব্যসৃষ্টি ও প্রকাশ কবির নিজের অধিকার, কিন্তু একবার প্রকাশিত হয়ে গেলে তার উপর সর্বসাধারণের দাবী। রবীন্দ্ররচনার বেলা একথা আরো বেশী করে খাটে। কারণ ষাট বছরের কষ্টিপাথরে তার মূল্য যাচাই হয়ে গেছে, এবং ব্যক্তি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নিজের এ সমস্ত রচনার উপর এখন আর কোন দাবী নেই। তাছাড়া কবিই যে তার কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক, এসম্বন্ধে কোন স্থিরতা নেই।... যে রচনা সমালোচকের দৃষ্টিতে কবি বর্জন

www.pathagar.com

করতে চান, হয়ত মহাকালের বিচারে তাই থাকবে টিকে, আর কবির সজ্ঞান মুহূর্তের বেছে নেওয়া রচনা পড়ে যাবে বাদ।[১৮]

শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে চতুরঙ্গের প্রাবন্ধিক অজিত দত্ত 'বাংলা শিশু সাহিত্য' বিষয়ের আলোচনায় বলেন :

> শিশুকে খুসি করা সহজ, অতএব শিশু-সাহিত্য সৃষ্টি করাও সোজা, এই মারাত্মক ভুল ধারণা বাংলাদেশে অত্যন্ত প্রসার লাভ করেছে বলে মনে হয়। তার ফলে বাংলা ভাষায় ছোট ছেলেদের অসংখ্য বই বেরিয়েছে—যা না বেরুনোই উচিত ছিলো।...শিশু সাহিত্য জিনিসটা সাহিত্যই অন্য কিছু নয়। একথা যদি স্বীকার করি, তাহলে এক্ষেত্রেও প্রতিভা কিংবা নৈপুণ্যের প্রয়োজন না মেনে উপায় থাকে না। অথচ আজ শিশু সাহিত্যের 'বাজার' দখল করে আছেন তাঁরাই, যাঁরা মোটেই লিখতে জানেন না। ছেলেদের জন্য একখানা বই কিনতে গেলে যত রকম বই দেখানো হয়, তার কোনটাই ছেলেদের হাতে তুলে দিতে মন সারে না। অধিকাংশ বইয়ের ভাষা খারাপ, ছন্দ ভুল এবং রসিকতাগুলো একঘেঁয়ে। শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসাহিত্যিকদের এই আক্রমণ অত্যন্ত মারাত্মক।...'

> বড়দের বই প্রায় মানুষ পড়ে না, আর পড়লেও যা হবার তা হয়ে গেছে, মননের পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু শিশু খাদ্যর বিষক্রিয়ার মত কুৎসিৎ রচনা দ্বারা পরিবর্দ্ধমান শিশুমনকে পরে পরিপুষ্ট ও পরিবর্তন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। 'আমার চিরকালই বিশ্বাস যে শিশু সাহিত্য তখনই সার্থক হয়, যখন বড়দেরও তা ভালো লাগে। কারণ তখনই প্রমাণ হয় যে জিনিষটা সাহিত্যই।' ননসেনস্ এর মধ্যদিয়েই গভীর সেনস্ প্রকাশ করা সম্ভব। আমরা ভুলে যাই যে, বড়দের চেয়ে শিশুরা সাহিত্য সম্বন্ধে বেশি সচেতন। কিন্তু এখনকার পাঠ্যগুলো তাদের রসানুভূতিও নষ্ট করে দিচ্ছে। বাংলা সাহিত্য সার্বিকভাবে এগুচ্ছে মনে করলেও শিশু সাহিত্যের বেলায় তা বলা চলে না। অবশ্য শিশু সাহিত্য রচনার জন্য এক অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। 'যা প্রকৃত সাহিত্য হবে অথচ ছোটরা ভালবাসবে তেমন লেখা সব সাহিত্যিকই লিখতে পারেন না। শিশুর মন বোঝা খুব সহজ নয়।' লেখক সংশয় প্রকাশ করে বলেন, বর্তমানের শিশু সাহিত্য পড়ে বড় হয়ে এরা কখনো ভালো সাহিত্য উপভোগ করতে পারবে কিনা ! ছোটদের কাগজের মডেল হওয়া উচিত 'সন্দেশ'।[১৯]

বাংলা সাহিত্যের এই দুরবস্থার জন্যেই সম্ভবত বুদ্ধদেব বসু ভেবেছিলেন, 'লেখার একটা ইস্কুল খুললে কেমন হয়। বিজ্ঞাপনে দেখেছি বিলেতে অনেক ইস্কুল আছে যারা পত্রযোগে গল্প-টল্প লিখতে শেখায়। তাদের শিক্ষার প্রণালী প্রত্যক্ষ জানবার সৌভাগ্য আমার হয়নি ; কিন্তু অনুমান করি যে বিলেতি সচিত্র মাসিকে যে এক ধরনের ছক কাটা, মাপসই গল্প ছাপানো হয়, সে-গল্প এদের সাহায্যে লিখতে শেখা অসম্ভব নয়।'

বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের ইস্কুলের প্রস্তাবক ভেবেচিন্তে আপাতত এই পরামর্শ দেন যে, 'লিখতে শেখবার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে—পড়া। লেখাতে হাতে ধরে শেখাবার কিছু নেই—ছবি আঁকায় আছে, গানে আছে। কথা ছাড়া লেখার আর কোন উপাদান নেই, এবং এ সমস্ত কথা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। কথাগুলো সবই প্রায় আমাদের জানা, কিন্তু ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি বসানোতেই লেখকের বিশেষত্ব। লেখার ইস্কুল খুলে, দুঃখের বিষয়, সেটা শেখানো যায় না ; কথার ওস্তাদ কারিগর যাঁরা, তাঁদের কাছেই সেটা শিখতে হয়, তাছাড়া অবশ্য প্রত্যেক লেখকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই কারণে লেখক নিজেই নিজের শিক্ষক ; অন্যের কাছ থেকে তিনি প্রচুর শিখতে পারেন ও শিখে

www.pathagar.com

থাকেন, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে, অনেক সময় নিজেরও অজান্তে ; প্রত্যক্ষ ও সচেতনভাবে তিনি যখন পাঠ নিতে যান, সে-শিক্ষা মূল্যবান হবে না এমন বলি না, কিন্তু খুব দূরস্পর্শী হবে না।

ভাষার সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি ভঙ্গিকে নিখুঁত করা, কথাগুলোয় সম্ভবমতো পালিশ চড়ানো—এগুলো ইস্কুলের ধরণেই শেখানো যেতে পারে ; কিন্তু ভাষার মর্মস্থলে প্রবেশ করবার রাস্তা পৃথিবীর মহৎ লেখকদের গ্রন্থমালাই। সেখান থেকে লেখক শুধু যে ভাষার রহস্যই শেখেন তাই নয়, জীবনের রহস্যও খানিকটা শেখেন ; জীবনের অভিজ্ঞতাকে তিনি সবসময়েই সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা দিয়ে বর্ধিত শোধিত ও সংযত করে নেন।

আর শেষ পর্যন্ত জীবনকে দেখতে শেখাই লেখকের প্রধান দায়িত্ব। এবং এটাও কোনো ইস্কুলে শেখানো যায় না। সমস্ত জীবনই লেখকের কাঁচামাল ; কিন্তু জীবন বিশৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী, সেই উত্তাল আবর্ত থেকে কোন্ সময়ে কতটুকু তিনি নেবেন, এবং কী ভাবে সেটা ব্যবহার করবেন, তার জন্যে নিজের রুচি ও বিচারবুদ্ধি, তাছাড়া সোপার্জিত শিক্ষার উপরেই তাঁকে নির্ভর করতে হবে। ভাষা ও আঙ্গিকের উপর মোটামুটি দখল না জন্মালে লেখকই হওয়া যায় না। কিন্তু জীবনকে কে কত ব্যাপক ও কত গভীরভাবে দেখতে পেরেছেন, এবং তার প্রকাশই বা কতটা সত্য হয়েছে, লেখকদের আপেক্ষিক গুরুত্বের এ-ই শেষ বিচার।'[২০]

'সাম্প্রতিক কবিতার ঢঙ' নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে ; যেমন, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, সাম্প্রতিক (বা আধুনিক) বাংলা কবিতার বয়স বেশী না-হলেও সেটা বর্তমানে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং বলা হয় যে, 'এযুগের কবিতা তার আকারে, প্রকারে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, রচনা-কৌশলে এবং শব্দ-গ্রন্থন পদ্ধতিতে এমন একটা রীতিসিদ্ধ ধারায় এগিয়ে চলছে যা শুধু যে অভিনব তা-ই নয়, তাকে যুগান্তর সৃষ্টিকারী বললেও অত্যুক্তি হয়না। এ প্রকার উক্তি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

কিন্তু অভিনব হলেই কি সুন্দর হয়? শব্দবিন্যাস ও রচনার প্রকৃতি নতুন পথে পরিবর্তিত হলেই কি হৃয়দ গ্রাহী হবে? মনে হয় না, কারণ, শব্দবিন্যাস বা রচনার প্রকৃতি নতুন পথে পরিবর্তিত হলেই যে কবিতা হৃদয়গ্রাহী হবে এমন কোনো কথা নেই। আর দৃষ্টিভঙ্গি বা আঙ্গিকের নূতনত্বের জন্যেও কাব্য হৃদয়গ্রাহী হতে পারে না। যদিও ঠিক যে, কোনো যুগের কাব্যের প্রকৃতি বা প্রগতি সেই যুগের প্রকৃতিরই অনুগামী হবে। কিন্তু আমাদের পরিবর্তিত জীবনের মাল মশলা দিয়ে কবিতা তৈরি হলেই যে তাকে সাম্প্রতিক কবিতা বলা হবে তার কোনো মানে নেই।

> কারণ কাব্যের বিষয়বস্তু চিরকালই যুগে যুগে অপরিবর্তনীয় এবং তার পরিধিও কোনো যুগের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। কবিতার জন্ম চিন্তা থেকে, যে বিষয়বস্তু থেকে এ চিন্তা বা অনুভূতির উৎপত্তি তা দিয়ে সত্যকার কবিতা রচনা হয় না।....এরা (আধূনিক বিষয়) আমাদের জীবনে অনেকখানি বৈচিত্র্য এনেছে, তাতে করে বৃহৎ জগৎ ছোট হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সম্মুখে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সীমানাটাও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছে পরিমিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাহিরের এই জিনিষগুলি যে আমাদের জীবনে পরিবর্তন এনেছে, সেইটেই আসল কথা নয়। আসল কথা এই পরিবর্তিত আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের বিধিবদ্ধ ধারণা ও ভাবুকতা কতখানি নাড়া পেয়েছে, আমাদের ধর্মে ও রাষ্ট্রে, সামাজিক ও

www.pathagar.com

নৈতিকজীবনে বা বিবেকবুদ্ধিতে তাতে করে কি পরিবর্তন ঘটেছে এবং সে সম্পর্কে আমাদের কবিদের মননশীলতা বা ভাবধারণায় (attitude-এ) বা কি পরিবর্তন ঘটেছে, সাম্প্রতিক কাব্য বিচারের পক্ষে সেইটেই হচ্ছে আসল কথা।[২১]

শুধু দেশের নয়, বিদেশের বইয়ে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কী বলা হচ্ছে বা না হচ্ছে, তাও চতুরঙ্গের চোখ এড়াতে পারেনি। রাসব্রুক উইলিয়ামস্ প্রণীত এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত বিশ্ববৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তিকার সমালোচনায় ইবনে বতুতা বলেন, প্রচার–পুস্তিকা হলেও তাঁদের প্রকাশনাগুলো মোটামুটি তথ্যপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত, কিন্তু ভারতবর্ষ ও প্যালেস্টাইন সম্বন্ধীয় পুস্তিকাগুলো এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। বইগুলো 'অসত্য ও অর্ধসত্যে পরিপূর্ণ'। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে ভারতবর্ষের সমস্যাকে দেখে, তার পরিচয় হিসাবে পুস্তিকাখানি কৌতুক উদ্রেক করবে।[২২]

বিশ্বসাহিত্য বুঝতে হলে রাজনীতি সচেতনতা দরকার। সাহিত্যিককে আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আজ আর নিজের কুটীর–কোণে বসে তারা গুণলে চলবে না। তার বদলে মানবজাতির ভাগ্য গণণা করতে হবে। আর সেজন্য সাহিত্যিককে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

মুসলমান সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদও তা মর্মে–মর্মে উপলব্ধি করেছেন। তিনি লিখেছেন রাজনীতিতে সাহিত্যেকের এই হস্তক্ষেপ বিশ্বের সর্বত্র প্রয়োজন হলেও রুশিয়ার পরেই বোধ হয় আমাদের এই দুর্ভাগা দেশেই তার প্রয়োজন আশু। কারণ মানবজাতির যে দুর্ভাগ্য তাদের জীবনকে কুৎসিৎ, কদর্য্য ও অসুন্দর করেছে, সে দুর্ভাগ্য বোধ হয় ভারতবর্ষেই সকল দেশের চাইতে বেশী।

এ হতভাগ্য দেশের হতভাগ্যতর সন্তানদের উপর রাগ করে গত যুগে সাহিত্যিক নিরাশ কণ্ঠে তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন : 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদেরে করেছ অপমান, হতে হবে তাহাদের সবার সমান।' —কিন্তু এটা রাগ, অভিশাপ–অভিমানের কথা, হস্তক্ষেপের কথা নয়। আজ তাই করতে হবে। সাহিত্যিককে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে হবে। আত্মভোলা জাতিকে আত্মহত্যার হাত থেকে, নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতে হবে সাহিত্যিককেই। সাহিত্যিকই জাতির ভাগ্যের ইঞ্জিনিয়ার। রাজনীতিক তার মিস্ত্রী মাত্র। 'বস্তুত সাহত্যিককেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের তাজমহলের পরিকল্পনা করতে হবে : রাজনীতিক তা গড়ে তুলবেন সাহিত্যিকের সৃষ্ট উপাদান দিয়ে তাঁরই আঁকা নক্শার উপর।'

আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন,

> আমরা ভারতবাসীর মুক্তি চাইছি। কিন্তু ভারতবাসী সেটা চাইছে কই? মুক্তি চাইবার মত মন্ত্র তার তৈরী হয়েছে কী? ভারতবর্ষে আজ যে কদর্য্যতা, কৌৎসিত্য ও অসৌন্দর্য্যের তাণ্ডব চল্ছে, এসব দূর করতে গেলে চাই আমূল পরিবর্তন, রাজনীতিক যাকে বল্ছে বিপ্লব। কিন্তু সে বিপ্লবী মন কই? ভারতবাসী যে বিপ্লবের যোগ্য হয়নি, তার প্রমাণ তার সাহিত্য। তার সাহিত্যে বিপ্লবের সুর কোথায়? তার বুকে বিপ্লবের প্রাণস্পন্দন শুনছো কি? শুনছি না কেন? কারণ তার সাহিত্য প্রাণহীন। ভারতবাসীর সাহিত্যের সঙ্গে তার জীবনের যোগ নেই ; তাতে তার দুঃখ বেদনার ছাপ নেই ; মুক্তির পথ–নির্দেশ নেই।' তা বলে কিন্তু সাহিত্যিককে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া চলবে না। সাহিত্যিককে আমাদের জীবন–

www.pathagar.com

সংহিতা লিখতে হবে, আমাদের জীবন-ক্ষুধাকে রূপ দিতে হবে তাঁর সৃষ্টিতে। 'সমস্ত জাতির সত্যিকারের মুক্তির অগ্রদূত সাহিত্যিককেই হতে হবে।[২৩]

কিন্তু এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হলে সাহিত্যিকদের বুঝতে হবে ধর্ম নিয়ে রাজনীতির ব্যবসা চলছে, তাতে তাঁদের যোগ না দিয়ে মানবতাবাদীর দৃষ্টিতে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাহিত্যিককে কাজ করতে হবে। সমাজ ও শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করা আবশ্যক। সমাজ-দর্শন ও শিক্ষা-দর্শনের আমূল পরিবর্তনও সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। সমাজের প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি পরিতৃপ্ত করবার চেষ্টা যুগযুগ ধরে হয়ে এসেছে ধর্মের নামে বা ধর্মের সাহায্যে।

> ধর্মেরও সামাজিক রূপ আছে, কিন্তু তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানবের ব্যক্তিত্বের তৃপ্তিসাধন। সমাজকে সমগ্রভাবে পরিচালিত বা প্রভাবান্বিত করা ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ব্যক্তিনিষ্ঠতাই ধর্মের প্রধান লক্ষণ।

তাই আজ এই বিংশ শতাব্দীতে ধর্মের আলোচনা করে কি লাভ? 'ধর্ম বলিয়া কি আছে আর কিছু? হিন্দুসভা ও মুসলিম লীগের পাণ্ডারাও কি মনে মনে সকলেই বিশ্বাস করেন না যে ধর্ম অর্থলাভের উপায় মাত্র? ফ্রান্স, ইংলন্ড, রাশিয়া প্রভৃতি যে-সব দেশে ধর্মের নামে অর্থলাভের সুবিধা নাই, সে-সব দেশে তো ধর্মের অস্তিত্বই প্রায় নাই। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ধর্মের...সংজ্ঞাটি স্মরণ করিতে হইবে যে, যদ্দ্বারা মানুষের অন্ধ আবেগ পরিতৃপ্ত হইবার অবকাশ পায় তাহাই হইল ধর্ম। এই অর্থে ধর্ম কোথাও মরে নাই, মরিতে পারেনা।'

কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মতো ধর্ম নয়, সমগ্র জাতি ও সমাজকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা কৃষ্টিরই সাধন করা উচিত। কারণ 'ধর্মের ভিত্তিতে সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিলে কৃষ্টির হানি হয়, ধর্মও লোপ পায়। আমাদের দেশে কিন্তু এইটিই এখন ঘটিতে বসিয়াছে। হিন্দু ধর্ম ও মুসলমান ধর্মে সন্তুষ্ট না থাকিয়া আমরা এখন হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের পরিকল্পনায় মশগুল। ধর্মের এই রূপ অপব্যবহার মধ্যযুগের পর পৃথিবীতে আর কোথাও হয় নাই। অথচ এই ভারতবর্ষেই কৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল।'[২৪]

আজকার অসার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তর থেকে সার্থক সংস্কৃতি চিন্তার স্তরে উপনীত হতে হলে যে সব ধাপ আমাদের অতিক্রম করতে হবে তার কিছু নির্দেশ সাহিত্যিকগণ তখনই দিয়েছিলেন। কিছু কথা চতুরঙ্গর-র পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করা যাক : একটি রচনায় বলা হয় :

১. দেশে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না।
২. একান্ত বীভৎস না হলে কোনো সমাজেরই ধর্মাচার অশ্রদ্ধেয় বিবেচিত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে যে যা প্রাচীন তা প্রাচীন বলেই বরণীয় নয়, বরণীয় তার বর্তমান কার্যকারিতার জন্যে।
৩. হিন্দু মুসলমানের পোষাক ও নামের ব্যবধান থাকবেনা অথবা অস্বীকার করা হবে।
৪. সামাজিক আদান-প্রদান-বিবাহ-আদি সমেত সর্বত্র সহজ হবে।
৫. আইন সমস্ত দেশের জন্যে এক হবে।[২৫]

দেশের মঙ্গল ও মুক্তির জন্য চতুরঙ্গ সামাজিক সমস্যার সকল দিকেই দৃষ্টি দিতে চেয়েছিল। সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধিজীর্ণ পরিবেশে, পাকিস্তান আন্দোলনকালে, মার্কসবাদীর দুর্বলতাসম্পন্ন কংগ্রেসী ধারার স্বাধীনতা আন্দোলনরত বুদ্ধিজীবী লেখকদের আধিক্যপূর্ণ

www.pathagar.com

পত্রিকায় জমিদারী ব্যবস্থা, জমিজমা ও জাতীয় সম্পত্তি সম্পর্কে স্টালিন এর 'অন দি সোভিয়েট কনস্‌টিটিউশন' অনুসরণেও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে এবং তাতে মত দেয়া হয়েছে যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মুক্তি চরম মুক্তি নয়।

কিন্তু এই বন্ধন মুক্তির ফলে দেশের কৃষি প্রগতির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে যদি কৃষি–ব্যবস্থাকে রাশিয়ার ধারায় প্রবাহিত করতে পারা যায়।

> সমাজ বিকাশের নূতন পথ, নূতন দিক উন্মুক্ত হবে, জীর্ণ ব্যবস্থার মর্মর–মূর্তির পরিবর্তে দেশে সফল কৃষি ও সজীব কৃষক দেখা দিবে।[২৬]

শুধু প্রবন্ধে নয়, কবিতায়ও সমকালীন দুর্ভিক্ষ–দুর্নীতি (১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষ আগত অবস্থায় রচিত) প্রতিভাসিত হয়েছে, খেলাফত, অসহযোগ ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কর্মী বেনজীর আহমদ (১৯০৩–৮৩) এর একটি কবিতায় দেখা যাক :

> মুমূর্ষু ধরায় নেমেছে আজ
> নিরাশা–কৃষ্ণ মরণ অন্ধকার।
> মহানগরীর বুকে বুকে দোলে
> সমাধি–শশ্মানের ভীতি–বিহ্বলতা;
> ফুটপাথের পাশে পাশে দেউটীর মালা
> অন্ধকারের আবরণে ঢেকেছে মুখ ;
> বজ্রাহত সদ্য–মৃতের মতো লাইট–পোষ্টের সুদীর্ঘ লাইন।[২৭]

কিন্তু রোম্যান্টিক কবিতাও লিখেছেন মার্কসবাদী কবিরা—যেমন গোলাম কুদ্দুস এর 'পঙ্কজ' :

> ....গাগরী ভরিবে রাধা জলে।
> রাত একটায় পিজ ঢালা পথে
> লোকটা কোথায় চলে।
> ক্লান্ত শহর তন্দ্রাকাতর, স্তব্ধ দিনের পাখা,
> কর্মের নদী নিশ্চল সরোবর,
> অতল সলিলে খসিল আঁচল, কাঁচুলী, অঙ্গ রাখা।
> যমুনার কূল কত জন্মান্তর !
> বৃত্তাকারেই সর্পিল পথ বারে বারে প্রসারিত,
> দেহের অতলে হাজার মৃত্যু আসে।
> পঙ্ক এখানে কেবলি জৈব–যাতনা–সং শঙ্কিত
> পঙ্কজহারা কাঁপিছে শয্যাপাশে।[২৮]

সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের ভাবনা ছিল। লেখকদের অধিকাংশ রচনাই মার্কসবাদী ধ্যান–ধারণা প্রভাবিত। কিন্তু এটাকে 'মার্কসবাদী পত্রিকা' একেবারে নিঃসংশয়ে বলা বোধহয় ঠিক হবে না। চিন্তাচর্চার মুক্তমঞ্চ হিসেবেই চতুরঙ্গকে দেখা উচিত।

'বুদ্ধির মুক্তি' বা প্রমথ চৌধুরীর প্রিয় বক্তব্য—emancipation of intellect ই ছিল এর আদর্শ। সম্পাদক কী মনে করে একবার সকলের সন্দেহ নিরসন করার জন্য বলেছিলেন মুখ ফুটে সে কথা, যদিও বলার অপেক্ষা রাখেনি, চতুরঙ্গ নিজেই প্রকাশিত হয়েছে আপন–স্বরূপে। কিন্তু ক্ষুদ্রপরিসরে চতুরঙ্গর বৈশিষ্ট্য কতোটাই বা প্রস্ফুটিত করা যায়? তাই সম্পাদকের ঘোষণা বা বিবৃতিটি এখানে উল্লেখ করা গেল :

www.pathagar.com

চতুরঙ্গ কখনো কোনো বিশেষ রাজনৈতিক বা সাহিত্যিক দল বা গোষ্ঠীর মতবাদের মোহে আত্মসমর্পণ করেনি, বরং নিরপেক্ষভাবে সমস্ত সাহিত্যিকের রচনাকেই স্বীকার করবার চেষ্টা করেছে। তাই সাহিত্য এবং সমালোচনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মতবাদের পরিচয় চতুরঙ্গের রচনাবলিতে মিলবে। সাহিত্যিক মূল্যবিচারে মতভেদের স্থান আছে এবং কোন বিশেষ মতের প্রাধান্য দেওয়া বা অস্বীকার করা দুই-ই সাহিত্যধর্মের বিরোধী। এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই 'চতুরঙ্গ' সমালোচকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে এসেছে। সমালোচকের মতামত সম্পাদকের দৃষ্টিতে ভুল বা অযৌক্তিক মনে হলেও সে মতামত প্রকাশে কখনো বাধা দেওয়া হয়নি। অন্য পত্রিকায় এরকম ঘটেছে কিনা জানিনা, কিন্তু সম্পাদকের নিজের রচনার বিরূপ সমালোচনা 'চতুরঙ্গ'তে অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচক নির্বাচনের জন্য অবশ্য সম্পাদক দায়ী, কিন্তু সমালোচনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র সমালোচকের।[২৮]

চতুরঙ্গের প্রতিষ্ঠালগ্নে নিয়মাবলী বেঁধে দেয়া হয়েছিল—'আশ্বিন হইতে বর্ষ শুরু করিয়া প্রত্যেক তৃতীয় মাসে অর্থাৎ আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ় মাসে 'চতুরঙ্গ' বাহির হয়। মূল্য বার্ষিক সডাক ৩ টাকা চার আনা, প্রতি সংখ্যা ১২ আনা। বৈদেশিক ৮ শিলিং। চতুরঙ্গ–এ প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার। প্রাপ্ত রচনা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যতা থাকিবে না। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন সংখ্যার পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের ২১ তারিখের মধ্যে আমাদের জানাইবেন। চিঠিপত্র পাঠাইবার সময় অনুগ্রহ পূর্বক গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন।

বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি সংখ্যার সাধারণ প্রতিপৃষ্ঠা ৩৫ টাকা, অর্ধপৃষ্ঠা ২২ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১২ টাকা। বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য। পত্রিকা প্রকাশের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র টাকা কড়ি, চেক ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা—আতোয়ার রহমান, ৫, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।[৩০]

গতানুগতিক মাসিক পত্রিকার মতো পত্রিকার বিভিন্ন রচনার মধ্যে–মধ্যে বিজ্ঞাপন ছিল না। অর্থাৎ কাগজ পুরোটা কাজে না লাগিয়ে রচনাটিকে আকর্ষণীয়রূপে উপস্থাপন করা হতো। প্রথম দিকে বিজ্ঞাপন বেশী পাওয়া যেতো না। ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের বিজ্ঞাপন ছাপা হতো। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর বইয়ের বিজ্ঞাপন ও ইন্ডিয়ান টী, এবং অন্যান্য বই পুস্তকের বিজ্ঞাপন ছাপা হতো। আর কোনো বই, পত্রিকা নতুন বের হলে তার আলোচনাও চতুরঙ্গে বেরিয়েছে।

অবশ্য সেসব বইয়ের 'সাহিত্য' নামের বৈতরণী পার হতে হতো। প্রতি সংখ্যা ১২০, এবং কিঞ্চিৎ কম বা বেশি পৃষ্ঠা, কার্টিজ পেপারে, ডিমাই রয়েল সাইজে, ১ কলামে, ছাপা হতো। প্রথম বর্ষের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫৮, দ্বিতীয় বর্ষের ৩৮৫, তৃতীয় বর্ষের ৩৯০ পৃষ্ঠা ছিল। এই পত্রিকাটি মনস্বী হুমায়ুন কবির একটি 'অভিযান' রূপেই বের করেছিলেন। প্রথম বর্ষের তাঁর একটি কবিতা— 'অভিযান' এর কটি লাইন—

জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার সামাল তরী।
নোঙ্গর তোল, মেলে দাও পাল ত্বরা,

www.pathagar.com

বন্দরে বসি কাটাইবে কাল কেমন করি।
নবীন আবেগে গতি চঞ্চল
ফুলে ফুলে ওঠে ফেনা ভরা জল,
থর থর করি কাঁপে পুরাতন বসুন্ধরা।
নোঙ্গর তোল, মেলে দাও পাল ত্বরা ত্বরা ত্বরা।[৩১]

তথ্যনির্দেশ

১. আতাউর রহমান স্মরণে (পুস্তিকা), তারিখবিহীন, কলকাতা থেকে তাঁর নিকটজনদের (শ্রী নীহাররঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীমতী নীরা রহমান) দ্বারা/উদ্যোগে প্রকাশিত। চতুরঙ্গ অফিস থেকে শ্রী নীহাররঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়ের সৌজন্যে সংগৃহীত।

২ শ্রীনৃপেন্দ্র সান্যাল, চতুরঙ্গ : মিলিয়ে মিশিয়ে (আলোচনা), চতুরঙ্গ, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯২, পৃ. ৪৫২।

৩. উপরিউক্ত।

৪. শাহরিয়ার ইকবাল, হুমায়ুন কবির (জীবনীগ্রন্থ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৭।

৫. বুদ্ধদেব বসু, 'আমার যৌবন' শীর্ষক রচনায় লিখেছিলেন, '...বছর দুই পরে, 'পরিচয়ের' প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা চতুরঙ্গ যখন বের করলেন, তখন আমি রইলাম তাঁর সহকর্মী, প্রথম বছরে তাঁর সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদক, তারপর বহুকাল ধরে লেখক হিসেবে সম্পৃক্ত।" উদ্ধৃতি—উপরিউক্ত জীবনীগ্রন্থ, পৃ. ৪৬।

৬. শাহরিয়ার ইকবাল, হুমায়ুন কবির, পৃ. ৪৬।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারী, (কবিতা), চতুরঙ্গ, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ. ২২।

৮. বিষ্ণু দে, মুদ্রা রাক্ষস (কবিতা), উপরিউক্ত, পৃ. ২৪।

৯. বুদ্ধদেব বসু, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শান্তি (প্রবন্ধ), উপরিউক্ত, পৃ. ৩৬–৩৭।

১০. উপরিউক্ত।

১১. উপরিউক্ত, পৃ. ৪৩।

১২ উপরিউক্ত, পৃ. ৪৯–৫০।

১৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রগতি ও পরিবর্তন (প্রবন্ধ), উপরিউক্ত, পৃ. ৫৬।

১৪. বেশ কিছু অনূদিত রচনার (নিচে বা উপরে) অনুবাদকের নাম নেই। এগুলোকে স্বভাবতই সম্পাদকীয় কর্ম ধরতে হয়, কারণ সাময়িকপত্রের সম্পাদকেরা পত্রিকার আদর্শ প্রতিফলনের কিংবা প্রিয় বিষয়ের প্রচার করতে পছন্দ করেন।

হুমায়ুন কবিরের রচনা প্রতি সংখ্যায় স্বনামে অনেক প্রকাশিত হয়েছে বলে বেনামীতেও তিনি এসব অনুবাদ করতে পারেন।

তাছাড়া বিষয়গুলো বেনামীতে লেখার মতো লেখকদের মধ্যে হুমায়ুন কবির হওয়াই সম্ভব। পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক নন—কেবলই লেখক যাঁরা, তাঁরা বেনামীতে লেখা ছাপাবেন কোন্ দুঃখে। অবশ্য এমন দুঃখও দেখা যায়, লেখকেরা পেটের ও বিবেকের তাড়না–বা নানা কারণে বেনামীতে রচনা প্রকাশের জন্য পত্রিকায় দিয়ে থাকেন। তবে চতুরঙ্গের বেনামী লেখাগুলোকে হুমায়ুন কবিরের বলে গণ্য করা উচিত।

১৫. সাহিত্য বিভাগীয় আলোচনা (সম্পাদকীয়?), চতুরঙ্গ, ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৫, পৃ. ৩২২–২৬।

১৬. উপরিউক্ত।

১৭. রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন' দ্রষ্টব্য।

১৮. হুমায়ুন কবির, পুস্তক-সমালোচনা (রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড বিশ্বভারতী), চতুরঙ্গ, ২ বর্ষ, ১ (বিশেষ) সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৬, পৃ. ১০৬।

www.pathagar.com

১৯. অজিত দত্ত, বাংলা সাহিত্য (আলোচনা), উপরিউক্ত, পৃ. ৯৮–১০০।
২০. বুদ্ধদেব বসু, লেখার ইস্কুল (প্রবন্ধ), চতুরঙ্গ, উপরিউক্ত, পৃ. ৩৯–৫৪।
২১. সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সাম্প্রতিক কবিতার ঢঙ (প্রবন্ধ), চতুরঙ্গ, ৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ. ৩৩২–৩৩।
২২. ইবনে বতুতা, পুস্তক–সমালোচনা, চতুরঙ্গ, ৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৮, পৃ. ১৭৭।
২৩. আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে ভারতীয় রাজনীতি, চতুরঙ্গ, ২ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৬, পৃ. ১৮৭।
২৪. বটকৃষ্ণ ঘোষ, শিক্ষা ও সমাজ, চতুরঙ্গ, ২ বর্ষ, ২ সংখ্যা পৌষ ১৩৪৬, পৃ. ১৫৯।
২৫. কাজী আবদুল ওদুদ, সংস্কৃতির কথা, চতুরঙ্গ, ৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৮, পৃ. ১৩৫–৪২।
২৬. গৌরীশংকর রায়, জমিদারী ও জাতীয় সম্পত্তি, চতুরঙ্গ, ২ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃ. ৩৩৭–৩৯।
২৭. বেনজীর আহমদ, ব্লাক আউট (কবিতা), ৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৮, পৃ. ১৯৭।
২৮. গোলাম কুদ্দুস, পঙ্কজ (কবিতা), ৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৮, পৃ. ১১৮।
২৯. সম্পাদকীয়, ১৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা, শ্রাবণ–আশ্বিন, ১৩৬২।
৩০. নিয়মাবলী, ২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৬।
৩১. হুমায়ুন কবির, অভিযান (কবিতা), চতুরঙ্গ, ১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৬।

www.pathagar.com

৮. রূপায়ন

(কলকাতা, ১৩৪৭–৪৮)

'রূপায়ন' সাহিত্য মাসিকের নাম সাধারণভাবে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে বলে আজ এর পরিচিতি বিবৃতির দাবি রাখে। কিন্তু রূপায়নের সম্পাদক বাংলাদেশ ও বাঙালির স্মৃতিসত্তায় ভাস্বর—তাঁর পরিচয় বিস্তৃত করে বলার দরকার পড়ে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য, পাকিস্তানের অন্যতম বিচারপতি এবং ১৯৭১ সনের মহান মুক্তিসংগ্রামের অবিস্মরণীয় প্রধানতম সংগঠক ও স্বাধীন বাংলাদেশের দ্বিতীয়তম রাষ্ট্রপতি, আবু সাঈদ চৌধুরী (১৯২১–৮৭) ছিলেন এর সম্পাদক। তাঁর বাবাও ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গের একজন প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। পূর্বপাকিস্তানের আইন পরিষদের তিনি স্পীকার ছিলেন।

অভিজাত ধনাঢ্য পরিবারের সুশ্রী, মেধাবী, বিশ বছরের তরুণ আবু সাঈদ চৌধুরী কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কলকাতার বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। তখন থাকেন তিনি কলকাতার বেকার হোস্টেলে। এই হোস্টেলে বাংলাদেশের স্থপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও (১৯২০–৭৫) থাকতেন।

তৎকালীন বেকার হোস্টেলে বসবাস করতেন বাংলার মুসলিম রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতিজগতের নবীন তারকারা। এঁরাই বঙ্গের কৃতী সন্তানদের তালিকার এক বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছেন। হুমায়ুন কবিরের পরিচয়ও বিদ্বৎসমাজে বিস্তৃত করে দেবার প্রয়োজন হয় না। তিনিও ছিলেন ঐ হোস্টেলে।

আজকের প্রাতঃস্মরণীয় মুসলিম বাঙালি মনীষীদের অনেকেই ছাত্রাবস্থায় বেকার হোস্টেলে থেকেছেন। সেখানেই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত, বন্ধুত্বের দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এই হোস্টেলের বন্ধু এ. এস. এম. আবদুর রউফ ছিলেন আবু সাঈদ চৌধুরী সম্পাদিত রূপায়নের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ঠিকানা দেওয়া হতো ৭০ নং থিয়েটার রোড, পার্ক সার্কাস, কলকাতার। তবে প্রিন্টার্স লাইনে লেখা হতো ইংরেজিতে (অন্যান্য সকল বাংলা পত্রিকার ন্যায়–ই 'প্রিন্টেড বাই এ. এস. এম. আবদুর রউফ ফরম পাবলিসিটি হাউস, ৩১–এ, কেশব সেন স্ট্রীট, এ্যান্ড পাবলিশ্‌ড বাই দি সেম ফরম বেকার হোস্টেল, কলকাতা'।

এর প্রথম সংখ্যার লেখা আনার জন্য গিয়েছিলেন প্রখ্যাত অন্নদাশংকর রায়ের (১৯০৪–২০০২) নিকট। তিনি বল্লেন, দু'এক সংখ্যা বের করো, স্টান্ডার্ড মনে করলে পরে লেখা দেবো।[১] কিন্তু অন্নদাশংকরের রচনা আর নেওয়া হয়নি।

রূপায়নও বছর খানেক চলে বন্ধ হয়ে যায়, কারণ সম্পাদক আবু সাঈদ চৌধুরী ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত চলে গেলেন। আবু সাঈদ চৌধুরী নিজেই অবসর জীবনে 'আমার কথা' নামের আত্মবিবরণীতে জানিয়েছেন, স্কুল জীবন থেকেই তিনি বিদ্যায়তনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশ নিয়ে অভিনয় ইত্যাদি করতেন। তাঁর পঠনকালে স্কুল ও

www.pathagar.com

কলেজ বার্ষিকীর সম্পাদক তিনিই হতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের বীর্ষকীর ২৫ বছর পূর্তির বিশেষ সংখ্যা তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

তাঁর কথায়—'কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করি। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক মনীষীর লেখাতেই রজতজয়ন্তী সংখ্যা ধন্য হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' কবিতাটি লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরে ১৯৪০–৪১ শিক্ষাবর্ষে আমি কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করি।'

বেকার হোস্টেলের 'ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সম্পাদক' হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে আবু সাঈদ চৌধুরী কবি নজরুল ইসলামের স্নেহভাজন হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় 'রূপায়ন' বের হয়।

> ....নজরুল ইসলামের সঙ্গে মাঝে-মাঝেই দেখা করতে যেতাম বন্ধুবর রউফের সঙ্গে। নজরুল ইসলাম একদিন বললেন যে বাঙ্গলায় তাঁর মনের মতো মাসিক পত্রিকা নেই। সাহিত্যিক মাপকাঠির দ্বারা বিচার করলে অত্যন্ত উঁচুদরের মাসিক পত্রিকা আছে—যেমন 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্রা'। কিন্তু তিনি চান যে, সেই মানের আরেকটি সাহিত্য পত্রিকা হোক যেখানে হিন্দু ও মুসলিম লেখকের সংখ্যা প্রায় সমান থাকবে। তাঁর উদ্দেশ্য, হিন্দু ও মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ যদি এই পত্রিকায় লেখেন তাহলে দুটি প্রধান ধর্মাবলম্বী লেখকদের রচনায় বাঙ্গালার নিজস্ব রূপ ফুটে উঠবে। তাঁর ইচ্ছা বাঙ্গালির সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় এই পত্রিকায় ফুটে উঠবে। পত্রিকাটির নামকরণও তিনি করেন। পরিকল্পনাটি রউফের ভাল লাগল। কয়েকজন তরুণ মুসলিম সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার ছিল পরিচয়। তাঁদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে যাঁরা খুব উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসেন, তাঁরা হলেন আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, গোলাম কুদ্দুস ও শওকত ওসমান। আমরা নজরুল ইসলামের পরিকল্পনা অনুযায়ী হিন্দু লেখকদের লেখা সংগ্রহের চেষ্টা করি এবং সকলের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ লাভ করি।[২]

প্রথম সংখ্যা 'রূপায়ন' ১৩৪৭ সনের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় সত্যি সত্যি হিন্দু মুসলমান লেখক-সংখ্যা প্রায় সমান সমান। লেখা দেন আনন্দবাজার এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, অনুশীলন পার্টির নেতা অনিলচন্দ্র রায়, প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলার অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বাগচী, ইংরেজির অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, কমলারায় চৌধুরী এবং বিষ্ণুদাস বসু।

মুসলমান লেখকগণ হলেন—কাজী নজরুল ইসলাম, কামাল চৌধুরী, আবুল হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আহসান হাবীব, মোহাম্মদ মোদাব্বের, গোলাম কুদ্দুস, জসীমউদ্‌দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হুমায়ুন কবির (অধ্যাপক), এবং রূপকুমার (ছদ্মনাম, সিনেমার আলোচক)।

সম্পাদকীয় বক্তব্যটি চমৎকার, পরিপক্ক, প্রজ্ঞার অধিকারী—১৯৪০ সনের ডিসেম্বর, ১৩৪৭ সনের অগ্রহায়ণে সম্পাদক এর বয়স মাত্র বিশ বৎসর, কিন্তু লেখা পড়লে তা কি মনে হয়?

> ...কোন নূতন মাসিক পত্রিকাকে আত্ম-প্রকাশের সাথেই পাঠকবর্গের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয়, ইহার প্রয়োজন কী, উদ্দেশ্য কী? এই মাসিকপ্লাবিত বাংলাদেশে এই ধরনের প্রশ্ন

www.pathagar.com

একেবারে নিরর্থক নয়। কেননা মাসিকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।–ছত্রকের মত কতকগুলি জন্মিয়াই মরে, কতকগুলি কিছুদিন পৃথিবীর আলো-বাতাস পাইবার সৌভাগ্য লাভ করে। মাত্র কয়েকখানি মাসিক পত্রিকা আজও বাঁচিয়া আছে তাহাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ; তাছাড়া অধিকাংশ মাসিক পত্রিকাই বিশেষত্বহীন এবং প্রতিষ্ঠাবান মাসিকগুলির অনুকরণ মাত্র। ইহাদের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। সমাজের নিখুঁত রূপায়নে দেশের বা জাতির নবজাগ্রত রূপকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারে মুসলমান সমাজে এমন বিশেষ কোন মাসিকের নামোল্লেখ করা কষ্টসাধ্য।[৩]

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতির তারুণ্যের অভিব্যক্তি রূপায়নে যে ভাবে রূপায়িত হয়েছে, তা লক্ষ্য করার মত—তিনি লিখেছিলেন, আমাদের তরুণ মন আদর্শের স্বপ্ন দেখে। সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে নব নব অভ্যুদয় চায়। গতানুগতিকতাকে নির্বিচারে বরণ করতে পারে না। দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য তরুণ মন সহজেই উন্মুখ হয়। বুদ্ধি, শক্তি ও বিবেচনানুযায়ী বিচার-বিশ্লেষণ করে খুঁজিপন্থি বাস্তববাদীর দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত আত্মোন্নতির দিকে অগ্রসর হলে সে প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সম্পাদক লিখেছিলেন, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'আমরা এক ভাঙ্গা-গড়ার যুগ-সন্ধিক্ষণে পৌঁছিয়াছি'। যুগ-সন্ধিক্ষণের চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে হাঁফ ছাড়ার সময়ই নেই আমাদের। 'কে জানে কখন এই চোরাবালিতে আমাদের পা আটকাইয়া যায়'—তাই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অতীত দিনের সুখস্মৃতির আলোচনা করে, অতীত গৌরব ও আভিজাত্যের দম্ভে 'পুরাতন মৃত দৃষ্টিভঙ্গি' নিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে বাঁচবার কোনও পথ আর খোলা নেই।

আমাদেরকে গড্ডলপ্রবাহ থেকে মুক্ত হয়ে নতুন আদর্শের নতুন জীবন দৃষ্টি নিয়ে আমাদের এই যুগ সন্ধিক্ষণের 'চোরাবালি' পার হতে হবে। 'আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিণতির সাথে সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকেও নবনব রূপে রূপায়িত করিয়া বিশ্বের সমক্ষে আজ তুলিয়া ধরিতে হইবে।'

আমাদের জীবনে যে দুঃসহ দুর্দিন উপস্থিত হয়েছে তার প্রকৃত কারণগুলোর অন্যতম হচ্ছে 'আমাদের জাতীয় জীবন স্ফুরণের জন্য মানসিক বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশের অভাব। রূপায়নের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল প্রকৃত সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের নব-স্ফুরণকল্পে আমাদের সুবৃত্তিনিচয়ের উন্মেষ করা।'

রূপায়নের সম্পাদকীয়তে স্পষ্টই বলা হয়—কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, আত্মকলহ, স্বার্থপরতা আমাদের জাতীয় জীবনকে যে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে, সেসবের অবসান ঘটিয়ে জীবন্মৃত জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে একাগ্রসাধনা ও ঐকান্তিক কর্মনিষ্ঠা দ্বারা। উৎসাহ ও উদ্দীপনাময় কর্মপ্রেরণাসহ সাহিত্যসাধনায় জাতীয় জীবনে আসবে নব উন্মেষের পুলক স্পন্দন। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নবজাগ্রত জাতি আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাবে। মানুষের বাঁচার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পীকারের পুত্র, যিনি বংশানুক্রমে জমিদার এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের মেধাবী ছাত্র—তিনি যে দরিদ্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হবেন, বা বাংলাদেশকে ঔপনিবেশিক শাসকদের শোষণ প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত করার স্বাধীনতা সংগ্রামের

www.pathagar.com

সংগঠনে নেতৃত্ব দেবেন ত্রিশ বছর পরে, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে, তাঁর আভাস ও মানসিকতার বীজ লুকিয়ে ছিল মজলুমের মুক্তিকামী কবির (নজরুল) প্রতি অনুরাগে, আর ১৯৪০সনে প্রকাশিত রূপায়নের এই সম্পাদকীয়তে,—আবু সাঈদ চৌধুরী সম্পাদকীয়তে মজলুম ও নির্যাতিত নিপীড়িতের চলমান স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেন,

> দুনিয়ায় যাহারা মজলুম, নির্যাতিত, নিপীড়িত, যাহারা বুকের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতেছে—যাহাদের অন্নহীন বস্ত্রহীন জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালে-কঙ্কালে প্রমত্ত অন্ধযুগের অভিযান চলিয়াছে তাহাদের করুণচিত্র রূপায়নের প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিবে ; তাহাদের বেদনাকে ভাবে ও ভাষায় মূর্ত করিয়া বিশ্বের দরবারে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিবে 'রূপায়ন'। মানুষের জীবন-ধর্ম, স্বীয়-স্বাধীনতা লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার তাহার জন্মগত অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজকে, ধর্মকে, জাতিকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজাইবার ব্রতে আমরা ব্রতী। তাই চাই এমন জগত যেখানে ধনী, নির্ধন, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকলে মানুষ হিসাবে সমান সম্মান লাভ করিবে।[৪]

সম্পাদক জানেন, এ-পথে হয়তোবা অনেক বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হবে, হয়তো অশেষ ক্লেশ ভোগ করতে হবে, ঝঞ্ঝা সংকুল দুর্যোগের মধ্যে নিপতিত হতে হবে, কিন্তু আমাদের অভিযান চলবে বিপুল আশা ও দুর্দমনীয় একাগ্রতায়। জাতির জীবনে অবসাদ এসেছে, মোহ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—এই অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে আমরা জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হব—

> আমাদের জয়ী হইতে হইবে কারণ আমরা চাই চির কল্যাণময় মুক্তি—মানুষের মুক্তি।[৫]

রূপায়নের নিয়মাবলিতে বলা হয় : 'রূপায়ন প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়ণ মাস হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত রূপায়নের বর্ষ গণনা করা হয়।..... বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুলসহ তিন টাকা চারি আনা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য চার আনা।'

এটি সাদা ভালো কাগজে 'চতুরঙ্গে'র সাইজে ও মডেলে প্রকাশিত হয়েছিল, মুদ্রণ-সৌকর্য ও শিল্পজ্ঞান, প্রচ্ছদ অনুরূপ ছিল। গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হবে বলে নিয়মে উল্লেখ করা হয়। প্রথম সংখ্যা বিজ্ঞাপনসহ ৬৪ পৃষ্ঠায় বের হয়। প্রথম রচনাটি ছিল কাজী নজরুল ইসলামের 'অভেদম' শীর্ষক কবিতা—

> দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে গড়িছে যে এই রূপ?
> রূপে রূপে হয়ে রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ।[৬]

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 'ভারতে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থ' শীর্ষক স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণামূলক তথ্য-বক্তব্য ও বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'প্রতি বৎসর ভারত গবর্ণমেন্ট বহু টাকা ইংলনডে ব্যয় করেন' যা ভারতীয় বাজেটে 'হোমচার্য' রূপে বর্ণিত হয়—'কিন্তু ভারতীয় স্বার্থে ইহা নিয়ন্ত্রণ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করি নাই। বাধা দিবার ক্ষমতা তো আমাদের নাই-ই।[৭]

এছাড়া কামাল চৌধুরী লিখেছিলেন কবিতা—'জন্মদিন' ; অনিলচন্দ্র রায় এর প্রবন্ধের নাম—'সভ্যতার রূপায়ন'। আবুল হোসেনের কবিতার নাম-'নকিব'। আবুল হোসেনের প্রমথ ও বিখ্যাত কবিতার বই 'নব বসন্ত' বের হয়েছে তখন—এবং শামসুর রাহমানের পূর্বজ,

www.pathagar.com

বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার কারিকর আবুল হোসেনের কবিতাটি ছিল সাম্প্রতিক বিষয়ের ওপর—

হে আমার মেয়রের দল
ডাক দাও আজ তোমাদের যত আছে দমকল বাহিনী,
আন ক্রেন, রেঞ্জ ; রিলিফ গাড়ী,
বসাও ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট !
আকাশে তড়িতবজ্র বাজে, শুনতে কি পাও ?
বাতাসে বিষাক্ত বারুদের গন্ধ, শুঁকেছ কি কোনদিন ?
মাটির গর্ভে ভূমিকম্পের আর্তনাদ, শুনতে কি পাও ?
রাজপথে আসে প্রবল বন্যা, দেখেছ কি কোনদিন ?
অতএব 'হে রাজমিস্ত্রী জাগো জাগো আজ, এসেছে সময়।
আন তোমার শাবল, ছেনি, কন্নিক,
ডাক দাও যত আছে জোগালদার...[৮]

প্রথম সংখ্যার অপরাপর রচনার দিকে এক নজরে তাকানো যাক—শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন—যুদ্ধ ও ব্যাংক ব্যবসায় (প্রবন্ধ) ; রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী—পিপাসিত (কবিতা) ; আবুল হোসেনের একটি কবিতা ছাড়াও 'কিছুক্ষণ' নামের একটা গল্প ছাপা হয়। গল্পটি তখনকার কল্লোলোত্তর চেতনার, আধুনিক জীবন-ভাবনাসমৃদ্ধ (উল্লেখ্য যে, এই গল্পটি রসোত্তীর্ণ হলেও পরে তিনি কবিতাই লেখেন)। শ্রী শশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী—আর্নল্ড বেনেটের 'অনুকরণে' লিখেছিলেন—'বইপড়া'।

অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও মফিজ চৌধুরীর কবিতার শিরোনাম যথাক্রমে—'নাছোড়বান্দা' ও 'কঙ্কা'।

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ 'প্রগতি সাহিত্য' (তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সংস্কৃতি কথা'য় অসংকলিত) রূপায়নের বিশেষ তাৎপর্য বৃদ্ধি করেছে— '....কিন্তু প্রগতি সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি ? আধুনিক রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গির দিকে তাকালে এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। আধুনিক মানুষ ধনসাম্যের দাবিদার, দেশ শাসনে সামান্য অধিকার লাভে সে আর সন্তুষ্ট নয় (১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের পরে লেখা মনে করলে এবং শাসনতন্ত্রে যে ভারতীয়দের ক্ষমতা 'সামান্য'ই দেয়া হয়—এ নিয়ে তৎকালের বিতর্ক, সমালোচনা স্মরণযোগ্য)। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান তার জীবনের গোড়ার কথা। সাহিত্যেও এই আত্মপ্রত্যয়-প্রবুদ্ধ জনসাধারণের অভিযান হবে, এ স্বাভাবিক। মনুষ্যত্ব কারো একচেটে সম্পত্তি নয়, সকলেরই তাতে সমান অধিকার। প্রগতি সাহিত্যকামীদের এই ঘোষণাবাণী।—এ-বাণীর জয় হউক, কারণ এ-পথেই মানুষের মুক্তি !'[৯]

লেখক টীকা যোগ করেন বন্ধনীমধ্যে যে 'প্রগতি-সাহিত্যকামী' কথাটা তিনি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করেছেন। কারণ, 'প্রগতি সাহিত্যিকের সংখ্যা আমাদের দেশে সত্যই নগণ্য। প্রগতিকামীরা এখনো সাহিত্যিক হতে পারেননি—তাঁদের জ্ঞান ও শিক্ষা অনুভূতির স্তরে উন্নীত হয়নি বলে।'[১০]

আহসান হাবীব 'সাম্প্রতিক' নামে কবিতা, আর মোহাম্মদ মোদাব্বের 'অদ্ভুত' শিরোনামের দীর্ঘ গল্প লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা না পেলেও উদ্ধৃতি ব্যবহার

www.pathagar.com

করেছিলেন। নির্বাচিত কবিতাংশগুলো উল্লেখ করার মতো, এতে পত্রিকা ও তার কর্ণধারদের মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে—'শুধু একমনে হও পার/এ প্রলয়-পারাবার/নূতন সৃষ্টির উপকূলে/নূতন বিজয় ধ্বজা তুলে'।[১১]

জসীমউদ্‌দীন 'উর্দু কবিতার অনুসরণে' লিখেছিলেন—'একটী বিরহ রাতেরে কমাতে শকতি আছে কি তার !' আবুল মনসুর আহমদ 'সত্যযুগের পরবর্তী মিথ্যা ঘটনা অবলম্বনে' ব্যঙ্গাত্মক 'না-টীকা' লিখেছিলেন—'ত্রিযুগমিতি'। শ্রীকমল রায় চৌধুরী লিখেছিলেন প্রবন্ধ—'রুশ-জার্মান সম্পর্ক ও বৃটিশনীতি'। হুমায়ুন কবির এর 'সূর্যাস্ত' শীর্ষক কবিতাটি রোমান্টিক।

পুস্তক-সমালোচনা বিভাগে আবুল হোসেনের কাব্য 'নববসন্ত' ও 'দলবেঁধে' (প্রকাশক, চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, কলকাতা) শীর্ষক গল্প-সংকলনের আলোচনা করেন যথাক্রমে ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং শ্রীবিষ্ণুদা বসু। 'রূপ ও ছায়া' বিভাগে রূপকুমার ছদ্মনামে আলোচনা লেখেন 'উদয় শংকর' ও 'সংস্কৃতি কলাকেন্দ্র'র ওপর।

সম্পাদকীয় বিভাগে 'চীনা শুভেচ্ছা মিশন' ; 'ছাত্র-আন্দোলন' ; 'ছাত্র-স্বাস্থ্য ; 'কংগ্রেসের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা', 'কারান্তরালে জওহেরলাল' ; 'আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রুজভেল্টের বিজয়', 'মিঃ চেম্বারলেন-এর মৃত্যু' প্রভৃতি বিষয়ে সুন্দর আলোচনা স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম লেখা গোলাম কুদ্দুসের গল্প,—'প্রেক্ষাগৃহ'। দ্বিতীয় রচনা নজরুলের ; 'অভয়-সুন্দর' শীর্ষক কবিতা—(কুৎসিৎ যাহা অসাম্য যাহা সুন্দর ধরণীতে—হে পরম সুন্দরী পূজারী ! হবে তাহা বিনাশিতে)।

অপরাপর লেখকগণ হলেন—প্রমথনাথ বিশী (কবিতা, তৃতীয় নেত্র) ; হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কবিতা, খেয়াঘাট) ; সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (কবিতা, বাণী) ; আবুল হোসেন (কবিতা, 'আর্মস্ট্রিস, ১৯৩৮'), ফররুখ আহমদ (কবিতা—'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি') এবং শোফিন চৌধুরী (কবিতা—'পুতল')।

আবুল হোসেন কর্তৃক লিখিত রবীন্দ্ররচনাবলীর সমালোচনা, ইগনাজিও সিলোনের বইয়ের অনুবাদ 'ফন্টামারা' (অনুবাদক : আবুল মনসুর ও দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়) ; শওকত ওসমানের গল্প—'সিগন্যাল' ; আবু ইউছুফ এর গল্প—'ইহাই নিয়ম' ; আর ইগনাজিও সিলোনের পেংগুইন সিরিজের বই 'ফন্টামারার' আবু রুশদ কর্তৃক সমালোচনা ; আজিজর রহমানকৃত গুপ্ত ফ্রেন্ডস এন্ড কোম্পানি প্রকাশিত মনোরঞ্জন হাজরার উপন্যাস—'নোঙরহীন নৌকা' ও সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রর 'পর্ণজা', 'খোয়াই' ও 'উপলা'র গোলাম কুদ্দুসকৃত সমালোচনা।

মওলানা মোহাম্মদ আলীর মৃত্যুতে দীর্ঘ সম্পাদকীয় আলোচনা নিয়ে বের হয় উপরিউক্ত দ্বিতীয় সংখ্যা।

কাজী নজরুল ইসলাম রূপায়নের প্রত্যেক সংখ্যাতেই কবিতা দিয়েছেন। 'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়' গানটি বসন্ত ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার লিখেছিলেন ভারতের রাজস্ব নীতি (প্রবন্ধ, বসন্ত, ১৩৪৭) সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (কবিতা, জল, ঐ) ; আবুল হোসেন (কবিতা, প্রতীক্ষা, ঐ) ; কামাল চৌধুরী (কবিতা টিয়াপাখি, ঐ) ;

www.pathagar.com

গোলাম কুদ্দুস ছিলেন বিভিন্ন সংখ্যার লেখক। গোলাম কুদ্দুস একটি নতুনদৃষ্টির সমালোচনা লেখেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতসীমামী, মিহি ও মোটা কাহিনী, প্রাগৈতিহাসিক ও বৌ— এই চারটি বইয়ের ওপর। আজিজর রহমান লিখেছিলেন জীবন চৌধুরী ও অমিয় সেনের যুগ্ম সংকলন 'দ্বিধা'র। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের 'রোকেয়া জীবনী'র আলোচনা লিখেছিলেন আবু রুশদ।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা 'আর জিজ্ঞাসা করিব না কোন কথা' ; —এমন দীর্ঘতম নাম নজরুলের কবিতার খুব কমই আছে—তাঁর বাক্‌শক্তি রহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে পত্রিকার আয়ুও নিঃশেষ হয়ে যায়—তাতে প্রকাশিত 'আর জিজ্ঞাসা করিবনা কোন কথা'র মধ্যে বেদনা ও শোকের ছায়া ঘনায়িত হয়েছিল, একী তাঁর ভেতরের অনুভূতি ?—

আর জিজ্ঞাসা করিব না কোন কথা,
আপনার মনে কয়ে যাব আমি আপন মনের ব্যথা।
ভোরের প্রথম ফোটা ফুলগুলি গোপনে তুলিয়া আনি ;
অঞ্জলি দিতে তোমার দুয়ারে দাঁড়াই যুক্ত-পাণি।

এই দীর্ঘ কবিতার শেষপাদে তিনি বলেন—

...আজ চলে যাই, এই পৃথিবীরে আর লাগেনা ভালো
হেথা মানুষের নিঃশ্বাসে নিভে যায় গো প্রেমের আলো।
*   *   *   *
সেদিন যেন গো দ্বিধা নাহি আসে
কোন লোক যেন নাহি থাকে পাশে
যে নামে আমারে ডাকিলে না আজ, সেদিন
ডেকো সে নামে,
কি নামে ডাকিলে বেঁচে উঠি আমি, শুধাইও রাধাশ্যামে।[১২]

বস্তুতপক্ষে হিন্দু ও মুসলমান খ্যাতনামা কবিও সাহিত্যিকদের এমন সমন্বয় এবং প্রায় সমসংখ্যক সমাবেশ সমকালীন আর কোন পত্রিকায় যেমন দেখা যায় না, তেমনি চতুরঙ্গ ব্যতীত খুব অল্প কটি পত্রিকাই এমন নির্বাচিত সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ রচনা নিয়ে পুষ্ট হয়ে বের হয়েছে সেকালে। মুসলমান সম্পাদকরাও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকার আদর্শ যে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, ত্রিশের ও চল্লিশের দশকের এই সময়েই আমরা তা দেখতে পাই।

এখানে একটি কথা উল্লেখ বাঞ্ছনীয় যে, হিন্দু-সম্পাদিত সাহিত্যপত্রিকায় মুসলিম-রচিত গল্প, কবিতা ও আলোচনা ছাপা হলেও এইরূপ প্রায় সমসংখ্যক রচনা ও সুসমন্বয় বিরল ছিল। মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকায়, এমনকি কট্টর পাকিস্তানবাদী বা ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী কিংবা মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী পত্রিকাতেও অনেক হিন্দুর রচনা চোখে পড়ে, সমান নাহলেও প্রায় সমান সমান ছাপা হয়েছে দুই সম্প্রদায়ের লেখকদের রচনা— মুসলমানদের সম্পাদিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে আরো দু'চারটি খুঁজলে পাওয়া যাবে।

তথাপি 'রূপায়ন' যে পরিকল্পনা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল,—এবং প্রকৃতই সে রূপ প্রতিজ্ঞা ও অভিপ্রায় তাঁদের রক্ষিত হয়েছিল, এমন একটি আদর্শিক নমুনার সাহিত্যপত্রিকার সকল পৃষ্ঠা কোথাও সংরক্ষিত নেই,—এটাই দুঃখজনক। পত্রিকা বন্ধের

www.pathagar.com

কারণ সম্পর্কে সম্পাদক নিজে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা উল্লেখ করেই প্রসঙ্গ শেষ করা যাক—

> পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা বের হয়েই বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকাটির একটি পরিচালনা কমিটি ছিল। তার সদস্য ছিলো জহুর হোসেন চৌধুরী, কামাল চৌধুরী, ফজলে রব খান চৌধুরী ও আবদুল হাকিম মৃধা। রউফ ছিল ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এরা সবাই তখন ছাত্র। ফলে পেশাগতভাবে এর কার্য নির্বাহের ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না। অথচ আমাদের সুবিধা ছিল এই যে, স্নেহের দাবী নিয়ে যেখানে উপস্থিত হয়েছি সেখানেই লেখা পেয়েছি। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আরেকটি বড় কারণ নজরুল ইসলামের অসুস্থ হয়ে পড়া। এতে আমাদের শক্তির উৎসই গেল বন্ধ হয়ে।[১৩]

তথ্যনির্দেশ

১. অন্নদাশংকর রায়–এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, এই পত্রিকাটি প্রকাশের সংবাদ তিনিই আমাকে প্রথম অবহিত করেন। তিনি বলেন, পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর লেখা চাইতে গেলে, দুএক সংখ্যা বের করো, পরে পত্রিকার বৈশিষ্ট্য, চারিত্র্য দেখে লেখা দেবো—এধরনের বুঝ দিয়ে বিদেয় করে দেন। পত্রিকা বের হয়েছিল কিনা সেটা তাঁর আর মনে ছিল না বা জানা ছিল না।

১৯৭২ সনে আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকা কালে অন্নদাশংকর রায় বাংলা একাডেমী আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে এলে আবু সাঈদ চৌধুরীই তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, 'রূপায়ন' এর কয়েকটি সংখ্যা বের হয়েছিল। —এই সূত্রে অনুসন্ধান করে আবু সাঈদ চৌধুরীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে, তদীয় কণিষ্ঠপুত্র জনাব আবুল কাশেম চৌধুরী খালেদ–এর আনুকূল্যে পত্রিকাটির সংরক্ষিত ফাইলের একসেট ফটোকপি লাভ করেছি। 'রূপায়ন' বানানটি পত্রিকার প্রচ্ছদ ও টাইটেলপেজ–এ এভাবেই ছিল বলে পরিবর্তন করা হয়নি।

২ আবু সাঈদ চৌধুরী, আমার কথা, স্মৃতিসত্তায় আবু সাঈদ চৌধুরী, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতীয় স্মৃতি সংসদ, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৬৫।

৩. সম্পাদকীয়, রূপায়ন, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭, পৃ. ৫৬।

৪. উপরিউক্ত, পৃ. ৫৭।

৫. উপরিউক্ত।

৬. নজরুল ইসলাম, অভেদম (কবিতা), উপরিউক্ত, পৃ. ১।

৭. সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ভারতে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থ (প্রবন্ধ), উপরিউক্ত, পৃ. ৫৬।

৮. আবুল হোসেন, নকিব (কবিতা), উপরিউক্ত, পৃ ১৩।

৯. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, প্রগতিসাহিত্য (প্রবন্ধ), উপরিউক্ত, পৃ. ২৯।

১০. উপরিউক্ত।

১১. রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশ, উপরিউক্ত, পৃ. ৩৯।

১২ কাজী নজরুল ইসলাম, রূপায়ন, প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, পৃ. ১৯৭–২০০।

১৩. আবু সাঈদ চৌধুরী, আমার কথা, স্মৃতিসত্তায় আবু সাঈদ চৌধুরী, পৃ. ৬৬।

www.pathagar.com

৯. ত্রিকাল
(কলকাতা, ১৩৪৯–৫২)

'ত্রিকাল' সাহিত্য পত্রিকার বেশি সংখ্যা বের হয়নি। কিন্তু এর সম্পাদক ও লেখক–শুভানুধ্যায়ীদের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উচ্চখ্যাতির কারণে মাত্র তিনটি সংখ্যা বের হয়েই 'ত্রিকাল' সাহিত্য সংস্কৃতিজগতে এখনও স্মরণযোগ্য এক নাম হয়ে রয়েছে। এর সম্পাদক ছিলেন চতুরঙ্গ পত্রিকার এক সময়ের প্রকাশক ও পরিচালক আতাউর রহমান। তিনি ভারতীয় সাংস্কৃতিক জগতেরও সুপরিচিত এক ব্যক্তিত্ব।

'ত্রিকাল' বার্ষিক সাহিত্যপত্র ছিল। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ সনে, হুমায়ুন প্রেস, কালকাতা থেকে। আতাউর রহমানের নাম সম্পাদক হিসেবে ত্রিকালে ছাপা হয়েছিল 'আতাওয়ার' বানানে। যুগ্ম সম্পাদনায় অন্যজন হলেন ফয়জুল করিম। এঁর সম্পর্কে আজ আর বেশি তথ্য পাওয়া যায় না।

ত্রিকাল মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১/২, দুর্গাপিতুরী লেন, কলকাতা থেকে ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪, মূল্য দেড় টাকা। সংকলন–গ্রন্থ প্রকাশের মতো এটি উৎসর্গ করা হয় : 'নীলিমা দেবী ও শান্তি কবির শ্রদ্ধাস্পদেষু' লিখে।

এতে বোঝা যায় আতাউর রহমান হুমায়ুন কবিরের কতোটা স্নেহধন্য ছিলেন। তাঁদের পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তৃতীয় সংখ্যাটিও আতাউয়ার রহমান সম্পাদিত। গুপ্ত রহমান এ্যান্ড গুপ্ত, কলকাতা—প্রকাশকের হেড লাইন। সোল এজেন্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা। মূল্য আড়াই টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪২।১৬ বাই ১ ডাবল ডিমাই সাইজ।

উপরিউক্ত মডার্ণ আর্ট প্রেস থেকে ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এই সংখ্যাটি উৎসর্গ করা হয়—'হুমায়ুন কবির ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে'। সম্পাদক লিখেছেন :

> নানা অসুবিধার ভিতর দিয়ে ত্রিকাল প্রকাশিত হলো। প্রথম সংখ্যা ত্রিকালের লেখাগুলোতে দেখা গেছে, কোনো বিশেষ দলীয় মতবাদের প্রশ্রয় সেখানে ছিলো না। দ্বিতীয় সংখ্যার ত্রিকালে দেখা যাচ্ছে সমসাময়িক কালের কেন্দ্রস্থ একটি বিশেষ ভাববস্তু নিয়েই রচনাগুলো তৈরী, তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় দ্বিতীয় সংখ্যা ত্রিকালে কালের স্বাক্ষর উজ্জ্বল। এ সংখ্যার সঙ্গেই ত্রিকালের সম্পাদনাও আমার শেষ হয়ে গেল। তৃতীয় সংখ্যা ত্রিকাল নূতন সম্পাদনায় ভাবী কালের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত দেবে বলেই আমার ধারণা।[১]

ত্রিকালের জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ সংখ্যায় খাজা আহমদ আব্বাস এর প্রবন্ধ—জওহরলাল নেহেরুর ওপর রচনার বেনামী অনুবাদ ; নিখিল চক্রবর্তীর প্রবন্ধ—জাতীয় ঐক্য ; হুমায়ুন কবিরের প্রবন্ধ ভারতীয় চিত্র—(দার্শনিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ ভারতের চিত্রকলা বিষয়ক আলোচনা) ; শওকত ওসমানের প্রবন্ধ—'প্রমথ চৌধুরী' (প্রমথ চৌধুরীর চিন্তাধারা, সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব আলোচনা) ; 'আবুল কাসেম ফজলুল হক' শীর্ষক হবিবর রহমানের আলোচনা ; শান্তি দেব ঘোষের প্রবন্ধ—'রবীন্দ্রনাথের সুর সংযোজনা পদ্ধতি' এবং বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ (চক্ষুস্থির) ; অমিয় চক্রবর্তী (হরাণ) ; হরপ্রসাদ মিত্র

www.pathagar.com

(পুনর্মিলন) ; সুধীর কুমার চৌধুরী (অসি) ; অরুণ মিত্র (রূপান্তর) ; সমর সেন (জানুয়ারি ১৯৪২) ; সুভাষ মুখোপাধ্যায় (গ্রামে) ; দীনেশ দাশ (ব্যাংক) ; নবগোপাল দাস (এপিট ওপিঠ) ও ম্যাক্সি ইষ্টম্যান-এর (লিম্ব ট্রটস্কি) কবিতা ; আর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (ম্যাজিক) ; বুদ্ধদেব বসু (ব্লাক আউট) ; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (মুখে ভাত) ; অন্নদাশংকর রায় (ঝাঁপ) প্রমুখের গল্প ত্রিকালের সাহিত্য সম্পদ ছিল।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য আলোচনা লিখেছিলেন 'বাংলা সিনেমা'র ওপরে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বাংলা ছবিগুলোর কাহিনী ক্রমেই অসাহিত্যিক ও কুসাহিত্যিকের সংশ্রব ত্যাগ করে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের স্পর্শ লাভ করেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশংকর, শৈলজানন্দ, প্রবোধ সান্ন্যাল, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের নামসমূহ দর্শকদের মনে খুবই উৎসাহ এনে দেয়। তাছাড়া এঁদের দুজন কাহিনী পরিবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে চিত্র পরিচালনার ভারও গ্রহণ করেছেন।

শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারা সম্পর্কে উন্নত মানের প্রবন্ধ লিখেছিলেন সাহিত্যিক হবিবুর রহমান। ফজলুল হকের চিন্তাধারা অন্যান্য পত্রিকার মতো (মুসলিম সম্পাদিত) নেগেটিভ দৃষ্টিতে না দেখে পজেটিভ পয়েন্ট অব ভিউ থেকে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'ফজলুল হক জিন্দাবাদ' ধ্বনিকে তিনি তাঁর রচনার প্রথম ও শেষ প্রান্তে সংযোগ করেছেন, এতে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়।

পাকিস্তান বিরোধী, কংগ্রেসী দৃষ্টি, জনগণের পক্ষ অবলম্বনকারী—বস্তুবাদী, মার্কসীস্ট এর চেতনা—সবই আছে এর প্রতিটি পৃষ্ঠায়। সম্পাদকের বক্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। তাঁরা কোনো মতের ও দলের প্রতিনিধিত্ব করতে চাননি। সম্পাদকের আরও কটি কথা প্রথম সংখ্যায় পাওয়া যায়, অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে এখানে তা উল্লেখ করা হলো :

> ত্রিকাল কোন সংস্কারের সমর্থক নয়। এতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি লেখাই যে পাঠকের সহানুভূতি পাবে—এ আশা আমরা করি না। একটা নির্দিষ্ট মতবাদের গণ্ডিতে বাঙ্গালীর আদর্শকে সীমাবদ্ধ না করে আরো বিস্তৃত ভাবে তাকে পরিচালিত করবে বলেই ত্রিকালের আবির্ভাব। এতে প্রকাশিত স্বাক্ষরিত বা অস্বাক্ষরিত কোন লেখারই বিশেষ মতবাদের দায়িত্ব 'ত্রিকাল' গ্রহণ করবে না। ত্রিকালের উদ্দেশ্য শুধু লেখকদের মতবাদকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা।[২]

যাঁরা নিরপেক্ষ বলতে চান, তাঁদেরও পছন্দ অপছন্দ ফুটে ওঠে তাঁদের কর্মে, লেখা নির্বাচনে, সম্পাদন রুচিতে ; নিখিল চক্রবর্তীর 'জাতীয় ঐক্য' শীর্ষক প্রবন্ধের কতিপয় উক্তি :

> জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে আজকাল আমাদের দেশে নানা মত শোনা যায়। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার কথাই হল—ভারতীয়দের সকলকে এক জাতি বলে গণ্য করা। সেই অনুসারে ইতিহাসকে সাক্ষী মেনে প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছে যে বহু শতাব্দী ধরে—তাতে আমাদের জাতীয়তাবোধের লক্ষণ পাওয়া যায়। আমাদের বিদেশী শাসকরা ঠিক এর উল্টো কথা বলে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য যে ইংরাজ শাসনের ফলেই আমাদের জাতীয় ঐক্য সম্ভব হয়েছে এবং তার আগে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও গৃহযুদ্ধ লেগেছিল—যা ভারতীয়দের বৈশিষ্ট্য ছিল। অল্প কিছুদিন ধরে এই বিষয়ে নতুন নতুন মতামতের আবির্ভাব হয়েছে। পাকিস্তান পরিকল্পনাতে আজকে অনেকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁদের পাল্টা জবাব দিচ্ছে হিন্দুদের 'হিন্দুস্থান' ও 'অখণ্ড হিন্দুস্থানের' শ্লোগান।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা ন্যায়সঙ্গত হবে বলে মনে হয়। লেখক প্রশ্ন উত্থাপন করে জবাব খোঁজেন, আমরা এখন প্রশ্ন করতে পারি, জাতি কাকে বলে? জাতীয়তাবোধ কি এবং তা কোন অবস্থায় ফুটে বের হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বুঝতে পারব যে ইংরেজ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দাবী কতদূর সত্য এবং এ–বিষয়ে অন্যান্য মতামত কেন আজকে উঠেছে..মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণের পর লেখক মন্তব্য করেন,....

> পৃথক পৃথক জাতীয় আন্দোলন কখনও দাঁড়াতে পারবে না আপন শক্তিতে। তাই একত্রীভূত হয়ে জাতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করা প্রথম কর্তব্য। তারপর নতুন সমাজে প্রত্যেক অপরিণত জাতীয়তাকে পূর্ণ করে তুলতে হবে। পাকিস্তানের দাবীর বিপক্ষে শুধু জাতীয় ঐক্যের শ্লোগান তুললে চলবে না, দেখাতে হবে, পাকিস্তানের ভারতের যে ভাগ হচ্ছে, তা বৈজ্ঞানিক বিচারে জাতিগুলির অস্তিত্ব ও অবস্থিতির সঙ্গে মিলছে কিনা। যেখানে যেরকম জাতি দেখা যাচ্ছে, সেখানেই আশ্বাস দিতে হবে যে স্বাধীন ভারতে তাদের দাবী গ্রহণ করা হবে। তাই, জাতীয়তাবাদের নামেই ভারতকে বিভক্ত করতে হতে পারে। কিন্তু সে বিভাগ আজ হবে না। মুক্তিসংগ্রামে জাতীয় শক্তি বিভক্ত করা যায় না। জয়লাভের পর নতুন ব্যবস্থা হবে, নতুন জাতিগুলির উত্থান সম্ভবপর করতে হবে।[৩]

ত্রিকালের দ্বিতীয় সংখ্যাটি (১৩৫২) রচনা–ঐশ্বর্যে আরো উন্নত। সুবোধ ঘোষের—তিন অধ্যায়; বুদ্ধদেব বসুর—হরিবোল; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নসুমামা ও আমি; মনোজ বসুর—থু: শীর্ষক উৎকৃষ্ট গল্পসহ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাস 'যায় যদি যাক' এতে ছাপা হয়েছিল। পাঁচজন কবি ছিলেন—অরুণ মিত্র (ম্যাজিক); সমর সেন (আকাল); দিনেশ দাস (গ্লানি); আবুল হোসেন (শয়তান) ও অজিত দত্ত (পলাতক)।

তাছাড়া অমিয় চক্রবর্তী আলোচনা করেছিলেন 'কাব্যাদর্শ' স্বরচিত অনেকগুলো পংক্তির উদাহরণসহ। এই সংখ্যার এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে উৎকৃষ্ট 'চিন্তাবলি, গদ্যভাষায়—, যেমন হুমায়ুন কবিরের ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রবন্ধ); মিনু মাসানীর প্রবন্ধ আগামীকাল (অনুবাদকের নাম নেই); ভারতী সরাভাই–এর যুদ্ধোত্তর ভারত (অনুবাদকের নাম নেই); থেরসিটিস এর প্রবন্ধ—ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ (অনুবাদক অনুক্ত); যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য–র যুদ্ধোত্তর শিল্পবাণিজ্য (অনুবাদক অনুক্ত); জহিরউদ্দিন আহমদের সরোজিনী নাইডু এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'বাংলা সিনেমা' ও তিমিরবরণ এর 'হারমোনিয়াম ও রেডিও' শীর্ষক আলোচনা ছাড়াও বিদেশী লেখকের রচনার তিনটি অনুবাদ : যথা : লুমিয়েঁ লরা—শ্রেণী সংগ্রাম ও সামাজিক শান্তি; এইচ. এল. ব্রেলসফোর্ড—পরাধীন ভারত এবং জি.বি. এস. ও সি.ই.এম. জো অড—এর 'কাল্পনিক কথোপকথন'।

হুমায়ুন কবিরের 'ভারত বর্ষের ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধ দিয়ে ত্রিকালের পত্রসূচনা। ১৯৪৫ সনে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের একটি মুক্তিকামী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে হুমায়ুন কবির ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে স্বচ্ছ ব্যাখ্যা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন, তা উজ্জ্বল মনীষার নিদর্শন। পৌনে চার পৃষ্ঠার প্রবন্ধে তিনি ভারতবর্ষের দুই হাজার বছরের ইতিহাসের পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে আরম্ভ করেন কথা এভাবে :

> ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ যে সম্পূর্ণরূপে পার্থিব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক, এ বিষয়ে আজ মতভেদ নাই। মধ্যযুগের ভারতবর্ষেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়

www.pathagar.com

নাই। এসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। ভারত ইতিহাসের একটী বিশিষ্ট বিকাশের কথা আলোচনা করলে এ মতবাদের নতুন সমর্থন মেলে। মধ্য এশিয়ার ভৌগোলিক বা আর্থিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বিভিন্ন অভিযাত্রী জাতি ও বাহিনীর আবির্ভাব অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কিন্তু মধ্যযুগে রাজপুত শক্তির অভ্যুত্থান, প্রতিষ্ঠা ও অবনতির ইতিহাস সম্বন্ধে আজো আলোচনা অসম্পূর্ণ। মোটামুটি ভাবে বলা চলে যে অষ্টম শতকের পূর্বে অথবা অষ্টাদশ শতকের পরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজপুতদের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। এই হাজার বৎসর কিন্তু ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে তারাই প্রধান অভিনেতার অন্যতম। সংখ্যা ও সামরিক গুরুত্বে অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের স্থান তাদের উপরে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই এক হাজার বৎসরের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে তাদের স্থান অনস্বীকার্য। অষ্টম শতকের পূর্বে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কেন্দ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় গঙ্গা তীরেই আবদ্ধ—পাটলীপুত্র প্রয়াগ কৌণজ সমস্তই গাঙ্গেয় নগর। অশোক থেকে শুরু করে হর্ষবর্ধনের যুগ পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বও পূর্বাঞ্চল থেকেই এসেছে। অষ্টম শতকের অবসানে তা অকস্মাৎ বদলে গেল। রাষ্ট্রিক জীবনের কেন্দ্র পূর্ব থেকে সরে গিয়ে দিল্লীর আশে পাশেই প্রায় হাজার বৎসর রইল। দিল্লীর গৌরবের যুগ রাজপুত ইতিহাসেরও যুগ।

ইতিহাসের এ ঘটনা পরম্পরা যাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাঁরাও 'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জীবন প্রবাহের আলোচনা' ব্যতীত এর গূঢ় রহস্য বা তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন নি। লেখক আলোচনা করে দেখান যে, 'অষ্টম শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্যপ্রবাহ পূর্বাভিমুখী, সেদিকেই ভারতীয় উপনিবেশ ও সমুদ্রান্তর বস্তি।' সুদূর চীন ও জাপানের সঙ্গেও সেদিন ভারতবর্ষের যোগাযোগ সমুদ্র ও স্থলপথে অব্যাহত। পশ্চিম দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধেরও নিশানা মেলে, মিশর ও ইউনানের বাজারে ভারতীয় ইস্পাত ও বস্ত্রের কথাও শোনা যায়।

কিন্তু পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্যের তুলনায় পশ্চিমাভিমুখী বাণিজ্য স্বল্প ও অনির্দিষ্ট। তারই ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক জীবনের গতিও পূর্বাভিমুখী। সমুদ্রান্তর পূর্বদেশ হতে যে ঐশ্বর্যসম্ভার ভারতবর্ষে এসেছে ; তারই প্রভাব রাষ্ট্রীয় জীবনেও স্বপ্রকাশ। সপ্তম শতকের শেষে....আরব নৌ শক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের পশ্চিমমুখী বাণিজ্যে নতুন বিকাশ দেখা দিল।... এ নতুন বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র গুজরাট, এবং সে পথে পশ্চিম থেকে ঐশ্বর্যসম্ভার ভারতবর্ষে আসতে শুরু করল।

ভারতীয় বাণিজ্য প্রবাহের এ নতুন পরিণতি যে যুগের কথা, সেই যুগেই রাজপুত শক্তির আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। আবার 'অকস্মাৎ যেভাবে রাজপুত প্রতিষ্ঠার সমাপ্তি, তাতেও প্রমাণিত হয় যে, উত্তমাশা অন্তরীপের সন্ধান যখন পর্তুগীজেরা পেলো, তখন কালিকটে এসে তারা বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করার পরে মাদ্রাজ ও পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য বন্দরে নতুন বাণিজ্য প্রবাহ বইতে শুরু করে। আর তখন থেকেই গুজরাটের গুরুত্ব কমতে থাকে এবং রাজপুত শক্তি ম্রিয়মাণ হতে আরম্ভ করে। তিনি আলোচনার শেষ পর্বে বলেন, ইয়োরোপীয় বাণিজ্য প্রবাহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক জীবন নতুন খাতে বইতে শুরু করল।

অর্থনৈতিক কেন্দ্র পরিবর্তনের সঙ্গে রাজনৈতিক কেন্দ্রও বদলাল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বোধ হয়, প্রথম মাদ্রাজ এবং কলিকাতা রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। ফলে, রাজপুত ও মারাঠা উভয় শক্তিরই রাজনৈতিক প্রতিপত্তি কমে এল। মারাঠা শক্তি তবু প্রায় একশো বছর পরাজয়ের বিরুদ্ধে লড়েছে, কিন্তু রাজপুতেরা যেন ভারত ইতিহাস থেকে

www.pathagar.com

একেবারে মুছে গেল। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজের বদলে বাণিজ্যিক প্রাধান্য যখন ইংরেজ ও ফরাসীর হাতে এল, তখন কঙ্কনের চেয়ে করমণ্ডল ও দক্ষিণবঙ্গের গুরুত্বই বেড়ে গেল বটে, কিন্তু বন্দর হিসাবে বোম্বাই-এর প্রয়োজনীয়তা কোনদিনই কমে নাই। তাই অর্থনৈতিক জীবনের একটি ধারা সেখানে জাগ্রত রইল, এবং তারই ফলে মারাঠিরা কোনদিনই একেবারে শক্তিহীন হয় নাই। পরন্তু ঘটনা পরম্পরায় বোম্বাইতে ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের যে বিকাশ, তাতে সম্প্রতি, আবার গুর্জ্জরবাসী ও মারাঠার ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য দেখা দিয়েছে। মোগল-পাঠানের বিরুদ্ধে রাজপুতের সংগ্রাম অথবা মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মারাঠার বিদ্রোহ—এ সমস্ত ঘটনার মূলেই তাই অর্থনৈতিক শক্তির ক্রীড়া দেখা যায়। ধর্মীয়, জাতিগত বা সংস্কৃতিমূলক প্রায় সমস্ত দ্বন্দ্বেই গোড়ার কথা পার্থিব স্বার্থের সংঘাত।[৪]

ভারতবর্ষ ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হবার দুবছর আগে যুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্পবাণিজ্য বিষয়ের আলোচনায় যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্পষ্ট কয়েকটি কথা বলেছিলেন : ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের একমাত্র ভরসা জাতীয় গভর্নমেন্ট। যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষ যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে এবং দেশের জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হন, তাহলেই যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হতে পারে।

এদেশে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, মজুর ও কাঁচামালের কোন অভাব নেই, দেশের জনসমষ্টি এত বিপুল যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য এদেশের উৎপাদকদের বাইরে যাবার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। যুদ্ধোত্তরকালে দেশে যদি জাতীয় গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহলে বর্তমানে দেশবাসীর হাতে যে শত শত কোটি টাকা অকেজো অবস্থায় এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের কোম্পানির কাগজ ও ডিবেঞ্চারে নামমাত্র সুদের বিনিময়ে বাধা পড়ে আছে, তা দেশের শিল্পবাণিজ্যে নিয়োজিত হতে পারবে।

গভর্নমেন্টকে আগ্রহী দেখলে পাবলিক সেকটরও বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে, দেশের বেকার সমস্যা কিছু লাঘব হবে, দেশবাসীর আয় বৃদ্ধি পাবে এবং জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নত হবে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যুদ্ধোত্তর কালে যদি দেশে জাতীয় গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইলে ১৫/২০ বৎসর কালের মধ্যে ভারতবর্ষ শিল্প বাণিজ্যে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে এবং ভারতবর্ষে এত সমৃদ্ধি আসিবে যাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মঙ্গল ঘটাইবার পক্ষেও বিশেষভাবে সাহায্য করিবে।...

এ কেবল কল্পনার কথা নয়, রাশিয়ার উদাহরণ টেনে লেখক বলেন, 'রুশিয়াতে যাহা সম্ভবপর হইয়াছে ভারতবর্ষে তাহা না হওয়ার কারণ' নেই। 'ভারতীয় কংগ্রেস ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিশনের দশ বৎসর কালের মধ্যে দেশের শিল্প বাণিজ্য উন্নীত করিয়া দেশবাসীর জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতি সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করিয়াছেন তাহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবসর নাই।

কিন্তু বর্তমান গভর্নমেন্টই দেশের উন্নতির পক্ষে চরম বিঘ্নস্বরূপ। 'এই গভর্নমেন্টের পরিবর্তন ব্যতীত দেশের অবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব। যুদ্ধোত্তর কালে যদি এই গভর্নমেন্টের শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে তাহা হইলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য অবনতির পথেই ধাবিত হইবে।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে দেশে যদি জাতীয় গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে এই দেশের শিল্প-বাণিজ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দিবে। বর্তমান যুদ্ধের অবসানে এই দেশের 'শিল্প-বাণিজ্যের কি অবস্থা দাঁড়াবে' এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের ইহার অধিক আর কোন বক্তব্য নাই।'[৫]

জহিরউদ্দিন আহ্মেদ ত্রিকালে সরোজিনী নাইডুর চিন্তা ও কর্মের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের প্রকাশ্য এবং ছদ্মবেশী শত্রুরা যাই বলুন না কেন, 'এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, কংগ্রেস চিরদিনই স্বাধীনতার সংগ্রামে অগ্রণী। এবং কোন যুক্তি বা উপলক্ষেই স্বাধীনতার দাবী কংগ্রেস ছাড়ে নাই।

ভারত সরকারের ইংরেজ স্বরাষ্ট্র সচিবও বহু দিন পরে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জাপ-প্রীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তা কেবলমাত্র ভিত্তিহীন নয়, বরং সজ্ঞান ও স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যাভাষণ। ভারতবর্ষকে স্বাধীন ঘোষণা করে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ রাজশক্তির অপসারণের যে দাবী কংগ্রেস তুলেছিল, তার আর কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এ মিথ্যা অভিযোগ দেশে ও দেশান্তরে রটিয়েছিল।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কণ্ঠরোধের জন্য ব্যগ্রতাও সেই একই কারণে।... সরোজিনী নাইডুর কার্যক্রম সমস্ত রকমের শোষণেরই বিরুদ্ধে। শ্রীমতী নাইডুর মতে, ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার স্বীকৃতি ভিন্ন দেশের সমস্যার কোনই সমাধান নাই...।'[৬]

শুধু প্রবন্ধ সম্পদেই নয়, কবিতা, গল্প, উপন্যাস—শিল্প-সাহিত্যের সকল বিষয়ে তাঁদের রচনা নির্বাচনে বিশেষ মান ফুটে উঠেছে। লেখকদের তালিকা থেকেই এর মান বুঝা যায় বলে বিস্তৃত বর্ণনার দরকার পড়বে না বলে মনে করি।

তথ্যনির্দেশ

১. সম্পাদকীয়, ত্রিকাল, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৫২।
২ সম্পাদকীয়, ত্রিকাল, প্রথম বর্ষ, ১৩৪৯।
৩. নিখিল চক্রবর্তী, জাতীয় ঐক্য, উপরিউক্ত, পৃ. ২০।
৪. হুমায়ুন কবির, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রবন্ধ), ত্রিকাল, ১৩৫২, পৃ. ১-৪।
৫. যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যুদ্ধোত্তর শিল্প-বাণিজ্য, ত্রিকাল, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৫২, পৃ. ৫০-৫১।
৬. জহিরউদ্দীন আহমেদ, সরোজিনী নাইডু, উপরিউক্ত পৃ. ৬৮-৬৯।

www.pathagar.com

৪. খ. মধ্যপন্থী, উদারনৈতিক মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল ধারা

১০. মোয়াজ্জিন

(কলকাতা, ১৩৩৫–৫৪)

'ভারতীয় খাদেমুল এনছান সমিতিসমূহের মুখপত্র' মোয়াজ্জিন প্রথমে ১৯২৮ বা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর থেকে ত্রৈমাসিক কাগজ রূপে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন ফরিদপুরের কৃতীসন্তান, 'তরুণ ভারতের এক কীর্তিমান যুবক' সৈয়দ আবদুর রব (১৯০৩–৬৯)। তিনি মানবসেবক এনছান সমিতিরও প্রতিষ্ঠাতা।

ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে আর্ত, পীড়িত মানুষের সেবার জন্য বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যায় এর কয়েকশত শাখা, প্রশাখার কার্যক্রমের মাধ্যমে খুব অল্পকালের মধ্যেই বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ ভারতের বড়লাট তাঁকে ১৯৩৭ সনে সমাজসেবার জন্য স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন।

সৈয়দ আবদুর রব এর পিতা সৈয়দ আকমল আলী ও মাতা সৈয়দা লতিফুন্নেসার সম্মতি ও উৎসাহেই ফরিদপুরের নিজস্ব বাসভবনে 'খাদেমুল এনছান সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২৮ সনে। এব্যাপারে তাঁর মায়ের অবদানই সর্বাধিক। তিনিই নেপথ্যে থেকে এই সমিতি পরিচালনা করতেন বলে মোয়াজ্জিনে উল্লেখ আছে।

আবদুর রবের মাতা সুশিক্ষিতা, সদবংশীয়া রমণী ছিলেন, তাঁর কাছেই রবের মানবতাবাদী শিক্ষার সূচনা। বাল্যকালেই তিনি দুঃস্থ মানবতার সেবার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজেকে সে কাজে উৎসর্গ করেন। একাঁডেমিক শিক্ষা বেশী না থাকলেও তিনি ছিলেন কবিপ্রাণ সুসাহিত্যিক এবং ইংরেজী, বাংলা. উর্দু, হিন্দী, আরবী ও ফারসী ভাষায় স্বশিক্ষিত ব্যক্তি।

ইংরেজী ভাষায় 'দি সারভেন্ট অব হিউম্যানিটি' সম্পাদনা করে তাঁর ইংরেজি শিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মীয় শিক্ষার পরিচয় রয়েছে তাঁর রচনাবলিতে, এই পত্রিকার পাতাতেই মুদ্রিত হরেক রকমের লেখায়। তিনি মরমী, মানবতাবাদী গান ও কবিতাও লিখেছেন। হিসেব করলে হয়ত দেখা যাবে ত্রৈমাসিক এক বছর, দ্বি–মাসিক দুই বছর ও মাসিক হিসাবে নয় বছর প্রকাশিত মোয়াজ্জিনের মোট পৃষ্ঠার এক চতুর্থাংশই নামে. বেনামে তাঁর রচনা।

সমিতি পরিচালনার এবং পত্রিকা সম্পাদনার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করাতে তাঁর নিজের লেখা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সমকালের অন্যান্য পত্রপত্রিকায় তাঁর কতিপয় সৃজনশীল লেখা প্রকাশিত হলেও, সমিতির পক্ষে বহু আবেদন নিবেদন পত্রাদি মোয়াজ্জিনে ছাপা হয়েছে যা তাঁর রচিত। বস্তুত তিনি ছিলেন অখণ্ড ভারতের বিপুল সংখ্যক লোক নন্দিত, তৎকালের প্রায় তাবৎ পত্রিকার আলোচিত এক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই ব্যক্তির স্মৃতি এখন বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে নানা প্রসঙ্গে আমাদের সাহিত্য সমাজে, অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উপাদানের উৎসরূপে 'মোয়াজ্জিন' এর উল্লেখ হয়ে থাকে। সমাজকল্যাণের

www.pathagar.com

উচ্চতর বিদ্যাচর্চায় 'খাদেমুল এনছান সমিতি'র ইতিহাস সুদীর্ঘকাল ধরেই পাঠ্যসূচিভুক্ত হয়ে আছে।

মোয়াজ্জিনের ১২ বছরের সংখ্যাগুলোর অনেকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে খাদেমুল এনছান সমিতির ঘোষণা, আহ্বান, আবেদন এবং কার্যক্রমের বিবরণ। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের নানা স্থানে বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প, মহামারী ইত্যাদি দুর্যোগে সৈয়দ আবদুর রব ও তাঁর মিশন দক্ষতার সঙ্গে সেবাকার্য পরিচালনা করেছেন।

আর্তের সেবার মাধ্যমে সৈয়দ আবদুর রবের মনে সমাজের বৃহত্তর সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, দুর্নীতি, সর্ববিধ দৈন্য তাঁকে পীড়িত করে। তাই শুধু আর্তের সেবা নয়, মিশনের উদ্দেশ্যে তিনি যোজনা করেন সামাজিক সংস্কারের ও পুনর্গঠনের ব্রতও। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করলেও তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন স্ব-সমাজের (বাঙালি মুসলমানের) পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নতির দিকে।

খাদেমুল এনছান সমিতি দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় ও নৈশ বিদ্যালয়, পাঠাগার, এতিমখানা, কবরস্থান, ধর্মগোলা, সালিশীবোর্ড ইত্যাদি স্থাপন করে। এক সময় বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে এর ৩২৮টি শাখা অফিস, ২১৩ টি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং ১১৫টি শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

এগুলোর আবার বার্ষিক সম্মিলন হতো কয়েকদিন ব্যাপী। তাতে মৌলানা, মৌলবী ও সাধারণ শ্রেণীর বহুলোকের সমাগম হতো। এঁদের উদ্দেশে সৈয়দ আবদুর রব প্রকৃত ইসলাম কী, ধর্ম কাহাকে বলে আর অধর্ম ও অশিক্ষা, কুশিক্ষা কী—তা ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধ বা অভিভাষণ উপস্থিত করেছেন। 'মোয়াজ্জিন'ও তাঁদের কাছে নিয়মিত পৌঁছেছে। মুদ্রণ সংখ্যাও নেহায়েত কম ছিল না। অতএব মুসলিম সমাজে তো বটেই, সমিতি ও এর মুখপত্র মোয়াজ্জিন এর প্রবল প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে বৃহত্তর বাঙালি সমাজে। 'মোয়াজ্জিন' এর মানবতাবাদী সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব বাঙালি মুসলমানের মননের ওপর অপরিসীম।

সমিতির কার্যক্রম যখন ব্যাপকতা লাভ করে, তখন এর সদর দফতর কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়, শাখা রাখা হয় ফরিদপুরে। আগে সদর দফতর ফরিদপুরে এবং শাখা কলকাতায় ছিল। ১৯৩৮ সন নাগাদ কলকাতার উল্টোডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে আট বিঘা জমির ওপর 'আদর্শ জগৎ উপনিবেশ' নামে একটি প্রকল্প স্থাপনের কাজও শেষ হয়েছিল।[১]

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাঙ্গার জোর আন্দোলনের সময় সম্পাদক গুরুতররূপে আহত হন এবং মিশন অফিস লুণ্ঠিত হয়। আবদুর রব শহর ফরিদপুরে ফিরে যান এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

সাতচল্লিশ সালের ঘটনায় দৈহিক আঘাতের চেয়ে মানসিক আঘাত তাঁর অনেক বেশি লেগেছিল। তাঁর এত সাধনা ও শ্রমে গড়া প্রতিষ্ঠান এক কুটিল চক্রান্তে বিনষ্ট হয়ে গেল! হৃতসর্বস্ব হয়েও তিনি মিশন পুনরুজ্জীবিত করবার প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর কর্মসূচী সফল হতে যে পরিবেশের প্রয়োজন ছিল তার নিতান্তই অভাব ঘটে তখন।[২]

তিনি সাহিত্য-সেবায় নিয়োজিত করলেন নিজেকে। প্রকাশের প্রতি মনযোগ না থাকলেও লেখাতে বিরাম দেননি তিনি। তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে

www.pathagar.com

জীবন ও সাহিত্য, বাস্তববাদী সাহিত্য, ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞার পয়গাম, বিশ্বমুক্তি, নজরুল-নামা, বিশ্বভাস্কর, বিশ্বমুসলিমের সমস্যা, ধর্ম-সাহিত্য, সভ্যতা ও জ্ঞান ভিত্তিক আদর্শ, ইসলাম ধর্ম আন্দোলনে ফরিদপুর, আত্মচরিত, খাদেমুল এনছান আন্দোলন, সাহিত্য ও সমসাময়িক সমাজচিত্র, কাব্য-সাহিত্য, স্ব-সম্প্রদায় ও স্বদেশ সেবায় নজরুল, নবদিগন্ত, সাহিত্যে ফরিদপুর ইত্যাদি।

ফরিদপুর থেকে মোয়াজ্জিন যখন বের হয় ত্রৈমাসিক পত্রিকারূপে বৈশাখ ১৩৩৫-এ, তখন এর শীর্ষে লেখা হত 'ফরিদপুর, চরহরিরামপুর, উজানচর, কোমরপুর, রাজৈর, বাহাদুরপুর (নদীয়া) ও ঢাকার খাদেমুল এনছান সমিতিসমূহের মুখপত্র'। পরে এই সব পরিবর্তিত হয়। সমিতির শাখা বেড়ে গেলে সর্বভারতীয়রূপ দেয়া হয় পত্রিকার এবং অবাঙালিদের মাঝে প্রচারের জন্য ১৯৩৬ সনে 'দি সারভেন্ট অব হিউম্যানিটি' বের করেছিলেন।

'মোয়াজ্জিন' কথার অর্থ আহ্বায়ক। এর প্রচ্ছদে পবিত্র কোরআনের আয়াত উৎকলিত হত—'আমি তোমাকে (হজরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামকে) বিশ্বজগতের কল্যাণের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছি।' এবং হাদীস 'বিশ্বমানবের জন্য তুমি তাহাই পছন্দ করিবে, যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহা হইলে তুমি মুসলমান হইতে পারিবে।'

এ থেকে পত্রিকার উদ্দেশ্য মোটামুটি বুঝা যায়। তবে 'মোয়াজ্জিনের কথা' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় থেকেও দুটি উক্তি উদ্ধৃত করা হলো :

> নিশার নিবিড় কালিমা কাটিয়া গিয়াছে। মোসলেম জগতে আজ জাগরণের জোয়ার আসিয়াছে। তাই এ নবীন ঊষায়, সেই তের শত বৎসর পূর্বে গড়া প্রেমের মিনারে দাঁড়ায়ে, 'মোয়াজ্জিন' মুক্তকণ্ঠে এ-তন্দ্রা-অলস জাতিকে জাগরণী গানে আহ্বান করিতেছে। এ মিনার, পৃথিবীর মহামানব প্রেমিক শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কঠোর সাধনা বলে প্রেম ও মৈত্রী, সাম্য ও শান্তির উৎকৃষ্ট উপাদানে গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন।
>
> সেই অনাবিল সত্য প্রতিষ্ঠার কঠোর সাধনার ধন, প্রেমের ইসলাম ভবন আজ অযত্ন অবহেলায় আগাছা-পরগাছায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ভয় হয়, এইরূপ অযত্নে মর্ত্ত মানবের একান্ত সম্বল এই প্রেমের মহল ক্রমে জানোয়ারের আবাস স্থল রূপে পরিণত না হয়।...
>
> ... সেই অনাবিল সত্যকে উপেক্ষিত দেখিয়া মানবতার মুক্তি দূত...নবীনপন্থীদের প্রাণে প্রাণে আকুল আগ্রহ ও ব্যাকুল বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে,...এই সাধনা দ্বারাই সারা বিশ্বে আবার সেই খাঁটি সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেদিন ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে।... এই সত্যের যাঁহারা খাঁটি সাধক তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে মোয়াজ্জিনের এ আকুল আহ্বান।[৩]

'মোয়াজ্জিনকে' স্বাগত জানিয়ে শের এ বাংলা এ.কে. ফজলুল হক লিখেছিলেন :

> মোয়াজ্জিন ! এস, প্রাণের সবটুকু আনন্দ দিয়ে তোমায় অভিনন্দিত করছি ! সুদীর্ঘ রজনীর নিবিড় তিমিরাবসানে এ শুভ প্রভাতে, তুমি গেয়ে উঠ গম্ভীর রবে জাগরণের গান। আহ্বান কর ইসলামের সুউচ্চ মিনারে দাঁড়ায়ে তুমি, এ নিখিল বিশ্ব মানবকে।...আশীর্বাদ করি, তুমি কর্মবলে, সেবা ধর্ম বলে এবং জ্ঞান ও সত্য-সাহিত্য-সাধনার বলে বলীয়ান হয়ে উঠ। আঁধার অবসানান্তে তুমিই আলোর আগমনী গানে বিশ্বের মুক্ত আকাশ বাতাস ধ্বনিত কর। মানুষের মলিন মুখে আবার হাসির রেখা ফুটিয়ে তুল ! বড়ই আনন্দ হয়, তুমি ইসলামের সত্য ও স্বরূপ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেছ। তুমি যেন চিরদিন প্রেম ও শান্তির গান

www.pathagar.com

> গেয়ে বিশ্বকে আহ্বান করে তোমার 'মোয়াজ্জিন' নামের সার্থকতা সমাপন করতে পার! বিশ্বের বিশেষতঃ বঙ্গ মোসলেমের, তুমি যেন গৌরব গরিমা হয়ে উঠ। তোমার গান শুনে, মানুষ যেন ছুটে আসে শান্তির সন্ধানে, তৃপ্তির সন্ধানে ও মুক্তির সন্ধানে তোমার পাশে। তুমি দীর্ঘায়ু হও, ধন্য হও।[৪]

মোয়াজ্জিন যে সমিতির মুখপত্র ছিল, সেই সমিতির সভাপতি ছিলেন ফরিদপুরের মুসলিম লীগের নেতা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী চৌধুরী, তমিজউদ্দিন খান, আলিমুজ্জামান চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ ইসমাইল, হুমায়ুন কবির প্রমুখ। এর প্রকাশ অনিয়মিত ছিল, কিন্তু ১২ বছরে এতে (ত্রৈমাসিক, দ্বি মাসিক, মাসিক ও যুগ্ম সংখ্যা মিলিয়ে) অনেক ভালো লেখা ছাপা হয়েছে, যা অন্যসব পত্রিকায় ছাপা হতো না।

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা মোয়াজ্জিনে অনেক ছাপা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, প্রায়·প্রতি সংখ্যায় তাঁর নতুন অথবা পুরানো কবিতা, গান বা উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথম সংখ্যায়

'ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণী তল...ধূলায় তাজমহল'—কবিতাটি ছাপা হয় 'মোয়াজ্জিন' শিরোনামের নীচে। মার্চের সুরের কবিতা ও গানের প্রতি সম্পাদকের দুর্বলতা ছিল। তাঁর (নজরুলের) জাগরণী গান ঘুমন্ত মুসলমানের রক্ত চঞ্চল করে তোলার জন্যে দরকার, সম্পাদক তাই মনে করতেন। কর্মের প্রতিই আকর্ষণ বেশি তাঁর (সম্পাদকের), মিছে বক্‌বকানিতে আস্থা ছিল না,—এই মর্ম কথা মোয়াজ্জিনের অন্যতম লেখক, দার্শনিক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর (১৮৯৮–১৯৭৪) কথায়ও অভিব্যক্ত হয়েছে—'আজ বক্তার দল একবার মৌনব্রত গ্রহণ কর। নীরব কর্মীর জন্য সমাজের গৌরবাসন ছাড়িয়া দাও।'

এইরকম উক্তি করার পেছনে, যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি তাঁর সগোত্রীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থা দেখেছেন,—কারাগারে পচে মরছে, স্টেশনে স্টেশনে কুলীগিরী করে বেড়াচ্ছে, জমিদারের লাঠিয়াল হয়ে মানুষ মারছে যারা—তারা সবাই মুসলমান।

> মুসলমানের অবনতি, দুর্দশা ভাষায় বলিবার সাধ্য নাই। ভাবিলে ব্যথায় বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু কাহাকে বলিবেন, কাহাকে বুঝাইবেন? বুঝিবে কে? শুনিবে কে?... মুসলিম সমাজ এখন অজ্ঞতারূপ শয়তানের দ্বারা আবিষ্ট। অজ্ঞতাই পাপ। পাপই শয়তান। অজ্ঞতা মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

... মুসলিম সভ্যতার বিকাশ তো আপনাআপনি ঘটেনি। কতকগুলি ত্যাগী–তপস্বী–কর্মীর সাধনার দ্বারা তা হয়েছিল। মুসলমানেরও উচিত আজ তাই করা। 'পুণ্যব্রতের উদযাপনে যে যতটুকু পার সম্ভার যোগাও, আর তৃষিত সমাজ সে সুধা পান করিয়া অমর হইয়া বাঁচিয়া উঠুক। তাহার প্রাণে নবশক্তি, নবচেতনা জাগ্রত হইয়া তাহাকে মহান লক্ষ্যের পানে ছুটাক।[৫]

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বি.এ.বি.টি 'বঙ্গ মোসলেমের দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন,

> মোসলমানগণ শিক্ষায় এত পশ্চাৎপদ, বাণিজ্য ব্যবসায়ে এত উদাসীন, প্রতিকর্মে এমন উৎসাহহীন হইবার কারণ কি?... মোসলমানদের দরিদ্র হইবার কারণ অনেক।... প্রতিকারের উপায় কি? আমার মনে হয়, দুই উপায়ে আমরা এই অবস্থার প্রতিকার করিতে

www.pathagar.com

পারি। প্রথমতঃ ব্যাংক স্থাপন করিয়া, দ্বিতীয়তঃ গ্রামে গ্রামে বাইতুল মাল তহবিল স্থাপন করিয়া।... এই ক্ষেত্রে আমি বাংলার প্রত্যেক পল্লীবাসীকে ফরিদপুরের খাদেমুল এনছান সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা, সারা বাঙলার মধ্যে আজ কেবল ফরিদপুরের মোসলেম যুবকগণই অগ্রণী হইয়া পল্লী সংগঠন কার্য মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদিগের এই সংকল্প অতি মহান। বর্তমানে বাঙলায় ইহারই একান্ত প্রয়োজন।... তাঁহাদের এ কর্মপদ্ধতি গৃহীত হইলে বাঙ্গালী মোসলমানের কুদিন ফিরিয়া সুদিন আসিবে।[৬]

বাঙালির মাতৃভাষা যে বাংলা, সে বিষয়ে মোয়াজ্জিনেরও দ্বিমত ছিল না। 'মাতৃভাষার ভিতর দিয়া নিজেদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে' যে, সেকথা মুসলমানদেরকে 'মোয়াজ্জিন' উপর্যুপরি বলবার চেষ্টা করেছে—

বঙ্গভাষা যে বঙ্গীয় মুছলমানদের মাতৃভাষা, এ সম্বন্ধে বোধ হয় এখন আর দ্বিমত নাই। অন্তত অধিকাংশ বঙ্গীয় মুছলমানই একথা এক বাক্যে স্বীকার করেন। অল্প সংখ্যক যাঁহারা করেন না তাঁহারা এখনও উর্দুর স্বপ্নেই..(বিভোর)।

এবারও সেইরূপ কিছু আয়োজন দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে ভয় বা আশংকার কোন কারণ নাই। প্রকৃতির নিয়মকে উল্টাইয়া দিয়া উর্দু কোনরূপেই বাঙ্গলার মুছলিম জনসাধারণের ভাষা হইতে পারিবে না।... আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে বাংলা ভাষা কেবল আমাদের মাতৃভাষা নয়, আমাদের জন্মভূমির ভাষা। ইহা হিন্দুরও ভাষা, মুছলমানেরও ভাষা। ইহার উপর হিন্দু-মুছলমান সকলের তুল্য অধিকার।[৭]

বাংলা ভাষার দুই রীতির মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য—সে প্রসঙ্গেও 'মোয়াজ্জিন' প্রাগ্রসর মত প্রচার করতে চেয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অভিভাষণ উদ্ধৃত করার মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যাবে—

বর্তমানে বাঙ্গালা সাহিত্যে সাধুভাষা ও কথ্যভাষা দুই-ই চলিতেছে। সরলতা ও স্বাভাবিকতার দিকে দেখিতে গেলে কথ্য ভাষার দাবী অগ্রগণ্য। আমার মনে হয় এই কথ্যভাষাকেই একমাত্র সাহিত্যের ভাষা করা উচিত। তজ্জন্য অবশ্য তাহাকে মার্জিত ও সংস্কৃত করিতে হইবে।... আমরা এখন অভ্যাসবশে সাধুভাষা লিখিতেছি, বিচার করিয়া লিখিতে গেলে কথ্য-ভাষাই আমাদের অবলম্বনীয় হইবে। নাটকে কথোপকথোনে আমরা কথ্যভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য।

'কেহ হয়ত বলিবেন.. কোথাকার কথ্যভাষা ব্যবহার করিতে হইবে?... ইহার উত্তর এই যে... শ্রোতারা কিভাবে তাহা গ্রহণ করে। মোটকথা রাজনৈতিক কারণে সাহিত্যিক শক্তিতে এবং শিক্ষার কেন্দ্ররূপে কলকাতার কথ্যভাষাই সাহিত্যের ভাষারূপে দাঁড়াইতে সক্ষম। তবে তাহার সংস্কারের প্রয়োজন নাই এমন কথা বলা চলে না।... ... বলিয়াছি বাঙ্গালা বিশ্ব সাহিত্যের ভাষা হইবে। আরবী, পারসী, ইংরেজি, ফরাসী, জর্মান, রুস, গ্রীক, ল্যাটিন, চীনা, তিব্বতী প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য হইতে কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান সর্ববিষয়ের শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলির অনুবাদ বাঙ্গালা ভাষায় করিতে হইবে। দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ বাঙ্গালায় রচনা করিতে হইবে। বিশ্ববাসীকে বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য উদগ্রীব করিতে হইবে। এখন লোকের অভাব নাই। কিন্তু ইচ্ছা কোথায়? তবে আসুন বঙ্গবাণীর ভক্ত, সাধক ও সেবকগণ, আমরা ভাষা জননীকে জগতের চক্ষে বরণীয়া করিয়া, আমরা নিজেরা ধন্য হই এবং আমাদের মাতৃভূমিকে ধন্য করি। ওম্ স্বস্তি! স্বস্তি! আমীন![৮]

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল বারী 'সাহিত্য ও মুছলমান শিক্ষিত তরুণ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

শিক্ষিত তরুণেরাই সমাজের আশা ভরসার স্থল। ...আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে প্রতি বছরই কিছুনা কিছু গ্রাজুয়েট লাভ করিতেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত ইঁহাদের নিকট হইতে সমাজ বিশেষ কিছু পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।... এই বিংশ শতাব্দীর জয়যাত্রার দিনে, আমাদের শিক্ষিত তরুণদল পদে পদে অসামর্থ্য প্রকাশ করিতেছেন।...শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত থাকায় আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে পাঠ্যাবস্থা হইতেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি মুছলমান ছাত্রদের একটা অবহেলার ভাব দেখা যায়।... ফলে তাহারা কোন প্রকারে 'জোড়াতালি' দিয়া পরীক্ষার পাড়ি উৎরাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে মাত্র। ফলে বাঙ্গালা সম্বন্ধে মুছলমান ছাত্রদের দৃঢ় জ্ঞান জন্মিতে পারে না। উত্তরকালে ইঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রী লাভের সুযোগ ঘটিলেও মাতৃভাষা সম্বন্ধে অনেকেরই জবান অপরিপক্কই থাকিয়া যায়। এখনও এমন গ্রাজুয়েটের অভাব নাই, যাঁহার চারি ছত্রে বাঙ্গালা লিখিতে অন্ততঃ পাঁচটি বর্ণাশুদ্ধি হয় না।...

সংবাদপত্র জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি। কিন্তু উপযুক্ত সাহায্য সহানুভূতি ও গ্রাহকের অভাবে মুছলমানদের কাগজগুলি টিকিয়া থাকিতে পারে না। প্রবন্ধের অভাবে সাময়িকীগুলি রীতিমত প্রকাশিত হইতে পারে না। ইহা কি কম ক্ষোভের কথা।... অনুশীলনই উন্নতির সোপান। একদিনই রবি ঠাকুর 'বিশ্বকবি' বা শরৎচন্দ্র 'সাহিত্য সম্রাট' হন নাই। যুগ প্রবর্তক কবি নজরুল ইসলাম প্রথম যেদিন তাঁহার লেখা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়' পাঠান, সেদিন সম্পাদকের নিকট প্রবন্ধ প্রকাশার্থে সে কি ব্যগ্রকাতর প্রার্থনা! আর আজ সেই সম্পাদকেরাই পত্রিকার উপরের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেন,—'এই সংখ্যায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অমুক কবিতা বাহির হইয়াছে'... এরূপ ব্যর্থতা স্বাভাবিক' এবং তাহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি সেইখানেই বসিয়া পড়িতে হইবে? কখনই নহে। অনুশীলনের সোপান বাহিয়া চলুন, সাফল্যের গৌরব শিখরে পৌঁছিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

আমাদের শিক্ষার বাহন উর্দু হইবে কি বাঙ্গালা হইবে এই তর্ক সেদিন মাত্র আসিয়াছে। সুতরাং বলাই বাহুল্য, আমাদের সাহিত্যের কোন অঙ্গই পুষ্ট নহে। বিশেষতঃ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে মুছলমানগণ নিতান্ত পশ্চাৎপদ। পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সিরাজদ্দৌলার কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন। স্যার যদুনাথ সরকার ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে মোগল অন্তঃপুরের সংবাদ দিতেছেন। এসম্বন্ধে আমাদের কি কোনই কর্তব্য নাই? দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয় মুছলমানের ইতিহাস কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত। মধ্যে-মধ্যে পত্রিকার পৃষ্ঠায় দুই একটি ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদে মিথ্যা কলঙ্কের এ গাঢ় মসীপ্রলেপ অপনীত হইবার নহে।[৯]

লেখক স্পষ্ট করে বলেন, মুসলমান সমাজের ছোট বড় সকল সাহিত্য স্রষ্টাকেই বাংলা সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে, এছাড়া বাঙ্গালি মুসলমানের জাগরণ সম্ভবপর নয়।

মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে বিরাজমান কসুংস্কার দূরীকরণের ক্ষেত্রে 'মোয়াজ্জিন' এর একটি বড় ভূমিকা বিরাটভাবেই চোখে পড়ে। যাঁরা সমাজের আস্থাবান আলেম, ধার্মিক তাঁদের কথাই ধর্মভীরু মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে কোরান ও হাদীসের মর্মকথা বিশ্বস্ত ভাবে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনের মাধ্যমে যাঁরা মুসলমানদেরকে মানবতা, স্বদেশ ও সভ্যতার কল্যাণের পথে আহ্বান করেছেন, তাঁদের ভূমিকাকে গৌণ করে দেখার অবকাশ নেই। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান সাহিত্যিক না হয়েও যে সকল মৌলানা মৌলবী

www.pathagar.com

সাহিত্যের পথে ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে বাঙ্গালি মুসলমানকে আগ্রহী অনুরাগী করে তুলেছেন—তাঁদের মধ্যে মোয়াজ্জিনের লেখকগোষ্ঠীর অবদান স্বীকৃত হবে। বিশেষ করে সৈয়দ আবদুর রব এর সম্পাদকত্ব ও লেখনীর মর্যাদা আমাদের দিতেই হবে। তিনি বলেন,

মুসলমানের উন্নতির জন্য মাদ্রাসা-শিক্ষার কুফল থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। আরও দরকার মুসলমান সমাজের গতানুগতিক, ধর্মবিশ্বাসের বন্ধনমুক্তি। মোয়াজ্জিনের বিভিন্ন সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ ও সংস্কারমূলক নকশায় একথা বারবার বলা হয়েছে যে, অজ্ঞানতাপূর্ণ ধার্মিকতা অত্যন্ত ঘৃণিত এবং তা এক প্রকারের অধর্মও বটে। মুসলমানদের উন্নতির জন্য দরকার 'অর্থপূর্ণ ধার্মিকতা'। সম্পাদক আবদুর রব 'এছলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা' নামক এক অভিভাষণে বলেন :

> অতি দুঃখের সহিতই বলিতে হইতেছে, আমাদের সমাজে ব্যর্থ নামাজীর সংখ্যাই শতকরা নিরানব্বই অপেক্ষাও অধিক। একদল লোক আমাদের সমাজে আছে, যাহারা কেবল কুরআনের মাহাত্ম্য, হাদিছের বৈশিষ্ট্য, এছলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং হজরতের বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াজ করিয়া বক্তৃতামঞ্চে 'বাহবা' আদায় করাই জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছে। অন্য একদল সমাজকে হেদায়েতের পথে (?) আনয়ন করিতে মূর্খ সাগরিদান ও মুরিদানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার অদ্ভুত প্রয়াস পাইতেছে... পৌরহিত্যের কি লোভ !... ইহাদের কথা ও ইহাদের খলিফাদের কথা চিন্তা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় ! ইহারা পীর মুরীদী ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য কত প্রকারের ঘৃণিত পন্থাই না অবলম্বন করিতেছে।... আমাদের সমাজের এই দারুণ দুর্দশার জন্য ইহারাই দায়ী। ইহাদের সংস্পর্শে সমাজের ক্রমঅধঃপতন হইতেছে।... মাদ্রাছার মধ্যবর্তিতায় প্রতি বৎসর আমরা অকর্মণ্য-অপদার্থ করিয়া ফেলিতেছি। একটি জাতির পক্ষে ইহা কত বড় ক্ষতিজনক ! আবার মাদ্রাছার শিক্ষা সাধারণতঃ মাদ্রাছাতেই সীমাবদ্ধ থাকিতেছে।... এইরূপে সমাজ ক্রমশ ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইতেছে।... মাদ্রাছায় শিক্ষালাভ করিলেই ভিক্ষা-বৃত্তিটী চরিত্রের একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়ায়।... এইরূপেই আমাদের আলেম ও মৌলানাদের সম্মান বিনষ্ট হইতেছে।...[১০]

লেখক স্পষ্ট করে বলেন, বর্তমানে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বাহ্যিক ধর্ম প্রচারের ধুম পড়ে গেছে। মানুষ বর্তমান জমানায় উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির আধার। অজ্ঞানতা, বর্বরতা ও অসভ্যতা এখন অনেক মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছে। এযুগে প্রয়োজন হইতেছে কেবল শিক্ষার। মানুষ শিক্ষিত হউক। সত্য সে নিজেই গ্রহণ করিবে।[১১]

বলা আবশ্যক যে, সৈয়দ আবদুর রবের এই অভিভাষণের সূত্রে অন্তত ২০টি আলোচনা বা পত্র মোয়াজ্জিনে প্রকাশ পায়। তাতে মুসলমান সমাজের গলদগুলো চিহ্নিত হয় এবং প্রতিকারের উপায় বলা হয়।

কাজী আবদুল ওদুদ, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যিকগণ ছাড়াও অনেক মওলানা, মৌলবী, ইসলামী চিন্তাবিদ এই প্রবন্ধের বক্তব্যের উচ্চ প্রশংসা করেন এবং বলা দরকার, 'বাংলার জাগরণপন্থী' লেখকগণ মোয়াজ্জিনের পাতাতে সাগ্রহে লিখতেন, বিস্তৃত অনুসন্ধানে তা দেখা যায়।

বাঙ্গালি মুসলমান সমাজের অন্ধত্ব মোচনের জন্য এবং বাঙ্গলার মুসলমানকে হিন্দুর সাধনার সঙ্গে সমান্তরাল হবার জন্য উপর্যুপরি তাগিদ দিয়েছেন তাঁরা। মুক্তবুদ্ধির সাধনায়

www.pathagar.com

লিপ্ত হবার জন্য মোয়াজ্জিনে প্রকাশিত রচনাদির পরিচয় নিলে একথা বলতেই হবে যে বাঙ্গালি মুসলমানের সার্বিক অগ্রগতিতে এর দান অসামান্য।

ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের অনেক লেখা এই পত্রে ছাপা হয়েছে। তাঁর 'মুসলমান', 'দুঃখের রাত্রি', এবং 'বিশ্বাস ও আত্মশক্তির জয়' প্রভৃতি রচনা মোয়াজ্জিনে ধারাবাহিক, বলতে গেলে প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। একই সংখ্যায় কখনও একাধিক রচনাও তাঁর ছাপা হয়েছে। সম্পাদক আবদুর রব ডাক্তার লুৎফর রহমানের আদর্শের একজন ডেডিকেটেড, নিবেদিতপ্রাণ অনুসারী ছিলেন। মহান সমাজ সংস্কারক ছিলেন দুজনেই। লুৎফর রহমানের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ঠ। তাঁদের আদর্শের ও দর্শনের ঐক্য ছিল যে তা তাঁদের রচনাবলিই প্রমাণ করে। ডাক্তার লুৎফর রহমানের মৃত্যুর পর (১৯৩৬) সৈয়দ আবদুর রব মোয়াজ্জিনের একটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেন।[১২] 'মুসলমান' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনার একস্থলে লুৎফর রহমান বলেন,

> দিবারাত্র ওজু গোসল, ধর্মক্রিয়া এবং আবৃত্তিই তাহার ধর্ম জীবন নহে। পরকালে স্বর্গে পরমাসুন্দরী লাভের জন্য যে সারারাত্রি উপাসনার নামে জাগিয়া থাকে ইহা তার অতি নিকৃষ্ট হৃদয়বৃত্তির পরিচায়ক।... মুসলমান শুধু বাহিরের ক্রিয়ায় নহে, সুপ্ত সুবিপুল সুবিরাট আত্মিক সাধনা—সংগ্রামে সে মুনষ্যত্ব ও ঐশী প্রকৃতির মহোচ্চ আসন লাভের জন্য সদা জাগ্রত, সদা ব্যস্ত থাকিবে,—ইহাই তাহার ধর্ম। জগতে পরম শান্তি আনন্দ ও কল্যাণের বেহেস্ত রচনা করা, মনুষ্যের জন্য এবং নিজের জন্য পরম শান্তির রাজ্য অধিকারই তার জীবন সাধনা। তার বাক্য, ব্যবহার, আলাপ, জীবনরীতি সবই মধুর ও শান্তি সুবাসিত হওয়া দরকার।[১৩]

কাজী নজরুল ইসলাম বিশ ও ত্রিশের দশকেই মুসলমান সমাজের আদৃত সাহিত্য ব্যক্তিত্ব রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রগতিশীল, মানবতাবাদী মুসলমানের কাছে তিনি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কামাল পাশা ও আতাতুর্কের মতো সমাজ জাগরণের প্রতীক। বিভিন্ন সংখ্যায় নজরুলের পুরানো কবিতার আবশ্যিক অংশ উদ্ধৃত করে মোয়াজ্জিন সম্পাদকও সমাজকে জাগাতে চেয়েছেন বলাবাহুল্য, নজরুলের আদর্শ অনুসরণ করেই প্রথম সংখ্যাতে 'ওমর ফারুক' কবিতার কতিপয় চরণ চয়ন করা হয়েছে।

> এরপর 'নিদ্রাদেবীর মিনার চূড়ে মোয়াজ্জিনের শুনছি আরাব' (১/৩) ; 'যে দুর্দিনে নেমেছে তাহার বজ্র শিরে ধরি' (১/২) ; 'বাজল কিরে ভোরের সানাই' (১/৩) ; ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের সভার উদ্বোধনগীতি—'এস এস রসলোকবিহারী' (৪/২) ; 'বিদায়গীতি' (৪/৩) ; 'স্বদেশ' শীর্ষক মার্চ সঙ্গীত—'কলকল্লোলে ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে উঠছে গান (৪/৫) ; 'ভয় নাহি শংকাশূণ্য লক্ষ্য কণ্ঠে শঙ্খ বাজিছে ঐ' (৪/৫) ; 'দূর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে আজ শরতের ভোর হাওয়ায়' (৬/৬) ; 'তোমরা আমায় দেখতে কি পাও আমার গানের নদী পারে' (৪/৩) ; 'রণ মাদল চলরে চপল তরুণ দল বাঁধন হারা' (৬/৬) ; 'এই ভারতে নাই যাহা...' (৮/৩) ; 'আয়রে পাগল আপন বিভোল খুশীর খেয়ালী' (২/১–২) ; 'দূর আরবের স্বপন দেখি বাঙলাদেশের কুটীর হতে' এবং 'নামাজ পড় রোজা রাখ কলমা পড় ভাই' (১১/২) প্রভৃতি গান, গজল ও মার্চ সঙ্গীত ছাড়াও তাঁর 'নবাব নামতা পাঠ—'একেককে এক বাবা কোথায় দেখ' (৬/৮) ; চুটকী ছড়া এবং ভিক্ষার গান ; 'ভূমিকম্পের প্রলয়লীলায় সব হল ছারখার' (৬/১২) ; আর, 'জপে তোমারি নাম নিশীদিন/ জপে খোদা দুনিয়া জাহান' (১১/১) প্রভৃতি মোয়াজ্জিনে ছাপা হয়।

www.pathagar.com

নজরুলের নিজের লেখা ছাড়াও, তাঁকে নিয়ে রচিত গান, কবিতা, প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে মোয়াজ্জিনে। 'সিরাজগঞ্জে বঙ্গের বুলবুল কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের শুভাগমনে' কবিতা লেখেন রইছউদ্দীন আহমদ (৪/২)। তাছাড়া এতে কবিতা লিখেছেন বন্দে আলী মিয়া, মিসেস আর, এস. হোসেন, হুমায়ুন কবির, জসীমউদ্দীন, সুফিয়া এন. হোসেন, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, কাজী আবুল কাসেম, মোহাম্মদ আবদুল আলী, মিস রহিমা খাতুন, মহিউদ্দীন, মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরী, এম. আকবর আলী, সৈয়দ রাশেদুন নবী, শ্রী মন্মথ রায়, শ্রী সুরেশ বিশ্বাস, শ্রী অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, নছরু, সৈয়দ নুরুল আমীন, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সরকার, রিয়াজউদ্দীন চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ মিত্র, এম. আবদুর রহমান, বিভূতি চৌধুরী (বেগম রোকেয়া স্মরণে—'মৃত্যু বিজয়িনী', ৪/২), গোপালচন্দ্র বটব্যাল, এম.এ. ওয়াহিদ, আবু মঞ্জুর, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য, আজীজুল হাকীম, চিত্তরঞ্জন আচার্য বিদ্যাবিনোদ, এম. আলী নওয়াজ চৌধুরী, শ্রী সজনীকান্ত দাস, আবদুল কাদির, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (হাফিজের গজলের অনুবাদ, বিভিন্ন সংখ্যায়) ; মোহাম্মদ লোকমান খান, খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন (মিসেস আর. এস. হোসেন স্মরণে, ৪/২) সৈয়দ উদ্দীন, এম. এ. বাকী, শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী, আশরাফ আলী খান, বিশ্বনাথ নন্দী, মাহবুব, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (রবীন্দ্র-বন্দনা, ৮/২) ; আসমা খাতুন, নিশীকান্ত রায় চৌধুরী, আবু নয়ীম মোহাম্মদ বজলুর রশীদ, কে. এম. শমসের আলী, মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ. কামালউদ্দীন প্রমুখ তৎকালের হিন্দু ও মুসলমান অনেক কবি।

এ ছাড়াও কবি মুহম্মদ ইকবালের আসরার-ই-খুদীর অনুবাদ (৪/৪), শেকওয়ায়ে ইকবাল (৪/৪) এর অনুবাদ ছাপা হয়েছে। এগুলো অনুবাদ করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আশরাফ আলী খান ও আবদুল মজীদ সাহিত্যরত্ন।

লক্ষণীয় অনেক মুসলিম মহিলা ও হিন্দু লেখকের রচনা এতে ছাপা হয়েছে। ১৯৩১ সনে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের মৃত্যুতে অমুসলিম কবিও শোক গাথা লিখেছেন। মুসলিম মহিলা রবীন্দ্র-বন্দনা গেয়েছেন। মুসলিম মহিলারা সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হয়েছেন —একালের পত্র-পত্রিকার সূচিপত্র তারও প্রমাণ দিচ্ছে। অসাম্প্রদায়িক, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সাধনায় রত, মৌলবী সৈয়দ আবদুর রব 'মোয়াজ্জিন' নামকরণের মাধ্যমে আসলে বাঙলার দুস্থ দুর্গত মানুষকে মানবতার পথে, উন্নতির দিকে ডেকেছিলেন। সেজন্যেই কংগ্রেসীনেতা অধ্যাপক হুমায়ুন কবির এবং বুদ্ধির মুক্তিবাদী চিন্তক, কবি আব্দুল কাদিরও 'মোয়জ্জিন' নামে কবিতা লিখেছেন—'নতুন যুগের মিনারে দাঁড়ায়ে আজান ফুকারে মোয়াজ্জিন'।[১৪]

মোয়াজ্জিনের গল্প, উপন্যাস ও সামাজিক নকশা বিভাগও বেশ উন্নত ছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'কি চাই' (৩/১-২) ; এবং বন্দে আলী মিয়ার 'পরিশিষ্ট' ও 'নূর নেহার' উপন্যাস দুটি ধারাবাহিক এতে ছাপা হয়। অন্যান্য আরও গল্প তাঁর আছে। বেগম রোকেয়ার ; 'বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল' (৪/১) ; ইব্রাহীম খাঁর 'ভিস্তি ও বাদশা' (২/৫-৬) ; আবুল হাছানাৎ-এর 'সংস্কার' ; মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার 'রমযান মাসে' (৩/৩-১২) ; শাহজাদী (৬/১০) প্রভৃতি এ পত্রে ছাপা হয়েছিল। আরও গল্প উপন্যাস লিখেছিলেন যাঁরা তাঁরা হলেন মোহাম্মদ কাসেম (দুঃসাহস, ৬/৬) ; কাজী মোতাহার হোসেন (নবীন সংঘ,

www.pathagar.com

৩/১-২) ; রিজাউল করীম (তিন বন্ধু, ৪/৪) ; আকবরউদ্দীন আহমদ (শেষ হিসাব, ১/৪) ; খালেকদাদ চৌধুরী ও হামিদা চৌধুরী (বেদুঈনের মেয়ে, উপন্যাস, ধারাবাহিক) ; সুফী মোতাহার হোসেন, (রমযান মাসে, ১/৪) ; নিবারণ চক্রবর্তী (গৃহদাহ, ৪/৪) ; আবদুর রাজ্জাক (বড়বাবু, ১/৪) ; সুবহান আহমদ (মুক্তির সন্ধানে, ৬/৯) ; শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পথের ব্যথা, ৬/১১) ; যতীন্দ্রমোহন সিংহ, মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (কৃষাণীর বিরহ, ৭/৩) ; কুমারী পারুল সেন, মেনহাজ আহমদ, নছরু এবং খোন্দকার লোত্‌ফর রহমান।

বলেছি, মোয়াজ্জিন ছিল খাদেমুল এনছান সমিতি বা বিশ্ব মানবসেবা সংঘের মুখপত্র। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের (বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি) সময়ে মানবতার আহ্বান জানিয়ে যে সমস্ত সম্পাদকীয়, গান, কবিতা রচনা ও আবেদন নিবেদন জানানো হয়—ড. লুৎফর রহমান ও বেগম রোকেয়ার মৃত্যুতে মোয়াজ্জিন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে বা বিশেষ সম্পাদকীয় লিখে মানবতার সেবাই করেছে। ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম প্রবর্তকের জীবনের ওপর হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকের লেখা এতে ছাপা হয়েছে। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুদ খাওয়া হারাম—এই ধারণার বিপরীতে 'জীবন বীমা ও মুসলমান' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বরং বীমার প্রতি মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ উৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়াও 'মোয়াজ্জিনে'র চিন্তাশীল, মননধর্মী, সংস্কারবাদী আলোচনা সমালোচনা ও নিবন্ধসমূহের প্রতি চোখ বুলালেও এ পত্রের বিষয়বৈচিত্র্য অনুধাবন করা যায়—

আবদুল কাদের লিখেছেন মোসলেম কীর্তি (২/১১-১২) ; উজীর আল মনসুর (৩/৩-১২) ; মূরের শেষ গৌরব (৭/১২) প্রভৃতি। আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন—মানুষ মোহাম্মদ (৮/৩) ও নবী দিবসে (৯/৫)। আবদুল কাদির—'মানুষের ধর্ম' (মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ রচিত বইয়ের সমালোচনা। আফসার উদ্দীন আহমদ—নবাব সেকান্দার বেগম (৭/৩) ; আনওয়ার হোসেন—সমবায় সমিতি (১/৪) ; আবদুল মজীদ—বাংলা ভাষা ও মুসলমান (২/৯-১০) ; ইউনুছউদ্দীন আহমদ—আর্ট (৬/১২) এবং সাহিত্য ও শিল্প (৮/৫) ; ইন্দুলেখা ধর—নবীদিবস (৪/২, নবীদিবসে এলবার্ট হলে পঠিত) এবং ইব্রাহীম খাঁ—ওমর খৈয়ামের জীবনতত্ত্ব (৪/১) বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন।

আরও লিখেছেন, এম. জাফর আহমদ—বিশ্বসভ্যতা ও ইসলাম (৬/৭ ও অন্যান্য) ; এম. জেসারত আলী—নব্যতুরস্কের স্রষ্টা কামাল আতাতুর্ক (জীবনী, ১১/১) ; এম. ফরহাদ—আবরাহার মক্কা অভিযান (৭/২) ; এস. ওয়াজেদ আলি—আসামে কয়েকদিন (২/৫-৬) ; ইসলাম ও খেদমত (৩/১-২) ; চয়ন (৩/৩-৯)। এহছান আলী বি.এ. —শিক্ষা সমস্যা ও ভারতীয় ওয়াক্‌ফ (৬/৮) ; এ. জেড. নূর আহমদ—তুর্কী মহিলা প্রতিভা (২/৫-৬ ও বিভিন্ন সংখ্যায়) ; হজরত মুহম্মদ স্মরণে (৭/১) ; আরব কবি আবু তামাম আল্লামা জমখশরী (২/২) ; এম. আবদুর রহমান—ভূপালেশ্বরী সুলতানা জাহাঁ বেগম (৮/২) ; কাজী আবদুল ওদুদ—হজরত মোহাম্মদ (২/৪) ; মওলানা মোহাম্মদ আলী (৩/১-২) ; বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের ৫ম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ (৪/৪, এটি বুলবুল, সওগাত, মোহাম্মদী সকল পত্রিকায় ছাপা হয়।

এ অধিবেশনের বিবরণ প্রায় সফল প্রধান মুসলিম সাময়িকীতে পাওয়া যাবে) ; এছলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (পত্র, ৬/৩) ; কোরানের মোমেন, আল্লা ও কাফের (৬/১০) ;

www.pathagar.com

'এছলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা' প্রসঙ্গে (পত্র, ৭/৪) ; কাজী আনওয়ারুল কাদির—বাঙালি মুসলমানের সামাজিক গলদ (৩/৩-১২) ; কামালউদ্দিন—নারী জাতির প্রতি হজরত (৩/৩-১২) ; সিরাজের অদৃষ্ট (৪/২) ; কাজী মোতাহার হোসেন—কোরানের মোমেন, আল্লা ও কাফের : সমাজচিত্র (২/২) ; বিংশ শতাব্দীর ইসলাম (১১/১) ; কায়কোবাদ—অভিভাষণ (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের ৫ম অধিবেশনের মূল সভাপতির বক্তৃতাটিও ঐকালের সকল মুসলিম সম্পাদিত সাহিত্যপত্রে ছাপা হয়) ; গোলাম মকসুদ হিলালী—হালিদা আদীম হানুমের শিক্ষা-মন্ত্রীত্ব : মিথ্যা-রটনা (৪/১) ; হজরতের নৈতিক জীবন (৪/৪) ; হজরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের ন্যায়নিষ্ঠা (৮/৫) প্রভৃতি।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন লিখেছিলেন মসজিদ স্থাপত্য সম্পর্কে (৩/১-২)। মুসলমানদের বাংলা চর্চা বিষয়ে ঐতিহাসিক নিবন্ধ লিখেছিলেন সাদত আলী আখন্দ। মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ঐকালের একজন প্রধান লেখক, শিখাগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ততা তাঁর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশেষ ভাবে। তিনি মোয়াজ্জিনে লিখেছিলেন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও মুসলমানের শিক্ষা, আর ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে।

সুধীরকুমার মিত্র প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে এবং মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা বর্তমানে নারীর কর্তব্য বিষয়ে লিখেছিলেন। ইসলামে শ্রমিক-সমস্যা বিষয়ে লিখেছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী। মুসলমান সমাজ সম্পর্কে ভাবিত আর একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক মোহাম্মদ আবদুল বারী লিখেছিলেন বাঙালি মুসলমান সমাজ ও তার সংস্কার, সাহিত্য ও শিক্ষিত মুসলমান তরুণ, পল্লীর দারিদ্র্য সম্বন্ধে দুএকটি কথা, এছলাম ও আধুনিক মুসলমান এবং বাঙালী শিশুর পারিবারিক শিক্ষা সম্বন্ধে।

এছাড়াও মোয়জ্জিনের চিন্তামূলক আলোচনা, সমালোচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদির লেখক-তালিকায় নাম আছে শেখ হবিবর রহমান, ডাক্তার লুৎফর রহমান, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ (বাহার), মোহম্মদ আবদুল আলী, হাজী আফসারউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ আজহার উদ্দীন, শাহাদাৎ আলী খাঁ, নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, রইছউদ্দিন আহমদ, শাহ আবুল হাছানাৎ মোহাম্মদ ইছমাইল, বিনোদভূষণ ঘোষ, মোহাম্মদ সেরাজুল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ লোকমান আলী, সৈয়দ আবদুর রব, মিস ফজিলাতুননেছা, মাহফুজুর রহমান খান, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, দেওয়ান নাছিরউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ আবদুল খালেক, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, সতীশচন্দ্র মিত্র, সুকোমল বসু, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মোজাফফর আহমদ, রিজিয়া বেগম রশিদা, বেগম রোকেয়া প্রমুখের। এই সকল সাহিত্যিক যে-পত্রিকার সূচি দখল করেছিলেন, সেটা নেহায়েত গৌণ পত্রিকা যে ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। উল্লেখ্য, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মোয়াজ্জিন ও খাদেমুল এনছান সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন বা অধিবেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সে অভিভাষণ ও 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ (অভিভাষণ) মোয়জ্জিনে ছাপা আছে।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. মোয়াজ্জিন ১১ বর্ষ,১ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৫–এর একটি বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল এরূপ : "বিগত সুদীর্ঘ প্রায় এক যুগের সাধনায় কেন্দ্রীয় খাদেমুল এনছান সমিতি, কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে উল্টাডাঙ্গা রোড, রেলষ্টেশনের পার্শ্বে 'আদর্শ জগৎ' নামে একটা উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত উপনিবেশে সমিতির প্রধান কেন্দ্র এবং আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে।"

২. আকবর কবির, লেখক–পরিচিতি, সৈয়দ আবদুর রব প্রণীত 'নজরুল–নামা', ফরিদপুর, ১৯৮২।

৩. মোয়াজ্জিনের কথা, মোয়াজ্জিন, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ–আষাঢ় ১৩৩৫।

৪. উপরিউক্ত।

৫. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, মানুষ তৈরীর পন্থা, মোয়াজ্জিন, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৫, পৃ. ৪–১২।

৬. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, বঙ্গ–মোসলেমের দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকার, মোয়াজ্জিন, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৃ. ১৫–১৬।

৭. কায়কোবাদ, অভিভাষণ, মোয়াজ্জিন, ৫ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৯, পৃ. ৮৬।

৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাঙ্গালা ভাষা, উপরিউক্ত, ৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৯, পৃ. ১১১–১৪।

৯. মোহাম্মদ আবদুল বারী, সাহিত্য ও মুছলমান শিক্ষিত তরুণ, উপরিউক্ত, পৃ. ১১৫–১৭।

১০. সৈয়দ আবদুর রব, এছলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, উপরিউক্ত, ৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৯, পৃ. ১৭৭।

১১. উপরিউক্ত।

১২. ডাক্তার লুৎফর রহমান সংখ্যা, মোয়াজ্জিন, ৯বর্ষ, ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩।

১৩. মুসলমান (ধারাবাহিক রচনা), উদ্ধৃতি, তত্বীয় বর্ষ, বন্যাদুর্ভিক্ষ সংখ্যা, আষাঢ়–চৈত্র, ১৩৩৮, পৃ. ৯৯।

১৪. আবদুল কাদির, মোয়াজ্জিন(কবিতা), মোয়াজ্জিন, ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, কার্তিক–পৌষ, ১৩৩৫।

www.pathagar.com

১১. গুলিস্তাঁ

(কলকাতা, ১৩৩৯–৫৪)

'গুলিস্তাঁ' মুসলিম-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকাগুলোর মধ্যে নানা কারণে নাম করেছিল। এটি ছিল অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী ধারার পত্রিকা। তাছাড়া, এই পত্রিকার সঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলির (১৮৯০–১৯৫১) সম্পৃক্ততা ছিল। অনেকেই জানতেন, এটি অন্যের নামে সম্পাদনা করতেন প্রকারান্তরে এস. ওয়াজেদ আলি।

এস. ওদাজেদ আলি বিশ শতকের দ্বিতীয়–চতুর্থ দশকে মুসলমান সমাজের মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। তাঁর মতো বিলেত–ফেরত ব্যারিস্টার, সরকারি চাকুরে এবং প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ লেখক, ঐ কালে বিরল ছিলেন।

১৯২৩ সনে তিনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ সন পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ও সামাজিক মর্যাদাই তাঁকে নজরুলের মতো উচ্চস্তরের কবির সংবর্ধনার মানপত্র তৈরি, পাঠ এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করার অধিকার সংরক্ষণ করেছিল। ১৯২৯ সনে কলকাতার এলবার্ট হলে ঐ অনুষ্ঠান হয়। তাতে তৎকালীন বাঙলার প্রধান ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নজরুল–সংবর্ধনা অনুষ্ঠানই শুধু নয়, ঐকালের, বিশেষত মুসলমান সমাজের বিভিন্ন সভাসমিতিরও তিনি প্রধান অতিথি বা সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'ফেলো'–র সম্মান দেন। তাঁর প্রথম রচনা প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮–১৯৪৬) 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সনে। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যও ছিল।[১]

মনীষী আবদুল হক (১৯২১–৯৭) 'একজন বাঙালি জাতীয়তাবাদী' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন :

> বাঙালী মুসলিম সমাজে বোধ হয় এস. ওয়াজেদ আলিই সর্বপ্রথম বাঙালী জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি পরিষ্কার ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন এবং এক ধরনের অর্ধ–সার্বভৌম বাঙালী রাষ্ট্রও কামনা করেছিলেন। তাঁর আগে পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন মাশহাদী, বেগম রোকেয়া, কাজী আবদুল ওদুদ এবং আরও কোনো–কোনো লেখকের রচনাবলিতে একটা স্থির অন্তর্লীন বাঙালী জাতীয়বোধ প্রায়শ অনুচ্চারিত। ঐ অনুভব তাঁরা কখনো–বা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাঁদের জাতীয়তাবোধ কখনো স্পষ্ট রূপ এবং অভিব্যক্তি লাভ করেনি।[২]

এস. ওয়াজেদ আলির অনেকগুলো বই সমকালেই তাঁকে সুখ্যাতি দিয়েছিল। গুলদাস্তা (১৯২৭) ; মাশুকের দরবার (১৯৩০) ; দরবেশের দোওয়া (১৯৩১) ; গ্রানাডার শেষ বীর (১৯৪০) ; জীবনের শিল্প (১৯৪১) ; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৯৪৩) ; ভবিষ্যতের বাঙালী (১৯৪৩) ; সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের অবদান (১৯৪৮) ; মোটরযোগে রাঁচি সফর (১৯৩৯) ; আকবরের রাষ্ট্র–সাধনা (১৯৪৯) ; ভাঙ্গাবাঁশী, ইকবালের পয়গাম ইত্যাদি তাঁর রচনাবলির শিরোনাম।[৩]

www.pathagar.com

এস. ওয়াজেদ আলি নেপথ্যে থেকে 'গুলিস্তাঁ' পরিচালনা করতেন। সম্পাদক বা ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকেরা প্রাসঙ্গিক কাজের দ্বারা সহযোগিতা দিতেন। প্রথম দিকে গুলিস্তাঁর প্রচ্ছদে সম্পাদক হিসেবে সেকালের নামকরা সাহিত্যিক শেখ ইদরিস আলী ওয়াজেদ আলির ছোট ভাই শেখ শমসের আলি এবং ওয়াজেদ আলির জামাতা এস. আবদুর রউফ–এর নাম ছাপা হত। ম্যানেজার ছিলেন বি. সি. মুখার্জি। প্রধানত তিনিই সব করতেন।

বছর দুই পর, শেখ ইদরিস আলি সম্পর্ক ছেঁদ করে গুলিস্তাঁ থেকে চলে যান। তখন শমসের আলি ও আবদুর রউফের নাম ছাপা হতো পত্রিকায়। এঁদের সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল না, তবে প্রবণতা কিছুটা ছিল। শমসের আলি আলিগড়ের বি. এ.। এঁরা হুগলি জেলার বড় তাজপুর গ্রামের ব্যবসায়ী পরিবারের লোক। ব্যাংক ব্যবসা ছিল তাঁদের (ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার), চা বাগানও ছিল। শমসের আলি তাঁদের ব্যাংকের শিলং শাখার ম্যানেজার ছিলেন। সফল ও বিখ্যাত ইনস্যুরেন্স এজেন্ট, সমাজসেবী শমসের আলি কলিকাতার 'অনারারী জাস্টিস অব পীস'ও ছিলেন। ছবি আঁকতে ভালবাসতেন তিনি। তাঁর রচিত কিছু বইয়ের নামও জানা যায়—যেমন, Enduring Success এবং My Wife। এছাড়া পেশাভিত্তিক পত্রিকায়ও তিনি লিখেছেন। সাহিত্যিক রচনায় তাঁর আগ্রহ ও দক্ষতা যদিও তেমন ছিল না, তথাপি বেতনভুক্ত সম্পাদক ও সাহিত্যগতপ্রাণ ইদরিস আলি উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়ে কিছু কিছু লিখিয়ে নিতেন শমসের আলিকে দিয়ে।

পত্রিকায় মুদ্রিত সম্পাদকমণ্ডীর অপর সদস্য এস. আবদুর রউফ বি.এ.বি.এল. কলকাতার আলিপুর এস.ডি.ও কোর্টে ওকালতি করতেন। মাঝে মধ্যে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টেও যেতেন। তিনি ওয়াজেদ আলি সাহেবের প্রথম পক্ষের কন্যার স্বামী। তাঁর কলকাতার ২৯ নং ধর্মতলা স্ট্রীটের বাসা কাম চেম্বারের পাশেই আলাদা ঘরে গুলিস্তাঁর অফিস ছিল। পরে তাঁর বাসা ৬৮ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে যায়, পত্রিকার ঠিকানাও পরিবর্তন হয়। আবদুর রউফ হুগলি জেলার চণ্ডীতলা থানার কুমীর মোড়া গ্রামের লোক ছিলেন। কলকাতায় তিনি সপরিবারে থাকতেন না। হুগলীর বাড়ীতে স্ত্রী পরিজন থাকতেন।

আবদুর রউফও সাহিত্যচর্চা বিশেষ করতেন না। কিন্তু পত্রিকায় তাঁর নামটাও ইদরিস আলির উৎসাহে ছাপা হতো। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে তৃতীয় সংখ্যা পর্যন্ত মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন এস.এম. ইদরিস আলি। এরপর প্রকাশক হিসেবে নাম ছাপা হতো এস. এনছান আলির। গুলিস্তাঁর দাপ্তরিক ঠিকানা ছিল ৬৮ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা। এস. এনছান আলি শেখ পরিবারের সদস্য—নাম দেখেই তা বোঝা যায়। বলাবাহুল্য, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি প্রমুখ 'শেখ' এর পরিবর্তে 'এস.' ব্যবহার করতেন পাশ্চাত্য স্টাইলে। হয়ত তাঁরা মনে করতেন, 'শেখ' এর মধ্যে অনভিজাত গ্রাম্যতা প্রকাশ পায়।

মহাত্মা ওয়াজেদ আলির স্বনামে পত্রিকা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু নানা কারণে যখন স্বনামে পত্রিকা–সম্পাদনা সম্ভব হচ্ছিলো না, তখন তিনি 'বঙ্কিমদুহিতা' (১৯১৭) গ্রন্থের আলোচিত ও বিতর্কিত লেখক শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি (১৮৯৫–১৯৪৬) কে পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব দেন। ওয়াজেদ আলি সাহেবের পক্ষ থেকে ইদরিস আলিকে শ'দুয়েক টাকা দেয়া হতো বলে জানা যায়। মোহাম্মদ আকরম খাঁর 'মোহাম্মদী' সম্পাদনার জন্য আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে দেয়া হত তিন শ টাকা।[৪]

www.pathagar.com

শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি হাওড়া জেলার শিবপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর আন্তরিক টান ছিল। 'বঙ্কিম দুহিতা' নাম দিয়ে বই লেখার মধ্যে তাঁর সে পরিচয় বিধৃত। 'বঙ্কিম দুহিতা' নামের জন্য তাঁর এ–বই সরকার বাজেয়াপ্ত করে। জানা যায়, বইয়ের 'বঙ্কিম দুহিতা' নাম পরিবর্তনের জন্য শেখ ইদরিস আলিকে জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক পঁচিশ–ত্রিশ হাজার টাকাও সেধেছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হন নি। বঙ্কিম দুহিতা ছাড়াও তাঁর অন্যান্য কিছু বই রয়েছে। তাঁর বেশ কখানা বই জনপ্রিয়ও হয়েছিল। অনেকে বলেন কাগুজে বয়স–এর থেকে তাঁর বয়স বেশি ছিল। ১৯৪৬ সনে তিনি হৃদরোগে ৭০ বছর বয়সে মারা যান বলে কোনো কোনো কাগজে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য অসহযোগ–আন্দোলনের কয়েক বছর আগে থেকে ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬৪–১৯৩০) এবং শেখ ইদরিস আলি বঙ্কিম–সমালোচনার ধারা সৃষ্টি করেন। মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'রায়–নন্দিনী' ও (১৯১৮) এসময়েই লেখা হয়। এগুলো বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রতিক্রিয়ায় রচিত।[৫]

গুলিস্তাঁ বিভাগ পূর্ববর্তীকালের কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যজগতে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী ধারার পত্রিকা হিসেবে হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর পাঠকের কৌতূহল ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। মোহাম্মদী পত্রিকা যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থাবলিতে মুসলমানদেরকে নিন্দনীয়, হেয় প্রতিপন্ন করে উপস্থাপনের প্রতিবাদে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে (উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে আপত্তিকর বিষয় ও আলোচনা দ্রষ্টব্য 'মোহাম্মদী'র আলোচনা)—গুলিস্তাঁ তখন হীন, সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট বলে মোহাম্মদীকে সমালোচনা করেছিল (অবশ্য পরে তাঁরাও মোহাম্মদীর বক্তব্য সমর্থন করেন, এবং মুসলিম স্বার্থে কথা বলেন)। বিভাগ–পূর্ববর্তীকালে ১৩৫০/৫১–র উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নবপর্যায় শুরু হলে গুলিস্তাঁর প্রচ্ছদে বড় করে লেখা হত : 'হিন্দু–মুসলমানের মিলনের অগ্রদূত'। তখন এরূপ প্রচেষ্টার, সামাজিক দ্বায়বদ্ধতার অঙ্গীকারঋদ্ধ পত্রিকা ছিল বিরল।

রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও আশা–আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ পরিবর্তিত ও সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় গুলিস্তাঁর তখনকার ভূমিকাকে আমরা একালে যতোই গৌণ করে দেখতে চাই না কেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের মনন গঠনে এর তাৎপর্যপূর্ণ অবদান লক্ষ্য না–করে পারা যায় না। কল্লোলযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বাস্তববাদী, শ্রেণী সংঘর্ষের সাহিত্যসৃষ্টির সমকালে মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক, মিলনকামী সাহিত্যধারা সৃষ্টিতেও তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। দেশ বিভক্ত হওয়ার প্রাক্কালেও (পাকিস্তান হবার সময়ে) তাঁরা 'পাকিস্তানের যাথার্থ্য' বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। কামনা করেছেন হিন্দু–মুসলমানের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান। পত্রিকার সূচিপত্রও সেজন্য দেখা যায়, দখল করে আছেন হিন্দু ও মুসলমান—সকলেই।

মুসলমানের পত্রিকায় হিন্দু লেখকদের সংখ্যাধিক্যের পাশাপাশি তখনকার হিন্দু সম্পাদিত পত্র–পত্রিকায় মুসলমান লেখকদের স্বল্প উপস্থিতির তুলনা করলেও মুসলমানদের পত্রিকাগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে না পড়ে পারে না। শুধু গুলিস্তাঁ নয়, সওগাত, শিখা, জয়তী, বুলবুল, ছায়াবীথি, মৃত্তিকা, নব্য বাংলা, রূপরেখা, বর্ষবাণী, রূপায়ণ প্রভৃতি মুসলিম

www.pathagar.com

সম্পাদিত পত্রিকার বেশিরভাগই হিন্দুর প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসার পরিচয় রেখে গেছে। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে গুলিস্তাঁর প্রচেষ্টা তাই প্রশংসার দাবিদার।

বুলবুল ১৯৩৮ সনের পর বন্ধ হয়ে যায়। গুলিস্তাঁ মোটামুটিভাবে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত চালু ছিল। ১৯৪০ সনের পরও মিলন-প্রত্যাশী পত্রিকা কোথায় কোন্‌টি ছিল—তার হিসাব নিলে এই পত্রিকার সমান্তরালে আর কটি পাওয়া যাবে—সেটাই প্রশ্ন। স্মরণীয় যে, এস. ওদাজেদ আলি পাকিস্তান সৃষ্টির পরও কলকাতাতেই ছিলেন। এবং সেখানেই ১৯৫১-তে মৃত্যুবরণ করেন। ১৩৩৯-এ প্রথম প্রকাশিত হলেও ১৩৫৪ পর্যন্ত পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ প্রকাশিত হয়। অনিয়মিত ছিল গুলিস্তাঁ ।প্রাপ্ত ৬ বর্ষ ১ সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৫৩ সনে।

গুলিস্তাঁ মুসলমান সমাজের ধ্যান-ধারণাসমূহের উচ্ছেদ সাধন বা পরিবর্তন এবং অনাচার, কুসংস্কার অপসংস্কৃতি প্রভৃতির মূলোচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছে। সমাজের বহুমুখী সমালোচনার মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে প্রগতির পথ ও পন্থা। সেজন্যই বোধ করি প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে, বড় করে লেখা থাকত—'মুসলিম বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্র'। কখনও বলা হত 'প্রগতিশীল সচিত্র মাসিক মুখপত্র'।

১৩৫১ থেকে নবপর্যায়ে গুলিস্তাঁ এ. এইচ. এম. ফখরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় যখন, তখন লেখা থাকত—'হিন্দু মুসলমানের মিলনের অগ্রদূত'। এসময় পত্রিকায় আরও লেখা থাকত : 'বাংলার ভূতপূর্ব মন্ত্রী খানবাহাদুর হাশেম আলি খান কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত। মিঃ এস. ওয়াজেদ আলি বি.এ. (কেন্টাব) বার-এট-ল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত'।

'গুলিস্তাঁ' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ (১৯৩২) বঙ্গাব্দে। বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা দশ আনা, প্রতি সংখ্যা চার আনা। কবি মুহম্মদ ইকবালের ছবি দিয়ে 'সচিত্র মাসিক পত্র' যেমন লেখা হত, তেমনি বলা হত 'মুসলিম বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্র'।

সাদা কাগজে ৪৮ পৃষ্ঠায়—প্রত্যেক সংখ্যাতেই বিশেষ ব্যক্তি বা স্থাপত্য শিল্পের ছবি, গদ্য দু'কলামে, কবিতা এক কলামে ছাপা হত। লেখকের ছবিও থাকত। বিশেষ করে ওয়াজেদ আলির একাধিক লেখার সঙ্গে একাধিক ছবি একই সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। কোনও কোনও সংখ্যায় চার-পাঁচটি ছবিও গেছে। ওয়াজেদ আলির ওপরেও ধারাবাহিক রচনা ছাপা হয়েছে গুলিস্তাঁয়। নিজের পত্রিকায় এভাবে নগ্ন আত্মপ্রচার দেখে তখনকার মুসলিম সংবাদপত্রসেবীদের মধ্যে গুলিস্তাঁকে 'ওয়াজেদ-নামা'[৬] বলেও উল্লেখ করা হত।

লেখকদের ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতাও উল্লেখ করা হতো ; যেমন ওয়াজেদ আলির প্রত্যেক লেখার সঙ্গে মিঃ...বি.এ. কেন্টাব-বার এট ল' লেখা থাকত। ফলে পত্রিকাটি দেখলে সস্তাদরের মনে হয়।

কিন্তু রচনাগুলোর মধ্যে দুটো ভাব ও প্রেরণা মুখ্যত ধরা পড়েছে, তাহলো আধ্যাত্মিক, সুকুমার বৃত্তির এবং পরিচ্ছন্ন জাতীয়তাবোধ ও স্বজাতির জাগরণ আকাঙ্ক্ষা লেখক-সম্পাদকদের অন্তরে জাগ্রত আছে বা ছিল। তাঁরা যৌন বিষয়ের আলোচনায় রাখ্-ঢাক্ পছন্দ করতেন ; অনেকটা কিশোরদের ম্যাগাজিনের মতো। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যখন আলোচনা করা হয়েছে তখন গুলিস্তাঁতে খোলামেলা প্রেমদৃশ্যকে অপছন্দ ও নিন্দা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

পত্রিকার প্রচ্ছদে ছবি সজ্জিতকরণের ধারাটাও লক্ষণীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম সংখ্যায় 'প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ কবি ; স্যার শেখ মোহাম্মদ একবাল' এর ছবি দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় 'মুসলিম ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাবুক ও সাহিত্যিক মিঃ এস. ওয়াজেদ আলি বি.এ. (ক্যান্টাব) বার-এট্‌ল'র ছবি দেয়া হয়েছে। তৃতীয় সংখ্যায় 'সুখের সমাধি' শিরোনামে আগ্রার কেল্লা ও তাজমহলের ছবি ছাপানো হয়। সম্রাট শাহজাহান শেষ জীবনে যে কেল্লাতে বন্দী অবস্থায় কাটান সেই কেল্লা ও তাজমহলের ছবি দিয়ে রুবাইয়াৎ উদ্ধৃত :

> তকদীরের নির্মম বিধানে তোমায় যেদিন যেতে হয়েছে ; আনন্দের হাসিকেও সেদিন চির বিদায় নিতে হয়েছে। প্রিয়া মোর ! বিরহে তোমার কত যে জ্বালা প্রাণ সয়েছে। আমি জানি আর তিনি যাঁর আদেশে এখানে আসতে হয়েছে।

বিভিন্ন সংখ্যায় আরও যেসমস্ত ছবি ছাপা হয়েছে তা থেকে গুলিস্তাঁর সংস্কৃতি চর্চার বৈশিষ্ট্য অনুমান করা যায়, যেমন : বার্লিনের একটি দৃশ্য (১/৩) ; ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলিম প্রচারক খাজা কামাল উদ্দীনের ছবি (১/৩) ; মহাকবি ওমর খৈয়ামের ছবি (১/৪) ; হলিউডের বিখ্যাত চিত্রতারকা ডরথি মেকেইল এর সহাস্য মদির আঁখির প্রতিচিত্র (১/৪) ; হলিউডের আর এক নায়িকা ফিনিস কনস্টাম এর ছবি (ঐ) ; একজন নবদীক্ষিত বিখ্যাত মুসলিম ব্যারণ ওমর এহ্‌রিণ ফেলস এর ছবি (১/৪) ; বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'শাহনামা' প্রণেতা মহাকবি ফেরদৌসী (১/৫) ; 'মধু-মিলন'—নরনারীর রঙীন রোমান্টিক পোজের ছবি ; বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের মুখপত্র 'স্টার অব ইন্ডিয়া'র সৌজন্যে বোম্বে ক্রনিকেলের অন্যতম সম্পাদক ইংরাজ ডোয়ারের সপরিবারে ইসলাম গ্রহণের ছবি ; মহাকবি ফেরদৌসীর পৃষ্ঠপোষক, দিগ্বিজয়ী সম্রাট সোলতান মাহমুদ গজনবীর ছবি ; ক্রুসেড বিজয়ী সোলতান সালাহউদ্দীন গাজীর (১/৭) ; আফগানিস্তানের গাজী নাদির খান ও তাঁর পরিবার ; কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; নওয়াব আবদুল লতিফ ; নওয়াব আবদুর রহমান ; চিত্রনায়িকা সুশীলা ; সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর ছবি যেমন ছাপা হয়েছে তেমনি আবু নূর এর আঁকা রমণীদের প্রচুর রঙীন ছবি (ন্যুড ছবিও) ছাপা হয়েছে।

সুন্দর মানুষের, মহাকবি মহামানবের এবং মুসলিম, ইংরেজ, রাজা বাদশাহ্‌ সেনাপতির ছবি ইত্যাদি থেকে এঁদের উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয়ও আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাপালেও তাঁর চিন্তাধারার বিরূপ সমালোচনাও গুলিস্তাঁয় রয়েছে। আবার লক্ষণীয় : প্রচ্ছদে এবং ভিতরে হাদিস শরীফও উৎকলিত—প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই থাকছে এই অমর বাণী : 'যে নিজেকে চিনেছে, সে তার খোদাকেও চিনেছে।'

পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা পর্যন্ত নিয়মিত বের হলেও পরের (১/৪) সংখ্যা বের হয় তিন মাস পর। ১৩৩৯ এর ফাল্গুন, চৈত্র ও ১৩৪০ এর বৈশাখ সংখ্যা বের হয়নি। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ এ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা বের হলে তিন মাস পত্রিকা বন্ধ থাকার কারণ হিসেবে বলা হয় :

> নিজস্ব প্রেস না থাকার জন্য পত্রিকা নিয়মিত বের করা যায়নি। দ্বিতীয়ত শুধু প্রেসের গোলযোগের জন্য নয়, আমাদের অন্যতম সম্পাদক কবি শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি সাহেবের আকস্মিক কার্যত্যাগও গুলিস্তাঁ নিয়মিত প্রকাশ না হওয়ার আর একটী কারণ।.... তবে ভবিষ্যতে আর এরকম গোলযোগ যাতে না ঘটে সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সজাগ থাকবো। এবার আমরা প্রেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি... আরও সুখের বিষয়.... ইদরিস আলি সাহেব পুনরায় কার্যে যোগদান করেছেন। এবার তিনি কায়মনে গুলিস্তাঁর খেদমতে

www.pathagar.com

নিয়োজিত হয়েছেন।.... আরও বলবার কথা এই গুলিস্তাঁর ম্যানেজার এস. পি. মুখার্জিকে অপসারিত করা হয়েছে।...[৭]

গুলিস্তাঁর প্রথম সংখ্যায় 'কৈফিয়ৎ' (সম্পাদকীয়) এ বলা হয় : ..শুধু কাগজের কলেবর বৃদ্ধি, আর ছবির বাজার বসিয়ে পাঠকদের ভুলিয়ে রাখবার প্রবৃত্তি আমাদের নেই। বাইরের জাকজমক বা চাকচিক্যে পাঠকের দর্শন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করা খুব কঠিন কাজ নয় ; কিন্তু তাতে পত্রিকা প্রচারের আসল উদ্দেশ্য পাঠক সমাজের মনের খাদ্য দেওয়া যায় না। আমরা কাগজের বাইরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলেও ভিতরের সারবস্তু রচনা-সম্ভারের বৈশিষ্ট্যের দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবো। আর গুলিস্তাঁ যাতে ঘড়ির কাটার মত প্রতি মাসের ঠিক ১লা তারিখ বের হয়, তার ব্যবস্থা করতে ভুলবো না।[৮]

মুসলিম বাঙ্গলায় গুলিস্তাঁর উদ্দেশ্য ও ভূমিকা কী হবে, সে সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> যে অভাব প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালী পাঠক এতদিন ধরে অনুভব করে আসছিলেন এবার তা পূরণ হতে চললো। মুসলিম কাল্‌চারের মালঞ্চরূপে 'গুলিস্তাঁ' পাঠকসমাজের চিত্তবিনোদনের জন্য আজ বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করলো। প্রত্যেক সহৃদয় হিন্দু এবং প্রত্যেক সমাজপ্রেমিক মুসলিম এই নিয়ে আফ্‌সোস করেন যে, যে বাংলাদেশে প্রায় তিন কোটী মুসলমানের বাস, সে দেশের সাহিত্যে মুসলিম সভ্যতার আদর্শ এখন পর্যন্ত উপযুক্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। আমরা সেই অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করেছি বলেই এই গুলিস্তাঁ নিয়ে পাঠকদের দ্বারে উপস্থিত হলুম। আশা করি, নূতন এই মেহমানকে তাঁরা সাদরে এস্তেকবাল করবেন।
>
> গুলিস্তাঁ কোন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করবে না। তার সাধনার লক্ষ্য হবে, যে মুসলিম কালচার হচ্ছে বিশ্বসভ্যতার অন্যতম গৌরবের জিনিস, সেই কালচারের স্বরূপকে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রকট করে তোলা ; আর সেই কালচারকে বাঙালী মুসলিমের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তবে মুসলিম কালচারের মিশন নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও বিশ্বের বিভিন্ন কালচারের উপযুক্ত সম্মান করতে এবং সেই সব কাল্‌চার থেকে প্রেরণা, শিক্ষা ও আনন্দ আহরণ করতে গুলিস্তাঁ কখনও পরাঙ্মুখ হবে না।
>
> পক্ষান্তরে সংকীর্ণ এবং একদেশদর্শী সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে গুলিস্তাঁ পুষ্পক্ষেত্র থেকে দূরে রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে ক্রটী করবে না।
>
> গুলিস্তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে পাঠকদের মেহেরবাণী আর লেখকদের সহযোগিতার উপর। এই দুইয়ের আশা অন্তরে নিয়েই আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি। আল্লা করুন, আমাদের অন্তরের আশা এবং প্রাণের কামনা যেন ব্যর্থ না হয়। আমাদের তরফ থেকে পাঠক সমাজকে আশ্বাস দিচ্ছি, গুলিস্তাঁ যাতে তার নামের ইজ্জত রক্ষা করতে পারে এবং পাঠকদের আনন্দবিধানে সক্ষম হয়, সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে আমরা ছাড়বো না।[৯]

গুলিস্তাঁর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনাটি কাজী নজরুল ইসলামের একটি গান—'বনে মোর ফুটেছে হেনা চামেলি যুথী বেলী'। এস. ওয়াজেদ আলির 'একবালের পয়গাম' (ধারাবাহিক অনুবাদ) প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় আরও কবিতা লেখেন গোলাম মোস্তফা (ফেরদৌসীর স্বপ্ন) ; মোহাম্মদ জেয়াদুল করিম (প্রীতি) ; শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (গুলিস্তান) ; জসিমউদ্‌দীন (আমি যাব সেই দেশে/ যেথায় আসিয়া খোদার রসুল/ ফিরিল কাঙাল বেশে') ; আবদুল কাদির (সহচরী) প্রমুখ।

www.pathagar.com

বন্দে আলী মিয়া একটি গল্প লেখেন ('বদল')। এস. শমসের আলী—চা বাগান ভ্রমণ ; এবং খান সাহেব সৈয়দ এমদাদ আলী 'বাংলা মুসলিম সমাজ ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এস. ওয়াজেদ আলি 'আল-গায়েব' ছদ্মনামে কবিতা এবং প্রবন্ধ 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও মক্তব মাদ্রাসার বাঙ্গালা শিক্ষা' (মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তির বিরূপ সমালোচনা) লিখেছিলেন।

গ্রন্থ সমালোচনার বিভাগেও এস. ওয়াজেদ আলি প্রণীত 'দরবেশের দোয়া' বইয়ের আলোচনা আছে। ওয়াজেদ আলি সাহেবের বইয়ের আলোচনা, তাঁর কবিতা, গল্প, ভ্রমণ, প্রবন্ধ এবং তাঁর চিন্তাধারার ওপর অন্য লেখকের প্রবন্ধের ভারে গুলিস্তাঁ ক্লান্ত একঘেয়ে হলেও এর পৃষ্ঠা সম্পাদকীয় উদ্দেশ্য প্রতিপাদনের জন্য খুঁজলে সত্যিই মুসলিম কালচারের স্বরূপ সুপ্রকট হয়ে উঠেছে—এমন কিছু ভালো লেখা মুদ্রিত দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে এই রচনাগুলোর সংযোজন ও প্রভাব সদর্থক বিবেচিত হবে। তবে গুলিস্তাঁর সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে আজকের এবং সেকালের বিবেচনায় সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ে। যেমন সাহিত্যের মান ও আদর্শ।

গুলিস্তাঁয় 'ওমর উম্মিয়ার খেয়ালাত' নামে বিবিধ বিষয়ের আলোচনার বিভাগ ছিল। 'ওমর উম্মিয়ার খেয়ালাত' নামকরণের তাৎপর্য হলো : পুঁথি সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট চরিত্র 'ওমর উম্মিয়া' টুপী, পাদুকা, আর লাঠি দরবেশের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। টুপী মাথায় দিলে কেউ তাঁকে দেখতে পেতেন না, অদৃশ্য হয়ে যেতেন। পাদুকা পায়ে দিলে তিনি শূন্যভরে বিচরণ করতে পারতেন। লাঠি বা 'আশা' হাতে নিয়ে বিপক্ষ দলের সৈন্যদের উপর ব্রজাঘাতের ন্যায় গদার আঘাত করতেন। কিন্তু কোথা থেকে আঘাত আসছে তা কেউ বুঝতে পারত না। বিপক্ষ দল পরাজিত, বিধ্বস্ত হতো। অর্থাৎ শত্রু পরাজিত হতো। এর সঙ্গে কৌতুক রসের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল। কবি ইদরিস 'ওমর উম্মিয়া' নাম গ্রহণ করে 'খেয়ালাত' লিখতেন। 'খেয়ালাত' মানে চিন্তাধারা।[১০]

'ওমর উম্মিয়ার খেয়ালাত' এর 'সাহিত্য সম্বন্ধে দু'চার কথা'র কটি উক্তি এখানে কেবল ঐতিহাসিকতার কারণে উপস্থাপনযোগ্য, তবে আজ এগুলো খুবই পশ্চাৎপদ মনে হবে। কিন্তু এখনও সত্য, শাশ্বত বলেই গণ্য হবে—

> আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যই এই বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ হচ্ছেন শিল্পীদের রাজা—বড় শিল্পী—এই বিশ্বভ্রমাণ্ড তাঁর শিল্পকীর্তি—নিজের সৌন্দর্য অপরকে দেখাবার জন্য অন্তরের তাড়নায় তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।...সাহিত্য ও আর্টের মূল হচ্ছে এই সুন্দরের পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনাকে কোনো না কোনো উপায়ে প্রকাশ করা হচ্ছে মানুষের স্বভাব। আর তাই থেকে জন্ম লাভ করে তার সাহিত্য, তার আর্ট, তার ধর্ম, তার সবকিছু। যার অন্তরের অনুভূতি যতো সুন্দর, তার সৃষ্ট সাহিত্য এবং আর্ট তত সুন্দর। শিল্পীদের দানের আগ্রহ প্রবল—হাফেজ সাদী গালেব বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ সকলের বিষয়ে এই এক কথা।
>
> দেবার জিনিস থাকা চাই। দেবার জন্য আগ্রহ থাকা চাই। দেবার জিনিসের আবার মূল্য থাকা চাই... দানের মূল্য যত বেশী, দাতার সম্মানও তত বেশী। উঁচুদরের সাহিত্য তিনিই দিতে পারেন, প্রাণ যার নানা রসে ভরপুর ; মন যার নানা বিদ্যায়, নানা জ্ঞানে, নানা অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ; অন্তর যার মহৎভাবের তরঙ্গে হিল্লোলিত।...সাহিত্যের প্রকৃত সাধককে তাই ভালবাসতে হবে, অন্তরের সূচিতা সাধন করতে হবে।

www.pathagar.com

সে যদি মহৎকে ভালবাসতে শেখে, সাহিত্য তার মহৎ হবে, আর যদি সে তুচ্ছকে ভালবাসতে শেখে সাহিত্য তার তুচ্ছ হবে। বাল্মিকী রামকে ভালবাসতে শিখেছিলেন, তাই তিনি রামায়ণ লিখেছিলেন। অস্কার ওয়াইল্ড, গেঁ দ্য মোপাসাঁ প্রভৃতি তুচ্ছতাকে ভালবেসেছেন, তাই তুচ্ছ সাহিত্যই তাঁরা লিখেছেন। ব্যাপক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আমাদের তাই বলতে হয় যে, সাহিত্যের সাধনা প্রকৃত পক্ষে হচ্ছে ধর্মের সাধনা : যাঁর ধর্ম যত বড় (এখানে সাম্প্রদায়িক ধর্মের কথা বলছি না, ব্যক্তিগত বিশিষ্ট জীবনাদর্শের কথাই বলছি) তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য তত বড়... কবি মানুষ হিসাবে যত বড়, তাঁর রচিত কাব্য ও সাহিত্য হিসাবে তত বড়।

আমার উক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে Art for art sake একথা চলে না। আর্টের জন্য আর্ট নয়, জীবনের অভিব্যক্তির জন্য, ভাবের অভিব্যক্তির জন্য, আদর্শের অভিব্যক্তির জন্য আর্ট। বর্তমান জগতে, বিশেষ করে, আমাদের এই বাঙলাদেশে আর্টের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে যে একটা তুচ্ছতা, একটা Decadantism (হীনতা) এসে দেখা দিয়েছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে, শিল্পী লেখাকে তাঁর গৌণ উদ্দেশ্য মনে না করে, তাঁকেই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি Art for arts sake এই ভ্রান্ত আদর্শের অনুবর্তন করেন।

আর্টের জন্য জীবন সাধনা করলে আর্ট হয় না, সাহিত্যের জন্য জীবন সাধনা করলে সাহিত্য হয় না। জীবন সাধনাকে রূপ দেবার জন্য সাহিত্যের সাধনা করতে হয়, আর্টের সাধনা করতে হয়। লড়াইয়ের জন্য জীবন ধারণ করলে ভুল হয়, জীবন ধারণের জন্য লড়াই করতে হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা তাই করেছেন।... আল্লাহর নৈকট্য লাভ করলে আমরা ধন্য হব। আমরা তখন দেখতে পাব যে, তিনি চির সুন্দর, তাঁর সাধনাই হচ্ছে জীবনের একমাত্র কার্য, সাহিত্যের, তথা আমাদের সর্ব সাধনার একমাত্র লক্ষ্য, আর তাঁর প্রেমই হচ্ছে সর্বরসের, সর্ব আনন্দের অফুরন্ত উৎস।[১১]

'সাহিত্যপত্রিকা' সম্পর্কে সম্পাদকীয় বিভাগের একটি আলোচনায় বলা হয় :

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রত্যেক সম্পাদক ভারী ভারী কথা বলে সেই চিরাচরিত একঘেয়ে গল্প-উপন্যাস, কবিতা-কাহিনীতেই প্রত্যেকটির কলেবর পূর্ণ করেন।... 'আজ যে দুনিয়া জোড়া অর্থসংকট, বেকার-সমস্যা ঘনীভূত হয়ে আমাদের চোখের সামনে দেখা দিয়েছে, যদি কেউ পঞ্চাশ বছর পরে তার ইতিহাস বাংলা সাহিত্যে অনুসন্ধান করেন, তবে তিনি কি তার কোন নিদর্শন আমাদের এসব সাহিত্যের ভেতর থেকে পাবেন? আমাদের মনে হয় তার অতি ক্ষীণ আভাসও তিনি পাবেন না। তার পরিবর্তে দেখবেন কর্মব্যর্থ বিলাসী যুবক যুবতীর প্রেমের নামে ন্যাকামী, হাসি-কান্না, মিলন-বিচ্ছেদ, আর পাবেন মলয়-হাওয়া। বুলবুলির বুলি, সাকীর শারাব, হাসনাহেনার হাতছানি।... মোটকথা একটা যুবতীর দেহের আস্বাদ উপভোগের জন্য মানবজীবনের সমস্ত দায়িত্ব কর্মনাশার বুকে বিসর্জন দিয়ে আপনহারা হয়ে ঘুরে বেড়ান।'

আলোচক সম্পাদীয়তে নারীদেহবর্জিত 'মানবসম্প্রদায়ের অর্থনীতি চর্চা' এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার গবেষণায় আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্য ছাড়া পত্রিকা প্রকাশের আসল উদ্দেশ্য রক্ষা হয় না বলে মনে করেছেন। 'কামকলার সুচারু অনুশীলনে সাধারণের বিকৃত রুচির খোরাক জুগিয়ে সমাজকে জাহান্নামের পথে নামিয়ে দেয়া পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য নয়।'[১২]

www.pathagar.com

'স্ত্রী-শিক্ষা' সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রকাশিত হয়েছে এই সম্পাদকীয়তে। তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষেই। তাই আক্ষেপ করে বলেছেন : প্রতিবেশীরূপে বরাবর হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাস করেও কেন যে বাঙলার মুসলিম সমাজ নারী শিক্ষার প্রতি আজও এত উদাসীন, আমাদের নেতৃবৃন্দ কেন যে এদিকে আন্দোলন উপস্থিত করছেন না তার কারণ নির্দেশ করতে গেলে সর্বপ্রথমে আমাদের মনে হয় পর্দা প্রথার নামে যে অবরোধ প্রথা সমাজে উঁচুমাথা দাঁড়িয়ে আছে সেই অবরোধ প্রথাই স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর প্রতিবন্ধক। কিন্তু আমরা যদি আজও জাতীয় উন্নতির এই মারাত্মক অন্তরায় দূর করতে চেষ্টিত না হই যদি মাতৃজাতির শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করি, তাহলে জগতের কৃষ্টি, সভ্যতা, ভাবধারার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে আমাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেব কি উপায়ে? বাঙালী মুসলিমের জাতীয় মর্যাদা রক্ষা হবে কিরূপে?'

এস. ওয়াজেদ আলিও নারী-শিক্ষার পক্ষে 'ওমর উল্মিয়ার খেয়ালা'তে আলোচনা করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষক-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে যে ভাষণ দেন, তাতে শিক্ষা ও শিক্ষকের ভূমিকা প্রসঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : 'সমাজের চেতনা সঞ্চারের জন্য এর আলোচনা আরো ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত।'

'নারী-প্রগতি' শিরোনামের আলোচনায় আবদুল গফুর বিএ. বলেন :

> ...বহুযুগ চালু পরাধীনতার চাপ ভারতবাসীর মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। স্বাধীন ভাবধারার স্রোত তাহাদের হৃদয়ে প্রবাহের সৃষ্টি করে না। এই পরাধীনতারূপ হীনবৃত্তির প্রভাবে প্রণোদিত হইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্বল নারীজাতিকে পুরুষ তাহাদের খেলার ক্রীড়নক জ্ঞান করে। সুতরাং এই দেশের পুরুষ অনেক স্থলে নারী জাতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখে না বরং সুযোগ সুবিধা উপস্থিত হইলে পুরুষ নারীকে ভোগের লালসা নিয়া অবলোকন করে। দেশের কর্ণধার যে সকল মহাপ্রাণ আজ এতদ্দেশের নারীদের দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া অন্যান্য দেশের অনুকরণে নারী-প্রগতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন দেশের এই অপবিত্র আবহাওয়ায় নারী-প্রগতির প্রসারকল্পে সহশিক্ষা (Co-education) সম্পূর্ণ নিরাপদ কিনা?
>
> পৃথিবীময় জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। দেশে দেশে নারী প্রগতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হইতেছে। আমরাও কামনা করি ভারতের নারী জাগুক ; জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রতিভামণ্ডিত হইয়া নারী দেশের এবং জাতির সর্বপ্রকার কল্যাণসাধনে ব্রতী হৌক। কিন্তু কি প্রকারে? তাহার নিজের সত্তাকে নষ্ট করিয়া নয়, তাহার মাতৃত্বের গৌরব ধ্বংস করিয়া নয় ; তাহার নিজের নারীত্বকে রক্ষা করিয়া এবং তাহার স্বাস্থ্যকে বজায় রাখিয়া। সময়োপযোগী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া জরুরী বিষয়ের জ্ঞানলাভ তাহাকে করিতে হইবে। গৃহিনীরূপে পারিবারিক সৌষ্ঠের সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়া তাহাকে সংসার জীবনের মানুষের জন্য মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিতে হইবে এবং সুসন্তানের জননী হইয়া ধরাকে নন্দন কাননে পরিণত করিতে হইবে।
>
> আদর্শ রমণী হইবার জন্য তাহাকে পুরুষের সংশ্রবে আসিতে হইবে এবং ঘোষণা দ্বারা স্ত্রী স্বাধীনতা দিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। তাহার শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ত আছেই। সেগুলি আবশ্যক মত সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংস্কৃত করিলেই তাহার শিক্ষার পথ সুপ্রশস্ত হইবে। এবং তাহা হইতেই আদর্শ নারী তৈয়ার হইতে পারিবে—যদি সমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ আন্তরিকতার সহিত এ কার্যে অগ্রসর হন।

www.pathagar.com

ইউরোপের স্বাধীনজাতি জার্মানও আজ স্যার হিটলারের নেতৃত্বে নারীর বাহ্য স্বাধীনতা খর্ব করিয়া তাহাকে আজ পারিবারিক জীবন যাত্রার শৃঙ্খলাবিধানের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয় তাহাদের এই কার্য পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত এবং প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[১৩]

গুলিস্তাঁর দুই পর্বে লেখক ও বিষয়ের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ১৩৫১ র পূর্বে প্রকাশিত সংখ্যাগুলোতে হিন্দু মুসলমান অনেক লেখকই লিখেছেন, কিন্তু তাঁদের সকলের খ্যাতি সমান ছিল না বা স্থায়ী হয়নি। নজরুলের গান গুলিস্তাঁর প্রথম ও প্রধান রচনা হলেও নজরুলের লেখা গুলিস্তাঁতে সংখ্যায় বেশি নয়।

গুলিস্তাঁর প্রথম পর্বের নির্বাচিত লেখক তালিকা নিম্নরূপ :

কাজী নজরুল ইসলাম, এস. ওয়াজেদ আলি, গোলাম মোস্তফা, বন্দে আলী মিয়া, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, জসিমউদ্‌দীন, সৈয়দ এমদাদ আলী, আবদুল কাদির, শেখ মুহম্মদ ইদরিস আলী, সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ফজলুল হক সেলবর্সী, মাখনলাল মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসী, মিসেস আর. এস. হোসেন, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, রিয়াজউদ্দিন চৌধুরী, শাহাদাৎ হোসেন, খালেকদাদ চৌধুরী, আবদুল মজিদ, মতিয়ার রহমান খান, আলী আহমদ ওলী এছলামাবাদী, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেওয়ান একলিমুর রাজা কাব্যবিশারদ, এম. আবদুর রহমান, আবদুল বাসেত, মিস জয়নব রহিম বি.এ. বি. টি, বাণীকুমার, মোল্লা নাসিরুল হক, এম, আনোয়ারা বেগম, বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মোহাম্মদ লোকমান খান, আবদুল গফফার চৌধুরী, চণ্ডীচরণ ভঞ্জ, ডাঃ মোঃ আবুল কাসেম, এরশাদ, ননীলাল ভট্টাচার্য, আহম্মদ হোসেন, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, আমিনুল হক, ডাঃ এস. আমজেদ আলী, নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, রাসবিহারী মণ্ডল, কাদের নওয়াজ, আশরাফ আলী খান, মোহাম্মদ আহ্বাব চৌধুরী, আবু নূর, অমিয় রায়চৌধুরী, মিস সোলতানা শামসুননাহার, কাজী আবদুল মতিন, মোহাম্মদ কাসেম, সৈয়দ আসাদউদদৌলা সিরাজী, অধ্যাপক আবদুল মজিদ, শামসুন্নেহার ইউসুফ, জোয়ারদার রহিম জাহেদ, ওয়াহেদুল হক, রেজাউল করীম, এস. জহিরুল ইসলাম, মঈনুদ্দীন, পিয়ারা আখতার বানু বেগম, ফণিভূষণ সিংহ, জীতেন্দ্রনাথ সেন, হাবীব, (ইনি কবি আহসান হাবীব, তখনকার পত্রপত্রিকায় শুধু হাবিব বা হবিব নামে লিখেছেন), বযলুর রহমান বি.এ. খাদিজাতুল কোব্‌রা, মোবারক আলী, এম, ইউসুফ, শচীন্দ্রমোহন সরকার, নিবারণ চক্রবর্তী, এম. আশরাফ হোসেন, মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন চৌধুরী, শ্রী গোপালচন্দ্র বটব্যাল, এস. আবদুর রউফ, এম. আজিজুল হক, বিনয়কুমার সরকার, সুরবালা বিশ্বাস, প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল, মহবুব, মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, আবদুল আহাদ, আহমদ নওয়াজ, মিসেস নাজমা বেগম, সুফিয়া এন. হোসেন, এস. মানিক বখ্‌শ, জেবুন্নিসা বেগম, মিসেস গোলাম মহিউদ্দিন, এ.কে. এম. শামসুল হক, সুহৃদকৃষ্ণ বসু, মিসেস নাজমা বেগম, শাহ আবদুল খালেক চৌধুরী, নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আবদুল করিম খান ফারুকী, মিস নওরোজ, ডাঃ সাখাওয়াৎ উল্লাহ, মোহাম্মদ সুলতান, কুমারী প্রতিমারাণী চৌধুরী, এম. এ. আজম. মোহাম্মদ হাফিজউল্লাহ খাঁ, মিসেস রাবেয়া সাঈদ, এম. সিরাজউদ্দীন চৌধুরী সাহিত্যরত্ন, শ্রী অমরনাথ পাল, জাহেরুল ইসলাম, শেখ মজহারউদ্দিন ভূঁইয়া, শ্রী কালিদাস রায় কবিশেখর, শ্রী অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, আহমদ নওয়াজ বি.এ.বি.টি., শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, মোহাম্মদ নূরুল হক, আবুল

www.pathagar.com

আহসান, হামিদা খানম, মিসেস এ. লতিফ, খোন্দকার আবদুল হামিদ এম. এ., মোহাম্মদ নূরুল হক, আবুল আহসান, হামিদা খানম, মিসেস এ. লতিফ, খোন্দকার আবদুল হামিদ এম. এ., মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, শ্রীমতী অরুণা বসু, লুৎফুন্নেসা, এস. এম. খাদেম আলী, পান্না বেগম, ডা. আবদুল গনি, হাসিনা খাতুন, জমিলা খাতুন, কুমারী লীলা বসু, সালেমা খাতুন সিদ্দিকা, বেগম এ. ডি. কুলসুম চৌধুরী, জাহানআরা বেগম চৌধুরী, কুমারী হাবিবা শেখ, তঞ্জিনা খাতুন, সুজাতা দেবী, মোহাম্মদ মোলতাজী, গোরা হক, শ্রী বাসুদেব দত্ত, নূর মোহাম্মদ মিয়া, কাজি আকমল হক, আজিজুর রহমান, সৈয়দ আবদুল মান্নান, মতিউল ইসলাম, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুফি মোতাহার হোসেন এবং আরও লেখকের নাম এর সূচিপত্রে দেখা যায়, যাঁদের অনেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় প্রবন্ধ কবিতা বা গল্প ইত্যাদির জন্য মর্যাদার স্থান পেয়েছেন।[১৪]

১৩৪৪ এর দ্বিতীয়ার্ধে গুলিস্তাঁ তৃতীয় বর্ষ নবম সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।— ১৩৫১ র শ্রাবণ অর্থাৎ ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের পরবর্তীকালে শ্রাবণ ১৩৫১ তে—১৯৪৭ সনের মাত্র তিন বছর আগে গুলিস্তাঁ দ্বিতীয় পর্যায়ে এ. এইচ. এম. ফখরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলে এর মেজাজ এ ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।

বাঙলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তখন উত্তপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, বাঙলার গোটা পরিস্থিতিই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তখন প্রচ্ছদে 'হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অগ্রদূত', কথাটা বড় করে লিখে যখন প্রকাশিত হয় গুলিস্তাঁ, এস. ওয়াজেদ আলির এই আশীর্বাণী তখন গ্রহণ করা হয়—

> আমার চিরকালের বিশ্বাস, সাধনার মৃত্যু নাই। গুলিস্তাঁর পুনরাবির্ভাবে সে বিশ্বাস আজ দৃঢ়তর হল। অনেক আশা অন্তরে পোষণ করে আমি গুলিস্তাঁর প্রতিষ্ঠা করেছিলুম। কিছুকাল পূর্বে যখন এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়, তখন আমার যে কত দুঃখ হয়েছিল,...আজ তরুণ বন্ধুরা আমারই আদর্শ গ্রহণ করে গুলিস্তাঁর লুণ্ঠিত পতাকা তাঁদের সবল হস্তে তুলে নিয়েছেন। এই ঘটনা থেকে আমি যে কি পরিমাণ আনন্দ লাভ করেছি, ভাষায় তা ব্যক্ত করা কঠিন।... বাঙালী পাঠকসমাজের কাছে আমার সশ্রদ্ধ নিবেদন, তাঁরা যেন গুলিস্তাঁকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। আমার আশা আছে গুলিস্তাঁ তার ফুলের বিচিত্র শোভায় এবং সুরভিতে বাঙ্গালার সাহিত্য আসরকে আনন্দময় করে তুলবে।[১৫]

১৯৪৪ সনে ভারত রক্ষা আইন ও নিত্য নতুন অর্ডিন্যান্স এর জুলুম নিপীড়ন চলছে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা জগতে। যুদ্ধের পর পত্রপত্রিকায় কাগজ সাপ্লাই প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। শতকরা ৭০ ভাগ পৃষ্ঠাসংখ্যা কমিয়ে পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হতো। তবুও, আকৃতি ছোট হলেও, এসময়ের গুলিস্তাঁ বলিষ্ঠ, জাতীয়তাবাদী চিন্তায় পুষ্ট, উন্নতমানের কিছু রচনা দিয়ে ভরা হতো। মাসিক কাগজের নিয়মে শিশুদের জন্য মালি ভাইয়ের পরিচালনায় 'ফুলের মেলা' এবং 'রেখা দি'র (রেডিওর) পরিচালনায় 'নারী জগৎ' বিভাগ খোলা হয়। সিনেমার বিভিন্ন বিষয়ও জুড়ে দেয়া হল। সোভিয়েতের ছায়াছবি, সাগরপারের ছায়াছবি ইত্যাদি কত নাম দিয়ে বিষয়বস্তু চয়ন করা হত ! এতে হিন্দু ও মুসলমান কিশোর-কিশোরী, নারী-পুরুষ সকলেই গুলিস্তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আকৃষ্ট হন। গুলিস্তাঁর সাহিত্য মজলিসও প্রায়ই বসতো। নতুন কার্যলায় ১২৭ এ বহু বাজার স্ট্রীট, কলিকাতার ঠিকানায় এর সহযোগী প্রকাশনা 'সাপ্তাহিক ইনকেলাব' ও প্রকাশিত হয়। 'ইনকেলাব জিন্দাবাদ' বলেও বাংলা বিভক্তি ঠেকানো যায়নি।

www.pathagar.com

তৃতীয় বর্ষ দশম সংখ্যা (শ্রাবণ, ১৩৫১ থেকে) গুলিস্তাঁর নব পর্যায় এর লেখকদের মধ্যে ছিলেন :

এস. ওয়াজেদ আলি (নবী দিবস), ফররুখ আহমদ (পাঞ্জেরী), প্রবাসী সম্পাদক শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বেগম জেবু আহমদ, নূরউদদীন মাহমুদ, ইলা দাশগুপ্তা, ফখরুল ইসলাম খান, রায় বাহাদুর খগেন মিত্র, ভারত বর্ষ সম্পাদক শ্রী ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথা), শ্রী অনুরূপা দেবী, শ্রী হাসিরাসি দেবী, এবনে গোলাম নবী, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, শ্রী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী বিশ্বনাথ রায়, আবদুল কাদের, কমরেড আবদুল আজিজ, কাজী আবদুল ওদুদ, ডক্টর মুহম্মদ কুদরত এ খুদা, আভা দেবী, হামেদ আহমদ, নির্মল দাশ, শ্রী প্রভাবতীদেবী স্বরস্বতী, শ্রী প্রমথনাথ বিশী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ।

কাজী নজরুল ইসলামের দুর্ভাগ্যজনক অসুস্থতার জন্য এঁদের অন্তর কেঁদেছে। তাঁর আরোগ্য উপায় খুঁজেছেন তাঁরা। প্রতি সংখ্যায় নজরুলের কবিতা, গান এসময় উদ্ধৃত হয়েছে। পত্রিকাটির তখনকার আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল—কারণ গুলিস্তাঁ পাবলিশিং হাউস করে এখান থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা করার ভাবনা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের ঘটনা সব ভণ্ডুল করে দেয়। ফখরুল ইসলাম পাকিস্তানে এসে, ওয়াজেদ আলির মৃত্যুর পর—কয়েক সংখ্যা গুলিস্তাঁ বের করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো আর তখন প্রাণবন্ত হয়নি। গুলিস্তাঁ বস্তুত ১৯৪৭ সনে মৃত পত্রিকার তালিকায় চলে যায়।

'গুলিস্তাঁ' টিকে থাকতে চেয়েছিল অখণ্ড বাঙলার অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে। চতুর্থ বার্ষিক উৎসব পালন করে (কার্তিক ১৩৫১ তে) তাঁরা সম্প্রীতির গান গেয়েছিলেন। কলকাতার স্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক মি. চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সে-সভায় এস. ওয়াজেদ আলি, প্রাক্তন মন্ত্রী হাশেম আলী খান, বিনয়কুমার সরকার, আব্বাসউদ্দীন আহমদ প্রমুখ সেদিন যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, বা আবেগ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন—এক কথায় তা ছিল : 'হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য'।[১৬]

গুলিস্তাঁর গোটা ফাইলে বালিকা, গৃহবধূ, ব্যবসায়ী, হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেক লেখকের বহু রচনা ছাপা হয়েছে দেখা যায়। ১৯৩২ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এই পত্রিকার উদ্যম প্রলম্বিত হয়েছে। সকলের রচনা প্রকাশের মুক্তমঞ্চ ও ভাবচিন্তা প্রকাশের উদার অঙ্গন ছিল গুলিস্তাঁর পাতা।

রচনা নির্বাচনে সাহিত্যিক শৈল্পিক মান বজায় রাখা হয়নি সর্বত্র। তবে গ্রাহক ও পাঠক ছিল এর ব্যাপক। গ্রাহকদের রচনাও এতে প্রকাশ করা হয়েছে। তাতেই মান দুর্বল হয়েছে। লেখকদের নাম ও রচনার শিরোনাম চৌকষ, শৈল্পিক নয়—যেমন মিস্, মিসেস, ডাক্তার, বি.এ. বিটি. এম. এ. যাঁর যা ডিগ্রি ছিল সব উল্লেখ করা হয়েছে। কারো বা নাম মিসেস অমুক ইত্যাদি।

কামাল পাশা, তুর্কীস্থান, হজরত মুহম্মদ, কোরান-হাদীস, আল্লাহ্, ধর্মকর্ম, পর্দাপ্রথা, সাহিত্যের উদ্দেশ্য-আদর্শ, রোমান্টিক ভাবাবেগে কাতর কবিতা, গল্প ও নিবন্ধ-প্রবন্ধ প্রচুর

www.pathagar.com

ছাপা হয়েছে এতে। মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে। ১৯৩২–৪৭ সময়ের কলকাতা কেন্দ্রিক জাগ্রত বাঙালি সমাজের সকল প্রকার অগ্রসর চিন্তার পরিচয় যেমন এতে আছে, তেমনি অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদতার পরিচয়ও গুলিস্তাঁ দিচ্ছে।

মেয়েদের সহশিক্ষার কথা বলা হয়েছে। মোপাসাঁ, অস্কার ওয়াইল্ড প্রমুখের সাহিত্যের উচ্চমূল্য স্বীকার করা হয়নি। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত প্রমুখের এবং কল্লোল গোষ্ঠীর ও ত্রিশের দশকের প্রধান অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদের রচনা এতে ছাপা হয়নি—এরূপ অনেক কথা বলে গুলিস্তাঁর মূল্য কম করে ধরা চলে।

কিন্তু গুলিস্তাঁ এই যেসব দায়িত্ব পালন করেছে—এমন আবার অনেক পত্রিকাই করতে পারেনি। 'গুলিস্তাঁ' তাই তাঁর কালের প্রায় একশত প্রধান বাংলা সাময়িকপত্রের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে আছে তার নিজস্ব ভূমিকার কারণেই। 'সম্মিলনী' পত্রিকায় (২/৫) গুলিস্তাঁ প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল :

> খাঁটি ইসলাম কালচারের প্রাণের কথা... ইসলাম দর্শনের অবিকৃত অবিমিশ্র তথ্যগুলি যাঁহারা অধিগত করিতে চাহেন—তাঁহারা এই পত্রিকাখানি পড়িলে বড়ই উপকৃত হইবেন। আমাদের মতে ইসলামী কালচারের অন্তরের কথা না জানিলে ভারতবাসীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।[১৭]

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : সৈয়দ আকরম হোসেন প্রণীত এস. ওয়াজেদ আলি, জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৭।

২. আবদুল হক, নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ৭৭।

৩. চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫৯।

৪. পশ্চিম বাঙলার (খোসবাসপুর, মুর্শিদাবাদ) প্রবীণ সাহিত্যিক ও সংবাদপত্রসেবী জনাব আবদুর রহমান ফেরদৌসীর (১৯০৩–১৯৯৯) সাক্ষাৎকার (২২.৯.৯৩ তারিখে গৃহীত)।

৫. হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বিখ্যাত সৈয়দ আবুল হোসেন এর বঙ্কিম-সমালোচনার ৬টির মধ্যে ৫টিই ১৯২২ ও ১ খানি বই ১৯২৭ সনে প্রকাশিত হয়। তাঁর বইগুলো : বঙ্কিম-সমালোচনা : আনন্দমঠ (১৯২২) : বঙ্কিম-সমালোচনা : ইক্ষুর নাম বিষয়বৃক্ষ (১৯২২) ; বঙ্কিম-সমালোচনা : কপালকুণ্ডলা (১৯২২) ; বঙ্কিম-সমালোচনা : দুর্গেশনন্দিনী (১৯২২) ; বঙ্কিম-সমালোচনা : সীতারাম (১৯২২) ; এবং বিবাহ-বিভ্রাট বা রাজসিংহ (১৯২৭) কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দেখতে পেয়েছি। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'চরিতাভিধান' এ তাঁর এই বইগুলোর উল্লেখ নেই, প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলোতেও এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নেই। তবে তাঁর কয়েকটি বইয়ের নাম বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন, যমজ ভগিনী (১৯০৫) ; স্বর্গারোহণ (১৯০৬) ; জীবন্ত পুতুল (১৯০৭) ; নূরজাহান (১৯২৫), হাবসী বাদশা (১৯২৫) ইত্যাদি। একটি বইয়ে উল্লেখ আছে বঙ্কিম সমালোচনাগুলো ১৯২৪ সনে 'জ্ঞানভাণ্ডার' নামের একটি বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করে লেখক প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এতে অসঙ্গতি লক্ষণীয়।

শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলি সম্পর্কে নানারূপ তথ্য পাওয়া যায়। বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রকাশিত 'চরিতাভিধান' গ্রন্থে তিনি বি.এ. পর্যন্ত পড়াশোনা করেন বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কবি ইদরিস আলী কালচারাল সোসাইটির (কাঁচপাড়া, হাওড়া-৯) পক্ষে নূরুদ্দিন লস্কর, কর্তৃক প্রকাশিত 'ঈদবার্তা' পত্রিকায় এবং জনাব আবদুর রহমান

www.pathagar.com

ফেরদৌসীর সঙ্গে আলাপে জানা যায়, তিনি ম্যাট্রিক পাশও ছিলেন না। পশ্চিম বঙ্গের এস. এম. এহিয়া সম্পাদিত 'পলাশী' পত্রিকায় এঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে।

উল্লেখ্য, ইদরিস আলির স্মরণে তাঁর জন্মস্থান কাঁচপাড়া গ্রামে (হুগলী) গড়ে উঠেছে 'কবি ইদরিস লাইব্রেরী' ও 'কবি ইদরিস কালচারাল সোসাইটি' এবং হাওড়ার শিবপুর মোল্লাপাড়ায় একটি পাঠাগার। 'বঙ্কিম-দুহিতা' ছাড়াও তিনি আমার প্রিয়া, পীযূষ প্লাবণী, মর্মবাণী, মুক্তিবীণা, চন্দ্রালোকে, শেখ সংসার, দরবেশ কাহিনী, নূতন বৌ, প্রেমের পথে, আদর্শ গৃহিনী, রূপের মোহ, শিশুদের মোস্তফা, আরব আম্বিয়া, শিশুদের সিদ্দিক, ছন্দহারা প্রভৃতি বই লেখেন। মুসাফির, ইসলাম দর্শন প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। সূত্র : চরিতাভিধান (ঢাকা) ও 'ঈদবার্তা', সাপ্তাহিক, ১৭ এপ্রিল, ১৯৯১, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

৬. মুর্শিদাবাদের খোসবাসপুর নিবাসী সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, উপরিউক্ত।

৭. গুলিস্তাঁর কৈফিয়ৎ, গুলিস্তাঁ, ১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, পৃ. ১৮৮।

৮. গুলিস্তাঁর প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার কৈফিয়ত, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯।

৯. আমাদের আরজ (সম্পাদকীয়), গুলিস্তাঁ, উপরিউক্ত।

১০. সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, তারিখ ২৫.৯.৯৩।

১১. ওমর উম্মিয়ার খেয়ালতা, গুলিস্তাঁ, দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪১, পৃ. ৩৭০-৭১।

১২. গুলিস্তাঁর সম্পাদকের দফতর, দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪১, পৃ. ৪৫৬।

১৩. আবদুল গফুর বি.এ., নারী প্রগতি, গুলিস্তাঁ, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৪২, পৃ. ৯৭।

১৪. লেখকদের নামগুলো প্রথম থেকে দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৫১) পর্যন্ত পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টে একবার করে উল্লেখ করতে হয়েছে। অনেক নাম তালিকা দীর্ঘ হয় বলে বাদ দিতে হয়েছে।

১৫. এস. ওয়াজেদ আলি, প্রতিষ্ঠাতার আশীর্বাণী, গুলিস্তাঁ, তৃতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫১।

১৬. গুলিস্তাঁর চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫১-তে এই সভার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এতেই ছাপা হয় শ্রী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের গলদ কোথায়?' ; শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইতিহাসের কথা' ; ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার দুর্দশা' ; শ্রী বিশ্বনাথ রায়ের 'সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ' ; ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা' ইত্যাদি মূল্যবান রচনা।

১৭. উদ্ধৃত, গুলিস্তাঁ, দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা থেকে।

www.pathagar.com

১২ সবুজ বাঙলা

(নারায়ণগঞ্জ, ১৩৪১-৪৫)

ঢাকার নিকটবর্তী নারায়ণগঞ্জ থেকে এম. ওসমান আলীর সম্পাদনায় ১৩৪১ সনের বৈশাখে মাসিক সাহিত্যপত্র 'সবুজ বাঙলা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বছর দুই চলে। এটি শিখা-সওগাত-বুলবুল প্রভাবিত এবং কল্লোল-প্রগতি-ধূপছায়া-কালি কলম-মৃত্তিকার অনুসারি সাহিত্যপত্রিকা ছিল। এর পৃষ্ঠাগুলোতে চোখ বুলালেই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এর প্রথম রচনা 'শিখা' তথা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর পুরোধা, 'বাঙলার জাগরণ'-পন্থী মনস্বী সাহিত্যিক, কাজী আবদুল ওদুদের একটি আশীর্বাণী—শিরোনাম, 'সাহিত্যচর্চা'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জসীমউদ্‌দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, অন্নদাশংকর রায় (লীলাময় রায় নামে), দিলীপকুমার রায়, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, আবদুল কাদির, এ. এফ. রহমান, আবদুল মওদুদ প্রমুখ সবুজ বাঙলার লেখকসূচির শোভা বর্ধন করে আছেন। লেখকদের তালিকার প্রতি দৃষ্টি দিলেও এর চরিত্র সহজে অনুমান করা যায়।

আমরা জানি ১৯৩৩-৩৪ সন নাগাদ অন্নদাশংকর রায় বাঙলার সারস্বত সাহিত্য সমাজে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হন। তাঁর আই. সি. এস. এর মর্যাদাপূর্ণ চাকরি (এই সময় তাঁর পোস্টিং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছিল) এবং অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী সাহিত্যিক আদর্শ, তাঁকে মুসলমান সমাজের প্রিয়জন হতে সাহায্য করেছিল। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় তাঁর রচনা মুদ্রণের আগ্রহ বিশেষ ভাবে চোখে পড়াতেই একথা বলার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তদুপরি, 'সবুজ বাঙলা' জানিয়েছে যে, এই পত্রিকাটি অন্নদাশংকর রায়ের অনুপ্রেরণাতেই বের হয়। প্রকাশের উদ্দেশ্য, ঘোষিত আদর্শ ও প্রেরণা সম্পর্কে জানার জন্য সবুজ বাঙলার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়টি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :

> নূতন কাগজ বার করতে গেলেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়।... বাংলা সাহিত্য আজ দরিদ্র নয়। তবু সবুজ বাংলার কত সৌন্দর্য এখনো অনাবিষ্কৃত। নব্য বাংলা সাহিত্যে বাঙলার এক অঞ্চলের শোভা সম্পদই কিছু উজ্জ্বল হয়ে আমাদের চোখের সামনে ফুটেছে ; অন্যান্য অঞ্চলের শোভা সৌন্দর্য এখনো অনাবিষ্কৃতই বলতে হবে।... দেশ বলতে বিশেষ করে বোঝায় দেশের লোক। দীনবন্ধুর তুলিকায় অমর হয়ে আছে যশুরে তোরাপ ও আদরিণী। প্রতিদিন যাদের আমরা দেখি হাটে, মাঠে... সেই বলিষ্ঠদের অকুতোভয় স্থূলবুদ্ধি কিন্তু দরাজদিল 'বাঙ্গাল'কে বুঝবার ক্ষমতা নিয়ে যদি আমাদের ভিতরে আবির্ভূত হন একদল নূতন দীনবন্ধু—'সবুজ বাঙ্‌লা'-র সেই এক কুণ্ঠিত গোপন কামনা।...
>
> 'সবুজ বাঙলার' জন্মকথা জানবার কৌতূহল কারো কারো হয়ত আছে। বিগত ১৯৩৩ সনের ১৭ই ডিসেম্বর আমাদের এই নারায়ণগঞ্জ শহরে এক বিরাট সাহিত্য-সভার অধিবেশন হয়। সভার উদ্বোধন করেছিলেন সুবিখ্যাত কথাশিল্পী চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন তরুণ মনীষী অন্নদাশংকর রায় আই.সি.এস.। অধ্যাপক ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর এম.এস.সি. ডি.এস.সি. ; শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম.এ. ; প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম.এ. প্রমুখ বহু মনীষী

www.pathagar.com

সেদিন সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উৎসাহ ও স্নেহ 'সবুজ বাঙলা'র অফুরন্ত পাথেয়। তাঁদের মধ্যে মনীষী অন্নদাশংকর রায় মহাশয়ের স্নেহ ঋণ 'সবুজ বাঙলা' চিরদিন পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে। তাঁর উদ্দীপনা ও উপদেশই 'সবুজ বাঙলা'র উদ্যোক্তাদের এমন দুঃসাহসী করেছে। নারায়ণগঞ্জের সেই বিরাট সাহিত্য-সভা সেদিন 'পূর্ব বাঙলা সাহিত্য সংসদ' স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে বসেছিল। 'সবুজ বাঙলা' সেদিনকার সে পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করতে চায়.... '[১]

'সবুজ বাঙলা' আর দশটি মাসিক পত্রিকার মডেলে প্রকাশিত হলেও তরুণ সম্পাদকের অত্যন্ত খাঁটি সাহিত্যসেবা ও সমাজগঠনের মানসিকতা পত্রিকার বক্তব্যে মেজাজে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষায় নতুন সুর সংযোজন করেছিল। কারণ তখন মুসলিম জাগরণের কাল, আবার তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রয়াস দ্বারা স্বদেশ ও জাতির সাহিত্য ও কৃষ্টির উন্নতি সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রাবণ ১৩৪১ সংখ্যার সম্পাদকীয় বক্তব্যেও তার পরিচয় রয়েছে :

বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা যখন হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই তখন উভয়ের পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জানা দরকার। সেজন্য মুসলমানের সংস্কৃত চর্চা ও হিন্দুর আরবী ফারসী-চর্চা অথবা হিন্দু-সাধনার প্রতি মুসলমানের শ্রদ্ধা ও মুসলিম-সাধনার প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধা যে বাঞ্ছিত সেকথা সহজেই বোঝা যায়। আর কাজটি যে অসম্ভব বা দুঃসাধ্য তাও নয়, কেননা যে পরিশ্রমে আমরা ইউরোপীয় বিদ্যা অর্জন করি তার পরিমাণ আর একটু বাড়ালেই এটি সহজসাধ্য হতে পারে—যেমন ইউরোপের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি নানা ইউরোপীয় বিদ্যায় অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম ইতিহাস সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন।... কিন্তু আমাদের মনে হয়, এদেশের হিন্দু ও মুসলমান তাঁদের পরস্পরের অতীত-সাধনার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হউন দেশের আর্থিক ও মানসিক উন্নতির জন্য এই-ই যথেষ্ট নয়। অতীত বাস্তবিকই মানুষের নিয়ন্তা নয়... কোন জাতির অতীত গৌরব তার কোন কাজেই আসে না যদি না বর্তমানে সার্থক হবার মতো প্রেরণা তার ভেতরে জাগে। আমাদেরত মনে হয় যতদিন এদেশের লোকেরা নিজেদের বিশেষভাবে হিন্দু ও মুসলমান বলেই জানবেন ততদিন দেশ প্রকৃত সার্থকতার পথে পদচারণা করবে না।[২]

পত্রিকার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য 'সবুজ বাঙলার' বিভিন্ন সংখ্যার কতিপয় রচনার উল্লেখ প্রয়োজন। এই পত্রের বিশেষ নিবেদন ছিল কাজী আবদুল ওদুদ, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, লীলাময় রায় ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু রচনা ও উক্তি। কাজী আবদুল ওদুদ আশীর্বাণীতে লিখেছিলেন :

...সাহিত্যের চর্চার দ্বারা জাতির কল্যাণ-সাধন হয় এমন মতবাদ সন্দেহের চোক্ষে দেখাই ভাল। তার চাইতে এই বরং বেশি সত্য যে, সাহিত্যচর্চার দ্বারা শুধু সাহিত্যিকদের নিরঙ্কুশ বৈঠকী আলাপ জমতে থাকে বেশী। 'সবুজ বাঙলা'র উদ্যোক্তাদের উদ্যমে 'ঠাণ্ডাজল নিক্ষেপে'র বিন্দুমাত্র দুরভিসন্ধি আমার নেই। আমি শুধু পরম বিনয়ে এই কথাটি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, অহমিকা ও আত্মঅবিশ্বাস সাহিত্যিক জীবনের এই দুই বিষম প্রলোভন বাঁচিয়ে সত্যব্রত তাঁরা হোন। তাহলে তাঁদের সাহিত্যিক শক্তি প্রকাণ্ড কি অপ্রকাণ্ড সে সমস্যাই হয়ত উঠবে না ; তাহলে তাঁদের সাহিত্যিক-চেষ্টা মাত্রই হবে অর্থপূর্ণ—পরম সুন্দর।

সাহিত্য জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নয়। আর জ্ঞানের অপ্রতিহত গতি—মানুষের জন্য শক্তি ও কল্যাণ অর্জনের দিকে।'[৩]

www.pathagar.com

অন্যত্র কাজী আবদুল ওদুদের বিভিন্ন উক্তি মুদ্রিত হয়েছে-যেমন 'সেই জাতির লোকেরাই ভাগ্যবান যাঁরা তাঁদের প্রতিভাবানদের প্রতিভার আলোকে পথ চলতে চেষ্টা করেন, সেই আলোর স্তবগান করে বা প্রদক্ষিণ করে সময় কাটানো অমূল্য জ্ঞান করেন না।'[৪]

'সবুজ বাঙলা'র পৃষ্ঠা উল্টেপাল্টে দেখার পর মনে হয়, কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন তখনকার প্রাগ্রসর চিন্তার, অখণ্ড বাঙলার সম্প্রীতিতে আস্থাশীল মুসলিম সমাজের জাতীয়-শিক্ষক, বিবেক। ১৯৩৩-৩৪ সন নাগাদ তিনি চল্লিশোত্তীর্ণ পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পূন্ন, মুসলমান সমাজের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান মনস্বী এক সাহিত্যিক।

'কোরানের নূতন ব্যাখ্যা' নামে তিনি রচনা প্রকাশ করে মুসলমানদেরকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁদেরই পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মূল স্পিরিটের আলোকে। 'কোরানের আল্লাহ্' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রাথমিক রূপটি তিনি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা আবুল কালাম আজাদের উর্দুতে অনূদিত কোরানের সমালোচনা করতে গিয়ে খসড়া করেছিলেন মনে হয়, এবং 'সবুজ বাঙলা' পত্রিকায় প্রথমে তা ছাপা হয়। এই ছোট (দুই পৃষ্ঠার) লেখাটি পাঠ করলে মুক্তবুদ্ধির অধিকারী যে কোনও মুসলমানের মন আন্দোলিত হয়—কারণ নতুন যুক্তির আলোকে কোরানের শিক্ষা ও দর্শনের বহুব্যাপকতার সন্ধান এতে মেলে। যেমন সাধারণ মওলানা-মৌলবীরা সভা-সমিতিতে প্রচার করে থাকেন যে, মুসলমানেরাই কেবল বেহেশ্‌তে যাবেন এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর সুপারিশের দ্বারাই তারা স্বর্গের পথে অবমুক্ত হবেন। কিন্তু মওলানা আবুল কালাম আজাদের নবতর ব্যাখ্যার আলোকে কাজী আবদুল ওদুদ গুরুতর এই প্রসঙ্গে সুরা বাকারার সূত্রে বলেন, প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে এই মনে করা যে, 'বিশ্বাসী (মুসলমান), ইহুদী ও খৃষ্টান ও সাবেঈন, যে কেউ আল্লাতে ও শেষদিনে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, আর তাদের জন্য ভয় নাই। আর তারা অনুশোচনাও করবে না।'

'কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হলেই প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসী হওয়া যায় না। প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহতে বিশ্বাস ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান।... এই সত্য সমস্ত ধর্মের ভিতরেই নিহিত রয়েছে, হজরত মোহাম্মদ এসেছিলেন এই চিরন্তন সত্য সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেদের স্মরণ করিয়ে দিতে, একটি বিশেষ দলের স্থাপনের জন্যই তাঁর আগমন নয়।' 'শাফায়াত' বা সুপারিশ-তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, 'কোরানের মতে মানুষ কেবল তার নিজের কর্মের দ্বারাই মুক্তি পাবে, 'শাফায়াতে'র (সুপারিশের) দ্বারা নয়।'

কোরানের এই নূতন ব্যাখ্যা মওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং কাজী আবদুল ওদুদ যথাক্রমে উর্দু ও বাংলা ভাষায় প্রচার করেছিলেন যাতে বিবদমান ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা চিরন্তন ধর্ম ইসলামের অন্তর্নিহিত সার সত্যের আলোকে যুক্তিবাদী হয়ে জড়তা ও জড়ত্ব ও পরস্পরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষের মনোভাব থেকে হতে পারে। উপসংহারে কাজী আবদুল ওদুদ মন্তব্য করেন, আমাদের একালের আলেম সম্প্রদায় এই দৃষ্টিকোণে কোরআনের ব্যাখ্যা করেন না। 'আমাদের আলেমদের ভিতরে যাঁরা কোরআনের বিদ্যায় সুপণ্ডিত তাঁরা যদি কোরআন সম্বন্ধে এসব নূতন মতের বিচার যথাযোগ্যভাবে করেন তবে বাঙলার মুসলমানের চিত্তোৎকর্ষের বিশেষ সহায়তা তাঁরা করবেন।'[৫]

স্মরণীয় যে ১৯৩৩ সনে ঢাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে (বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে) রামমোহন মৃত্যু শতবার্ষিকী পালিত হয়। সবুজ বাঙলার সম্পাদকীয় বিভাগে মনীষী রামমোহন রায়ের মৃত্যু শতবার্ষিকীর ওপর আলোচনা লিখিত হয়। রামমোহন রায়ের ওপর

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধরাজির মধ্যে অন্যতম কাজী আবদুল ওদুদের 'রামমোহন রায়' শীর্ষক প্রবন্ধটিও সবুজ বাঙলায় ছাপা হয়। তাঁর অপর প্রবন্ধ 'ফেরদৌসী-উৎসব' ও 'বর ও কনে' শীর্ষক কবিতা সবুজ বাঙলায় ছাপা হয়। কাজী আবদুল ওদুদের গুণানুরাগী সম্পাদকের লিখিত ২ বর্ষ, ১ সংখ্যার একটি সম্পাদকীয় বক্তব্য মিলিয়ে দেখা যেতে পারে :

> সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়ে মানুষের হয়ত উপায় নাই ; ... কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিড়ম্বনা এইখানে যে যে-আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লোক সম্প্রদায়বদ্ধ হয়, পরে সাম্প্রদায়িক জীবনে সেই প্রাণভূত আদর্শেরই ঘটে অভাব। তবে সংসারে ভাগ্যবান জাতি ও সম্প্রদায়ও একান্ত বিরল নয়, আদর্শের নব নব জন্মলাভ তাদের ভিতরে হয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায় সেই ভাগ্যবান দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে কিনা তাই জিজ্ঞাস্য। এ প্রশ্ন এ-কালে মুসলমান কর্মীদের সামনে কঠিনতম প্রশ্ন। যতদূর বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয়—এক নব আশার বিদ্যুৎ ঝলকে তাদের চিত্তচমকিত হয়েছে মাত্র, কিন্তু নব-চেতনা বা নব-জীবন লাভ বলতে যে সুমহৎ সম্ভাবনা বোঝায় সে-সম্বন্ধে পর্যাপ্ত চেতনা আজো তাদের ভিতরে আসে নাই। মানুষ নানা ভাবে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে বাস করে...অহংবোধের গণ্ডী, পরিবারের গণ্ডী, সম্প্রদায়ের গণ্ডী, দেশের গণ্ডী, এবং আরো কত কি ! কিন্তু যে মানুষ জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয় সে একই সঙ্গে গণ্ডীর অধিবাসী ও বিশ্বের অধিবাসী। জীবনের এই সত্যকার দায়িত্বের বোধ নবজাগরণ অভিলাষী মুসলমানের ভিতরে পর্যাপ্ত নয় একথা মান্‌তে হবে। কিন্তু ছোট বড় হয়, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে। ভাগ্যবান জাতি, সুলভ আশা ও অক্লান্ত শ্রম মুসলমানের জন্য সত্য হোক।[৬]

অসাম্প্রদায়িক আদর্শে পরিচালিত হয়েও 'সবুজ বাঙলা' পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজ, মুসলিম সাহিত্য ও সাংবাদিকতার উন্নতি কামনা করেছে। অপর একটি সম্পাদকীয় বক্তব্যে বলা হয় :

'বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে সাহিত্য চর্চার যে অবস্থা তার চাইতে শোচনীয়তর অবস্থা সাংবাদিকতার। সাংবাদিকতা বলতে আমরা সাময়িক সাহিত্যের কথাও ভাব্‌ছি।... সংখ্যায় খুব অল্প হলেও এমন সাহিত্যিক বাঙলার মুসলমান সমাজে জন্মেছেন যাঁরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছেন ; কিন্তু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এমন শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছেন কে ?'

বাঙলার মুসলমান সমাজের সফলকাম সাংবাদিকদের প্রভাবকে জ্ঞান ও আনন্দের প্রভাব বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে সম্পাদকদের মতামত :

'আমাদের মনে হয়, তাঁদের প্রভাবকে দেশের মুসলমান নর-নারীর উপরে জ্ঞান ও আনন্দের প্রভাব বলা যায় না। সর্বসাধারণ মুসলমানের যে বুদ্ধি বিবেচনা ও সংস্কার সে সব জ্ঞান ও সৌন্দর্যের কষ্টি পাথরে যাচাই করে তাঁরা মুসলমান জনসাধারণের প্রতি বন্ধুত্বের পরিচয় দেন নাই, তাঁরা জনসাধারণের বন্ধু হয়েছেন তাদের মন জুগিয়ে। অবশ্য মন জোগানো যে খারাপ কাজ তা নয় ; কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে কখনো কখনো এমন সময় আসে যখন বন্ধুর কর্তব্য হয় তার মন জোগানো নয় তার চাইতে কঠিনতর কিছু।[৭]

উপরিউক্ত উক্তিগুলো কাজী আবদুল ওদুদের নামে চালানো যায়। তাই বলেছিলাম, সম্পাদক ছিলেন কাজী ওদুদের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। অবশ্য অল্পশক্তিমান লেখক এম. ওসমান আলীর ওপর কাজী সাহেবের প্রভাব ভালো ফলই দিয়েছে। একটি স্মরণীয়

www.pathagar.com

সাহিত্যপত্রের সৃষ্টি তাঁর দ্বারা তাতে সম্ভবপর হয়েছিল। এসময় কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন ঢাকায়, তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সম্পাদক তাঁর কাছে গিয়ে সম্পাদকীয়-বক্তব্য লিখে আনতেন। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রও (?) হতে পারেন তখন এ-পত্রের সম্পাদক।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনও (১৯০৪-৮৭) ১৯৩১ সন পর্যন্ত স্কুল সাব-ইন্সপেক্টরের পদে কাজ করার পর ১৯৩২ সনে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ইংরেজির শিক্ষকের পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন এবং ১৯৩৪-৩৫ সন পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন।[৮]

'সবুজ বাঙলা'য় মুদ্রিত মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'তরুণের জ্ঞান সাধনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি কলেজের Study circle এর inauqural meeting এ পড়া হয়। এতে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে বলেছিলেন কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ কথা।

বলাবাহুল্য, তরুণ অধ্যাপকের এই রচনাটির লিখনশৈলীও ভাল, তাঁর অন্যান্য রচনার মতো সাদামাটা হলেও প্রাণের উষ্ণস্পর্শ ও স্বকীয় অনুভূতিতে কথাগুলো সিক্ত। তিনি বলেন, পাঠচক্রটি Stady Circle বড় সময়োপযোগী হয়েছে। কারণ জ্ঞান চর্চার এ একটি সুন্দর পন্থা, আমাদের আজ বড় প্রয়োজন নিজেদেরকে কৃচ্ছ্জ্ঞান সাধনায় একান্তভাবে নিয়োগ করা।...

'... পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির উন্নতির মূলে রয়েছে জ্ঞান সাধনা।... এই পাঠচক্রের প্রসার যত বৃদ্ধি পাবে আমাদের জ্ঞানের চর্চা ততোধিক রূপে সহজ, সার্থক এবং সুন্দর হবে। বর্তমান জগতে জ্ঞানেরই প্রভুত্ব।... বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায় হতে অজ্ঞানতা বেশী, সুতরাং এই অজ্ঞানতার অন্ধকার যাতে বিদূরিত হয় তার চেষ্টা আমাদের করতে হবেই। অজ্ঞানতার জন্য আমাদের মধ্যে inferiority complex বর্তমান রয়েছে। আমাদের মধ্যে থেকে সেই মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করতে হলে এই ধরনের পাঠক গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা যে কত বলে শেষ করা যায় না।

জ্ঞানচর্চার রাজপথ হচ্ছে সাহিত্য এবং বিজ্ঞান।...জ্ঞানচর্চা বিজ্ঞান প্রধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞান সহজ বুদ্ধির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, বিজ্ঞান অযৌক্তিক এবং অসম্ভব পন্থা গ্রহণ বা সেমতে কার্য করে না। বিজ্ঞানের মর্মবাণী আমাদের গ্রহণ করা কর্তব্য।...বিজ্ঞানচর্চায় আমরা ভারতবাসী বড়ই পশ্চাৎপদ, আমরা যদি অগ্রগামী হই তবে আমরাই লাভবান এবং উপকৃত হব।...আমাদের এই জাতীয় দুর্বলতা (inferiority Complex) দূর করতে হলে আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। আত্মবিশ্বাসের প্রধান উপায় নিজের শক্তি সম্বন্ধে সঠিক মূল্য নিরূপণ, আমাদের বর্তমান অধপতিত অবস্থায় আমরা নিজেদের বিশ্বাস করতে পারছি না।

মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তিনি ঐ আলোচনায় বলেন :

> এই inferiority Complex এর আর একটি কারণ আছে। আমাদের মধ্যে কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী জন্মগ্রহণ করেননি। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, রাজেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক প্রতিভাশালী ব্যক্তি মুসলমান সমাজে কবে জন্মাবেন কে জানে? হিন্দু সমাজের শিশু, কিশোর এবং তরুণদল এই সকল মহীরুহের শীতল, জীবন-প্রদায়িনী ছায়াতলে এক পরমানন্দে জীবন-যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করতে ব্যাপৃত, তাদের আত্মোৎকর্ষের এবং আত্ম-বিশ্বাসের ফসল উৎপাদনের যে উপযুক্ত উর্বর ক্ষেত্র বর্তমান রয়েছে তা সত্যই অপূর্ব। তরুণ বাঙালী যে বলদৃপ্ত তার মূলে রয়েছে

www.pathagar.com

এই রহস্য। এই অমূল্য, অপর্যাপ্ত এবং অবারিত–ভাণ্ডার লুট করে বাঙালী তরুণ হিন্দু সচেষ্ট, কার্যতৎপর এবং সাধনা নিমগ্ন।

এ ভাণ্ডার থেকে যে মুসলমান তরুণ বাঙালী কিছু নিচ্ছে না তা নয়। এই মনীষীদের অপূর্ব সাধনার ধন সমগ্র জগতের মানব জাতির সম্পত্তি, কিন্তু যে সম্প্রদায় থেকে এর লাভ হল তার বুক কি দশহাত উঁচু হয়ে উঠেনি? এবং আত্ম–বিশ্বাস কি সেই সম্প্রদায়ের তরুণদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে দর্বার প্রাণের বেগ সৃষ্টি করে না? যে শিশু নিরোগ এবং সবল গাভীর উৎকৃষ্ট টাট্‌কা দুধ পায়, সেকি স্বতঃই বার্লীজিলপায়ী শিশু হতে স্বাস্থ্যবান এবং বলশালী হবে না?

এখানেই মুসলমান তরুণদের পরাজয়? এখানেই তাদের আত্মবিশ্বাসহীনতার মূলীভূত কারণ লুক্কায়িত রয়েছে। এজন্যই inferiority complex রূপ জুজু তাদের বুদ্ধিমত্তার স্কন্ধে চেপে রয়েছে। এখানেই মুসলমানদের আশা ঘন মসীলিপ্ত। কোন নব–বার্তাবহের জন্ম দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান অন্ধকার বিদূরিত হতে পারে। মুসলমান সমাজ সেই লগনের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমুখের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, তাঁদের তিরোধানে বাঙালীর মহাক্ষতি হবে। সুতরাং তাঁরা বেঁচে থাকতে মুসলমান তরুণেরা যেন মহৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজেদেরকে সঞ্জীবিত করে নেন। 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানদের জাতীয় কোন উজ্জ্বল ছবি নেই, যার দ্বারা আমাদের মধ্যে প্রাণের বেগ সৃষ্টি হতে পারে। কোন হিন্দু সাহিত্যিক বহুলপাঠ্য উপন্যাসে মুসলমান চরিত্র জাতীয় উদ্দীপনাময় করে তোলেননি।... 'গোরা'র মত একটী মুসলমান চরিত্র সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে নেই। সুতরাং আমাদের মনে একটা দ্বিধা ও সঙ্কোচ জাগা অসম্ভব নয়। আর তাছাড়া সমস্ত বাংলা সাহিত্যের রীতি (Style) হিন্দুয়ানী বাংলা, বাঙালীর বাংলা ত নয়ই, মুসলমানী বাংলা ত দূরের কথা।

সুতরাং অতি সহজে অজ্ঞানতাকে দূর করতে হলে শক্তিশালী তরুণ মুসলমানদের একযোগে এই সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র ন্যায় উজ্জ্বল উদ্দীপনাময় এবং প্রাণময় ভাবাবেগ ও ধারণা সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রতীচ্য দেশীয় নব জ্ঞান বিজ্ঞানের কাণ্ডজ্ঞানবোধ্য রহস্যগুলি বহুল প্রচার করতে হবে।'

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন অবশ্য সতর্ক করে দেন, পাঠচক্রে একভাবে সম্মিলিত হয়ে এসব বিষয়ের গভীর আলোচনা করতে হবে। জাতীয় উন্নতিই আমাদের লক্ষ্য ও কাম্য। 'আমাদের জ্ঞান সাধনায় যেন কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ না আসে। আমরা বাঙালী, বাঙলার কল্যাণই প্রার্থনীয়। আমরা যেন হিন্দুদের ন্যায় ভাষার ও জ্ঞানের দুয়ারে অন্য জাতিকে প্রবেশ করতে নিষেধ না করি। কি আমাদের পাঠচক্রে, কি আমাদের মাদ্রাসায় যেমন ড. শহীদুল্লাহ্‌র ব্যাপারে হাস্যকর ঘটনা ঘটেছিল।'[৯]

পাঠচক্রের ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেছিলেন, 'জ্ঞানান্বেষীদের মধ্যে কোন প্রকার জাতিভেদ বা সম্প্রদায় ভেদ থাকা নিতান্তই গর্হিত। সামাজিক ভেদ এবং সাম্প্রদায়িক ভেদের জন্যই আমাদের জ্ঞানান্বেষীদের মধ্যে হৃদয়ের গভীর অমিল দেখ্‌তে পাওয়া যায়।' হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলমান সমাজেও বর্তমান অপ্রার্থনীয় মোজাহাবী বিভেদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পাঠচক্রের উদার ও প্রশস্ত মিলনভূমিতে হৃদয়ের সেই ক্ষুদ্রতাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে

www.pathagar.com

বিসর্জন করতে পারব' বলে আশা করি। আর আাদের জ্ঞান যেন আমাদের হৃদয়ের প্রেমের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেয়।[১০]

৪

অন্নদাশংকর রায়ের 'মাদ্রাসী বাংলা' নামের একটি রচনা 'সবুজ বাঙলা'য় ছাপা হয়। বিভিন্ন রচনায় এটা স্পষ্ট হয় যে, মুসলমান ও হিন্দুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সেকালে কীরকম লেখকদেরকে ভাবিত ও বিচলিত করেছিল। তখনকার প্রায় সকল পত্রপত্রিকায়ই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-দ্বন্দ্বের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অন্নদাশংকর রায় 'মাদ্রাসী বাঙলায়' বলেন :

> মুসলমানরা আমাদের নাম রেখেছেন হিন্দু। সে নাম আমরা সগৌরবে বহন করে আসছি, কোনো আপত্তি করিনি। আমাদের বংশপদবী খাঁ, শাহ (সাহা), ফৌজদার, মজুমদার... এ নিয়ে আমরা লজ্জিত নই... কত বলব আদি অন্ত মুসলমানী।... বস্তুত মুসলমানী ঘরে না এনে যত রকমে মুসলমান হতে হয় তা আমরা হয়েছি। রক্তে মুসলমান নই বলে কোনো কোনো মুসলমানের চেয়ে কম মুসলমান নই আমরা।... দেড়শ বছর মুসলমান রাজত্ব গেছে। ইচ্ছা করলে আমাদের সমাজ ও সাহিত্য থেকে মুসলমান প্রভাব নির্মূল করতে পারতুম। সে প্রবৃত্তি আমাদের হয়নি। কারণ মুসলমান রাজারা পর ছিলেন না। তাঁরাই আমাদের রামায়ণ অনুবাদ করিয়েছেন। শিল্পকার্যে তাদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম।... বাঙালী মুসলমানরা আপনাদের মধ্যে এমন কতকগুলি আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করে থাকেন যা আমরা করিনে। বেশীর ভাগ তাঁদের ধর্ম বিশ্বাস সংক্রান্ত। আবার তাঁরা এমন কতকগুলো শব্দও ব্যবহার করেন যা সংস্কৃত থেকে নেওয়া অথচ তাদের মধ্যে অপ্রচলিত। যেমন পানি।
>
> সরবতে আমাদের অরুচি নেই কিন্তু পানি অর্থাৎ পানীয়জল আমাদের গোসলের কাজে পর্যন্ত লাগে না। বুঝি যে এতে আমরা যৌক্তিকতার পরিচয় দিইনে। তবু রুচি বলে একটা অযৌক্তিক পদার্থ আছে। অরুচির বদল হলে একদিন চোখের পানিতে ভাস্ব, সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটব। এর জন্য আমাদের মুসলমান ভাইদের ভাবতে হবে না। তাঁরা বর্মা থেকে লুঙ্গি আমদানী করে আরবী বলে চালাচ্ছেন, তাও পরছি। দিল্লী থেকে বিল্লী এনেছেন, তাও পুষছি। বোখারা থেকে বক্‌রী আনিয়েছেন তাও খাচ্ছি। অতএব পঞ্চনদ থেকে পানি আনলে তা দিয়ে বাঙলার জলকষ্ট দূর করব না কেন?
>
> মুসকিল বেঁধেছে মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক থেকে শেখা মুসলমানী শব্দ নিয়ে। আমরা বলছি যত মুসলমানী শব্দ নিয়েছি তাই কিছু কম নয়। আমরা যত মুসলমানী কথা বলি তত বাংলার চাষী মুসলমানরাও বলেন না, বোঝেন না। তাঁদেরই ছেলেরা মাদ্রাসায় গিয়ে যখন মৌলবী হয়ে ফেরেন তখন শুধু যে পিতৃপিতামহের মণ্ডল বিশ্বাস প্রামাণিক ইত্যাদি পদবী পাল্টে আহমদ মহম্মদ উদ্দীন ও ইসলাম করেন তাই নয় রাতারাতি দেশভাষাকে আরবী ফারসী করে তোলেন। তাতেও আমাদের আপত্তি নেই। আমরা যখন তাঁদের সঙ্গে কথা বলি তখন তাঁরা দয়া করে আমাদেরই মত বাক্যালাপ করেন। আমাদের গায়ে লাগে যখন তাঁরা বাংলা সাহিত্য নাম দিয়ে মূল্যবান আরবী কেতাব লেখেন।

দীর্ঘ ব্যাঙ্গাত্মক রচনায় রবীন্দ্রনাথের বরাতে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ বরং বলতে পারতেন, 'হে মুসলমান, তোমার পিতৃকুল যাই হোক, তোমার মাতৃকুল হিন্দু। তোমার

www.pathagar.com

মাতৃভাষা বাঙালী হিন্দুর ভাষা। তোমার মাতামহীর ভাষা সংস্কৃত। যে কারণে তোমার বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা শাড়ী পরেন সেই কারণে তোমাকেও সংস্কৃত পড়তে হবে। উপরন্তু আরবী ফারসী ইংরাজী পড়তে পারো, কিন্তু গোড়াতে পড়তে হবে ইতিহাসে যে ভাষাকে বাংলা বলা হয়েছে সেই ভাষা ও তার বিবর্তন হয়েছে যার থেকে সেই সংস্কৃত ভাষা।

স্বদেশের ট্রাডিশনকে অগ্রাহ্য করে বিদেশের কালচারকে আবাহন করা হচ্ছে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া। আরব পারস্য তোমার প্রপিতামহের স্বদেশ হলেও তোমার স্বদেশ নয়, যেমন আমেরিকানের স্বদেশ নয় ইংলন্ড। স্বদেশের বনিয়াদের উপর যদি তাকে স্থাপন করতে পারো তবেই তুমি স্বদেশের তথা স্বসম্প্রদায়ের বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করতে পারবে। নতুবা পরিচয় দিতে থাকবে তোমার বিজিত মনোবৃত্তির। তোমার 'ন ঘরকা না ঘাটকা' নীতির।'[১১]

অবশ্য সম্পাদকীয় বক্তব্যে লীলাময় রায়ের উপরিউক্ত রচনা পর্যালোচনায় মন্তব্য করা হয় যে, সংস্কৃত চর্চা করবার পরামর্শ দেওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত লীলাময় রায় মহাশয়কে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংস্কৃত একটি সুন্দর ভাষা, তার সঙ্গে পরিচিত হলে বাংলার মুসলমান লাভবানই হবেন। সেই সঙ্গে রায় মহাশয় যদি বাঙলার হিন্দুকে নূতন করে ফারসী চর্চা করবার জন্য পরামর্শ দেন তবে বেশ একটি ভাল কাজ করবেন বলেই মনে হয়। সংস্কৃতের রথ-ঘর্ঘর আর ফারসীর বিদ্যুৎ চমক এই দুয়ের সমবায়ে বাঙালীর মানস জগৎ বাস্তবিকই সমৃদ্ধ হবে।'[১২]

সবুজ বাঙলায় কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাও প্রায় প্রতি সংখ্যায় ছাপাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সব লেখা যে সবুজ বাঙলার জন্য নতুন করে লেখা হয়েছিল তা নয়, রবীন্দ্র-নজরুলের অনেক বহুল উদ্ধৃত রচনা বক্তৃতা বা কবিতা সবুজ বাঙলায় ছাপা হয়েছে, যেমন ঢাকার বাসন্তী কটন মিলের উদবোধন উৎসবে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ 'ধন ও জাতীয় শ্রী' এবং 'আশুতোষ-স্মৃতি' শীর্ষক কবিতাসহ বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণ এতে ছাপা হয়েছে।[১৩]

সবুজ বাঙলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পত্রের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এটি কবি আজিজুল হাকিমকে ১০/১০/১৯২৯ তারিখে লেখা। কবি আজিজুল হাকিম নারায়ণগঞ্জের অধিবাসী এবং তিনি সবুজ বাঙলার প্রথম দিককার সংখ্যাগুলোর মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন। মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের কাছে লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র' ঢাকার বাংলা একাডেমী ও কলকাতার 'দেশ'-এর সাহিত্যসংখ্যাসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে আজিজুল হাকিমের কাছে লেখা পত্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়নি। তিনি লিখেছিলেন :

কল্যাণীয়েষু,

...আমাদের দেশে আমরা কেবলি কথা বল্‌চি এবং কথা শুন্‌চি এবং কতকগুলি বাঁধা কথার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে পড়চি। বড়ো কথা মাত্রই অত্যন্ত পুরানো, কাজের মধ্য দিয়েই জীবনে তাদের নূতন করে আবিষ্কার করি। যতক্ষণ না করি ততক্ষণ সেকথাগুলো বস্তার ভিতরকার বীজের মতো, যে বীজ উপযুক্ত মাটির মধ্যেই সক্রিয় হয়ে সার্থক হয়, অন্যত্র কেবল মাত্র বোঝা হয়ে থাকে। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯২৯।

—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

www.pathagar.com

কাজী নজরুলের... 'বাদলা কালো স্নিগ্ধা আমার/কান্তা এলো রিমঝিমিয়ে' ; কাঁদিছে তিমির কুন্তলা সাঁঝ/আমার হৃদয় গগনে' ; 'আজ নিশিথে অভিসার তোমার পথে প্রিয়তম' ; 'মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন' ; 'দাও শৌর্য দাও ধৈর্য, হে উদারনাথ/দাও দাও প্রাণ' ; 'ওকে মুঠি মুঠি আবীর কাননে ছড়ায়' প্রভৃতি গান কবিতা সবুজ বাঙলার সাহিত্য-সম্পদ ছিল। এতে নজরুল আরও লিখেছিলেন রুবাইয়াৎ। উল্লিখিত প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে সবুজ বাঙলার লেখক-তালিকায় আছেন :

> প্রতিভা সোম রাণু, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, সতীশচন্দ্র খাস্তগীর, এ. জেড. নূর আহাম্মদ, আনওয়ার হোসেন, পাপিয়া বসু, শচীন সেনরায়, সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, পরিমল কুমার ঘোষ, চঞ্চল দাস, নীলিমাময়ী সেন, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন সেন, জ্যোতির্ময় দে, পুলিনবিহারী গুণ, জগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার, অসিতরঞ্জন ঘোষ, মনীশ আচার্য, সুকুমার মজুমদার, মোহাম্মদ ইসমাইল, সুকুমার হালদার, রিয়াজউদ্দীন চৌধুরী, ইব্রাহীম খাঁ, আশরাফ আলী খান, রবিদাস সাহা রায়, মাহফুজার রহমান খান, মোহাম্মদ মোলতাজী, হবিবর রহমান, আবদুস সালাম, আবদুল কাইয়ুম, আবুল হাছানাৎ, আবদুল কাদের খান, নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী, জিয়াউদ্দীন আহমদ, সিরাজউদ্দিন চৌধুরী সাহিত্যরত্ন, আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন, আয়শা সিদ্দিকা, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রফুল্ল দে, মঈনুদ্দীন, আমিনুল ইসলাম, কুমারী জয়নাব রহিম, বি.এ., বি.টি. ফিদা আলী খান, ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো,সালেমা খাতুন, মোহাম্মদ হানিফ, শ্রীশচন্দ্র সাহা, মোহাম্মদ ফজলুস সালাম, রাইহানা তায়েবজী, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, শিবরাম চক্রবর্তী, খালেকদাদ চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রফুল্লকুমার গুহ, নজিবর রহমান, খন্দকার আবুল কাসেম, মহিউদ্দীন প্রমুখ হিন্দু ও মুসলমান, নারী ও পুরুষ, লেখক ও লেখিকা।

লক্ষণীয় হিন্দু ও মুসলমান প্রায় সমান তালে সবুজ বাঙলায় লিখেছিলেন। লেখকদের এক বড় অংশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডক্টর, পণ্ডিতজন। গল্প, উপন্যাস, গান, কবিতা, আলোচনা প্রভৃতিতে সবুজ বাংলা একটি প্রথম সারির পত্রিকাই ছিল, কিন্তু দু'বছরের বেশী প্রকাশের তথ্য পাওয় যায়নি। এই পত্রিকার সম্পাদক এম. ওসমান আলী বা কবি আজিজুল হাকিম পরবর্তী সময় পর্যন্ত পত্রিকাটিকে স্মরণীয়, বিখ্যাত করে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন বলে সৎ-প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানের সামাজিক স্বার্থ ও স্বকীয় জাগরণের কথা বলেছেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাতে.ফুটে ওঠেনি। মুসলমানদের মধ্য থেকে অন্ধ কুসংস্কার, শাস্ত্রানুগত্য দূর করতে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন।

সবুজ বাঙলার সঙ্গে প্রথমে কবি আজিজুল হাকিমের (১৯০৮-৬২) ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনিই ছিলেন এর মুদ্রক ও প্রকাশক। তাঁর ঠিকানাই ছিল পত্রিকার ঠিকানা—২৪ মহিম গাঙ্গুলি রোড, টানবাজার, নারায়ণগঞ্জ। ছাপা হতো 'নারায়ণগঞ্জ প্রিন্টিং ওয়ার্কস' থেকে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬২, সাদা কাগজ, বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা। প্রতি সংখ্যা চার আনা। চার সংখ্যার পর থেকে (১/৫ থেকে) সম্পাদক এম. ওসমান আলী কর্তৃক সবুজ বাঙলা একই প্রেস ও ঠিকানা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ওসমান আলী গল্প উপন্যাস লিখতেন, অধুনা বিস্মৃত। কবি আজিজুল হাকিমের নাম মুসলমানদের কাছে এখনও মোটামুটি পরিচিত।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. সম্পাদকীয়, সবুজ বাঙলা, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪১।

২. উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪১।

৩. কাজী আবদুল ওদুদ, আশীর্বাণী ('সাহিত্যচর্চা' নামে), উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪১।

৪. কাজী আবদুল ওদুদের উদ্ধৃত উক্তিটি ছাপা আছে সবুজ বাঙলার ১ বর্ষ, ৬–৭ যুগ্ম সংখ্যায়, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৪১, পৃ. ৩২৩।

৫. কাজী আবদুল ওদুদের 'কোরআনের নূতন ব্যাখ্যা' নামের এই প্রবন্ধটি তাঁর 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থে সংকলিত 'কোরআনের আল্লাহ' শীর্ষক সুলিখিত প্রবন্ধের থেকে পৃথক, মনে হয় এতদসংক্রান্ত রচনার এটি প্রাথমিক খসড়া।

৬. সম্পাদকীয়, সবুজ বাঙলা, ২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪২।

৭. সম্পাদকীয়, উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ৬–৭ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৪১।

৮. মোমেন চৌধুরী, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (জীবনী-গ্রন্থমালা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ১৮।

৯. প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাসায় এখনও পর্যন্ত কোনও হিন্দু-ছাত্র ভর্তি হয়নি। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাকে হিন্দু পরিচালিত কলেজে ভর্তির ব্যাপারে আপত্তি তাই অযৌক্তিক মনে হয় না। এখনও মাদ্রাসায় কোনও হিন্দু-ছাত্র ভর্তি হতে গেলে সহজে, বিনা-আপত্তিতে ভর্তি হতে পারবে বলে মনে হয় না।

১০. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, 'তরুণের জ্ঞানসাধনা', সবুজ বাঙলা, ১ম বর্ষ, ৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪১, পৃ. ২০৪–২০৬।

১১. লীলাময় রায়, মাদ্রাসী বাংলা, সবুজ বাঙলা, ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪১, পৃ. ১১৫–১১৭।

১২. সম্পাদকীয়, সবুজ বাঙলা, ১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪১, পৃ. ১১৪।

১৩. প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী, শনিবারের চিঠি, দেশ, বুলবুল, সওগাত প্রভৃতি ঐকালের প্রধান নিয়মিত ত্রৈমাসিক ও মাসিকগুলোতে বিভিন্ন সাহিত্য-সম্মিলনের প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও আলোচনা পুনঃপুন প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা সংকলিত বা উদ্ধৃত করে 'সবুজ বাঙলা' গৌরবান্বিত বোধ এবং কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চেয়েছে।

www.pathagar.com

১৩. মৃত্তিকা

(কলকাতা, ১৩৪৮–৫৪)

মুসলমান তরুণদের মধ্যে যাঁরা কল্লোলের মতো অত্যাধুনিক পত্রিকা প্রকাশের দুর্দমনীয় বাসনায় বাংলা সাহিত্যপত্র প্রকাশের পথে অগ্রসর হন, তাঁদের মধ্যে কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ (১৯২১–৭৫) অন্যতম। তিনি 'ধূপছায়া' পত্রিকার সম্পাদক রেণুভূষণ গাঙ্গুলির (১৯০৩–৪৩) বিশেষ ঘনিষ্ঠ জন এবং কল্লোল–কালিকলম–প্রগতি–অগ্রগতি–চতুরঙ্গ পত্রিকার কর্ণধার–উদ্যোক্তা–লেখকগোষ্ঠীর অত্যাধুনিক সাহিত্যাদর্শ, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন।

কাজী আফসারউদ্দিন গল্প উপন্যাস লিখেছেন প্রচুর এবং পত্রপত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে সাংবাদিকতা জগতে পাকিস্তান (১৯৪৭–৭১) আমলে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ আমলে তিনি রাজনৈতিক কারণে পেছনের সারিতে পড়ে যান। স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছর পরেই মৃত্যু হওয়ায়, স্বাধীন বাংলাদেশে আফসারউদ্দীন খুব বেশী গুরুত্ব পাচ্ছেন না। যদিও সেকালের বিবেচনায় কথাসাহিত্য সৃষ্টি ও সমাজ–সচেতন সাংবাদিকতার জন্য তাঁর বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকার কথা ছিল। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০টি।

১৯৩৮ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এরপরে ১৩৫০ এর মন্বন্তর ঘনিয়ে আসে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রভাবিত, মার্কসবাদীদের কার্যক্রমও ভারতবর্ষ তথা বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ–সঞ্জীবনী শক্তি জোগাচ্ছে ; হিন্দু মুসলমানের যৌথ ও স্বতন্ত্রধারায় পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তুঙ্গ অবস্থা জনচিত্তকে অস্থির, সক্রিয় করে তুলেছে ; বাংলা সাহিত্যের লক্ষ্যও তখন আধুনিক পর্যায়কে সফলভাবে সম্পন্ন করে নতুন যুগের উদ্বোধন ঘোষণা করা।

কিন্তু মুসলিম–সাময়িকপত্রে চলছে তখনও বঙ্গদর্শনের যুগের মতো জাতীয়তাবাদী সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা। এমত অবস্থায় কলকাতা থেকে তরুণ কাজী আফসারউদ্দীনের সম্পাদনায় দ্বি–মাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'মৃত্তিকা' প্রকাশিত হয়। এঁদের সার্বিক প্রয়াসে স্পষ্ট হয়ে আছে অত্যাধুনিক বাংলা সাহিত্যের সৃজন–কর্মীদের সহযাত্রী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

মৃত্তিকা ছ'বছর চলেছিল। ১৭ বি তারকদত্ত রোড, বালিগঞ্জ–এ "মৃত্তিকা সাহিত্যসদন" ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখান থেকেই বের হত 'মৃত্তিকা'। পত্রিকায় মুদ্রিত হতো একথা যে, 'নূতন মনন ও সংস্কৃতিমূলক সাহিত্যপত্রিকা'। 'ক্লাসিক প্রেস, ২১ পাটুয়াটোলা লেন, কলকাতা থেকে অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। স্বত্বাধিকারী : কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ।' পরে সম্পাদক হিসেবে দুজনের নাম ছাপা হয়, কাজী আফসারউদ্দীন ও এস. এম. বজলুল হক। প্রতি সংখ্যার মূল্য বারো আনা। বার্ষিক চার টাকা আট আনা। প্রথম বর্ষে শীত–হেমন্ত, ছয় ঋতুতে ছয়টি বের হয়। পরে নিয়ম হয় আষাঢ়–শ্রাবণ থেকে বর্ষ আরম্ভ হয়ে বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠে বর্ষ শেষ হবে। এ থেকে পত্রিকার অনিয়ম–অব্যবস্থা বোঝা যায়। পরের দিকে 'মননশীল সাহিত্যপত্রিকা' বা 'প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা' বলে উল্লেখ করা হতো।

www.pathagar.com

১৯৪১ থেকে ৪৭ পর্যন্ত ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতিতে দীর্ঘ ছয় বছর মৃত্তিকা প্রকাশিত হওয়ায় এবং মেধাবী তরুণ ও প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের কেন্দ্র হওয়ায় 'মৃত্তিকা' এই সময়ের সাহিত্যিক-শৈল্পিক দর্পণ হয়ে রয়েছে। কিন্তু এর সবকটি সংখ্যা পাওয়া যায়নি।

প্রতিটি সাময়িকপত্রেই নূতন করে বিশেষ কোনো পত্রিকা প্রকাশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার রেওয়াজ আছে। এবং তাতে ফল ভালই হয়। কারণ তা করতে গিয়ে সম্পাদকেরা চতুষ্পার্শে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকেন :

> ... নিজেদের কৈফিয়ৎ জানাইবার জন্য নূতন পত্রিকার সম্পাদক-পরিচালক গোষ্ঠী নাকি বাধ্য। অতঃপর আমরা তাহারই চেষ্টায় ব্রতী হইলাম।
>
> গোটা চারেক মাসিক, চার পাঁচ খানা সাপ্তাহিক, খান তিনেক দৈনিক পত্রিকা এবং তিন-চারখানা ঈদ-স্পেশাল লইয়া একটা বিরাট সমাজ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না বলিয়া আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে। যে-চিন্তাধারাকে সমর্থন করিয়া এবং যে-ভাবভংগী লইয়া উক্ত পত্রিকাগুলি প্রেসে ছাপা হইয়া সাধারণ্যে প্রকাশ পায়, তাহাতে প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির কিছু একটা হইতেছে কিনা, সে-সম্বন্ধে অনেকেরই মনে বিষম খটকা বাঁধিয়াছে বলিলে বাহুল্য দোষে দোষী সাব্যস্ত হইব না। মনে করি যে, সে-স্রোতাবেগের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ট পরিচয় জন্মিয়াছে।
>
> অবশ্য সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকার অভাব আমাদের মধ্যে নাই, এবং তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন বলিয়া মনে হয়।
>
> কিন্তু এ-কথা কি করিয়া ভুলিতে বসিব যে, আজ পর্যন্ত তাঁহারা একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকও সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। লেখকের স্বাধীন চিন্তা সংস্কৃতি এবং বৈদগ্ধ অনুভূতিতে যে লেখার জন্ম হয়—তাহা প্রকাশ করিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারে—এমন কোনো পত্রিকা আমাদের আছে কি? কর্তৃপক্ষের মুখ চাহিয়া যাঁহাদের লিখিতে হয় এবং যাঁহারা শুধুমাত্র খেয়ালের বশেই লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা যে কষ্মিণকালেই প্রথম শ্রেণীর তো দূরের কথা, ভালো সাহিত্যিক পর্যন্ত হইতে পারেন না তাহা স্বতঃসিদ্ধ।[১]

মৃত্তিকার মতে 'কিছুদিন পূর্বেও অনর্গল লিখিতে পারেন এমন একজন সাহিত্যিকও আমাদের মধ্যে' (মুসলমানদের মধ্যে) বিরল ছিল। কিন্তু বর্তমানে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ এসেছে, কারণ ওয়াকিবহালদের মতে 'ইদানীং আমাদের মধ্যে প্রায় অর্ধ ডজন তরুণ সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা ভাবে ভাষায় মননে অনুভূতির ঐশ্বর্যে বাস্তবিকই মহার্ঘ। ইঁহাদের রচনা প্রচুরভাবে প্রকাশিত হইতে পারে,—এমন কোনো পত্রিকার জন্ম এখনো আমাদের মধ্যে হয় নাই। যে-সব পত্রিকা সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রথমত তাঁহারা নিজেদের কৌলীন্যের ভঙ্গুর অভিমান ভুলিতে পারিতেছেন না। হেতু রহিয়াছে প্রচুর, বিশ্লেষণের প্রয়োজন রহিয়াছে অনেক, কিন্তু মনে করি তাহা ধীরে ধীরে প্রকাশ করিলে চলিবে।'

পত্রিকার বিশ্বাস, 'আমাদের জনসাধারণের অশিক্ষার, বিশেষ করিয়া,—কুশিক্ষার জন্যই এই ধরনের নাটকীয় নাটকের অভিনয় দিনের পর দিন এবং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া হইয়া যাইতেছে। সমস্ত দেশব্যাপী জ্ঞানের সুবিপুল আগ্রহ জাগাইতে হইলে যে-কঠোর সহিষ্ণুতা, নিবিড় একাগ্রতা এবং অশেষ কর্মতৎপরতা অত্যাবশ্যক, তাহা হইতে আমরা যে অনেক কাল হইতেই নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত তাহা ভুলিলে চলিবে কেন?'

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে উপরিউক্ত আলোচনার সূত্রেই—'যে-নূতন বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির উপর ভিত্তি করিয়া পৃথিবীশুদ্ধ সমাজ ব্যক্তি সর্বাগ্রণী', তাকে আমরা আমাদের 'মহাগত কৌলীন্যের পঙ্গু অহমিকার জন্য আজিও অবজ্ঞা দেখাইয়া আসিতেছি'। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির প্রতি অনাগ্রহ এবং 'প্রজ্ঞাহীন সৎবুদ্ধি আমাদের তাই নিষ্ঠুর ব্যর্থতায় পর্যবসিত' করেছে।

'শিল্প ও সাহিত্য' সম্পর্কে মৃত্তিকার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে এই উক্তিতে :

> শিল্প ও সাহিত্য হইতেছে মানুষের Rational স্বপ্ন ; আত্ম নিবিষ্ট মনের সঙ্গে যে মিতালী,—যে পৃথিবীকে আমরা নিয়তই ব্যাকুল ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করিতেছি,—মনের সাহায্যে নিবিড় উপলব্ধি করিতেছি,—সেই রূপের-রসের-শব্দের-স্পর্শের-মাটির পৃথিবী প্রাণহীন বস্তুপিণ্ড মাত্র নয়, সে প্রাণবান, নিয়তই পরিবর্তনশীল প্রত্যেক মুহূর্তেই তাহার নূতন রূপান্তর হইতেছে, নূতন জন্ম, নূতন জীবন আর নূতন মৃত্যু ঘটিতেছে। ইহাদের লইয়াইত আমাদের সাহিত্য রচনা আর আমাদের শিল্পপ্রয়াস। মন আমাদের আপনা হইতেই একাগ্র হইয়া উঠে—আবেষ্টনের আবহাওয়ায় আর অবসরের শিথিলতায় তৈয়ারি হয় প্রাত্যহিক জীবন-জগত আর চিত্তের ভাবোপযোগী সাহিত্য, যাহা মৃত্তিকার স্নেহ-শীতল গতর হইতেই পরিশ্রুত।[২]

পত্রিকা-প্রসঙ্গের এক আলোচনায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে মৃত্তিকার সাহিত্য-দৃষ্টি পরিস্ফুট হয়েছে :

আমরা মনে করি, সাহিত্যের যে সুবিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় মাঠ রয়েছে, তাতে সাহিত্যের বীজ বপন করতে হলে সর্বপ্রথম যার সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে প্রচুরভাবে, তা হচ্ছে সাময়িক পত্রিকা, এবং পরে পুস্তিকা প্রকাশ। সাম্প্রতিক কালে মুসলমান সাহিত্যিকদের সংখ্যা ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে ; তাঁদের বিস্ফোরণোন্মুখ চঞ্চলতা আজকে অনেকের চোখেই সাড়া জাগিয়েছে সন্দেহ নেই। যুগের অন্তে যুগের আবির্ভাবে মানুষের চিন্তাধারা যে পাল্টে, জাতির জীবনের—সংস্কৃতির সর্বতোমুখী সাধনার পথে অসাধারণ বীর্যবত্তার সঙ্গে কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে উন্নীত হয়ে দাঁড়ায়, স্বভাবতই দাঁড়ায়,—সে-কথা প্রতিষ্ঠিত সত্য হলেও মুসলমান সমাজ আজো পর্যন্ত তা অস্বীকার করতে অভ্যস্ত। আজকের সময়টা বিশেষ করেই বিজ্ঞানের যুগ : বিজ্ঞানের দুর্বার গতি মানুষের জীবনে, জাতির সর্বকোণে অতি দ্রুত আসন অধিকার করে নিয়েছে। বস্তুজগতের শক্তিমত্তা ও অমোঘ রহস্য উদ্‌ঘাটনে আজকের মানুষের সাধনা অন্য সমস্ত সাধনাকে ছাড়িয়ে চলেছে। মানুষ তাঁর নিখাঁদ চিন্তাধারায় জগতের সমস্ত উত্থান-পতন, মানবিক-জৈবিক সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যের মূলে তাঁর তীব্র-তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে কতোনা উত্তেজনা অনুভব করছে। এসব মনের রহস্য, বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য, প্রকৃতিতে অফুরন্ত ঐশ্বর্য, সাহিত্যের স্ফুটনোন্মুখতা, মানবিক-সংস্কারের দুর্বোধ্যতা সকলের পেছনে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের মগজ দিনের পর দিন উদগ্র আগ্রহে জাতির—সমাজের—সভ্যতার সোপান দৃঢ় ও উন্নীত করছে নিরন্তর। আর, সে-মুহূর্তে মুসলমান সাহিত্যিকদের চলবার রাস্তা পর্যন্ত বর্বর অত্যাচারে কন্টকময় : এখনো বৈদগ্ধী সমাজ বলতে পারেন : কিন্তু মুসলমান সমাজের ও সাহিত্যের বাধা অপেক্ষাকৃত বেশি।'[৩]

মুসলমান সমাজের প্রতি মৃত্তিকার আহ্বান : 'মানুষের সমষ্টিগত সমাজে, জাতির সংস্কৃতি এবং সভ্যতার উন্নতির প্রয়োজনে, সাহিত্যের তথা সাহিত্যিকের সাহচর্য কতো যে

www.pathagar.com

প্রচণ্ড ফলপ্রসূ সে কথা এখনো কী মুসলমান সমাজ প্রকৃত রসবেত্তার মতো সাহিত্য তথা সাহিত্যিকদের গ্রহণ করতে এগিয়ে এসে প্রমাণিত করবে না?'

বর্তমান এর প্রতি তাকিয়ে মৃত্তিকা উচ্চারণ করেছে : 'আজ পৃথিবীর সভ্য-জাতি মরণ-উৎসবে মেতে উঠেছে ; মরণ যজ্ঞের আগুন ভারতবর্ষের সীমায় এসে পৌঁছেছে। প্লেটো তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন, পাছে তাঁদের কাব্য রাষ্ট্রের জনগণের মনে মোহ ও দুর্বলতা আসে। যুদ্ধমান সকল জাতিই প্রচার করেছেন যে সভ্যতার রক্ষার জন্যই তাঁদের অস্ত্রধারণ, কারণ তাঁদের 'শত্রুপক্ষ মানুষের সভ্যতার শত্রু। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের সভ্যতার সৃষ্টি ও রক্ষা হয় নাই—সে যুদ্ধক্ষেত্র যতই দূর প্রসারী হোক, তাতে বীরত্ব ও কৌশলের যতই পরিচয় থাকুক। মনস্বী অতুলচন্দ্র গুপ্তের উক্তি ধার করে তাঁরা বলেন, মানুষের সভ্যতার সৃষ্টি ও রক্ষা হয়েছে কবির কাব্যে, দার্শনিকের চিন্তায়, ধর্মনেতার উপলব্ধিতে, বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাশালায়। প্রচণ্ডতাকেই জীবনের চরম বিকাশ বলে স্বীকার করবো না। আকস্মিককে চিরন্তনের পূজা দিয়ে তার পায়ে মাথা নোয়াবো না।[৪]

মানবতাবিধ্বংসী যুদ্ধের বিপক্ষে মৃত্তিকা উপর্যুপরি মতামত ব্যক্ত করেছে। কবি-সাহিত্যিকদের জন্য সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী রাষ্ট্রেরও কল্পনা করেছে মৃত্তিকা।

'বেয়নেট ও লেখনী' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় আলোচনায় বলা হয় : যুদ্ধের বোবা দুর্বোধ্য পরিস্থিতিতে অতীষ্ঠ 'সাধারণ মানুষ এই আবহাওয়ার আওতা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন.... আমাদের মতো সাহিত্যিক নয়তো শিল্পী যাঁরা, তাঁদের ভেতরের-বাইরের সকল রকমের কম্পন প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে যাবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলেই আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ ভাবতে বসে আজকের দিনে অগ্রে-পশ্চাতে কোথাও কোনো মাধুরী-যুক্ত দেউলের সন্ধান পাচ্ছিনে।... সকলেই আমরা বুঝতে পারছি,... এই বর্বর, দ্রুতগতিসম্পন্ন যুদ্ধে যে, শিশু কি স্ত্রীলোক-পণ্ডিত, কি সাহিত্যিক কারুর পক্ষেই নিশ্চিন্তভাবে বেঁচে থাকবার কোনো রকমের ইংগিত নেই, ...বাঁচবো কি মারা পড়বো, নিজের-নিজের সৃষ্টির আনন্দের মধ্যে পর্যাপ্ত সময়ক্ষেপ করবার প্রচুর নিরঙ্কুশ অবসর পাবো কি পাবো না, এ-উপলব্ধিতে আজ প্রলয়ংকরী ধাঁধাঁর জ্বালাময় ঘূর্ণি অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছে : যার দুলুনী আমাদের দৈনিক পদক্ষেপের সীমানা পর্যন্ত সংক্ষেপ এবং কাঁটা বেড়ায় ঘিরে রাখার প্রলোভনে তীক্ষ্ণ প্রলোভিত করছে।... ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সমস্যা, উত্থান-পতন উল্লাস-বৈচিত্র্য থেকে যাতে করে শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিকেরা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও নিষ্কম্প্র থাকতে পারেন,—তাদের মূল্যবান সময়-অবসর যাতে তাঁদের নিজেদের কাজেই, তাঁদের নিজেদের স্বকীয়তার লালিত্যে ও ছন্দে ব্যয়িত হতে পারে, সেজন্যে বর্তমানে প্রধানত লাঞ্চনা-অপমান প্রকাশ্যে করেও দ্রুত এবং তীব্র উত্তেজনায় টেকসই শ্রেণীহীন সমিতি গড়ে তুলবার দরুন আমাদের প্রচণ্ড বেগে প্রোপাগাণ্ডা করতে হবে।

এই শ্রেণীহীন সমিতিতে এবং সভ্যদের ভেতর থাকবে না কোনো স্তরেরই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, কোনো রহস্যময় ঘূর্ণিই আমাদের কার্যপন্থায় উত্তেজনায় বার্ধক্যের ছোঁয়াচ কিংবা কৌটিল্যের কূটবুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে বসিয়ে দিতে যাতে না পারে, সে দিকে আমাদের প্রত্যেকের অভিন্ন সতর্ক দৃষ্টি নিরন্তর উন্মদিষ্ণুতার তালে সজাগ থাকবে।'

সম্পাদকের মন্তব্য, 'এর চাইতে আনন্দের ব্যাপার কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকের পক্ষে আর কী হতে পারে, সাহিত্যিক শিল্পীরা তাঁদের চিরাচরিত জীবনযাত্রা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক

www.pathagar.com

না হয়েও তাঁদের প্রকৃত এবং প্রকৃষ্ট কার্যেই অর্থাৎ, লেখার–আঁকার–চিন্তার গভীরতায় সমস্ত চিত্তটাই আবিষ্ট রাখতে নির্মেঘ অবসর পাবেন?'

সম্পাদক সতর্ক যে, কবি–শিল্পী সাহিত্যিক–দার্শনিকের পক্ষে রাজনীতি ব্যাপারটাই বিরক্তিকর, কিন্তু আজ বাঁচতে হলে 'নিজেদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যাবলীর অস্তিত্বের নিশেন উড্ডীয়মান রেখে যেতে হলে আমাদের সম্পূর্ণ নিঃশ্বাস ফেলেই বাঁচতে হবে, এবং নিঃসংশয়ে বাঁচতে হবে।'

আজকে অনেক শিল্পী–সাহিত্যিকই হয়ত রাজনৈতিক–উর্মির ঘূর্ণিপাক থেকে দূরে সরে থাকতে পারলে বেশ একটু খুশিই হতেন, কিন্তু তাঁদের স্বতন্ত্র এবং রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদ সংকুল চিন্তা–সাম্রাজ্য ছড়িয়ে রেখে, সহজ করে,—পেশাদার রাজনৈতিকদের প্রতি শিল্পী–সাহিত্যিক–দার্শনিকের অবিশ্বাস–তাচ্ছিল্য–অবজ্ঞা–ঘৃণা নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাইলে যে অতি সত্বরই দুর্ঘটনার মতো বেয়নেটের পরিসমাপ্তি হতে পারে নয় শুধু, হবেই–যে, তাতে এতটুকু ভাববার কিছু নেই। ফলে বাধ্য হয়ে জগতের সব থেকে সরল ও নমনীয় প্রাণী, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিদর্শন সাহিত্যিক–দার্শনিকেরা দেশে আসতে বাধ্য হয়েছেন আজ রাজনৈতিক সমর–বেয়নেটের আস্ফালনের মধ্যে। সাহিত্যিকেরা আজ একথা উঁচু গলায় স্পষ্ট করে স্বীকার করেন যে, যাতে বিশ্বের সভ্যতা–কৃষ্টি–সংস্কৃতি রক্ষা পায় পরিপূর্ণভাবে পূর্ণাঙ্গ সফলতার সংগে, তাই তাঁরা করবেন। আর আজ তাঁরা তাই সংস্কৃতি রক্ষার ও মানুষের কল্যাণের দরুন মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এ–যুদ্ধে যদি তাঁরা মারাও পড়েন তাহলেও সত্যিকারের শুভ–সূচক আবহাওয়ার সংকেতের নাচুনি দেখে তৃপ্তি পাওয়া যাবে।'

সাহিত্যিকেরা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে–ঘূর্ণিতে যোগ দিয়েছেন, কারণ আত্মরক্ষার স্বতন্ত্র কোনো পথ নেই। সকলেই চান—'যুদ্ধ যাতে এখনো শেষ হয়'। 'কিন্তু কী পরিস্থিতিতে জগত এসে পড়লে যুদ্ধ আর চলবে না, তাঁর চক্রের ঘূর্ণি থেকে যাবে?'.... 'সাম্রাজ্যলোলুপ রাষ্ট্র–নায়কদের এক–এক টুকরো মাটি ছেড়ে দিলে তারা একেবারেই চুপ মেরে যাবে, এমন ধারণা করাও বিরাট মূর্খতা।'[৫]

যুদ্ধের রক্তাক্ত বহ্নিশিখা লেলিহান হয়ে জ্বলছে, পৃথিবী জুড়ে অমানুষিক কালো ছায়া পুঞ্জীভূত হয়ে দৃঢ় এবং ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে যখন, তখন মৃত্তিকা বের হয় এবং সেই পরিস্থিতিতেই বছর পূর্ণ হয়। বর্ষশেষ সংখ্যায় সম্পাদক বলেন,

> ...এ মুহূর্তে কোনো মানুষই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন না। নিজের অজানিতেই তাঁরা নেমে পড়েছেন তাঁদের বাঞ্ছিত মত নিয়ে। তবু যাঁরা এখনো দ্বিধা করছেন, তাঁরা জানেন, বিশ্বাস করেন : শৃঙ্খলের সঙ্গে মুক্তির, আঁধারের সঙ্গে আলোর সংগ্রামের মূল উৎসের মুখে যে–সামগ্রী উঠবে, তাতে থাকবে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির ইংগিত, থাকবে অমৃত। মনুষ্য–সমাজ স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্ন দেখছে নিজের দেশের—জাতির উন্নতির, ভাবছে—হয় সর্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক অঞ্জলি দিয়ে দাসত্বকে বরণ করে নিতে হবে চিরদিনের জন্যে, নয়তো সর্বজনীন স্বাধীনতাকে গ্রহণ করতে হবে।... দেশের সভ্যতার, সমাজবিন্যাসের, শিল্প প্রয়োজনের সম্প্রসারণের ভেতর দিয়েই দেশের সত্যিকারের রূপারূপ প্রকাশিত হবে। মানুষের জন্যে মানুষ তখন অবশ্য মরবে, মরতে পারবে মানুষের মতো। সে মৃত্যুতে মহাশ্মশানের ভিত্তি তৈরি হবে না, সে প্রয়াণে অগ্নিশুদ্ধ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হবে মানব কল্যাণের প্রার্থিত দেবতা। আর হবে, সভ্যতার সংস্কৃতির সার্বভৌম আলাপনে সার্বজাতিক আত্মার জাজ্বল্য–

www.pathagar.com

প্রকাশ।... বিশ্বাস করি, সভ্যতার সত্যিকারের সর্বজনীনতা সাধন সম্ভব জাতির-সমাজের-ধনের সকল বৈষম্যের নির্মোক উৎপাদিত হলে।[৬]

মৃত্তিকায় বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখকদের অনেকেই লিখেছেন। পত্রিকার সবকটি সংখ্যা পাওয়া যায়নি। বলতে গেলে এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আছে, তাও খণ্ডিত, তাতেই দেখা যায়, মৃত্তিকায় লিখেছিলেন : অরূপ আহমদ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, আজিজুর রহমান, কাজি আফসারউদ্দিন আহমদ, আবদুল কাদির, আবু রুশদ, আবুল কাসেম, আহসান হাবীব, এস. এম. বাজলুল হক, কল্পনা গাঙ্গুলি, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, কামাল চৌধুরী, জুলফিকার হায়দার, দ্বিজেন গাঙ্গুলি, নওশের আলী খান, নাজমা বেগম, ফররুখ আহমদ, বেগম খায়রুণ আহমদ, বেগম আখতার জামিল, বেগম জেবু আহমদ, মবিনউদ্‌দীন আহমদ, নূরউদ্দীন মাহমুদ, প্রমথনাথ বিশী, প্রশান্ত দত্ত, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, ফজলুর রহমান, ফতেহ লোহানী, রেণুভূষণ গাঙ্গুলি, শামসুদ্দীন হায়দার, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, সৈয়দ আলী আহসান, হাবীবুর রহমান, হীরালাল দাশগুপ্ত, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির, হোসেনে আরা বেগম, জ্যোতি সেন, ফজলুল জলিল, হামিদ আহমদ, প্রীতিসুধা সিংহ, সৈয়দ তারেক রুমি, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মতিউল ইসলাম, আবুল ফজল, প্রবোধচন্দ্র সেন, জগন্নাথ বিশ্বাস, বিজয় দাশগুপ্ত, ব্রজেন বোস, শাহেদ আলী, মাহমুদা বেগম, মহীউদ্দিন প্রমুখ।

মৃত্তিকার প্রতিটি রচনাই পঠনযোগ্য। বাঙালি মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের আধুনিক অংশ,—যাঁরা পাকিস্তান আমলে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের তরুণ বয়সের লেখা ধারণ করে আছে এ পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। শরৎচন্দ্র ও স্যার আমীর আলীর ওপর আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। আবার ত্রিশের দশকের আধুনিক সাহিত্যের আলোচনাও আছে। আছে কাজী আবদুল ওদুদের বৈদগ্ধ পূর্ণ রচনা 'শিক্ষা-সংকট' এবং কবিগুরু গ্যেটের অনুবাদ। অদ্বৈত মল্লবর্মণের কবিতা 'বিদেশী নায়িকা' এতে ছাপা হয়। কাজী আফসারউদ্দীনের গল্প, উপন্যাস, আলোচনা প্রভৃতি ছাপা হয়েছে। 'দুই নগরীর উপাখ্যান' নামের উপন্যাস চার সংখ্যায় ধারাবাহিক ছাপা হয়, এটা বস্তুতান্ত্রিক (কল্লোলোত্তর) আদর্শের চরিত্রচিত্রণ ও মনোবিশ্লেষণ, কিন্তু এই নামের উপন্যাস তার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নয় মনে হয়। মবিনউদ্দীন আহমদের অনেক ভালো গল্প এতে ছাপা হয়। গল্পের ভাগ এতে বৃহৎ এবং এগুলো কথাসাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

হুমায়ুন কবিরের 'ছাত্র মনের নূতন বিপ্লব' নামের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল প্রথম বর্ষে। এটি লেখকের মূল ইংরেজি প্রবন্ধ থেকে ধূপছায়া-সম্পাদক রেণুভূষণ গাঙ্গুলি অনুবাদ করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ওপর সদর্থক রচনাও আছে, বেগম আখতার জমিল সমাজতন্ত্রের দৈনন্দিন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। মহিলাদের হাতে এমন বিদগ্ধ আলোচনা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

দেশী-বিদেশী সাহিত্যের, তথা পুস্তক-সমালোচনার ভাগও উন্নতমানের। হীরালাল দাশগুপ্ত প্রমুখ 'অগ্রগতি' ও সেকালের প্রগতিশীল পত্রিকার লেখকদের কাছ থেকে রচনা সংগ্রহ করে, এতে ছাপানোতে পত্রিকায় বৈচিত্র্য ও নতুন স্বাদ এসেছে। কাজী নজরুল ইসলাম ও কাজী আবদুল ওদুদ সেকালের মুসলিম সম্পাদিত সকল সাময়িকীতে উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

অনেক হিন্দু লেখকের রচনাও এইসব সাময়িকীতে দেখা যায়। কিন্তু হীরালাল দাশগুপ্তের ন্যায় সৌখিন অত্যাধুনিক কবির রচনা মৃত্তিকাতেই প্রথম চোখে পড়ল।

ফররুখ আহ্‌মদ (১৯১৮–৭৪), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২–৭১) আহসান হাবীব (১৯১৭–৮৫) সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২–২০০২) কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ (১৯২১–৭৫) ফতেহ্ লোহানী (১৯২৬–৭৫) আবু রুশদ (১৯২২–) প্রমুখের ন্যায় উজ্জ্বল অথচ তরুণ লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৃত্তিকা ছিল অত্যন্ত আগ্রহী।

তাঁদের সম্পাদকীয় ঘোষণায় যে অর্ধ–ডজন আধুনিক প্রতিভাবানের কথা উল্লেখ আছে, মনে হয় এঁরা ঐ তালিকায় স্থান পাবেন। মৃত্তিকায় মুদ্রিত এঁদের কয়েকটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করা হলো :

১. অশেষ দিগন্ত, আর মাঠ, বন, প্রান্তরের শেষে
শীতের সোনালী ধান, ফাল্গুনের সন্ধ্যায় পার হয়ে,
চৈত্রের সীমান্ত ছেড়ে কতবার ডাক দিয়ে গেছে
শূন্য প্রাণ পঁচিশে বৈশাখ।'

(ফররুখ আহমদ, রবীন্দ্র–স্মরণে, মৃত্তিকা,
৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আষাঢ়–শ্রাবণ, ১৩৫৩)

অথবা পদ্মবনে প্রভাত সমীরণে যে মেলেছে দল,
দেখেছি সে লীলা কমল রক্তিম উজ্জ্বল,
ভোর না হতে পথ চেয়ে যে পাপড়ি মেলে আছে
উদয়নের শুভ্র বিভা ফিরছে তাহার কাছে।

(ফররুখ আহমদ, লিলি, মৃত্তিকা, ২ বর্ষ,
২ সংখ্যা, বসন্ত ১৩৪৯, পৃ. ৮৫)

২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ঔপন্যাসিক, কথাশিল্পী হিসেবেই খ্যাত হয়েছেন, কিন্তু তিনি কবিতাও লিখতেন, এই কবিতাটি পুরো উদ্ধৃত না করলে অর্থ পরিষ্কার হয় না :

অবশেষে তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখছি,
কারণ, তুমি আর আমি।
শালিকের মাথার মত তোমার মাথার গড়ন,
তেমনি, চ্যাপ্টা, পিচ্ছিল ও কালো।
নাকটি তোমার টিয়ার ঠোঁটের মত,
তেমনি বাঁকা শক্ত আর তীক্ষ্ণ।
পা দুটি তোমার বকের পায়ের মত,
তেমনি সরু, দীর্ঘ ও ঢ্যাঙ ঢেঙে ;
এবং সে–সরু পা দুটি দিয়ে তুমি হাঁটো উটের হাঁটা,
অথচ ক্যাঙ্গারু–নিতম্ব নিয়ে বসো হাতীর বসা।
তোমাকে আংশিকভাবে পেতে চাইলে
আমি যাই চিড়িয়াখানায়।
সেখানে তোমাকে পাই,
আর পাই খণ্ড খণ্ড ভাবে এ–মেয়ে ও সে–পুরুষের মাঝে,
কারণ তুমি পুরুষ ও নারী দুই–ই তো বটে !

www.pathagar.com

এখানে-সেখানে এদেশে সেদেশে,
কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পাইনে কখনো,
কারণ তোমার পূর্ণ মূর্তি নেই এই পৃথিবীতে।
আদিকাল থেকে মানুষেরা তোমাকে
লুকিয়ে রাখবার চেষ্টায় আছে।
(তারা তোমার নকল-মূর্তিই ভালোবাসে !)
এবং সে-চেষ্টা সভ্যতার সাথে-সাথে
আরো যেনো প্রকট হয়ে উঠছে

(সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, তুমি, মৃত্তিকা, ২ বর্ষ,
৩ সংখ্যা, গ্রীষ্ম, ১৩৫০, পৃ. ১৬২)

৩. সৈয়দ আলী আহসান এর কবিতা 'এই পৃথিবী'র কটি লাইন :

শিরশিরে হাওয়া প্রলাপ কহিছে কানে
গৃহ কপোতের মৃদুগুঞ্জন শুনি
ঘরের বাহিরে পাখা ঝাপটায় ছোট্ট দোয়েল শিশু
হলুদ-বরণ প্রজাপতি এলো বাতাসের সুর শুনি,
নাম হারা কত বনজ-ফুলের সুবাস আসিছে নাকে
স্বর্ণলতাটি উজ্জ্বল হল সূর্যের সোনা লেগে
প্রয়োজনহীন বন্য গুল্ম অহেতুক প্রাণময়,
সম্মুখে ঐ ধু ধু প্রান্তর মিশেছে রঙিন মেঘে
(সৈয়দ আলী আহসান, এই পৃথিবী, মৃত্তিকা,
২ বর্ষ, ২ সংখ্যা, বসন্ত ১৩৪৯, পৃ. ৬৯)

পত্রিকার সম্পাদকীয় বক্তব্যের সঙ্গে উপরিউক্ত রোমান্টিক ভাবাক্রান্ত কবিতার আধুনিকতার সঙ্গতি যেমন আছে তেমনি, গদ্যগুলোতে স্পষ্ট যে তাঁরা মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আর তাঁরা বলেছিলেন, 'বাঙলার সাহিত্য... মনে হয় সাহিত্যের অগ্রগতি আর তার বৈচিত্র্যময় আখ্যানভাগ, বিষয়বস্তু বুঝতে হলে—তার রূপান্তরের ধারার সঙ্গে পরিচয় রাখতে হলে—আজকে নতুনতরো দৃষ্টিভংগিকে সজাগ করে সাহিত্যের আলোচনায় কোমর বাঁধবার প্রয়োজন আছে। আরো মনে হয়, সমাজ-চেতনায় দেশকে জানতে হলে, দেশের পুরুষ মেয়ে আর সাহিত্য আর সংস্কৃতিকে জানতে হলে মার্কসীয় ভংগিটাই কি সুস্থ নয় ?'[৭]

কারণ, 'বর্তমান পৃথিবী অপমানিত-অত্যাচারিত-হৃতসর্বস্বদের পৃথিবী। বর্তমানের নতুন পৃথিবীতে আলো নেই-হাওয়া নেই—অন্ন নেই-বস্ত্র নেই—এক্ষণে আছে শুধু চিরবঞ্চিতের অর্থহীন কাকুতি আর ব্যর্থ হাহাকার।'[৮]

মৃত্তিকার উপন্যাস-গল্পে বিধৃত হতে চেয়েছে এই চেতনা—'আজকের পৃথিবীর একদিকে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফলে মানুষের সমস্ত সুকুমার বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পশুতে পরিণত হয়ে যান্ত্রিক জীবন যাপন করার ইতিহাস, আর অপর দিকে আছে নিষ্ঠুর ভয়াবহ দারিদ্র্যের নিদারুণ নিষ্পেষণে মানুষের তিলে তিলে অপমৃত্যুর আলেখ্য। তাই সেই উপন্যাস চাই, যে উপন্যাসে কোনও সুনির্দিষ্ট প্লট নেই। অধ্যায়ে অধ্যায়ে নায়ক নায়িকার

www.pathagar.com

জীবনের মর্মান্তিক উপলব্ধি, সে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত কোথাও সন্ধি নেই—আছে এই সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে নায়ক–নায়িকার অবিরাম সংগ্রাম 'The straugle goes on.[৯]

অবশ্য তাঁরা প্রগতি সাহিত্যের এতটাই অন্ধ আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন যে, ত্রিশোত্তর আধুনিকদের এবং চল্লিশোত্তর মার্কসবাদীদের সেই বহুলালোচিত ও বিতর্কিত রবীন্দ্র-সাহিত্য বর্জনের প্রস্তাবে ধোয়া তুলেছিলেন :

> প্রগতি সাহিত্যের প্রাণ-রস উপলব্ধি করতে হবে শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে ইংলন্ড ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশে প্রচলিত এবং ভারতবর্ষে বহু বর্ষব্যাপী সমাদৃত ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি এবং স্বাধীন কাল্পনিক সৌন্দর্য-লোক সৃষ্টির নীতি একেবারে বাতিল করে দেয়া একান্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর Benedetto croce আর Bertrand Russel এবং Middleton Murry প্রভৃতির আদর্শ প্রগতি সাহিত্যের পরিপন্থী ; যেহেতু প্রগতি সাহিত্যের প্রধান যে দুটো Charactersticts তা হচ্ছে Conscious purposefull mess আর consicious Co-ordination with collective, existence," কবিতায় শুধু প্রেমের বিচিত্র কাহিনী শোনাবার আর পড়বার দিন শেষ হয়ে গেছে।
>
> বর্তমানে সমগ্র রাষ্ট্র ও জাতি চায় এমনি সাহিত্য যা মানুষকে মর্মে-মর্মে জানিয়ে দেবে তার অভিশপ্ত অস্তিত্বের ইতিকথা—সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির মূলে জাগিয়ে তুলবে প্রচণ্ড আলোড়ন। এবং তারই ফলে মানুষ কল্পনার বিলাস বৈভব থেকে নেমে আসবে ভাঙা মাটির পৃথিবীতে। তারা ফেলবে ভেঙে এই অবাস্তব শাসন সংস্কারের শৃঙ্খল। মানুষের সঙ্গে মানুষ হাত ধরাধরি করে গড়ে তুলবে নতুন পৃথিবী। যেখানে বেঁচে থাকবার গৌরবে মানুষের জীবন হবে সুন্দর আর মঙ্গলময়।
>
> পরিশেষে বক্তব্য এই : সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক বিপ্লবের প্রধান ও গোড়ার কথা হচ্ছে সমাজ। সমস্ত বিপ্লবই সামাজিক বিপ্লব। যে শিক্ষা আর সাহিত্য আর সভ্যতা ভবিষ্যৎ সমাজ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে, সেই শিক্ষা ও সাহিত্য ও সভ্যতা অতীতের গৌরবময় ইতিহাস অপেক্ষা আরও গৌরবময়।[১০]

তথ্যনির্দেশ

১. আমাদের কথা (সম্পাদকীয়), মৃত্তিকা, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, শীত, ১৩৪৮, পৃ. ৫৭।

২. উপরিউক্ত, পৃ. ৫৮–৫৯।

৩. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিঠি, মৃত্তিকা, ২ বর্ষ, ২ সংখ্যা, বসন্ত ১৩৪৮।

৪. উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, বসন্ত ১৩৪৮।

৫. উপরিউক্ত, গ্রীষ্ম, ১৩৪৯, পৃ. ১৫৪–৫৬।

৬. উপরিউক্ত, হেমন্ত, ১৩৪৯।

৭. উপরিউক্ত, ২ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, বর্ষা, ১৩৫০।

৮. উপরিউক্ত, ২ বর্ষ, ২ সংখ্যা, বসন্ত, ১৩৪৯, পৃ. ৭৪।

৯. উপরিউক্ত, পৃ. ৭৪–৭৫।

১০. উপরিউক্ত।

www.pathagar.com

১৪. পূরবী

(চট্টগ্রাম, ১৯৩৬-৩৯/১৩৪৩-৪৫)

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সামাজিক প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। তখন কলকাতার সঙ্গে সরাসরি চট্টগ্রামের যোগাযোগ ছিল।[১] চট্টগ্রামের হিন্দু ও মুসলমান—দু তরফের লোকেরাই শিক্ষায় সংস্কৃতিতে তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিলো।

পূর্ববঙ্গে মুসলিম আধিক্যের ঐতিহাসিক তথ্য স্মরণে রেখে বলতে হয় কুমিল্লার কিয়দংশ, সিলেট, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের অধিকাংশ এলাকায় মুসলমান সমাজ আগে গড়ে ওঠে, এবং বন্দর নগরী হিসেবে আর্থিক অবস্থাও ঐসব এলাকার লোকেদের ভাল। হিন্দু-মুসলিম উভয়ের আর্থিক অবস্থা যেমন উন্নত ছিল, তেমনি তাঁদের সাংস্কৃতিক বোধও রুচিসম্পন্ন ছিল। ফলে সাম্প্রদায়িক সুসম্পর্ক, সম্প্রীতির মনোভাব তাঁদের মধ্যে বিরাজ করত।

হিন্দু-মুসলিম উভয়েই তাৎপর্যপূর্ণ সম্প্রীতিতে সমান মর্যাদা নিয়ে বাস করতেন। একটা প্রমাণ ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি। প্রভাত (১৩১৯) প্রতিভা (১৩৪২), পূরবী (১৩৪৩), সীমান্ত (১৩৫৪) প্রভৃতি পত্রপত্রিকা এবং 'পূরবী সাহিত্য গোষ্ঠী' (১৯৩৬-৩৯) সহ কয়েকটি সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিকগোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান ও সূর্যসেন প্রমুখের রাজনৈতিক তৎপরতা, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা এখানে সূত্রাকারে স্মরণযোগ্য। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ প্রয়াস বিবেচনা করতে গেলে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পূরবী পত্রিকা ও সাহিত্যগোষ্ঠীর পটভূমিতে রয়েছে নলিনীকান্ত সেন কর্তৃক গড়ে তোলা 'অধ্যয়ন সম্মিলনী' এবং 'চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদ'। 'অধ্যয়ন সম্মিলনী' অনেকের মতে চট্টগ্রামের প্রথম সাহিত্য প্রতিষ্ঠান।[২] এটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখারূপে কাজ করতো। ১৯১১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি শ্রী সারদাচরণ মিত্রের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট হলে এই 'চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদ' গঠিত হয়। কবি নবীনচন্দ্র দাস (১৮৫৩-১৯১৪) সম্পাদিত 'প্রভাত' (১৩১৯) ছিল এর মুখপত্র। পরিষদের মাসিক অধিবেশন হত। চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে এর বার্ষিক অধিবেশনও বসতো। ১৯৩৮ পর্যন্ত পরিষদের কার্যক্রম চলে বলে জানা যায়।

'আর্যসঙ্গীত সমিতি' ও 'সঙ্গীত পরিষদ' এর গান শেখানোর চেষ্টা ও রেলওয়ের ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউটের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চায়নের ধারা প্রভৃতি মিলে চট্টগ্রামের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আবহের কথা মনে রেখেই 'পূরবীর' আলোচনা করতে হয়।

পূরবীকে ঘিরে 'শিখাগোষ্ঠী'র ন্যায় 'পূরবী সাহিত্য গোষ্ঠী' গড়ে ওঠে এবং বছর দুই এটি সক্রিয় ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই সংগঠনটি চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে মুখরিত রেখেছিল। উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলো এই গোষ্ঠীর কর্মকর্তাবৃন্দ। তখনকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক সংকটকালে 'শিখা' বা 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ'এর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত বেশ কিছু পত্রিকা দেশের বিভিন্ন স্থান

www.pathagar.com

থেকে প্রকাশিত হয়েছে। একদল তরুণ মুসলমান সাহিত্যকর্মীর চিন্তাচেতনায় কল্লোলের প্রভাবও ক্রিয়া করেছে।

এঁরা 'শিখাগোষ্ঠীর' লোকেদের থেকে আরো অগ্রসর চিন্তার অনুসারী ও অনুকরণমুখী ছিলেন। 'জয়তী', 'মৃত্তিকা', 'ছায়াবীথি' কলকাতা থেকে বের হতো। এগুলোতে কল্লোলের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সবুজ বাঙলা', 'পূরবী', 'বঙ্গভূমি' প্রভৃতি পূর্ববাঙলা থেকে বের হয়েছে। এর সম্পাদক প্রকাশকও ছিলেন মুসলমান। ফলে ঢাকার আলোড়ন সৃষ্টিকারী পত্রিকা 'শিখা' ও মুসলিম সাহিত্য সমাজ দ্বারা বেশি করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এঁদের পত্রিকায় এবং সংগঠনের সঙ্গে শিখাগোষ্ঠীর অনেকের, বিশেষ করে কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির, আবুল ফজল, মোতাহের হোসেন চৌধুরী প্রমুখের সংযোগ ছিল। এই সকল মুসলিম চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক জাতীয়তাবাদী অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তাঁরা একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসী রাজনৈতিক আদর্শে (যদিও এটি রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না)। এজন্য এতে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা প্রকাশের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে শরিক হওয়ার প্রচেষ্টাটি স্পষ্ট না হয়ে পারেনি। পূরবীর বর্ষশেষের সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ নিজেরাই পরিষ্কার করে দিয়েছেন বিষয়টি :

> পূরবী একখানি পত্রিকা নহে। ইহা একটি আন্দোলন। পত্রিকাখানি আন্দোলনের মুখপত্র। এই আন্দোলন আমাদের সাহিত্যকে জনমুখী করিয়া তোলার তাকিদ অনুভব করে। কিন্তু ইহা শ্রেণীসংগ্রামের তাকিদ অনুভব করে না। ইহার কারণ হয়ত এই যে পূরবী রাজনৈতিকদের প্রতিষ্ঠান নহে। যাঁহারা ইহাকে পরিচালিত করেন তাঁহারা মূলত সাহিত্যিক।[৩]

উপরিউক্ত আলোচনায় তাঁরা বলেন, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিকদের লক্ষ্য দেশ ও জনগণ। সকল দেশের অবস্থাই হয়ত অনুরূপ। জনগণ, দেশের মুক্তি প্রশ্নে রাজনীতি ও সাহিত্য অভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করে। 'রাজনীতির পশ্চাৎপটের উপর সাহিত্য লীলায়িত হইয়া রূপ সৃষ্টি করে এবং দেশের রাজনীতি উহা হইতে পরিপোষণ লাভ করে। দেশের রাজনীতিতে 'পূরবী' নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করে এবং সাহিত্যে নূতন সৃষ্টির প্রেরণা সে উপলব্ধি করে।'

মাসিক পূরবীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সনের পহেলা কার্তিক রোববার ১৭ অক্টোবর ১৯৩৬ সন। শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৪৫। এর সম্পাদক ছিলেন চট্টগ্রামের দুই নামকরা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ওহিদুল আলম (১৯১১–) ও আশুতোষ চৌধুরী (১৮৯০–১৯৪৪)। শ্রী আশুতোষ চৌধুরী কবি ও লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক হিসেবে নাম করেছিলেন। প্রথম দিকে চট্টগ্রামের জেলা আদালতের মোক্তার ছিলেন, পরে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক হিসেবে মনোনয়ন লাভ করেছিলেন। গীতিকা (কবিতা), অভিধান, (কবিতা) এবং চট্টগ্রামীভাষা ও সংস্কৃতি, চট্টলভূমি, ভেলুয়া, হাতি খেদা, কমল সওদাগর, কাফন চোরা, নসর মালুম, নূরুন্নাহার, কবরের কথা, সুজা তনয়ার বিলাপ, পরীবানুর হঁলা, ইত্যাদি তাঁর কতিপয় গ্রন্থের নাম।[৪]

তাঁর পুত্র সুচরিত চৌধুরীও (১৯৩০–৯৪) সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক—ব্যক্তিত্ব ও পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নাম করেছিলেন। প্রধানত দেশ বিভাগের সামান্য আগে থেকে তাঁর সক্রিয়

www.pathagar.com

পদচারণা শুরু হয়েছিল সাহিত্য জগতে এবং আমৃত্যু তিনি চট্টগ্রামকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে কাজ করে গেছেন।

পূরবীর অপর সম্পাদক ওহিদুল আলম চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারের সন্তান। তাঁদের আত্মীয় পরম্পরায় অন্তত জনা দশেক পুরুষ ও মহিলা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে অবদান রেখে বাঙালি সমাজকে ঋণী করে রেখেছেন। কবি দিদারুল আলম, মাহবুবউল আলম, আবুল ফজল, ওমরাতুল ফজল প্রমুখের নাম স্মরণযোগ্য। আবুল ফজল ও মাহবুবউল আলম পূরবীর সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন। ওহিদুল আলম এখনও জীবিত আছেন এবং সাহিত্য সেবায় রত। 'দেশকাল' পত্রিকার সম্পাদনায়ও তাঁর নাম আছে। জোহরার প্রতীক্ষা (১৯৫০), শামীমা (১৯৫৪), সোনাগাজী (১৯৫৪), কর্ণফুলির মাঝি (১৯৭২) কাব্যসমগ্র (১৯৭৯), কবি দিদারুল আলম (১৯৭৭), পৃথিবীর পথিক (১৯৭২), চট্টগ্রামের ইতিহাস (১৯৮২) এবং চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য প্রভৃতি অনেক বইয়ের লেখক তিনি।[৫]

বয়সের তারতম্যের কথা (একুশ বছরের ছোট-বড়) চিন্তা করলে তৎকালের চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিতের সাহিত্যিক সু-সম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র ভেসে ওঠে যেমন, তেমনি তাঁদের উদ্দেশ্যও স্পষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা পাকিস্তান প্রস্তাব (১৯৪০) উত্থাপনের চার বছর পূর্বে এবং ভারত সরকার প্রবর্তিত ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের পরের বছরে 'পূরবী' প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছিলেন। 'পূরবী' মনে করতো ১৯৩৫ সনের এই আইনে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের স্বীকৃতির ফলে অপর সম্প্রদায় ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

১৯২৩ সনের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের উল্লেখ করে হিন্দু-মুসলমানের ন্যায্য অধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল পূরবীতে—'আজ এমন নেতার প্রয়োজন যিনি interms of community চিন্তা না করে চিন্তা করিবেন in terms of country. যাহার চিন্তার বিষয় হইবে দেশ, সম্প্রদায় নয়। কারণ, এরূপ চিন্তা করিতে পারার উপরই মুসলমানের ভবিষ্যত নির্ভর করে।.... বাংলায় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন-অধিকার তাঁহার দুর্বলতার পরিচায়ক এবং তাঁহার পক্ষে বিষম লজ্জার ব্যাপার।'[৬]

পূরবী হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য 'ভারতের মুক্তি' সংগ্রামে কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে সমানতালে রাজনৈতিক সাহিত্যচর্চা করতো যদিও, তথাপি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টায়ই প্রধানত নিয়োজিত ছিল এবং তাঁদের পত্রিকা প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাই। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার 'নিবেদন' এ প্রথম পৃষ্ঠাতেই বলা হয় :

> বাংলা সাহিত্যের দরবারে চট্টগ্রামের একখানি মুখপত্রের প্রয়োজন, এই বিশ্বাস হইতে 'পূরবী' প্রকাশিত হইল। চট্টগ্রাম বাঙলার অন্তর্গত হইলেও ইহার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পাহাড় ও সমুদ্রের এরূপ মিশামিশি বাঙলার আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহার ফলে চট্টগ্রামের মুসলমানগণ বিগত এক হাজার বৎসর ধরিয়া সামুদ্রিক জীবন যাপন করিতেছে। চট্টগ্রাম বাঙলার প্রান্তস্থান বলিয়া পাঠান ও মোগল চারিশত বৎসর ধরিয়া যে ভীষণ রাষ্ট্র-বিপ্লব বাঙলার বুককে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল উহা তাহাকে সামান্যই স্পর্শ করিয়াছে। ইহার ফলে চট্টগ্রামের নিজস্ব এমন এক কৃষ্টির সৃষ্টি হইয়াছে যাহা বাঙলার সাধারণ কৃষ্টি হইতে

www.pathagar.com

স্বতন্ত্র ও অভিনব। এই কৃষ্টি আরব, আরাকানী, গৌড়ীয় মুসলমান, হিন্দু, পর্তুগীজ ও ইংরেজ সভ্যতা হইতে প্রাণ–বস্তু আহরণ করিয়াছে।

চট্টগ্রামের বিগত ও বর্তমান কবি ও লেখকগণের লেখায় এই কৃষ্টির বিশিষ্ট সুরটি ধরা পড়ে। কিন্তু একখানি মুখপত্রের অভাবে একদিকে আত্মোপলব্ধির, অপর দিকে প্রচারের সুযোগ হইতে চট্টগ্রামের সাহিত্যসেবীগণ বঞ্চিত আছেন। এই অভাব দূরীকরণের জন্যই 'পূরবী'র জন্ম।

পূরবী প্রকাশিত হত অন্যতম সম্পাদক ওহীদুল আলম বিএ. কর্তৃক এবং মুদ্রিত হত চট্টগ্রামের আন্দর কিল্লাস্থ কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে। পূরবীর নিয়মাবলীতে বলা হয় : 'প্রতি সংখ্যা চারি আনা, বার্ষিক তিন টাকা। তবে সুপরিচিত পাঠাগারের জন্য মাত্র দু'টাকা। এজেন্টদের বেলায় তিন আনা এবং পঁচিশ কপির কম পাঠান হয় না। কেহ যদি চারজন গ্রাহকের চাঁদা পাঠায়ে দেন বিনিময়ে তিনি এক বছরের পত্রিকা বিনামূল্যে পাবেন। ম্যানেজারের ঠিকানায় যোগাযোগ। অমনোনীত প্রবন্ধ ও কবিতা কার্যালয়ে অনুসন্ধান করে ফেরৎ নিতে হয়।'

'পূরবী' শুভানুধ্যায়ীদের যে তালিকা প্রকাশ করে তাতে দেখা যায়, এর সঙ্গে আত্মিকভাবে সংযুক্ত ছিলেন : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, সিদ্দিক আহমদ বি.এল., ডা. মোহাম্মদ ওমর এম. বি, এম. এন ইসলাম, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র নাগ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, শেখ রফিউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র হাজারী, মকবুল আহমদ সওদাগর, মুনসি কবির আহমদ, আবুল মনসুর, লোৎফে আহমদ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ একরামুল হক, কক্সবাজার থেকে মিঃ সাদৎ আলী আখন্দ বি.এল., আপার বার্মা থেকে এস. এ. নূর, আকিয়াব থেকে মিঃ মোহাম্মদ সোলাইমান খাঁ প্রমুখ।[৭]

'পূবরী' খ্যাতনামা ব্যক্তিদের চিত্র মুদ্রিত করেছে। প্রথমবর্ষে যাঁদের ছবি এসেছে, তাঁরা হলেন : দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেন, মোহাম্মদ কাজেম আলী, শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, হাজী নজু মিঞা সওদাগর, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষিরোদচন্দ্র রায়, মৌলানা মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী প্রমুখ।

পূরবীর লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনার শেষাংশে বলা হয় : 'বাঙলা আবার যুগ–সন্ধির সম্মুখীন হইয়াছে। পুরাতন প্রশ্ন আবার নূতন করিয়া ধ্বনিত হইতেছে : নূতন বাঙলা গড়নে কে কি দিবে? চট্টগ্রামের হইয়া পূরবী এ প্রশ্নের উত্তর দিবে।'

বলাবাহুল্য, পূরবী দুই বছরের প্রচেষ্টায় বাঙলা ভাঙবার প্রাক্–মুহূর্তে ঐক্যের বাণী প্রচার করেছিল আর মননসাধনার পর্যাপ্ত উপাদান উপকরণ সরবরাহ করেছিল। এর সকল লেখাই পঠনোপযোগী ছিল, আর সুসম্পাদনার ছাপ প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রতিটি চরণে সুস্পষ্ট রয়েছে। তাড়াহুড়ো ছিল না, মফস্বলের প্রয়াসে ছিল ধীর, স্থির, সংযত প্রযত্ন, কারণ তাঁরা কলকাতার নাগরিক জীবনের থেকে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপস্থাপনের জন্য ছিলেন প্রত্যয়ী। একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

কলিকাতার প্রভাব আমাদের জীবনে কতখানি? 'এর উত্তর চট্টগ্রামের সাহিত্যিকগণই দিতে পারেন।' আরও বলা হয় : বহিরাগত মানুষেরা এককালে চট্টলার বুকে সত্য ও সুন্দরের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। কালক্রমে এঁদের অবিনশ্বর আত্মার ছোঁয়াচে চট্টগ্রামের প্রতিটি

www.pathagar.com

লোককে মরমী করে তুলেছে। আমাদের লেখকগণ এর মর্মকথা না এঁকে বহু কষ্টে কল্পনার সাহায্যে কলিকাতার ছবিই আঁকেন। অথচ তাঁদের সাথে এঁদের পরিচয় নেই।

নিজের উপর আমাদের আস্থা আছে। একমাত্র সময়ই উহা যাচাই করিবে। ...আমাদের লক্ষ্য চট্টগ্রামের সত্যোপলব্ধি এবং বাংলা সাহিত্যের দরবারের উহার সংস্কৃতির পরিচয়। বাঙলার জাগ্রত মননকে কলিকাতার পথ হইতে ফিরাইয়া গ্রামমুখী করাও আমাদের উদ্দেশ্য। ইহাতে aggressive প্রসারণের ভাব তেমন নাই, exclusiveness এর ভাবও তেমন নাই।

তখনকার অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'পূরবীর' সমালোচনা পূরবীতেই সংকলিত করায় চট্টগ্রামের তৎকালীন কয়েকটি পত্রপত্রিকার নাম পূরবী থেকে জানা যায়। সাপ্তাহিক 'জনমত' (সম্পাদক : আবদুল মোনএম, চট্টগ্রাম) 'যুগধর্ম', 'সত্যবার্তা', 'পাঞ্চজন্য' প্রভৃতি পত্রিকায় এটিকে গবেষণামূলক সিরিয়াস প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য অভিনন্দিত করা হয়।

'পূরবী'র বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'পূরবী সাহিত্য গোষ্ঠী' চট্টগ্রামে 'পূরবী সাহিত্য সম্মেলন' নামে এক বিরাট সাহিত্য সভার আয়োজন করে। ঐ সাহিত্য সম্মেলন সফল করার জন্য গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই আন্তরিকতা ও পরিশ্রম দিয়ে কাজ করেন এবং সত্যিই সেই সভা খুব আকর্ষণীয় হয়। সম্মেলনের বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন মাহবুবউল আলম, আশুতোষ চৌধুরী, মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, আবুল ফজল, মোহাম্মদ আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক মোহাম্মদ ওসমান গনি, ওহিদুল আলম প্রমুখ। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের মুসলিম হলে। উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়ে শোনান, প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রী ধ্যানচন্দ্র সেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ দেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, সাহিত্য সভার সভাপতির অভিভাষণ দেন অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ।

দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব করেন বিভিন্ন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ পাঠ করেন বহু কবি সাহিত্যিক। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর ভাষণে 'পূরবী সাহিত্য সম্মেলন'কে বন্ধু সম্মেলন বলে উল্লেখ করেন। 'কারণ বন্ধু-সম্মেলন সুদিনে নয়, দুর্দিনে জমে।' তিনি বলেন, 'শুনেছি এই পূরবী সাহিত্য সম্মেলনের পশ্চাতে উদ্যোক্তাদের একটি উদ্দেশ্য আছে, তাঁরা সম্মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করতে চান যে, বাংলা সাহিত্যে গণসংযোগের কথা বিশেষভাবে ভাববার দিন এসেছে।'

পূরবীতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন মাহবুবউল আলম (চট্টগ্রামের জন্মকথা), লুৎফর রহমান (ধর্মবোধ), শ্রী আশুতোষ চৌধুরী (দলিল-দস্তাবেজের ভাষা), শ্রী হীরালাল দাশগুপ্ত (রবীন্দ্রোত্তর যুগের মুসলিম কবিগণ), শ্রী অমিত সেন, নেলী সেনগুপ্তা (ইলা সেন), মোহাম্মদ সোলতানুল আলম (ইতিহাস ও মোসলমান), হরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য (মানুষের ধর্ম), ড. মুহম্মদ এনামুল হক (চট্টল সংস্কৃতির গোড়ার কথা), অধ্যাপক শ্রী কমলকৃষ্ণ ঘোষ (শাহনামার বীর পরিবার), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (মুসলমান রচিত পদাবলী সাহিত্য, ফকির কবি সৈয়দ মর্তুজা, কবি শশাঙ্কমোহন স্মরণে), শ্রীমতী সুজাতা ঘোষ (হযরতের বাণী), কাজী আবদুল ওদুদ (শিক্ষা-সংকট, পুনর্মুদ্রণ ; পরিবেষ্টনের সঙ্গে প্রেমের যোগ), বার্ট্রান্ড রাসেল (নীতিশাস্ত্রের ভঙ্গী, অনুবাদকের নাম নেই), আবদুস সালাম, আবুল ফজল, আবদুল কাদির, পণ্ডিত শ্রী সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী, প্রফেসর বিনয়কুমার সরকার (মুসলিম রেনেসাঁ), শ্রী

www.pathagar.com

সুশীলকুমার গুপ্ত (চরিত্রগঠন), সাদত আলী আখন্দ (মেঘদূত), মাহমুদুল হক (বাঙলার কৃষক, নারী-শিক্ষা, ভিক্ষা-সমস্যা, ভারতে মুক্তি) ; সম্পাদক (মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা), শ্রী কল্পতরু সেনগুপ্ত (সাহিত্য ও সমাজ, মুসোলিনী-হিটলার) প্রমুখ।

গল্প লিখেছিলেন শামস্‌উল আলম, অমলেন্দু গুপ্ত, হরিদাস গুপ্ত, যীশুদত্ত, ওহিদুল আলম, সায়েফউদ্দিন খালেদ, বঙ্কিম দেওয়ান, নূর মোহাম্মদ, মাহবুবউল আলম, আবুল ফজল, মনসুর আহমদ প্রমুখ।

শামস্‌উল আলম এর 'তীর্থ-রহস্য' শীর্ষক উপন্যাস কয়েক সংখ্যাব্যাপী ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। সতীশচন্দ্র দত্ত বিদ্যারঞ্জন-এর 'প্রেম' এবং শ্রী আশুতোষ চৌধুরীর 'মাগ ফিরিঙ্গি' শীর্ষক দুটি নাটিকা এতে ছাপা হয়।

কবিতা ও গান লেখেন ওহিদুল আলম, ফকির আহমদ, আবদুস সালাম, দিদারুল আলম, সুবোধরঞ্জন রায়, ছরওয়ার জামান খাঁ, মোহাম্মদ লোকমান খাঁ, মোহাম্মদ ছাইফুল ইসলাম, তোফায়েল আহমদ, শেখ শাহনূর আহমদ, দিদারে আনওয়ার, কাজী শামসুল ইসলাম, বসন্তকুমার কানুনগো, মোহাম্মদ মোলতাজী, মোহাম্মদ ইসমাইল, অশ্বিনীকুমার চৌধুরী, আবদুল কুদ্দুস, সুফিয়া এন. হোসেন, চিত্তরঞ্জন দাস, মঈনুদ্দীন, কুমারী স্মৃতি সেন, শেখ নূর আহমদ শাহ, ফসিউল আলম, আহমদুর রহমান, বেনজীর আহমদ, বন্দে আলী মিয়া, নির্মল রাহা, নাজিরুদ্দিন চৌধুরী, শ্রীমতী নীলিমা দেবী, মোহাম্মদ হোসেন আলী, মহীউদ্দীন, হিরন্ময় দাসগুপ্ত, জসীমউদ্‌দীন, সালামত আলী দেওয়ান প্রমুখ।[৮]

চট্টগ্রামের সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে মাসিক 'পূরবী'র অবদান অবিস্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই পত্রিকা অনেক নতুন উপাদান সংযোগ করে। ত্রিশের দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রের মধ্যে এর স্থান নগণ্য নয়। কিন্তু দুষ্প্রাপ্য এই পত্রটি সচরাচর গ্রন্থাগারগুলোতে পাওয়া যায় না। আশা করি সাহিত্য-সমাজের দৃষ্টি সেদিকে নিপতিত হবে এবং পূর্ণাঙ্গ পরিচয় যাতে পাওয়া যায় সেদিকে যত্নবান হবেন।[৯]

তথ্যনির্দেশ

১. 'সীমান্ত'-সম্পাদক মাহবুবউল আলম চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ৩ জুন ১৯৯২।
২. সুনীল কান্তি দে, পূরবী সাহিত্য গোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা (১৯৩৬-৩৮), বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৪০০, পৃ. ১৭৮।
৩. 'পূরবী' (আলোচনা), পূরবী, ১ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৪, পৃ. ৪৮৩-৮৪।
৪. চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৪৩।
৫. বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৬৩।
৬. বিনয় কুমার সরকার, মুসলিম রেঁনেসাঁ, পূরবী, ১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৪, পৃ. ৩৯৩-৯৪।
৭. পূরবী, ১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৩।
৮. মুহম্মদ ইসহাক চৌধুরী, তিরিশের দশকে চট্টগ্রামে সাহিত্য আন্দোলন : মাসিক পূরবী, দৈনিক আজাদী (চট্টগ্রাম), ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ও ৭ জানুয়ারি ১৯৯৪ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত বিস্তৃত তালিকা থেকে।

www.pathagar.com

৯. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে এবং মুহম্মদ ইসহাক চৌধুরী সাহেবের সংগ্রহে পূরবীর সম্পূর্ণ ফাইল আছে। জেরক্স করে পত্রিকাটির কপি বড় বড় লাইব্রেরিতে সহজলভ্য করা যায়। ঢাকার বাংলা একাডেমীও তাঁদের দায়িত্ব হিসেবে এ কাজটি করতে পারে।

www.pathagar.com

১৫. বঙ্গভূমি
(ঢাকা, ১৩৪৪-৪৫ ?)

মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা-গোষ্ঠীর কার্যক্রম (১৯২৬-৩৮) স্তিমিত হয়ে এলে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র (১৮৮৫-১৯৬৯) অনুপ্রেরণায়ই ঢাকায় ১৯৩৭ সন নাগাদ আবার 'পূর্ব বঙ্গ সাহিত্য সমাজ' গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু এই সাহিত্য সমাজ ও এর মুখপত্র 'বঙ্গভূমি'র কোনো খবর অনেকেই জানেন না। অথচ এটা ঢাকার ঘটনাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাজ 'শিখা' ও 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬/২৭) উভয়বঙ্গে আলোড়ন তুলে এখন ইতিহাস হয়েছে। কিন্তু বঙ্গভূমি ও 'পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজ' বছর দুই চলতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সকল সাহিত্যপত্রই এলোমেলো হয়ে যায়। শেষ দিকে কাগজ-সংকটে বহু ছোট পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। বড় ও প্রতিষ্ঠিত মোহাম্মদী-প্রবাসীর মতো পত্রিকাগুলো আকার ছোট করে ধারা বজায় রেখেছিল। কাগজ আনতে তখন সম্পাদকদের দিল্লী দৌড়াতে হতো।

এই অবস্থায় 'পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজ' ও এর মুখপত্র 'বঙ্গভূমি'র কার্যাবলী স্থগিত হয়ে যায়। তাছাড়া 'বঙ্গভূমি'র উদ্যোক্তাদের ইচ্ছাশক্তি ও মনীষা 'শিখা'র কর্ণধারদের ন্যায় ছিল না। তাছাড়া এই পত্রিকায় 'পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজ' এর সঙ্গে কবি, অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮২-১৯৫২) এর নাম সংযুক্ত আছে দেখা যায়। কিন্তু এই সময় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ক্রমে বিষময় হয়ে ওঠায় অসাম্প্রদায়িক কোনো প্রতিষ্ঠান টিকে থাকবে বা গড়ে উঠবে এমন আশাও করা যায় না।

বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের ইতিহাসে বিভাগ পূর্বকালের কয়েকটি সভা-সমিতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর দৃষ্টান্তে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যিকদের 'মুসলমান সাহিত্য সমিতি', 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রভৃতি বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত কলকাতা ও ঢাকায় গড়ে উঠেছিল। সাহিত্যিক সংগঠনের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নের কাজে যাঁরা নিয়োজিত, তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই বঙ্গভূমির সম্পাদকীয়র এই সংবাদ তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হবে :

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি উৎসাহী ছাত্র একটী 'পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজ' গঠন করিয়াছে। সমাজ হিন্দু মুসলমান সকল ছাত্রের ভাব বিনিময়ের এবং সম্মিলনের স্থান। সমাজের কর্ণধার প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং সহকারী কবিবর অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার। ইতিমধ্যে সমাজের কয়েকটী অধিবেশন হইয়াছে। এ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রবন্ধ পড়া হইয়াছে, তাহাতে ছাত্রদের সাহিত্য-চর্চার জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। সাম্প্রদায়িক কলহ এবং ধর্ম বিষয়ে অনধিকার চর্চা হইতে সমাজকে মুক্ত রাখিলে, ইহা দ্বারা শুভ ফল হইবে আশা করি। আমরা ইহার দীর্ঘ আয়ু ও সাফল্য কামনা করি।

এই সাহিত্য সমাজের মুখপত্ররূপে 'বঙ্গভূমি' প্রথম প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে ঢাকার ৯৫ নং ইসলামপুর থেকে। সম্পাদক চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন। পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। কার্যাধ্যক্ষ এ. এইচ. সৈয়দ। অবশ্য পত্রিকার প্রিন্টার্স লাইনে (শেষ পৃষ্ঠায়) বলা হয়েছে এ. এইচ. সৈয়দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং চৌধুরী মোয়াজ্জম হোসেন

www.pathagar.com

কর্তৃক বলিয়াদি প্রিন্টিং প্রেস ৯৫ ইসলামপুর, ঢাকা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।' প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। প্রাপ্ত ৬ষ্ঠ সংখ্যার ধারাবাহিক পৃষ্ঠা সংখা ২৪৯ থেকে ৩০৪। প্রতি সংখ্যার দাম চার আনা। সডাক বার্ষিক মূল্য ২ টাকা আট আনা। 'সম্পাদকীয়'তে প্রমাণ হয় দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নিয়েই বের হয়েছিল 'বঙ্গভূমি' :

> বাঙ্গালার বাজারে মাসিক পত্রিকার অভাব নেই ; তবু আর একটীর কি দরকার—এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ইহার সোজা উত্তর এই যে সকলের রুচি এক নয় ; আমাদের ধারণা, এক শ্রেণীর পাঠক এইরূপ একখানি পত্রিকা চাহিতে ছিলেন, তাঁহাদের রুচির তৃপ্তির জন্য আমাদের এই প্রয়াস। গাছের পরিচয় ফলে, ফলের পরিচয় আস্বাদে। আমরা এই পত্রিকায় কি করিব, তাহা আমরা এখন জোর গলায় বলিতে চাই না। পাঠকেরা ক্রমে পরিচয় পাইবেন। বোধ হয়, এই নমুনাতেও কিছু পরিচয় আছে।
>
> কেহ বলিবেন, পত্রিকাখানি টিকিবে ত? আমরা ছেলেখেলা করিতে বসি নাই। যখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা 'বঙ্গভূমি'তে প্রকাশিত হইয়াছি, তখন আমরা সহজে লুকাইব না। তবে যদি কেহ আমাদিগকে না চান, তবে অনর্থক ঠাঁই জুড়িয়া থাকিব না। মোদ্দাকথা, আমাদের থাকা না থাকা পাঠকদের চাওয়া না চাওয়ার উপর নির্ভর। তাঁহারা যদি চাহেন, তবে আমরা চির যুগ থাকিব।

'বঙ্গভূমি' 'চিরযুগ' টিকে থাকার প্রত্যয় নিয়ে বের হয়েছিল বলে এক পৃষ্ঠাব্যাপী 'নিয়মাবলী' ছাপা হয়েছিল। ঘোষণা ছিল : 'আমরা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলে নই। দেশের এবং দশের মঙ্গলের জন্য যে কোন দল যে কোন চেষ্টা করিবেন, তাহাতে আমাদের সহানুভূতি আছে।' তবে তাঁরা মনে করেন, 'অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, সাম্প্রদায়িক শান্তি, কৃষকের আর্থিক উন্নতি এবং শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান—এইগুলি সকল দলের আশু সুবিবেচনার বিষয় হওয়া দরকার।'

বঙ্গভূমি মাত্র দুটি সংখ্যা (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৪ ও ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৪৪) পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'চাঁদপুর মুসলিম যুবক সমিতি'র একাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে ২/৫/৩৭ ইং তারিখে সভাপতির যে ভাষণ দেন—তা 'অভিভাষণ' শিরোনামে ছাপা হয়েছে প্রথম সংখ্যাতেই। এই ভাষণে তিনি কোরআন, হাদিস, ইতিহাস ও দর্শন থেকে সুন্দর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে মুসলিম জাতিকে জাগতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ; যেমন তিনি তাঁর প্রতিটি ভাষণে, বক্তৃতায় সমাজকে সামনে রেখে আজীবন বলে গেছেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মুসলিম জাগরণের এক অবিস্মরণীয় যুগ-পুরুষ, মুসলমানদের উন্নয়নের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে জন্মে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে কলুষিত না-করেও পশ্চাৎপদ সমাজকে জাগিয়ে দেয়া যায়। তাই বিশ্বমানবের দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন মানবিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির নৈতিক প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠিতে। এই অভিভাষণে তিনি বলেন :

> প্রিয় যুবক বন্ধুগণ ...গতিই জীবন। গতির অভাব মৃত্যু। যুবশক্তি নিরন্তর গতিশীল। সেই যুবশক্তি প্রবীণের ভুয়োদর্শন দ্বারা পরিচালিত হলে পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করতে পারে। তুর্কী, ইটালী ও জার্মানীর তরুণগণ তাদের প্রধান নেতা কামাল আতাতুর্ক, মুসোলিনী ও হিটলারের নেতৃত্বে তাদের দেশে কিনা এক যুগান্তর উপস্থিত করেছে। আমাদের দেশেও তা সম্ভব হবে না কেন?

www.pathagar.com

তিনি বলেন, আমরাও মানুষ, ইউরোপ আমেরিকার লোকও মানুষ ; কিন্তু তাদের ভিতর দুটি বিশেষ গুণ আছে, যার জন্য তারা গৌরবের এত উচ্চ চূড়ায় উঠেছে, আর যার অভাবে আমরা হীনতার এই গভীর গহ্বরে রয়েছি। একটি তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ইউরোপ আমেরিকার উন্নতিশীল জাতিদের প্রত্যেকেই মনে করে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, সমস্ত দুনিয়াটা আমাদের পায়ে মাথা নত করবে। ...বড় হতে গেলে নেতা চাই এবং নেতার অনুগত দলও চাই।' তিনি বলেন, 'আমি মনে করি দেশের সর্ব প্রথম কাজ মূর্খতারূপ মহাশত্রুর সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম করা। কবে সরকার বাহাদুর অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেশে চালাবেন, এ ভরসায় বসে থাকলে চলবে না।' প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর জন্য বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য কর্তব্য' এই হাদিসের উল্লেখ করে মুসলমান যুবকদেরকে সর্বস্তরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানান তিনি।[১]

প্রথম সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলামের

'প্রাণ চঞ্চল প্রাচীর তরুণ কর্মবীর,
হে মানবতার প্রতীক গর্ব উচ্চশির।
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোরা দৃপ্তপদ
সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ,
মরু-সঞ্চর গতি চপল।
অগ্র-পথিক রে পাঁও দল, জোর কদম চল্‌রে চল।

এবং সুফিয়া এন. হোসেন এর কবিতা 'একটী সূর্য্যাস্ত' ছাপা হয়। এ. জেড. নূর আহমদ এর ভ্রমণ কাহিনী—'দিল্লী, আজমীর ও আগ্রার স্মৃতি' ; মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম এর গল্প —'জিহাদ' ; উমর খৈয়ামের কবিতার অনুবাদ ; সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এর গল্প—'যার যেখানে বাস' ; আজহারুল ইসলামের কবিতা-'বাদল দিনে' ; যোগেশচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ— 'বাঙ্গালা ভাষার লিখন ও পঠন' ; মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র দ্বিতীয় রচনা—'আর্য্য জাতির প্রাচীনতম প্রেম-কাহিনী' ; মিসেস মহুয়া এম. হক এর গল্প—'ভাগ্যরাণী' ; এবং শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন এবং আমীনুদ্দীন আহমদ লিখিত দুটি পুস্তক পরিচয় প্রকাশিত হয়।

প্রথম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনের একটি অভিভাষণ ছাপা আছে। এ লেখার পাদটীকা থেকে জানা যায় 'পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজে'র প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল ঢাকায় এবং তাতে শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন যোগ দিয়েছিলেন সভাপতি হিসেবে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখের অনুরোধ তিনি রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই অভিভাষণটি কি সংকলিত হয়েছে? এতে তাঁর আত্মজৈবনিক ঘটনার বিবরণ রয়েছে, তিনি বলেন :

> ভদ্র মহোদয়গণ, ঢাকায় আমার কৈশোর ও নবযৌবনের শত স্বপ্নকথা জড়িত ; আমার সেই কৈশোর ও নবযৌবনের শত স্বপ্ন এখানে আসিয়া আজ যেন ফিরিয়া পাইতেছি। আপনাদের কৈশোর ও নবযৌবনের চাঞ্চল্য, এবং মুখশ্রীতে সবুজ প্রভায় আমার জীবনের সেই সবুজ স্বপ্ন যেন খেলিয়া বেড়াইতেছে, তাহার মধ্যে আজ আমার সেই স্বপ্নে পাওয়া হারানো রাজ্যের সংবাদ পাইতেছি ; এজন্য এই দেশকে আমার বড় প্রিয় বোধ হইতেছে এবং আপনাদিগকে নানারূপ প্রিয় সম্ভাষণ দ্বারা আপ্যায়িত করিবার ইচ্ছা হইতেছে।...

তারুণ্য ও জ্বরাত্বের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসজ্ঞের ভাষায় তিনি বলেন, 'এখন যে সকল জিনিসের মূল্য দিতেছি তাহা ভুয়ো। কিন্তু তরুণ জীবনের বিনা শিক্ষায় বিনা

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতায় নিজের সর্বস্ব বিলাইবার যে প্রেরণাটি ছিল, তাহাই স্বর্গ হইতে পাইয়াছিলাম। এখন বুঝিতেছি তোমাদের সঙ্গে আমার যে পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমার পক্ষে মোটেই লাভের হয় নাই।...'

তরুণদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'তরুণ-বয়স-সুলভ মহৎগুণগুলিকে হারাইয়া ফেলিও না। এখন জগতে আদর্শবাদ ও জড় বাস্তবতার সঙ্গে সংঘর্ষ চলিয়াছে, ভারতবর্ষ চির আদর্শবাদী, ভারতবর্ষ চির বিশ্বাসী।... ভারতবর্ষ পথ হাঁটিতে পশ্চাৎপদ নহে, কিন্তু পথের শেষ আছে ইহা তাহারা বিশ্বাস করে।... আমাদের বৈষ্ণবেরা কিশোর রূপকে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে সেই কিশোরসুলভ গুণগুলি প্রত্যক্ষ। এই গুণগুলি কেহ তোমাদিগকে শিখাইয়া দেয় নাই—ইহা তোমাদের নৈসর্গিক ও স্বতসিদ্ধ। এই গুণ সূত্রে তোমাদের চক্ষের সমস্ত ঘোর অন্ধকার কাটিয়া যাইবে। যদি তোমাদের নির্মল চক্ষু, নির্মল প্রেম আমি জীবনে আর একবার পাইতাম, তবে পার্থিব জীবনে আমি আজ ভরাডুবি হইয়া এরূপ কাষ্ঠখণ্ডের মত ভাসিয়া বেড়াইতাম না। হে তরুণগণ। তোমাদের গুণরাশি তোমাদের সতেজ অন্তরের প্রফুল্লতা, অনবদ্য কমনীয়তা ও সাহস আমার নমস্য, তোমরা এই সকল মহৎগুণের অনাদর করিও না। জড়বাদিদের কথা শুনিও না।'

ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে তিনি আরও বলেন, 'যেহেতু আজ আমাদের ঘোর দুর্দ্দিন, জগতের নানা বিঘ্ন নানা জটিল অবস্থাচক্র ভারতবাসীকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে ; আজ শব-সাধনা করিতে হইবে, আজ আহার বিহার, আরাম ভুলিয়া যান। পতিত ভারতকে আপনাদের উদ্ধার করিতে হইবে ; আজ যদি না করেন, তবে সম্মুখে করাল মৃত্যু। আজ আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা, কঠোর সংযম, অনিদ্রা, অনাহারে অভ্যস্ত হউন।... আজ কোন বিপদই যেন আপনাদিগকে হঠাইতে না পারে। একনিষ্ঠ তপস্যার ক্ষেত্রে সংযমের খাঁড়া ধরিয়া রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক ব্রতচারী হউন। এই ভীষণ সমরে মহৎগুণের বর্মে দেহ আচ্ছাদন করিয়া প্রস্তুত হউন।'

ঐক্যের প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করান :

> আজকালকার প্রধান শক্তি হইতেছে সংঘশক্তি ; United we stand, divided we fall, সেই শকুনী, জয়চন্দ্র, মীরজাফর, ভবানন্দ মজুমদার প্রভৃতির সময় হইতে আমরা সকল গুণের গুণী হইয়াও গৃহশক্রতার জন্য অধপতিত হইয়াছি ; আজ আমাদিগকে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে ; আমাদের সকলকে এক ব্যক্তির ন্যায় একনিষ্ঠ ও একমনা হইতে হইবে। আপনাদের সাহিত্যসভার সূত্রে এই ঐক্য অর্জন করুন—সাহিত্য কথার সঙ্গে সহিত শব্দের মিল আছে। সাহিত্যের ঐক্যও একটি অর্থ হইতে পারে।... বাঙ্গালী এক সময়ে দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন সাহসিকতায় অদ্বিতীয়, জ্ঞানে গুরু শিল্পকার্য্যে দক্ষ, আমরা হিন্দু মুসলমান তাঁহাদেরই বংশধর। বাঙ্গালা ভাষার যে রূপ এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। এই ভাষাকে অবলম্বন করিয়া আসুন আমরা সৌভ্রাত্র স্থাপন করি। পূর্ব ইতিহাসের উপকরণ দিয়া ভাবী ইতিহাসের ভিত গঠন করিতে লাগিয়া যাই।[২]

প্রথম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় জানা যায়, মোহাম্মদ নূরুল হক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন অন্ধকবি আল্-মা' আরী'র ওপর। ডা. মণীন্দ্রকুমার পাত্র যক্ষ্মা-চিকিৎসার ওপর লিখেছিলেন। আরবী সাহিত্যের ওপরও ধারাবাহিক রচনা প্রকাশ পেয়েছিল নূর আহমদ এর। কাজী হবীবুর রহমান লিখেছিলেন হযরত আবু বকরের ওপর। শ্রী পাপিয়া বসু ধারাবাহিক

www.pathagar.com

গল্প লিখতেন 'বঙ্গভূমিতে 'সংশয় বাজিল মনে, ক্ষণ ব্যতিক্রমে' শিরোনামে। নছরু গল্প লিখতেন। আরও গল্প লিখেছিলেন বদিউস সালাম ও আনীসুদ্দীন আহমদ। কবিতা লিখতেন সুনীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (হাফিযের গজলের অনুবাদ), আজহারুল ইসলাম প্রমুখ।

যে কটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাতে যে নির্বাচিত কিছু ভাল লেখাই প্রকাশিত হয়েছিল, তা অনুমেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিত, অধ্যাপকদের সংশ্লিষ্টতা বঙ্গভূমির কর্তাব্যক্তিদের কিছু বাড়তি দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক চেতনা ও সাহিত্যিক সম্পদ লাভে সহায়তা করেছিল। 'নারী–প্রগতি' সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষার খাতা থেকে জনৈক ভদ্রমহিলার একটি রচনা উদ্ধৃত করে কর্তৃপক্ষ তাঁদের 'নারী–প্রগতি' সংক্রান্ত ধারণা স্পষ্ট করেছেন। একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয় : 'আজকাল নারী প্রগতির দিনে দেশ বিদেশে নারী সমাজ যে–পথে চলেছে, সেপথ ভাল কি মন্দ, নারী জীবনের লক্ষ্যই বা কি, এ সম্বন্ধে আমরা পুরুষেরা কিছু বলিলে ভুল বুঝিবারই সম্ভাবনা। এই জন্য একজন ভদ্র মহিলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি.এ. পরীক্ষার উত্তরপত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

> প্রবন্ধ লিখিবার প্রথমেই আমার মনে হইল যে, আমি হিন্দু কুলবধূ। আমার আদর্শ জীবনে কি হইতে পারে? আজকাল এই বিষয় লইয়া বহু পত্রিকায় এবং বহু মহিলা সমিতিতে আলোচিত হইতেছে। কিন্তু এখনও ইহার কোন মীমাংসা হয় নাই এবং হওয়া কঠিন। কারণ, আজকাল নবজাগরণীর যুগ, মানুষ এখনও বুঝিতে পারিতেছে না, তাহাকে কতখানি কোন দিক সামলাইয়া এই জগতের দ্রুত গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। তাই আজ আমার আদর্শের সঙ্গে নবীনাদের আদর্শের খাপ খাইতেছে না। তবু প্রত্যেক মানুষের এক একটা আদর্শ আছে। আমার যদিও নিজস্ব কিছু আদর্শ আছে ; কিন্তু আমার সে আদর্শ কার্যে পরিণত করা কঠিন হইয়া পড়ে সময় সময়ে। স্বামীর কথা অবহেলা করিয়া, এখনও কোন কাজ করিতে সাহসে কুলায় না।
>
> আদর্শ লইয়া মানুষকে জীবন গড়িতে হয়। তাহা না হইলে প্রতি পদে পথ হারাইয়া ফেলিতে হয়। আজকাল মেয়েরা উচ্চউপাধি লাভ করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহাদের জীবনের আদর্শ কি জিজ্ঞাসা করিলে কোনই সদুত্তর দিতে পারেন না। কেহই সে বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। আমাদের দেশের মেয়েদের যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে তাঁহারা শুধু বিলাসিতা ও পুঁথি পড়া বিদ্যাই লাভ করিতেছেন ; কিন্তু কিভাবে জীবন গড়িলে জীবন মধুময় ও সুন্দর হইবে, দেশের ও দশের কাজে লাগিবে, তাহার কিছুই শিখিবার অবসর পান না।
>
> আমরা মাতৃজাতি। আমার প্রধান কর্তব্য আদর্শ জননী হওয়া। সন্তানদিগের উপর দেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আমরা যদি তাহাদের ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারি, তবে এ দেশের স্বাধীনতা আজ সুদূর পরাহত।... আমাদের মেয়েরা স্বাধীনতা কাহাকে বলে ভুলিয়া যান, স্বাধীনতা কথার অপব্যবহার করেন। সংসার আমাদের প্রধান স্থান, কারণ ভগবান, জননী হইবার আশীর্বাদ আমাদের উপরই দিয়াছেন। আমরা সংসার ও সন্তানদের অবহেলা করিয়া শুধু যদি দেশের কাজে বাহিরে কাটাই, তবে আমাদের উপর সন্তান পালনের যে গুরুভার ন্যস্ত আছে, তাহা সাধন করা সম্ভব হয় না। এই সন্তানেরা একদিন জগতের মুখ উজ্জ্বল করিবে ; এই আশা লইয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের নিজেদের তৈরী হইতে হইবে। নিজের জীবন সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে

www.pathagar.com

> সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়না। এই জীবন গড়িবার জন্য আমাদের সাধনা করিতে হইবে। শিক্ষা ও সাধনা এক সঙ্গে মিলিত হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, কেমন করিয়া জীবনের এই দুর্বিসহ পথকে মধুময় করিয়া যাইতে পারি। এই সাধনার একটী অঙ্গ ত্যাগ। ত্যাগকে জীবনের ব্রত করিতে হইবে।[৩]

বঙ্গভূমিতে বিজ্ঞানাচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে গভীর শোক সম্পাদকীয় লেখা হয়। ১৯৩৭ সনের আগে পরের বাঙলার রাজনীতির কথা মনে করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের কয়েকটি অভিযোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন প্রয়োজন। মাসিক 'মোহাম্মদী' 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা' প্রকাশ করে যুক্তি দিয়ে দেখায় যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্ত স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচী ও বিষয়বস্তু যেরূপে প্রণয়ন করেছে তাতে সম্প্রীতির স্বার্থে সংশোধন করা প্রয়োজন। ঐকালের মুসলমানদের সাময়িকীগুলোর প্রতিটিতেই এই ব্যাপারে মোহাম্মদীর সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতার অবসান ঘটিয়ে ন্যায়, যুক্তি ও মানবতার আদর্শে বাঙলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি পরিচালিত করার পক্ষে মতামত জানানো হয়েছে।

'মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড বিল' এর বিপক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আপত্তির বিপক্ষে 'বঙ্গভূমি' অত্যন্ত রুচিস্নিগ্ধ যৌক্তিক আলোচনা উত্থাপন করেন। তাঁরা বলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান প্রধানমন্ত্রীর আমলে গণশিক্ষার বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। কারণ, 'বাঙ্গালার সমস্ত শিক্ষাকে নিজেদের মত অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিতে' চান। 'তাঁরা ঠিকই জানেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু সংস্কৃতির অজেয় দুর্গ ও শিক্ষাকেন্দ্র। 'শুদ্ধি' করিবার প্রয়াসের ন্যায় অত্যন্ত নিন্দনীয় গোঁড়ামি বলিয়া মনে করি।' বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডে হিন্দু ও মুসলমান সদস্যের অনুপাত নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে মুসলমান সদস্য কম থাকবে—হিন্দুদের এই মতের বিরুদ্ধে 'বঙ্গভূমি' বলেছে :

> মুসলমান হইলেই যে অযোগ্য হইবে এবং হিন্দু হইলেই যে যোগ্য হইবে, এ ধারণা অন্যায়। ঢাকা শিক্ষা-বোর্ডেও উপযুক্ত সংখ্যক মুসলমান আছেন ; কিন্তু বোর্ড কি হিন্দুদিগকে কোন প্রকারে জব্দ করিয়াছেন কিংবা শিক্ষা বিষয়ে অসুবিধায় ফেলিয়াছেন ? এইরূপ দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারিবে কি? আপত্তি হইয়াছে যে, মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। অতএব বোর্ডে তাহাদের সংখ্যা নগণ্য থাকাই কর্তব্য। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পদ্ধতি মুসলমানদের শিক্ষাবিষয়ে অবনতির একটি কারণ। বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন, সমস্ত মুসলমান সমাজ তাহা তাঁহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুকূল মনে করিতে পারেন নাই ; এইজন্য তাঁহারা হিন্দু সমাজের ন্যায় উৎসাহের সহিত সেই শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি দেশের মঙ্গলের জন্য একান্ত প্রয়োজন, ইহা প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি মনে করেন। এবং এই জন্যই বোর্ডে উপযুক্ত পরিমাণ মুসলমান সদস্য প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হবে, স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে—ইত্যাদি অজুহাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল বোর্ড প্রতিষ্ঠার কুযুক্তি খণ্ডন করে 'বঙ্গভূমি'র মন্তব্য :

> দেশ স্বাধীন না হইলে, কখনই দেশের শিক্ষা স্বাধীন হইবে না, ইহা আমরা বুঝি, এবং তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করাও কর্তব্য মনে করি। কিন্তু বর্তমানে স্বাধীনতার মিথ্যা দোহাই

www.pathagar.com

দিয়া প্রস্তাবিত বোর্ডকে চিরকালের জন্য স্থগিত রাখার চেষ্টা কেবল যে সাম্প্রদায়িক দুষ্টবুদ্ধির জন্য কিংবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যায় স্বার্থের জন্য, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি নিশ্চয়ই মুসলমান সমাজের আছে। প্রস্তাবিত বোর্ডের সমস্ত নিয়ম সঙ্গত আমরা তাহা বলি না। যাহা অসঙ্গত, তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন আনিয়া বোর্ডকে বাধা দেওয়া গোঁড়ামি মাত্র। আমরা গোঁড়ামিকে ঘৃণা করি।[৪]

বঙ্গভূমি চতুরঙ্গ সওগাত সাইজের পত্রিকা হলেও এক কলামে লেখা ছাপা হত। মুদ্রণ-পারিপাট্য ভাল, মুদ্রণ-প্রমাদ বেশি নেই। সাদা কাগজের পত্রিকা। ঢাকা থেকে প্রকাশিত। রুচিশীল একটি মাসিক ছিল। কিন্তু বেশিদিন চলেনি। আর দুটো সংখ্যার বেশি সংরক্ষিতও নেই। পাওয়া গেলে একটি ভাল পত্রিকা ছিল বলে এতে মুদ্রিত রচনার দ্বারা সেকালের অনেক কথা জানা যেত।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অভিভাষণ, বঙ্গভূমি, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৪, পৃ. ১-৫।
২. দীনেশচন্দ্র সেন, 'পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজ' এর সাহিত্য-সভায় প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, বঙ্গভূমি, ১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪, পৃ. ২৪৯-৫৩।
৩. সম্পাদকীয়, উপরিউক্ত, পৃ. ৩৩৩-৩৪।
৪. উপরিউক্ত, পৃ. ৩৩৪।

www.pathagar.com

১৬. শীশ্-মহল
(কলকাতা, ১৩৪৬–৫০)

'শীশ্-মহল' পত্রিকাটিকে শিখার উত্তরসূরি মুসলিম সাহিত্যপত্র হিসেবে বিবেচনার জন্য মোতাহের হোসেন চৌধুরীর (১৯০৩–৫৬) একটি পত্র আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি কবি আবদুল কাদিরকে (১৯০৬–৮৪) একটি পত্রে লিখেছিলেন :

> শীশ্-মহলের প্রতি আমার মমতার কারণ, এই যে, তাতে আমার মনের প্রতিধ্বনি খুঁজে পেয়েছি। সেইজন্য শীশ্-মহলের লেখকগোষ্ঠীকে আমি আত্মীয় বলে গ্রহণ করি। আমাদের দলের লেখকগণ শীশ্-মহলের ভিতর দিয়ে ক্রমান্বয়ে আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করলে আমি খুশি হব।... অবশ্য একথা সত্য যে, আমাদের দলে বলতে যে দলটি মনে পড়ছে, সেটি আর পূর্বের মতো বড় নেই, অনেক ছোট হয়ে গেছে। রাজনৈতিক মতভেদই তার কারণ। সাহিত্যের উপর রাজনীতির প্রভাব প্রচুর।... রাজনৈতিক আদর্শ মানে জীবনের আদর্শ, আর এই জীবনাদর্শের পার্থক্যই আমাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করছে ও করবে। তাঁদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এই যে, তাঁরা রাজনীতিতে তথা জীবনাদর্শে ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়কে বড়ো করে দেখছেন, আমরা মনুষ্যত্বকে বড়ো করে দেখছি। ধর্ম সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মনুষ্যত্বধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত মুক্তবুদ্ধি প্রেমিক মানবসমাজই আমাদের ধ্যান-ধারণার বস্তু। ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়কে বড়ো করে দেখতে আমাদের আপত্তি এই যে, তাতে করে অন্ধতা ও অপ্রেমকে প্রশ্রয় দেয়া হয় এবং জীবনের প্রগতি বা বিকাশের মূলে যে মুক্তবুদ্ধি তাকে টুটি টিপে হত্যা করা হয়। একথা সত্য কি মিথ্যা, একবার কলকাতার আপিস ঘর ছেড়ে মফস্বলে তসরিফ আনলেই তাঁরা তা টের পাবেন। কলকাতা থেকে উপলব্ধি করা অসম্ভব।[১]

মোতাহের হোসেন চৌধুরী ঐ পত্রে আরও বলেন, 'জানি মুক্তবুদ্ধির বাণী সহজ ব্যাপার নয়, কঠিন ব্যাপার, তবু সেই কঠিন পথই আমরা বেছে নিয়েছি। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যেন আমরা সেই পথ ত্যাগ না করি। সেই কঠিন পথের যাঁরা পথিক, তাঁরা আমাদের বন্ধু; শীশ্ মহলের মারফত তাঁদের হৃদয়ের উত্তাপ উপলব্ধি করতে পারলে খুশী হব।'[২]

শীশ্-মহলের প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শেষাংশ থেকে বেশ কিছু সংখ্যা অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের কয়েকটি সংখ্যা পাওয়া গেছে, তারই একটিতে (চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায়) তৃতীয় বর্ষের বর্ষ সূচিটি মিলেছে। ফলে এই বর্ষসূচি ও চতুর্থ বর্ষের একটি সংখ্যা অবলম্বন করেই 'শীশ্-মহল'-এর ওপর আলোচনা করতে হবে।

প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি না-পাওয়ায় এর ঘোষিত উদ্দেশ্য-আদর্শ সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে একজন সিরিয়াস পাঠক, এবং শিখা গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর উপর্যুক্ত মূল্যায়ন থেকে পত্রিকার চারিত্র উপলব্ধি করতে সহায়ক হয়। তাছাড়া প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোতে মুদ্রিত রচনায়ও এর কিঞ্চিৎ পরিচয় দুর্লভ্য নয়। এর গল্পগুলো কল্লোল-প্রভাবিত। রাজনৈতিকভাবেও সেগুলো সচেতন। সমকালীন জাতীয়তাবাদী-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এঁরা হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামী। কিছুটা সংস্কার-মুক্ত। বাংলার বাজেট প্রসঙ্গের আলোচনায় সে-কথা স্পষ্ট হয়েছে :

www.pathagar.com

...হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী আমরা বাংলার ঘোর দুর্দিনেও প্রচার করিয়া আসিতেছি। আর তাহাই হইতেছে আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য। বাংলা-সরকার এ-বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন উহা অবশ্য অত্যন্ত সুখের বিষয়।

...তবে ইহাও আশা করি যে, এ আর পি কর্মী ও কর্মকর্তা প্রভৃতি নিয়োগের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবিটির বিষয়টিও তাঁহারা ভুলিবেন না।[৩]

বলাবাহুল্য, সাহিত্য সংস্কৃতির আদর্শরূপে তাঁদের সামনে ছিল কলকাতার বৃহত্তর বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগৎ। গোঁড়ামী তাঁদের অপছন্দ, আর আধুনিকতার প্রতি রয়েছে প্রবল টান। কাজী আবদুল ওদুদ, এস. ওয়াজেদ আলি, অন্নদাশংকর রায়, দিলীপকুমার রায়, বিনয়কুমার সরকার, আবুল ফজল, এবনে গোলাম নবী, এম. আকবর আলি, কাদের নওয়াজ, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, কবিশেখর কালিদাস রায়, জাহানআরা বেগম, ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল মুখোপাধ্যায়, বন্দে আলী, মবিনউদ্দিন আহমদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম হামিদা খাতুন, বেগম নূরন নাহার, মহিউদ্দীন, মাহবুব উল আলম, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, মফিজউল হক, মুকররম হোসেন, মোহাম্মদ শমসের আলী, মনসুর আহমদ, রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলবালা ঘোষজায়া, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রমুখ উভয় সম্প্রদায়ের লেখক শীশ্-মহলে লিখেছেন।

হিন্দু লেখক কতোজন আর মুসলমানই বা কজন-এ হিসেব নিতে গেলে হিন্দু লেখকদের সংখ্যা ও তাঁদের লেখার পরিমাণ বেশিও হয়ে যেতে পারে। কলকাতার পরিবেশে আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মুসলমান সম্পাদকদের সঙ্গে হিন্দু-কবি-সাহিত্যিকদের সুসম্পর্ক বা বন্ধুত্ব ছিলো ; একত্রেই সাহিত্য সাধনা ও দেশমুক্তির সংগ্রাম তাঁরা পরিচালনা করেছেন, এসব কথা মনে রেখে এসব পত্রিকা পাঠ করতে হবে। আরও মনে হয়েছে, এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৯ সনের দিকে, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পাকিস্তান আন্দোলন এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রাম উভয়ই জোরদার হয়েছে। নজরুল ইসলামও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এবং তাঁর লেখা কমে গেছে। তিনি ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন গান রচনায়, গান রেকর্ডিংএ, এবং দৈনিক নবযুগ পত্রিকা সম্পাদনায়। কিছুদিন পর তিনি অসুস্থই হয়ে যান (১৯৪২)।

শীশ্-মহল এর চতুর্থ বর্ষ চলছে ১৯৪২ সনে। ফলে প্রথম দিককার পত্রিকা না পাওয়ায় এবং শেষ দিকে কবি নজরুল অসুস্থ হওয়ায় শীশ্-মহলে তাঁর রচনা দৃষ্ট হয় না। তৃতীয় বর্ষের বর্ষসূচির কোথাও নজরুলের নাম নেই। তৃতীয় বর্ষ ১৯৪১ সনে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে বের হয়, তখন নজরুল সক্রিয়। কি কারণে শীশ্-মহলে তাঁর লেখা নেই? উপরন্তু লক্ষণীয় যে, নজরুল ইসলামকে এঁরা অকরুণ সমালোচনার বাণে বিদ্ধ করেছেন। বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককেও খোঁচা মারতে ছাড়েননি তাঁরা। 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশের প্রসঙ্গেই এই ব্যঙ্গ । উল্লেখ্য, নবযুগের ফাইল দুষ্প্রাপ্য। 'শীশ্-মহল' থেকে এই পত্রিকার ইতিহাসও কিছু জানা গেলো :

বর্তমান ভারতবর্ষ চরমপন্থীর যুগ। হয় মুসলিম লীগ, না হয় হিন্দু মহাসভা। যাঁহারা এই উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন বিপদ তাঁহাদেরই। ভারত সমাজে তাঁহাদের স্থান নাই। যাহারা মধ্যপন্থী শান্তিই তাহাদের একমাত্র কাম্য। তাই বাংলার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় ফজলুল হক সাহেব হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি

www.pathagar.com

রক্ষার নিমিত্ত যে 'নবযুগ'-এর সূচনা করিতেছেন তাহা আমাদের প্রাণে আশা ও আনন্দের আলোড়ন আনিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় বলিয়াছেন, "বাঙলাদেশে আমরা নূতন যুগের সূচনা করিতে চাই। বাঙলার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে এবং বাঙালীকে জগৎ সভায় তাহার ন্যায্য আসনে আমরা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। আমরা চাই বাঙলা তাহার বিধাতৃনির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করুক ও নিজের ভাগ্য গড়িয়া তুলক।"—হক সাহেবের এই উক্তি সার্থক হউক ! নবযুগ যেন সত্যই নবযুগের উদ্দেশ্য সাধন করে।

'সাময়িক প্রসঙ্গ' বিভাগে আবার মন্তব্য করা হয় :

"বাঙলার প্রধানমন্ত্রী 'নবযুগ' বাহির করিতেছেন। বলাবাহুল্য ইহা সংবাদপত্র। চারিদিকে আমাদের জীবনে আজ নবযুগের প্রকাশ দেখা যাইতেছে। এমন ব্রাহ্ম-মুহূর্তে নবযুগের সূচনা খুবই সময়োচিত। হক সাহেব বিচক্ষণ বুদ্ধিমান বলিতেই হইবে। যথাযোগ্য মুহূর্তকে এমন খপ্ করিয়া ধরিবার যোগ্যতা তাঁহার মত আর কাহারও আছে কিনা তাহা আমাদের জানা নেই। মুহূর্তকে তিনি অনেক বারই ধরিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা মুহূর্তে পর্যবসিত হইয়াছে। খপ্ করিয়া ধরার ইহাই বিপদ। একটু ধীরে সুস্থে ধরিলে নাকি এইরূপ হয় না। যাহা হউক মি. ফজলুল হক পরিচালিত ও বিদ্রোহী কবি (প্রাক্তন) নজরুল সম্পাদক—এই মণিকাঞ্চন সংযোগে নবযুগের আবাদ জমিয়া উঠিবে এমন সন্দেহ করিবার দৃঢ়তা (কারণ আইনের ভয়ও যে না থাকিবে তাহা নহে) কাহারও আছে আমরা আশা করি না। বাংলাদেশ সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা ; সুতরাং আবাদ ভালই হইবে আশা করাও মিথা নহে। তবে একটা কথা যথাসময়ে বলিয়া রাখা ভাল যে—'হক-কথা'র আবাদ আর না হইলেই ভাল। কথার স্থানে ধানের চাষ হইলে বাঙালী খাইয়া বাঁচিবে।

'নবযুগ' কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের নবযুগের বাহন না হইয়া জাতির নবযুগের বাহন হইলেই মঙ্গল।"[৪]

সেকালের ইতিহাসের উপকরণ সরবরাহ করায় এর সাহিত্যিক তাৎপর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সাহিত্য ও মুক্তবুদ্ধি' ও অন্যান্য রচনা ; কাজী আবদুল ওদুদের 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ' ও 'বাঙালী মুসলমানের আদর্শ' (প্রবন্ধ) প্রভৃতি ও অন্যান্য রচনা এবং লীলাময় রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধ এই পত্রিকার অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী বিশিষ্ট চারিত্রই তুলে ধরেছে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর (১৩৪৮ এর শ্রাবণ) প্রকাশিত সংখ্যাগুলোতে রবীন্দ্রপ্রয়াণে হিন্দু ও মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের অসংখ্য রচনা শীশ্ মহলে ছাপা হয়েছে। ফলে এই পত্রের রবীন্দ্রানুরাগের ব্যাপারটিও লক্ষণীয়। আরও যেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহলো তর্ক-বিতর্ক তাঁরা মুক্তমনে ছেপেছেন। নারী স্বাধীনতা ও পণপ্রথা বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতার আধুনিক শিক্ষিতা মুসলিম লেখিকারা এ-তর্কে অংশগ্রহণ করেছেন।

কাজী আবদুল ওদুদ এর স্বচ্ছদৃষ্টির কয়েকটি লেখা শীশ্-মহলও ছেপেছে। 'বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন :

"বাঙলাদেশের মুসলমানদের আমরা বাঙালী মুসলমান বলবো না মুসলিম বাঙালী বলবো?....এ বিষয়ে আজ বাংলার মুসলমান, অন্তত বাংলার শিক্ষিত মুসলমান, নিঃসন্দেহ

www.pathagar.com

যে তাঁদের একটি সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে ; সে স্বাতন্ত্র্য তাঁদের রক্ষা করতে হবে। এ পর্যন্ত তাঁরা এই স্বাতন্ত্র্যের কথা ভেবেছেন প্রধানত বাংলার হিন্দু সম্পর্কে। আজ তাঁদের কারও কারও মনে একথাও জেগেছে যে ভারতবর্ষে অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে তুলনায়ও তাঁদের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে।... বাংলার মুসলমান... যে সংস্কৃতির ব্যাপারেও নিজেদের স্বতন্ত্র ভাববে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ; তবে কথা হচ্ছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যান্য সমাজের সঙ্গে তাঁদের যে পার্থক্য তা প্রধান না অপ্রধান।"[৫]

'শীশ্-মহল' একটি উন্নতমানের সাহিত্যপত্র ছিলো। কাজী আবদুল ওদুদ ও লীলাময় রায়ের লেখা তাঁরা লাভ করেছেন। এই পত্রিকায় লিখতে গিয়ে কারও মনে হয়নি যে, তা সম্পাদক ছাপতে পারবেন না। ফলে এর রচনাগুলো আকর্ষণীয়, নতুন স্বাদের হয়েছে। প্রচ্ছদ ও ছাপা ইত্যাদি ছিল পরিচ্ছন্ন সাহিত্য পত্রিকার ন্যায়। ভিতরের লেখাগুলো সচিত্র, রেখা সম্বলিত ছিল। ১৩৪৬ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত বের হলেও এতে অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে, বলতেই হয়। গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধগুলোর সাহিত্যিক মানও ছিল ভাল। মনে হয়, ১৩৫০ এর মন্বন্তরের কবলে শীশ্-মহলের মৃত্যু ঘটে।

'শীশ্-মহল'-এর প্রচ্ছদে লেখা থাকত 'অনাগত ভবিষ্যতের অগ্রদূত'। মাসিক পত্রিকা হিসেবে রেজিস্টার্ড ছিল (নং সি ২৬২০)। সম্পাদক রকিবুস সুলতান, বি.এ.। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। সডাক বার্ষিক দুই টাকা দুই আনা। ৬/১, হায়াত খাঁ লেন, কলকাতা থেকে বের হতো। সাদা কাগজ, দুই কলাম, প্রবাসীর সাইজ। টাকা পয়সা ও বিজ্ঞাপন ব্যাপারে ম্যানেজার ২১ পাটুয়াটোলা লেন, কলিকাতার সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। এ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং এ.সি. সরকার কর্তৃক দি ক্লাসিক প্রেস ২১ পাটুয়াটোলী লেন থেকে মুদ্রিত হতো। পরে ঠিকানা পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত সম্পাদকীয় ঠিকানা ছিল ১৩৩ সি আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

তথ্যনির্দেশ

১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, সাহিত্য ও মুক্তবুদ্ধি (কবি আবদুল কাদিরকে লিখিত পত্রের অংশ), শীশ্-মহল, ৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪৮, পৃ. ৪২৪।

২ উপরিউক্ত।

৩. সাময়িক প্রসঙ্গ, শীশ্-মহল, ৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪৮, পৃ. ৩৪৩।

৪. সাময়িক প্রসঙ্গ, শীশ্-মহল, ৩ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৮, পৃ. ২৮০।

৫. কাজী আবদুল ওদুদ, বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি, শীশ্-মহল, ৩ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৮, পৃ. ২৪৩।

www.pathagar.com

১৭. প্রতিভা

(চট্টগ্রাম, ১৩৪২–)

ত্রিশের এবং চল্লিশের দশকের শিক্ষিত, সমাজ-মনস্ক মুসলমানদের মধ্যে কবি, সাংবাদিক ও সমাজসেবী আবদুস সালাম এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, একটি সাপ্তাহিক (অভিযান) ও মাসিকপত্র প্রতিভা সম্পাদনা ছাড়াও তখনকার পত্রপত্রিকায় (অধিকাংশই মুসলিম-সম্পাদিত) তাঁর রচনা প্রায়ই চোখে পড়ে। কিন্তু তাঁর নাম চট্টগ্রামের পরিসর থেকে সর্ববঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

ঢাকার বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে দেখা যায়, পুরনো পত্রপত্রিকার সঙ্গে 'প্রতিভা' নামের একটি মাসিক পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি সংরক্ষিত রয়েছে। এটির গায়ে ভাদ্র ১৩৪২ সন তারিখ লেখা। সম্পাদক : আবদুস সালাম। প্রতিভা কার্যালয় : মুসলিম হল, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। এই একই ঠিকানা থেকে আবদুস সালাম সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক জনমত' বের হতো।

সে যাহোক, প্রতিভা নিয়মিত মাসিক হিসেবে প্রকাশের অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিসংখ্যা তিন আনা, বার্ষিক মূল্য দুই টাকা চার আনা ধার্য করা হয়েছিল। পত্রিকার পরিচালক হিসেবে নাম ছাপা হয়েছিল মোহাম্মদ আয়ুব খাঁ ও এ.কে. এম. ওবায়দুল্লাহ্‌র। 'পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ' নামে ২৭ জন বিশিষ্ট শিল্পপতি বুদ্ধিজীবী, সরকারি চাকুরে এবং লেখক-সাহিত্যিকের নাম ছাপা হয়েছিল।

এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-৮২), আবদুল কাদের (কাদির, ১৯০৬-৮৪), সাদত আলী আখন্দ, মাহবুবউল আলম (১৮৯৮-১৯৮১) এবং আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩)-এর নাম। পত্রিকার ভূমিকায় লেখা হয়েছিল : '... এ নবযুগের নব নবীনদের তারুণ্য প্রতিভা বিচ্ছুরণের একমাত্র ও অন্যতম বাহন হবে আমাদের নববিকশিত এ প্রতিভা।'

পত্রিকাখানির লেখক তালিকায় রয়েছেন মিসেস ইউসুফ শামসুন্নাহার (কবি দিদারুল আলমের স্মৃতিসভায় প্রদত্ত সভানেত্রীর অভিভাষণ) ; আবুল ফজল (গল্প, গল্পের নায়িকা) ; কলিমউদ্দীন আহমদ (গল্প, হীরা) ; এম. আবদুর রউফ (প্রবন্ধ, সংবাদপত্রে মুসলিম চাটগাঁ) ; আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (প্রবন্ধ, পারসিক আখ্যানমালা) ; শ্রী আশুতোষ চৌধুরী (কবিতা, আমি) ; মাহবুবউল আলম (প্রবন্ধ, শাহ মোহাম্মদ বদিউল আলম) ; এ. কে. এম. কমরউদ্দীন (কবিতা, পরশ প্রভাব) ; দিদারুল আলম (কবিতা, নবীন ভারতের গান) ; শামসের আল আজাদ (প্রবন্ধ, প্রতিভা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা) ; আবদুস সালাম (প্রবন্ধ, গৌড়-কবি) ; ফকির আহমদ (অনুবাদ, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম) ; মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ (ঔপন্যাসিকা, মুক্তবাণ) ; এ. কে. এম. ওবায়দুল্লাহ্ (প্রবন্ধ, বিশ্ব-সভ্যতায় মুসলমান) ; ওহিদুল আলম (কবিতা, সাধ) ; আবদুস সালাম (গল্প, যবনিকা) ; মোহাম্মদ দন্ত-স (ছদ্মনাম ; প্রবন্ধ, প্রগতির গতি) ; আনোয়ার হোসেন (প্রবন্ধ, শিক্ষা-সমস্যা) এবং চলন্তিকায় আলোচনা হয় সমকালীন প্রসঙ্গে।

www.pathagar.com

লেখক ও বিষয়বস্তুর তালিকা থেকে পত্রিকাটিকে নেহায়ৎ ফেলে দেবার মতো মনে হয় না। কিন্তু এর অপরাপর সংখ্যাগুলো অনুসন্ধানেও পাওয়া যায়নি বলে বিস্তৃত বর্ণনা করা গেল না।[১]

তথ্যনির্দেশ

১. ঢাকার বাংলা একাডেমীর 'শহীদুল্লাহ্ গবেষণাকক্ষে' পত্রিকাটি দেখতে পাই।

www.pathagar.com

১৮. নব্য বাংলা
(১৩৩৯, চৈত্র)

'নব্য বাংলা' নামের একটি পত্রিকার আংশিক (১৬ পৃষ্ঠা) পাওয়া গেছে। কিন্তু এর রচনার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় কলকাতা থেকে প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকা এটি।

কামালউদ্দীনের প্রবন্ধ 'নারীপ্রগতি' ; শ্রী উপেন্দ্রমোহন দাস এর প্রবন্ধ 'সাময়িক সাহিত্য' ; শ্রী বীমাচার্য্য, প্রবন্ধ 'বীমা-প্রসঙ্গ' ; কাজী নজরুল ইসলাম এর গান—'কোন কুসুমে তোমায় আমি পূজিব নাম বল' ; শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এর প্রবন্ধ 'নূতন বাঙালী কি চায়?' এবং আবুল হুসেন এম.এ. এম. এল. এর বক্তৃতা, 'সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য' 'নব্য বাংলা'য় ছাপা হয়েছিল।

এই পত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত প্রীতি-সম্ভাষণের উত্তরে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের তরফে আবুল হুসেনের বক্তৃতার সারাংশ ছাপা হয়েছিল। এ থেকে মনে হয়, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ আবুল হুসেনকে সম্মান জানিয়েছিল কোনো অনুষ্ঠান করে। আর শ্রী শচীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বি.এ.র 'বাংলার জাগরণ' শীর্ষক একটি আলোচনায় মুসলমান সমাজের নবজাগরণের পরিচয় দেয়া হয়েছে।

বিশেষ করে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', 'শিখা গোষ্ঠী' তথা কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন এবং 'সওগাত', 'তরুণপত্র', 'অভিযান', 'যুগের আলো', 'মাসিক জাগরণ' প্রভৃতি পত্রিকার ভূমিকা নির্ণয় করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লেখক বুদ্ধিজীবীদেরকে ঐ সমস্ত পত্রপত্রিকা ও সংগঠনের মাধ্যমে মুসলমান সমাজের চিন্তাচর্চার খবর রাখবার অনুরোধ-আহ্বান জানানো হয়েছিল।

মুসলমান সমাজের এই সমস্ত উদ্যোগ ও তৎপরতা সম্পর্কে হিন্দুদের অজ্ঞতা বেদনাদায়ক বলেও মন্তব্য করেন লেখক। এই প্রবন্ধের তিনটি অনুচ্ছেদে কাজী আবদুল ওদুদ লিখিত ও মাঘ ১৩২৯ এর মোহাম্মদীতে প্রকাশিত আত্মকথা জাতীয় প্রবন্ধের ওপর দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। ১৩২৯ মানে ১৯২৩ সন।

এই সময়ে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের সারথীবৃন্দ, বিশেষ করে কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেন প্রতিক্রিয়াশীলদের ভীষণ আক্রমণের সম্মুখীন হন এবং সাফাই বা কৈফিয়ৎ-জাতীয় অনেক লেখা তাঁদেরকে লিখতে হয়। মোহাম্মদী-গ্রুপের আক্রমণের প্রেক্ষিতে এই সমস্ত ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ৎ মোহাম্মদীতে কিছু ছাপা হয়েছে।

সেইসব রচনার প্রসঙ্গে 'নব্য বাংলা'য় প্রগতির পক্ষে দৃষ্টি রেখে আলোচনা চলতো বলে মনে হয়। আরও মনে পড়ছে 'নব্য বাংলা' নামে মুসলমানদের একটি পত্রিকা যে বের হতো— তা মুসলিম সাময়িকপত্রের আলোচনাসমূহেও চোখে পড়েছে।[১]

তবে দুর্ভাগ্য, এর একটি সংখ্যাও অখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেলো না। হয়ত কোনো দিন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।[২]

এর সাহিত্যিক মান উন্নত ছিল।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২ 'নব্যবাংলা'র খণ্ডিত ফাইলটি বাংলা একাডেমী, ঢাকার 'শহীদুল্লাহ্ গবেষণাকক্ষে পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থাগারে খুঁজলে হয়ত আরও তথ্য মিলবে।

www.pathagar.com

১৯. রূপ-রেখা
(কলকাতা, ১৩৩৯-৪২)

২০. বর্ষবাণী
(কলকাতা, ১৩৪২-৫৭)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদপুষ্ট এবং তাঁরই প্রদত্ত নাম ধারণ করে উল্লেখযোগ্য একটি বার্ষিকপত্র—'রূপ-রেখা' সম্পাদনা করতেন বেগম জাহানআরা চৌধুরী (১৯১৩-৮২)। তাঁর অগ্রজ আলতাফ চৌধুরীর স্নেহানুকূল্যে বা উৎসাহে এটি বের হত ১৩৮, লেকরোড, বালিগঞ্জ থেকে। প্রথম সংখ্যা ১৫৪ পৃষ্ঠার ছিল 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সাইজে। ছাপা হত শ্রীকৃষ্ণ প্রিটিং ওয়ার্কস, ২৫৯ আপার চিৎপুর রোড, কলকাতা থেকে। জাহানআরা চৌধুরী 'রূপ-রেখা' এবং 'বর্ষবাণী' নামে দুটি বীর্ষক পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে ত্রিশের দশকে কলকাতার সাহিত্যমহলে বিশেষ পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

অভিজাত সুন্দরী ভদ্রমহিলা জাহানআরা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কাজী নজরুল ইসলামসহ কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক সমাজ ও সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং বাঙালি মুসলমান মহিলা হিসেবে আধুনিকতার ক্ষেত্রে তাঁরাও যে পিছিয়ে নেই, তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। অতি আধুনিকদের পত্রপত্রিকায় (যেমন আশু চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অগ্রগতি' এবং রকিবুস সুলতান-এর 'শীশ্-মহল') জাহানআরা চৌধুরী নানাভাবে সমালোচিত, অর্থাৎ স্থূল আক্রমণ বা স্ক্যান্ডালের শিকার হয়েছেন। তাঁর দুটি পত্রিকাতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান ও নবীন লেখক লেখিকাদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

জাহানআরার পৈত্রিক আদি বাড়ী মালদহ জিলায়। সাজ্জাদ আহমদ চৌধুরী তাঁর পিতা। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার জমিদার ছিলেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়ের উপাচার্য স্যার, এ. এফ. রহমান ছিলেন তাঁর ভগ্নিপতি। জাহানআরা তাঁর বড়ো ভাই আলতাফ চৌধুরীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।[১] এবং তাঁর চিঠি বা শুভেচ্ছাবাণী কিংবা পুরনো কবিতা ছেপে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'রূপ-রেখা' এবং 'বর্ষবাণী'র সংশ্লিষ্টতা রেখেছিলেন। এই সুবাদে আশু চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অগ্রগতির' সাময়িক-প্রসঙ্গ বিভাগে তাঁকে নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গও করা হয়েছে।

আলতাফ চৌধুরী (১৯০৬-?) বিলেতী শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মুসলমান, সংস্কৃতিসেবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিছু কিছু বাংলা লেখা পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হলেও 'লেখক' হিসেবে খ্যাতিমান হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচনার প্রশংসা করে চিঠি লিখলেও দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যের সেবক হিসেবে তিনি অনুশীলন অব্যাহত রাখেন নি।

জানা যায়, আলতাফ চৌধুরী ১৯১৭ সনে শান্তিনিকেতন স্কুলের ছাত্ররূপে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং ১৯১৯-২০ সনে রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় বসবাসকালে তিনি জোড়াসাঁকোতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। কবির সঙ্গে আমৃত্যু (১৯৪১) তিনি সংযোগ রক্ষা

www.pathagar.com

করে চলেছিলেন। দশ বারোটি চিঠিও তিনি কবির কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন 'রূপ-রেখা'র মুদ্রক ও প্রকাশক।

১৯৩১-৩২ সনে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে Welfare ইংরেজি সাপ্তাহিকের সম্পাদনা করেন এবং 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। The Statesman পত্রিকায় কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেন (১৯৩০-৩১)। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ (১৯৩৩-৩৫) ও বিহার ন্যাশনাল কলেজ (পাটনা, ১৯৩৬-৩৭)-এ অধ্যাপনাও করেন। সরকারী কাজে এবং ব্যবসার সঙ্গে সংযুক্ত আলতাফ চৌধুরী কলকাতার শিক্ষিত মহলে সুপরিচিত ছিলেন।[২]

'রূপ-রেখা' এবং 'বর্ষবাণী'র প্রসঙ্গে আলতাফ চৌধুরীর কথা না বলে পারা যায় না, কারণ ছোট বোনের হয়ে খাটুনির কাজ অনেকটা তিনিই করতেন।

'রূপ-রেখা'র দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩৩৯ ও ১৩৪১ বঙ্গাব্দে। ১৩৪২ সনে পূর্বের ধারাবাহিকতায় 'বর্ষবাণী'র তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় একই সম্পাদক ও প্রকাশকের নামে। অন্তত বারোটি বার্ষিক 'বর্ষবাণী' বের হয়েছিল বলে জানা যায়।[৩] ১৩৪৭ সনে ৯ম বর্ষ প্রকাশের পর দশ বৎসর বন্ধ থেকে ১৩৫৭-তে বর্ষবাণীর ১০ম বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তখন তিনি বিবাহিত এবং নামের আগে 'বেগম' যুক্ত হয়ে ছাপা হত 'বেগম জাহানআরা খান'। ৯বি লর্ড সিংহ রোড থেকে আলতাফ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি-১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলকাতা হতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য তিনটাকা বার আনা।[৪]

'রূপ-রেখা'র প্রথম বার্ষিক সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবেদনে বলা হয় :

> কিছুকাল ধরে হিন্দু মুসলমানের রাষ্ট্রনৈতিক বৈষম্যের অনুরূপ একটি স্বাতন্ত্র্যবাদকে বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা চলেছে। আধুনিককালে সাহিত্যকে আশ্রয় করে এদেশে মানবচিত্তের যে উৎকর্ষসাধন হয়েছে ভেদ-নীতির দ্বারা তার বিনাশ ঘটবে এই আমাদের আশঙ্কা। মাটির বুকে যে ফুল ফোটে, যে শস্য ফলে, তার নীতি যেমন সহজ, উদার, সাহিত্যসৃষ্টির ধারাও তেমনি বাধাবন্ধনহীন। সাহিত্য সৃষ্টির এই মূল নীতির বিকৃতি ঘটতে দেওয়া উচিত নয়, এই আমাদের অভিমত, এবং 'রূপ-রেখা' প্রকাশ করার এটিই আমাদের প্রধান কৈফিয়ৎ।
>
> 'রূপ-রেখা' আমাদের লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত হাওয়ায় দেশের মন প্রাণ ক্লান্ত। এর ঊর্ধ্বে মাথা তুলে যাঁরা মানবতার বিশুদ্ধ স্তরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে চান, তাঁদের প্রথম মিলন ঘটবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হলেও, আমরা প্রত্যেকেই যে একটা বিরাট বিধানের এক-একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, অন্তরে অন্তরে যে আমরা সবাই এক, এইটে উপলব্ধি করতে হলে অন্তরের দিক দিয়ে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হওয়া চাই। সাহিত্যই এই পরিচয় ঘটাতে পারে, এবং এইখানেই এর সার্থকতা। 'রূপ-রেখা' এই বিপুল দায়িত্ব একা বহন করবার স্পর্ধা করছে না—সে সাধ্য তার নেই।
>
> 'রূপ-রেখা' একটা যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। সে বিনীতভাবে দেশের মনীষী এবং সহৃদয় লেখক-লেখিকা ও চিত্র শিল্পীগণকে নিমন্ত্রণ করেছে তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা করে। যাঁরা সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে সে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।....মেয়েদের

www.pathagar.com

তরফ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত করতে পারেন এরূপ লেখিকা আমাদের সকলের সমাজেই দেখা দিয়েছেন। তাঁদের সকলকে আহ্বান করবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। ইচ্ছা ছিল, মহিলা-বিভাগ পৃথক করে এই ধরনের লেখাগুলো এক সঙ্গে প্রকাশ করব। কারণ আমাদের বিশ্বাস, পুরুষ স্বার্থের ক্ষেত্রে যেমন সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাতে করে এই ভেদনীতির প্রাকার ক্রমশঃ দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে। সুতরাং মেয়েদের দিক থেকে এর পরিপন্থী কোনো অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত না করলে উপায় নেই।

'হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন না তুলে সকল সমাজের মেয়েরা যদি পরস্পর মেলামেশা করে একটা উৎকর্ষগত মিলনের সহজ ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে পারি, তাহলে বিভেদের বিভীষিকা স্বতই দূর হয়ে যাবে।

পুরুষ আমাদের আলো থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল, আমরা উদার আলোর স্বচ্ছ রূপটি এতদিন দেখিনি। পুরুষ এখনো অবরোধের মায়া এবং মুক্তির অর্থহীন ভয় কাটাতে পারেনি। তথাপি এই বিজ্ঞানের যুগের স্কুলে প্রথম পাঠ নিতে গিয়েই আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছে এ আলোরই সঙ্গে। আমরা তার উন্মুক্ত, উদার, সহজ রূপটি দেখেছি। সম্প্রদায়ের রূপ সে নয়, স্বার্থের রূপ সে নয়—তাকে ভাগ করা যায় না। সেই আলো আমাদের জীবনকে প্রকাশ করেছে—আমাদের হৃদয়কে বঞ্চিত করেছে,—আমরা সেই আলোতেই মানুষকে দেখেছি। সেই আলোকেই আমরা মানুষকে দেখব।[৫]

২

রূপ-রেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ দুটো চিঠি বা শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছিলেন, একটি ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা, 'মূল্যশোধ' নামে তা ছাপা হয়েছে প্রথম সংখ্যায়। দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় সংখ্যায় ছাপা হয় 'ওঁ' শিরোনামে, এই রচনাটি 'রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র' নামে ভূঁইয়া ইকবাল মুসলমান কবি-সাহিত্যিক-সম্পাদকদের কাছে লেখা পত্রের যে-সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তাতেও সংকলিত হয়নি পত্রিকার দুষ্প্রাপ্যতার কারণে। 'মূল্যশোধ' শীর্ষক আশীর্বাণীর কয়েকটি চরণ :

তোমাকে পেয়েছি বলে জেনেছিলেম,
কোনো দাম করোনি দাবী।
দিন গেছে রাত গেছে
দিয়েছে ডালি তোমার উজাড় করে।
প্রাণ ভরে উঠল বেদনায়
ঢেলে দিলেম তোমার উদ্দেশে।
এতদিন তোমার দাম দেওয়া হোলো
পেলেম তাই পূর্ণ করে।[৬]

'রূপ-রেখা'র প্রথম বর্ষে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আলতাফ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জলধর সেন ও বীরবল। প্রমথ চৌধুরী—(বীরবল) 'ভারতবর্ষ—যাদুঘর' শীর্ষক ক্ষুদ্র রচনাটিতে বলেন :

ভারতবর্ষের ইতিহাস যে লেখা হয়নি, তার কারণ ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস নেই। ইতিহাস অতীতের হয়, বর্তমানের হয় না। ভারতবর্ষের কোন অতীত নেই। কেননা

www.pathagar.com

ভারতবর্ষের সবই বর্তমান। সুতরাং যাঁরা হয় পুঁথির নয় মাটির ভিতর থেকে ইতিহাস বার করতে গেছেন—তাঁরা সময় ও পরিশ্রম দু-ই বৃথা ব্যয় করছেন।[৭]

'রূপ-রেখা'য় আরও যাঁদের লেখা ছাপা হয়, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বনফুল, ডা. আর. আহমদ, প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, পরিমল গোস্বামী, অতুলানন্দ চক্রবর্তী, প্রভাবতী দেবী স্বরস্বতী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাত কিরণ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, রাধারাণী দেবী, হাসিরাশি দেবী, বেনজীর আহমদ, গোলাম মোস্তফা, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ কুদরৎ-ই-খুদা, নরেন্দ্র দেব, কিরণকুমার রায়, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, ধরাসুন্দরী দেবী, অনুরূপা দেবী, মণীন্দ্রনাথ রায়, তারাদাস মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র রায়, সুফী মোতাহার হোসেন, শ্রী প্রভাত মোহন বন্দ্যোপ্যাধ্যায়, দৌলতুন্নেসা, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, সুফিয়া এন. হোসেন, জুলফিকার হায়দার, সরলা দেবী, প্রণব রায়, দেবীপ্রসাদ চৌধুরী, হুমায়ুন কবির, অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভা সেন, সজনীকান্ত দাস, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, বিনোদ চৌধুরী, জসীমউদ্দীন, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় এবং বিভাবতী সেন।

লক্ষণীয় ১৯৩২ সনে কলকাতা থেকে মুসলিম মহিলা পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে যথার্থই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে সাহিত্যশিল্পের মানদণ্ডে প্রতিভাধর লেখকদের রচনাই সংগ্রহ করেছিলেন। পত্রিকাটি যখন বের হয়, তখন কাজী নজরুল ইসলাম—যিনি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খ্যাতির অধিকারী আধুনিক,—মাত্র তেত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসরের ; জসীমউদ্দীন, হুমায়ুন কবির, বেনজীর আহমদ, গোলাম মোস্তফা, কুদরৎ-ই-খুদা, সুফী মোতাহার হোসেন, জুলফিকার হায়দার, দৌলতুন্নেসা, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, সুফিয়া এন. হোসেন (পরে কামাল) উঠতি, প্রতিশ্রুতিশীল কলকাতাবাসী মুসলমান সাহিত্যিক। তাঁদের সকলের রচনাই নেয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে এঁদের প্রত্যেকেই খ্যাতির শীর্ষ স্পর্শ করেছেন।

হিন্দু-মুসলমানের বিভেদাত্মক রাজনৈতিক সংকটকে তাঁরা সংকটই মনে করেছিলেন। সাহিত্যিকদের কোনো জাত বা ধর্মীয় গোত্র বিবেচনায় গ্রহণকে ঘৃণা করতেন জাহানআরা বা আলতাফ চৌধুরী। তাঁরা 'পাকিস্তান' হলে ভারত ত্যাগ করেননি। আলতাফ চৌধুরীর 'চিঠি' শীর্ষক রচনায় এই মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে। সম্পাদিকা, কনিষ্ঠা সহোদরাকে লেখা 'চিঠি'তে তিনি যে আলোচনা করেন, তার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'চিঠি' লিখে প্রতিক্রিয়া জানান। নিচে দুটো পত্র উদ্ধৃত করা হলো :

আলতাফ চৌধুরী লিখেছেন :

> কল্যাণীয়াসু, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্বন্ধে তত্ত্বকথা শুনাইবার মত পাণ্ডিত্য আমার নাই.. সাহিত্য বিচার আমার নাগালের বাহিরে। সেইজন্যই বোধ করি বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্বন্ধে ভাবিতে বসিয়া বেশী অগ্রসর হইতে পারিলাম না। তবু কেন পারিলাম না তাহার কৈফিয়ৎটা নিতান্তপক্ষে দিয়া রাখি।
>
> প্রথমত : কোন্ বস্তুটির যে তোমরা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' নামকরণ করিয়াছ তাহাই ঠাহর করিতে পারিতেছি না। বোধকরি মুসলমান সাহিত্যিক কর্তৃক রচিত সাহিত্যবস্তুকেই

www.pathagar.com

এই নামে অভিহিত করা হইতেছে। কিন্তু মুসলমান কবির রচনা গত দুই শতাব্দীর অধিককাল হইতে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে স্থান পাইয়া অমর হইয়া আছে (অমরকোষ দ্রষ্টব্য)। ইতিপূর্বে বহু মুসলমান সাহিত্য রচনা করিয়াও গিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল রচনাকে বিশেষভাবে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' আখ্যা দিয়া বাংলা সাহিত্যের মূলক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেহ কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া জানি না। যাঁহারা সাহিত্য রচনা করেন তাঁহাদের ক্ষেত্র ভাব ও ভাষার ক্ষেত্র। সেটা জাতি বা গোত্রের ক্ষেত্র নহে,—ধর্ম বা সংস্কারের ক্ষেত্রও নহে। সেখানে ভাবের বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে, কিন্তু বৈষম্য নাই। তোমরা যে নীতির বলে মুসলমানের রচিত সাহিত্যকে পৃথক করিয়া দিতে চাও তাহা সাহিত্যিকের কাম্য নহে ; সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকরত নহেই। মানুষের ধর্মজীবনে, রাষ্ট্রজীবনে, সামাজিক জীবনে এই ভেদনীতি অশেষ অকল্যাণ আনিয়াছে ; সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আনিবে।

কিন্তু কল্যাণই হউক আর অকল্যাণই হউক, বিচার করিয়া দেখিবার শুধু এইটুকু আছে যে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন হইতে মুসলমানের রচনাকে পৃথক করিয়া লইতে চাহিলেই তাহা পৃথক হইয়া যায় কিনা। আমার মনে হয়, যায় না। অবশ্য ইহা লইয়া শ্রেণী বিভাগ চলিতে পারে, কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তির মত বঙ্গভারতীকে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টানে মিলিয়া ভাগবাটোয়ারা করিয়া লওয়া বোধকরি আদৌ চলে না। যাহা পৃথক হইবার তাহা আপনি পৃথক হইয়া আছে। যেমন বাইবেলের বাংলা অনুবাদ ও সোনাভানের পুঁথি।...

ইংলন্ডে বহু মুসলমান আছেন ; ফ্রান্সেও বহু ফরাসি মুসলমান আছেন এবং তাঁহাদের অনেকে সাহিত্যসাধনাও করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনায় কালযাপন করিয়াছি, কিন্তু মুসলমান ইংরেজের রচিত সাহিত্যকে 'ইংরেজি মুসলিম সাহিত্য' অথবা ফরাসি মুসলমানের রচিত সাহিত্যকে 'ফরাসি মুসলিম সাহিত্য' বলিয়া আখ্যাত হইতে শুনি নাই। ইংরেজ সাহিত্যিক মুসলমান হউন, খ্রীষ্টান হউন বা য়ীহুদী হউন, ইংরেজী ভাষায় রচিত হইলে সাহিত্য সৃষ্টিকে 'ইংরেজী সাহিত্য' ছাড়া অন্যকিছু বলা চলে না। তেমনিই বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যসৃষ্টিকে 'বাঙলা সাহিত্য' ছাড়া অন্যকিছু বলা অস্বাভাবিক। ইউরোপের মুসলমানের সঙ্গে আমাদের মনোবৃত্তির এই প্রভেদটুকু লক্ষ্য করিবার বস্তু। সাহিত্যিক হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন ক্ষতি নাই, কিন্তু সাহিত্য যেন না মুসলমান হয় বা না হিন্দু হয়।

বঙ্গীয় মুসলমান 'ভাষা' বলিয়া যদি কিছু থাকিত, তবে তাহা লইয়া একটি নির্দিষ্ট চিরস্থায়ী বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য রচনা সম্ভব হইত। আব্বা, আম্মা, চাচা, নানী, ফুফু, অথবা গুলবদন, খুনখারাপ, শারাব প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করিলেই ভাষার জাত্যন্তর ঘটে না কিংবা তাহার ফলে রচনা বিশেষকে 'মুসলমান সাহিত্য' আখ্যা দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বীরবল, মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জলধর সেন প্রভৃতি সকলেই গল্পে, প্রবন্ধে, কবিতায় এরূপ শব্দ পুনঃপুন ব্যবহার করিয়াছেন। মুসলিম উৎকর্ষ, মুসলিম সংস্কার, মুসলিম ভাবধারা, চিন্তা বৈশিষ্ট্য অথবা মুসলমানের সামাজিক জীবন লইয়া বাংলা ভাষার সাহায্যে যদি সাহিত্য রচিত হয় এবং তাহাকেই যদি বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য বলিতে হয় তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে এরূপ সাহিত্য রচনা হিন্দু সাহিত্যিক দ্বারাও হইতে পারে ; এবং তখন তাহাকে মুসলিম সাহিত্যই বলিতে হইবে ; —রবীন্দ্রনাথের লেখনী নিঃসৃত এই শ্রেণীর রচনাকেও 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

তাহা হইলে তখন একথা বলিবার উপায় থাকিবে না যে 'মুসলিম সাহিত্য' শুধুই মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনা। জলধর দাদার 'করিম সেখ', শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

www.pathagar.com

'সর্বনাশের নেশা', বিহার গোস্বামীর 'পন্দনামা বা নীতিপত্র', মোহিতলালের 'বেদুঈন' ও 'নাদির শাহ', কান্তিচন্দ্রের ও নরেশদেবের 'ওমর খৈয়াম' সবই বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যে পরিণত হইবে। এবং অবশেষে তাহাই যদি হইল তবে মুসলিম সাহিত্য গড়িতে গিয়া বঙ্গভারতীর অঙ্গচ্ছেদ করিয়া কাহার কি পরমোপকার সাধিত হইবে তাহা আমার কাছে নিতান্তই দুর্বোধ্য। রবীন্দ্রনাথের 'শা' জাহান' কিংবা কবি জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ'-কে মুসলিম সাহিত্য বলার মত অনাবশ্যক আর কিছুই নাই।

কোন বিশেষ গুণ অথবা বস্তু-বিচার দ্বারা সাহিত্যের মুসলিমত্ব নির্ণয় করা হয়, এ-প্রশ্নের উত্তর কাহারও নিকট পাই নাই। 'নকশী কাঁথার মাঠে' কবি মুসলমান পল্লীগৃহে মোরগের বিচিত্র চারুরঞ্জিত পালকের শোভার বর্ণনা করিয়াছেন, আবার কালো রূপের বর্ণনাচ্ছলে লিখিয়াছেন 'কালোয় যে জন আলো করে মাতায় ত্রিভুবন, তারি পদরজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন'।

'মোরগ' যদি বা মুসলিম সাহিত্যে স্থান পায়, 'বৃন্দাবন' যে পাইবে না তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ 'ঈদের চাঁদ' শীর্ষক কোন কবিতা লিখিলে যদি তাহাকে মুসলমান সাহিত্য বলিয়া আমরা দখল করিয়া বসি তবে তাহার চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? রবীন্দ্রনাথের 'শা' জাহান'কে যদি আজ বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য বলিয়া বেদখল করিয়া বসি তবে সত্যই বঙ্গ স্বরস্বতীর ললাটে করাঘাত করিয়া কাঁদিবার দিন আসিবে—

আমি তুরগ' ভাবিয়া মোরগে চড়িনু লইল মিঞার ঘরে।

মোর কালী-মা' ছাড়ায়ে কলেমা পড়ায়ে বুঝি মুসলিম করে। (কাজী নজরুল ইসলাম)

সাহিত্য বাদ দিয়া ললিতকলার ক্ষেত্র যদি ধর, তবে কতকগুলি বিশিষ্ট রেখা বা বর্ণবিন্যাস পদ্ধতিকে অথবা বিশিষ্ট ভাব-ব্যঞ্জন পদ্ধতিকে 'ইসলামীয়-আর্ট' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আধুনিক মুসলমান চিত্রশিল্পী আবদুর রহমত চুঘতাই সাহেবের অঙ্কিত চিত্রগুলিকে বিশুদ্ধ 'মুসলিম আর্ট' বলা চলে না। সাহিত্যের বেলাতেও এই কথাই খাটে। বিষয়মূলক শ্রেণীবিভাগ করিয়া কোরাণ শরীফের বাংলা অনুবাদকে 'ইসলামী সাহিত্য' বলিতে পারা যায়, কিন্তু মুসলমান লেখকমাত্রের রচনা হইলেই তাহাকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' বলিয়া কেহ কোনও দাবী উপস্থিত করিয়াছেন কিনা জানি না। করিলেও তাহা অবান্তর হইত। মনে পড়ে কলিকাতায় ছাত্র জীবনে কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে একজন মুসলমান সংস্পর্শ-বিসর্জনকামী মাংস বিক্রেতা তাহার দোকানে লিখিয়া রাখিত 'এখানে হিন্দু পাঁঠার মাংস বিক্রয় হয়'। এই পরম হাস্যকর ব্যাপারটিতে হাসিতাম বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে নিরাশাও বড় কম ছিল না। সাহিত্যের মূল কথা হইল রসসৃষ্টি।...সাম্প্রদায়িকতাক্লিষ্ট মনের ক্ষুদ্রতা দিয়া যদি তাহার বিচার করিতে বসি তবে রসজ্ঞের সভায় স্থান মিলিবে না।[৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭ বৈশাখ ১৩৪১ তারিখে উপরিউক্ত 'চিঠি' পাঠ করে শান্তিনিকেতন থেকে আলতাফ চৌধুরীকে লিখেছিলেন মালদার ঠিকানায় :

কল্যাণীয়েষু, রূপ-রেখায় তোমার চিঠিখানি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা চলছে তার মতো বর্বরতা আর হতে পারে না। এ যেন ভাইয়ের উপর রাগ করে পারিবারিক বাস্তুঘরে আগুন লাগানো। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরুদ্ধতা অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের দেশভাষাকে পীড়িত করবার উদ্যোগ কোন সভ্য দেশে দেখা যায়নি।

www.pathagar.com

এমনতর নির্ম্মম অন্ধতা বাঙলা প্রদেশেই এতবড় স্পর্ধার সঙ্গে আজ দেখা দিয়েছে বলে আমি লজ্জাবোধ করি। বাঙলাদেশের মুসলমানকে যদি বাঙালী বলে গণ্য না করতুম তাহলে সাহিত্যিক এই অদ্ভুত কদাচার সম্বন্ধে তাঁদের কঠিন নিন্দা ঘোষণা করে সান্ত্বনা পেতে পারতুম। কিন্তু জগতের মধ্যে একমাত্র বাঙলাদেশ প্রসূত এই মূঢ়তার গ্লানি নিজে স্বীকার না করে উপায় কী? বেলজিয়ামে জনসাধারণের মধ্যে একদল বলে ফ্লেমিস, অন্যদল ফরাসী, ফ্লেমিসভাষী লেখক সাহিত্যে যখন ফরাসী ভাষা ব্যবহার করে, তখন ফ্লেমিস শব্দ মিশিয়ে ফরাসী ভাষাকে আবিল করে তোলবার কথা কল্পনাও করে না। অথচ সেখানে দুই সমাজের বিপক্ষতা যথেষ্ট আছে। উত্তর পশ্চিমে সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাব নেই। সে সকল প্রদেশে অনেক হিন্দু উর্দু ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি করে উর্দু ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অসংগতভাবে মিশেল করতে থাকবেন তাঁদের কাছ থেকে এমনতরো প্রমত্ততা প্রত্যাশা করতে পারিনে। এরকম অদ্ভুত আচরণ কেবলি কি ঘটতে পারবে বিশ্বজগতের মধ্যে একমাত্র বাঙলাদেশে? আমাদের রক্তে এই মোহমিশ্রিত হোতে পারলে কোথা থেকে? হতভাগ্য দেশ, যেখানে ভ্রাতৃবিদ্রোহ দেশ বিদ্রোহে পরিণত হয়ে সর্বসাধারণের সম্পদকে নষ্ট করতে কুণ্ঠিত হয় না। নিজের সুবুদ্ধিকে কলঙ্কিত করার মধ্যে যে আত্মাবমাননা আছে দুর্দিনে সেকথাও মানুষ যখন ভোলে তখন সাংঘাতিক দুর্গতি থেকে কে বাঁচবে?[৯]

এই পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যাতেও রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন। রাজশেখর বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জলধর সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, কালীদাস রায়, দিলীপকুমার রায়, হুমায়ুন কবির, সুফিয়া এন. হোসেন প্রমুখ কবিতা, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গরচনা, নক্সা প্রভৃতি লিখেছিলেন। গুলিস্তাঁয় যে আলোচনাটি প্রকাশিত হয় রূপ-রেখার—তাতে বলা হয়, 'রূপ-রেখা' সম্পাদনে তাঁর (সম্পাদিকার) মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্যপিপাসু মনের পরিচয় আমরা ভালভাবেই পেয়েছি। চিত্রের দিক দিয়েও তার নামের মর্যাদা রক্ষা করেছে। শিক্ষিত পাঠক সমাজে রূপ-রেখা যে যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।'[১০]

মনে হয়, উপরের মন্তব্যে অতিরঞ্জন ছিলনা।

৩

'বর্ষবাণী'র সংখ্যাগুলো সব দেখবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু বর্ষবাণীতে মুদ্রিত শরৎচন্দ্রের মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনারীতি বা ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে যে ছোট্ট লেখাটি ছাপা হয়, তা বুলবুল, সওগাত, জাগরণ প্রভৃতি পত্রিকায় বহুমুখী আক্রমণের শিকার হয়।[১১] শরৎ রচনাবলিতে 'বর্ষবাণী'র ১৩৪২ সংখ্যার রচনাটি সংকলিত হয়েছে :

কল্যাণীয়া জাহান আরা,

তোমার বার্ষিক পত্রিকায় সামান্য কিছু একটা লিখে দিতে অনুরোধ করেছ। আমার বর্তমান অসুস্থতার মধ্যে হয়ত সামান্যই একটু লেখা চলে। ভাবছিলাম, সাহিত্যের ধর্ম, রূপ, গঠন, সীমানা, এর তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্প বিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর একটা দিকের কথা প্রকাশ্যে আজও কেউ বলেননি। সে এর প্রয়োজনের দিক। এর কল্যাণ করার শক্তি সম্বন্ধে।... সাহিত্য রসের মধ্য দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্য রসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ ও বেদনা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

শরৎচন্দ্র মুসলমান সমাজের মনোভাব প্রতিফলিত করে বলেন : 'রাগের উপর কেউ কেউ ভাষাটাকে বিকৃত করে তুলতেও যেন পরান্মুখ নন, এমনি চোখে ঠেকে। অজুহাত তাঁদের নেই, তা নয়, কিন্তু রাগ পড়লেই একদিন নিজেরাই দেখতে পাবেন, অজুহাতের বেশীও সে নয়। যে কারণেই হোক, এতদিন বাংলাদেশের হিন্দুরাই শুধু সাহিত্যচর্চা করে এসেছেন। মুসলমান সমাজ দীর্ঘকাল এদিকে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সাধনার ফলতো একটা আছেই। তাই বাণী দেবতার বর দিয়ে এসেছেনও এঁদেরকে। মুষ্টিমেয় সাহিত্যরসিক মুসলমান সাধকের কথা আমি ভুলিনি, কিন্তু আক্ষেপের প্রকাশ ত যুক্তি নয়। যদিচ বলা চলে, সাহিত্যিকদের মধ্যে কয়জন তাঁদের রচনায় মুসলমান চরিত্র এঁকেছেন ; ক'টা জায়গায় এতবড় বিরাট সমাজের সুখ দুঃখের বিবরণ বিধৃত করেছেন। কেমন করে তাঁদের সহানুভূতি পাবেন, কিসে তাঁদের হৃদয়স্পর্শ করবে ! স্পর্শ করেনি তা জানি, বরঞ্চ উল্টোটাই দেখা যায়। ফলে ক্ষতি যা হয়েছে তা কম নয়, এবং আজ এর একটা প্রতিকারের পথও খুঁজে দেখতে হবে।'[১২]

বস্তুত, মানবতাবাদী মুসলমান লেখকদের অভিমত হলো, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি একই দেশে একই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মত বাস করে, জন্মকাল থেকে একই ভাষা বলে আসলেও এমন বিচ্ছিন্ন, এমন পর হয়ে আছে পরস্পরে যে ভাবলেও বিস্ময় লাগে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংসার ও 'জীবনধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা–পাওনা একটা আছে, কিন্তু অন্তরের দেনা–পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না।'

কেন এমন হয়েছে, এ নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন নেই, 'কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচাতেই হবে। না হলে কারও মঙ্গল নেই।' তাই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচানোর দুঃসাধ্য সাধনের উপায় স্থির করতে হবে। আর সে উপায় হচ্ছে একমাত্র 'সাহিত্য'। মুসলমান লেখকদের মতে হিন্দুদেরই এগিয়ে আসতে হবে, টেনে নিতে হবে মুসলমানদের। তাঁদের সাহিত্যে মুসলমানদের কথা স্নেহ সহানুভূতির সঙ্গে বলতে হবে। 'নিছক হিন্দুর জন্যই হিন্দু সাহিত্য রচনা করবেন না।' মুসলমান পাঠকের কথাও তাঁদের মনে রাখতে হবে।

একথার জবাবে শরৎচন্দ্রের অভিমত হলো : 'অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এ ত তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা।"[১৩]

কিন্তু অবস্থার অবসান সাহিত্যিকদেরই করতে হবে। কারণ সাহিত্যিকগণ জাতিতে, মননে এক। আর সে সত্য উপলব্ধি করার দায়িত্ব মুসলমানদেরই। শরৎচন্দ্র হিন্দু–মুসলমানের অবাঞ্চিত ব্যবধান ঘুচাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন এভাবেই। শরৎচন্দ্রের এই পরামর্শে মুসলমান সমাজ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। ফলে 'বুলবুল' পত্রিকায় 'অবাঞ্চিত ব্যবধান' শিরোনামে এক বিতর্ক জমে উঠেছিল।

www.pathagar.com

যে ভাবেই হোক, 'রূপরেখা' ও 'বর্ষবাণী'র সম্পাদিকা বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা ছেপে বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাসমূহের সমাধান প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা হয়ত ফলপ্রসূ হয়নি, কিন্তু বাংলা সাময়িকপত্রের তথা সাহিত্যের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপের মূল্য স্বীকার করতে হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. ভূঁইয়া ইকবাল, রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছপত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৫ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৬৫–৬৭ ও ৯৩–৯৫।

২ উপরিউক্ত।

৩. ভূঁইয়া ইকবাল উপরিউক্ত গ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে রূপ-রেখার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিন্তু গুলিস্তাঁর ২ বর্ষ ১০ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪২ এ ১৩৪১ সনে প্রকাশিত 'রূপ-রেখা'র দ্বিতীয় সংখ্যার আলোচনা প্রকাশিত হওয়ায় দুটি সংখ্যা যে রূপ রেখার বেরিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৩৪২ সনে পূর্বের ধারাবাহিকতা মনে রেখে 'বর্ষবাণী'কে তৃতীয় সংখ্যা হিসেবে চালানো হয়। ১৩৪৬ সনে বর্ষবাণীর পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশের তথ্য প্রমাণ করে যে এ পত্রিকা বার্ষিকী হিসেবেও নিয়মিত বের হয়নি।

৪. 'বর্ষবাণী'র সকল নমুনা বহু সন্ধানেও পাওয়া যায়নি বলে পরোক্ষ সূত্রে উল্লেখ করা হলো এজন্য যে, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে যাতে বর্ষবাণীর কথা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে না চলে যায়। ঢাকার বাংলা একাডেমী লাইব্রেরীতে দুটি বার্ষিক সংখ্যা আছে। আরও অনুসন্ধানে ১০/১২ টি সংখ্যা হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

৫. নিবেদন (সম্পাদকীয়), রূপ রেখা, প্রথম বর্ষ, ১৩৩৯।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মূল্যশোধ (আশীর্বাণী, কবিতায়), রূপরেখা, প্রথম বর্ষ, ১৩৩৯।

৭. বীরবল, ভারতবর্ষের যাদুঘর, উপরিউক্ত।

৮. আলতাফ চৌধুরী, রূপ-রেখা, উপরিউক্ত, পৃ. ৪–৫।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, উদ্ধৃত ভূঁইয়া ইকবাল, উপরিউক্ত, পৃ. ৬৭।

১০. গুলিস্তাঁ (মাসিকপত্র), ২ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪২।

১১. এই অভিসন্দর্ভে 'জাগরণ'এর আলোচনা দেখুন।

১২ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের আর একটা দিক, 'শরৎ সাহিত্য সমগ্র', সম্পাদক : সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. (অখণ্ড সংস্করণ), কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ২১৬৬।

www.pathagar.com

২১. অভিযান
(ঢাকা, ১৩৪০)

ঢাকা থেকে 'শিখা গোষ্ঠী'র কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৩০ এর পর কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে—যার মধ্যে 'অভিযান' এর নাম উল্লেখ করতেই হয়, কিন্তু এ 'অভিযান' আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮) পৃষ্ঠপোষিত মোহাম্মদ কাসেম (১৯০৫-৫৭) সম্পাদিত ঢাকা থেকে ভাদ্র ১৩৩৩ সনে প্রকাশিত শিখার ধারার স্বল্পায়ু (মাত্র দুই সংখ্যা বের হয়) 'অভিযান' নয়। এই অভিযান এর সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ বি.এ. এবং মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন জিয়াউদ্দিন আহমদ বি.এ.।

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ ঢাকা থেকে প্রকাশিত পাকিস্তান আমলের পত্র-পত্রিকায়ও গল্প ইত্যাদি লিখেছেন। কিন্তু সাহিত্য সমাজে এখন তিনি বিস্মৃত। কেউ কেউ মনীষী অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) এর সঙ্গে মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ বি.এ.কে গুলিয়ে ফেলেন।

অভিযান সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ পাকিস্তান আমলে সক্রিয় থাকলেও সেকালের কাগজে অভিযান সম্পর্কে কোন লেখা বা বিবরণ ছাপা হয়নি। তার কারণ অভিযান স্বল্পায়ু ছিল। এখনও অভিযানের একটির বেশি সংখ্যা পাওয়াও যায়নি। এই সংখ্যাটিও ২৬ পৃষ্ঠার ছিল। তবে আরও সংখ্যা বের হয়ে থাকতে পারে। বৈশাখ ১৩৪০ এ প্রকাশিত প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা অভিযান এর প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের 'আশীর্বচন' ছাপা হয়েছে :

আকাশ বাতাস
ছেয়ে ফেল আজ
তোদের মিলন গানে,
মায়ের পূজার
পূত-উপচার
পূর্ণ হবে শুধু
সে-যে তোদেরই অরঘ-দানে।

অভিযান গতানুগতিক বর্ষ সংখ্যা লেখার নিয়ম ভেঙ্গে লিখেছিল 'পয়লা সংখ্যা', 'পয়লা বছর'। নিয়মাবলীতে বলা হয়েছিল "অভিযান প্রতি বাংলা মাসের প্রথম ভাগে বাহির হইবে। প্রবন্ধাদি ও টাকা-কড়ি সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য। বৎসরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। তৎসংক্রান্ত বিষয়ে কর্ম সচিবের সহিত পত্রব্যবহার বা সাক্ষাৎ প্রার্থনীয়।"

অভিযানের কর্মসচিব ছিলেন আবদুল আজিজ। ঠিকানা ৬৯, ওয়াটার ওয়ার্কস রোড, ঢাকা। ব্রাঞ্চ অফিস ছিল ৩৬, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা। এই ঠিকানা ছিল 'বেদুঈনের আড্ডা' অর্থাৎ 'তরুণ বঙ্গের শক্তিশালী প্রতিনিধি, আদর্শ জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা বেদুঈন' এর ঠিকানা। সাপ্তাহিক 'বেদুঈন' এর বিজ্ঞাপনে দেখা যায় 'বেদুঈন' এর ঢাকাস্থ ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানা আর 'অভিযান' এর ঠিকানা ; এবং 'অভিযান' এর কলকাতার ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানা আর 'বেদুঈন' এর কলকাতার মূল ঠিকানা এক।

www.pathagar.com

অতএব অভিযান ও 'বেদুঈন' যে একই দলের তরুণদের পত্রিকা ছিল এটা নিশ্চিৎ করেই বলা যায়। মুসলমান তরুণদের সাময়িক সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণের প্রচেষ্টা এইসব ক্ষুদ্র, কিন্তু আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যে লক্ষ্য না করে পারা যায় না। তরুণদের নিজেদের পত্রিকার বিজ্ঞাপনে 'তরুণবঙ্গের শক্তিশালী প্রতিনিধি' বা 'আদর্শ জাতীয় সাপ্তাহিক' কথাগুলোও লক্ষণীয়। 'বেদুঈন' এর বিজ্ঞাপনটির মধ্যদিয়ে অভিযান গোষ্ঠীর তরুণদের মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে :

> 'বেদুঈন' এর তুলনা একমাত্র বেদুঈনই। তরুণমনের কথা, তরুণের প্রাণের ব্যথা, তরুণের স্বপ্ন কল্পনা, তরুণের আশা নৈরাশ্যের খবর লইয়া আসিয়াছে 'বেদুঈন'। দরিদ্রের বন্ধু, পীড়কের চির-শত্রু, দেশ ও জাতির প্রকৃত সেবক রূপে আসিয়াছে বেদুঈন। শক্তিশালী তরুণ লেখকের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতিতে বেদুঈন-এর পৃষ্ঠা ভরপুর। বেদুঈন-এ প্রকাশিত প্রত্যেকটি লেখায় অনুভূত হয় তরুণ বাঙলার প্রাণের স্পন্দন। আজই গ্রাহক হউন।'

'আমাদের কথা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> বাঙ্গালা সাহিত্য তার চলার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। এমনকি বিশ্ব সাহিত্যের নিকষেও বাঙ্গালা কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে ; কিন্তু একথা শুনলে অনেকেই হয়ত চমকিত হবেন যে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালীর সাহিত্য রচিত হয়নি ; বড় জোর হিন্দুর সাহিত্য ও সামান্য পরিমাণ মুসলমান সাহিত্য রচিত হয়েছে। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালী সেই সাহিত্যের আঙ্গিনায় ভ্রাতৃভাবে সমবেত হতে পারে—তেমন সাহিত্য আজো ত গড়ে উঠল না। সুদীর্ঘ সাত শ' বছরের পরিচয়ে যা' হল না, জানি না তার জন্য বাঙ্গালীকে সাধনা করতে হবে আরও কতকাল।
>
> আজিকার বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাচীন-পন্থীরা শোচনীয়ভাবে সাম্প্রদায়িক, আর অতি-আধুনিকরা অতিমাত্রায় পাশ্চাত্যমোহে মুগ্ধ, প্রাচীনেরা যেখানে খোলস নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছেন, নবীনেরা সেখানে শুধু Polish নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এই দোটানায় পড়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের সত্যিকার সৃষ্টি বলে কোন কিছু গড়ে ওঠবার সুযোগ পাচ্ছে না ; অধিকন্তু তরুণদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে বঙ্গবাণী দিনদিনই বেআব্রু হয়ে পড়ছে। ফলে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের ন্যায় সাহিত্যিক জীবনেও সমস্যার পর সমস্যা বেড়েই চলেছে। সাহিত্যের এই দুর্গম কষ্টময় পথে আজ আমাদের অভিযান, জানি, পথ আমাদের দীর্ঘ, পাথেয় আমাদের অকিঞ্চিৎকর, তবু এই চির-চলা রক্তরাঙ্গা পথেই পথের ডাকে আজ আমরা বেরিয়ে পড়েছি চিরপথচারী মরু-বেদুঈনের মতোই।

তাঁদের 'ক্রীড' (Creed) সম্বন্ধে নিজেদের বক্তব্যও উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেন, "অনেকেই আমাদের Creed সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। এ সম্পর্কে আশা করি এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, সাহিত্যকে আমরা জীবনের প্রতিচ্ছবি বলেই মনে করি, সুতরাং সমাজ ও জাতীয় জীবনের যে সমস্ত সমস্যা আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে সেগুলোকে পাশ কেটে যাওয়ার মতো দুঃসাহস আমাদের নেই। আমরা বিশ্বাস করি, নিছক কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত যে সাহিত্য তাতে সাময়িক উত্তেজনা হয় ত সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু মানুষের মনে তা শিকড় গেড়ে বসতে পারে না কোনদিনই। মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনের বহু উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত সে সাহিত্য, সৌন্দর্য্যের কল্পলোকে তা চিরস্থায়ী হোক, আমাদের পৃথিবীতে থাক

www.pathagar.com

সে সাহিত্য, কোটি কোটি অবহেলিত মূঢ়-মূক-ম্লান ধূলার সন্তানের জয়গান যার ভিতর দিয়ে নিরন্তর ধ্বনিত হবে।"

অভিযান-এর কর্তৃপক্ষ বলেন, 'অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত পৃষ্ঠায় যে সমস্ত মহামূল্য মণি-মাণিক্য লুক্কায়িত রয়েছে' তার অনুসন্ধান ও উপস্থাপনের 'ভার' নিয়েছেন তাঁরা। প্রথমে তাঁরা ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো (অধ্যাপক, ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)র পরামর্শে মওলানা মোহাম্মদ হোসেন আজাদের সুবিখ্যাত 'দরবারে আকবরী' শীর্ষক গ্রন্থ অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অভিযানে অনূদিত পাঠ ধারাবাহিক ('প্রতি মাসে') প্রকাশিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়।'[১]

এতসব আয়োজন সত্ত্বেও অভিযান বেশিদূর এগিয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে মোহাম্মদ কাসেমের গল্প 'ভূমিকা' পরের সংখ্যায় প্রকাশের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল। আর দু'চার/পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত না হবার কোনও যুক্তিও নেই। সংরক্ষণের অভাবেই হয়ত অভিযানের পুরো ফাইল আর দেখার সুযোগ হবে না।

অভিযানে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বচনের সঙ্গে নজরুল ইসলামের মার্চ-সঙ্গীত 'দুরন্ত দুর্ম্মদ প্রাণ অফুরাণ/গাহে আজি উদ্ধত গান' ছাপা হয়েছিল। বেগম মাজেদা খাতুন-এর একটি 'রুবাইয়াৎ' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান যুগ', মোহাম্মদ ওদুদ (ওয়াদুদ) বি.এ.'র গল্প—'মাতৃত্বের অভিশাপ', জসীমউদ্‌দীনের রূপকথা—'মালঞ্চ ও মাধব', শ্রী মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা—'জীবনের হাটে' এবং মোহাম্মদ কাসেম লিখিত জসীমউদ্‌দীনের 'ধানক্ষেত' শীর্ষক পুস্তকের পরিচয় অভিযানের সাহিত্য সম্পদ ছিল। নিতান্ত মন্দ বলা যাবে না এঁদের আয়োজনকে। মোহিতলাল মজুমদার এর কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ : ...

জীবনের হাটে বেসাতি করিতে কারো লাভ হয়, কারো বা ক্ষতি,
কারো খোয়া যায় শেষ কড়িটিও, কেউ সহজেই লক্ষপতি।
বুদ্ধিরে কভু দেয় নাক' দোষ—লক্ষ্মী যাহার ছাড়িয়া যায়,
ভাগ্যের নামে আরেক জনেরে বড় সে তখন মানিতে যায়।
আপনার চেয়ে বড় কেউ আছে, সে কথা মানিতে লজ্জা নাই,
ঠিকে ভুল আছে, হেন অপবাদ সহিবারে তুমি পারো কি ভাই
এইত মানুষ ! —যদি কোনদিন হৃদয়-আবেগে ভুল সে করে
ঠকিয়াছে ভাবি' পরদিন সে যে আফ্‌শোসে মাথা খুঁড়িয়া মরে।[২]

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাঙ্গালা-সাহিত্যে মুসলমান যুগ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, বাংলা সাহিত্যের গৌড়ীয়যুগ সর্বতোভাবে মুসলমান প্রভাব-মূলক। 'গৌড়ীয় যুগের প্রারম্ভ হইতে যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের নবজন্ম সূচিত হইয়াছিল তাহার মূলে মুসলমান রাজাদিগেরই প্রেরণা-সঞ্জিবনী কার্যকরী হইয়াছিল। বাঙ্গালার সর্বশেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকাল পর্যন্ত বাঙ্গালার প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্পত্তি আপনার স্বাতন্ত্র্য বাঁচাইয়া তুলিতে পারে নাই।... এক কৃত্রিম অপ্রচলিত ভাষার মায়া-বন্ধনীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া বাঙ্গালী-পণ্ডিতের মৌলিক সাহিত্যকীর্তি যেন একেবারে স্তম্ভিত স্থানুদেহের মত অচল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্যই সেনবংশের দীর্ঘ রাজত্বকালেও বাঙ্গালীর একখণ্ড সাহিত্যকীর্তিও দৃষ্টিগোচর হয় না। সংস্কৃত ভাষা যে বাঙ্গালীর অস্থি মজ্জাগত হইয়া কোনকালেই তাহার

www.pathagar.com

সত্যিকার রস প্রেরণামূলক হইতে পারে নাই, তাহা তাহার সংস্কৃত সাহিত্যে মৌলিক রস-সৃষ্টির অভাব হইতেই প্রতীয়মান হইবে।'[৩]

তথ্যনির্দেশ

১. আমাদের কথা (সম্পাদকীয়), অভিযান, বৈশাখ ১৩৪০, পৃ. ২৬।

২ মোহিতলাল মজুমদার, জীবনের হাটে (কবিতা), উপরিউক্ত, পৃ. ২৪।

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান যুগ (প্রবন্ধ), উপরিউক্ত, পৃ. ৬-৮।

www.pathagar.com

৪. গ. মুসলিম জাতীয়তাবাদী (স্বাতন্ত্র্যবাদী) ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী ধারা

২২. মোহাম্মদী

(কলকাতা ১৩৩৪-১৩৫৪)

মুসলিম বাঙলার সাময়িকপত্র জগতের প্রবাদ-পুরুষ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) যখন 'মাসিক মোহাম্মদী' প্রকাশ করতে শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সে কেন তিনি একটি মাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের জন্য, স্বেচ্ছায় বেছে নেয়া পল্লীর নির্ঝঞ্ঝাট নিভৃতকুঞ্জ পরিত্যাগ করে কলকাতায় যান্ত্রিক কলকোলাহলের মধ্যে ফিরে এলেন—মোহাম্মদীর ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় নিজেই তাঁর কারণ বিবৃত করেছিলেন। মোহাম্মদীর আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে মোহাম্মদ আকরম খাঁর এই আত্মবিশ্লেষণ শোনা যাক :

> মাসিক মোহাম্মদীর জীবন-ইতিহাসের দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষব্যাপী একটি যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হাতে করিয়া আজ সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতেছি এবং তাহার পক্ষ হইতে নবযুগের অভিনন্দন নিবেদন করিতেছি।
>
> দ্বাদশ বৎসর পূর্বে, 'মোস্তফা চরিত' ও 'আমপারার' তফছির প্রকাশিত হওয়ার পর, সমাজের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে অবিরাম তাকিদ আসিয়াছিল, 'কোরআনের তরজমা ও তফছির' শেষ করিয়া যাওয়ার জন্য। আমিও এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং জীবনের শেষ অংশটুকু শান্তির ও বিশ্রামের সঙ্গে এই সাধনায় অতিবাহিত করিবার জন্য পল্লীবাসের সমস্ত ব্যবস্থা সমাপ্ত করিয়া লইতেছিলাম। ঠিক এমনই সময় কলিকাতা হইতে আহ্বান পৌঁছিল, এছলাম ধর্ম্ম ও মুছলমান সমাজের নামে। বন্ধুরা এই সময় যাহা জানাইলেন, তাহার সারমর্ম এই যে, বাংলা ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় মুছলমানের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে গত একশত বৎসর ধরিয়া যে প্রচারণা চলিয়া আসিয়াছে বর্তমানে তাহা পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে চলিয়াছে—প্রগতি ও তারুণ্যের মোহমন্ত্রে আবিষ্ট হইয়া মোছলেমবঙ্গের শিক্ষিত তরুণ সমাজ আজ নিজেরাই বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী দয়ানন্দের সুরে এছলাম ধর্ম্ম ও মোছলেম সভ্যতার নামে আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। একখানি সাময়িকপত্রের[১] একটা প্রবন্ধের উল্লেখও এই প্রসঙ্গ বিশেষভাবে করা হইতে লাগিল।
>
> কিন্তু ঢাকা হইতে যে-সব সংবাদ আসিতে লাগিল, তাহা আরও ভীষণ। কএকদিনের মধ্যে দেখিতে পাইলাম তারুণ্যের জয়পতাকাবাহী একদল মুছলমান যুবক প্রজ্জ্বলিত 'শিখা'[২] হস্তে বাংলার মছজিদ ও তাহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষা ও সাধনাকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়ার জন্য আস্ফালন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। 'নবপর্য্যায়ে'র নামে নতুন বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিয়া জনৈক বিজ্ঞ অধ্যাপক[৩] আলেম সমাজকে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ দিয়া বলিতেছেন 'মুসলিম তরুণ সমাজ তোমাদের শাস্ত্রের গুলিগোলার রেঞ্জ অতিক্রম করিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।'[৪]
>
> মুছলমানের সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে তখন অজ্ঞানতার নামই জ্ঞান হইয়া দাঁড়ায় (১৯২৫-২৭ এর কথা বলা হচ্ছে), ধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয়মাত্রকে তখন 'বুদ্ধির

www.pathagar.com

মুক্তি' আখ্যা দেওয়া হয়। অর্দ্ধশিক্ষিত কবি, লেখক ও সম্পাদকগণের সহযোগে এই সময় বাঙ্গালী মুছলমানের সাহিত্যক্ষেত্রে যে অনর্থের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, জাতি ও ধর্ম্মের দরদী সাহিত্যিকরা বোধ হয় আজও সে লজ্জাজনক পরিস্থিতির কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এই সময় কর্ত্তব্যের আহ্বানে বিচলিত হইয়া পল্লীবাসের সমস্ত সুখ-কল্পনায় জলাঞ্জলি দিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হয় এবং 'মাসিক মোহাম্মদী' প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় তাহারই কিছুকাল পরে।[৫]

মওলানা আকরম খাঁ ঐ আলোচনায় (১৩/১, ১৯৩৯ সনের) বলেন, মাসিক মোহাম্মদী প্রকাশে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন 'সেবা' হিসেবে 'সাধনা' মনে করে নয়। মোহাম্মদী প্রকাশের দীর্ঘ একযুগ পরে তিনি বলেন : 'পরম আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, যাঁহার পবিত্র নামমাত্রকে সম্বল করিয়া জাতি ও ধর্ম্মের কল্যাণকামনায় এই সাধনা-পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম, তাঁহারই অনন্ত রহমতের কল্যাণে এই দীন সেবকের সে-সাধনা ইতিমধ্যেই বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে।'

শিখাগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, তরুণ মোছলেমের বিবেক পরের অন্ধ অনুকরণের অভিশাপকে 'বুদ্ধির মুক্তি' বলে মনে করতে আজ লজ্জা অনুভব করে থাকেন। 'সব চাইতে সুখের বিষয় এই যে, সেদিন সাধনার প্রথম সূচনায় নিজেদের এই যাত্রাপথের প্রধান পরিপন্থী হিসেবে দেখিতে পাইয়াছিলাম যে-সব সুশিক্ষিত প্রতিভাশীল ও শক্তিমান তরুণ মোছলেমকে, অল্পদিনের মধ্যে তাঁহাদের অনেকে আসিয়া আমাদের যাত্রাপথের প্রধান সাথী হইয়া দাঁড়াইলেন।'

সম্পাদক মোহাম্মদ আকরম খাঁ বলেন, মাসিক মোহাম্মদী যখন তিনি প্রকাশে ব্রতী হন, তখন সাহিত্যের মধ্যদিয়ে সাধনার দরকার উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৫ সনের ভারত সরকারের শাসন-সংস্কার নীতি প্রবর্তিত হবার পর 'রাজনীতির তাকিদই জাতীয় জীবনের বৃহত্তম সত্যে পরিণত হইয়া চলিয়াছে এবং ভবিষ্যতে এই দিকের গুরুত্ব আরও বহুগুণে বাড়িয়া যাইবে। জাতীয় জীবনের এই দিককার নানা আতঙ্ক আশঙ্কাপূর্ণ সম্ভাবনার কল্পনায় বিচলিত' হয়ে তিনি ১৯৩৬ সনে (৩১শে অক্টোবর প্রথম প্রকাশ, কলকাতা থেকে) দৈনিক 'আজাদ' প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলেন। জাতির এই দিকের দৈন্য দূর করার জন্য আজাদের পিছনে শ্রম ও চিন্তা ব্যয় করায় মাসিক মোহাম্মদীর প্রতি অযত্ন হবার কথাও তিনি স্বীকার করেন। এবং প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার 'আত্মনিবেদন' পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বলেন :

> প্রথম যুগের যাত্রারম্ভে যে নিবেদন লইয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, দ্বিতীয় যুগের সূচনা কালে আজ আবার তাহাই পুনরুক্তি করার অনুমতি চাহিতেছি। কারণ আমার সমগ্র জীবন সাধনার প্রথম উক্তি মধ্যম উক্তি ও শেষ উক্তি একমাত্র ইহাই। দ্বাদশ বৎসর পূর্বেকার 'জীবন সায়াহ্নে' আজ তাহার সকল তাৎপর্য্য লইয়া আরও নিষ্ঠুর বাস্তবতার সহিত সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সময় থাকিতে সে আত্মনিবেদন আর একবার জাতির সমীপে করিয়া রাখিতে চাই।

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার যে 'আত্মনিবেদন' পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছিল, তা শুরু করা হয় 'করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে' ; তাতে বলা হয় :

> বিভিন্ন ভাবধারার সমবায়ে এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে, মোছলেম বঙ্গের স্তরে স্তরে, আজ এক অভিনব জীবন সাধনা জাগিয়া উঠিয়াছে। একদিকে পুরাতনের মায়া অন্যদিকে

www.pathagar.com

আধুনিকতার মোহ। পুরাতনের মায়া, বহু শতাব্দীর সংকলিত জ্ঞান-অজ্ঞানের সমস্ত সঞ্চয় একত্রে আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রাণপণেও তাঁহাকে রক্ষা করার জন্য ব্যাকুল—আধুনিকতার মোহ, প্রত্যেক রাজসিক বিকারকে জীবনের স্পন্দন এবং উচ্ছৃঙ্খলতার প্রত্যেক বিকাশকে জ্ঞানের মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে ব্যগ্র। উভয় দিকের এই ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবধারার প্রকাশকে অনেকে সংঘাত ও সংঘর্ষ নামে আখ্যাত করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় ধারার মূল উৎস এবং উভয়ের চরম লক্ষ্য অভিন্ন। বাহ্যতঃ ইহা সংঘাত, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা নতুন জীবনের সূত্রপাত। এখনকার কর্ত্তব্য, উভয় ধারাকে বাহিরের আবর্জনার হাত হইতে রক্ষা করা—সত্যকে তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উভয় ধারাকে গভীর ও নির্ম্মল করিয়া তোলা। দুই প্রকারে দুই ধারার সহায়তা করিয়া, আমরা যত শীঘ্র তাহাকে খরস্রোত করিয়া তুলিতে পারিব, তাহার মধ্যকার অন্তরাল—ক্লেদ কর্দমের বর্ত্তমান ব্যবধান—তত শীঘ্রই গলিয়া ধুইয়া অপসারিত হইয়া যাইবে।

পুরাতন ও আধুনিকতার সমন্বয় সাধন প্রসঙ্গে ১৯২৭ সনেই মোহাম্মদীর ঘোষণা ছিল : 'পুরাতনের সকল সঞ্চয়কে একত্রে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কেবল ভাবপ্রবণতার অভিব্যক্তি বা রূঢ়ভাষার স্মরণ গ্রহণ দ্বারা, আধুনিকতার প্রবাহকে যাঁহারা প্রতিহত করিতে চাহিতেছেন—এছলামকে যথাযথরূপে বড় করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার মত বড় নজর ও বড় দেমাগ হইতে তাঁহাদিগের অনেকেই আজ বঞ্চিত। এছলামকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, দলিয়া মথিয়া নিজেদের সংকীর্ণ চিন্তা ও সংকীর্ণ দৃষ্টির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া রাখিতে তাঁহারা আজ ব্যতিব্যস্ত। তাই বাহিরের আলোকের তীব্র প্রভায় আজ তাঁহাদিগের চোখগুলি যেন ঝলসিয়া যাইতেছে, এবং নিজেদের পরিকল্পিত এছলামকে রক্ষা করার জন্য দিশাহারার মত হইয়া আজ তাঁহারা আলোক-কেই অভিসম্পাত করিতেছেন। —নিদানের সম্বলরূপে বহুযত্নে রক্ষিত, কাদেরী-ফৎওয়ার পুরাতন পুঁটলি দুই একখানা পচা নেকড়া গুঁজিয়া দিয়া, আসন্ন মগ্নদ্বারের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা পাইতেছেন—এ সমস্ত সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, পরশমণির উপর সঞ্চিত ধূলামাটিকেও যে আজ তাঁহারা এমন ভীতত্রস্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতেছেন, সেও সেই পরশমণিকে হারাইবার আশঙ্কায়। সে মাণিকের, সে পরশমণির অধিকারী ও রক্ষাকারী এখনও তাঁহারাই, কিন্তু তাই বলিয়া আর মায়া করা চলিবে না। যে কোন প্রকারেই হউক ; আল্লাহ্‌র মুক্ত আলো-বাতাসে মানিককে উপস্থিত করিতে হইবে—মানুষের আমলরূপে বিশ্বমানবের সন্নিধানে তাহাকে উপস্থাপিত করিতে হইবে। আমাদিগের সঙ্কল্পের সাধুতা এবং নিজেদের আতঙ্কের অসারতা বুঝিতে পারিলে দুই দিন পরে তাঁহারাই আসিয়া আবার এ নৌকার হাল ধরিবেন ; তাঁহাদের চরণতলে দণ্ডায়মান হইয়া আবার আমরা রিক্তমুক্ত এছলামের জয়জয়কার শুনিতে পাইব।'[৭]

প্রথম দল অর্থাৎ প্রাচীনদের সম্পর্কে তিনি বলেন, তাঁদের দৃষ্টি ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে আসলেও তা এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা ইসলামের সত্যকার স্বরূপকে যথাযথভাবে দর্শন করতে পারছেন না। 'ইহার একমাত্র কারণ'—সকল দিককার সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে তাঁরা নিজেরাই দর্শনীয় পরশমণিকে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছাদিত করে ফেলেছেন। কাজেই দৃষ্টিশক্তির অভাব না-ঘটলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁরা ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে আধুনিকতার মোহ ও মায়ামুগ্ধ তরুণের চারপার্শ্বে আলোকের অভাব না-ঘটলেও ইসলামধর্ম সম্পর্কে তাঁরা আজ সম্পূর্ণতই দৃষ্টিহীন। কাজেই দর্শন-শক্তির অভাবে, আলোকে অবস্থান করা সত্ত্বেও ইছলামের প্রকৃত স্বরূপকে তাঁরা আজ চিনতে

www.pathagar.com

পারছেন না। দুই একজন বিলাতী দোকানের রঙিন চশ্‌মা ব্যবহার করে আরও হিতে বিপরীত ঘটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে 'প্রথমপক্ষ' অর্থাৎ প্রাচীনদের বলতে হবে—'দ্বার খোল', 'আলোকের পথ ছাড়িয়া দাও, সাত রাজার ধন মাণিক আমার মহিমায় গরিমায় উজ্জ্বল হইয়া বিশ্বমানবের মন মোহন করিতে থাকুক।' দ্বিতীয় পক্ষকে বলতে হবে—'চোখ মেল'। 'আল্লাহর দেওয়া চোখ দুটি দিয়া একবার এছলামের নয়নাভিরাম স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করার চেষ্টা কর। যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের দিকে তাকাইয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, যে আলোকের প্রথম সাক্ষাৎ-এর তীব্রতায় ঝলসিত চক্ষু তুমি,—নিজের দর্শন বিকারের প্রগল্ভ অভিব্যক্তি দ্বারা মুক্তির নামে নতুন শৃঙ্খলের জয়গান করিতেছ, সেই আলোককে যথেষ্টরূপে তোমাদিগের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক পরিমাণে আয়ত্ব করা সত্ত্বেও তাঁহারা তোমাদিগের মত দিশাহারা হয় নাই। শুধু ইহাই নহে, সেই আলোকের সদ্ব্যবহার করিয়া তাহারাই আজ দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে এছলামের পুণ্যচ্ছবি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে।' উপসংহারে সম্পাদক লিখেছেন :

> এই দ্বার 'খোলা' ও 'চোখ মেলার' সাধনার মধ্য দিয়া দীর্ঘ দুইটি যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সেই দীর্ঘকালের সুখ-স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত দেখার উদ্দেশ্যে জীবন-সায়াহ্নে মাসিক মোহাম্মদীর এই নতুন সাধনা। সকলে আশীর্বাদ করুন—এ সাধনা সিদ্ধিলাভ করুক। এ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হউক।[৮]

মাসিক মোহাম্মদীর নিজের কথা থেকেই বেরিয়ে এসেছে তাঁরা কি অভীষ্ঠ অর্জন করার জন্য এই সাহিত্য পত্রিকাটি প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছিলেন। সূত্রাকারে বলা যায় : 'বাঙলা ভাষার মধ্যবর্তিতায় মুছলমানের ধর্ম্ম সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে' আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়া থেকেই যে সকল মুসলিম-বিদ্বেষে পূর্ণ সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে, তার জবাব দিয়ে মুসলমান সম্প্রদায় ও ইসলাম ধর্মের হৃত মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ; পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজকে জাগিয়ে দেয়ার ব্রত পালন করা ; আর, মুসলমানদের মুখপত্ররূপে ব্রিটিশ সরকার ও তাঁদের সহযোগী, দেশীয় প্রভু হিন্দুদের কর্তৃক মুসলিমকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা তথা বঞ্চনা ও প্রতারণার বিপক্ষে বার্গেনিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যেই আকরম খাঁ মাসিক মোহাম্মদী প্রকাশ করতে উদ্‌যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

বলা আবশ্যক যে, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যখন রবীন্দ্রোত্তর যুগের অতি আধুনিক কবিরা বাঙলার সাংস্কৃতিক ও প্রাদেশিক রাজধানী কলকাতা থেকে কল্লোল-প্রগতি-পরিচয়-কবিতা-অগ্রগতি-দেশ প্রভৃতি এবং শক্তিশালী প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, শনিবারের চিঠি, বঙ্গবাণী প্রকাশিত করছিলেন, বঙ্গদর্শন-সাধনা-সবুজপত্রের উত্তরসূরি ঐসব সাহিত্য-পত্রিকার উজানে দাঁড়িয়ে বাণিজ্যিকভাবে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার এবং সাহিত্যিক শৈল্পিক, ভাষিক ও পাণ্ডিত্যের গভীরতার দিক থেকে মোহাম্মদীর সগর্ব ঘোষণা দেবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

লক্ষণীয় যে, মোহাম্মদী সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর ন্যায় অত্যাধুনিক উচ্চমানসম্পন্ন পণ্ডিত, বিদগ্ধ সম্পাদক-এর প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড়িয়েছিলেন। অনেকেই মনে করতেন 'প্রবাসী'র মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ, সাম্প্রদায়িক কূপমণ্ডুকতাপুষ্ট রচনাসমূহের জবাব দেবার জন্য 'মোহাম্মদী'র বলিষ্ঠ ভূমিকা

www.pathagar.com

রয়েছে। এ দায়িত্ব সওগাত, বুলবুল, চতুরঙ্গ সকল পত্রিকাই পালন করেছে। সত্যিই, মোহাম্মদীর পৃষ্ঠা উল্টালে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ১৯২৬–২৭ সন থেকে বাঙলার সাহিত্য–সংস্কৃতি রাজনীতি, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে যে সকল প্রধান বিতর্ক (ইস্যু) সংঘটিত হয়েছিল, মোহাম্মদীর শাণিত যুক্তিসমৃদ্ধ তথ্যনিষ্ঠ আলোচনায় সে সবই স্থান লাভ করেছে এবং মুসলমান স্বার্থকে 'মোহাম্মদী' সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তবে তাঁদের ভূমিকা ছিল প্রধানত ঠাণ্ডা মাথায় সরকারি উকিলের বিপক্ষে ন্যায়সঙ্গতভাবে বেসরকারি উকিলের লড়ে যাওয়া, অর্থাৎ অভিযোগ খণ্ডনের এবং—জবাব প্রদানের দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

যেখানে, যে–বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু–সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলিম স্বার্থ–বিরোধী অযৌক্তিক নিয়ম–রীতি চালু রেখে দিয়েছিলেন, সেসব পরিবর্তনের জন্য মোহাম্মদী গোষ্ঠী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এর ফলে সৃষ্ট মুসলিম–সচেতনতা বা সংঘবদ্ধতার জন্য সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা বিরক্ত হয়েছিলেন। জুড়ে থাকা অধিকার ফিরিয়ে না–দেবার জন্য তাঁরা নানারূপ পন্থা ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। আনন্দবাজার প্রবাসী প্রভৃতি হিন্দু–সম্পাদিত পত্র–পত্রিকায় সরকারকে প্রচলিত নিয়মের ব্যত্যয় না–ঘটাবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে দেয়া হয়েছে হুমকি। সেই হুমকি ও ওকালতির প্রতিবাদ করেছে 'মোহাম্মদী', এবং সত্যি বলতে কি, মুসলমান সমাজের সার্বজনীন বিষয়গুলোতে সওগাত, বুলবুল এমনকি শিখা–জয়তী–সবুজ বাঙলাসহ প্রায় সকল মুসলিম সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকায় একই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। হিন্দু কর্তৃক মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার সকল চেষ্টাকে মুসলিম–পত্রিকাসমূহ এক হয়ে প্রতিরোধ করতে চেয়েছে। আর ঘুমন্ত মুসলমানদের জাগাবার অন্তহীন প্রচেষ্টা নবনূর, আল–এছলাম–সওগাত–ধূমকেতু–নওরোজ সকল এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত পত্রিকাই চালিয়ে গেছে।

এই প্রচেষ্টায় দুটো কিংবা তিনটি ধারা, সৃষ্টি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। মুসলিম জাতীয়তাবাদী, হিন্দু–মুসলিম সম্প্রীতিতে আস্থাবাদী, আর কম্যুনিজম প্রভাবিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসীদের ধারা। কিন্তু মুসলিম জাতীয়তাবাদী ধারাই বিশ–ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে প্রবল–প্রতাপশালী হয়ে ওঠে। আর এ-ধারার প্রধান পত্রিকারূপে উঠে এসেছিল মাসিক 'মোহাম্মদী' এবং একাজ করতে গিয়ে মুসলমান–সম্পাদিত মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও হিন্দু–মুসলিম সম্প্রীতিতে আস্থাশীল মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকাগুলোকেও আক্রমণের হাত থেকে রেহাই দেয়া হয়নি। 'শিখা', 'সওগাত' এবং ঐদলের পত্রিকাগুলোতে রামমোহন–বিদ্যাসাগর–রবীন্দ্রনাথের ধারায় অনুপ্রাণিত বাঙলার নবজাগরণপন্থী মুসলিম চিন্তাবিদদেরকে হিন্দুদের থেকেও বেশি সমালোচিত অর্থাৎ তুলোধুণা করা হয়েছিল। (আকরম খাঁর উপরিউক্ত নিবেদন ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

বাঙলার রাজনীতিতে 'মুসলিম লীগ' শক্তিশালী হয়ে উঠলে মোহাম্মদী মুসলিম লীগের প্রধান বাঙলা মুখপত্র বা সাহিত্য–পত্রিকার ভূমিকা গ্রহণ করে। মুসলিম লীগের আন্দোলন চালাবার জন্যই 'আজাদ' বের হয়েছিল (১৯৩৬)। মুসলিম জাগরণের চূড়ান্ত মুহূর্তে কংগ্রেসী মুসলমানেরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। বস্তুতপক্ষে হিন্দুদের হিন্দুয়ানী বৃদ্ধি পেলে মুসলমান কমরেডরাও 'মুসলমান' হয়ে ওঠেন। অথবা, তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে বাধ্য হন। 'মোহাম্মদী' তাই মুসলিম জাগরণের প্রধান মুখপত্র রূপে সারা ভারতে খ্যাতি লাভ করে। আর শুধু

www.pathagar.com

রাজনৈতিকভাবেই তাঁরা বেশি সোচ্চার ছিলেন তাই-ই নয়, 'সাহিত্য-পত্রিকা' হিসেবে সাহিত্য-শিল্পের মানদণ্ডেও মোহাম্মদী প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকার স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার ব্যাপারে ছিল নিরাপোষ। ফলে কার্তিক ১৩৩৪ থেকে কার্তিক ১৩৫৪ পর্যন্ত তাঁরা প্রায় নিয়মিতভাবে ২০ বছরে বারোটি সংখ্যাই প্রকাশ করতে সমর্থ হন।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে মোহাম্মদী ছিল সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা। আর মোহাম্মদী তো কেবল একক সাহিত্য পত্রিকা ছিল না। এঁদের ছিল 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'দৈনিক আজাদ' এবং 'মোহাম্মদী পাবলিশিং হাউস'-এর সম্মিলিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। মোহাম্মদী পত্রিকার কেন্দ্রে শক্তিশালী সুসংহত সাহিত্যিক আড্ডাও গড়ে উঠেছিল। এই কেন্দ্র থেকেই প্রাণরস আহরণ করে গড়ে ওঠে 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' (১৯৪০) ও 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' (১৯৪২)। 'মোহাম্মদী' পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে ও উদ্যোগ আয়োজন করেছে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কোনো কোনো সম্মিলন অনুষ্ঠান করার জন্যও।

এঁদের অনুপ্রেরণায় বিজয়ী হয়ে সুখ্যাত হয়েছিল কলকাতার 'মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব'। হাজী মোহাম্মদ মহসিন, নবাব সিরাজউদদৌলা (১২/১০ এবং ১৩/৯) কামাল পাশা (১২/৩), মহাকবি মুহম্মদ ইকবাল (১১/৮) প্রমুখের স্মরণে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে মুসলিম ঐতিহ্য পুরুজ্জীবিত করে মুসলিমের প্রাণশক্তিও তাঁরা বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। অবশ্য আচার্য জগদীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (১১/৫) এবং রবীন্দ্রনাথ-এর মহাপ্রয়াণে বিশেষ সংখ্যাও 'মোহাম্মদী' প্রকাশ করেছিল।

কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, এমনকি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এঁরা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাজা রামমোহন রায়ের ৯৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভার সভাপতির বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫/১৯২৮)। এই সভার সভাপতিও ছিলেন একজন মুসলমান—মৌ: আবদুল করিম। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের ৫৩ তম জন্মতিথির অনুষ্ঠানের অভিনন্দনের জবাবে শরৎচন্দ্রের বলা 'আমার মনের কথা'ও সংকলিত হয়েছে (২/৩) মোহাম্মদীতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' শীর্ষক কবিতা—যা আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত মোহাম্মদীর ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যায় (পৌষ ১৩৩৫) ছাপা হয়। মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রকাব্যে দুঃখবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ ছাপা হয় ৫ বর্ষ, ৪ সংখ্যায়। শান্তিনিকেতনের ওপর সচিত্র প্রতিবেদনও ছাপা হয় ঐ সংখ্যাতে। রবীন্দ্রনাথের 'পাশ্চাত্য সভ্যতার গলদ কোথায়' শীর্ষক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে ২ বর্ষ, ২ সংখ্যায়। এমনিভাবে প্রায়ই রবীন্দ্র-রচনা চোখে পড়ে মোহাম্মদীতে। তাঁর সাহিত্য, চিন্তা ও কর্মের ওপরও রচনা মুদ্রিত হয়েছে।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা (রবীন্দ্র-সংখ্যা, ১৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা)য় মুসলিম সাহিত্যিক, নবনূর-সম্পাদক, সৈয়দ এমদাদ আলী লিখেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথ স্মরণে'—

> '...যাঁহার কাব্যসুধা পান করিয়া বাঙ্গালী ধন্য হইয়াছে, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য ধন্য হইয়াছে, সেই বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ আর নাই ইহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। কেবল কবিতা ও গানে নহে, সাহিত্যের নানা বিভাগে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ... একাধারে এত শক্তি আর কোনও ভারতীয় কবির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নাই। তাঁহার কবিতার গুঞ্জনধ্বনি সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাই তিনি বিশ্বকবিদের

www.pathagar.com

পর্যায়ে স্থান পাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ধন্য, তাঁহার দেশবাসী ধন্য, যে বঙ্গ সাহিত্যকে তিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, সে সাহিত্য ধন্য। তিনি এবং কবি একবার বর্তমান শতাব্দীতে ভারতের নামকে বিশ্বসাহিত্যে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিশোর বয়সে যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতার সহিত প্রথম পরিচিত হই তখন কী আনন্দের বন্যা যে মনের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইত তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না।" (পৃ ৭২০)

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা—'সালাম অস্ত-রবি' ('কাব্যগীতির শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, দ্রষ্টা, ঋষি ও ধ্যানী') এবং বেনজীর আহমদের দীর্ঘ কবিতা 'রবীন্দ্র-প্রয়াণে' সহ ২০/২৫টি রচনা দিয়ে রবীন্দ্র মৃত্যু পরবর্তী সংখ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। বেনজীর আহমদের কয়েকটি চরণ : হে সম্রাট কবি ! /প্রাচ্যের দিগন্ত ভালে গৌরবের দ্যুতি-দীপ্ত রবি, /জেগেছিলে তুমি--/তোমার পরশ লভি/ব্যথা দগ্ধ সারা মর্ত-ভূমি/আনন্দ-অমৃত-রসে হল স্নিগ্ধ ক্লান্ত মধুক্ষরা,/জীবন বন্দনা গানে ডুবে গেল যত মৃত্যু জরা।" (পৃ ৭৩০)

কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবসে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা ছাড়াও মুসলিম সাহিত্যের আলোচনায় মোহাম্মদীতে কাজী নজরুল ইসলামকে প্রতিভাশালী মুসলিম কবি হিসেবে সগর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও কাজী নজরুল ইসলামও মোহাম্মদীর বিরূপ সমালোচনার হাত থেকে (প্রথম দিকে) রেহাই পাননি। প্রথম, যাত্রা আরম্ভ সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩৩৪), নজরুলের 'বাংলার আজীজ' কবিতাটি মুদ্রিত হলেও, পরের সংখ্যাসমূহে নজরুল ধর্মীয় রীতি-নীতিতে পরিহার্য লেখকরূপে গণ্য হন। তাঁকে ধর্মদ্রোহী বা কাফের বলে ফৎওয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পরে যখন মোহাম্মদী মুসলমান লেখকদের নিয়ে সমালোচনা লিখতে গিয়ে কাজী নজরুলকে প্রতিভাধর, জাগরণের অগ্রদূত বলে অভিহিত করতে থাকেন তখন মোহাম্মদীর পাতাতেই (মোটামুটিভাবে ১৯৩৩-৩৪ থেকে), প্রায় প্রতি সংখ্যায়, কাজী নজরুলের কবিতা-গান ও গজল ছাপা হতে থাকে।

যাঁরা মনে করেন, 'মোহাম্মদী' কেবলই নজরুলকে 'কাফের' আখ্যা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের কথায়ও সত্য নেই। যাঁরা মনে করেন, মোহাম্মদী রবীন্দ্র-বিরোধী পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নোবেল প্রাইজ' লাভকে 'ম্যানেজড' বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন কেবল—তাঁরাও ঠিক বলেন না। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা, কবিতা, অভিভাষণ মোহাম্মদীতে পুণর্মুদ্রিত হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে যেখানে হিন্দুস্বার্থ, রক্ষিত হয়েছে আর মুসলমান স্বার্থ বর্জিত হয়েছে বলে মোহাম্মদী গোষ্ঠীর কর্তারা মনে করেছেন—সেসকল ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকেও সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পরাঙ্মুখ হয়নি মোহাম্মদী।

বস্তুতপক্ষে একথা বলতেই হবে, মোহাম্মদীর সমালোচনায় ধার ও ভার দুই-ই ছিল। তাঁদের সমালোচনা ছিল সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের গর্বে গরীয়ান, জাগ্রত সচেতন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বা জোসে উজ্জীবিত, মুসলমানী জাগরণের চেতনায় সমৃদ্ধ। তবে তাঁরা যে এতদিন পশ্চাৎপদ ছিলেন এবং তাঁর পেছনে হিন্দুদের সক্রিয় হস্তক্ষেপ, ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, আর মুসলমানদের উদাসীনতা, অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা কাজ করেছিল—সে বিষয়েও তাঁরা ছিলেন সচেতন।

বাঙলা সাহিত্যের আলোচনায় তাঁদের এই সচেতনতার তথা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাঠক-সমালোচককে খুশি করে। আর সত্যি বলতে কি, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের

www.pathagar.com

অগ্রগতির ইতিহাস চলচ্চিত্রের মতোই মোহাম্মদীতে চিত্রিত হয়ে অছে। বস্তুত 'মোহাম্মদী' ও 'সওগাত' কাজী নজরুল থেকে কবি শামসুর রাহমান কিংবা নির্মলেন্দু গুণ, রফিক আজাদ, আবুল হাসান পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক বিকাশের নিখুঁত দলিল হয়ে রয়েছে।

উনিশ ও বিশ শতকের প্রধান কবি সাহিত্যিক কায়কোবাদ (১৮৫২-১৯৫২), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩১) আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) ; সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৫-১৯৫৬), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) থেকে আবুল ফজল, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আহর্সান হাবীব, আবু রুশদ, শওকত ওসমান, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, মুহম্মদ আবদুল হাই, আলাউদ্দীন আল আজাদ—সকলের রচনাই কালে কালে ছাপা হয়েছে মোহাম্মদীতে। মোহাম্মদী প্রকাশের সময় যেসকল কবি সাহিত্যিক ভূমিষ্ঠ হননি, বড় হয়ে (নবীন লেখক) তাঁরাও মোহাম্মদীর 'আধুনিকী' বিভাগে আধুনিক কবিতা বা সাহিত্য মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করেছেন। বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রগতিতে মোহাম্মদীর ভূমিকা তাই অপরিসীম এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার কার্যক্রমের বিস্তৃত বিবরণও দেয়া প্রায় অসম্ভব।

২

মোহাম্মদী-সম্পাদক আকরম খাঁর সম্পাদকীয় যোগ্যতা ও শক্তি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ দশজন সম্পাদকের সঙ্গে তুলিত হতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার, হুমায়ুন কবির, সিকান্দার আবু জাফর —এঁরা ছিলেন জাত-সম্পাদক। আকরম খাঁর জীবন সাধনার অন্যতম পন্থা বা সহযোগী ছিল সংবাদ সাময়িকী ও সাহিত্য পত্রিকা। তাঁর সংগ্রামের হাতিয়ারও ছিল সাহিত্যপত্রিকা ও সংবাদ সাময়িকী। তিনটি দৈনিক সংবাদপত্র, একটি সাপ্তাহিকী, একটি মাসিক এবং উর্দু 'জামানা' ও ইংরেজি 'কমরেড' প্রভৃতি মিলিয়ে ১৯০৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত সাময়িকপত্র সম্পাদনার এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন—তার নজীর বাঙলা সাময়িকপত্রজগতে খুব বেশি মেলে না।

লক্ষণীয়, ভারতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, আনন্দবাজার, দেশ, চতুরঙ্গ, পরিচয় প্রভৃতি দীর্ঘজীবী পত্রিকা বটে, কিন্তু এগুলোর সম্পাদনা এক হাতে বা অভিন্ন নেতৃত্বে হয়নি। কিন্তু আকরম খাঁ ১৯০৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত মোহাম্মদী-র প্রত্যক্ষ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবন এ ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা করেছিল।

মওলানা আকরম খাঁ ইংরেজি পত্রিকা 'কমরেড' (১৯৪৬) এবং উর্দু 'জামানা' (১৯২১—) সম্পাদনার মাধ্যমে তাঁর বহু ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন মাদ্রাসায়। তবে মাদ্রাসার প্রথাগত শিক্ষার স্তর থেকে তাঁর শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যের পরিধি ছিল সুগভীর সুবিপুল, সুবিস্তৃত। উর্দু, হিন্দী, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করে তিনি নিজেকে একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিত হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম, কোরান, হাদীস সম্পর্কে

www.pathagar.com

তিনি যে যুগোপযোগী, প্রাণসঞ্জীবনী ব্যাখ্যা ও ফৎওয়া প্রদান করে গেছেন, তা মুসলমান সমাজকে গোঁড়ামীর অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে, অগ্রগতির পথে একশ বছর এগিয়ে দিয়েছে।

মওলানা আকরম খাঁ ১৮৯৬ সনে কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর আগে তিনি আহলে হাদীস ও মুহাম্মদী আখবার (১৮৭৮) নামক দুটি সাময়িকীতে কাজ করেন। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯০৩ সনে সাংবাদিকতা পেশায় প্রবেশ করেন বেতনভুক্ সম্পাদক হিসেবে স্বল্পায়ু 'মোহাম্মদী'র মাধ্যমে। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী (কংগ্রেসী ধারায়) আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ ঘটে। তাঁর পিতাও চব্বিশ পরগনা জিলার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হাকিমপুর নিবাসী মওলানা আবদুল বারী খান একজন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছিলেন।

১৯০৬ সনে আকরম খাঁ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ বছরের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর যে জাতীয়-চেতনার বিকাশ ঘটে, তাই ছিল পরবর্তীকালের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ভিত্তি। ১৯০৮ সনে তিনি সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে (মাঝে মধ্যে অনিয়মিত হয়েছে) প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পত্রিকা প্রকাশের পেছনেও কাজ করেছে মুসলমান সমাজের উন্নতি সমৃদ্ধি সাধনের ভাবনা। পত্রিকার মতো স্থায়ী সাহিত্যিক মাধ্যম ছাড়া কেবল রাজনৈতিক বিবৃতি ও বক্তৃতায় যে ভালো কাজ হয় না, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

দারিদ্র্য ও শিক্ষাবঞ্চিত মুসলমানদের অভাব অভিযোগ তুলে ধরার জন্য ও তাঁদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও অন্ধ কুসংস্কার দূর করার জন্য সাহিত্যিক মুখপত্রের প্রয়োজন—সে চিন্তা থেকেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পত্রপত্রিকা সম্পাদনা, সাংবাদিকতা ও সাহিত্য সাধনা থেকে বিচ্যুত হননি। পরবর্তীকালে 'দৈনিক আজাদ' প্রকাশিত হলেও তিনি তাই সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর প্রকাশ বন্ধ করেন নি। এই পত্রিকায় একদল মুসলিম লেখক ও সাংবাদিক নিজেদের চিন্তা ও সাহিত্যের চর্চা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর লেখক সাংবাদিকগণ মুসলমানদের জন্য জাগরণমূলক বহু লেখা ও খবর ছেপে তখনকার অবিভক্ত বাঙলা, আসাম ও ব্রহ্মদেশের মুসলমানদের একটি প্রিয় পত্রিকায় পরিণত করেছিলেন। এ পত্রেই বাঙলাভাষী মুসলমানেরা স্বীয় স্বার্থ ও অভাব-অভিযোগের কথা তৎকালীন শাসকবর্গের দৃষ্টিগোচর করেছিলেন। কিন্তু সাপ্তাহিকে সাহিত্যচর্চার সুযোগ ছিল সীমিত। সেজন্যও মাসিক মোহাম্মদীর প্রকাশের প্রয়োজন ছিল।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ বাঙলা তথা ভারতের রাজনীতি ও সাংবাদিকতা জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হলেও তিনি ছিলেন একাধারে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক, গবেষক, পণ্ডিত ও রসবেত্তা। ধার্মিক বা শাস্ত্রজ্ঞ হিসেবে তিনি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। ১৯১৩ সনে 'আঞ্জুমানে ওলামা' গঠিত হলে তিনি এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। এটি ইসলামী চিন্তাবিদদের জ্ঞানালোচনার প্রতিষ্ঠান ছিল। তাঁদের কাজ ছিল মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি ও তাঁদেরকে সংঘবদ্ধ করা।

মওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), শেরে বাঙলা এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৩—১৯৬২), মওলানা আবুল কালাম আজাদ, (১৮৮৮-১৯৫২), মওলানা মোহাম্মদ

www.pathagar.com

আবদুল্লাহিল বাকী (১৮৮৬-১৯৫২), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮২-১৯৩১) প্রমুখ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ সনে 'আঞ্জুমানে ওলামা'র মুখপত্র-'আল এছলাম' প্রকাশিত হয়। আকরম খাঁ এই পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন সহকারী সম্পাদক।

'আল এছলাম' বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের সার্বিক জাগরণে যে কি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে, তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ১৯৬০ সনের বি.এ. শ্রেণীর পাঠ্য বাঙলা প্রবন্ধ-সংগ্রহখানা দেখলেই বুঝা যায়। এই গ্রন্থে সংকলিত অধিকাংশ প্রবন্ধই 'আল্-এছলাম'-এর রচনা। ছয় বছরে যতো উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়—তাতে ঘুমন্ত মুসলমান জাতিকে কষাঘাতে জাগাবার চেষ্টাটি আগে চোখে পড়ে।

আল-এছলামের পরে, ১৯২০ সনে আকরম খাঁ উর্দু দৈনিক 'জামানা' প্রকাশ করেন খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে সহযোগিতা করার জন্য। এর দ্বারা আকরম খাঁ ভারতের উর্দু-সাংবাদিকতার জগতেও স্থান লাভ করেন।

এই সময়ে তিনি সাপ্তাহিক সেবক, দৈনিক সেবক, দৈনিক মোহাম্মদী প্রভৃতি দ্বারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের উদ্দীপক হিসেব অগ্নিঝরা বক্তব্য দিয়ে ব্রিটিশের বিচারে শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে কারাগারে অন্তরীণ হন। খেলাফৎ ও অসহযোগ প্রভৃতি আন্দোলন অবসানের এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর (১৯২৫) কয়েক বছরের প্রান্তে গিয়ে (১৯২৭) তিনি মাসিক মোহাম্মদীর প্রকাশনায় হাত দিয়েছিলেন। অতএব এর চেতনায় ছিল প্রাজ্ঞতা।

এই পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন তাঁর পুত্র মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ। তৎকর্তৃক মোহাম্মদী পাবলিশিং কোম্পানি ২৯ নং আপার সারকুলার রোড, কলকাতা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এরপর ৮৬-এ লোয়ার সারকুলার রোডে তাঁদের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে মাসিক মোহাম্মদীর বার্ষিক মূল্য ছিল সডাক তিন টাকা, পরে তিন টাকা সাত আনা হয়। একবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৪ পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তার ক'মাস আগে (১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট) 'পাকিস্তান' ও 'ভারত' দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপ নেয় এবং মোহাম্মদীও ঢাকায় চলে যায়।

অতএব এই অভিসন্দর্ভে পরবর্তী কাহিনী বিস্তৃত করার দরকার নেই। কিন্তু এখানে এটুকু বলা চলে যে, মোহাম্মদীর ব্রিটিশ শাসনাধীন পর্বের ভূমিকা ছিল বিরোধী দলীয়, ফলে তাতে বিপ্লবীর, বিদ্রোহীর, ত্যাগী-সংগ্রামী-চেতনা ছিল, যাকে জাগরণের যুগ বলা চলে। পরের অধ্যায়ে ১৯৪৯ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত মাসিক 'মোহাম্মদী' ঢাকা থেকে পাকিস্তান-সরকারের সহযোগী হয়ে, সেকালের অবক্ষয়ীধারার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছে। এর পূর্ব-প্রাধান্য ও উন্নততর মর্যাদা তখন (১৯৪৭-৭১) আর ছিল না।

পাকিস্তানে তখন পাকিস্তান-বিরোধী মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপক্ষে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এবং সেটাই ছিল জাগরণের, উত্থানের শক্তি ও লক্ষ্য। বস্তুত মোহাম্মদীর দুই পর্বই তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখলেও এর সাতচল্লিশ পূর্ববর্তীকালের অবদানই ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন। কারণ, স্বাধীন পাকিস্তান এর পুণ্যভূমিতে মুসলমানদের জন্য অনুকূল পরিবেশে ইসলামী জাগরণমুখী, সরকারি ধারার পত্রিকা প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা ছিল না। কিন্তু পরাধীন ঔপনিবেশিক শাসনামলের হতোদরিদ্র, পশ্চাৎপদ

www.pathagar.com

মুসলমানদের স্বকীয় ও স্বাধীন চেতনাধারায় সাহিত্য-শিল্প চর্চার সুযোগদান ও ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজটি ছিল কঠিন এবং সেজন্য যুগান্তর সৃষ্টিকারী।

১৯৪৭ এর পর পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য লড়াইকারী বাঙালি মুসলমানদেরকে প্রশিক্ষণ দ্বারা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের যে সকল পত্রিকা—তার মধ্যে মোহাম্মদীই শ্রেষ্ঠতর। এর সঙ্গে তুলনীয় কেবল মাত্র 'সওগাত' এবং সে-সওগাতও অন্য বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতর এবং অতুলনীয়।

সে যাহোক, মাসিক মোহাম্মদীর পাতায় যে সমস্ত লেখকদের রচনা দেখা যায়, তাঁদের অনেকেই একালের মুসলমানদের কাছেও অপরিচিত। আবার সুবিখ্যাত লেখকদের রচনাও প্রথম থেকেই এর পাতা দখল করে আছে। মোহাম্মদী-পরিক্রমা তাই ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মূল্যবান বিবেচিত হবে।

৩

মোহাম্মদীর প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনা ছিল কোরআন ও হাদীসের আলোচনা—যা মওলানা আকরম খাঁ পরিকল্পিত ও রচিত। বেনামীতে তিনি 'এছলামের আদর্শ' শীর্ষক একটি রচনাও লেখেন। কাজী কাদের নওয়াজ মোহাম্মদীকে স্বাগত জানিয়ে 'স্বাগতম' শীর্ষক কবিতা লিখেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের 'বাংলার আজীজ' শীর্ষক কবিতা, বুলবুল-সম্পাদক মুহম্মদ হবীবুল্লাহ (বাহার) এর প্রবন্ধ 'হজ্জে আকবর' ছাড়া অন্যান্য যেসব লেখক লিখেছিলেন, তাঁরা হলেন : মওলবী কাজী নওয়াজ খোদা (প্রবন্ধ, ওমর খৈয়াম) ; এস. ওয়াজেদ আলি (প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ) ; শাহাদাৎ হোসেন (কবিতা, মহাপয়গাম) ; আকরম খাঁ (বেনামী রচনা, খ্রীষ্টান লেখকগণের ভ্রান্তি) ; গোলাম মোস্তফা (কবিতা, ক্রন্দসী) ; নজীর আহমদ চৌধুরী (প্রবন্ধ, আহমদ ছা'দ পাশা জগলুল) ; শাহাদাৎ হোসেন (গল্প, কাঁটাফুল) এবং ছৈয়দ মোহাম্মদ নজীর আবু ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী (প্রবন্ধ, বাদশাহ আমানুল্লাহ)।

বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকা থেকে অনূদিত রচনাও আছে। আলোচনাগুলোর শিরোনাম ছিল 'সভ্যতার স্বরূপ' ; 'ম্যালেরিয়া প্রসঙ্গ' ; 'চীন প্রসঙ্গে' ; 'ইটালীয়ান মন্ত্রী' ; 'ভারতের অন্ন-সমস্যা' এবং মওলানা আকরম খাঁর ধারাবাহিক রচনা 'অভিব্যক্তিবাদ'। এছাড়াও ছাপা হয় 'মোসলেম জগতে সাময়িকপত্রিকা' শীর্ষক একটি আলোচনা। এই আলোচনার মূল বক্তব্য হলো : 'মোসলেম জগতে সাময়িক-পত্রিকার প্রচার খুব বাড়িয়া গিয়াছে' ; এবং এক-সুরে, এক ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হয়ে তাঁরা কাজ করছেন।

সম্পাদকীয় ('আলোচনা') বিভাগে ছাপা হয় : 'চরিত্র ও এছলাম' ; 'আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার' ; 'পাশ্চাত্য গবেষণার নমুনা' ; 'মোহাম্মদ কে?' ; 'যাদুকর আরব' ; 'মুছলমানের শূকর-বিদ্বেষ' ; 'রাজনৈতিক গবেষণা' ; 'মেও-পিলচার আন্দোলন' ; 'শরৎবাবুর অভিমত' ; 'ডারউইনের উদ্বর্ত্তনবাদ' প্রভৃতি। এ থেকে বুঝা যায় 'মানুষের আসলরূপে বিশ্বমানবের সন্নিধানে পৌঁছাবার', প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস-এর ধরণ ছিল কীরূপ।

উপরিউক্ত রচনার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে আকরম খাঁর মানসিকতাও বুঝা দরকার।

www.pathagar.com

১৯২১–২৫ সময়কালে (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবৎকাল পর্যন্ত) বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অবস্থা মোটামুটি বসোবাসউপযোগী ছিল। তিনি ১৯২৩ সনে বেঙ্গল–প্যাক্ট এর ব্যবস্থা করেছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময়ও (১৬–৬–১৯২৫) ঘনিয়ে এলো, আর বিপ্লবী নেতা লালা হরদয়ালের এই ঘোষণাও জারী হলো : "হিন্দুস্থানে হিন্দুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হিন্দু সংগঠন ও মুসলমানদের 'শুদ্ধিকরণ' দ্বারা হিন্দুকরণ ও আফগানিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ 'শুদ্ধি' করে অধিকার করা।" —এই উক্তিতে মুসলমান নেতৃবৃন্দের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

তদুপরি শুদ্ধি সংগঠনের আন্দোলন স্বামী শ্রদ্ধানন্দর নেতৃত্বে জোরদার হয়ে ওঠে। ফলে জাতীয়তাবাদী বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ডাক্তার সাইফুদ্দীন কিস্‌লু প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'তবলীগ' ও তান্‌জীম' নামে দুটো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মওলানা আকরম খাঁ তখন ডাক্তার কিস্‌লুর সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং এই আন্দোলনের প্রচার কার্যের জন্য মোহাম্মদীকে ব্যবহার করেছিলেন।

'শুদ্ধি' সংগঠন ও 'তবলীগ' আন্দোলনকে একই পর্যায়ভুক্ত করে দেখা ঠিক নয়। কারণ দুটোর প্রকৃতি ভিন্ন রকম। তবলীগের কাম্য ছিলো মুসলিম সমাজের ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করা ; আর শুদ্ধি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো অপর সম্প্রদায়ের মানুষকে ছলে বলে, যে কোন প্রকারে ধর্মান্তরিত করে 'আর্যসমাজ'ভুক্ত করে নেওয়া।

মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন একাধারে সমগ্র সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় মুসলিম সমাজের একজন পরম হিতৈষী। সুতরাং মুসলমান সমাজের একান্ত মঙ্গল কামনায় তিনি 'তবলীগ' ও 'তানজীম' আন্দোলনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অমানবতাবাদী, খুন খারাবিতে বিশ্বাসী ছিলেন না।

১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে 'শুদ্ধি' আন্দোলনের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লীতে এক মুসলমান যুবক কর্তৃক নিহত হলে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে মওলানা আকরম খাঁও তীব্র ভাষায় এর নিন্দা করেছিলেন। তাঁর উক্তি শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন :

> আজ হতে পাঁচ বৎসর আগে (১৯২১) মুসলমানরা ইসলাম ধর্মের উদারতার জলন্ত নিদর্শনস্বরূপ যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ জামে মসজিদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে পবিত্র 'মেম্বর' (pulsit) এর উপর দাঁড়িয়ে তাঁকে বক্তৃতা দেবার সম্মান দিয়েছিলো, সেই মুসলমান সমাজের এক ধর্ম্মান্ধ যুবক, সেই স্বামীজীকে হত্যা করেছে শুনে আমি মর্মাহত হয়েছি, এই যুবক মুসলমান সমাজের কলঙ্ক।[৯]

মোহাম্মদীতে আকরম খাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়েছে। মোহাম্মদীর আলোচনায় মওলানা আকরম খাঁর যুক্তিবাদী নিরপেক্ষ ও উদার হৃদয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণে অনেকেই 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে থাকেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই, আকরম খাঁও স্ব–সম্প্রদায় (সমাজ !)–এর কল্যাণের লক্ষ্যেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। কিন্তু অন্য সমাজের নিপাত তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। বড়ো জোর বলা চলে : তিনি সাম্প্রদায়িক হিন্দুর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মুসলমান ছিলেন। মুসলমানদের অস্তিত্বের বিবেচনায় এই সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য অর্থ করা সঙ্গত হবে না। যদিও একটি মহল

www.pathagar.com

থেকে 'আক্রমণ খাঁ' হিসেবে তিনি নিন্দিত হয়েছেন। আজাদ-মোহাম্মদী কওমী পত্রিকারূপে খ্যাতি ও অখ্যাতি দুটোই অর্জন করেছে।[১০]

৪

আকরম খাঁ যদি রাজনীতি না করতেন, তাহলেও উনিশ শতকে জন্মগ্রহণ করা লেখকের মধ্যে তিনি উজ্জ্বল স্থান লাভ করতেন। তাঁর অবস্থান রামমোহন রায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের সারিতে। বাঙালিকে ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করে তোলার জন্য তাঁর পাণ্ডিত্য কাজে লেগেছে রামমোহন বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্তের প্রজ্ঞার মতোই। মুসলমান সমাজের প্রগতিশীলতার সাধনায় তিনি প্রতিক্রিয়াশীলের অমর্যাদা লাভ করলেও বৃহত্তর সমাজে যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে রচিত তাঁর শাস্ত্রীয় সাহিত্যের যে বিপুল প্রভাব—তার মাপকাঠিতে বলতেই হবে যে, মুসলমানীত্বের গোঁড়ামী থেকে মুক্তির পথে তাঁর 'সমস্যা ও সমাধান', আর মোস্তফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা 'মোস্তফা চরিত' ইত্যাদি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রভূত পরিমাণে কার্যকর অবদান রেখেছিল।

যে-সকল রচনার আলোকে মওলানা আকরম খাঁর এই মূল্যায়ন—বলা আবশ্যক যে, সে সমস্তই বেরিয়েছিল মোহাম্মদীতে। প্রায় প্রতি সংখ্যায় স্বনামে ও বেনামীতে ('আলোচনা', সম্পাদকীয় কর্মসহ) যা তিনি রচনা করেছেন,—গোটা মোহাম্মদীর তা এক বৃহৎ অংশ। মোহাম্মদ আকরম খাঁর বিশাল রচনাবলি 'মোহাম্মদী' ও 'আজাদ' প্রভৃতি তাঁর স্বসম্পাদিত পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত রচনা ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিকে সামনে নিয়ে লেখা অর্থাৎ 'কাজের সাহিত্য'। 'ভাবের সাহিত্য' তিনি রচনা করেছেন কম।[১১] সে সময়ও তাঁর ছিল না।

তরুণ-অবস্থা থেকে রাজনীতির সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্টতার ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৩৭ সনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর বাগ্মিতা, সাংগঠনিক প্রতিভা ও নেতৃত্বের যোগ্যতা সারা ভারতের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯২৯ সনে 'চৌদ্দ দফা' প্রণয়নের কালে তিনি জিন্নাহর দৃষ্টিতে এসেছিলেন। আইন সভার সদস্য হিসাবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন।

এই সচেতনতা থেকেই তাঁর পত্রিকায় মুসলমানদের বঞ্চিত করার সকল অপচেষ্টার প্রতিবাদ ছাপা হয়েছে। সেজন্য লিখেছেন অনেক রাজনৈতিক প্রবন্ধ—মোহাম্মদীর পাতাতেই—যেমন : কাটমোল্লা ও আকাট পণ্ডিত (১/৭) ; বিবাহের বয়স নির্ধারণ (১/৭) ; মোছলেম খর্পরে গির্জা প্রতিষ্ঠা ; মোছলমানের সংখ্যাগত অনুপাত ও খ্রিষ্টান লেখকগণের ভ্রান্তি (১/১) ; কাজী আবদুল ওদুদের 'নবপর্য্যায়'এর ছিদ্রান্বেষী আলোচনা 'নব-পর্য্যায় না নব-পর্য্যয়' ; মোল্লা-প্রভাবের অনিষ্টকারিতা (১/৯) ; সংবাদপত্রে মহিলাচিত্র (১/৮) ; বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার (১/৯) ; মুসলমান কর দাতার সংখ্যা (৫/৭) ; জয় মোহাম্মদ ! জয় মোস্তফা (১/১২) ; এছলাম ও দণ্ডবিধি (৫/১) ; সত্যকার এছলাম (৫/৩) ; মক্তব মাদ্রাসার পাঠ্য ও হিন্দু-বিবৃতি (৫/৮) ; সংখ্যাবিজ্ঞান (৫/৮) ; লেথিয়াল কমিটির রিপোর্ট (৫/৯) ; জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ (২/১) ; মোহসেন স্মরণে (২/৩) ; ব্যাকটু দি কোরআন—হজ্জের

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা (২/৯) ; মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ (২/১১) ; চিত্রকলা ও এছলাম (৩/৮) ; গণিত ও গণতন্ত্র (৪/৫) ; অবরোধ ও উচ্ছৃঙ্খলতা (৪/৭) ; মুসলমানের বর্ণবিচার (৬/৬) ; বাঙ্গালায় রাজ-কর কাহারা বেশি দেয় (৮/৬) ; শরৎচন্দ্রের নতুন ভাব (১০/১) ; নারী হরণের অভিযোগ (১০/২) ; মোছলেম বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি (৯/১২) ; বন্দেমাতরম-বিরোধী আন্দোলন (১১/১) ; বাঙ্গালার সীমানা (১১/১০) ; মুসলমানের জাতিত্ব ও সংস্কৃতি (১২/৪) প্রভৃতি।

তাছাড়া তিনি জিন্নাহ্, মুসলিম লীগ, শওকত আলী, কংগ্রেসের রাজনীতিসহ প্রবাসীতে উত্থাপিত মুসলমানসংক্রান্ত যাবতীয় রচনার সমালোচনা করেছেন 'আলোচনা' নামের সম্পাদকীয় বিভাগে। তিনি একা লিখতেন না, সহকর্মীরাও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরই অনুকরণে লিখেছেন। 'বাঙ্গলা সাহিত্য ও মুসলমান' বিষয়ে লিখেছেন। লিখেছেন উর্দু-বাংলা ও উর্দু-হিন্দীর বিতর্কে অংশ নিয়েও। ইসলাম ধর্মের কুসংস্কার ও গোঁড়ামী বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক লিখেছেন—'সমস্যা ও সমাধান' শিরোনামে। এই রচনায় তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে সঙ্গীত, চিত্রকলা, নারী-স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে হাদীস-কালামের উদ্ধৃতিসহ লিখেছেন এবং সকল প্রগতিশীল মুসলমান লেখক আকরম খাঁর এই বক্তব্যের ভিত্তিতে মুসলমানদেরকে সঙ্গীত চিত্রকলা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। 'সমস্যা ও সমাধানে'র সঙ্গীত সংক্রান্ত কটি উক্তি :

> এছলাম ধর্মে সঙ্গীতকে সঙ্গীত বলিয়া হারাম করা হইয়াছে—হজরত রসুলে করিমের সেরূপ কোন আদেশ আমরা এ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। সঙ্গীত সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষ হজরতের নামকরণে যে-সকল তথাকথিত হাদিছের উল্লেখ করিয়া থাকেন, অভিজ্ঞ মোহাদ্দেছগণের মতো তাহার একটীও বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ...সঙ্গীত হারাম হওয়া সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিছ বিদ্যমান নাই।[১২]

'সমস্যা ও সমাধান' প্রবন্ধে ব্যক্ত আকরম খাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে 'আল-মুসলিম' সাপ্তাহিক পত্রিকার ম্যানেজার (ফজলুল হক সেলবর্ষী) অসংযত ভাষায় প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছিলেন মোহাম্মদীর কার্যালয়ে। এর জবাবে মোহাম্মদী থেকে বলা হয় : 'প্রতিবাদ করুন যুক্তি দিয়া, ছাপিব, কিন্তু যুক্তিশূন্য আক্রোশে কি শিক্ষিতসমাজ ভুলিতে পারে?"

(মোহাম্মদী ২ বর্ষ, ২ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

৫

মাসিক মোহাম্মদীর দৃষ্টিতে বাঙলা সাহিত্যের স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরীর এই রচনাটিতে। —

> মুছলিম বন্ধু যেভাবে হিন্দু কালচারের ভিতরে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিতেছে, তাহার পরিণাম ফল যে কি হইবে, চিন্তা করিয়া কোন কিনারা পাওয়া যায় না।...জাতীয় সাহিত্যের অভাবই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। গত একশত বৎসর ব্যাপিয়া পৌত্তলিক হিন্দুয়ানী মুছলিম-বিদ্বেষী সাহিত্যই আমাদের কৌমকে এত গয়ের ইছলামী করিয়া ফেলিয়াছে। জাতীয় সাহিত্য গঠন করিলে সে সাহিত্য যে জাতীয়তার গতি নির্দেশ করিয়া দেয়, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। পৌত্তলিক বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা আমাদের কৌমী জিন্দেগীর ধারাকে একেবারে বিষাক্ত করিয়া দিয়াছে। ১৮০০ সনের

www.pathagar.com

পর হইতে হিন্দু জাতির পুনর্জ্জাগরণ ও মুছলিম জাতীয় জীবনের অধঃপতনের আরম্ভ হয়। হিন্দু সাহিত্যের অনুকরণে তথাকথিত মুছলিম কবিরা যে বিষাক্ত সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, ইহা সমাজের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া সমগ্র মুছলিম সমাজকে দিনদিন হিন্দু ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে চৈতন্যযুগ হইতে বিদ্যাসাগরী যুগ পর্য্যন্ত নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য কবিরা বৈষ্ণব প্রেমে বিভোর হইয়া যেভাবে নিজের মজহব ও আকিদায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। মুনসি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ছাহেব ও ডা. দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই যুগের 'বৈষ্ণব পদাবলী লেখক' মুছলিম কবিগণের যে লিষ্ট দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে অবাক হইতে হয়। ...এতগুলি মুছলিম কবি হিন্দুয়ানী আদর্শে বিভোর হইয়া মনের পিপাসা মিটাইলেন ইহা হইতে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্য নির্ব্বাচন প্রণালীর আমূল পরিবর্তন ও জাতীয় সাহিত্যের গঠনই এই ব্যাধির একমাত্র মহৌষধ। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা আমাদের জাতীয় শিক্ষার অভাব দূর হইবে না। আমাদের ইছলামী কালচার ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে বাঙ্গালার মুছলিম ছাত্রগণের জন্য—এক সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয় নেহায়েত আবশ্যক।[১৩]

লেখক সচেতন যে এরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হিন্দুরা 'সাম্প্রদায়িকতার নামে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিবেন'। কিন্তু হিন্দুরা সমগ্র ভারতের মধ্যে শিক্ষায় ও ধনে অত্যন্ত উন্নত ও অগ্রসর হয়েও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুকুল আশ্রম, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজ প্রভৃতি স্থাপন করে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করতে কুণ্ঠিত হননি। এসবে যদি সাম্প্রদায়িকতা বা কম্যুনালিজম এর দোষ না হয়, তবে মুছলমানেরা কিছু করতে গেলেই দোষ হবে কেন?

বাঙলাদেশে মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণ আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে 'পুরাদস্তুর ইছলামী ভাব ও আদর্শ বজায় রাখিয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে হইবে' বলে আহবাব চৌধুরী প্রস্তাব করেন এবং বলেন, 'সে সাহিত্যে শিরক ও পৌত্তলিকতার ছায়ামাত্র স্পর্শ করিবে না। ...উর্দুর ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাকে খাছ ইছলামী ভাষায় পরিণত করিতে হইবে।' কামাল পাশা প্রমুখের উদাহরণ তুলে তিনি বলেন, মুসলমানেরা যদি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামী ভাষায় পরিণত করতে না পারেন, তাহলে সে-লজ্জা কোথায় রাখা যাবে? তারপর ইতিহাস, কাব্য ও সাহিত্য সম্পূর্ণ ইছলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। হজরতের জীবনীর মহান আদর্শ, খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিবৃত্ত, মুছলিম বাদশাহগণের কীর্তিকলাপ, ওলীদরবেশ ও উলামা, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের জীবনকাহিনী সর্বত্র প্রচার করিতে হইবে। মওলানা আকরম খাঁর সূত্র উল্লেখ করে আহবাব চৌধুরীও মন্তব্য করেন, 'আরবী আমাদের জাতীয় ভাষা ও জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার। জ্ঞানের সেবা, মানবের অধিকার, সমাজের আদর্শ, রাষ্ট্রের শাসন ও উদার অর্থনীতি প্রভৃতির যে মহান আদর্শ আরবী সাহিত্যে আছে, তাহা নিজ মাতৃভাষার মধ্যদিয়া জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিতে হইবে।'[১৪]

মোহাম্মদীর একজন লেখিকা—মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা 'সাহিত্য ও আর্ট' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

www.pathagar.com

সাহিত্যক্ষেত্রে আর্ট ও নীতি লইয়া আজকাল বেশ গোলমাল চলিতেছে। কাহারো মতে আর্টের সহিত নীতির সম্বন্ধ নাই, কাহারো মতে আছে। ইহারই সম্বন্ধে ভীরু গৃহকোণ হইতে আজ দু'একটি কথা কহিতে চাই। আমরা যদি মনে করি সাহিত্যে আর্ট জিনিষটা কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য ও রস সৃষ্টি করার জন্যই তাহা হইলে আমরা ভুল করিব। কারণ নীতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা যাহাই করিনা কেন, তাহাতে অমঙ্গলের আশা আছে। নীতির অপব্যবহারে সৌন্দর্য্যেরই ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। কিন্তু নীতির পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যেই সৌন্দর্য্য আছে। সৌন্দর্য্যও আপনি সম্পূর্ণ নয়। তাহার গঠনের জন্য তাহাকেও সৌন্দর্য্যনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নীতির দ্বারাই জগৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে পারা যায়। আর জগৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিবার জন্যই নীতির সৃষ্টি। এবং ইহার প্রমাণ নীতি ধর্মই সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিয়াছে। লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায় যে শৃঙ্খলার উপরেই শান্তির ভিত্তি স্থাপিত। এইজন্য আমরা নীতিকে পশ্চাতে রাখিয়া আর্টের রচনা করিতে পারি না।[১৫]

নজির আহমদ চৌধুরী 'এছলাম ও নজরুল ইসলাম' শীর্ষক রচনায় বলেন : মুছলমান হিসেবে তাঁহার উপর আমাদের ও আমাদের উপর তাঁহার দাবীদাওয়া করার কোন অধিকার আছে কিনা?—

কবি নজরুল ইসলাম সাহেবকে এদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। যে কবিতাগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার কবিপ্রতিভা স্ফুরণ লাভ করিয়াছে বলিয়া বলা হয়—সেখানে তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব হইতেছে—খোদাকে অস্বীকার করিয়া, অমান্য করিয়া, অপমান করিয়া।...উদাহরণস্বরূপ... অগ্নিবীণা... খোদাতায়ালার প্রতি অতি জঘন্য ভাষায় বিদ্রোহ ঘোষণা করাই তাঁহার এই পুস্তকের প্রধান বিশেষত্ব। কবি সেখানে নিজের বিদ্রোহরূপের পরিচয় দিতে দিতে মোছলেম বাঙ্গালার সম্মুখে যে আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন—কোন আজাজীলই (আজাজীলই 'শয়তান' আখ্যায়িত হন') আজ পর্যন্ত ততটা করিতে সাহসী হয় নাই। আজাজীল খোদার একটা আদেশ অমান্য করিয়াছিল—তাঁহাকে সে অস্বীকার করে নাই। ফেরআওন নিজেকে বনি ইসরাইলীয়দের খোদা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। নিজে 'জগদীশ্বরের ঈশ্বর' হওয়ার ধৃষ্ঠতা সেও কোনদিন প্রকাশ করে নাই। কিন্তু আমাদের কবি এদের সকলকে ছাপাইয়া গিয়াছেন। তিনি দম্ভ করিয়া বলিতেছেন—"আমি মানব দানব...খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।'

...এছলামের চোখে এ অপরাধ অমার্জনীয়। মুছলমান সাহিত্যিকগণ শতকণ্ঠে ধিক্কার দিয়া এই পাপ আদর্শকে জাতির সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।[১৬]

নজরুলের বিদ্রোহী কবিতাই শুধু নয়, প্রগতিশীল, বিশেষ করে 'সাম্যবাদ'-প্রভাবিত বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের প্রতিও মোহাম্মদীর কোনো-কোনো রচনায় আক্রমণ করা হতো, বলা চলে প্রতিনিয়তই করা হতো, 'মুসলমানীত্ব' ও 'ইসলাম' এর মূলে যাঁরাই কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন বলে মোহাম্মদীর দল মনে করেছেন—তাঁদেরকেই কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। গোলাম নবীর রচনায় কাজী নজরুল ইসলাম, মোমেনের জবানবন্দী-খ্যাত লেখক মাহবুবউল আলম এবং 'বুলবুল' পত্রিকা প্রভৃতি লক্ষ করে নিয়ে বলা হয় :

'বাঙলা মুসলিম সাহিত্য সবেমাত্র গড়িয়া উঠিতেছে। যাঁহারাই এই সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহাদের দান এখনও নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, কাজেই তাঁহাদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত করিয়া কোন কিছু মত প্রকাশ করিবার সময় এখনও আসে নাই।...একদল 'অতি

www.pathagar.com

আধুনিক' সাহিত্যিক বাঙলার সাহিত্য ক্ষেত্রে 'বর্গীদের মত উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। ...ইহারা মুসলমানের নামাজ, রোজা, কোরান-কেতাব, মসজিদ এমনকি শাশ্বত প্রেম ও সুন্দরের প্রতীক যে তাজমহল—তাহাকেও আঘাত করিয়া ফিরিয়াছেন। ইঁহারা রাশিয়ার 'সাম্যবাদে'র স্বপ্ন দেখেন। কৌশলে ধীরে ধীরে নিজেদের মতবাদকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ইঁহাদের সাহিত্য-সাধনার গোপন উদ্দেশ্য। ইঁহাদের একটী প্রধান বিশেষত্ব এই—ইসলামের প্রতি যে যত আঘাত করিতে পারে, ইঁহাদের চোখে সে তত বড় প্রতিভা। কিছুদিন পূর্বে ইঁহাদের মধ্যে কে কিভাবে ইসলামের অমর্যাদা করিয়াছেন, তাহা সমাজের অবিদিত নাই।...বর্তমানে আরো কয়েকটি 'নূতন প্রতিভা'র আবির্ভাব হইয়াছে।[১৭]

কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ যখন তীব্র হলো, হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে যখন বাঙলাভাষার বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিতর্ক বেধে গেল, তখন মোহাম্মদীর স্বকীয় দলের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামকেই—কারণ মুসলমানদের মধ্যে উন্নত মানের সাহিত্য-স্রষ্টা ও প্রতিভাশালী শিল্পীর জন্ম কেন হয়নি ইত্যাকার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কবি কাজী নজরুলকে নজীর হিসাবে উপস্থাপন না করে উপায় ছিল না। একালে জসীমউদ্‌দীনও উঠে আসেন নজরুলের সাথে। 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যত' শীর্ষক একটি 'আলোচনায়' বলা হয় :

> এ সাহিত্য সত্যিকার যুগস্রষ্টা জিনিয়াসের স্পর্শ লাভ করে নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে।...এর ফলে মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্য হইতে inferiority Complex দূর হইয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে মুছলমান এখন স্বাধীন স্বকীয় মত প্রকাশে আর কুণ্ঠাবোধ করে না।...নজরুল প্রতিভা তাঁদের মাথা উঁচু করিয়া দিয়াছে।[১৮]

সাহিত্যিক প্রতিভার তারতম্য, নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রযুগের নাকি রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রতিভা এবং জসীমউদ্‌দীনের অবস্থানই বা কোন্ যুগে—এসব প্রসঙ্গের এক বিতর্ক গড়ে ওঠে সওগাত (মাঘ, ১৩৪৫) ও মোহাম্মদীর মধ্যে। জসীমউদ্‌দীনকেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়, তাঁর কাব্যদেহ 'অনেকটা রবীন্দ্রযুগীয় কিন্তু প্রাণ নজরুল যুগের'। নজরুল প্রসঙ্গে আবেগী ভাষায় বলা হয়—

> ...দুর্ভাগ্য আমাদের কি নজরুলের বলতে পারি না। কিন্তু তিনি যদি হিন্দুর ঘরে জন্ম নিতেন তাহলে বোধ হয় মাইকেলের মত প্রতিষ্ঠা এতদিনে অর্জ্জন করতে পারতেন। যে দেশের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রতিভাকে যোগ্য স্থান দিতে নারাজ, সে দেশে প্রবন্ধ লিখে প্রতিভা প্রতিপন্ন করতে হয় বইকি।...জসীমকে নজরুল যুগের মনে করাই অধিকতর সমীচীন।...পল্লী এবং নাগরিক ভাষার এমন সুষ্ঠু সংযোগ বাঙলার অন্য কোন কবির কাব্যেই নেই।[১৯]

কবি টেনিসন-এর প্রসঙ্গ এনে আলোচক বলনে, টেনিসন ইংরেজী কাব্যের ভাষা-ছন্দকে এতাদৃশ পরিমার্জিত, পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে গিয়েছেন যে, তৎপরে ভাষার সম্পূর্ণ নবরূপ ও ছন্দ ইংরেজী সাহিত্যে কেউ আশা করতে পারেনি। বাঙলা সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ঘেঁষা বাঙলা ভাষার এতাদৃশ পরিমার্জ্জনা করেছেন যে, সেপথে আর নতুনত্ব আশা করবার কিছুই ছিল না। ছন্দের দিক থেকেও সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য থেকে নেবার বাকী যা' কিছু ছিল সত্যেন দত্ত তার প্রচলন করে দিয়েছিলেন। অনেকেই তাই মনে করতেন—'এরপরে ভাব ছাড়া আর কোনদিকে কোন প্রকার নূতনত্ব ফলাও করার সুযোগই নাই। কবি মোহিতলাল

www.pathagar.com

প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। সেজন্যেই তাঁদের কাব্য মাত্র নবভাব অবলম্বন প্রয়াসী, ভাষা ও ছন্দ সেই রবীন্দ্র ও সত্যেন যুগীয়।'

...কিন্তু বাঙলার বিরাট পুঁথি সাহিত্যের যে মুছলিম রূপ ও ভাবকে অনেকে অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছেন এবং সেপথে নতুন কিছু করা যেতে পারে বলে কারো মনে চিন্তার উদয়ও হয়নি—সেদিকে নজরুল ইসলাম দৃষ্টি দিয়ে 'নূতন দানে বাঙলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করে' তুলেছিলেন। এই মুছলমানী ভাব ও রূপের জন্যই তাঁর সাহিত্যকে যুগ-প্রবর্ত্তক রচনা বলে সংস্কৃত ভাব ও রূপপন্থী হিন্দু সমঝদার ও সাহিত্যিকেরা মেনে নিতে পারছেন না।

লেখক মন্তব্য করেন ; 'কিন্তু মনে করুন, যদি উল্টো ফল হোত (অর্থাৎ কোন হিন্দু কবি পৌরাণিক উপকরণ নিয়ে কাব্য সাহিত্য রচনা করতেন—যেমন মধুসূদন দত্ত)—তাহলে হিন্দুরা কিভাবে নিতেন?'[২০]

৬

বাংলা-সাহিত্য সংক্রান্ত চিন্তারাজিতে মোহাম্মদীর দৃষ্টিই প্রধানত ফুটে উঠেছে একথা বেশি করে উদাহরণ দিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। কয়েকটি রচনার উল্লেখই যথেষ্ট মনে করি। 'বাঙ্গালা সাহিত্য ও মুছলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে মোহাম্মদ আকরম খাঁ বলেন : "বাঙ্গালার হিন্দুর ন্যায় এদেশের মুসলমানও যে সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালাই যে তাহাদের সকলের একমাত্র মাতৃভাষা, সে-সম্বন্ধে দ্বিমত করার বিন্দুমাত্রও অবকাশ নাই। মায়ের দেওয়া ভাষাকে মুছলমানরাও মায়ের মতই প্রিয়, পবিত্র ও মধুর বলিয়া মর্মে মর্মে অনুভব ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কয়িা থাকে। তবুও মাতৃভাষার সেবাক্ষেত্রে হিন্দু ও মুছলমান সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে নানা দিক দিয়া নানাপ্রকার মতভেদ উপস্থিত হইতেছে।' তিনি বলেন,

> অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রকৃতপক্ষে এই মতভেদের মূলে সাহিত্যিক নীতি-পদ্ধতি অপেক্ষা দেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধিই অধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে।...এদেশের মুছলমান এখন বাঙ্গালাকে নিজের মাতৃভাষা হিসাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। সে বাঙ্গালার মধ্য দিয়া নিজের কোরআনকে, হাদীসকে, ইতিহাসকে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে। এই সমস্ত ভাবের ও জ্ঞানের উপযুক্ত বাহনরূপ প্রতিশব্দ অনেক সময় বাঙ্গালা ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে জোর করিয়া বাঙ্গালা বা সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করিতে গেলে হিতে বিপরীত ফল হয়—বাহনের পিঠ হইতে পড়িয়া ভাবটীর অপঘাতে মৃত্যু ঘটে। এইজন্য এসব ক্ষেত্রে মূল আরবী শব্দ ব্যবহার করা ব্যতীত মুছলমান সাহিত্যকের গত্যন্তর থাকে না। কাজেই সাহিত্য-সেবার এই দিকটায় অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মুছলমান সাহিত্যিকদের লেখায় নূতন নূতন আরবী শব্দের আমদানীও অধিক পরিমাণে দেখা যাইতেছে। এই অগ্রগতির অনুপাতে এইসব নূতন শব্দের সংঘাত দিনদিন বাড়িয়া চলিবে। ইহা অসংগতও নহে, অস্বাভাবিকও নহে।[২১]

'আজাদ' থেকে পুনর্মুদ্রিত 'বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয় : 'মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্যিকদের কর্মগুলোর মাধ্যমে বাঙ্গালা সাহিত্য এদেশকে সৌন্দর্যবোধের দিক দিয়ে কতকটা সচেতন করিয়াছে বটে, কিন্তু জাতির জীবনে সত্যিকার নবজীবন সঞ্চার করিতে পারে নাই। কারণ সাহিত্যে 'প্যাগাম' সুলভ সৌন্দর্যপূজারী মনের প্রকাশ যতটা আছে, মুক্তবুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মনের বাস্তব প্রকাশ তাতে তেমন নাই। শেষোক্ত জনও সাহিত্যে সবলতা

www.pathagar.com

লইয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই বলিয়া নানা গুণ সত্ত্বেও ইহা জাতীয় জীবনে ব্যর্থতাই বহন করিয়া আনিয়াছে মাত্র।

বাঙ্গালার সাহিত্যিক হিন্দুমন 'প্যাগাম'-ধর্মী, পূর্ব-সংস্কার (instinct) ইহার স্বভাবগত। এই মনে বুদ্ধি তার বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা লইয়া কখনো জয়ী হইতে পারে নাই। পারিবে কিনা, সে-সম্বন্ধেও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বৈজ্ঞানিক সত্যকেও ইঁহারা আপনার সংস্কারের রঙে রাঙাইয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। এমন মনে মুক্তবুদ্ধির জাগরণ কতকটা অসম্ভাবিত ব্যাপার। অন্তত সাহিত্যক্ষেত্রে এখনো তাহা জাগে নাই। তাই দেখি, বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের যে-কল্পনা সে করিয়াছে, মুক্তবুদ্ধির অভাবে তার স্বাভাবিক প্যাগানধর্মী ধারণার অনুপ্রেরণায় তাহা হইয়া পড়িয়াছে নিতান্তই একদেশদর্শী—নিজের সংকীর্ণ অচলায়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শোচনীয় ব্যর্থতা বহন করা ছাড়া তার গত্যন্তর নাই।

মুক্তবুদ্ধ, জাতির জীবনে নবজীবন সঞ্চারকারী সাহিত্য সৃষ্টি কি বাঙ্গলায় কখনো সম্ভব হইবে না? যে জীবন্ত সাহিত্য নিপীড়িত রুশিয়াকে মুক্তির অরুণরাগে রঞ্জিত করিয়াছে, অভিশপ্ত রুশ জাতি যে সাহিত্যের সঞ্জীবনী মন্ত্রে জগতে অঘটন ঘটাইতে পারিয়াছে, তেমন সাহিত্যের জন্ম বাঙ্গালায় একেবারই অসম্ভব? আমাদের কিন্তু তাহা মনে হয় না।'

নজরুল ইসলামের প্রসঙ্গে এই রচনায় বলা হয়, 'নজরুলের রচনা মুক্তবুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি নহে, তবু নবজীবনের প্রেরণা ইহাতে কতকটা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই জন্যই আশা হয়, হয়ত সে-সাহিত্যের স্রষ্টা আসিতে বেশী দেরী নাই। তবে সংস্কারের পূজারী, 'প্যাগান-ধর্মী' হিন্দু-সাহিত্যিকদের মধ্যেই তিনি আবির্ভূত হইবেন, এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মুসলমান গণতন্ত্রধর্মী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী। মনে হয়, মুক্তবুদ্ধ সাহিত্যসাধক ইঁহাদের মধ্য হইতেই আসিবেন।'[২২]

'সাহিত্য ও আমাদের সমাজ' শীর্ষক একটি আলোচনায় মোহাম্মদীর আকুল আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। ১৯৩০ এর জানুআরি-ফেব্রুআরিতে লেখা ঐ সম্পাদকীয় 'আলোচনায়' বলা হয় :

> 'ধীরে ধীরে বাঙ্গালী মুছলমানের নিশ্চল সাহিত্যজগতে একটা স্পন্দনের অনুভূতি দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহা এখনও অনুভূতির অস্পষ্টালোককে ছাড়াইয়া প্রকাশের জাগর লোকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।...আজ আমাদের অন্তরের বেদনা বর্ণহীন আকুলতায় পথ খুঁজিয়া মরিতেছে—সমগ্র জাতি ও সমাজ আজ মৌন আকাঙ্ক্ষায় বসিয়া আছে—কোথায় সে সাহিত্যিক, কোথায় সে বাণী সাধক, যে জাতির অন্তরের এই পুঞ্জিভূত বেদনাকে অন্তরের অসীম দরদে নব মূর্তি দিবে? যে কথা আজ লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ঘরে, অজ্ঞানতার নিগূঢ় অন্ধকারে গুমরিয়া মরিতেছে ; যে অসহায় আর্তনাদ আজ কোটী বক্ষে তুফান তুলিতেছে, কে সেই অন্ধকার ঘরে বিলুপ্ত গুমরাণিকে জাতির বুক হইতে টানিয়া আনিয়া জাগরণের বাণীতে পরিণত করিবে? অসহায়ের ব্যর্থ আর্তনাদকে নব জীবনের মহা সঙ্গীতের রূপ কে দিবে? সমগ্র মুছলমান সমাজ আজ তাহার আগমন প্রতীক্ষায় আছে?'[২৩]

বস্তুতপক্ষে মোহাম্মদী বাঙালি মুসলমানের অন্তরের বেদনাকে বাণীময়, বাঙ্ময় করে তোলার জন্য, 'জাতির অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনাকে অন্তরের অসীম দরদে' নতুন রূপে মূর্তিমান করে তুলতে চেয়েছিল। হুমায়ুন কবির, আবুল ফজল, আবদুল কাদির, মুজীবুর রহমান খাঁ, সানাউল হক, ইমাউল হক, মাহবুবউল আলম, আবদুল হক, শওকত ওসমান,

www.pathagar.com

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন, সৈয়দ আলী আহসান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ফররুখ আহমদ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আবুল হোসেন, আবু রুশদ, সুফিয়া কামাল, হোসনে আরা, কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ, আবদুল গনি হাজারী প্রমুখের ন্যায় প্রায় অর্ধশত মুসলিম কবি সাহিত্যিকের প্লাটফরম তৈরি করে দিয়েছিল মাসিক মোহাম্মদী।

মোহাম্মদীর উপর্যুক্ত লেখকরাই 'বাঙলাদেশের বাঙলা সাহিত্যের' প্রথম পর্বের শ্রেষ্ঠ লেখক ও সাহিত্যিক। বাঙলার জাগরণপন্থী, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী মুসলিম সাহিত্যিক ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের (১৮৮৯–১৯৩৬) অকাল মৃত্যুতে মোহাম্মদীও অন্যান্য মুসলিম সম্পাদিত পত্র–পত্রিকার ন্যায় শোক–গাথা প্রকাশ করে।

মুজীবুর রহমান খাঁ, আবদুল কাদির প্রমুখ আধুনিক শক্তিশালী, সাহিত্যিক লুৎফর রহমানের চিন্তাধারার পরিচয় প্রদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অধুনাবিস্মৃত এই লেখক সম্পর্কে একজন হিন্দু কবির (শ্রী বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ) প্রতিক্রিয়া মোহাম্মদীতে ছাপা হয় :

আশা যাওয়া জগতের একমাত্র সার।
নাহি এর কোন খানে গতির বিরাম।
যেথা হতে এসেছিলে করিলে প্রয়াণ
সেথা পুনঃ ; এখানে কি শেষ সাধনার ?
হে কর্মী সাধক সুধী বন্ধু সাহিত্যিক
মিথ্যা হেথা স্নেহ কথা, প্রীতি আলাপন ;
জীবনের বায়স্কোপের কত অগণন
রূপরেখা ফুটে উঠে, মিলায় ক্ষণিক।
সে কথা স্মরণ করি, দুটি আঁখিজল
ফেলে যাই বন্ধু তব গমনের পথে।
তবু তব ছবি সখা মোর মনোরথে
অম্লান কুসুম সম রবে সুনির্মল।
স্বধর্মী তোমারে দেবে বিপুল সম্মান।
ধরো স্নেহে বিধর্মীর অন্তরের দান।

বেগম রোকেয়ার মহাপ্রয়াণেও কবি সুফিয়া কামালসহ অনেকেই শোক–গাথা (কবিতা ও গদ্যে) লেখেন। মোহাম্মদীতে রোকেয়ার 'অবরোধবাসিনী' ধারাবাহিক ছাপা হয়। তাঁর রাণী ভিখারিণী, বলিগর্ত্ত, বিয়ে পাগলা বুড়ো, পঁয়ত্রিশ মন খানা, হজের ময়দানে প্রভৃতি রচনা মোহাম্মদীতে প্রকাশ পায়। নারী জাগরণের মহীয়সী অগ্রদূতীর রচনা মোহাম্মদীরা ছেপেছেন। নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল তাঁদের। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল। আবুল হুসেনের 'পর্দা' সংক্রান্ত আলোচনার সমাদর তাঁরা করতে পারেননি।

পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক 'মোহাম্মদী' ১৯৪০ এর আগে ও পরে বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের 'নিজস্ব আবাসভূমির আকাঙ্ক্ষা' মূর্ত করে তুলেছে কীভাবে তার একটি নমুনা দেয়া যায়, ১৯৪৭ সনের অনেক আগে (১৩৫০/১৯৪৩ এ) রচিত 'পাকিস্তান' শীর্ষক একটি গজল উদ্বৃত করে,—কবি রওশন ইজদানী লিখেছেন :

এই আমাদের বঙ্গভূমি
স্বপ্নলোকের পাকিস্তান,

www.pathagar.com

এই তো মোদের ধ্যানের ছবি,
জীবন মরণ মুক্তি গান॥
ঐ পাকিস্তান গুল–বাগিচায়
গাইবে যে গান বুলবুলি হায়,
জাগবে যে ফুল নওবাহারে
করবে বুকের সুবাস দান॥
পারের ঘাটে ঠেকবে তরী
জীবন দেউটী নিবিয়ে,
তখন যে ঐ গুল সুবাসে
পুলকে নয়ন ঝিমিয়ে আসে,
বুলবুলির ঐ কণ্ঠ সুধায়
হয় যে রুহুর মুক্তি দান।"

তখন হয়ত মুসলমান লেখকদের লিখবার জায়গার নিতান্তই অভাব ছিল না—কিন্তু ১৯২৭ থেকে উনিশ 'শ সাতচল্লিশের মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত যেসব পত্রিকার আলোচনা বর্তমান অভিসন্দর্ভে করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় সওগাত ছাড়া কোন মাসিক সাহিত্যপত্রিকা মোহাম্মদীর ন্যায় নিয়মিত ও দীর্ঘজীবী ছিল না।

সওগাত ১৯২৬ থেকে ১৯৪৮–৪৯ পর্যন্ত কলকাতা থেকে ধারাবাহিক বের হলেও মাঝে মধ্যেই অনিয়মিত হয়েছে। বুলবুল চার সাড়ে চার বছর, জয়ন্তী দুবছর, সবুজ বাঙলা বছর দুই, এরকম এক দুবছরেই আয়ু শেষ করেছে অধিকাংশ পত্রিকা। শিখা ছিল বার্ষিকী। অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে ধর্মীয় সাহিত্য ছিল বেশী, একালের পত্রিকার মধ্যে সংবাদ প্রধান সাপ্তাহিক, অর্ধ সাপ্তাহিক, বা পাক্ষিক পত্রিকার সংখ্যাও কম নয়।

আর যেসব পত্রিকার পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলোর তেমন খ্যাতি গড়ে ওঠেনি। একালে অনুসন্ধানে বের করতে হয়েছে যেগুলো, সেগুলো অনিয়মিত, ক্ষণজীবী, কৃশকায় অপ্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকা ছিল বলে গোটা বাঙলার সাহিত্যিকদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল। ভালো লেখা নিয়মিত ছেপে একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে সেগুলো সুনাম অর্জন করতে পারেনি। আর লেখকদেরও রচনায় উৎসাহ অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেনি নেপথ্যে থেকে।

মোহাম্মদী সেকাজ করেছিল নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে। মনীষী আবুল ফজল একটি রচনায় বলেছিলেন, লেখকদের সামনে সম্পাদক ও সাহিত্য পত্রিকা না থাকলে এবং লেখা ছাপা হয়ে পাঠকদের কাছে গিয়ে না পৌঁছালে লেখকেরা লেখার তাগিদ বোধ করেন না (উত্তরাধিকার, সমকাল, শ্রাবণ ১৩৮৪)।

মোহাম্মদী বাঙালী মুসলমান লেখকদের সামনে ভরসা ও অনুপ্রেরণার স্থল হিসেবে দণ্ডায়মান থেকে (সোলেমানী লাঠি বা তরবারির মতো!) বাঙালী মুসলমান লেখকদের আধুনিক, জীবনবাদী, মানবতাবাদী রচনা প্রণয়নে, সাহিত্যিশিল্প সৃষ্টিতে যে অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে তা অবশ্যই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

শুধু মাসিক মোহাম্মদীর ২০ বছরের কার্যক্রমই নয়, ১৩৩৫ সনে প্রকাশিত 'বার্ষিক মোহাম্মদী', 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'র বিশেষ সংখ্যাসমূহও উৎকৃষ্ট রচনাবলিতে পূর্ণ ছিল।

www.pathagar.com

৭

ত্রিশের দশকের বাংলা সাহিত্য ও 'মোহাম্মদী'

মোহাম্মদীর পৃষ্ঠাগুলোর সমস্ত কথাই আজ আলোচনা করতে মন চায়। ধারাবাহিকভাবে পড়ে গেলে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে মোহাম্মদী যে কীরূপে, কতোটা, অবদান রেখেছিল—তা গবেষকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। একটি ঘুমন্ত জাতি ও সম্প্রদায়কে শিক্ষিত-সাহিত্যমনস্ক করে তোলার পর, তাঁদের দ্বারাই সাহিত্য সৃষ্টি করাবার অভিভাবকসুলভ প্রাণশক্তি ও আশা-উদ্দীপনা নিয়ে মোহাম্মদী পরিচালিত হয়েছে।

একটি শিশুকে যেভাবে পিতামাতা বড় করে তোলেন, দিনে দিনে যেভাবে লক্ষ্য করেন ক্রমবিকাশ—আকরম খাঁ ছিলেন বাংলা সাহিত্যের সেরূপ একজন পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক ; পিতৃসুলভ গৌরববোধ তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হওয়াও স্বাভাবিক। কারণ ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত 'মহাম্মদী আখবার' পত্রিকার প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত হবার সময়েও বস্তুতপক্ষে মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্যে অনাগত, শিশু সুলভ হাঁটি হাঁটি পা পা করছে। মীর মশাররফ হোসেনের কয়েকটি রচনা ও গ্রন্থ পাঠকসমাজের দৃষ্টি কেড়েছে, মুসলিম সাময়িকী ও সংবাদপত্রসমূহের কৈশোর অবস্থা কাটেনি—এমনি সময় থেকে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব অবস্থা পেরিয়ে গেছে, তারপর মোহাম্মদীর প্রকাশ ঘটেছে।

অতএব এই পত্রে তিনি পরবর্তীকালের মুসলিম সাহিত্যের অগ্রযাত্রায় ত্রিকালজ্ঞ-সম্পাদক হিসেবে দিক্‌নির্দেশনা দেবেন, শাসন করবেন, পথ দেখাবেন, অনুপ্রাণিত করবেন— এমন ভূমিকাই লক্ষ্য করা যাবে তাঁর মধ্যে। ১৯৩১ সনে কল্লোলের কোলাহল থেমে যাবার সময় হয়েছে, 'কল্লোল যুগের পরে' নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে—এমনি সময়ে ত্রিকালদর্শীর অভিজ্ঞতা মোহাম্মদীর সম্পাদকীয়তে রূপলাভ করেছে :

> ...অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ হইতে বাণী সাধকগণ জাতি ও সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। বাঙ্গালার আড়াই কোটি মুছলমানের অন্তরে যে কথা, যে ব্যথা যুগ যুগ করিয়া জমা হইয়া আছে, আজ তাহা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, মূক আজ কথা বলিতে চাহিয়াছে, এবং প্রকাশের বেদনাই আজ তাহাকে কথা বলাইতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু যে কথা কহিলে এই বিরাট জাতির হাসি ও কান্নাকে হীরার ও পান্নার মত সযত্নে ভরিয়া রাখিবে, যাহার বাণী এই মৃতকল্প সমাজকে আবার নবশক্তিতে জাগাইয়া তুলিবে, তাহার আগমনধ্বনী এখনও আমাদের সাহিত্যে বাজিয়া উঠে নাই।
>
> তবে সে আসিবে, যেমন করিয়া প্রভাত সূর্য পূর্ব-গগনে আসে, তেমনি একদিন সে আসিবেই। আজ শুধু প্রয়োজন তাহার আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করা। আজ কোন গর্ব নয়, কোন সৃষ্টির অহমিকা নয়, শুধু একান্ত নিষ্ঠায় বাণী সাধনায় পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করা দরকার। একটি যুগের এই কঠোর আত্মনিয়োগের ফলেই পরবর্তী যুগের নব সৃষ্টি সম্ভব হইবে।
>
> সেই নব সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সফল করিয়া তোলাই আমাদের বাণী সাধনার আদর্শ এবং সে আদর্শ সফল হইবে আমাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টায়।[২৪]

জাতি গঠনের ন্যায় প্রতিভাধর সাহিত্যসেবক-এর এই উক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া যায় মোহাম্মদীর সাহিত্য পুরস্কার এর ঘোষণাটি। ভালো গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস রচনার

www.pathagar.com

জন্য লেখকদেরকে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। মোহাম্মদীতে উল্লেখ করা হয়েছে ১. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস ; ২. কালাম শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ; ৩. সাহিত্যের আদর্শ ; এবং ৪. মোছলেম বঙ্গের বর্তমান চিন্তাধারা বিষয়ে আকর্ষণীয় অর্থ-পুরস্কার ঘোষণা করার পরও বিবেচনার জন্য মাত্র ২৯টি গল্প এসেছে।

প্রথম বিষয়ের ওপর ৫টি প্রবন্ধ ; তৃতীয় বিষয়ের ওপর ৬টি ; চতুর্থ বিষয়ের ওপর ৫টি প্রবন্ধ ; তৃতীয় বিষয়ের ওপর ৬টি ; চতুর্থ বিষয়ের ওপর ৭টি প্রবন্ধ আসে। কালাম শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ওপর (২নং) কোনো লেখাই আসেনি। মোহাম্মদীর মন্তব্য : 'উপযুক্ত পুরস্কার ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ লেখকের দৈন্যের জন্য সত্যিই মনকষ্ট হয়।'

আর চিন্তামূলক রচনার থেকে গল্পের দিকে মুসলমানদের ঝোঁক বেশি তাও বোঝা যায়।

সাহিত্যিকদের মধ্যে চিন্তামূলক রচনার প্রতি আগ্রহ জাতির অগ্রগতির প্রমাণ দেয়। আর গল্প-কবিতা-উপন্যাসের প্রতি আগ্রহ ও এ-বিষয়ে উন্নতি সুকুমার বৃত্তির উৎকর্ষের পরিচায়ক। মুসলমানদের কথা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ আশার আলোকও দেখায়। প্রাচীনপন্থী লেখক আহবাব চৌধুরী উপন্যাস সম্পর্কে মোহাম্মদীতে লিখেছিলেন :

> আমাদের এক শ্রেণীর মুসলিম তরুণ হিন্দু পারিপার্শ্বিকতা ও সাহিত্যের প্রভাবে ক্রমশ ইসলামী আদর্শ হইতে সরিয়া পড়িতেছেন।...আমাদের উপন্যাস ও গল্পে আমাদের একজন আদর্শ মুসলিম কর্মধারা নায়ক ও চরিত্রের সহিত মোলাকাত হইল না। আমাদের জীবন মরণ সমস্যার দিনে রাষ্ট্রীয় আদর্শ কি হইবে, ভবিষ্যতে ভারতে মুসলিমদের স্থান কোথায়, এইরূপ চিত্র বা কল্পনা কোন উপন্যাসেই পাইলাম না।...বাঙ্গালা তথা ভারতের মুসলিমকে আবার জাগাইতে হইলে ইসলামের অতীত গৌরব ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন জাতির ভিতরে জাগাইতে হইবে। উপন্যাসই জাতির শিরায় এই কল্পনা জাগাইবার একমাত্র প্রধান সহায়।
>
> আমাদের এই নির্জীব পথ হারা বাঙ্গালা উপন্যাস জগতে কি বাঙালী আনোয়ার-কামালের আবির্ভাব হইবে না? আবার আমাদের উপন্যাস জগতে কি সেই তাজমহল, আল্হাম্‌রা, দেওয়ানে আম ও দরবারে নওরতন জাগিয়া উঠিবে না? আমরা সেই সত্যিকার ঔপন্যাসিকের খোশ আমদের ইন্তেজারিতে বসিয়া রহিয়াছি।[২৫]

ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হচ্ছে, ক্রমে নজরুল সম্পর্কেও স্পষ্ট হচ্ছে তাঁদের ধারণা। এটা লক্ষণীয়, ১৯৩৫ সন নাগাদ তাঁরা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছেন, লিখছেন। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশ ক্রমে সুদৃঢ় ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন হয়ে উঠছে। গত দশ বৎসরের (১৯২৫-৩৫) সাহিত্যিক তৎপরতার প্রশংসা করে মোহাম্মদীতে বলা হয় : 'এমনটি ইতিপূর্বে আর কখনো হয় নাই। এর কারণ, সম্ভবত সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার আবির্ভাব। সাহিত্যিক প্রগতি নির্ভর করে প্রধানত এই শ্রেণীর প্রতিভার উপরে। স্রষ্টা সাহিত্যিক আসিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উন্নতির বীজ ছড়াইয়া দেন,—ক্রমে তাহা হইতে সাহিত্যের নবসৃষ্টি স্ফুরিত হইয়া উঠে। প্রধানত নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের মোছলেম-ধারায় নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।'

পূর্বতন মুসলমান সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে কথা হয়, তাতে 'নব সৃষ্টির প্রেরণা' খুব কমই ছিল। অনুকরণই ছিল তখনকার সাহিত্যসাধনার বড় কথা। অনুকরণে নবসৃষ্টি সম্ভব নয়। কিন্তু নজরুল প্রতিভা সৃষ্টিধর্মী হলেও 'স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ নহে'।

www.pathagar.com

'তাই এতবড় প্রতিভাও বাঙ্গালা সাহিত্যের মোছলেম ধারায় আশানুরূপ সুফলদায়ী হইতে পারে নাই—সম্ভবতঃ পারিবেও না। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে নবযৌবন জলতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সাহিত্য সাধনার সবদিক বাঙ্গালীর সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছিল। নজরুল ইসলামের প্রতিভার দ্বারা তাহা হইতে পারে নাই। তবে কাব্যক্ষেত্রে মুসলমান বাঙ্গালী অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে—এমনকি বঙ্গীয় হিন্দুদের কাব্য সাধনার সাথে সমকক্ষতা করিতে পারার যোগ্যতাও তাঁহার হইয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু কথাসাহিত্যে তাঁহাদের সাধনা বিশেষ কিছু সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এমনকি হিন্দু কথাসাহিত্যিকদের সাথে তাঁহাদের নাম করিবারই উপায় নাই। কথাসাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমানের দীনতা এমনি শোচনীয়। প্রতিভাশালী কথা সাহিত্যিকের আবির্ভাব না হইলে এ দীনতা শীঘ্র দূর হইবে বলিয়া মনে হয় না। নজরুল ইসলামের কথা সাহিত্য রচনারও যথোপযুক্ত শক্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু... তাঁহার প্রতিভা স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ নহে,—অনেকটা হুজুগপ্রিয়! তাই তাঁহার দ্বারা বিশেষ কিছু আশা করা যায় না। কবে প্রতিভাশালী কথা শিল্পীর আবির্ভাব আমাদের ভিতরে দেখিতে পাইব?'[২৬]

আবু রুশদ্-এর 'রাজধানীতে ঝড়' শীর্ষক উপন্যাসের আলোচনায় একথার পুনরুক্তি করে বলা হয়, কথা সাহিত্য রচনায় মুসলমানেরা এখনও আঁতুড় ঘরেই অবস্থান করছেন। আবু রুশদ উপন্যাসের ক্ষেত্রে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আরও অনেকেই দিচ্ছেন। যেমন আবুল ফজল, শওকত ওসমান, কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ, মনিরউদ্দীন আহমদ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম—এঁদের দলের বহু গল্প, উপন্যাস, সেমি-গল্প, সেমি-উপন্যাস প্রচুর ছেপে কথাসাহিত্যে মুসলমানের পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করে আসার চেষ্টায় মোহাম্মদী নিষ্ঠাবান থেকেছে।

উল্লেখ্য, আবু রুশদ্এর উপন্যাস 'রাজধানীতে ঝড়' বুলবুল পাবিলিশিং হাউস (মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহারের) থেকে প্রকাশিত হলেও এটি মোহাম্মদীতে 'ঝড় ও রোমান্স' নামে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়।[২৭]

তাঁর 'সাজ্জাদ' শীর্ষক উপন্যাস্ও মোহাম্মদীতে ছাপা হয়।

এছাড়া আবুল ফজলের 'জীবন পথের যাত্রী' উপন্যাসটিও 'নারী ও পুরুষ' নামে ধারাবাহিকভাবে মোহাম্মদীতে ছাপা হয় (৮/৩ থেকে)। মাহবুবউল আলমের 'পল্টন জীবনের স্মৃতি', আবুল কালাম শামসুদ্দীনের 'পোড়ো জমি', আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'পরিত্যাক্ত স্বামী' ; মোহাম্মদ গোলাম জিলানীর 'দূরের নেশা' ; বন্দে আলী মিয়ার 'নারী রহস্যময়ী' ; আকবরউদ্দীনের 'অভিনেতা' ; 'পথ ও পথিক' ও 'মাটির মানুষ' ; কাজী আফসারউদ্দীনের (মৃত্তিকা-সম্পাদক) 'চরভাঙা চর' ; মহীউদ্দীনের 'আলোর পিপাসা' (৬/৯) ছাড়াও মোহাম্মদীতে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', রেণভূষণ গাঙ্গুলির (ধুপছায়া-সম্পাদক) 'যথাক্রমে' (১৪/২) মোহাম্মদীতে ছাপা হয়। শওকত ওসমানের বিখ্যাত 'পিঁজরাপোল' মোহাম্মদীরই সাহিত্য-সম্পদ।

বলা আবশ্যক যে, মুসলাম লেখকদের সঙ্গে অনেক হিন্দুলেখকের গল্প, উপন্যাসও মোহাম্মদী ছাপে। মোহাম্মদীর লেখকদের তালিকায় দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যের সকল সম্প্রদায়ের লেখকের রচনা ছেপে তাঁরা বাংলা সাময়িকপত্রের নিরপেক্ষ ঐতিহ্য রেখেছেন।

www.pathagar.com

এখানে একটি কথা বলা দরকার যে, ইসলাম ধর্ম, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর ধর্মের মহান আদর্শ নিয়ে হিন্দু লেখকগণও অনেক রচনা লিখেছেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, হজরত মোহাম্মদ' নামেরই কবিতা লিখেছেন (৫/১)—'তোমার ত্রিদিব কান্তি জাগে চক্ষে ওগো পয়গম্বর'/উদভাসিয়া মেদিনী অম্বর'।[২৮]

অক্ষয়কুমার নন্দী, সুরেশ্বর শর্মা, প্রভাবতী দেবী স্বরস্বতী, হাসিরাশি দেবী, সুধাংশু কুমার রায়, মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্রনাথ রায়, নির্মলচন্দ্র ঘোষ, হরিপ্রসাদ বর্মা, নরেন্দ্রনাথ সেন, গোপালচন্দ্র নিয়োগী, ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, রমেশ শর্মা, অক্ষয়কুমার নন্দী, (তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধ 'মাতৃমন্দির' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত করা হয়), অসিত মুখোপাধ্যায় ('ইসলাম ও যুগপ্রগতি', প্রবন্ধ), শৈলবালা মুখোপাধ্যায়, সুবোধবালা বিশ্বাস, রায়বাহাদুর জলধর সেন, রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, কবি, অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (বৃহত্তর প্রাণীজগৎ, ৪/৩) এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র মোহাম্মদীতে লিখতে পেরেছেন–তাঁরা 'সাম্প্রদায়িক' আখড়ায় ঢুকতে ভয় পাননি। 'আক্রমণ'ও বোধ করেন নি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার কটি চরণ :

হাঁকে ফিরিওলা, কাগজ বিক্রি, কাগজ বিক্রি
পুরনো কাগজ চাই!
ঘরের কোণেতে সঞ্চিত যত
তাড়াগুলি হাতড়াই
পুরনো কাগজ চাই![২৯]

মুসলমান তরুণ কবিদের আধুনিক সাহিত্য-প্রয়াস মোহাম্মদীতে নির্বিঘ্নে ছাপা হয়েছে, হুমায়ুন কবির এর একটি কবিতা :

সন্ধ্যা আকাশে মুদিল দিনের জ্বালা
শান্ত আকাশে জ্বলিছে তারার মালা
পূর্বগগন প্রান্তে সোনার ভাতি
আশার প্রদীপ জ্বালায়ে রেখেছে বাতি।
স্বপন নিমিষে মুক্তা মালায় গাঁথি
রাখিল নীরবে দিবসের উপহার
স্নেহের মতন স্নিগ্ধ অন্ধকার।[৩০]

তাঁর (হুমায়ুন কবির) বিখ্যাত কবিতা 'আমিনা' ছাপা হয় মোহাম্মদীর মাঘ ১৩৪১ সংখ্যায়, এটি স্কুলের বাংলা পাঠ্য বইয়ে বহুদিন ধরে ক্রমাগত ছাপা হয়েছে :

শোন্ মা আমিনা, রেখে দেরে কাজ
ত্বরা করে মাঠে চল্
এল মেঘনায় জোয়ারের বেলা
এখনি নামিবে ঢল।
নদীর কিনারে ঘন ঘাসে ভরা
মাঠ থেকে গরু নিয়ে আয় ত্বরা!
করিস্‌নে দেরী, আসিয়া পড়িবে
সহসা অথই জল।

(হুমায়ুন কবির, আমিনা (কবিতা), ৮/৪, মাঘ '৪১, পৃ. ২২৫)

www.pathagar.com

নজরুল ইসলামের যেসব কবিতা ছাপা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—বুকে তোমায় নাই বা পেলাম/রইবে আমার চোখের জলে (৬/১) ; আমার বিজন ঘরে হেসে এল পথিক মুসাফির বেশে (৬/৩) ; তওফিক দাও খোদা ইসলামে (ঈদের মোনাজাত, ৬/৫) ; এল শোকের ... স্মৃতি লয়ে (৬/৮) ; একলা ভাসাই গানের কমল সুরের স্রোতে (৬/৯) ; দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের তিরোধানে (৬/১১) ; রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (৭/১ এবং পরের সংখ্যাগুলোতে ধারাবাহিক) ; নাই পরিলে নোটন্ খোঁপায় ঝুম্‌কো জবার ফুল (৭/৯) ; অনন্ত কালে এ অনন্ত লোকে/মন ভোলানোরে তার খুঁজে ফেরে মন (৮/১) ; আমি সুন্দর নহি জানি হে বন্ধু জানি (৭/১২) ; এস তুমি একেবারে প্রাণের পাশে।/ যাও মিশে গো আমার প্রাণে, আমার শ্বাসে (৮/৮) ; চোখে চোখে চাহ যখন/ তোমার দুটী পাখী সেই চাহনী দেখে আমি/ অন্তরালে থাকি। (৮/১০) ; ঐ নীল গগনের নয়ন পাতায়/ নামল কাজল কাল মায়া (৯/১) ; এবং ব্যঙ্গ কবিতা :

> কর্থ্য ভাষা কইতে পারি শুর্দ্ধ কথা ভিন্ন।
> নেড়ায় আমি নিম্নবলি (কারণ) ছেঁড়ায় বলি ছিন্ন॥
> গোসাইটাকে কই গোর্সামি, তাই মসাইকে মোর্স্বামী।
> বানকে বলি বন্যা, আর কালকে কন্যা কই আমি॥[৩১]

সাঁওতালী গীতি—ও তার প্যারোডিও মোহাম্মদী ছাপে। যেমন : 'তেপান্তরের মাঠে বধূ হে/ একা বসে থাকি। /তুমি যে পথ দিয়ে গেছ চলে/ তারি ধূলা মাখি হে/ একা বসে থাকি।'[৩২] —এর প্যারোডি লিখেছিলেন গিরীণ চক্রবর্তী 'পেঁটালি গীতি' নামে—

> (ভুগে) উদারাময় রোগে বধূ হে খাটে শুয়ে থাকি
> আমি তামাক-পাতার পোড়া-ছাই সারা অঙ্গে মাখি
> খাটে শুয়ে থাকি।[৩৩]

এবং ধর্মীয় জাগরণমূলক গজল—'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায়/ আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়॥' ছাড়াও অনেক ইসলামী গান ছাপা হয়েছে। যেমন —কাবার জিয়ারতে তুমি/ কে যাও মদীনায় (১২/১১)। নাই হল মা জেওর লেবাস এই ঈদে আমার (১৩/২)। আমার দিলের নীল মহলায় আর কত দিন সাকী (১৪/৪)।

অতএব একথা বলা চলে না যে মোহাম্মদীতে নজরুলের কেবল ধর্ম-বিষয়ক রচনাই ছাপা হয়েছে। তাঁর আধুনিক কবিতা, সাহিত্যও ছাপা হয়েছে এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

৮

মুসলিম সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে মাসিক মোহাম্মদী

মোহাম্মদীর বড় একটি ভূমিকা বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে মুসলিম সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে, মুসলিম সংস্কৃতি বিরোধী কার্যক্রম রোধে ও লুপ্ত মুসলিম সংস্কৃতি উদ্ধারে। সকলকে সংঘবদ্ধ সোচ্চার করে তোলেন তাঁরা বহু বিষয়ে, যেমন 'বন্দেমাতরম'-এর অন্তর্নিহিত পৌত্তলিকতার জন্য সংগীত হিসেবে মুসলমানদের পক্ষে বর্জনীয় করে তোলার চেষ্টা (আন্দোলন)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শ্রী ও পদ্মের' মনোগ্রাম পরিবর্তন করানোর

www.pathagar.com

আন্দোলন। বাজেটে মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য কম বরাদ্দের প্রেক্ষিতে যুক্তিনিষ্ঠ রচনা লিখে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদি।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ 'বাঙ্গালায় রাজ কর কাহারা বেশী দেয়' শিরোনামে বিতর্কমূলক রচনা লিখে বলেন, মুসলমান জনসংখ্যা সরকারের অর্থ কম জোগায় না, অথচ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় আসন দেয়া হয় কম, তারপরও হিন্দুরা সন্তুষ্ট নন। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা নিয়ে সাইমন কমিশনের প্রতিবাদ করেছেন তিনি। এভাবে কলকাতা করপোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদে মুসলমান ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হলে হিন্দুরা মেনে নিতে চাননি বলে তার বিপক্ষেও জোরালো প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে কর্নেল শাহেদ সোহরাওয়ার্দী ও স্যার আজিজুল হকের নিয়োগ এবং এমনকি প্রধানমন্ত্রী পদে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের অধিষ্ঠানকেও হিন্দুরা সহজে মেনে নেননি।

এসবের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে এবং ব্রিটিশের ওপর চাপ সৃষ্টিতে মোহাম্মদীর অন্তহীন প্রচেষ্টা আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। সবচেয়ে বড় আন্দোলন ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শ্রী ও পদ্ম' মনোগ্রাম অপসারণ ও বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের সিলেবাস থেকে মুসলিম-বিদ্বেষপূর্ণ রচনা বর্জনের সংগ্রাম। আর নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিকৃত জীবনের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রণীত পাঠ্যবইগুলোর মুসলিম বিদ্বেষের প্রমাণ পরিচয় তুলে ধরা।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ এ প্রকাশিত ৯ বর্ষ ৮ সংখ্যাকে তাঁরা চিহ্নিত করেন 'ইউনিভার্সিটি সংখ্যা' হিসেবে। সম্পাদকের নিবেদনে বলা হয় :

> ... বাঙ্গালা দেশে আমাদের সরকারী স্কুলগুলির ভাষা হিন্দু এবং হিন্দুরাই তাহার শিক্ষক। পৌত্তলিক শিক্ষকদিগের দ্বারা এবং পৌত্তলিক ভাষার মধ্যবর্তিতায় প্রদত্ত এই শিক্ষাকে উচ্চশ্রেণীর মুছলমানরা ঘৃণার সহিত বর্জন করিয়াছেন।"—হান্টারের এই উক্তি উচ্চারণের পর একশত বৎসর অতিক্রান্ত হলেও সে-অবস্থার পরিবর্তন একটুও হয়নি।
>
> "বরং শত বৎসর পূর্বকার সেই শোচনীয়তার চিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিক অত্যাচারের ফলে আজ শোচনীয়তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তখনকার উচ্চ শ্রেণীর মুছলমান এই পরিস্থিতিকে 'ঘৃণার সহিত বর্জ্জন' করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থাগতিকে এখনকার সকল শ্রেণীর মুছলমান বর্তমানের এই শোচনীয়তর পরিস্থিতিকে অনিচ্ছার সহিত বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই বাধ্যতামূলক আত্মহত্যার অভিশাপ হইতে বাঙ্গালার মুছলমান নিজেকে রক্ষা করিতে চায়, মোছলেম জাতীয়তার মূল প্রাণবস্তুটাকে ফিরাইয়া পাইতে চায়। তাই তার এ প্রতিবাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিদ্রোহ ঘোষণা করার সংকল্প তার কোনদিনই ছিল না, এখনও নাই।
>
> মোছলেম বঙ্গের চিন্তানায়কদিগের সমবেত বিশ্বাস এই যে, ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী মুছলমানের দেহ, মন, মস্তিষ্ক আত্মদ্রোহ ও পরমুখিতার যে দারুণ অভিশাপ আজ আড়ষ্ট ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, স্কুল-কলেজের পঠিতব্য ইতিহাস ও বাঙ্গালা সাহিত্য প্রভৃতিই তাহার জন্য প্রধান দায়ী। ইহা তাহাদের সত্যকার অনুভূতি এবং সুদৃঢ়, সুচিন্তিত ও সমবেত সিদ্ধান্ত। গবর্ণমেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাহাদের অভিযোগগুলি শ্রবণ করুন, তাহার বিচার করুন এবং সেগুলি সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হউন, মুছলমানের প্রার্থনা শুধু এইটুকুই।

www.pathagar.com

এই সংখ্যায় লিখেছিলেন : মোহাম্মদ আকরম খাঁ—বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডাইলেমা'। খালেদ—'প্রবেশিকা বাঙ্গালা পাঠ্য কি পাঠ্য হইবার যোগ্য?'। মোছলেম খাঁ—'ইন্টারমিডিয়েট বেঙ্গলী সিলেকশন। তারেক—'ম্যাট্রিক সিলেকশানে মুসলমান কবিদের স্থান'। আল-ফারুক—'সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়'। খোন্দকার কেরামত আলী—'ম্যাট্রিকুলেশন প্রশ্নপত্রে সাম্প্রদায়িকতা'। আবদুল মা'বুদ—'জঘন্য আক্রমণ'। আলী হায়দার—'প্রশ্নপত্রে হিন্দুয়ানী'। নূরুল কবির—'গুরুতর গবেষণা'। মোহাম্মদ আবুল খয়ের—'যবন বর্জিত বিদ্যাপাঠ'। মোহাম্মদ মোল্লা—'কাশী বিদ্যাপীঠ'। আমীনুদ্দীন আহমদ—'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইহার উদ্দেশ্য'। নূরী—'বি.এ. ক্লাসের বাংলা পাঠ্য'। আজহার—'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ'। গোলাম মোরতজা—'প্রবেশিকার ভারত ইতিহাস'। এ-ছাড়াও শুক্রবারে পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বণিকবৃত্তি, বানান কমিটী, হিন্দু পুরাণ বনাম গ্রীক পুরাণ প্রভৃতি শীর্ষক আলোচনাতে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমপিরিয়ালিজ্‌ম' শীর্ষক পূর্ণাঙ্গ একটি প্রবন্ধও এতে (লেখক বেনে আব্বাস) ছাপা হয়। এই সমস্ত রচনার মূলকথা হলো :

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ে মুসলমানকে এবং মুসলমানের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ অস্পৃশ্যরূপে বর্জন করে চলা হয়েছে। মুসলমান ছাত্ররা যা পাঠ করে আনন্দ গৌরব ও জ্ঞান লাভ করতে পারে এর পাঠ্যগুলোতে তার নিতান্ত অভাব। অথচ মুষ্টিমেয় বৌদ্ধদের মনস্তুষ্টির জন্য ম্যাট্রিক, আই. এ ও বি.এ. শ্রেণীর বাঙলা পাঠ্যগুলোতে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির নিদর্শন, তত্ত্ব ও তথ্য দ্বারা দুর্বহ করে তোলা হয়েছে, হিন্দু ও হিন্দুত্বের ত কথাই নেই। স্কুল ও কলেজ স্তরের পাঠে নরপূজা, জড়পূজার প্রতীক ও প্রকৃতি-পূজার কুশিক্ষায় এবং আদিম যুগের অসভ্য মানুষের পৌরাণিক অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মহিমা প্রচার করা হয়েছে।

অন্যদিকে মুসলমানদেরকে নিতান্ত হেয়, নগণ্য জাতি হিসেবে প্রমাণ করার জন্য ইতিহাস-পুস্তকগুলোতে নীচতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতীকরূপে মুসলমানদেরকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বাঙালি মুসলমানদিগের অভাব-অভিযোগগুলি সম্যকরূপে অবগত হওয়ার সুযোগ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত করার জন্য শিক্ষক হিসেবে এবং প্রশাসনের সকল স্তরে মুসলমানদের নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

> দুঃখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের ন্যায় তাহার পরিচালনের প্রত্যেক দিকেই আজ পর্যন্ত 'যবনের' প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়া আছে। মুছলমান এই সমস্ত অভিযোগের বিচার ও প্রতিকার চায়।[৩৪]

'মোহাম্মদীর ইউনিভার্সিটি সংখ্যা পড়ে' ড. দীনেশচন্দ্র সেন মোহাম্মদীকে চিঠি লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেন :

> মুসলমান সম্প্রদায় তখন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন কাজেই মনোযোগী হন নাই। সুতরাং এই বিদ্যায়তনে যদি হিন্দু প্রাধান্য হইয়া থাকে, তবে একান্ত স্বাভাবিকক্রমেই হইয়াছে, তজ্জন্য হিন্দুদিগকে দোষারোপ করা চলে না।... একথা নিশ্চয় জানিবেন যে, মহৎ গুণ, মহৎ ভাব, করুণ ও বাৎসল্য রস, ত্যাগ, ক্ষমা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত সাহিত্যে অব্যর্থ, জোর করিয়া কেহ তাহাদের প্রভাব রোধ করিতে পারিবে না।

www.pathagar.com

আমরা হিন্দু, কিন্তু মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' পড়িয়া আমরা এত আনন্দ পাই কেন? উহাত আমাদের শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। কবির গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত... আপনারা, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত, কালিদাসের শকুন্তলা ঠেকাইবেন কিরূপ? 'ইলিয়াড' কে, 'এসকাইলাস'কে ঠেকাইবেন কিরূপে? এসকলের উত্তরাধিকারী সমস্ত মানব জাতি, ইহা হইতে আপনাদের সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করিলে, তাঁহারা এক অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

আপনাদের হাফেজ আছেন, ফেরদৌসী আছেন, ওমর খায়েম প্রভৃতি শত শত কবি আছেন, তাঁহাদের ভাব ও কবিত্ব বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচার করিয়া ফেলুন, দেখিবেন এই সর্বজগতের মহামানবদিগকে যেমন মুসলমান, তেমনি হিন্দুরাও গ্রহণ করিবেন। শতাব্দী পূর্ব্বে শত শত হিন্দু এই মহাকবিদের শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, সমাজ এজন্য তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত করে নাই।

...বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, তাঁর উপন্যাসে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিরক্তিকর বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে

'তৎসময়ের বিদেশীয়দের ইতিহাসগুলি পাঠের প্রভাবে—তাহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে নহে।' বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কারণেই হিন্দু-প্রাধান্য হোকনা কেনো, সেজন্য মুসলমানদের দাবী তামাদি হয়ে যায় নি। সিনেটে তাঁদের সংখ্যা কম নয়, তাঁরা সুলেখক ও কর্মী লোকের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করতে পারেন। 'ইসলামের আদর্শে খুব ভাল ভাল পুস্তক রচনা করুন, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কেহ কাহারও পথরোধ করিতে পারে না। যদি তাঁহারা সুসাহিত্য দান করেন, তবে কেনইবা তাহা পাঠ্য হইবে না? ভাল জিনিস তাহার পথ নিজেই করিয়া লইবে। কিন্তু এখন যে তাঁহারা শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় দুর্ব্বল। সংখ্যার বল, গায়ের বল, সর্ব্বত্র চলে, কিন্তু ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা হিসাবে ন্যূন অধ্যাপকের স্থান কোথায়।[৩৫]

তিনি বলেন, পাঠ্যপুস্তকসমূহের যেসকল দোষ বাহির করা হয়েছে, তা ধর্মের দিক দিয়ে নয়, সাহিত্য হিসেবে উপযোগী কিনা, তা ধীরস্থিরভাবে যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা আলোচনা করানো যেতে পারে। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্ণধার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তরুণ বয়সেও বিচক্ষণতা অর্জন করিয়াছেন।' কোন বিষয় তাঁর নিকট উপস্থিত করলে তিনি অবশ্যই তার প্রতিকার করবেন বলে দীনেশচন্দ্র সেন আস্থা প্রকাশ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুদের অধিকারে যাবার কারণ হিসেবে দীনেশচন্দ্র সেন যা বলেন, মোহাম্মদীর সম্পাদকীয় আলোচনায় এর ক'বছর আগেই সে-সম্পর্কে একই কথা বলা হয়েছিল।

মোহাম্মদীর অন্তর্দৃষ্টির কি সুন্দর পরিচয় রয়েছে এই বক্তব্যে। অথচ ইউনিভার্সিটি সংখ্যার মর্ম তার বিপরীত মনে হয়।

মোহাম্মদীর 'বিশ্ববিদ্যালয় ও ধনী মুসলমান' শীর্ষক এক আলোচনায় বলা হয়, একথাও সত্য যে, হিন্দুদের মধ্যে যেমন একদল মোসলেম-বিদ্বেষী লোক আছেন, মুসলমানদের মধ্যেও তেমনি একদল হিন্দু-বিদ্বেষী লোক আছেন। 'ইহারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া যে যথার্থই দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন তাহাও মনে হয় না। বরং সর্বাঙ্গীন উন্নতি আনয়নের পথে বাধা দিতে থাকিবেন। আর বর্তমানে যে কাল পড়িয়াছে

www.pathagar.com

তাহাতে একথা গোপন করিয়াও কোন লাভ নাই। সংস্কারমুক্ত হইয়া খোলাখুলিভাবে ইহার নিরপেক্ষ আলোচনা করাই এখন আমাদের উচিত। তাহাতে মনের ময়লা দূর হইয়া যাইবে এবং কর্তব্য পথ পরিস্ফুট হইবে।

...একজন স্বনামধন্য নেতা কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন এক অধিবেশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে উহাত হিন্দু প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছে,—উহার সকল বিভাগই হিন্দু কর্মচারী দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। উহার কোনখানে মুসলমানের নামগন্ধও পাওয়া যায় না' ইত্যাদি।

মোহাম্মদীর মন্তব্য :

"অভিযোগটি যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাহার জন্য দায়ী কে? হিন্দু না মুসলমান? আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, উচ্চ সরকারি পদে সমাসীন মুসলমানেরাই উহার জন্য মূলত ও মুখ্যত দায়ী, হিন্দুদেরকে দায়ী করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। ...কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারগুলি একবার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ...দানের ধারাবাহিক তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র তালিকাটি দেখিয়া আমরা লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছি। অধিকাংশ দাতাই হিন্দু, অল্প কয়েকজন খ্রিস্টান আর মাত্র চারিজন মুসলমান। হিন্দুরা দিয়াছেন প্রায় দেড় কোটি টাকা। আর মুসলমান দিয়াছেন মাত্র সাত হাজার পাঁচশত টাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন হিন্দু প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে তাহার কারণ এইখানে মিলিবে। দানের বেলাতে মুসলমান নাই--কিন্তু ভাগের সময় ষোল আনা চাই। কোন ন্যায়বান ব্যক্তি এইরূপ নীতি সমর্থন করিতে পারেন না।"[৩৬]

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দরিদ্র বেশি, সে-কথা স্বীকার করেও বলা চলে অনেক মুসলমান ব্যবসায়ী রয়েছেন যাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা অনায়াসে মুসলমানের শিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করতে পারেন, কিন্তু তা করেন না, আবার মুসলমান নেতৃবৃন্দ যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধনী ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করে টাকা সংগ্রহ করবেন, তাও করেন না। অথচ তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করতে কুণ্ঠিত হন না।

হিন্দু ধনীদের টাকা খাটিতেছে, তাই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের অনেককে চাকুরী দিয়া ভরণ পোষণ করিতেছে। মুসলমানের তথায় টাকা নাই। তাই মুসলমানের সেখানে গঞ্জায়েশ নাই। এখন যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা দিবার আগ্রহ ধনী মুসলমানের হৃদয়ে জন্মে তাহার জন্য আমাদের নেতৃবৃন্দ একটু চেষ্টা করিবেন কি।[৩৭]

মুসলমান সমাজে ব্যধি কম নয়, তাঁরা শিক্ষা বর্জন করেছে আবেগবশত, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হননি, ধর্মীয় কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে ঘরে পড়ে রয়েছেন, কাজ করতে চাননি। সমস্ত কাজ হিন্দুদের মনে করে তাঁরা পেটে পাথর বেঁধে ফুল-বাবু অথবা আশরাফ-অভিজাত হয়ে রয়েছেন—উন্নতি দেবী (লক্ষ্মী) তাঁদের ছেড়ে যাবেন না কেন?

এই রকম একটি বিষয়ের ('শিল্প ও স্বদেশী') আলোচনায় ১৯৩৪ সনের মোহাম্মদীতে বলা হয়েছিল : কয়েকটি শোচনীয় ব্যাধি মুসলমান সমাজকে পেয়েছে, যেমন মারাত্মক তেমনি তা মজ্জাগত। ফলে 'মুছলমান সমাজের মন ও মস্তিষ্ক এমন শোচনীয়ভাবে বিকার গ্রস্ত' হয়ে পড়েছে যে স্বাধীনভাবে নিজের মঙ্গল চেষ্টা—এমনকি, সে-চিন্তা করাও আজ তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অন্ধ ও অনর্থক হিন্দু-বিদ্বেষ এগুলোর মধ্যেকার এক অন্যতম ব্যাধি।

www.pathagar.com

লর্ড কার্জনের আমল থেকে, বিশেষত বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে, হিন্দুবঙ্গে একটি নতুন উদ্যম, নতুন আশা ও নতুন প্রেরণার সূত্রপাত হয়। হিন্দুরা বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু 'সে-আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা নূতন ভাবের বাণ ডাকিয়া গেল। মুছলমান আমরা সে আন্দোলনের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইলাম। পরের ইঙ্গিতে পরিচালিত নেতৃবর্গ হিন্দু-আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা করিতে লাগিলেন।'

বঙ্গ-ভঙ্গ সমর্থন করার যুক্তি কি তা মুসলমানদের কেউ তলিয়ে দেখেনি। বঙ্গ-ভঙ্গের সময় পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা দুই বাঙলাকে এক রাখার জন্য আন্দোলন করেছিলেন, আর এই আন্দোলনের প্রাণবস্তু ছিল স্বাদেশিকতার প্রেরণা। সে আন্দোলন শেষ হয়ে গেলেও, আন্দোলনের ফলে আনীত 'স্বদেশী' স্থায়ীরূপে ফল দিচ্ছে। হিন্দুদের শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। কিন্তু মুসলমানেরা স্বদেশীর বিরুদ্ধতা করে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু হয়েই রয়েছে। হিন্দুদের স্বদেশীয় শিল্পের প্রভাবে তাদেরকে বাণিজ্যিক ভাবেও শ্রীবৃদ্ধি করে দিয়েছে। মুসলমানের টাকা হিন্দুর সিন্দুকে চলে যাচ্ছে। মুসলমান এখন শুধু খরিদ্দার বা কলের মজুর। হিন্দু বিদ্বেষের জন্য স্বদেশীর বিরুদ্ধাচরণ করে 'মুসলমান হিন্দুর দ্বারা শোষিত হওয়ার সমস্ত উপকরণ নিজেই সঞ্চয় করিয়া লইয়াছে। কিন্তু আজও তাহার কোন স্তরে চেতনার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।'[৩৮]

৯

প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি : মোহাম্মদীর একটি বিতর্ক

'মোহাম্মদী' ও 'প্রবাসীর' মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক আভিজাত্যের লড়াই যেমন লক্ষণীয়, তেমনি সাহিত্যের বিকাশে কারা কতোটুকু অবদান রেখেছেন-তাও প্রকাশ পেয়েছে। প্রবাসী-ভারতবর্ষ-বসুমতী প্রভৃতিতে একশত শ্রেষ্ঠ বাঙলা বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রেক্ষিতে মোহাম্মদীগণ ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন যে, এর মধ্যে মুসলমান রচিত কোনো বই এর নাম নেই—অথচ উল্লেখ করার মতো কোনো বইই কি মুসলমানেরা রচনা করেন নি? তাঁরা মুসলমানদের রচিত ৫০টি বইয়ের তালিকা দিয়ে বলেন, এগুলোর মাধ্যমে তাঁদের অবদান বাঙলা সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করবে নিশ্চয়। তিনটি তালিকা প্রকাশিত হয় তখনকার মোহাম্মদীতে।

প্রথমে পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মকর্তাগণ ৯ বর্ষ ৩ সংখ্যায় (পৌষ ১৩৪২) মুসলিম রচিত শ্রেষ্ঠ পঞ্চাশখানা বইয়ের একটি তালিকা প্রকাশ করলে ৯ বর্ষ ৭ সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৪৩) মুস্তাফিজুর রহমান খান ঐ তালিকা সংশোধন করে পঞ্চাশটি বইয়ের নাম দেন। এরপর প্রখ্যাত বুদ্ধির মুক্তিবাদী, জয়তী ও শিখা-সম্পাদক কবি আবদুল কাদির (তখন তো তিরিশের মত বয়স ১৯০৬-৮৪) ১০ বর্ষ ৬ সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৪৩) পঞ্চাশ খানা ভালো বইয়ের তালিকা প্রেরণ করেন। নিম্নে আবদুল কাদিরের তালিকাটি কৌতূহলীদের জন্য ঐ দুটো তালিকাসহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এতে বাঙালি মুসলমানের শ্রেষ্ঠ রচনা সম্পর্কে (আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও ইসলামী পুণর্জাগরণবাদী—সকল ধারার তালিকাই পাওয়া যাচ্ছে) একটি ঐতিহাসিক তথ্য মিলবে বলে মনে হয়।

আবদুল কাদিরের তালিকাটি নিম্নরূপ ছিল :

www.pathagar.com

১. কায়কোবাদ—মহাশ্মশান ; ২. কায়কোবাদ—অশ্রুমালা ; ৩. গোলাম মোস্তফা—রক্তরাগ; ৪. শাহাদৎ হোসেন—কল্পলেখা ; ৫. কাজী নজরুল ইসলাম—অগ্নিবীণা ; ৬. কা.ন.ই.—দোলনচাঁপা ; ৭. কা.ন.ই.—চক্রবাক ; ৮. কা.ন.ই.—ঝিঙ্গির ; ৯. কা.ন.ই.—সিন্ধু-হিল্লোল; ১০. কা.ন.ই.—নজরুল-গীতিকা ; ১১. জসীমউদ্দীন—নক্সীকাঁথার মাঠ ; ১২. জসীমউদ্দীন—রাখালী ; ১৩. বন্দে আলী মিয়া—অনুরাগ ; ১৪. হুমায়ুন কবির—সাথী ; ১৫. মীর মোশাররফ হোসেন—বিষাদ সিন্ধু ; ১৬. মীর মো.হো.—উদাসীন পথিকের মনের কথা ; ১৭. মোজাম্মেল হক—শাহনামা ; ১৮. কাজী ইমদাদুল হক—আবদুল্লাহ ; ১৯. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন—পদ্মরাগ ; ২০. বে.রো.সা. হোসেন—অবরোধবাসিনী ; ২১. একরামউদ্দীন—কাচ ও মণি ; ২২. কাজী আবদুল ওদুদ—নদীবক্ষে ; ২৩. হেদায়েৎউল্লাহ—প্রদীপ ও চেরাগ ; ২৪. কাজী নজরুল ইসলাম—মৃত্যুক্ষুধা ; ২৫. কা.ন.ই.—শিউলিমালা ; ২৬. আবুল ফজল—চৌচির (উপ) ; ২৭. নাজিরুল ইসলাম (মোহাম্মদ সুফিয়ান)—সোনালী স্বপন ; ২৮. মোহাম্মদ কাসেম—আগামীবারে সমাপ্য ; ২৯. কাজী নজরুল ইসলাম—আলেয়া ; ৩০. আবুল মনসুর আহমদ—আয়না ; ৩১. পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী—সমাজ ও সংস্কার ; ৩২. ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান—উন্নতজীবন ; ৩৩. ডাঃ মো.লু. রহ—মানবজীবন ; ৩৪. মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী—মানবমুকুট ; ৩৫. বেগম রোকেয়া—মতিচুর ; ৩৬. শেখ ফজলুল করিম—পথ ও পাথের ; ৩৭. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ—বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ; ৩৮. একরামউদ্দীন—রবীন্দ্র প্রতিভা; ৩৯. কাজী আবদুল ওদুদ—রবীন্দ্রকাব্য পাঠ ; ৪০. কা.আ.ও.—সমাজ ও সাহিত্য ; ৪১. কা.আ.ও.—হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ; ৪২. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ—পারস্য প্রতিভা ; ৪৩. মীর্জা ইউসুফ আলী—সৌভাগ্য পরশমণি ; ৪৫. মোজাম্মেল হক—মহর্ষি মনসুর ; ৪৬. শেখ আবদুর রহিম—হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি ; ৪৭. মোহাম্মদ আকরম খাঁ—মোস্তফা চরিত ; ৪৮. মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ—তুরস্ক ; ৪৯. মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ—আরব জাতির ইতিহাস ; ৫০. কাজী আরকম হোসেন—ইসলামের ইতিহাস ;

মোহাম্মদীর কর্মকর্তাদের দেয়া প্রথম তালিকায় ছিল :

১. বিষাদসিন্ধু ; ২. সমাজ ও সংস্কার (পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন আহমদ) ; ৩. অশ্রুমালা (কায়কোবাদ) ; ৪. মহাশশ্মান (ঐ) ; ৫. মহর্ষি মনসুর (মোজাম্মেল হক) ; ৬. সৌভাগ্য পরশমণি (মীর্জা ই.আ.) ; ৭. হজরতের জীবনী (শেখ আ. রহিম) ; ৮. ভারতে মুসলমান সভ্যতা (মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী) ; ৯. মোসলেম সভ্যতার ইতিহাস (মোঃ কে. চাঁদ) ; ১০. সুচিন্তা (ইসমাইল হোসেন সিরাজী) ; ১১. মোস্তফা চরিত (মোহাম্মদ আকরম খাঁ) ; ১২. কোরআন (ঐ) ; ১৩. আবদুল্লাহ (কাজী ই. হক) ; ১৪. মতিচুর (বেগম রোকেয়া) ; ১৫. আনোয়ারা (নজিবর রহমান) ; ১৬. রবীন্দ্র-প্রতিভা (একরামউদ্দীন) ; ১৭. প্রদীপ ও চেরাগ (মোঃ হে. উল্লাহ) ; ১৮. মানবমুকুট (মোঃ এ.আ. চৌধুরী) ; ১৯. উন্নতজীবন (লু. রহমান) ; ২০. ফারুক চরিত (নজির আহমদ চৌধুরী) ; ২১. সমাজ ও সাহিত্য (কাজী আ. ওদুদ) ; ২২. রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ (ঐ) ; ২৩. মানুষের ধর্ম (মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ) ; খালেদার সমর স্মৃতি (ইব্রাহীম খাঁ) ; ২৫. সাহারা (গোলাম মোস্তফা) ; ২৬. কল্পলেখা (শাহাদাৎ হোসেন) ; ২৭. সাথী (হু ক.) ; ২৮. পোড়োজমি (আবুল কালাম শামসুদ্দীন) ; ২৯. মহামানুষ মুহসিন (মোঃ ওয়াজেদ আলী) ; ৩০. ইসলামের ইতিহাস (কাজী আকরম হোসেন) ; ৩১. মুসলমানী কথা (আবুল মনসুর আহমদ) ; ৩২. ওমর ফারুক (মুহম্মদ হবীবুল্লাহ) ; ৩৩. মহামানবের মহাজাগরণ (মহীউদ্দীন) ; ৩৪. নকশীকাঁথার মাঠ

www.pathagar.com

(জসীমউদ্‌দীন) ; রঙ্গিলা নায়ের মাঝি (ঐ) ; ৩৬. দিলরুবা (আবদুল কাদির) ; ৩৭. দীওয়ান-ই-জেবুন্নেসা (ফজলুর রহমান) ; ৩৮. হারামণি (মোঃ মনসুরউদ্দীন) ; ৩৯. সোনালী স্বপন (নাজিরুল ইসলাম) ; ৪০. আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (সাহিত্য বিশারদ ও এনামুল হক) ; এবং কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা, দোলনচাঁপা, সর্বহারা, সিন্ধু-হিল্লোল, বুলবুল, চন্দ্রবিন্দু, আলেয়া, মৃত্যুক্ষুধা, শিউলিমালা প্রভৃতি ১০টি বইয়ের নাম।

মুস্তাফিজুর রহমান খাঁর দেয়া পঞ্চাশটি বইয়ের নাম (কমন বইয়ের ক্ষেত্রে শুধু বইয়ের নামই দেয়া হলো)

১. বিষাদ-সিন্ধু ; ২. সমাজ ও সংস্কার ; ৩. সৌভাগ্য পরশমণি ; ৪. মহাশ্মশান ; ৫. অশ্রুমালা ; ৬. মহর্ষি মনসুর ; ৭. শাহনামা ৮. হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি ; ৯. ভারতে মুসলমান সভ্যতা ; ১০. সুচিন্তা ; ১১. প্রবন্ধমালা (কাজী ইমদাদুল হক) ; ১২. আবদুল্লাহ ; ১৩. মোস্তফা চরিত ; ১৪. সমস্যা ও সমাধান (আকরম খাঁ) ; ১৫. মতিচুর ; ১৬. মোসলেম সভ্যতার ইতিহাস ; ১৭. রবীন্দ্রপ্রতিভা ; ১৮. শান্তিধারা (এয়াকুব আলী চৌধুরী) ; ১৯. মানব মুকুট ; ২০. মহৎজীবন ; ২১. উন্নত জীবন ; ২২. পথ ও পাথেয়; ২৩. ইসলামের ইতিহাস ; ২৪. পারস্য প্রতিভা ; ২৫. মানুষের ধর্ম্ম ; ২৬. নবপর্য্যায় (কাজী আবদুল ওদুদ) ; ২৭. সমাজ ও সাহিত্য ; ২৮. রবীন্দ্র কাব্যপাঠ ; ২৯. আলমগীর (শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন) ; ৩০. কল্পলেখা ; ৩১. খালেদার সমর-স্মৃতি ; ৩২. অগ্নিবীণা ; ৩৩. সর্বহারা ; ৩৪. জিঞ্জির ; ৩৫. বুলবুল ; ৩৬. রুদ্রমঙ্গল ; ৩৭. মৃত্যুক্ষুধা ; ৩৮. শিউলিমালা ; ৩৯. পোড়োজমি ; ৪০. মুসলমানী কথা ; ৪১. স্বপ্নসাধ (হুমায়ুন কবির) ; ৪২ ওমর ফারুক ; ৪০. নকশী কাঁথার মাঠ ; ৪৪. সোজন বাদিয়ার ঘাট ; ৪৫. ময়নামতীর চর (বন্দে আলী) ; ৪৫. মুসলিম কালচার (আবুল হুসেন কর্তৃক মার্মাডিউক পিকথলের অনুবাদ) ; ৪৭. হারামণি ; ৪৮. আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য ; ৪৯. পথের গান (মহীউদ্দিন) ; ৫০. দীওয়ান-ই-জেবুন্নেসা।

উপরের তালিকা থেকে বোঝা যায় ১৯৩০ এর পরও মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখকের সংখ্যা ছিল কত নগণ্য। উল্লিখিত ৫০ খানা বইয়ের অর্ধেকই লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, জসীমউদ্‌দীন, হুমায়ুন কবির, লুৎফর রহমান, বেগম রোকেয়া, কায়কোবাদ ও মীর মশাররফ হোসেন।

১৯৪৭ পর্যন্ত মুসলমান লেখক যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি তাঁদের উল্লেখযোগ্য বইয়ের সংখ্যা এবং সাহিত্যের নানা শাখায় বহুমুখী চর্চার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

১০

বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ ও উর্দু সম্পর্কে মুসলিম সাহিত্যিকদের বিবৃতি

বাঙলা সাময়িকপত্রে মুসলমান সাহিত্যিকেরা যখন অসংখ্য রচনা লিখে ফেলেছেন, তখন শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকায় (এমনকি নজরুল ইসলামের রচনা সম্পর্কেও) কটাক্ষ করে 'বিদেশী' অজুহাতে আরবী-ফারসী শব্দ বিসর্জন বা বর্জনের পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। বিভিন্ন সাময়িকীতে এ নিয়ে বাদ-বিতর্ক কম হয়নি।

এ অবস্থায় মাসিক মোহাম্মদীর পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক (পরে দৈনিক 'আজাদ' এরও সম্পাকদ হন) আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বুলবুল পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক মুহম্মদ

www.pathagar.com

হবীবুল্লাহ বাহার, জয়তীর সম্পাদক আবদুল কাদির, সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর সহ-সম্পাদক মুজীবুর রহমান খাঁ, বুলবুলের অন্যতর সম্পাদক ও সর্ববঙ্গ মহিলা সমিতির পক্ষে শামসুন্নাহার ও সাহিত্য মজলিশের মোহাম্মদ মোদাব্বের প্রমুখ 'বাঙলার তরুণ মুসলিম সাহিত্যিকদের প্রতিনিধিস্থানীয় উপরোক্ত লেখকদের স্বাক্ষরিত' একটি বিবৃতি সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়—এই মর্মে যে, বিদেশী শব্দ সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে—বাংলার মতো জীবন্ত ভাষার পক্ষে এর প্রয়োজন এখনো নিঃশেষ হয়ে যায় নি—

> ভবিষ্যতে মুসলিম চিন্তাধারার সহিত বাঙ্গালী সাহিত্যিক-সমাজের পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠতর হইবে, তখন নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই বাঙ্গালায় আরো অধিক সংখ্যক আরবি, ফারসি শব্দের প্রচলন হইবে। ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য এই যে নূতন শব্দ ও ভাবধারার আমদানী, এর যাঁহারা বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা আমরা করিব না। চারিদিকে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বৈশিষ্ট্যবাদিরা অচলায়তন সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু আলোকপন্থী যাঁহারা তাঁহারা আলোকরশ্মিকে বরণ করিয়া লইবেনই। বাঙ্গালায় মুসলিম ভাবধারা প্রকাশ করিবার জন্য এবং কাব্য ও কথাসাহিত্যে মুসলিম আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনমত আরবি-ফারসি শব্দ আমরা ব্যবহার করিব। তবে বিনা প্রয়োজনে বিদেশী শব্দ আমদানী করিয়া খিচুড়ী ভাষা সৃষ্টির আমরা পক্ষপাতী নই।

তবে তাঁরা এও বলেন, আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারের ব্যাপারে 'প্রয়োজন' ছাড়া অন্য একটি বিষয়ও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। নতুন ভাবধারার দোহাই দিয়া আমরা অসুন্দর কিছু চালাইতে যেন চেষ্টা না করি। এ বিষয়ে 'প্রয়োজন' এবং 'সৌন্দর্যবোধ'-ই হইবে আমাদের মাপকাঠি।

উত্তর ভারতের উর্দু ও হিন্দী ভাষার উদাহরণ টেনে তাঁরা বলেন, রাষ্ট্রনৈতিক কারণে তাহলেও 'বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভাষা সৃষ্টির আমরা পক্ষপাতী নই। হিন্দু-মুসলমান ভাবধারার সমন্বয়ে ভবিষ্যতের বঙ্গসাহিত্য গড়িয়া উঠুক, ইহাই আমাদের কামনা।'[৩৯]

আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে তাঁরা উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে মুসলমান ছাত্রদের জন্য প্রচলন করারও সুপারিশ করেছিলেন। তাঁরা বলেন যে, মুসলিম তরুণদের মন ও মস্তিষ্ক দীর্ঘকালের বিজাতীয়ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। গত দশ বছর ধরে তাঁরা (মোহাম্মদী) এর প্রতিকার সন্ধান করছেন (পত্রিকায় আলোচনার মাধ্যমে), কিন্তু আশানুরূপ ফল ফলেনি।

> জাতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে যে শিক্ষিত যুবকগণের চিন্তা ও কর্মের উপর, তাঁহারা আচার-ব্যবহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে এবং ভাবে ও ভাষায় হিন্দু হইয়া যাইতেছেন, মুছলমানের জাতীয় ভাবধারার প্রতি নিষ্ঠাহীন হইয়া পড়িতেছেন, নিজেদের সবকিছুকে... ঘৃণা করিয়া চলাকেই সভ্য বা শিক্ষিত-জীবনের চরম আদর্শ বলিয়া মনে করিতেছেন, ইহা সর্বনাশের পূর্বাভাস মাত্র।

মোহাম্মদী-গোষ্ঠীর মতে এই সর্বনাশের তিনটি কারণ—'বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালার সর্বগ্রাসী পরিবেষ্টন, দ্বিতীয়ত...পাঠ্যতালিকা...সাহিত্য ও ইতিহাসের সর্বনাশী প্রভাব,...এবং তৃতীয়ত নিজের ধর্ম, ইতিহাস, সভ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে মুছলমান তরুণদের জ্ঞানলাভের সুযোগ-সুবিধার সম্পূর্ণ অভাব।'

www.pathagar.com

দ্বিতীয় কারণের প্রতিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকস্ট বুক কমিটির সহযোগিতায় হয়ে যাবে, কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় কারণটিই মারাত্মক। তৃতীয় কারণে প্রতিভাশালী মুসলমান কবিসাহিত্যিকগণ হিন্দুয়ানীভাবে আচ্ছন্ন। অথচ বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালার স্থলে ইসলামী ভাবধারার বাঙ্গালা সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তরুণ মনের প্রবণতা পরিবর্তনের দায়িত্ব সাহিত্যিকদের হলেও তাঁরা তা করছেন না। সমস্যা হলো ইসলামী জাতীয় ভাব ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁদের নিষ্ঠা আছে তাঁরা আবার প্রতিভা ও নিষ্ঠার দিক দিয়ে ন্যূন। এজন্য উপায় হলো আরবী অগত্যা উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষারূপে মুসলমানদের পড়ানো...

> 'উর্দুর অনুকূলেই যদি সমাজের সিদ্ধান্ত হয় (কারণ মুসলিম নেতৃবৃন্দ,—যাঁদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা, তাঁরা আরবীর থেকে উর্দুর প্রতি বেশি অনুরাগী ; সম্ভবত তাঁরা অধিকাংশ অবাঙ্গালী অথবা মুসলমানদেরকে অভিজাত মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু শিখিয়ে আশরাফ করতে চান) তাহা হইলে উর্দুকে বাঙ্গালী মুছলমান শিক্ষার্থীদিগের জন্য একমাত্র ও বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষায় পরিণত করিয়া লইতে হইবে। হিন্দু সমাজের বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহাতে ক্ষতির কারণ কিছুই নাই সত্য, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অথচ এই প্রস্তাবকে সহজে কার্য্যে পরিণত হইতে দিবেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা।'[৪০]

১১

কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেন সম্পর্কে মোহাম্মদীর সমালোচনা

মোহাম্মদীর ৬ বর্ষ, ৪ সংখ্যায় (মাঘ ১৩৩৯) ১৯৩২ সনের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণগুলো ছাপা হয়। কবি কায়কোবাদ, মো: কাজেমুদ্দীন আহমদ, ড. মুহম্মদ কুদরত-এ খুদা, সৈয়দ এমদাদ আলী, কাজী নজরুল ইসলাম (গান,—'তোমাদের দান—তোমাদের বাণী—পূর্ণ করিল অন্তর') প্রমুখের বক্তব্য বা রচনার প্রশংসা করা হলেও কাজী আবদুল ওদুদের অভিভাষণটি বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়।[৪১]

তাঁর সমুদয় রচনাকেই 'মোহাম্মদী'-রা 'হিন্দুয়ানীতে ভরা' ; 'হিন্দুদের অনুকারী' বলে নিন্দা করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফীর 'বাঙলা সাহিত্য ও মুছলমান সমাজের বিপর্যয়' শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা—কাজী আবদুল ওদুদের... 'অভিভাষণটি পাঠ করিয়া' তিনি 'অত্যন্ত মর্মাহত' হয়ে বলেন :

> কাজী ছাহেবের সমস্ত সামাজিক প্রবন্ধের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য যাহা, এই অভিভাষণেও তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছেন। ধর্মে, রাষ্ট্রে, শিল্পে, সাহিত্যে এছলামের ইতিহাস যে একটা ব্যর্থ-বিড়ম্বনার ইতিহাস মাত্র, নানা সুরে, নানা ছন্দে, এই কথাই তিনি মুছলমানকে শোনাইয়া আসিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার হিন্দু নেতাদের, বিশেষতঃ রাজা রামমোহন রায়ের, আদর্শকে তিনি সমাজের সম্মুখে বড় করিয়া ধরিতে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত।
>
> এই নিজস্ব বর্জনের প্রবৃত্তি ও পরস্ব অর্জনের প্রেরণাই তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধগুলির প্রাণবস্তু। তাহার পর, অনেক বিষয়ে কাজী ছাহেব নিজের ধারণা—অভিমতকেই যুক্তিপ্রমাণ নিরপেক্ষ চরমসত্য বলিয়া ধরিয়া লন এবং সেইসব অপ্রকৃত বা প্রমাণহীন কথাগুলির ভিত্তির উপর নিজের সিদ্ধান্তগুলির এমারত গাঁথিয়া যাইতে থাকেন।
>
> আলোচ্য অভিভাষণেও বিচার আলোচনার এই ধারার কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। স্যার ছৈয়দ, ওহাবী-প্রভাব, মওলানা আবুল কালাম আজাদের মন্তব্য, জামালুদ্দীন আফগানী প্রভৃতি

www.pathagar.com

> সম্বন্ধে তিনি যে-সব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাহা কতকগুলি প্রাণহীন অপসিদ্ধান্তের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে।
> এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে যথাযথভাবে আলোচনা করার সুযোগই যে তাঁহার ঘটে নাই ; অভিভাষণের মন্তব্যগুলিই তাহার প্রমাণ। আমরা সুযোগ মত একে একে এই সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমাদের এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করিব।[৪২]

মনীষী আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮) এর বিরুদ্ধেও মোহাম্মদীর লোকেরা উস্কানীমূলক বক্তব্য লিখে তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তুলতেন। তাঁকে জনসমক্ষে প্রগতিশীল বক্তব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে 'তওবা' করাতেও বাধ্য করেছিলেন মোহাম্মদী। আজ বুঝতে পারা মুশকিল যে, আবুল হুসেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের লোকেরা ইসলাম-বিরুদ্ধ কি এমন কথা বা কাজ করেছিলেন যে তাঁদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করা দরকার হয়েছিল?

অথচ মোহাম্মদী-সওগাতী এবং শিখা-গোষ্ঠীর সকলেরই লক্ষ্য ও কাম্য ছিল মুসলমান সমাজের জাগরণ ও উত্থান। শিক্ষা ও চিন্তার স্তরে তারতম্য থাকার কারণেই এই আত্মকলহ বেঁধেছিল, এখনও বাঁধে, শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয়, সকল ধর্ম ও আদর্শ কিংবা মতবাদ অনুসারীদের মধ্যেই তা হয়ে থাকে।

সে যাহোক, মোহাম্মদী শীর্ষস্থানীয় স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় দিয়েছিল। ঢাকার 'বাংলার বাণী' নামের একটি পত্রিকায় আবুল হুসেন একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন বলে 'ঢাকার বাণী' নামে মোহাম্মদীর সম্পাদকীয় 'আলোচনা'য় আকরম খাঁ লিখেছিলেন :

> স্বনামখ্যাত মৌলুবী আবুল হুসেন সাহেব 'বাঙ্গলার বাণী' নামক ঢাকার একখানি হিন্দুপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া মোছলেম নারী সমাজের চরিত্রের উপর অতি জঘন্য আক্রমণ করিয়াছেন। লেখক প্রবন্ধের একস্থানে বলিতেছেন : 'নারীকে পর্দায় রাখা হয় এই উদ্দেশ্যে যে তার প্রতি পুরুষের দৃষ্টি না পড়ে এবং তার সতীত্ব নষ্ট না হয়, অর্থাৎ তার দ্বারা এমন কোন সন্তান সন্ততির সৃষ্টি যাতে না হয় যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের জন্মদাতাকে খুঁজে বের করতে কষ্ট হয়। এই সতীত্ব রক্ষার উপায় পর্দা।'
>
> ইহার পর তিনি মুছলেমের জাতীয় চরিত্রের উপর যেরূপ নীচ ও ঘৃণ্য ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা অকথ্য অশ্রাব্য ও অসহ্য। সে আক্রমণ যে কতদূর জঘন্য এ পত্রিকার হিন্দু সম্পাদকের মন্তব্য পাঠ করিলে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারিবে। সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন—'লেখক মুছলমান হইয়া মুসলমান নারী সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, হিন্দু হইয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।'
> ...হিন্দু হইয়াও যে জঘন্য অপবাদে বিশ্বাস করিতে সম্পাদক মহাশয়ের প্রবৃত্তি হয় নাই, মুছলমান হইয়াও তাহা নীরবে সহ্য করিতে মোছলেম-বাঙ্গালা প্রস্তুত হইবে কিনা, তাহাই এখন দেখার বিষয়। ...ইতিপূর্বে অনুতপ্ত হইয়া তাওবানামা প্রকাশ করিয়াছিলেন... এতদিন পরে...স্বরূপ প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছেন...।[৪৩]

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর মাসিক মোহাম্মদী যে সেকালের বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ছিল, এবং বাংলা সাহিত্যের রচয়িতাদের নিত্য-নতুন চিন্তার ধারক বাহক ও অনুপ্রেরক ছিল তা বলাই বাহুল্য ; যদিও আজ তাঁদের অনেক কথা ও কাজ প্রতিক্রিয়াশীল ছিল বলে প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য নয়।

www.pathagar.com

এই পত্রিকার ভূমিকা সার্বিক অর্থেই বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সদর্থক বিবেচনার দাবি রাখে।

তথ্যনির্দেশ

১. প্রবাসীর কথা বলা হয়েছে।

২ ঢাকার 'বুদ্ধির মুক্তিবাদী' আন্দোলনের প্রবর্তক 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও এর মুখপত্র 'শিখা'র কথা বলা হচ্ছে।

৩. অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে। মোহাম্মদীতে কাজী আবদুল ওদুদের 'নবপর্যায়' গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনা হয়। শিখা-গোষ্ঠীর বিরোধিতার কথা অনেকের জানা থাকতে পারে।

৪. বস্তুত এসব উদ্ধৃতি শাস্ত্রানুগত মুসলমান সমাজকে চটিয়ে দেবার জন্য চাঁছাছোলাভাবে নিজেরা তৈরি করে নিতেন। সংরক্ষণবাদীরা যেমন এখনও করেন,—কিন্তু আবদুল ওদুদ ও তাঁদের শিখা-গোষ্ঠীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবের প্রতিফলন। এঁদের বক্তব্যকে নিজের মতো করে বলায় অর্থাৎ অপব্যাখ্যা দেওয়ায় কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ আপত্তিও জানিয়েছেন, কোনো কোনো পত্রিকায় (সওগাত/জয়তী প্রভৃতি, ঐকালের) তা ছাপাও হয়েছে।

৬. আসলে কথাটা ঠিক নয়। 'বুদ্ধির মুক্তিবাদী'দের কাছে এটা অহংকার ছিল।

৭. মোহাম্মদী, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা কার্তিক ১৩৩৪ এর 'আত্মনিবেদন' শীর্ষক সম্পাদকীয় ১৩ বর্ষ, ১ সংখ্যাসহ মোহাম্মদীতে বহুবার পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে ১৯৬৮ সন পর্যন্ত।

৮. উপরিউক্ত 'আত্মনিবেদন' দ্রষ্টব্য।

৯. সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসীর (খোসবাসপুর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ) একটি অপ্রকাশিত রচনা (মওলানা আকরম খাঁ সম্পর্কে কিছু স্মৃতিচারণ, ১৯৯৩ থেকে।

১০. উপরিউক্ত।

১১. আকরম খাঁ অল্প বয়সে কবিতা লিখতেন। বড় ভাইয়ের নানারূপ প্রতিবাদ প্রতিরোধের মুখে সে-অভ্যেস বর্জিত হয়। দ্রষ্টব্য বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ও মুহম্মদ জাহাঙ্গীর প্রণীত 'মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ' শীর্ষক গ্রন্থ। মোহাম্মদীতে বিভিন্নজনের ১২-১৪ কিস্তিতে সমাপ্ত 'বারোয়ারী' শীর্ষক উপন্যাসের একটি কিস্তিও তিনি লিখেছিলেন। এই বারোয়ারী উপন্যাসের প্রচলন হিন্দু সম্পাদিত অনেক সাহিত্য-সাময়িকীতে দেখা যাবে। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' তেও আছে। এ থেকেই 'সবুজবাঙলা'য় (এই অভিসন্দর্ভে আলোচিত) এই ধরনের 'আটইয়ারী'র পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

১২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান, মোহাম্মদী, ২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৬৫, পৃ. ১-২।

১৩. মোহাম্মদ আহ্বাব চৌধুরী, আমাদের জাতীয় ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার (প্রবন্ধ), মোহাম্মদী, ২ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৫, পৃ. ২০৪-১৫।

১৪. উপরিউক্ত।

১৫. মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, সাহিত্য ও আর্ট, মোহাম্মদী, ২ বর্ষ, ২ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫, পৃ. ১২০।

১৬. নজির আহমদ চৌধুরী, মোহাম্মদী, ২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৫, পৃ. ২৭।

১৭. গোলাম নবী, সমালোচকের সমালোচনী, মোহাম্মদী, ৯ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪২।

১৮. 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যতে' ('আলোচনা'), উপরিউক্ত, ১১ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৫, পৃ. ৭৯৯।

১৯. বজলুর রহমান, প্রতিভা-প্রসঙ্গ ('চিন্তাধারা'), উপরিউক্ত, ১৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৬, পৃ. ৫৬-৫৭।

২০. উপরিউক্ত।

www.pathagar.com

২১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, বাঙ্গালা সাহিত্য ও মুছলমান, উপরিউক্ত, ৯ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪২, পৃ. ৩০২।

২২ বাঙ্গালা সাহিত্যে রেনেসাঁস (মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নাকি 'নূরী' আবুল কালাম শামসুদ্দীনের লেখা?), উপরিউক্ত, ১০ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৪, পৃ. ৮৯০ ('আজাদ' থেকে পুনর্মুদ্রিত)।

২৩. 'সাহিত্য ও আমাদের সমাজ' (সম্পাদকীয় আলোচনা), উপরিউক্ত, ৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৬, পৃ. ৩১৯।

২৪. নববর্ষের নিবেদন (সম্পাদকীয়), উপরিউক্ত, ৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৩৭।

২৫. মোহাম্মদ আহ্বাব চৌধুরী, উপন্যাসে জাতীয় আদর্শ, উপরিউক্ত, ৬ বর্ষ ১ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪০, পৃ. ৬২৯।

২৬. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের মোছলের ধারা' (সম্পাদকীয় আলোচনা), উপরিউক্ত, ৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪২, পৃ. ৮১৬।

২৭. দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদী, ১১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৫।

২৮. দ্রষ্টব্য, উপরিউক্ত, ৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৩৮, পৃ. ১১।

২৯. প্রেমেন্দ্র মিত্র, কাগজবিক্রি (কবিতা), উপরিউক্ত, ৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩৭, পৃ. ১৭৬।

৩০. হুমায়ুন কবির, দানিয়ুব, (কবিতা), উপরিউক্ত, ৪ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ. ৫৬১।

৩১. নজরুল ইসলাম, ব্যঙ্গ কবিতা, মোহাম্মদী, ৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪২, পৃ. ৭৮৮।

৩২ নজরুল ইসলাম, সাঁওতালগীতি, মোহাম্মদী, ১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৪।

৩৩. গিরীন চক্রবর্তী, পৈটালিগীতি, উপরিউক্ত।

৩৪. সম্পাদকীয়, মোহাম্মদী, ৯ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩।

৩৫. দীনেশচন্দ্র সেন, পত্র ('মোহাম্মদীর ইউনিভার্সিটি সংখ্যা পড়ে'), মোহাম্মদী, ৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৩, পৃ. ৬৩৯–৪১।

৩৬. 'বিশ্ববিদ্যালয় ও ধনী মুসলমান' (আলোচনা), মোহাম্মদী, ২ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬, পৃ. ৫১৯–২০।

৩৭. উপরিউক্ত।

৩৮. 'শিল্প ও স্বদেশী' (আলোচনা), মোহাম্মদী, ৮ বর্ষ, ২ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪১, পৃ. ১৪৮–৪৯।

৩৯. বিবৃতিটি ছাপা আছে মোহাম্মদীর ৯ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪২–এ।

৪০. উপরিউক্ত, পৃ. ২৯৩।

৪১. কাজী আবদুল ওদুদের অভিভাষণটি 'শাশ্বতবঙ্গ' শীর্ষক গ্রন্থে 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারা' শিরোনামে ছাপা আছে, পৃ. ২৬৩–৭২।

৪২ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী, বাংলা সাহিত্য ও মুছলমান সমাজের বিপর্যয় (আলোচনা), মোহাম্মদী, ৬ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৯, (ফেব্রুআরি, ১৯৩৩)।

৪৩. 'ঢাকার বাণী' (সম্পাদকীয় আলোচনা), মোহাম্মদী, ৩ বর্ষ, ২ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।

www.pathagar.com

২৩. আল্-ইস্লাহ্
(সিলেট, ১৩৩৯-৫৪)

'আল্-ইস্লাহ্' মানে সংশোধক। এই পত্রিকা ১৯৩২ থেকে ১৯৮২-৮৩ পর্যন্ত বেরিয়েছে। অন্যের সম্পাদনায় এখনও সিলেট, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ থেকে বের হয়, তবে অন্য মেজাজে। কিন্তু এর প্রথম পনের বছরের প্রচেষ্টাই গুরুত্বপূর্ণ। এটি পাকিস্তান-আন্দোলনকালে মুসলিম-লীগের আদর্শের এবং মাসিক মোহাম্মদীর অনুসারী পত্রিকা ছিল। তবে মোহাম্মদীর মতোই এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাসহ বেশ কিছু হিন্দু-লেখকের রচনাও মুদ্রিত হয়েছে।

কিন্তু উত্থানকামী, জাগরণ-প্রয়াসী পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজকে বাংলা সাহিত্য-সেবায় অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার মাদ্রাসা শিক্ষিত লেখকদের অবদান সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয় ছিল। সম্পাদক মুহম্মদ নুরুল হক মাদ্রাসার ছাত্র অবস্থায়, হোস্টেলে থেকে বাংলা-বিদ্বেষী, আরবি-উর্দু-ফারসি-অনুরাগী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদেরকে বাংলা সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রথম এটা প্রকাশের চিন্তা করেছিলেন।

'আল্-ইস্লাহ্' ছিল আসামের প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলিম-সাময়িকপত্র।

বাঙলা-বিহার-আসাম-বার্মার মুসলমানদের মধ্যে যে-কজন মহৎপ্রাণ-ব্যক্তি সমাজের কল্যাণ-চিন্তায় নিতান্ত দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও, কেবল নিজের সমাজ-হিতৈষণা, সাহিত্যপ্রেম, শ্রম ও অধ্যাবসায় সম্বল করে সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আল্-ইস্লাহ্-সম্পাদক মুহম্মদ নূরুল হক (১৯০৭-৮৭) অন্যতম। তিনি আপন সাংগঠনিক প্রতিভাবলে একটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম-সাহিত্যপত্রিকা (মাসিক আল্-ইস্লাহ্) এবং সিলেটের 'কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ' গড়ে তুলেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি এখনও সমাজকে দান করে যাচ্ছে।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল অসহায়, পথভ্রান্ত, অসংগঠিত সিলেট নিবাসী মুসলমান সমাজকে জাগ্রত ও সংগঠিত করা। উপরিউক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সত্যিই সেখানকার মুসলমানেরা সংগঠিত হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্য ও শিল্প চর্চা করার জন্য। সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মাসিক সাহিত্য সভায় আলোচনার মাধ্যমে সাহিত্যিক সামাজিক পথ ও পন্থা তাঁরা নির্ধারণ করতে পারতেন। একটি অনুন্নত, মফস্বল শহর থেকে সেই ত্রিশের দশকে মাদ্রাসার একজন দরিদ্র ছাত্র একটি বাংলা সাহিত্য পত্রিকা কিরূপ বৈরী পরিবেশে বের করেছিলেন তা আজ সহজে অনুমান করা যায় না।

১৯২৮ সনে সৈয়দ আবদুর রব কলকাতা থেকে প্রকাশ করেছিলেন 'মোয়াজ্জিন'। সেটিও ছিল এইরূপ ধর্মপ্রাণ আর এক মৌলবী সাহেবের উদ্যোগ। কিন্তু এই দুজন মৌলবী-সম্পাদক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানদের সংশ্লিষ্ট করার জন্য যে প্রাণান্ত সাধনা করেন, তাঁর মূল্য বাঙালি মুসলমানেরা এখন প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন।

কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কাজী ইমদাদুল হক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান প্রমুখ বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের পশ্চাৎপদতা

www.pathagar.com

কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক ও মাদ্রাসা-শিক্ষিত মওলানা-মৌলবীদের একযোগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করার জন্য 'আল্-এস্‌লাম' প্রভৃতি পত্রিকায় উপর্যুপরি আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন। তার ফল বিলম্বে হলেও ফলেছিলো।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যপত্রিকা, সাম্যবাদী, মোয়াজ্জিন, আল্-ইস্‌লাহ্ (১৯১৫ থেকে) প্রভৃতি পত্রিকা তার প্রমাণ। ঐকালের বেশ কটি সাপ্তাহিক পত্রিকা মাদ্রাসা-শিক্ষিত মৌলবী সাহেবদের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। মোটামুটিভাবে বাঙালি মুসলমান আরবি, উর্দু, ফারসি সাহিত্যের প্রতি বিভিন্ন মাত্রায় অনুরাগ, আকর্ষণ পোষণ করেও বাংলা সাহিত্য চর্চায় যেভাবে একত্রে কাজ করতে শুরু করেছিলেন—তা যদি তখন না-করা হতো, তাহলে মুসলমান সমাজ এখন সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে নিজস্ব জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে—তা আরও বিলম্বিত হতো।

মুহম্মদ নূরুল হক মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে, মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের উৎসাহিত করে, তাঁদেরকে সংঘবদ্ধ করে যে কাজটি শুরু করেছিলেন, এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে তার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী, ধন্বন্তরী ঔষধের মতো। 'আল্-ইস্‌লাহ্' প্রথম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যপত্রিকার ভীড়ে দাঁড়াতে পারবে না। অতি নিষ্প্রভ মনে হবে এর গেট আপ, কাগজ, ছবি ইত্যাদি। কিন্তু প্রাণ-সম্পদে এর প্রাচুর্য চোখে না পড়ে পারে না।

মুসলমানদের প্রধান সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে (সওগাত মোহাম্মদী বুলবুল-জয়তী—চতুরঙ্গ) যদিও এর কোনও তুলনাই চলে না, তথাপি কতিপয় কারণে আল্-ইস্‌লাহ্ এখনও অতি প্রয়োজনীয় পত্রিকা হিসেবে বিবেচিত হবে। এতে ঐকালের বহু সাহিত্যসাময়িকী, সাপ্তাহিকী প্রভৃতি পত্রিকার নাম পরিচয় (বিজ্ঞাপন ও আলোচনার মাধ্যমে) লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আর হয়ে আছে সেকালের মুসলমান মানসের অকপট চিত্র, সামাজিক বিকাশের দলিল। সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক-বিজ্ঞানের গবেষকদের বহু উপকরণ, উপাদান আল্-ইস্‌লাহ্ সরবরাহ করে। এর পৃষ্ঠাগুলো মেললেই একটি যুগ জীবন্ত হয়ে, কথা কয়ে ওঠে।

এত সব কিছুর পরও 'আল্-ইস্‌লাহ্' একটি 'আঞ্চলিক' ও ধর্মীয় ধারার পত্রিকা হিসেবেই বিবেচনার দাবি রাখে।

আল্-ইস্‌লাহ্ সম্পাদক মুহম্মদ নূরুল হক দশঘরী সিলেটের বিশ্বনাথ থানার দশঘর গ্রামের লোক বলে নামের সঙ্গে 'দশঘরী' শব্দ লিখতেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ আয়াজ আলেম ফারসি সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। মুহম্মদ নূরুল হক ১৯২৫ সন থেকে বিভিন্ন মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে ১৯২৯ সনে সিলেটের সরকারি আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিলেন। শৈশবে ইংরেজি স্কুলের পাঠও শেষ করেছিলেন। ফলে দুটো ভিন্ন চেতনা লাভের সুযোগ তাঁর যতো সামান্যই হোক,—হয়েছিল।

নূরুল হক আলিয়া মাদ্রাসায় ছয় বৎসর (১৯২৯-৩৫) ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনীকার তাবেদার রসুল বকুল জানিয়েছেন, মাদ্রাসার সিনিয়র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় 'অভিযান' নামের এক হাতে লেখা পত্রিকার সূত্রে 'আল্-ইস্‌লাহ্'র সম্পাদনায় আসা হয়েছিল। 'অভিযান' এর নাম পরিবর্তন করেই 'আল্-ইস্‌লাহ্' করা হয়।

www.pathagar.com

মুসলমান সমাজের সদস্যরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অকারণে কেন দূরে ঠেলে রেখেছেন, সে প্রশ্ন 'অভিযান' উত্থাপন করেছিল। 'অভিযান' নামটির ভাবার্থ লক্ষণীয়। আর 'সংশোধক' বা 'আল্-ইস্লাহ্' দ্বারা সমালোচনার মাধ্যমে সংশোধন করতে চাওয়া হয়েছে মুসলমানদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে। (আল্ ইসলাহ্ অর্থ সংশোধন)।

যে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ 'বাংলা'র নাম-গন্ধ পর্যন্ত শুনতে পেতেন না, তাঁদেরকে সংগঠিত করে একটি কমিটি গঠন করা হয় বাংলা ভাষায় প্রকাশিতব্য আল্-ইস্লাহ্ পরিচালনার জন্য। পত্রিকা প্রকাশের পর বাঙলা-আসামের বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকশ অভিনন্দন পত্র সম্পাদকীয় দপ্তরে এলে সম্পাদক উৎসাহ বোধ করেন।

'বুলবুল', 'মোয়াজ্জিন' প্রভৃতি পত্রিকায় আল্-ইস্লাহ্র বড় বড় বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে। বলা হয়েছে, আল্-ইস্লাহ্তেও অনেক পত্রিকার বিজ্ঞাপন আছে।[১]

ঐ সমস্ত পত্রিকা আল্-ইস্লাহ্ কার্যালয়ে এলে পত্রিকায় তাঁর সমালোচনা করা হতো। ফলে ঐ পত্রিকায় এমন অনেক বিস্মৃত পত্রিকার নাম জানা যায় যা ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ এর মধ্যে মুসলমানদের দ্বারা প্রকাশিত বা সম্পাদিত হয়েছে। মুহম্মদ নূরুল হক লিখেছেন :

> ... মাদ্রাসায় আমরা স্বমতাবলম্বী জনাকয়েক একত্রিত হইয়াছিলাম. রীতিমতো আমরা বাংলা সাহিত্যের সেবা করিতাম এবং মাদ্রাসায় অন্যান্য ছাত্রবন্ধুদিগকে মাতৃভাষা বাংলা চর্চার জন্য উৎসাহ অনুপ্রেরণা যোগাইতাম। আমাদের চেষ্টা তদ্‌বিরের ফলে বাংলা সাহিত্য চর্চার দিকে মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিতে লাগিলাম,... একখানি আবেদন ছাপাইয়া চতুর্দিকে প্রচারার্থে পাঠাইলাম। অনুকূল সাড়া পাওয়া গেল। মাদ্রাসারও আন্তরিক সমর্থন লাভ করিলাম। এই সময় দুইজন উদার-হৃদয় অধ্যাপকের দৃষ্টি... আকৃষ্ট হইল। বাংলা সাহিত্য সেবার দিকে আমার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া তাঁহারা আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিলেন এবং আর্থিক সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।[২]

মুহম্মদ নূরুল হক আল্-ইস্লাহ্র উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে লিখেছেন :

> '...এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল আলেম সমাজকে বাংলা ভাষা চর্চার দিকে আকর্ষণ এবং মাতৃভাষার ভিতর দিয়া ইসলামিক সংস্কৃতি ও তমদ্দুনের বিকাশ গঠন। পত্রিকা বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পাওয়া গেল। সিলেট মাদ্রাসায়ই ইহার গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়াইল তিন শতাধিক। বাহিরের মাদ্রাসাসমূহ হইতেও উপযুক্ত সাড়া পাওয়া গেল। ছাত্রবৃন্দ ইহার গ্রাহক সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হইলেন। ইহার ফলে মুসলমান সমাজে পত্রিকাখানি বিশেষভাবে আদৃত হইল। বাঙলা আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে উৎসাহপূর্ণ কয়েকশত পত্রও পাইলাম। আমার উৎসাহ বাড়িয়া গেল।'[৩]

'আল্-ইস্লাহ্'র কার্যালয় ছিল সিলেটের রিকাবি বাজারের মৌলবী আবদুর রহমানের দোকানের ছোট্ট একটি কক্ষে। পরে দরগাহ্ মহল্লায় স্থানান্তরিত হয়। মোহাম্মদ মকবুল হোসেন সম্পাদিত সিলেটের নামকরা ঐতিহাসিক পত্রিকা সাপ্তাহিক 'যুগভেরী'র নিজস্ব মুদ্রণালয় 'মিনার প্রেস' থেকে আল্-ইস্লাহ্ আবদুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত হতো।

প্রথমে রয়েল আট পৃষ্ঠার তিন ফর্মা সাইজে অতি সাধারণ নিউজপ্রিন্ট কাগজে বের হতো। পরের দিকে ডিমাই সাইজ হয়। বার্ষিক মূল্য ছিল এক টাকা। প্রতি চান্দ্র মাসের মধ্যেই বাহির হয়।

www.pathagar.com

নিয়মে বলা হয় : 'সমাজের কুসংস্কারাদি বিদূরণ ও তাহার অভাব অভিযোগের প্রতিকারের উপায় লইয়া যেসব কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিত হয়, তাহা সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প পবিত্র শরিয়তের মোতাবেক হওয়া চাই।... নবীন লেখকগণকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করা হয়। প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক দায়ী।'

সম্পাদক লিখেছেন : 'আল্-ইস্লাহ্ প্রকাশের পর আমাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ ইত্যাদি কম সহ্য করিতে হয় নাই। ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই আমরা সমর্থন লাভ করিয়াছিলাম।'

প্রথম দিকের উৎসাহদাতা, পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে বনিবনাও হলো না। 'যাহা হউক মফস্বল হইতে যে কয়টি টাকা (চাঁদা) আসিয়াছিল, তাহা দ্বারাই ১৩৪০ সনের অগ্রহায়ণ মাসে ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যা লইয়া সমাজের দ্বারস্থ হইলাম। যে ভদ্রলোক পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন, তাহাকে এই দায়িত্ব আমার অনুকূলে ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি ছাড়িতে অস্বীকার করিলেন। এই গোলমালে পড়িয়া পত্রিকাটি সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গেল।'

ছায় সাত মাস পর দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো। তখন থেকে মুহম্মদ নূরুল হক সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর হলেন। সম্পাদকের নিজের লেখাপড়া, পরীক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে পত্রিকা মাঝে-মধ্যে বন্ধ থেকেছে বটে, কিন্তু এরূপে মোটামুটিভাবে ১৯৪৭ (১৩৫৪) সন পর্যন্ত পত্রিকার দশম বর্ষ বের হলো। পনের বছরে দশটি মাঝারি সাইজের ভলিউম বের হয়েছে।

নতুন মাত্রায়, মেজাজে ও ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রচারের জন্য এই পত্রিকাটির ভূমিকা রয়েছে। অনেক ভালো রচনা এতে ছাপা হয়েছে, ...অবশ্য এগুলোর অধিকাংশ বক্তব্য মাসিক মোহাম্মদীরই প্রতিধ্বনিমাত্র। সিলেটের ন্যূন লেখকেরা তা লিখেছেন। উদ্ধৃতিবাহুল্য বর্জন করে বলা চলে, বন্দেমাতরমের হিন্দুয়ানী, মুসলমানদের প্রতি সরকারের এবং প্রভাবশালী হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম চাপিয়ে দেবার মনোবৃত্তি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ে মুসলিম বিদ্বেষ, হিন্দু-নারী অপহরণের জন্য মুসলমানদেরকে অভিযুক্তকরণ প্রভৃতির জবাব দিয়ে, মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সচেতন পত্রপত্রিকার বক্তব্যকে সমর্থন করে, মুসলমানদের মুখপত্র হিসেবে মোহাম্মদীর মতোই আল্-ইস্লাহ্ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে।

আর আরবি প্রভৃতি ভাষার বিতর্কে বাংলার পক্ষাবলম্বন করে পত্রিকাকে সাহিত্যপত্রিকা রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম দুই বছরের পরে পত্রিকার আকার ও আদর্শ সবই পরিবর্তন করা হয়। বলা আবশ্যক যে, মুসলিম-লীগ সমর্থক পত্রিকা হলে আল্-ইস্লাহ্ সিলেটের আলেম সমাজের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়। পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষিত লোকেদের সমর্থন তাঁরা পেয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রথমে পত্রটি মুসলিম-স্বার্থসচেতন থেকেও দলীয়পত্রিকা ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা : 'সিলেট তথা আসামের মুসলমান সমাজে যখন একখানিও মাসিক পত্রিকা ছিল না— স্থানীয় লেখকগণ যখন অন্যত্র উৎসাহ পাইতেছিলেন না,—প্রতিভা বিকাশের পক্ষে নানা অন্তরায় সৃষ্টি হইতেছিল, সেই সময় 'আল্-ইস্লাহ্' মুসলিম সাহিত্যাকাশে দেখা দিয়াছিল একটি ক্ষীণ তারকার মতো।[৪]

www.pathagar.com

পত্রিকার প্রসঙ্গে 'সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের' কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। এই পত্রিকারই প্রসূণ সিলেটের উপরিউক্ত সংসদ ও এর গ্রন্থাগার। এই সংসদ–গ্রন্থাগারে বিশ–ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের মুসলিম সম্পাদিত সাহিত্যপত্রিকা ও সাময়িকীগুলো সংরক্ষিত হয়েছে। মুহম্মদ নূরুল হক সাহিত্য ও সাময়িকপত্রের কৌতূহলী পাঠক ও সংগ্রাহক ছিলেন।

তদুপরি আল্–ইস্‌লাহ্ প্রকাশ করতে গিয়ে অন্যান্য সাময়িকীগুলো সৌজন্য–সংখ্যারূপে তিনি লাভ করেছেন। এই সমস্ত আপাত–তুচ্ছ জিনিস অন্যেরা ফেলে দিয়েছেন, হারিয়ে গেছে ইতিহাস থেকে। কিন্তু মুহম্মদ নূরুল হক পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার গড়ে তোলারও পদক্ষেপ নেন।

১৯৩৬ সনের ১৬ সেপ্টেম্বর সিলেট দরগার মুতাওয়াল্লী, সারেকওম এ.জেড. ওরায়দুল্লাহর বাড়িতে উৎসাহীদের সমাবেশে সিলেট সাহিত্য সংসদের কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী কাব্যবিশারদ। ইনি বিখ্যাত হাছন রাজার বংশধর। সহ–সভাপতি ছিলেন এ্যাডভোকেট আশারাফউদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী, ইনি এম. এল. এ. ছিলেন। অন্যতর সহ–সভাপতি ছিলেন মকবুল হোসেন চৌধুরী, ইনিও এম. এল. এ. ছিলেন। সংসদের সম্পাদক ছিলেন সারেকওম এ.জেড. আবদুল্লাহ্। অন্যান্যরা ছিলেন, দেওয়ান অহিদুর রাজা চৌধুরী, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, ইকবাল হোসেন, শেখ মোঃ সেকান্দার আলী, মুহম্মদ নূরুল হক, মো: আবদুর রাজ্জাক, আবু মুকতাদির, মুহম্মদ রইস, আবু মো: আবদুজ্জাহের, মো: আবদুল বারী চৌধুরী, আবদুল হাই ও নূরুদ্দিন।

১৯৩৬ সনের ১৬ সেপ্টেম্বর একটি আলমারী ও ১৯ খানা বই নিয়ে সংসদের যাত্রারম্ভ হয়। মুহম্মদ নূরুল হক 'আল্–ইস্‌লাহ্'কে সংসদের মুখপত্র হিসেবে ঘোষণা দেন। প্রধান উদ্যোক্তা হয়েও সাহিত্য সংসদের প্রথম কমিটিতে নূরুল হক সাহেব সাধারণ সদস্য হিসেবেই থাকেন। তবে তিনি 'লাইব্রেরিয়ান' এর দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

১৯৩৮ সনে সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে মুহম্মদ নূরুল হক ও আবদুস সুবহান চৌধুরী যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪১ সন পর্যন্ত মুহম্মদ নূরুল হক সংসদের যুগ্ম–সম্পাদক ও লাইব্রেরিয়ান এর দায়িত্ব পালন করেন, আল্–ইস্‌লাহ্‌র সম্পাদক ছিলেন তিনি আজীবন। বর্তমানে একটি সুদৃশ্য বিরাট পাকা–ভবনে সিলেটের এই মুসলিম সাহিত্য সংসদ ও গ্রন্থাগার মুসলিম জাগরণের প্রতীকরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রায় ২২০০০ বই এবং সম্রাট আওয়ঙ্গজেবের স্বহস্তলিখিত পবিত্র কোরআন শরীফ, আইনে আকবরী ও অসংখ্য দুর্লভ বই ও পুরনো পত্রিকা এর সম্পদ বা সংগ্রহ। লেখকের কাছে পাওয়া যায় না যে বই, সে–বইও পাওয়া যায় মুসলিম সাহিত্য সংসদে। সিলেট জেলা ও মুসলিম বাঙলার পাঠক ও লেখক–গবেষকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উপাদান উপকরণ সরবরাহের ক্ষেত্রে নূরুল হকের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মুহম্মদ নূরুল হকের সাহিত্য ও সমাজ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ পাকিস্তান–এর প্রেসিডেন্ট তাঁকে 'তঘমায়ে খিদমত' (১৯৬৩) খেতাব দিয়েছিলেন। ঢাকার বাংলা একাডেমীসহ বহু প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মান ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। আল্–ইস্‌লাহ্‌র প্রচ্ছদে আরবি–স্টাইলের

www.pathagar.com

বাংলা হরফ, স্পষ্টই বোঝা যেত এটা ধর্মীয় ধারার পত্রিকা। না-হয়েও উপায় ছিল না। কারণ প্রকাশিত হতো মাদ্রাসার পরিবেশে, মাদ্রাসাকেন্দ্রিক লোকেদের উদ্দেশ্য করে। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্যে চিত্রশিল্পীর তখন নিদারুণ অভাব, যা আছে–সবই ইসলামি, আরবি হরফ ও শিল্পের অনুকরণ। এর উপরে লেখা থাকতো পবিত্র কোরআনের এই কথাটি– 'ইসলাম আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত ধর্ম'।

আল্-ইস্‌লাহ্‌র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বের হয় অগ্রহায়ণ ১৩৩৯, নভেম্বর ১৯৩২-এ। পত্রিকার গায়ে শাবান ১৩৫১ হিজরী কথাটিও লেখা ছিল। প্রথম সংখ্যার লেখকদের অধিকাংশ পত্র প্রেরক, আল্-ইস্‌লাহ্‌কে স্বাগত-শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁরা লিখেছিলেন, যেমন— মোহাম্মদ হুরমত আলী লস্কর, মোহাম্মদ আবদুল বারী, মোহাম্মদ ছানাওর, দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী, একলিমুর রাজা চৌধুরী, মওলানা মসদ্দর আলী, আবদুল গফফার চৌধুরী, সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, সুরেশ্বর কুমার গোস্বামী, মৌ: ইরফান্‌উল হক ; মৌ: আবদুর রশিদ চৌধুরী, মোসাম্মৎ আউয়ালুন্নেসা খাতুন প্রমুখ।

একই সংখ্যায় একাধিক লেখাও আছে অনেকের। দেওয়ান আহবাব চৌধুরীর লেখাটির শিরোনাম 'তরুণ সাহিত্যের আদর্শ'। টীকায় বলা হয় লেখকের 'উপন্যাসে জাতীয় আদর্শ' শীর্ষক পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত।

এই শিরোনামে মোহাম্মদীতেও তিনি লিখেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'আমাদের তরুণ সাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাস ও গল্পে, গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসিয়া লেখকেরা 'কওমের ভবিষ্যত চিন্তা দূর করিয়া' কেবল প্রেম-প্রীতি ও বীভৎস মনস্তত্ত্ববাদ প্রচার করে অধপতনের দিকে চলেছেন। মহান চরিত্র অঙ্কনের জন্য তাঁদেরকে কি মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস অনুপ্রাণিত করে না'? 'তাহাদের প্রাণ কি এতই নির্জীব, কান কি এতই বধির? আমাদের এই নির্জীব পথহারা বাঙ্গলা সাহিত্য জগতে কি কোন বাঙ্গালী আনোয়ারের আবির্ভাব হইবে না?... ইসলামের বার্তা লইয়া আসিবেন না?'[৫]

মওলানা মসদ্দর আলী বলেন, এত আলেম ফাজেল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নিজ মাতৃভাষার সাহায্যে ইসলামের গৌরব মর্যাদা দেশের প্রত্যেক জাতির অন্তরে প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না। 'বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষিত লোকদিগকে কোরআন হাদীস বুঝাইতে অক্ষম হন (তাঁরা) এ-লজ্জা রাখার স্থান কোথায়? 'বাংলা ভাষা এমন একটি ভাষা নহে যে উহা দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। ...সামান্য চেষ্টা করিলেই এই ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া যেখানে সেখানে যাইয়া কোরআন হাসীসের বাণী প্রচার করিতে পারিবেন। হে শ্রদ্ধাস্পদ আলেম সম্প্রদায়, ধর্মপ্রচার ও তাহার হেফাজতের জন্য দায়ী আপনারা নহে কি?'

বাংলা ভাষার মাধ্যমে কোরআন-হাদীসের বক্তব্য প্রচারের জন্য আরবী-শিক্ষিত সমাজের কাছে লেখক যুক্তি দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন।[৬]

মোহাম্মদ ছানাওর এর বক্তব্যও এই সুরেই বাধা। —'বাংলা সাহিত্যের গতি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন, ...অনেকে জাতীয় আত্মা পরিস্ফুটনের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনের কথা বলছেন। কিন্তু স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন কি? আরবি, ফারসি অনেক শব্দের বঙ্গানুবাদ হয় না, আবার মুসলমানদেরও রাতারাতি 'বিদ্যাসাগরীয় যুগের ভাষাকে' মৃতভাষা বলে পরিহার করা ঠিক হবে না। 'বাংলা ভাষা এবং বাঙালী জাতি এক আর

www.pathagar.com

বঙ্গভাষার সাহিত্যও এক। সেই একত্বের জায়গায় বহুত্বের প্রসার কোনমতেই সমীচীন নহে। কেহ্ কাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না। উভয়কে চেষ্টা করিয়া মাতৃভাষাকে আরবি বা সংস্কৃত ভাষার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণশীল করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা যদি করিতে পারি তবে অন্যভাষার গুরুত্ব নিয়া মাতৃভাষার সাধকদের মধ্যে ঝগড়া কলহ করিতে হইবে না। ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী।[৭]

আল্-ইস্লাহ্তে উপর্যুপরি 'জাতীয় সাহিত্য' হিসাবে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে মুসলমানকে সমভাবে সৃজনশীল ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। অপর এক আলোচনায় সম্পাদক লিখেছেন :

> দুনিয়ার যত দেশই উন্নতির উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের এই উন্নতির মূলেই রহিয়াছে জাতীয় সাহিত্য। সাহিত্যই জাতির প্রাণ। সাহিত্য ব্যতিরেকে কোন জাতিই নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও কালচারকে বজায় রাখিতে পারে না। দুনিয়ার কত নির্জীব ও পরাধীন জাতি আজ সাহিত্যের মৃতসঞ্জিবনী সুধা পান করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।... দেশের জাতির ও সমাজের উন্নতি করিতে হইলে সর্বাগ্রে আমাদিগকে জাতীয় সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আজ দিকে দিকে তরুণের বিজয় অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের তরুণরা নিজের মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছে। আমরা বাঙালী। বাংলাই আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষার ভিতর দিয়াই আমাদের জাতীয় ভাবধারা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।[৮]

আল্-ইস্লাহ্ সমাজকে নানাভাবে দেখবার চেষ্টা করেছে। তাঁরা মুসলিমকে ইসলামি আদর্শ গ্রহণ করতে বলেছেন। তাঁদের মতে, স্বাতন্ত্র্য-হীনতা জাতির পক্ষে বড়ই মারাত্মক। ইউরোপের আদর্শকে ভারতের অধপাতের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন : 'হায় কুক্ষণে ভারত ইউরোপের মুখ দেখিয়াছিল।'[৯]

মাদ্রাসা শিক্ষাকে বাংলাভাষার মাধ্যমে গ্রহণের পক্ষে তাঁরা মত দিয়েছেন, বলেছেন,

> কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় প্রাচীন রীতি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধন করিয়া ইংরেজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয় মাতৃভাষার মধ্যস্থতায় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন... কিন্তু আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার কি কোন পরিবর্ত্তন হইবে না? বাঙলার মাটিতে পয়দা বাঙ্গালী ছাত্রেরা যতদিন পর্যন্ত নিজ মাতৃভাষা বাঙলার মধ্যস্থতায় আরবী শিক্ষা না করিবে ততদিন পর্যন্ত আরবী শিক্ষিতদের দুর্গতির অবসান হইবে না।... বর্ত্তমানে যাঁহারা মাদ্রাসা পাশ করিতেছেন, তাঁহাদের পরিণাম কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুই একজন মৌলবী সাহেবকে সরকারী চাকুরী দিতে গেলে বাঙলা ইংরেজী জানা না থাকিলে গ্রহণ করিতে চাহেন না, আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে তাহাদিগকে বাংলা ইংরেজী পর্যাপ্তরূপে শিক্ষা দেওয়া হয় কি?[১০]

পল্লীবাসী সম্পাদক সেইকালের গ্রামবাঙলার যে ছবি দিয়েছেন, তা দেখলে সমাজপ্রগতির ব্যাপারে হতাশই হতে হয়। তিনি ১৯৩২ সনে লিখেছিলেন, 'পল্লীতে আজ আছে কি? আছে শুধু মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি, মিথ্যা মামলা, একে অন্যের মাননষ্ট, প্রাণ-নষ্ট, ভাইয়ে-ভাইয়ে অবিশ্বাস, বাপ-ছেলেতে ঝগড়া-ঝাটি, প্রতিহিংসা, নির্দয় ব্যবহার, আরও কত কি? আজ পল্লী নিদ্রিত। পল্লীর কর্ণকুহরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থ এই বিবিধ মহামন্ত্র প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। তবেই তাহার সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে।'

www.pathagar.com

আর এ ব্যাপারে আলেম সমাজের সহযোগিতাও সম্পাদক প্রত্যাশা করেছেন। 'কোথায় আলেম সমাজ' শীর্ষক আলোচনায় তিনি বলেন, 'আজ সমাজস্তরে ক্লেদ, কুসংস্কার এবং অনাচার যেরূপভাবে ঢুকিয়াছে, তাহা বিদূরিত করিতে ওলামা সম্প্রদায়ের বিরাট কর্মশক্তিকে কাজে গালাইতে হইবে।'[১১]

আল্-ইস্লাহ্‌র প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় আলোচনাতেই 'নারী-স্বাধীনতা' বিষয়ে আলোচনা করা হয় :

> আজকাল দেশের চতুর্দিকে নারী স্বাধীনতার একটা আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া আমরা আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। এই আন্দোলন দিনদিন যেরূপভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, অচিরেই এতদ্দেশীয় মহিলারা ইউরোপের স্বেচ্ছাচারী রমণীগণের ন্যায় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আসরে অবতীর্ণ হইবেন। হিন্দু মহিলারাও পূর্ব হইতেই নারী স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাকী মোসলমান মহিলারা, তাঁহারাও ভিতরে ভিতরে গোমরিয়া মরিতেছেন, সুযোগ পাইলেই বাহির হইবার চেষ্টা করিবেন। আমাদের বিবেচনায় কিন্তু এইরূপ নারী আন্দোলন ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। পুরুষ নারী জাতিকে কেবল ভোগ লালসার সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে, এবং নারীর সকল স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে, এইরূপ উক্তির মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বরং হিন্দু রমণীকে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির ও মোসলমান মহিলাগণকে খোদেজা, ফাতেমা,... প্রভৃতি পুণ্যশ্লোকা মহিয়সীদের আদর্শ অবলম্বন করিয়া সংসারে নন্দন-কাননের সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করি।

সম্পাদকের মতে, হিন্দু ও মোসলমানেরা যে আর্য ও মুসলিম সভ্যতার বড়াই করেন—তাঁরা তাঁদের মাতা ভগিনীগণকে ইউরোপীয় ফ্যাশনে চালিত করিতে চান, সেটা বড়ই লজ্জার বিষয়।[১২]

মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন একজন আধুনিক চেতনার মানুষ। 'ভিক্ষুক ও সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি মুসলমান সমাজে ভিক্ষুকের প্রবণতারোধের উদ্দেশ্যে লিখেছেন সেই প্রায় ৭০ বছর আগে :

> এদেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।... যত শ্রেণীর ভিক্ষুকের কথা আলোচনা হইল তাহাদের সবই যদি মুসলমান হয়, তবে হিন্দুর মধ্যে কি অন্ধ থাকিতে পারে না? হিন্দুর কোন সন্তান কি খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, আতুর হয় না? হিন্দুর মধ্যেও কি ভিক্ষুক নাই? নিশ্চয়ই আছে। হিন্দু-সমাজে অন্ধ আতুর বৈষ্ণব যথেষ্ট আছে। কিন্তু থাকিলে কি হয়?' তাঁরা তাদেরকে সমাজে বের করেন না। আত্মীয়রাই তাদের পোষণ করেন। 'আতুরকে প্রতিপালন করিয়া একটু বয়স হইলেই একটি ছোটখাটো ব্যবসা দিয়া বসাইয়া রাখেন অথবা কোনও প্রকার শিল্প শিক্ষা দেন, যাহাতে সে বসিয়া-বসিয়াও নিজের জীবিকার্জন করিতে পারে।...' লেখক মন্তব্য করেন, 'অত্যধিক দানশীলতার (?) প্রশ্রয় দিয়াই মুসলমান সমাজ অসংখ্য ভিক্ষুকের সৃষ্টি করিয়াছে এবং এইভাবে প্রশ্রয়মূলে ভিক্ষুকের দল বৃদ্ধি পাইয়া সিন্দাবাদের দৈত্যের মত মুসলমান সমাজের ঘাড়ে চাপিয়াছে। তাই আবার মুসলমান সমাজের নেতা ও আলেম সাহেবানকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, মুসলমান ভিক্ষুকের জাতি না ভিক্ষুক মুসলমানের জাতি? এবং এসব সামাজিক দুর্বলতার কি কোনও প্রতিকার নাই[১৩]

www.pathagar.com

আল্-ইস্লাহ্র উপরিউক্ত (আলোচিত) লেখকগণ ছাড়াও, হুরমৎ আলী লস্কর, আবদুল গফফার চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, মোহাঃ ছিকান্দর আলী, আমিনুল হক চৌধুরী, ছৈয়দ শামসুল ইসলাম, মৌঃ ফজলুর রহমান, আবদুল করিম, আবদুল আজিজ, মোহাম্মদ মোর্তজা চৌধুরী, মোহাম্মদ মুজফফর হোসেন, ডাক্তার কে.এন. খানম, আবদুজ্জাহের, মোহাম্মদ ইসমাইল, আলী আহমদ, আফতাব আলী, আছদ্দর আলী, আবদুল লতীফ, আঞ্জব আলী, নজিবুল্লাহ্, একলিমুর রাজা চৌধুরী, মতিনউদ্দীন আহমদ, এনায়েতউল্লাহ্, আজীজুর রহমান, এম.এ. ছালাম, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, ছঈদ আলী, সুরেশ কুমার গোস্বামী, গগনচন্দ্র ধর, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, শ্রীসমরেন্দ্র কর, ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস, শ্রী শ্যামধন সেনগুপ্ত, শ্রী হরদয়াল নাগ, উপেন্দ্রচন্দ্র দাস, রমেশচন্দ্র দাস, রসরাজ বৈদ্যরাজ প্রমুখ অমুসলিম লেখকদের অনেক রচনাসহ বিচিত্রসব রচনা আল্-ইস্লাহ্ ছেপেছে।

এই পত্রিকার প্রধান লেখক হচ্ছেন—আহবাব চৌধুরী, আশরাফ হোসেন, দেওয়ান আজরফ, আবদুর রাজ্জাক (কবি), আবদুল গফফার চৌধুরী (কবি) এবং সম্পাদক নিজে। তিনি প্রবন্ধ, আলোচনা, পুস্তক-সমালোচনা, পত্রিকার আলোচনা, সামাজিক সমস্যা সব বিষয়ে প্রাণস্পর্শী, বিদ্বেষশূন্য, মানবতাবাদী, উদার ও আধুনিক-যুক্তিবাদী লেখা অনেক লিখেছেন।

মোহাম্মদ মোর্তজা চৌধুরী, মহাম্মদ ছানাওর, মতিনউদ্দীন আহমদ, মতিউল ইসলাম, এ.জেড. আবদুল্লাহ্, আজহারউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ আবদুর রব, বন্দে আলী মিয়া, আবদুল, করিম সাহিত্যবিশারদ, আবদুস সোবহান চৌধুরী, মকদ্দুস আহমদ, মুহম্মদ আবদুল মজিদ, মহম্মদ হবীবুল্লাহ (বাহার), শেখ আবদুর রহীম, শাহেদ আলী, মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী প্রমুখও লিখেছেন এতে।

আল্-ইস্লাহ্র রচনাতে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজকে আনন্দের সঙ্গে আহ্বান করা হয়েছে। আর সুযোগবঞ্চিত নব্যলিখিয়েদের সাহিত্যচর্চার উৎসাহ যোগাযোগ হয়েছিল। বাঙলা ভাষা সম্পর্কে মুসলমানদের ভ্রান্তি নিরসনে এর দান অনেক।

আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আল্-ইস্লাহ্র একজন প্রধান লেখক, মুসলিম সমাজের গ্রহণযোগ্য সাহিত্যিক মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী লিখেছিলেন :

> বাঙ্গালার মুছলমানের মাতৃভাষা কি হইবে, ইহা লইয়া গত কয়েক বৎসর হইতে একটি আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে।... বাঙ্গালা ভাষাই বাঙ্গালী মুছলিম সমাজের মাতৃভাষা হওয়াই স্বাভাবিক। এই বিংশ শতাব্দীতে ইহা লইয়া আলোচনা করা হাস্যাস্পদ বলিয়া বোধ হয়... বাঙ্গালার মুছলমানের উত্থান পতন ও সুখ দুঃখের ইতিহাসের সহিত এই মাতৃভাষা-সমস্যাও বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ভাষা পরিবর্তনই মুছলিম-বঙ্গের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।[১৪]

তথ্যনির্দেশ

১. আল্-ইস্লাহ্র বিজ্ঞাপন অধিকাংশ মুসলিম-সম্পাদিত পত্রিকায় দৃষ্টিগোচর হলেও ঐকালের সবচেয়ে নিয়মিত প্রধান দুই পত্রিকা—সওগাত ও মোহাম্মদীতে আল্-ইস্লাহ্র কোনো বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না। বুলবুল ও মোয়াজ্জিনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনী প্রচারণা আল্-ইস্লাহ্র সুখ্যাতি বৃদ্ধি করেছে।

www.pathagar.com

'বুলবুল', 'মোয়াজ্জিন', আল্-ইস্লাহ্ এঁরা সারা বাঙলার মুসলমানদের যৌথ-জাগরণ কামনা করতেন, আর সামাজিক জাগরণে সামাজিক পত্রিকার অসীম ভূমিকার কথা বারবার পত্রিকার আলোচনায় উল্লেখ করতেন। এবং তাঁরা মুসলমানদেরকে সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করার অনুরোধ করতেন। উদ্বুদ্ধ করতেন নানা যৌক্তিকতা দিয়ে। এই যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া গবেষককে মুগ্ধ করে। এর ফল আজ ভোগ করছি আমরা। —একথা বলার মানে এই নয় যে, মোহাম্মদী ও সওগাত-এর সামাজিক জাগরণের প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেখতে হবে।

২ মুহম্মদ নূরুল হক, সংবাদপত্র সেবায় সিলহেটের মুসলমান, সিলেট, ১৯৬৯, পৃ. ৬-১৫।

৩. উপরিউক্ত।

৪. উপরিউক্ত।

৫. দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী, তরুণ সাহিত্যের আদর্শ, আল্-ইস্লাহ্, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯।

৬. মওলানা মসদ্দর আলী, সুরমা উপত্যকার উলামা সম্প্রদায়, উপরিউক্ত।

৭. মোহাম্মদ ছানাওর, বাংলা সাহিত্যের গতি, উপরিউক্ত।

৮. সম্পাদকীয় আলোচনা, আল্-ইস্লাহ্ ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩৯।

৯. উপরিউক্ত।

১০. উপরিউক্ত।

১১. আল্-ইস্লাহ্র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য।

১২ সম্পাদকীয় আলোচনা, উপরিউক্ত।

১৩. এম. আশরাফ হোসেন, ভিক্ষুক ও সমাজ, আল্-ইস্লাহ্, ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৯।

১৪. মৌলভী দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী, আমাদের মাতৃভাষা, উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৯।

•

www.pathagar.com

২৪. প্রভাতী
(সিলেট, ১৩৪৮–৫৪)

পাকিস্তান 'আন্দোলনের চূড়ান্তকালে, আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে, সাহিত্যিক মুখপত্র দ্বারা মুসলমানদের মানস গঠনের জন্যে প্রভাতী বের হয়েছিল। প্রত্যেক জেলা থেকে মুসলিম লীগের সাহিত্যিক মুখপত্র বের হয়েছিল কীনা জানা যায় না, তবে সেকালের ছোটবড় প্রায় সকলপত্রেই পাকিস্তানের পক্ষে বক্তব্য এসেছে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলনরত হিন্দু–পত্রপত্রিকার জবাব দিতে গিয়ে।

সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র-ফেডারেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুখপত্র, 'প্রভাতী'র প্রথম সংখ্যা বের হয় পৌষ ১৩৪৮, জানুআরি ১৯৪২ এ। সম্পাদক ছিলেন রজিউর রহমান। প্রকাশক ছিলেন ফেডারেশনের পক্ষে কাজী মোশারফ আলী। তৎ কর্তৃক সিলেটের সারদা প্রেসে মুদ্রিত হতো। প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা ১৫২। বছরে ৪০০ পৃষ্ঠা ছাপা হত। প্রতি সংখ্যার মূল্য পাঁচ আনা। ছাত্রদের জন্য চার আনা। বার্ষিক সডাক তিন টাকা। ছাত্রদের জন্য আড়াই টাকা। ঠিকানা দরগাহ মহল্লা, সিলেট। 'প্রভাতী'র বিভিন্ন সংখ্যার প্রচ্ছদে নজরুলের জাগরণমূলক কবিতা উদ্ধৃত হতো। যেমন, প্রথম সংখ্যায় ছিল—

জাগো দুর্মদ যৌবন। এসো তুফান যেমন আসে,
সুমুখে যা পাবে দলে চলে যাবে অকারণ উল্লাসে।
আনো অনন্ত বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি,
কূলের আবর্জনা ভেসে গেলে হবে না কাহারও ক্ষতি।
বুক ফুলাইয়া দুখেরে জড়াও, হাসো প্রাণ-খোলা হাসি,
স্বাধীনতা পরে হবে—আগে গাও, 'তাজা-ব-তাজা'র বাঁশী।
সাগরে ঝাঁপায়ে পড় অকারণে, ওঠ দূর গিরি চূড়ে,
বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে।
ভোলো বাহিরের, ভিতরের যত বদ্ধ–সংস্কার,
মরিচা ধরিয়া পড়িয়া আছে সব আলির জুলফিকার।
জাগে উমদ আনন্দে দুর্মদ তরুণেরা সবে,
নাইবা স্বাধীন হল দেশ, মানবাত্মা মুক্ত হবে।

পাকিস্তান আন্দোলনের, এবং মুসলিম লীগের প্রধান নেতা কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর শুভেচ্ছাবাণীতে বলা হয় :

> My message to the entire muslim youth of india is 'Be prepared'. The youth of muslim india have a special duty towards their community. They are looked upon as the flower of their nation, and correspondingly they have a greater responsibility to soulder. Besides, being the strong arm of their nation they will in time have to work also as its brain. So they must think, quality, equp and prepare themselves till the call for nation comes, It is only then, you will be able to discharge efficiently your duty and responsibility which may face upon you with credit and honour to your selves and to your people.

www.pathagar.com

প্রভাতীর যাত্রারম্ভের কথামালা ছিল নিম্নরূপ :

> অতীতের রক্তলেখা গৌরব-উজ্জ্বল ইতিহাস আজ দাসত্ব ও লাঞ্ছনার কলঙ্ক-কালিমায় মসীলিপ্ত ; ব্যর্থতার ঘোর কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্যে আকাশ-বাতাস পৃথিবী জুড়িয়া মহানরমেধযজ্ঞ। এ-দুর্দিনে এ-দারুণ অশুভ মুহূর্তে একমাত্র আল্লাহতায়ালার সত্য ও শাশ্বতবাণীই আমাদের পথ প্রদর্শক, আমাদের সাধনা ও আরাধনার বস্তু। হৃদয়ে দুর্বার শক্তি দিয়ে, প্রাণে অপরাজেয় ক্ষমতা দিয়ে কোরআন আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছে 'ভীত হইওনা, সন্ত্রস্ত হইও না, তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ, যদি তোমরা সত্যিকার বিশ্বাসী হও।'
>
> ...কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কোরআন আমাদিগকে শাসাইয়া দিয়াছেন, 'আল্লাহর রজ্জু দৃঢ় মুষ্ঠিতে আকর্ষণ করিও, এবং শতধা বিচ্ছিন্ন হইওনা।' অতএব আজ আমাদিগকে আত্মার দুর্জয় দুর্ণিবার শক্তি ফিরাইয়া আনিতে হইবে। দীন ইসলামের অচল অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, মুক্ত ভারতে মুক্ত ইছলাম স্থাপনের জন্য জাতিকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করত কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। মুছলিম ছাত্র সমাজের জীবনে প্রাণের নবীন স্পন্দন, কর্মের দুর্নিবার অনুপ্রেরণা আনয়নের মহান উদ্দেশ্যে আজ 'প্রভাতী'র যাত্রা। এ যাত্রা সফল হইক, ...ইহাই আকুল প্রার্থনা... 'তওফিক দাও খোদা ইছলামে/মুছলিম জাঁহা পুনঃ হউক আবাদ/দাও সে হারানো ছুল্‌তানাত্‌/দাও সে বাহু, দিল আজাদ।'[১]

প্রভাতীর প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলেন, আবদুল গফফার চৌধুরী, ফজলুল হক সেলবর্ষী, মো: আজিজুস সামাদ, মকবুল আহমদ খাঁন, এম. মুজিবর রহমান চৌধুরী, নূরুর রহমান, রজিউর রহমান, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, এ.জেড. আবদুল্লাহ, মতাহির আলী, আর. রহমান, আফিয়া খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, আমেনা খাতুন, মুফজ্জিল আলী, মহিউস সরিয়ত চৌধুরী, মুহম্মদ আবদুল বারী, মোহাম্মদ আমিনুল হক, গোলাম মোস্তফা, ইব্রাহিম খাঁ, বেনজীর আহমদ প্রমুখ।

অন্যান্য সংখ্যায় লিখেছেন যাঁরা—তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য বেগম রোকেয়া, শাহ মফিজউদ্দীন, শামছুদ্দিন আহমদ, খাকী খাঁ, শেখ আবদুর রহিম (যুগভরী থেকে, ইছলামে শাসনতন্ত্রের স্বরূপ), অধ্যাপক জসীমউদ্‌দীন, মোয়াজ্জম আহমদ চৌধুরী, এম. সুলতান, আবদুন নুর চৌধুরী, মঈনুদ্দীন আহমদ, হাফিজ কেরামত আলী, বদিউজ্জামান আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, শাহেদ আলী, মোহাম্মদ আজরফ, মোহাম্মদ মোস্তফা চৌধুরী, মকবুল আহমদ খাঁ, শিরিণ চৌধুরী, (মুসলিম নারী প্রগতি, ১/৩-৪), এম. ময়ীদুল হক চৌধুরী, আবুল কাছেম, আবদুল হান্নান, এস. এ. খালেক, আবুল হোসেন, আবুল কালাম চৌধুরী, আবদুল কাদের।

ড. মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক আকরম হোসেন, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার, এস. ওয়াজেদ আলী, মো: ইউনুছ আলী, মুহম্মদ নূরুল হক, মোতাহের হোসেন, শ্রীরামনাথ বিশ্বাস, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বন্দে আলী মিঞা, সৈয়দ মোস্তফা আলী, মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম.এন. রায়), সুধাকর দেবনাথ, উৎপল দাশ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, আবুল ফজল, ফাহমিদা খাতুন, কামিনী রায়, হেলেনা খাতুন, রাবেয়া খানম, জেবুন্নেসা খানম, জয়ন্তী ব্যানার্জী, বেগম খায়রুন্নেসা, শ্রী বটন্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন, আহমদ আলী, আকমল হুসেন, চৌধুরী গোলাম আকবর চৌধুরী প্রমুখের নাম।

www.pathagar.com

এ সঙ্গে আরও অর্ধশত লেখকের নাম করা যায়। এঁরা অধিকাংশই সিলেট, মৌলবী বাজার, আসাম প্রভৃতি স্থানের ছাত্র-ছাত্রী এবং রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত তরুণ, শিক্ষিত শ্রেণী।

পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠন এবং মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের বিপক্ষে কংগ্রেসের আন্দোলন ও বিবৃতি, বক্তৃতা এবং হিন্দু-সম্পাদিত পত্রপত্রিকার মুসলিম ও পাকিস্তান-বিরোধী বক্তব্যের জবাব দান এবং মুসলিম তরুণশক্তিকে উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত, সংগ্রামী করে তোলাই মুখ্য সাধনা ছিল 'প্রভাতী'র। এজন্য খ্যাতিমান মুসলিম সাহিত্যিকদের রচনাও তাঁরা নিয়েছেন। লেখকসূচি মনোযোগ দিয়ে সময়ের কথা মনে রেখে পড়লেই তা স্পষ্ট হয়।

১৯৪২-৪৩ সনের মুসলিম লীগের সভাপতির আশীর্বাদপুষ্ট, ছাত্র ফেডারেশনের মতো রাজনৈতিক মতাদর্শের সাংগঠনিক কর্মের অন্তর্ভুক্ত একটি মাসিক পত্রিকার রচনাবলির ধরন, বক্তব্য, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য কী হতে পারে—তা সহজেই যেহেতু অনুমেয়, সেইহেতু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে বিবরণ লম্বা করার যৌক্তিকতা নেই।

তবে বলে রাখা ভালো যে, এই পত্রিকায় ছোটদের এবং নারী-জাতিকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে 'ছোটদের মজলিস' (পরিচালক মশালভাই) এবং ছাত্রী মহল খোলা হয়। পরিচালিকা 'ডটার অব ইসলাম' নামে জিবুন্নেসা খানম। পরিচালকদের সাহিত্যিক নাম দুটোর অর্থ ও ব্যঞ্জনাও লক্ষণীয়। 'মশাল' আগুন জ্বালায় ও ছড়ায়। আর 'ডটার অব ইসলাম', ইসলামেরই প্রসূণ—বোঝাই যায়।) তাঁরা নারী ও শিশু-কিশোরদেরকেও নানানভাবে কাব্য-সাহিত্যে, বক্তব্যমূলক রচনায় পাকিস্তানের প্রতি সংগঠিত করেছিলেন এসবের দ্বারা।

এই পত্রিকায় লেখকেরা হক-শ্যামা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। একথা জানা যে, ফজলুল হক কায়েদে আজমের সঙ্গে প্রায়ই মতবিরোধে লিপ্ত হতেন, আর অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির খাঁটি বাঙালি উঁচুস্তরের রাজনীতিক ছিলেন তিনি। কট্টরপন্থী ও কায়েদে আজমের অনুরাগী, অন্ধ মুসলিম-লীগারদের সঙ্গে ফজলুল হক, আবুল হাশিম প্রমুখ প্রগতিশীল মুসলিম লীগারদের মতের বনিবনা হতো না। 'প্রভাতী' তাই হক-মন্ত্রিসভার সময়ে অবলম্বিত ছাত্র ও মুসলিম দমনের নীতিকে নিন্দা করেছে—

> আজ সবেমাত্র বাংলায় মুছলিম নির্যাতন আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহারই উদ্বোধন স্বরূপ মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পরিত্যক্ত হইয়াছে। সারা বাংলা জুড়িয়া মুছলমানের কণ্ঠরোধ করার আয়োজন চলিতেছে, মুছলমানের ঐক্য ও সংহতি ধ্বংস করত তাহাকে শতধাবিচ্ছিন্ন করিবার হীন ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। ইহা যে আরও ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিবে একথা প্রায় স্থির নিশ্চিত। কাজেই ছাত্র সমাজকে আরও কঠোরতর বিপদের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা যদি বীরদর্পে এই মহাসংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারি, তবে অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত আমরা দেখিতে পাইব, বাঙলার কুচক্রীদের এই জমাটবাধা শক্তি তাসের ঘরের মত বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে। বাঙলার মুছলমান আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে।[২]

'প্রভাতী'তে কাজী নজরুলের জাগরণমূলক যেসব কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হতো (তখন তিনি নতুন লেখা দিতে পারতেন না, কদিন পর অসুস্থ, বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যান)—তার কটি হচ্ছে—

www.pathagar.com

১. হে চির অরুণ-তরুণ ! তুমি কি বুঝিতে পারনি আজো
জীবন ভরিয়া রোজা রাখি ঈদ আনিবেনা অভিনব ?[৩]

২ আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত্ত পীড়িতের মাখি খুন
লাল লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ।
আজ হৃদয়ের জাম-ধরা যত কবাট ভাঙ্গিয়া দাও,
'রং করা এ চামড়ার যত আভরণ খুলে নাও।'
আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি করে ঢুকুক এ বুকে, খুলে দাও যত খিল।[৪]

কাজী নজরুল প্রভাবিত কবি বেনজীর আহমদ এর 'নয়া জামানার নব রাহাগীর' শীর্ষক কবিতাটি নিম্নরূপ :

নয়া জামানার নব রাহাগীর, অগ্রসর।
সম্মুখপথে, আরো সম্মুখে নাহিক ডর।
দূর দিগন্তে রয়েছে এখনো কাবার পথ—
যুগ জোজাহেদ। চল নির্ভয়ে, হাঁকাও রথ ;[৫]

ছাত্রদের জাগরণের কালে জাগরণমূলক বক্তব্যই প্রাধান্য পেয়েছে সব লেখায়। ফজলুল হক সেলবর্ষী 'প্রাচ্যে ছাত্রবোধন' শীর্ষক রচনায় বিকৃত ইতিহাস ছাত্রদের পড়িয়ে হীনমন্য করে গড়ে তোলা হয়েছে বলে সাবধান করে বলেন—'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে রচনা কাহিনীগুলিকে Facts (ফ্যাক্টস) বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।... সেই পুরাতন কথাগুলিই আজ আমাদের নূতনভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।'[৬]

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ 'ছাত্র সমাজের প্রতি দুটি কথা'য় বলেন, আমাদের সমাজ ও দেশে সমস্যার অন্ত নাই। সেসব সমস্যার সঙ্গে এখন হতেই ছাত্রসমাজের পরিচিত হতে হবে, এখন হতেই তার সমাধানের কথা চিন্তা করতে হবে এবং যিনি ভবিষ্যতে সে সমস্যা সমাধানে হাত দিতে চান, তাকে এখন হতেই সেজন্য প্রস্তুত হতে শুরু করতে হবে চিত্তে, চিন্তায় এবং যথাযথ হাতে কলমে।'[৭]

তিনি ছাত্রদের রাজনীতি সম্বন্ধে ধারণা রাখারও পরামর্শ দেন। চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা, প্রচলিত ধারণা-সংস্কার প্রভৃতি সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করে তিনি বলেন, মুসলমানদের পুরনো ধারণা বর্জন করে যুগোপযোগী হতে হবে এবং সমাজের জন্য সব সময় চেষ্টা ও আকর্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে।[৮]

শাহেদ আলী[৯] 'তরুণের অভিযান' শীর্ষক রচনায় বলেন :

সবচেয়ে বড় কথা হল নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অতীতের একটা অচল কোন কিছু বলে বর্জন করলে চলবে না। মুসলমানের পোষাক-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে যদি তার সাংস্কতিক ছাপ না থাকে—তার ঐতিহ্যের সম্পর্ক না থাকে, তাহলে সকল সাধনাই বৃথা। এর মধ্যে কোন সজীবতা আশা করা যায় না। মূলকথা আমাদের মধ্যেই হবে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের রূপায়ণ, অন্যকে তাক লাগানোর জন্য বড় বড় বুলি আউড়িয়ে কোন কাজ হয় না...।[১০]

ছোটদের মজলিস-এর কবিরাও লিখেছেন 'অধিকার চাহ মুসলমান' শীর্ষক কবিতা—"নবীণ প্রভাতে অরুণ কিরণে জাগরে আজিকে মুসলমান ; /কত কাল আর ঘুমায়ে কাটাবি তন্দ্রাতে রবি মূহ্যমান।"[১১]

www.pathagar.com

মূল চেতনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে বলে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়,/আড়ালে তার সূর্য হাসে!/হারা শশীর হাসাহাসি অন্ধকারেই ফিরে আসে!"[১২] ছাপা হয়েছে প্রভাতীতে।

আবুল ফজলের পদ্যানুবাদ 'রুবাইয়াৎ-ই-হালি' ; মোতাহের হোসেন এর কবিতা—'তুমি নহ ধরণীর, আকাশে ঊর্ধ্বে তব স্থান' ছাপা হয়েছে। এবং লক্ষণীয় যে, কাজী নজরুল থেকে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিক—বেনজীর আহমদ, আবুল ফজল, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ আজরফ, শাহেদ আলী, মু. নূরুল হক, ড. মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখসহ সিলেটের প্রধান প্রায় সকল সাহিত্যিকই প্রভাতীতে লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণীও সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পুণর্মুদ্রিত কবিতার দুটো চরণ : 'ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান,/বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান।'[১৩]

কামিনী রায়ের উপদেশাত্মক কবিতাও ছেপেছেন তাঁরা—

সকলের মুখ হাসি ভরা দেখে
পারনা মুছিতে নয়ন-ধার
পরিহতব্রতে পারনা রাখিতে
চাহিয়া আপন বিষাদ ভার?[১৪]

কবিতার এক বৃহদাংশ 'ছোটদের মজলিস' ও 'মহিলা মহফিল' এর রচনা হলেও এর সম্পাদকীয় আলোচনাগুলো তখনকার রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কের, সমাজের, মুসলিম-মানসের, কংগ্রেসী হিন্দু ও মুসলিম-লীগের মুসলমানদের বিদ্বেষ ও বিরোধিতার স্বরূপ লিপিবদ্ধ করে রেখেছে।

প্রাপ্ত সংখ্যাসমূহের সম্পাদকের দফতর-এ আলোচিত কটি বিষয়ের পরিচয় দেয়া হলো। লক্ষণীয় যে ১৯৪০ সন থেকে মুসলিম সাহিত্যে 'পাকিস্তান' বা 'পূর্ব পাকিস্তান' যেন হয়েই গেছে, এমনভাবে লেখা হয়েছে।

হঠাৎ মনে হয় ১৯৪৭ সনের পরের কাগজ। সন্তান জন্মলাভের আগেই কল্পিত নাম নির্ধারণ করে তাঁর নামে জমি জিরাত রাখার মতো! এই পত্রিকার শীর্ষে 'পূর্বপাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রসমাজের মাসিক মুখপত্র' এবং 'সিলেট জিলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, প্রচারিত ও পরিচালিত' কথাও লেখা হত।

প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যায় সম্পাদকের দফতরে 'ভুল করোনা পাঠক' শীর্ষক আলোচনায় পাকিস্তান-প্রস্তাব সম্পর্কে লীগের মতামত আলোচনা করা হয়। 'পাকিস্তানের দাবী' শীর্ষক আলোচনায় বলা হয়, লীগের মধ্যে কংগ্রেসের মত আপোষ-বিরোধী একগুঁয়ে মনোভাব নেই। লীগের মনোভাব আপোষ-কামী, অতিসুন্দর ও সুস্পষ্ট। 'পাকিস্তান' তাঁদের অভিপ্সিত একমাত্র লক্ষ্য হলেও গণতন্ত্রই তাঁদের যুক্তি। 'কংগ্রেসের প্রতি মনোভাব', 'অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট', 'সুস্পষ্ট অভিমত' প্রভৃতি আলোচনায় পাকিস্তানের পক্ষেই বলা হয়।

> লীগকে যাঁহারা আজও একটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই একদেশদর্শী। অতীতে লীগ বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিয়াছে..লীগ সংকীর্ণতার গণ্ডী চিরদিনই অতিক্রম করিয়া চলিতেছে..আগে লীগের ভূমিকা ছিল একটা মাইনরিটি সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব। আজ কিন্তু লীগের সেই মনোভাব সম্পূর্ণ সম্প্রসারিত

www.pathagar.com

... মুসলমান আজ মাইনরিটি সম্প্রদায় নহে বরং একটি মহান জাতি, ভারত একটি দেশ নয় মহাদেশ। ভারতবাসী একটি জাতি নহে বরং জাতি-সংঘ। লীগের মতে ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটিশের দানের সামগ্রী নহে, বরং ভারত মহাদেশের আন্তর্জাতিক আপোষ-রফার অনিবার্য পরিণাম। লীগ বলে হিন্দু একটী মহান জাতি, তাহার মুখপাত্র কংগ্রেস... তাহার আবাসভূমি হিন্দুস্থান। হিন্দু বাস করিবে তার নিজ হাতে গড়া হিন্দু-রাজ্যে। মুছলমান মহান জাতি... তার মুখপাত্র মুসলিম লীগ... তার আবাসভূমি পাকিস্তান।'[১৫]

'ঐক্য চাই' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় আলোচনায় বলা হয় :

আমরা জানি সাম্প্রদায়িক ঐক্য ব্যতীত দেশোদ্ধার কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তাই আমাদের আজ প্রধান কর্তব্য হইবে—যাহারা আজও কংগ্রেসের বাহিরে রহিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়িয়া তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে—তাহাদের সহিত ঐক্য প্রচেষ্টায় যোগদান করা।

মুসলিম লীগের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে আজ তাহাদের সামনে তুলিয়া ধরিতে হইবে এবং ইহার ন্যায় ও সত্যতা সম্বন্ধে তাহাদিগকে নিঃসন্দেহরূপে বুঝাইয়া বলিতে হইবে।... আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে অস্বীকার করিতে পারিবে না এবং আমরা যদি সচেষ্ট হই তবে অতি সহজেই আপোষের পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

"অপরদিকে নেতৃবৃন্দের উপরও ঐক্যের জন্য চাপ দিতে হইবে।... খাদ্য সংকট, মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি যে সকল ব্যাপারে জনগণের যন্ত্রণা চরমভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে—সেগুলির প্রতিরোধ সাধনে আজ আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। এ সকল কাজে জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই আমাদের সহায়তা করিবে এবং ইহার ভিতর দিয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রচেষ্টা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইয়া উঠিবে।

"তদুপরি গভর্ণমেন্টকেও আমাদের জোর দাবী জানাইতে হইবে—অবিলম্বে এই অচলাবস্থার অবসান চাই।... বিক্ষুব্ধ জনগণের গলা চাপিয়া ধরিলেই অশান্তির অবসান হইবে না... বরং দেশের মাটিতে দেশের মানুষের প্রকৃত অধিকার দান করিলেই এই অবাঞ্ছিত ভাবধারার মূলোৎপাটন সম্ভবপর হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ঐক্যের পথ দুর্গম হইলেও অগম্য নয় ; ঐক্য আমাদের সাধন করিতেই হইবে। ঐক্য সাধনের পর আমাদের সম্মিলিত দাবী দুনিয়ার কোন সাম্রাজ্যবাদই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।"[১৬]

'প্রভাতী'তে ছাপা আছে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা—এনামুল হক, মোহাম্মদ আজরফ, আবুল ফজল, ইব্রাহীম খাঁ প্রমুখ সেগুলোর লেখক। মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহারের একটি বক্তৃতা 'ছাত্র সমাজের প্রতি' এর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। তিনি মুসলিম লীগের উঁচু স্তরের নেতা ও পাকিস্তানের প্রাদেশিক মন্ত্রী ছিলেন, অতএব তাঁর বক্তৃতায় কংগ্রেস ও লীগের বক্তব্যের যুক্তিনিষ্ঠ, সাহিত্যিক মানসম্পন্ন আবেদন রয়েছে। তিনি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে বলেন,

'পাকিস্তান সত্যিই জাতির ঘুমন্ত প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। আদর্শের আহ্বানে অল্প সময়ের মধ্যেই একটা দেশকে-দেশ জাতিকে-জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে—ইতিহাসে এর নজির রহিয়াছে। ফরাসি-বিপ্লব, রুশ-বিপ্লবের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাকিস্তানও এই শ্রেণীর একটা বিপ্লবাত্মক আদর্শ।'

www.pathagar.com

তিনি বলেন, পাকিস্তান সত্যিকারের একটি মুক্তি-আন্দোলন—একই সঙ্গে বিদেশী ও স্বদেশী সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণ থেকে নিপীড়িতের মুক্তি সংগ্রাম। কিন্তু সকল যুক্তি ও তথ্যকে অস্বীকার করে 'কংগ্রেস নেতৃত্ব এখনও অখণ্ড ভারত ও অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার বুলি কপচাইতেছেন।'

তবে পাকিস্তানকে মুসলিম ছাত্রসমাজ তাঁদের জীবনদর্শন বলে মেনে নিয়েছেন এবং 'ভারতীয় রাজনীতিতে পাকিস্তানবাদের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গঠনতান্ত্রিক সমস্যা বিরাট ইনটেলেকচুয়াল ফ্যাক্ট রূপেই' দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানবাদের সম্যক উপলব্ধির জন্য এর সাহিত্যিক রূপায়ণ জরুরি এবং সত্যিকথা বলতে কি, তা সাধনা সাপেক্ষ, আর 'এই সাধনা ও তপস্যার দায়িত্ব প্রধানতই ছাত্র সমাজের।'

তিনি আরও বলেন :

> সাহিত্যিকদের পক্ষ হইতে আমাদের একটা গুরুতর সমস্যার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ সূচিত হইতেছে। এর পেছনে সাহিত্যিক জাগরণের প্রেরণা না থাকাতেই এই জাগরণ এখনো সুস্থ, স্বচ্ছ এবং বলিষ্ঠরূপ লাভ করিতে পারিল না। চিন্তার বিপ্লব না আসিলে রাজনৈতিক বিপ্লব সক্রিয় হইতে পারে না,... আমাদের মধ্যে যাঁরা রাজনীতির চর্চা করেন তাঁরা যেন একথা ভুলিয়াই গিয়াছেন। সাহিত্যই হইতেছে জাতীয় জীবনের উৎস। রুশ বিপ্লব বা ফরাসি বিপ্লবের নজির এখানে দিতে চাই না। আমাদের প্রতিবেশী বাঙালী হিন্দুর জাতীয় জাগরণ আসিয়াছে সাহিত্যের ভিতর দিয়া। সাহিত্যনিরপক্ষে রাজনীতি চর্চার যে বিড়ম্বনা, বিকৃত নেতৃত্বের আকারে তা এক সময় সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। এই বিকৃতির প্রতিবিধান করিবে প্রধানত ছাত্রেরা। তারাই দেশে চিন্তার বিপ্লব ঘটাইবে। তারাই করিবে রাজনৈতিক আদর্শের সাহিত্যিক রূপায়ণ। এই ব্যাপারে যে সুতীব্র অনুভূতির সৃষ্টি হইয়াছে কিছুদিন হইতে তাহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। ঢাকা ও সিলেট হইতে সাময়িকপত্র প্রকাশ এবং কলিকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা এই অনুভূতিরই বাহ্য প্রকাশ।

কিন্তু ছাত্রদের পাঠ্য-পুস্তক সমস্যা, সংস্কৃতি-সমস্যা, দারিদ্র্য-সমস্যা, ভাষা-সমস্যা, ব্যাকরণ-সমস্যা, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা সংস্কার সমস্যা এবং এডুকেশন বিল ও উচ্চশিক্ষার কথা চিন্তা করতে গেলেই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা এসে পড়ে।

তিনি বলেন, আমাদের হাতের সেসব ক্ষমতা ইংরেজ-রাজত্বে হারাতে হয়। বাংলার বিগত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক কোন্দল, সাহিত্যে প্রতিভার অভাব, চিন্তার রাজ্যে অরাজকতা—এসব থেকেই কায়েমী স্বার্থবাদী ক্ষয়মানতা সূচিত হয়েছে। 'বর্তমান মহাযুদ্ধের গোড়ায় প্রেরণা যোগাইতেছে পৃথিবীতে নববিধান রচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা। নববিধান রচনা এবং নূতন সৃষ্টি এই হোক আজ আমাদের আদর্শ।'[১৭]

মুহম্মদ আবদুল বারী 'শতবর্ষ পরে' নক্সায়, মোহাম্মদ আজরফ 'সমাজ পন্থা' শীর্ষক রম্য-রচনায়, 'বিরোধের মূল' শীর্ষক 'মজলুম' লিখিত আলোচনায়, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'জাতি-বিদ্বেষ' শীর্ষক প্রবন্ধে 'পাকিস্তান' এর সাহিত্যিক রূপের যুক্তি খোঁজা হয়েছে। তবে তালেবুর রহমান 'পাকিস্তানের অর্থনীতি' শীর্ষক রচনায় স্পষ্টতই রাশিয়ার সমাজতন্ত্রকে পাকিস্তানের অর্থনীতির আদর্শ রূপে গ্রহণের সুপারিশ করেছেন,—এমন রচনা মুসলিম সাময়িকীতে বিরল :

www.pathagar.com

সাম্যবাদের নাম শুনেই হয়ত আমাদের অনেক ধর্মপ্রাণ ভ্রাতা ভগিনী ভয়ে আঁৎকিয়ে উঠবেন। কিন্তু ধনতন্ত্রও পুঁজিবাদীদের মিথ্যা প্রচারকার্য সাম্যবাদকে যেরূপ ভয়াবহরূপে চিত্রিত করেছে, সাম্যবাদ আসলে কিন্তু সেরূপ ভয়ঙ্কর কিছুই নয়। সাম্যবাদীদের ধর্ম সংক্রান্ত বাড়াবাড়িটুকু বাদ দিলে সাম্যবাদ মোটেই ইসলাম-বিরোধী নয়। বরং ধর্মের প্রশ্ন বিবর্জিত সাম্যবাদকে ইসলামের মহান শিক্ষারই অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।... সত্যিই কি আমরা ধনী ও দরিদ্রকে সমান শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন করে থাকি? কখনই না।

... ইসলামের এই মহান শিক্ষা যে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি তার কারণ হচ্ছে সমাজে আর্থিক বৈষম্য। যে সমাজে আর্থিক বৈষম্য বিদ্যমান, সেখানে মানবতার সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বড় বড় কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন।... যে সমাজে কেউ দান গ্রহণ করবে না বা সেখানে দান করবার কোন প্রয়োজনীতাও থাকবে না ; সেইরূপ সমাজ শুধু অর্থনৈকি সাম্যবাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

সুতরাং আমাদের পরিকল্পিত স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সাম্যবাদের ভিতর দিয়েই যদি আমাদের সামাজিক জীবনে আমরা ইসলামের মহান শিক্ষা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে রূপ দিতে পারি, তবে সবচেয়ে সুখী হবেন দুঃস্থ ও উৎপীড়িত মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ সুহৃদ মানব-মুকুট নবীকুল শিরোমণি হজরত মোহাম্মদ (দঃ)।[১৮]

লেখক আরও বলেন, আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সর্বপ্রথম কর্তব হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ সাধন এবং জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া।[১৯]

তথ্যনির্দেশ

১. সম্পাদকীয়, প্রভাতী, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪৮, পৃ. ৩।

২ সম্পাদকীয়, প্রভাতী, ২ বর্ষ, ২ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৮, পৃ. ৫৯।

৩. কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা উদ্ধৃতি, প্রভাতী, ১ বর্ষ, ৮-৯ যুগ্ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৯, পৃ. ২২০।

৪. উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৪৮।

৫. বেনজীর আহমদ, নয়া জামানার রাহাগীর (কবিতা), ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪৮, পৃ. ৪।

৬. ফজলুল হক সেলবর্ষী, প্রাচ্যে ছাত্রবোধন (প্রবন্ধ), উপরিউক্ত, পৃ. ৫।

৭. ইব্রাহীম খাঁ (অধ্যক্ষ), ছাত্র সমাজের প্রতি দুটি কথা, উপরিউক্ত পৃ. ৯।

৮. উপরিউক্ত।

৯. শাহেদ আলী তখন ছাত্র, তরুণ, কবছর পর তাঁরা পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় এসে বিখ্যাত 'তমদ্দুন মজলিশ', সাপ্তাহিক সৈনিক ও মাসিক দ্যুতি ইত্যাদি বের করেছিলেন। তমদ্দুন মজলিশের প্রথম দিকের কার্যক্রম প্রগতিপন্থী ছিল।

১০. শাহেদ আলী, তরুণের অভিযান (প্রবন্ধ), উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, পৃ. ১০৬।

১১. এস. এ. খালেক আবুল হোসেন, (কবিতা), প্রভাতী ১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৯, পৃ. ১৩০ (ছোটদের মজলিশ)।

১২ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কাব্যাংশ, উদ্ধৃত) প্রভাতী ১ বর্ষ, ৮-৯ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৯ (ঈদ সংখ্যা) পৃ. ২৮০।

১৩. রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি, প্রভাতী, উপরিউক্ত, পৃ. ২৮০।

www.pathagar.com

১৪. কামিনী রায়ের কবিতা, উদ্ধৃতি, উপরিউক্ত, পৃ. ৩৯০।

১৫. সম্পাদকের দফতর, প্রভাতী, ১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৯, পৃ. ২০০।

১৬. উপরিউক্ত, পৃ. ২০২।

১৭. মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার, ছাত্র সমাজের প্রতি (বক্তৃতা/প্রবন্ধ), প্রভাতী, আশ্বিন, ১৩৪৯, পৃ. ২৩০–৩২।

১৮. তালেবুর রহমান, পাকিস্তানের অর্থনীতি (প্রবন্ধ), প্রভাতী, ১ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৯, পৃ. ৩৯১–৯৪।

১৯. উপরিউক্ত।

www.pathagar.com

২৫. আল-আমান
(সিলেট, ১৩৪৯-৫৪)

মুসলিম লীগের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সিলেটের পাকিস্তানবাদীদের সাহিত্যিক-মুখপত্র আল্-আমান-এর প্রথম সংখ্যা বের হয়েছিল আষাঢ় ১৩৪৯ এ। এই পত্রিকার শীর্ষে বড় করে লেখা থাকতো—'পূর্ব পাকিস্তানের সংহত বিপ্লব-শক্তির বীর্য্যবান মাসিক মুখপত্র'। বাংলা মাসের সঙ্গে হিজরী ও খ্রিষ্টাব্দ দুটোই লেখা হতো (জুলাই ১৯৪২ ; জমাদিউসসানি ১৩৬১)। সম্পাদনার স্থলে বলা হতো 'এডিট করেছেন—মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার'। প্রচার সচিব এম.এ. বারী ; চারাদীঘির পাড়, সীলহেট। সিলেটের সারদা প্রেস থেকে আবদুস সাত্তার (সম্পাদক) কর্তৃক মুদ্রিত এবং কালীঘাট রোডস্থিত আল-আমান কার্যালয় থেকে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

পরে ঠিকানা পরিবর্তন হয়। ৬-৯ (১ম বর্ষ) সংখ্যায় (ফাল্গুন, ১৩৪৯) পরিবর্তিত ঠিকানা হয়—পৃথিমপাশা, সীলহেট। 'কুলাউড়া লংলা প্রেস হইতে সম্পাদক আবদুস সাত্তার কর্তৃক মুদ্রিত এবং পৃথিমপাশা আল-আমান কার্য্যালয় হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।'

আল-আমানের নিয়মাবলীতে বলা হয় : 'সামাজিক গল্প, নূতন চিন্তাধারা-মূলক প্রবন্ধ, কবিতা, পাকিস্তান সম্বন্ধীয় কোন এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে কালি দিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। নূতন বাংলা বানান ব্যবহার বাঞ্ছনীয়...।' এর বৈশিষ্ট্য ছিল 'নির্ভীকতা, নূতনত্ব ও আগে চলা'। 'ফিবছরের চাঁদার হার দুই টাকা আট আনা। সডাক তিন টাকা। প্রতি কপি চার আনা।'

সিলেটের 'নকীব' পত্রিকার সম্পাদকের সহযোগিতা ও আনুকূল্যে আল-আমান প্রকাশিত হয় বলেও জানানো হয়। দুর্মূল্য কাগজ-এর প্রাপ্তি সহজ করে দেন ছানাওর আলী। জিন্নাহ্ ও লীগ এঁদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরক ছিল। পত্রিকার প্রথমে কোরআনের বাণী উদ্ধৃত করা হতো।

সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> পূর্ব পাকিস্তানের তওহিদস্নাত ভাইবোন ও ভদ্রমহোদয়গণ ! সমূহ দুর্দিন,—বিঘ্নদুর্দৈব যখন আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের উপর এক প্রবল ঝঞ্ঝাটের পূর্বাভাস সূচনা করিয়া দিতেছে.. যখন জাতির ভাগ্যাকাশে জাপ-আক্রমণের ঘনঘটা এক অমঙ্গলের ছবি আঁকিয়া দিতেছে, আর যখন ভরা আষাঢ়ের প্রফুল্ল প্রকৃতির রঙবেরঙের আবাহনে আপনাদের তারুণ্য লালায়িত রঙিন হৃদয় নাচিয়া উঠিতেছে—তখন এই দোলায়মান লগ্নে—আমরা আপনাদের কাছে প্রথম অবদান লইয়া অগ্রসর হইলাম।... সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ও সংস্কারের জন্য—বিশেষত এই নিবিড়তম দুর্দিনে জাতিকে আজ অনুপ্রেরণা দিবার জন্য পত্রিকার বহুলজন্মের একান্ত আবশ্যক।
>
> পত্রিকার... সাহিত্য-বিপ্লবের হাতছানির মারফতেই সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি-বিপ্লব জাগিয়া উঠে—জাগিয়া উঠে জাতি জীবন্তভাবে। ইহা যুগযুগ ধরিয়া প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। আজ যখন 'পাকিস্তান' জাতির নিকট চরম কাম্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তখন ইহার প্রচারকার্য্য সুদৃঢ় ও বহুলভাবেই করিতে হইবে। পুরাতন পদ্ধতি... পুরাতন

www.pathagar.com

থিওরিকে বিসর্জন দিয়া নূতনকে আবাহন করিতে হইলে চাই জোর প্রোপাগাণ্ডা... পাকিস্তানের জন্য এইরূপ প্রচারপত্র অপরিহার্য্য। বিশেষত সাহিত্যের রেনেসাঁসের দ্বারাই সমাজদেহের রেনেসাঁসের সূচনা হয়।... সাহিত্যের মারফতেই জাতি যুগে যুগে তার ক্ষুধার্ত আত্মার খোরাক পাইয়াছে।... এই তাগিদেই আমরা 'আল আমান', নামক মাসিকসাহিত্য পত্রিকা এহেন দুর্দিনেও প্রকাশ করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছি।

...ইহার গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় আধুনিকতা এবং পুরাতনকে তথা কুসংস্কারকে দলিয়া মারিবার ইঙ্গিত থাকিবে। সমাজকে নবীকরণের অফুরাণ প্রয়াস নিয়া—বিচ্ছিন্ন মানবতাকে একত্রীকরণের অভঞ্জনীয় অভীপ্সা নিয়া আমরা আল্-আমানের সৃষ্টি করিলাম।

প্রৌঢ়দের মত দুর্দিন দেখিয়া হাত পা গুটাইয়া না বসিয়া তরুণোচিত ধমণীর খুনের ডাকে আমরা দুর্দ্দিনকে অবহেলা করিতে পণ করিয়াছি। মুসলমান তরুণ ও সমাজসেবকবৃন্দ! আপনারা কি আমাদের এই অভিযানে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন?...[১]

আল-আমানের প্রথম সংখ্যায় কবিতা লিখেছিলেন আবদুর রাজ্জাক, শ্রী অমিয় দাশগুপ্ত ও আহমদ হুসেইন। গল্প লিখেছিলেন আলম রওশন বানু চৌধুরী ও মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার (সম্পাদক)। প্রবন্ধকার হলেন, আবুল ফজল, ফজলুল করিম ও মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম। এঁদের দুজনের রচনার শিরোনাম যথাক্রমে 'জিন্না-প্রশংসা' ও 'মোসলেম ক্ষুধায় পাকিস্তান'।

'মোসলেম ক্ষুধায় পাকিস্তান' শিরোনামের রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে তখন তাঁদের চেতনা ও অভীপ্সা কী রূপ ধারণ করেছিল :

... পাকিস্তানের আকর্ষণ আজ ভারতীয় মুছলমানদের মরা নদীতে দুর্বার বান ডাকিয়াছে। এই বানের খরস্রোতের কাছে কোন বাঁধাই আটকিয়া থাকিতে পারে না। থাকা অসম্ভব। তাই আজ হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধুর মরুতুল্য ভূমি হইতে বিচিত্র লীলার চিরশ্যামল নিকেতন আসাম পর্যন্ত মুহুর্মুহু হায়দরী হাঁক উঠিতেছে—চাই—পাকিস্তান চাই, পাকিস্তান—পাকিস্তান।

মুসলমানরা যেমন পাকিস্তানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, রক্তের বিনিময়েও লাভ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তদনুরূপ আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুজাতিও আজ সারাটি ভারতে অন্যায় অখণ্ড প্রতাপ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন।

আমাদের এই প্রতিবেশী জাতি সবসময় নিজকে বিজ্ঞ, বে-আন্দাজ বিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যানুরাগী বলিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আজ দেখিতেছি তাঁহারা পরস্বাপহরণে বেশ ওস্তাদ। ভারতের দশ কোটি মুসলমান—যাঁরা বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী—যাঁরা প্রায় সাত শত বৎসর এই ভারতের বুকে শাসন করিয়াছিলেন—তাঁহাদিগকে আজ তাঁরা কুটিল বুদ্ধির জোরে সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

গণতন্ত্রের আওতায় সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির অর্থই হইল—তোমরা পরাধীন—তোমরা আমাদের অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির নেহায়েৎ করুণার পাত্র।... ভোটের জোর দিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠরা সারাটি দেশ ভোগ করিবে-আর আমরা যাঁরা সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি তাঁহাদের কাছ হইতে পেট পালনের ভাতা পাইব—যেমন করিয়া আমাদের চোখের সামনে গরু-ভেড়ারা আমাদের কাছ হইতে পাইয়া থাকে।[২]

www.pathagar.com

কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে প্রবন্ধকার বলেন : যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানদের অবস্থা গরু-ভেড়ার মতোই হবে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, কংগ্রেস-সমর্থক পত্রিকাগুলো এ-বিষয়ে কিছু বলে না।

কিন্তু 'আমরা ভুলি নাই বিহার উড়িষ্যার মুসলমানদের উপর সে অসম্ভব নিগ্রহের কথা,... মুসলমানদের কোরবানীর গাভীর প্রতি তাহাদের অহৈতুকী প্রেমের কথা, আমরা ভুলি নাই বোম্বাইয়ের মদখোর হিন্দুদের অপরাধ স্খালনের জন্য নিরীহ মুসলমানদের উপর কর স্থাপনের ষড়যন্ত্রের কথা ও গুলিবর্ষণের করুণ ইতিহাস।

আমরা ভুলি নাই মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রীর অসভ্য তাণ্ডব নর্ত্তন—তওহিদস্নাত বর্বরোচিত প্রচেষ্টা (আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন),—আমরা ভুলি নাই মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া ধর্মের দোহাই দিয়া তাহাদের নাচিয়া লাফিয়া চিৎকার করিবার বেনজীর জিদ্।'[৩]

লেখকের পরামর্শ : এ-অবস্থায় প্রচারে, প্রলোভনে বিভ্রান্ত না-হয়ে মুসলমানদেরকে 'মানুষ' হিসেবে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করতে হবে। 'এইরূপ বাঁচিয়া থাকার চেষ্টার নামান্তরই পাকিস্তান'। মুসলমান জাতির সম্মুখে আজ যে অর্থের সমস্যা, ইসলামিক শিক্ষার সমস্যা, জাতি গঠনের সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা সমাধানের একমাত্র পন্থা হইল পাকিস্তান-প্রতিস্থাপন।'

বাঙালির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেষ্টায় লিপ্ত মনীষী কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ পাকিস্তান-প্রস্তাবের সমালোচনায় বলেছিলেন, পাকিস্তান পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তার একাংশ আর্থিক ভাবে পঙ্গু হয়ে কিভাবে স্থায়িত্ব লাভ করবে? তাঁরা বলেছিলেন, এদ্বারা বাঙালি জাতির বিকাশও হবে খর্বিত, ক্ষতিগ্রস্ত এবং হতোদ্যম। তিনি পূর্ব বাঙলার একটি পত্রিকায় ('চাবুক') লিখেছিলেন :

> ভারতবর্ষকে... বিভক্ত করবার চেষ্টায় একটা বড় আপত্তি এই যে, তাহলে মুসলমানের ভাগে দেশের যে অংশ পড়বে তা সাধারণত অনুর্বর। অথচ দেশকে ভাগ যদি করতেই হয় তবে এ ভিন্ন অন্য কোন রকমের ভাগ অসম্ভব বলেই মনে হয়। বাঙলা আর পাঞ্জাবকে বিশেষভাবে ইসলামী দেশে পরিণত করবার চেষ্টা শুধু বাঙ্গালী হিন্দু আর পাঞ্জাবী শিখের কাছ থেকে প্রবল বাধা পাবে তাই-ই নয়, সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হলেও অ-সার্থক হবে ভৌগোলিক কারণে—পাঞ্জাব থেকে বাঙলার দূরত্বের জন্যে।[৪]

কাজী আবদুল ওদুদ এবং তাঁর মতো মুসলিম চিন্তাবিদ্ যেমন রেজাউল করিম (মুর্শিদাবাদ), হুমায়ুন কবির, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ হলেন আল-আমানের লেখকদের দৃষ্টিতে 'মীর জাফর', অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক ও বেঈমান।

জিন্না-হকের মতদ্বৈধের কালে ফজলুল হক সাহেবকেও তাঁরা অত্যন্ত অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং 'পাকিস্তান' অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক অর্থাৎ 'মীর জাফর' চিহ্নিত করে ঐ রচনায় বলা হয় :

> গুজব উঠিয়াছে—বিশেষ করিয়া আমাদের মীর জাফরের দল বলিতে চাহিতেছেন যে, পাকিস্তান প্রতিস্থাপনে আমাদের জাতীয় আর্থিক শোচনীয়তা দ্বিগুণ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে—কলহ-ভেদাভেদ মুসলমানদের মধ্যে ঘর পাতিয়া বসিবে। এইরূপ ভিত্তিহীন গুজবের মূলে কতটুকু জঘন্য বুদ্ধি রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

www.pathagar.com

আমরা জানি, খনিজ সম্পদে যে দেশগুলা পুষ্ট তাহারাই আজ শিল্পে বাণিজ্যে পৃথিবীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে এবং তাহারাই পৃথিবীর ধনিক জাতি। এখন দেখা যাউক, আমাদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে খনিজ সম্পদ কি আছে?... খনিজ সম্পদের দিক দিয়া পাকিস্তান ('পাকিস্তান'কে আল আমানে 'পাকিস্থান' লেখা হয়েছে) কোন মতেই গরীব নয়। তদুপরি কৃষি-সম্পদে পূর্ব পাকিস্তান জগদ্বিখ্যাত।

আসলে বিশ্বের খবর না-রাখার জন্য এবং স্বদেশী-আন্দোলনের সময় বাঙলাকে শস্য-শ্যামলা সুজলা-সুফলা স্বর্গসম পুণ্যভূমিরূপে প্রচারের একটি কুফল হলো এই যে, নিজেদের দারিদ্র্য, অপুষ্টি ও নিষ্ফলার বেদনা ও অতৃপ্তিকে তুষ্ট করে বাঙলার অধিবাসীদের উর্বরার দিকে অর্থাৎ উন্নয়নের দিকে ধাবিত হবার প্রেরণা নষ্ট করে দেয়া হয়েছিল।

অন্তত 'আল-আমানে'র লেখকদের বাঙলাকে খণ্ড-বিখণ্ড করার যুক্তি সরবরাহ করেছিল। ফলে, বাঙলাকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছিল বা হতে হয়েছিল। অবশ্য স্বদেশী-আন্দোলনের ফলে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলে দেশীয়-শিল্পের বিকাশের দিগন্তও উন্মোচিত হয়—এখানে সেকথাও বিবেচ্য।

...সুতরাং আল-আমানের জোরালো ঘোষণা : 'পাকিস্তানে আমরা স্বাধীন জাতি হিসাবে বাস করিলে আমরা কোন মতেই আর্থিক শোচনীয়তায় ক্লিষ্ট হইব না।' এতদসত্ত্বেও যাঁরা 'আর্থিক শোচনীয়তার' কথা বলেন, এঁদের মতে, তার গূঢ় অর্থ হলো, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে কংগ্রেসের খাজাঞ্চিখানা হইতে তাহারা আর ভাতা পাইবে না"।

প্রগতিশীলতা ও মুক্তবুদ্ধির পক্ষে সোচ্চার বুদ্ধিজীবীদের এই শ্রেণীর লোকেরা সব সময়ই অপদস্থ ও অপমান করার জন্য 'বিদেশীর দালাল' ইত্যাদি উপরিউক্তরূপে অভিযোগের দায়ে ফেলে থাকেন। 'আল্-আমান'-এর এই লেখকও বলেন, আমরা স্বীকার করি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে মীর জাফরদেরই অন্নকষ্ট ঘটিবে।' এবং সেজন্য 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে মুসলমান সমাজে ভেদবিভেদের সৃষ্টি হইবে এই কথা মীর জাফরদের কলম অবিরত স্রাব করিয়া যাইতেছে।

আমরা কিন্তু এই প্রচারের মতলব খুঁজিয়া পাই না। মুসলমান সব সময় মুসলমান। এখানে কোন বর্ণবৈষম্য নাই। তবুও সাধারণত মুসলমান সমাজকে ইকোনমিক্যালি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—একটা ধনিক সমাজ—আর একটা গরীব সমাজ।'[৫]

পাকিস্তান-আন্দোলনের বিরোধী মুসলিম-শক্তিকে সমালোচনা করে আল্-আমানে বলা হয়, পাকিস্তান আন্দোলনকে তাঁরা ধনিক আন্দোলন বলে 'আজমাইল করিয়াছেন'। 'মোছলেম লীগের পিছনে যে একটী ক্ষুধার্ত গণশক্তির গভীর উৎস রহিয়াছে এইসব কর্তা-প্রবররা বোধ হয় সেদিকে নজর রাখেন না। এই যে ক্ষুধার্ত গণসমাজ আজ অন্নের অভাবে—বস্ত্রের অভাবে হাহাকার করিতেছে—তাহার একমাত্র নিবারণের পথ হইল নিজস্ব গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠাপনে।

ক্ষুধার্ত মোসলেম গণশক্তি আজ শতাব্দীর লাঞ্চনার ভিতর দিয়া ইহা উপলব্ধি করিয়াছে যে আজকালকার প্রতিযোগিতার জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নিজস্ব গভর্ণমেন্টের একান্ত দরকার। তাঁহাদের এ ক্ষুধিত চাওয়াটাই হইয়াছে পাকিস্তান।'[৬]

www.pathagar.com

কায়েদে আজমের স্তুতিকারী 'আল-আমান' এ.কে. ফজলুল হককে গালিগালাজ পূর্বক তাঁর 'অল ইণ্ডিয়া প্রগ্রেসিভ মোসলেম লীগ' স্থাপনের প্রয়াসকে নিন্দা করেছে এমন একটি সম্পাদকীয়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

> আমাদের ডেপুটী মহাত্মা ফজলুল হক সাহেব এক অভিযানের তোড়জোড় চালাইতেছেন। বাঙলার মাটীতে সমার্জ্জনী লাভ করিয়া নির্বাচনের পর নির্বাচনে খামুস হইয়া এইবার তাঁহার মাথার ক্ষেত্রে নওয়া আবক্কলের (নয়া আক্কেল বা নতুন জ্ঞান) চারা গজাইয়াছে। তিনি অল ইণ্ডিয়া প্রগ্রেসিভ মোসলেম লীগ স্থাপন করিবেন। সম্ভবত এই জারজ প্রতিষ্ঠানের হর্তা-কর্তা তিনিই হইবেন।
>
> সত্য বলিতে কি পাকিস্তান-প্রস্তাব তুলিয়াও তিনি যখন কায়েদে আজমের চাইতে বেশী নাম ফলাইতে পারিলেন না তখন হইতেই তাহার কার্যকলাপ কায়েদে আজমের নির্দেশ-বিরোধী বলিয়া প্রতিপন্নহইয়া আসিতেছিল, তাহা আমরা লক্ষ্য করিতেছিলাম। তারপর দেখিতে দেখিতে তাহার মীরজাফরী রক্ত হঠাৎ ফুলকিয়া উঠিল।
>
> এখন বিদ্রোহী হইয়া তিনি তাহার সনাতনী আশা চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি,—মুখার্জীভক্ত হক সাহেবকে কি সারা মোসলেম ভারত খইবৃষ্টি দিয়া সম্বর্দ্ধিত করিবে—না বাঙলার মুসলমানদের মত মটরে গোবর ছিটকাইয়া বেদানুসারে সূচীকৃত করিয়া দিবে?[৭]

মৌলবী আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্নও 'একখানা খোলা চিঠি'-তে ফজলুল হক সাহেবের রাজনৈতিক মতবাদের সমালোচনা করে বলেন, ১৯৪১ সনের শেষের দিকে বাঙ্গালার প্রধানমন্ত্রী হক সাহেবের সঙ্গে নিখিল ভারত মোসলেম লীগ কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ ঘটলে মি. হক যে-সমস্ত কথা বলেন, আর কাজ করেন, তাতে 'জাতীয় সংহতির মূলে' কুঠারাঘাত করা হয়। কিন্তু পরে মি. হকের মতের, লেখকের মতে পরিবর্তন হয়। এতে লেখক আনন্দিত হয়েছিলেন। হক সাহেবকে ১৯৪১ সনে তিনি যে পত্রটি লিখেছিলেন, তাতে বলেন—

> একনিষ্ঠ একতা ও দৃঢ়তাই জাতির চরম ও পরম বল। মোসলেম ভারতের সুযোগ্য নেতা মহামতি জিন্নাহর ত্যাগ, দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠ স্বজাতি-সেবার কল্যাণে মোসলেম ভারত আজ যতটুকু সঞ্চয় করিয়াছে, আপনার মুহূর্তের ভুলে আজ তাহার যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইতেছে।... আপনি অবশ্যই জানেন জাতির মধ্যে সংহতি গঠন ও রক্ষা কোরআন-এরই আদেশ।
>
> কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষীয় কাগজগুলি আপনাকে ভ্রান্তপথে চালিত ও উত্তেজিত করিয়া আপনার আকাঙ্ক্ষিত ক্রোধানলে ইন্ধন যোগাইতেছে, সুতরাং আপনি বিশেষভাবে চিন্তা ও বিবেচনা করিবার সুযোগ পাইতেছেন না। তাই বাঙ্গালী মুসলমানের উপর মহামতি জিন্নাহর প্রভাব বিস্তারের কথা উল্লেখ করিয়া দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু ধীরভাবে বিবেচনা করিলেই দেখিবেন যে তিনি (জিন্নাহ) কোন প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। এবং তিনি কোনও দেশের রাজপদ লাভের আকাঙ্ক্ষীও নহেন। বরং কওমের বৃহত্তম স্বার্থে মুসলেম ভারত আজ তাঁহার প্রভাবের অধীনে মাথা পাতিয়া দিয়াছে।
>
> সুতরাং এখানে বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালীর প্রশ্ন মোটেই উঠিতে পারেনা।... আপনার ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আপনিই 'পাকিস্তান'-এর প্রস্তাবক এবং একদিন বাঙ্গালাই হইবে বৃহত্তম পাকিস্তান।... ঠিক সেই সময়েই শত্রুদের প্রদত্ত উত্তেজনা মূলে আপনার মত মহান নেতাই আজ তাহা ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। ইহা কওমের পক্ষে এক অনির্বচনীয় আক্ষেপের

www.pathagar.com

কথা। কওমের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নির্বিচারে স্বীয় নির্বাচিত নেতার আদেশে মাথা পাতিয়া দিতে না পারিলে আজীবনের সেবা, ত্যাগ ও আদর্শের মহিমা মলিন হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ কি?... এই অনুরোধ... আপনি লীগ কাউন্সিল ওয়ার্কিং কমিটির পদত্যাগ ও অভিযোগপত্রগুলি প্রত্যাহার করুন। কায়মনে দরগাহে এলাহি প্রার্থনা করি—আপনার উপর শীঘ্র খোদার রহমত বর্ষিত হউক। আপনি পদত্যাগপত্র ও অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া শান্তি লাভ করুন। আমিন।[৮]

হক সাহেবকে 'আল আমান' 'অভিশপ্ত' গণ্য করে উপরিউক্ত খোলা চিঠির নিচে সম্পাদকীয়-মন্তব্য (পাদটীকায়) যোগ করা হয় : "যাহারা অভিশপ্ত হইয়া গিয়োছে তাহাদিগকে সত্যের পথে ফিরাইয়া আনিতে হইলে খোদার রহমতের প্রয়োজন। মি. হকের ঘাড়ে যে শয়তান চাপিয়াছে সে এত সহজেই কি নামিয়া পড়িবে? এই সব পত্র তদীয় স্কন্ধস্থিত শয়তানকে আরও উত্তেজিত করিবে বৈ কি?"[৯]

এই সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ফজলুল হক সাহেবকে নিন্দা করে আরও বলা হয় :

পাকিস্তানের মারফতে মুসলমানরা জাগিবে ইহাই অবধারিত সত্য। প্রত্যেক মুসলমানের অবচেতনার স্তরে স্তরে যে সনাতন লক্ষ্য রহিয়াছে তাহাই পাকিস্তান।... কিন্তু এই আশায় ছাই ফেলিতেছেন কতিপয় লীগ নেতা... এই দিকে ষড়যন্ত্র-প্রয়াসী কমিউনিষ্টরা তাহাদের বাধা বুলি দিয়া সরলপ্রাণ পল্লীর মুসলমানদিগকে 'সিরাতাল মুস্তাকীম' হইতে দূরে সরাইয়া নিতেছে।

ইহার প্রতিকার কাহারা করিবে এবং কখন? এইসব নেতারা তীর্থের দাঁড় কাকের মত নিজস্ব পেট ভরিতেছেন—আর সময়মত কা-কা করিয়া লোক ভুলাইতেছেন। এইসব দাঁড় কাকেরা তখন কা-কা-করে, যখন তাহাদের খাদ্য ফুরাইয়া যায়। এইরূপে তাঁহারা কায়েদে আজমকে প্রবঞ্চিত করিতছেন... মুসলমান জনসাধারণের পক্ষে এই সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে... পাকিস্তানের কল্যাণের জন্য ইহাদিগকে শাস্তি দিবার সময় আসিয়াছে।[১০]

অনুরূপভাবে মহাত্মা গান্ধীকেও তাঁরা মন্দ-ভালো বলতে কার্পণ্য করেননি—

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রের ছদ্মবেশী মহাত্মা এবার তাঁহার (এখানেও চন্দ্রবিন্দু নেই) খুলোস বদলাইয়াছেন। তম:গুণ পরিহার করিয়া এইবার তিনি রজঃগুণে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতে আর একটিও শাদা আদমি থাকিতে পারিবে না, তাঁহাদের সবকেই তল্পীতল্পা লইয়া এই বন্দেমাতরম-নিনাদিত দেশ হইতে পলায়ন করিতে হইবে।

...আমরা মহাত্মাজীর কেদরানি দেখিয়া যেমন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছি, তেমনি কিছুটা সজাগও হইয়াছি। কারণ পাকিস্তান না মানিয়া কোন আন্দোলন আরম্ভ করিলে সে আন্দোলন নিছক হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠাপনের পরিচায়ক হইবে। পাকিস্তান-লুব্ধ আত্মবোধশীল দশ কোটি মুসলমান হিন্দুস্থান স্থাপনের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিতে যে এক নব কারবালার সৃষ্টি করিবে, তাহা নিঃসন্দেহে জানিয়াও গান্ধীজী-মুক্তি আন্দোলনের নামে-ভারতে যে অন্তর্বিপ্লব ডাকিয়া আনিবেন—তাহার জন্য দায়ী কে?[১১]

এঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বিভিন্ন রচনায় সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি মন্থনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী-সংগ্রামী চেতনা ধারণ পূর্বক মুসলিম-তরুণসমাজকে পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।[১২]

www.pathagar.com

অবশ্য তখনকার মুসলিম-সম্পাদিত সকল পত্রিকায়ই সিরাজ-স্মৃতি পালনের সংবাদ ও এতদসংক্রান্ত সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে।

আল-আমানে সুভাষ বসু ও মহাত্মা গান্ধীজীর সমালোচনা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে জাপানী-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মতামত। এই পত্রিকা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালেই বের হয়। পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে চীনের মতামতের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে কংগ্রেসী উপদ্রবের নিন্দা করা হয়েছে। আবার কংগ্রেসীরা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিও দিচ্ছেন—একথা বলে মুসলমানদের ধোঁকাবাজিতে না পড়বার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এঁরা কোন অশোভন উক্তি করেননি, আর নজরুল ইসলামতো রীতিমতো জাগরণমন্ত্রের উদ্গাতা।[১৩]

এই সময় কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থ ; তাঁর কবিতা উদ্ধৃত কর হচ্ছে, এই চয়নের মধ্য দিয়ে নজরুলের কোন্ অংশকে কোন্ চেতনাকে তাঁরা ব্যবহার করছেন, তা বোঝা যায়—যেমন : 'উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ আরাবীর/দুনিয়াতে নত নয়, মুসলিম কারো শির,/তবে শুন, ঐ শুন বাজে কত দামামা,/ শামসের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা।...'[১৪]

'কবিরগুরুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> ৭ই আগষ্ট। বিশ্বের একটি স্মরণীয় দিবস। এই দিন বিশ্বের অন্যতম মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে ৭ই আগষ্ট বিশ্বের দরবারে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের অমর প্রতিভা, অসাধারণ প্রজ্ঞা, অফুরন্ত কাব্য-রস, মানুষ কখনও ভুলতে পারবে না। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের চলা-ফেরায়, আহার-নিদ্রায়, কেলী-কৌতুকে রবীন্দ্রনাথের ভাষার রস, চারুশিল্পের সূক্ষ্মরূপ অপরিমেয় আনন্দ পরিবেশন করবে। মানুষের এই আনন্দের ভেতর রবীন্দ্রনাথের অধিকার অক্ষয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষা রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে, প্রেম হতে প্রেমে বায়ু ও জলের মত মিশে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ অমর ; এই মনীষীকে মানুষ ভুলতে পারে না—ভুলা অসম্ভব।[১৫]

আল-আমানের প্রচ্ছদে জিন্নার উক্তি বা বাণী উদ্ধৃত হয়েছে। আবার কাজী নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিও উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন : কার্তিক ১৩৪৯ (নভেম্বর, ১৯৪২) সংখ্যার প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথের উক্তি : 'সুইজারল্যাণ্ড ইংলণ্ডের মত শক্তিশালী নৌবহর তৈরি করিবার আকাঙ্ক্ষায় যেরূপ হৃতসর্বস্ব হইয়াছিল ঠিক সেইরূপ ভারতে রাজনৈতিক এক জাতীয়তা তৈরি করিতে চেষ্টা করিলে তাকেও হৃতসর্বস্ব হইতে হইবে।'[১৬]

কায়েদ আজমের আদর্শেরই পত্রিকা এটি—তাঁর চেতনাই আল-আমানের। সর্বাঙ্গে একটি (অক্টোবর, ১৯৪২) সংখ্যার প্রচ্ছদে উদ্ধৃত হয়েছে—'পাকিস্তান ফার্স্ট, পাকিস্তান সেকেণ্ড, পাকিস্তান লাস্ট। আমরা হয় প্যাকিস্তান লাভ করিব, না হয় উহার জন্য ধ্বংস হইব।'[১৭]

এঁদের বক্তব্য হলো : 'পাকিস্তানের মারফতেই জাতি আবার নূতন উন্মাদনা, অদম্য সাহস, অটুট ধৈর্য ও অপরিমেয় রক্তের উচ্ছ্বাস নিয়া বিশ্বের দরবারে গৌরবময় আসন লাভ করিবে। তাই যদি হয় তবে প্রস্তুত হও, কোরবান-প্রিয় হও।'[১৮]

www.pathagar.com

আল-আমানের লেখক ছিলেন, অধিকাংশই সিলেটের সংস্কৃতিকর্মী, সাহিত্যিক, সম্পাদক ও সাময়িকীসেবক—যেমন : আবদুর রাজ্জাক, আবদুল জব্বার, এম.এ., মুহম্মদ মুফজ্জিল আলী, মোহাম্মদ আবদুল লতিফ, বেগম রোকেয়া, আবদুর রব চৌধুরী, আলম রওশন বানু চৌধুরী মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, মঈনুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ, আবদুর রকীব, এ. জেড. আবদুল্লাহ, শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শ্রীসমরেন্দ্র দাশগুপ্ত, মুহম্মদ নূরুল হক, মোহাম্মদ ছানাওর আলী, আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, দেওয়ান গোলাম মরতুজা চৌধুরী প্রমুখ।

পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম লীগের কার্যাবলির সমালোচনা, লীগ-বিরোধী কাজের প্রতিরোধ গড়ে তোলো, এই ছিল—আল্-আমানের গল্প, কবিতা, আলোচনা ও প্রবন্ধাবলির মূল সুর। মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ এবং এম. আবদুর রহমানসহ অনেকেই 'পাকিস্তান' সৃষ্টি না হলেও 'মোহাম্মদী'র মতোই 'পাকিস্তান' নিয়ে তখন (পাকিস্তান পূর্বকালে) কবিতা ও জারি-সারি গান গেয়েছেন।

মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ (তখন সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজের ছাত্র, ইনি অত্র অভিসন্দর্ভে আলোচিত 'অভিযান' পত্রিকার সম্পাদক) এর কোরাস—

মুসলিম ভারতের নওজোয়ান
পিছু পড়া জাতি তোরা হও আগুয়ান।
বিশ্বের বাদশাহ্ ছিলেরে যারা
তোরা তাদেরই দুলাল সর্বহারা
জেগেছেরে বিশ্ব
তোমরা কি নিঃস্ব
নয়া জামানায় আন বান।...[১৯]

মুসলিম সাহিত্য সাময়িকীর একজন উৎসাহী সংগ্রাহক পাঠক ও আলোচক এবং মুসিলম-অনুসন্ধান সমিতির (পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায়) এম. আবদুর রহমান সাতচল্লিশের পরে ভারতেই থেকে গেছেন, কিন্তু তখন (১৯২৫-৪৭) তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় মুসলিম-ঐতিহ্য ও মুসলমানদের জাগরণের সহায়ক কবিতা প্রভৃতি লিখে পাঠাতেন। আল্-ইস্লাহ, সওগাত, মোহাম্মদী প্রভৃতিতে তাঁর লেখা আছে। একটি দীর্ঘ কবিতা তিনি 'আল-আমান'-এ লিখেছিলেন—'ওমর ফারুক আমামা বাঁধিছে বীর জিন্নার মাথে' শিরোনামে। 'পাকিস্তান'-প্রীতি এবং এজন্য উচ্ছ্বাস কীরূপ ধারণ করেছিল তার প্রমাণস্বরূপ উপরিউক্ত কবিতার কটি লাইন উদ্ধৃত করছি :

কে সে দরবেশ স্বপন দেখেছে শেষ ধামে ভোর রাতে,
ওরম ফারুক আমামা বাঁধিছে বীর জিন্নার মাথে,
চাঁদ-তারা খচা ইসলামী ধ্বজা করিছে সমর্পণ।
দৃশ্য সে অতুলন।[২০]

তথ্যনির্দেশ

১. সম্পাদকীয়, আল-আমান, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৯।
২ মোসলেম ক্ষুধায় পাকিস্তান (প্রবন্ধ), মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, উপরিউক্ত।
৩. উপরিউক্ত।

www.pathagar.com

৪. সাপ্তাহিক 'চাবুক', ঢাকা, সম্পাদক : শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র সাহা, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪৫–এ কাজী আবদুল ওদুদ 'একটি প্রশ্ন' শিরোনামে ছোট্ট একটি রচনায় একথা লিখেছিলেন। তাঁর রচনাবলিতে অসংকলিত এই লেখাটি আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত 'লোকায়ত' পত্রিকায় (১২ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৩) পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে, পৃ. ২০–২৩।

৫. ২ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬. উপরিউক্ত।

৭. সম্পাদকীয় আলোচনা, আল–আমান, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৯।

৮. আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, মওলবী ফজলুল হকের প্রতি একখানা খোলা চিঠি, আল–আমান, ১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৯।

৯. সম্পাদকীয় মন্তব্য, আল–আমান, উপরিউক্ত।

১০. উপরিউক্ত।

১১. উপরিউক্ত।

১২. সম্পাদকীয় ('তেসরা জুলাই'), আল–আমান, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৯।

১৩. সম্পাদকীয়, ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৯ পৃ. ৪৪–৪৭।

১৪. উপরিউক্ত সংখ্যার প্রচ্ছদে উদ্ধৃত কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাংশ।

১৫. ১৩ সংখ্যক পাদটীকায় উল্লিখিত সংখ্যার সম্পাদকীয় বক্তব্য, পৃ. ৪৫।

১৬. আল–আমান, ১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৯ (প্রচ্ছদে উদ্ধৃত)।

১৭. উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৯ (প্রচ্ছদে উদ্ধৃত)।

১৮. আল–আমানের ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৯–এর প্রচ্ছদে উদ্ধৃত।

১৯. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ, কোরাস (কবিতা), উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৯, পৃ. ৪৯।

২০. এম. আবদুর রহমান, ওমর ফারুক আমামা বাঁধিছে বীর জিন্নার মাথে (কবিতা), উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ১০–১২ যুগ্ম সংখ্যা, চৈত্র–জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯–৫০।

www.pathagar.com

২৬. নওরোজ

(দিনাজপুর, ১৩৪৮–৫৪)

মুসলমানদের বাংলা সাময়িকপত্রের মধ্যে 'নওরোজ' একটি সুপরিচিত নাম। তবে এর কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত কলকাতা থেকে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে আফজাল উল হকের সম্পাদনায় যে 'নওরোজ' প্রকাশিত হয়, সেটি ছিল উন্নতমানের, অসাম্প্রদায়িক একটি সাহিত্যপত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না',... এবং কাজী নজরুল ইসলামের 'নওরোজ' নামের 'রূপের সওদা কে করিবি তোরা আয়রে আয় নওরোজের এই মেলায়' এবং হুমায়ুন কবিরসহ প্রধান মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের রচনা তাতে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রচ্ছদে উটের আর মরুভূমির ছবি থাকলেও তাতে বাঙলাদেশের এবং বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য আর বাংলা ভাষার আলোচনাই হয়েছিল। কলকাতা থেকে ছাপা হতো বলেই পত্রিকার উন্নত ছাপা, প্রচ্ছদ, কাগজ, রচনার চিন্তা ও সাহিত্য–সম্পদ এর কারণে তা সহজেই নাম করেছিল হিন্দু ও মুসলমান সকলের কাছে।

দ্বিতীয়ত দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত ১৯৪২ সনের নবপর্যায়ের 'নওরোজ' হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সরকারি কর্মকর্তা, সাহিত্যসেবী ও জমিদারদের যৌথ মিলন কেন্দ্র ছিল বলেও তা নাম করেছিল,—যদিও দিনাজপুরের নওরোজের সাহিত্যিক মান ততোটা উন্নত ছিল না। হিন্দু–মুসলমান উভয় শ্রেণীর লেখকদের রচনা ছাপা হলেও, তাতে কোনো উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। যদিও তা ছিল মুসলিম জাগরণের মুখপত্র।

এটি মুসলিম লীগের অন্যতম প্রধান নেতা স্যার নাজিমউদ্দীনের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুরের একটি হলের মুখপত্র ছিল। দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫০ থেকে এর নামকরণ হয়—'স্যার নাজিমউদ্দীন মুসলিম হল ও একবাল সোসাইটির মুখপত্র'। দুজনই মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের রাজনীতিক ও দার্শনিক—কবি।

অতএব মানসিকতা ও প্রেরণা লক্ষণীয়। ২ বর্ষ ৩ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয় 'মহাকবি মহাদার্শনিক এবং মহামনীষী আল্লামা একবালের প্রাণচঞ্চল বাণী প্রচারে নওরোজ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।'

প্রকৃতই কবি ইকবালের সাহিত্যের অনুবাদ ও প্রচারে নওরোজ বিশেষ অবদান রেখেছিল। একটি সম্পাদকীয় নিবেদনে বলা হয় :

> 'নওরোজ' আমরা ব্যবসা–বুদ্ধি লইয়া লাভের আশায় বাহির করি নাই। ভিতরের তাগিদেই ইহা বাহির করিয়াছি। কাহারো সহিত কঠোর প্রতিযোগিতা করারও আমাদের ইচ্ছা নাই। সেবা করাই আমাদের একমাত্র কর্ম। যাঁহারা সেবা পাইবেন তাঁহাদের উচিত সেবককে সেবা করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ দান করা। সারা বাঙলায় সত্যই কি দরদীর এতই অভাব হইবে? সেবক নওরোজের দিকে তাঁহারা সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাইবেন না! আমাদের করুণ নিবেদনে সাড়া দিবেন না?[১]

www.pathagar.com

অপর একটি সম্পাদকীয়তে যে বক্তব্য দেয়া হয়,—তাতে এঁদের সম্পর্কে আরো ধারণা জন্মে ; তাঁরা পত্রিকাকর্মীদের উদারতায় বিশ্বাসী। 'সম্পাদকীয় উদারতা' শীর্ষক বক্তব্যে অভিযোগ করে বলা হয় :

> নওরোজ বাহির করিয়া আমরা অনেক দৈনিক এবং মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছাহেবানের নিকট ইহার একখণ্ড সমালোচনার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু বড়ই দুঃখে বিষয় দুই একজন বাদে কেহই তাঁহাদের কাগজে 'নওরোজ' সম্বন্ধে দুই চারি লাইন লিখিবার উদারতা দেখাইতে সাহস পান নাই। তাহাদের চোখে নওরোজ 'তৃতীয় শ্রেণীর' বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকিলে সেকথাও তো তাঁহারা স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারিতেন। তাহাও করেন নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি উদার না হইতে পারেন, তাহা হইলে 'অখণ্ড হিন্দুস্থান' ও 'খণ্ডিত পাকিস্তান' বুলি বৃথা।[২]

সত্যিই তাঁরা মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের সুযোগ দিতেন।

'নওরোজ' সচিত্র মাসিকপত্র বলে পরিচয় দিত। সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বি.এল. (পরে সম্পাদক পরিবর্তিত হন) স্যার নাজিমউদ্দীন মুসলিম হল এণ্ড লাইব্রেরীর পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক মোহাম্মদ আবদুল হক, গ্রন্থাগারিক। দিনাজপুর ইউনিয়ন প্রেসে ছাপা হত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৮ বা ৫০। নাজিমউদ্দীন হলের সেক্রেটারি ছিলেন মৌলবী হেমায়েত আলী। পরে ইনিই হন নওরোজের সম্পাদক।

একটি সম্পাদনা-পরিষদও গঠিত হয় এর, হাসান আলী আহমদ, মোহাম্মদ কাদের বকস, দেলোয়ার হোসেন, হরিচরণ চক্রবর্তী ও হেমায়েত আলী তার সদস্য ছিলেন। উন্নতমানের মাসিক পত্রিকা ছিল না বলে উদ্যোক্তাদের নিজস্ব ধারণাই ছিল। ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় ছিল কারণ কংগ্রেস-নেতা যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্য—'আমরা ভালো রূপেই জানি, এই মহাপুরুষের কোনও শত্রু ছিলনা'।

ইসলামে সঙ্গীত-চর্চা প্রসঙ্গে বলা হয় :

> প্রথম কথা এই যে, মুসলমান লেখকদিগের ইসলামের প্রতি অযথা ও অহেতুক দোষারোপ মোটেই নীতিসঙ্গত নহে।... অবাধে সঙ্গীতচর্চার জন্য প্রচেষ্টা করুন তাতে আমাদের আপত্তি নাই... কিন্তু মুসলমান হয়ে তাঁরা অহেতুক ইসলামকে আক্রমণ করবেন কেন? সেটাই আমাদের প্রাণে বিষম বাঁধে।... বাস্তবিকই কি কোরআন ও হাদীসে সঙ্গীত নিষিদ্ধ হয়েছে? না, কোরআনে সঙ্গীত নিষিদ্ধ হয় নাই এবং হযরত রছুলে করিমও উহা নিষিদ্ধ বলেন নাই--নিষিদ্ধ হয়েছে সঙ্গীতের অশ্লীলতা ও উহার কুপ্রভাব ও কু-রুচির প্রেরণা যা মানুষকে আল্লাহ্র পথ হতে দূরে ধাবিত করে।...যে মুসলমানেরা অনুমানের উপর নির্ভর করে অহেতুক ইসলামের প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, তাঁরা এতদ্বারা সাধারণের, বিশেষতঃ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর নিকট অযথা ইসলামকে হেয় ও হাস্যাস্পদ করেন।[৩]

সম্পাদকীয় নিবন্ধে সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হতো। ধানচাষ, পাটচাষ সম্বন্ধেও বলা হতো। দিনাজপুরের কৃষকদের অনুরোধ করে বলা হতো কৃষি, খাদ্য-সংকট, জমি-জিরাতের ব্যবহার, ফসলের আবাদ এসবের ওপর ধারণা নিতে। বলা হতো, এগুলোর উৎকর্ষের ওপর নির্ভর করে জাতীয় উন্নতি। উল্লেখ্য, তখন ঔপনিবেশিক আমলের জমিদারী

www.pathagar.com

প্রথা বহাল ছিল। তারপরও কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা হতো সাহিত্যপত্রিকার মাধ্যমে। কারণ হলো, নাজিমউদ্দীন হল ও গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও সেটেলমেন্ট অফিসারগণ।

অবিভক্ত বাঙলার ইংরেজ ও ভারতীয় হিন্দু আই.সি.এস.গণ এসব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীন মত প্রকাশের কিছু সুযোগ ছিল।

পত্রিকায় অনেক ছাপার ভুল থাকতো। কভারও বিশেষ ভাল ছিল না। সাদা কাগজ কখনও, কখনও নিউজপ্রিন্ট, কখনও একটু মোটা কাগজ, কখনও পাতলা নিম্নমানের। প্রচ্ছদে অতি সাধারণ রুচির একরঙা বিভিন্ন বিজ্ঞাপন থাকতো। এতে সৌন্দর্য প্রকাশ পেতো না। সমিতির মুখপত্রের যেরূপ বারোয়ারি হবার কথা, তেমনি ছিল।

তবে কখনও পত্রিকার সাইজ ঠিক থাকেনি। একত্রে বাঁধাই করার পরে এটি মুদি দোকানের রশিদ এর মতো বিচিত্র দেখা গিয়েছে। নিয়ম ছিল প্রত্যেক বাঙলা মাসের ২৫ তারিখে পত্রিকা প্রকাশিত হবে। বার্ষিক মূল্য মাশুলসহ তিন টাকা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। ফাল্গুন থেকে বর্ষ আরম্ভ হবে।

কয়েকজন পৃষ্ঠপোষকের নাম—শরদিন্দুনারায়ণ রায়, মোহাম্মদ কাদের বক্স (ভাইস চেয়ারম্যান, দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি), হাসান আলী আহমদ (চেয়ারম্যান, দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড) প্রমুখ। পরে, পরে, আরও বিশেষ ব্যক্তিদেরকে এই সংগঠনের বার্ষিক অধিবেশনে আহবান করা হতো। প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখও এঁদের বিশেষ বা বার্ষিক সাহিত্য অধিবেশনে যোগ দিতেন। লেখার সঙ্গে নওরোজের কর্তৃপক্ষ লেখকদের পদবী, ডিগ্রি, কর্মস্থল ইত্যাদি কলেজ বার্ষিকীর মতো উল্লেখ করতেন। এতে মাসিক পত্রিকার রুচি বিঘ্নিত হয়েছে। পদাধিকারীর পদই উল্লেখ থাকে, সকলের নয়। সাহিত্য-সভার ও সাহিত্যিকদের বিশেষ সংবাদ, মায় বিয়ের খবরও দেয়া হয়েছে, এরূপ মোহাম্মদীতেও দেখা যায়।

কবি হুমায়ুন কবিরের অমুসলিম কন্যার পাণি গ্রহণের প্রেক্ষিতে নানারকম তর্ক ও ফৎওয়া ছাপা হয়েছে মোহাম্মদীতে। সাহিত্যপত্রিকায় সংবাদজাতীয় আলোচনা ছিল সেকালের বৈশিষ্ট্য, যখন সংবাদপত্র কম ছিল।

প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা থেকে স্বতন্ত্র 'মহিলা মজলিস' এবং এর পরে শিশু-কিশোরদের সাহিত্য বিভাগ 'গুলচির গুলসান' চালু করা হয়। 'বাঙলার শিক্ষিতা ভগ্নিগণকে সাদর আহবান' জানিয়ে বলা হয় : 'তাঁহাদের শিক্ষা-সভ্যতা, অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, সব বিষয়ে তাঁহারা এই বিভাগে আলোচনা করিবার সুবিধা ও সুযোগ পাইবেন।' কিশোরদের পাতায় কবি ইকবালকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

হিন্দু-মুসলমানের সকল সংবাদ, নীতিকথা সমান গুরুত্বে ছাপা হয়েছে নওরোজে। যেমন কোরআন, হাদীস উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে বা এসবের আলোচনা হয়েছে। হজরত মোহাম্মদ ও কার্লাইলের বাণীও উদ্ধৃত হয়েছে। ১৯৪২ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, আই.সি.এস.ভি.এন. রাজন এর সাম্প্রদায়িক মীমাংসার খবর প্রচার করে সম্প্রীতির চেষ্টাও লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৪২ সনেও হিন্দু-মুসলমানকে মূর্খের মতো অপরের ধর্মের বিষয়

www.pathagar.com

নিয়ে অহেতুক মারামারির মীমাংসা করতে হয়েছে। বিস্তৃত বর্ণিত হয়েছে এই মীমাংসা পত্রটিতে :

> মসজিদের সম্মুখ দিয়া সকল সময়েই বাদ্যযন্ত্রসহ শোভাযাত্রা করিয়া যাইবার অধিকার হিন্দুদের আছে বলিয়া হিন্দু-সম্প্রদায় দাবি করিয়াছেন, কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা নামাজের সময় বাদ্যযন্ত্রসহ মসজিদের সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা লইয়া যাইবেন না। এবং শোভাযাত্রা এমনভাবে পরিচালিত করিবেন যেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে ক্ষোভের সঞ্চার না হয়। মুসলমানগণও যে কোনও সময়ে নিজের জমিতে সকল রকম পশু হত্যা বা উৎসর্গ করিতে পারিবেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা এইরূপভাবে হত্যা বা উৎসর্গ করিবেন যাহাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে ক্ষোভের সঞ্চার না হয়।[৪]

নওরোজ 'অন্যান্য সাময়িকপত্রিকার মত বাংলা সাহিত্যে উর্দুভাষার সংমিশ্রণে শংকিত' ছিল না। তাঁদের বক্তব্য ছিল :

> 'নওরোজ' বাংলা সাহিত্যের নগণ্য খাদেম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সুষ্ঠু সুন্দর ও সাবলীল বিকাশ নওরোজের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কোনো ভাষার প্রতি নওরোজের অশ্রদ্ধা বা বীতশ্রদ্ধা নাই। নয়া জামানার নিশান বরদার হিসাবে নওরোজ সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার বিরোধী।[৫]

'ভাষার বিকাশ' প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন, যে-কোন জীবন্ত ভাষার বিকাশে বিদেশী শব্দের আগমন বা আমদানী অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন ভাষা হতে শব্দ সংগ্রহ করে বাঙলা ভাষা অধিকতর সরল এবং সাবলীল হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। একথা বিভিন্ন ভাবধারার বেলায়ও প্রযোজ্য। ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে অতিমাত্রায় রক্ষণশীলতা মানসিক সংকীর্ণতা বা দুর্বলতারই পরিচায়ক। ভাষার জাত নষ্ট হবার মত নয়। সমুদ্রের অবারিত প্রবাহের মতোই ভাষা এবং তা স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত ও পরিপুষ্ট হয়ে থাকে।[৬]

বাংলা ভাষার সংস্কার ও সহজ বানান পদ্ধতি সম্পর্কে আবুল হাছানাৎ এর পুস্তক ও তাঁর বানানরীতি সম্পর্কে নওরোজে অনেক আলোচনা হয়। বেশ কয়েকজন লেখক এতে অংশ নেন, কিন্তু বলাবাহুল্য যুক্তাক্ষর বর্জিত বিদঘুটে এই বানান-রীতি নিয়ে ঐকালে হুমায়ুন কবিরের মত ব্যক্তিও (চতুরঙ্গ দ্রষ্টব্য) অংশগ্রহণ করেছিলেন যদিও, তথাপি সে-প্রচেষ্টা সফলকাম হয়নি।

অতএব এবিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক মনে হয়। কারণ কোনও পত্রিকাই সহজ বাংলা বানান অনুসরণ করেনি, যদিও অনেক পত্রিকায় এসব ব্যাপারে কমবেশি বিতর্ক ও আলোচনা ছেপেছে। নওরোজে আবুল হাছানাৎ এর প্রস্তাব সমর্থন করে লিখেছিলেন মীজানুর রহমান, এ.কে.এস. নূর মোহাম্মদ প্রমুখ।

> বাংলা ভাষার উন্নতি শকলেই চায়। বাংলা ভাষাকে এমনভাবে বদলাতে হবে যেন আমাদের ছেলেমেয়েরা নানারূপ অসুবিধার হাত হতে বাঁচতে পারে। আমরা ভুগেছি, তাহারা বাঁচুক। ভাশার জাত গেল, এই মতের বদল হওয়া দরকার। যাহা দরকার, শককে বিনাশ করতে হবে। এই বিশয়ে বিশেশ আলোচনা হওয়া ভাল। কওমী বিবাদ অশোভন। বাংলা হিন্দু মুসলমান সকলেরই ভাশা। ইহার শহিত শকলেরই যোগাযোগ রয়েছে। থাকবে এবং থাকা উচিত। ভাশা দেশ ও জাতির বড় দওলত। একথা মনে রাখতেই হবে। কোশেশ্ করলে আমি যে ভাবে বলছি, তেমন ভাবে বাংলা ভাশার রদবদল হতে পারে।[৭]

www.pathagar.com

একটি সম্পাদকীয়র কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করে এ-প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করা যাক :

> নওরোজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শ্রদ্ধের আবুল হাছানাৎ সাহেবের 'বাংলা ভাষার সংস্কার' প্রবন্ধ লইয়া বেশ আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। দিনাজপুর, খুলনা প্রভৃতি কয়েকস্থানে ঐ প্রবন্ধটির স্বপক্ষে বিপক্ষে আলোচনার জন্য সাহিত্যিকগণের বড় বড় আলোচনাসভাও হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। বিভিন্ন পত্র ও পত্রিকাতে ইহার সমালোচনা বাহির হইতেছে। ইহা খুবই আনন্দের কথা।
>
> হাছানাৎ সাহেব আগামী ৬/৪/৪৬ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় কলিকাতা রেডিওতে বাংলা ভাষার বানান সমস্যা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিবেন। আমরা বাংলা ভাষার উন্নতিকামী প্রত্যেক বন্ধুকে তাঁহার বক্তৃতাটি শোনার জন্য অনুরোধ করিতেছি। বাংলা ভাষার এমারত দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন ভাবে গঠন করিতে সময় লাগিবে... তজ্জন্য আমাদিগকে ধৈর্য ধরিয়া এমারত ভাঙ্গার জন্য আঘাতের পর আঘাত চালাইতে হইবে। সফলতা অনিবার্য।[৮]

লক্ষণীয় যে সম্পাদকীয়টি লেখা হয়েছে সুপারিশকৃত বানান রীতির পরিবর্তে প্রচলিত বানানের নিয়মেই।

আল্-ইস্‌লাহ্, আল্-আমান এগুলোর ন্যায় দিনাজপুরের নওরোজও শিক্ষাক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ একটি মফস্বল শহর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা। এর নিজস্ব ছাপাখানা করলেও মফস্বলী ভাব কখনই কাটেনি। ১৯৪৭ সনের পরও সরকারী অর্থ সাহায্য এবং বাংলা একাডেমীর (ঢাকা) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। কিন্তু পত্রিকা হিসাবে নওরোজ মান অর্জন করতে পারেনি। আঞ্চলিক পত্রিকা হিসেবে, সেখানকার লেখকদের প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন সাহিত্যসভার আয়োজন করে সক্রিয় থেকেছে সাহিত্যের আসরে,—এটাই হল 'নওরোজ' ও এর প্রকাশস্থল বা কেন্দ্র নাজিমুদ্দীন মুসলিম হল ও ইকবাল সোসাইটির তথা এর কর্ণধার, কর্তাদের সার্থকতা।

> কাজী আকরম হোসেন, এম. আকবর আলী, শামসুদ্দীন, আবুল হাছানাৎ, মীর আজিজুর রহমান, দলিলউদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ তৈমুর, এফ. রহমান, লায়লা হক, আমিনুল হক, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ (বাহার), আবদুল কাদের, আবদুর রাজ্জাক, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মোঃ রহিমউদ্দীন সিদ্দিকী, মীজানুর রহমান, মেহেরাব আলী মুফ্তী, হাছান আলী, মুহম্মদ হাসান উদ্দিন নাটোরী, এ. জেড. আবদুল্লাহ, আবদুল গফ্ফার চৌধুরী, শামসুননেসা, আবদুর রকিব, এস.কে. জামাইয়াতুল্লাহ্, মোঃ আবদুল লতিফ সাহিত্যনিধী, রেখা আহমেদ, জয়নাব খাতুন, শামসুন্নাহার, ফিরোজা খাতুন, এম. এ. হোসেন, শামসুল আজীজ, এম. মফিজ আহমেদ।
>
> এস. ওয়াজেদ আলি, আনসার আহমদ, মুহম্মদ আবদুল বাকী, মওলানা আহছানউল্লাহ, এ. এস. এম. আবদুল জলীল, মাহবুব জামাল জাহেদী, আবদুস সালাম, কাজী ফকির, মোহাম্মদ খুরশেদ আলী, সৈয়দ মশাররফ হোসেন আহমদ, মকবুল হোসেন, ইব্রাহীম খাঁ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, মোহাম্মদ মোকাররম হোসেন, এ. এম. আনোয়ার হোসেন, এম. আলতাফ হোসেন, হাসান আলী, চৌধুরী এস. জোহা, কমরউজ্জামান।
>
> আবদুল কাদির, আবদুর রকীব, এম. সৈয়দউদ্দীন মণ্ডল, মোঃ আবদুল গফুর, সুলতান মাহমুদ, নুরুল হক, সিরাজউদ্দীন চৌধুরী, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, এ. কাছেম কেশরী, মোহাম্মদ ইউসুফ, মুফাখখারুল ইসলাম, রওশন ইজদানী, জালালউদ্দীন আকবর,

www.pathagar.com

মঈনুদ্দীন, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, আবদুল করিম, এম. মফিজ আহমেদ, সাহজাহান, সাদত আলী আখন্দ, এম. আবদুল রহমান, হারুন আল রশিদ।

প্রমুখ নওরোজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন রচনা ও চিন্তা আর অনুপ্রেরণা, উৎসাহ দিয়ে।

চিটাগাং থেকে জলপাইগুড়ি, মালদহ, আসাম, সিলেট, করটিয়া, কলকাতা সকল অঞ্চলের খ্যাত, হবু খ্যাত, শিক্ষানবিশ অখ্যাত লেখকেরা এতে লিখতেন। এর বৃহদাংশ জুড়ে ছিলেন হিন্দু-সম্প্রদায়ের কবি-সাহিত্যিক, যাঁরা সারা বাঙলায় বিক্ষিপ্তভাবে কর্মরত ও বসবাসরত অথবা ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ, সুহৃদ কুমার রায়, গোবিন্দ চন্দ্র রায়, হরিচরণ চক্রবর্তী, নরেন দাস, অশ্বিনীকুমার সেন, মতিলাল দাশ, রামনাথ বিশ্বাস, অমিয়কুমার সেন, হিমাংসু সেন, নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য, কানাইলাল, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সুধাংশুকিরণ ঘোষ, বিশ্বনাথ মজুমদার, প্রিয়লাল দাস, অমরেন্দ্র ঠাকুর, সুখচরণ সেনগুপ্ত, লোকানন্দ মজুমদার, নির্মল দাশ, কুমারী জাপানী সিংহ, শিবপ্রসাদ কর, গজেন্দ্রনাথ কর্মকার, প্রিয়নাথ কর্মকার, নির্মল কুমার রায়, কালিদাস রায়, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, পুর্ণেন্দু নন্দী, শ্রীবরেন্দ্র কুমার মজুমদার, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, হৈমবতী দেবী এঁদেরই তালিকা ভুক্ত।

বাঙলার দুর্ভিক্ষ, ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৪, জুলাই), বিভিন্ন সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সভাপতিদের অভিভাষণ—(যেমন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কানপুর বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের, ও এ.এফ. রহমানের বিভিন্ন জায়গার বক্তৃতা (যা অন্যান্য মুসলিম পত্রেও দুর্লভ্য নয়), মুসলমানের শিল্প-বাণিজ্য-অর্থ-বিত্তে পশ্চাৎপদতার কারণ, সিরাজদ্দৌলার কলঙ্কমোচন, ফজলুল হক-মন্ত্রিসভার থেকে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার প্রশংসাকীর্তন, যৌন-শিক্ষার আবশ্যকতা, বাঙ্গালীর মাতৃভাষা সমস্যার আলোচনায় বাংলার সমর্থন—প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় মুসলমান সমাজের প্রধান সমস্যা ও সকল সামাজিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গে মতামত ব্যক্ত করে পত্রিকাটি ঐকালের একটি দলিল হয়ে রয়েছে তার শত অপূর্ণতা, দুর্বলতা সত্ত্বেও।

৩১.৩.১৯৪৬ তারিখে দিনাজপুর নাজিমউদ্দিন হলে নওরোজের উদ্যোগে (৫ম) একটি সাহিত্য উৎসব পালিত হয়। তাতে স্বাগতভাষণে নওরোজ সম্পাদক হেমায়েত আলী বলেন : তাঁরা রাজনীতির চর্চা করেন না (কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্য রয়েছে, শেষের দিকে মুসলিম লীগের নাজিমউদ্দীন-গ্রুপের সমর্থক হন)। তাঁরা উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের প্রতি সমাদর দেখান। হিন্দু-মুসলিম মিলন হেতু হিন্দু ও মুসলিম লেখক-লেখিকা দ্বারা জীবনের শাশ্বত সত্য, চিরন্তন রহস্য, ইসলামের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ইতিহাস প্রভৃতি নানাবিধ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ নওরোজে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

আরও বলেন :

নওরোজ পল্লীর পত্রিকা।... তবে শহর ও মফঃস্বলের সর্বশ্রেণীর সাহিত্যরস-পিপাসু ব্যক্তিকে তৃপ্তি দান করে আসছে।... প্রত্যেক দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকার এক একটা পলিসি আছে, নির্দিষ্ট লেখক গোষ্ঠী আছে, এক বা একাধিক মালিক আছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটা রাজনীতির চর্চা করতে বাধ্য হন।... কিন্তু নওরোজ মামুলি প্রথা থেকে দূরে—এর পলিসি উদার এবং বাঙলা ও আসামের সব হিন্দু-মুসলিম উদার এর

সাহিত্যিকই এর মালিক।... এ অভিনব পন্থা নয় কি? যেহেতু স্যার নাজিমউদ্দীন হল সবার, নওরোজ পত্রিকাও...সবারই।

নওরোজ নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি কোনদিনই। কতিপয় উৎসাহী ব্যক্তি পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে এর নিজস্ব প্রেস করে দিতে চেয়েছিলেন। 'নওরোজ প্রেস' নামে তা গঠিত হয়। সবকিছু মিলিয়ে এই পত্রিকাকে ঘিরে বাঙলার এক অঞ্চলের লোকেরা চিন্তা-চর্চা করতেন, সেটাই বড় কথা।

তথ্যনির্দেশ

১. নিবেদন, নওরোজ (মাসিক), ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৯।

২ সম্পাদকীয়, উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯।

৩. স্কুল ইনস্পেক্টর আলহাজ মোহাম্মদ তৈমুর, ইসলামে সঙ্গীত চর্চা, নওরোজ, ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৯।

৪. বিবৃতিটি ছাপা হয়েছে নওরোজের প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৯-এ।

৫. সম্পাদকীয়, নওরোজ, বৈশাখ, ১৩৫০।

৬. উপরিউক্ত।

৭. মীজানুর রহমান, বাংলা ভাষার রদবদল (চিঠি), নওরোজ, দ্বিতীয় বর্ষ, ১০-১১ যুগ্ম-সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৫০, পৃ. ৩০০।

৮. সম্পাদকীয়, উপরিউক্ত, পৃ. ৩০৫।

www.pathagar.com

২৭. জাগরণ

(কলকাতা, ১৩৪৭—৫৪)

জাগরণ সম্পাদক মীজানুর রহমান পাকিস্তান আমলে উগ্র পাকিস্তানবাদী হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামী তাহজিব ও তমদ্দুনের পক্ষে সরকারি পত্রিকা মাসিক 'মাহেনও'-এ অনেক সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখে নাম করেছিলেন।

তিনি পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগে চাকুরি করতেন, আর কিছু দিনের জন্য অবৈতনিক সম্পাদকও ছিলেন মাহেনও-এর।

কিন্তু ১৯৪১ সন থেকে প্রথমে বনগাঁও (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, সাতচল্লিশ পূর্বকালে যশোহর জেলার অন্তর্গত ছিল) এবং পরে কলকাতা থেকে যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বিশ্বাসী 'জাগরণ' বের হতো—তার প্রধান কর্তা ছিলেন।

সাতচল্লিশের পরে মীজানুর রহমানের চিন্তার আমূল পরিবর্ত্তন হয়তো কলকাতার জীবনের অভিজ্ঞতার বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই ফল ছিল। ইনিই আবুল হাছানা এর সহজ বাংলা বানানের পক্ষে নওরোজে লিখেছিলেন। এই স্টাইলে পাকিস্তান সরকারের মাহেনও-এ ও লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের 'কোশেশ্' কোনো ফল দেয়নি।

উল্লেখ্য 'জাগরণ' এর পুরো ফাইল সংরক্ষিত নেই কোনো গ্রন্থাগারে। ঢাকার ৫, পুরানা পল্টনস্থ 'মীজানুর রহমানের নিজস্ব সংগ্রহ' থেকে মাইক্রোফিল্মে রক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সংগ্রহ থেকে জানা যায়—'জাগরণ' প্রথমে মাসিকপত্র ছিল এবং বনগ্রাম মুসলিম সমবায় শিক্ষা সমিতির মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হতো। সরকারি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল সি-২৭৭২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত প্রথম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশের তারিখ জুন ১৯৪১।

সম্পাদক সেরাজুল ইসলাম, বি.এল. এম., এল. এ. এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন ফজলুল করীম। বার্ষিক মূল্য সডাক দেড়টাকা। নগদমূল্য প্রতি সংখ্যা দুই আনা। পত্রিকার নিজস্ব 'জাগরণ প্রেস'-ও ছিল বনগ্রাম-এ। 'বনগ্রাম মুসলিম সমবায় সমিতি'র-এবং সমিতি থেকে প্রকাশিত মাসিক 'জাগরণ'-এর উদ্দেশ্য ছিল বনগ্রাম মহকুমার স্থানে স্থানে প্রাইমারী ও উচ্চতর শিক্ষাগার, লাইব্রেরি প্রভৃতি স্থাপন, বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য ও উন্নতি সাধন, গরীব ও মেধাবী ছাত্রগণকে সাময়িক ও মাসিক সাহায্য দান প্রভৃতি কার্যের দ্বারা সমগ্র মহকুমার শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই এই সমিতি। 'জাকাৎ প্রভৃতি ইসলামি শরীয়তসম্মত দানের টাকা গ্রহণের সুবিধার জন্যই 'মুসলিম' শব্দটি সমিতির নামের সহিত যোগ করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপকারের জন্যই সমিতির প্রতিষ্ঠা।' পরবর্তীকালে মীজানুর রহমান সম্পাদিত পাক্ষিক (কখনও সাপ্তাহিক) জাগরণে বলা হয় তাঁরই পুরো কাজ করতে হতো, সেজন্যই পত্রিকা বন্ধের পর 'জাগরণ' তিনি সম্পাদনা করার স্বত্ব লাভ করেছিলেন।

অতএব এটি ১৯৪১ এর জানুয়ারিতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সন পর্যন্ত চলেছিল বলে অনুমিত। মাসিক হিসাবে কিছুদিন বের হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

অতপর ১৯৪৩ সনের দিকে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হবার পর এর প্রধান কাজ হয় কচিকাঁচার সাহিত্য আসরের ন্যায় শিশুদের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও পঠন-পাঠনে উৎসাহ প্রদানের একটি প্রয়াস—'সবুজ সংঘ' গঠন। এক পর্যায়ে প্রায়... হাজার সদস্য হয় তাঁদের। 'দরদী' ছিলেন জাগরণের 'সবুজ সংঘে'র পরিচালক। ছোটদের চিঠিপত্রের জবাব দেয়া হত। নবীন, নতুন লিখিয়েদের রচনা ছেপে উৎসাহ দেয়া হত।

ঐকালে 'জাগরণ' ছোট, সবুজ, নতুন ও কচি-কাঁচাদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন-জাগরণ তুলতে সক্ষম হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আজকের খ্যাতিমান প্রবীণ লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁদেরকে শিশু-কিশোর সাহিত্যের লেখক, স্রষ্টা বলে দেশবাসী জানেন, তাঁদের অনেকেরই নাম এর সূচিপত্রে দেখা যাচ্ছে। যেমন আবুল্লাহ আল মুতী, ফয়েজ আহমদ, নাসির আলী, বেগম জেবু আমমেদ, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ।

১৯৪১ সনে সেরাজুল ইসলাম সম্পাদিত জাগরণ-এর প্রাপ্ত (১/৬) সংখ্যাটিতে কবি গোলাম মোস্তফার কবিতার একটি চরণ-'মুক্তির পথে দিলাম আজি এ মুক্তার উপহার'। মুহম্মদ হবীবুল্লাহ (বাহার) এর আগের সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিতের পর ধারাবাহিক রচনায় লিখেছিলেন, 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান'। এ প্রবন্ধে লেখক প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে মুসলমানদের কৃতিত্ব তুলে ধরেন।

সম্পাদক, মৌলভী সেরাজুল ইসলামের কবিতার নাম—'রসুলে মকবুল'। মহবুব জামাল (ইনি কি মাহবুব জামাল জাহেদী?)-এর গদ্য ধারাবাহিক বের হচ্ছিলো—'বুলুর ডায়রী' নামে। মোঃ আবদুল হামিদ লিখেছিলেন—'গরীবের দান'। সৈয়দ তোফায়েল আহমদ এর কবিতার নাম—'ঈমানের আহ্বান'। মোহাম্মদ এসহাক-এর রচনার নাম 'খণ্ডপাঠ'। 'সম্পাদকের দফতর' এ তখনকার প্রধান অশান্তি সাম্প্রদায়িক সমস্যার ওপর আলোচনা করে সমাধানের পথ খোঁজা হয়েছে। 'বুলবুল' এর হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-সংক্রান্ত অন্যতম বিতর্ক—'অবাঞ্চিত ব্যবধান' বিষয়ে জাগরণেও আলোচনা হয়। আমরা জানি 'ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর দশম বার্ষিক অধিবেশনে (১৯৩৬) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে সভাপতির ভাষণ দেন, এবং জাহানআরা চৌধুরী সম্পাদিত, 'বর্ষবাণী'তে (উদ্ধৃত করা হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভে) প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের পত্রের সূত্রে 'বুলবুল'-এ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, লীলাময় রায় (অন্নদাশংকর রায়), মীজানুর রহমান প্রমুখ বিভিন্নভাবে শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের সমালোচনা করেন। ১৯৪৫ সনের 'জাগরণের' প্রাপ্ত একটি সংখ্যায়ও এ-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল।

মীজানুর রহমান থেকে শুরু করে অপরাপর সকলে এ বিষয়ে যে-সমস্ত কথা বলেন, তাতে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবস্থান যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের স্তরও নির্ণীত হয়ে আছে। আমাদের মনে হয়েছে যে, শরৎচন্দ্র ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু মুসলমানেরা তাঁর সে-কথায় খুশি হননি। এর মধ্যেই মুসলমান বাঙালির চিন্তাবৃত্তির বিকাশের একটি মাত্রা বা পর্যায় ধরা পড়েছে যে, তাঁরা বাংলা সাহিত্য নিয়ে তখনও কিভাবে, কী ভাবছিলেন।

www.pathagar.com

জুলাই ১৯৪১ সংখ্যার মাসিক জাগরণ-এর সূচিতে সিরাজুল ইসলাম-এর কবিতা, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের দান' (ধারাবাহিক), মহবুব জামাল এর ধারাবাহিক 'বুলুর ডায়রী', শ্রী অমূল্যরতন সরকারের কবিতা—'সাত রাজার ধন', শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা—'জীবনের কয়েকটি দিন', মোঃ মতিউর রহমান-এর 'শান্তির পথ' ও সম্পাদকীয় প্রভৃতি রয়েছে।

আগস্ট ১৯৪১ সংখ্যা জাগরণ 'রবীন্দ্র-তিরোধান সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথের শেষদান শিরোনামে তাঁর—'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/ ...বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী'—এবং 'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে/এসেছে আমার দ্বারে' পুনঃ প্রকাশিত হয়। মীজানুর রহমান 'রবীন্দ্রনাথ জিন্দাবাদ' ; শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'বিশ্বকবির তিরোধানে' শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ' ; সেরাজুল ইসলাম 'রবীন্দ্র শোক-গীতিকা' এবং শ্রী পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর 'রবি অস্তমিত' ; মাহবুব জামালের-'বুলুর ডায়রী' ও সম্পাদকীয় ছাপা হয়।

মাসিক হিসেবে জাগরণ এক বছর তো বের হয়ই, সে তথ্য রয়েছে, কিন্তু পরের সংখ্যাগুলো পাওয়া যায়নি বলে মনে করা চলে যে, দ্বিতীয় বর্ষ থেকে ৩য় বর্ষ পর্যন্ত পত্রিকা বন্ধ ছিল। মাসিক জাগরণে উপরিউক্ত লেখকগণ ছাড়াও আর যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বেগম সুফিয়া কামাল (কবিতা, ঈদের চাঁদ) আজহারুল ইসলাম (কবিতা, ঈদের সওগাত) ; মনিরুজ্জামান এছলামবাদী (প্রবন্ধ, ইসলাম ও সাম্যবাদ) ; বেনজীর আহমদ (কবিতা, ত্যাগের দীপ্ত রক্ত ঈদ) এবং কাজী নজরুল ইসলামের 'মোনাজাত' কবিতাটি—

আমারে সকল ক্ষুদ্রতা হতে
বাঁচাও প্রভু উদার।
হে প্রভু, শেখাও—নীচতার চেয়ে
নীচ পাপ নাহি আর॥
...ক্ষমা নাই নীচতার—॥
ক্ষুদ্র করোনা হে প্রভু, আমার
হৃদয়ের পরিসর,
যেন হৃদয়ে আমার সম ঠাঁই পায়
শত্রু মিত্র পর
নিন্দা না-করি ঈর্ষায় কারো,
অন্যের সুখে সুখ পাই আরো,
কাঁদি তার তরে অশেষ দুঃখী ক্ষুদ্র আত্মা যার।[১]

'জাগরণ' দ্বিতীয় পর্বে কলকাতা থেকে মীজানুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক উভয় রূপেই। প্রাপ্ত তিনটি বিশেষ সংখ্যার একটি 'সবুজ সংখ্যা (১লা জানুয়ারি ১৯৪৫)'র শিরোনামে বড় করে লেখা—'ডাকে জাগরণ, ডাকে নওজোয়ান—জাগোরে হিন্দু জাগো মুসলমান।'

শিশু সাহিত্যের প্রতি এঁদের আকর্ষণীয় আগ্রহ রয়েছে। তখন 'বাগবান' আজাদে 'মুকুলের মহফিল' এবং 'রাহাগীর' সবুজদের নিয়ে পাকিস্তানবাদী আন্দোলন করতেন। আবার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথাও বলা হয়েছে। এই জাগরণ মুদ্রিত হতো বজলুর রউফ কর্তৃক

www.pathagar.com

'ক্যালকাটা আর্ট প্রিন্টার্স', ১১ ওয়েলেসলি স্ট্রীট, কলকাতা থেকে এবং প্রকাশকও ছিলেন তিনি, তবে প্রকাশের ঠিকানা ছিল ২, মডার্ণ স্ট্রীট, কলকাতা।

'সবুজ সংঘ'র পরিচালক দরদীর 'মোনাজাৎ' ছিল :

অলস মদির বিভল বুকে
কর্মবাদের ছুটুক বান
সুর হারাদের কণ্ঠে আবার
উঠুক বেজে চলার গান।

আহসান হাবীব—'জাগরণী' শীর্ষক কবিতায় লিখেন :

সুবেহে সাদেকের আজান এসেছে তোমরা কি জাগবে না?
প্রাণ-পল্লবে নতুন হাওয়ার দোলা কি গো লাগবে না?
ওগো প্রিয় বন্ধুরা, ...
ওগো ফাল্গুনী তরুণ কুমার আর ঘুমায়না জাগো জাগো
দুরন্ত জাগো অশান্ত অবারিত বন্যা গো।[২]

এম. আবদুর রহমান লিখেছিলেন—

জাগো বাংলার মাটির দুলাল, জাগো বাংলার চাষী
তোমাদের দিকে চেয়ে আছে যত অসহায় উপবাসী।
...এস তুমি ভাই লয়ে লাঙ্গল, ওগো বাংলার চাষী
জঙ্গল কর ক্ষেত্রে পরিণত
ফসল ফলাও তুমি অবিরত।[৩]

এ সংখ্যাতে লিখেছিলেন বেগম জেবু আহমদ (কবিতা), এ.কে.এম. মোশাররফ হোসেন (প্রবন্ধ), আবুল মনসুর আহমদ (গল্প, হারজিৎ) এবং আনোয়ারী হক (প্রবন্ধ, মহীয়সী রোকেয়া)।

অন্যান্য সংখ্যার লেখকদের মধ্যে রয়েছেন—

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল হাছানাৎ, বেগম সুফিয়া কামাল, মোহাম্মদ মোদাব্বের, শামসুদ্দীন, শওকত ওসমান, মহবুব জামাল, মহীউদ্দীন আহমদ, রাহাগীর, ফয়েজ (আহমদ?), সৈয়দ আবদুল মান্নান, আজীজুল হক, আনোয়ারী এম. রহমান, জাকের হোসেন, আশরাফ সিদ্দিকী, গোলাম সোলায়মান, খায়রুল বশর, এ.এস.এম. আবদুল জলীল, মোয়াজ্জামুল হক ; এম. আবদুল মন্নাফ, রওশন ইজদানী, ফজলুর রহমান, আবদুল্লাহ আল মুতী, আবদুল কাদের বি.এ. বি.সি.এস., মফীজুল্লাহ কবীর, কাজী আবদুল খালেক, হাবীবুর রহমান, বেগম সালেমা খাতুন, আবুল খায়ের, আহমদ খাঁ, আবদুল ওহাব সিদ্দিকী, ছুরাইয়া বেগম প্রমুখ।

লক্ষণীয় যে, এটি সাতচল্লিশের স্বাধীনতার বছর কয়েক আগের পত্রিকা। মুসলমান সমাজের তরুণদের মধ্যে প্রতিভাশালী যাঁরা, তাঁরা এতে লিখেছিলেন বলে প্রতিনিধিত্বশীল তরুণদের সমাবেশ ঘটেছিল জাগরণে। এর সবুজ, তরুণ লেখকদের নামই আজকের বাংলাদেশের বড় বিজ্ঞান-লেখক ও সচিব, কথাশিল্পী ও কবিদের তালিকায় দেখা যায়। অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকদের নামও রয়েছে।

www.pathagar.com

আর রয়েছেন অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের এক ঝাঁক হিন্দু-লেখক, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রামগোপাল, সুনীল ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র দত্ত, সুনির্মল বসু, শৈলবালা ঘোষজায়া, গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রগোপাল চক্রবর্তী, শান্তিময়ী পাঠক, বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ, শ্রীতন্ময় বাগচী, অলকানন্দ মুখোপাধ্যায়, রেণু গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিভা কুমার চক্রবর্তী, সঞ্জীব চৌধুরী, বি.সি. ঘোষ, ড. হীরেন্দ্রলাল দে, অধ্যাপক শ্রী সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, নির্মল দাশ প্রমুখ।

জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ সংখ্যা পাওয়া গেছে। এটি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর তৎকালীন উপাচার্য ড. স্যার আহমদ ফজলুর রহমান এর মৃত্যুর পরে তাঁর ওপর লিখিত বিশেষ স্মৃতি সংখ্যা। এতে আহমদ ফজলুর রহমান (স্যার এ.এফ. রহমান) এর ওপর অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। ইনি বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। মালদহের সম্ভ্রান্ত, মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। তথাকথিত কবি-সাহিত্যিক না-হলেও অশিক্ষিত পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের গর্বের বিষয় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এফ. রহমান এবং সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্ণেল শাহেদ সোহরাওয়ার্দী ও স্যার আজীজুল হক, বিজ্ঞানী কুদরৎ-ই-খুদা, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ—এমনকি বড় বড় ব্যবসায়ী, ধনাঢ্য ব্যক্তি, জমিদার পর্যন্ত। জাগরণের সময় এঁদের নিদর্শন ও উপস্থিতি, মুসলমানদেরকে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে সাহস-শক্তি যুগিয়েছিল।

জাগরণের কবিতা, গল্প, ছড়া ও আলোচনাসমূহ সাহিত্যের বিচারে উন্নত ছিল। তর্ক বিতর্ক ও আলোচনার বিষয় ও উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে বিরাজিত কুসংস্কার দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বর্ধন, যেমন একটি গল্পে একজন ঈমাম সাহেব ও মহেন্দ্র বাবুর কথোপকথন—ঈদের দিনে দুজনে বলছেন—'চলুন-কোলাকূলি করেই চুলাচুলির অবসান করি। বলেই মহেন্দ্রবাবু ঈমাম সাহেবের গলা জড়িয়ে ধরলেন, ঈমাম সাহেবও প্রগাঢ় আলিঙ্গনে মহেন্দ্র বাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। ঈমাম সাহেব বললেন—ঈদের উদ্দেশ্যও মিলন এবং মোসাহেফা। শুধু মুসলমানে মুসলমানে নয়—মানুষে মানুষে। মহেন্দ্রবাবু বললেন—বিজয়ার উদ্দেশ্যও ইহাই।[৪]

বিভিন্ন কার্টুনে "হিন্দু-মুসলমান কী জয়", 'সবুজ মহল জিন্দাবাদ' ইত্যাদি মানবতাবাদী সাহিত্য শিল্পের সুষমা রয়েছে। পত্রিকাটির যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তাহলো—পাকিস্তান, বা ভারত স্বাধীন হবে, সেই আকাঙ্ক্ষায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বা কৃষক-প্রজাদের অর্থাৎ তৃণমূল থেকে সমাজকে জাগিয়ে দেবার প্রয়াস পত্রস্থ হিন্দু ও মুসলমান উভয় কবির কবিতা ও প্রবন্ধ গল্পকারকের রচনায় ফুটে উঠেছে।

একই পৃষ্ঠায় হিন্দু ও মুসলমানের রচনা পাশাপাশি ছেপে তাতে সম্প্রীতির জয় গাওয়া হয়েছে। কারণ বোধ হয় এই যে, তখন সকল শ্রেণীর সম্প্রদায়ের কবি, শিল্পী, স্রস্টাদের কাছে স্বাধীনতাই বড় কাম্য ছিল। স্বাধীনতা লাভের সময়কার হিন্দু-মুসলমানের দরকষাকষির সময় এঁদের পাকিস্তানবাদী ও ভারতীয় জাতীয়তার বোধ তীক্ষ্ণ হয়ে যায়।

তবু এঁদের জাগরণ পাকিস্তানী ধারার উজ্জীবনেই শেষ পর্যন্ত কাজে লেগেছে। কারণ, পাকিস্তান ও বঙ্গ-বিভাগের পরিকল্পনার চূড়ান্ত মুহূর্তে দলবলসদস্য সহ তাঁরা সমর্থন

www.pathagar.com

জুগিয়েছিলেন মুসলিম লীগের নেতাকর্মীদেরই। এর পরিচয়ও পাওয়া যায়। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রথম দিকেই মীজানুর রহমান প্রমুখ সকলেই পূর্ব পাকিস্তানে (পশ্চিম পাকিস্তানে খুবই কম) পুনর্বাসিত হয়েছিলেন।

তথ্যনির্দেশ

১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মুনাজাত' (কবিতা), জাগরণ, ১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৪১। কবিতাটি ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলিতে সংকলিত হয়েছে।

২. আহসান হাবীব, 'জাগরণী' (কবিতা), জাগরণ, সবুজ সংখ্যা, ১ জানুয়ারি, ১৯৪৫, পৃ. ২।

৩. এম. আবদুর রহমান, জাগরণ (কবিতা), উপরিউক্ত, পৃ. ৪।

৪. 'মুহি' ছদ্মনামে লেখা 'হিমু' গল্পের উদ্ধৃতি, সবুজ সংখ্যা, উপরিউক্ত, পৃ. ৫৫। গল্পটি ব্যঙ্গচিত্র দ্বারা চিত্রিত। গল্পের নিচেই কার্টুনের শ্লোগান—'হিন্দু মুসলমান কী জয়'।

www.pathagar.com

২৮. নয়া-জামানা

(সিরাজগঞ্জ, ১৩৪৫-৫০)

সিরাজগঞ্জ থেকে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৮৮২-১৯৩১) সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা শিরাজী (সিরাজী?)র সম্পাদনায় 'নয়া-জামানা'র প্রথম সংখ্যা বের হয়েছিল অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে, নভেম্বর ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল দুই আনা। বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮। নিউজপ্রিন্ট, প্রবাসী-মোহাম্মদীর সাইজ। প্রিন্টার্স-লাইনে উল্লেখ করা ময় মৌলভী ফজলুর রহমান কর্তৃক চাঁদপুর প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ইজাবউদ্দীন আহমদন (নামকরা লেখক) কর্তৃক সিরাজগঞ্জের 'নয়া-জামানা' কার্যালয় থেকে প্রকাশিত।

নয়া-জামানার কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিল 'বাণীকুঞ্জ', সিরাজগঞ্জ-এ। 'বাণীকুঞ্জ', সিরাজগঞ্জে আসাদউদদৌলা সিরাজীর 'ইসলাম মিশন পুস্তক বিভাগ' নামে পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রয় কেন্দ্র ছিল। আসাদউদদ্দৌলা সিরাজী একজন কবি ও লেখক হিসেবে সেকালে নাম করেছিলেন। তিনি প্রখ্যাত ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বংশধর। তাঁর দামামা, সেতার, ইসলামের ডাক, মহামানব প্রভৃতি শিরোনামের ইসলামী গজলগান ও প্রবন্ধের বইয়ের বিজ্ঞাপন স্বসম্পাদিত নয়া-জামানাতেই রয়েছে।

ঐকালের মুসলিম পত্রপত্রিকায় মাসিক 'নয়া-জামানা' সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হবার বিজ্ঞাপন দেখা যায়। 'নয়া-জামানার' নিয়মাবলীতে বলা হয় : 'বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো হইবে।' আদর্শ হিসেবে বলা হয় : 'ধর্ম-শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সারগর্ভ রচনা, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকদিগের মধ্যে নবীন লেখক লেখিকার লেখা সাদরে গৃহীত হইবে।"

প্রথম সংখ্যার 'মোনাজাত' এ বলা হয় :

> বিশ্বনিখিলের সকল সৃষ্টির মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে আমরা মস্তক অবনত করিতেছি। জয়-পরাজয়ে, আলো-অন্ধকারে, একমাত্র তাঁহারই বিজয় ঘোষণা করিব। আত্মভোলা সর্বহারা যে কওম আজ ধ্বংসের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে—দুর্গতির অন্ধ তমসায় দৃষ্টি যাহাদের আচ্ছন্ন হইয়াছে—নয়া জামানার অরুণালোকে তাহাদিগকে জীবনের আহ্বান জানাইবার জন্য আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বাব্বুল আলামীনের দরগায় শক্তি প্রার্থনা করিতেছি।[১]

নয়া-জামানার প্রথম সংখ্যায় নজরুল ইসলাম (তখনকার পত্র-পত্রিকায় শুধু 'নজরুল ইসলাম'ই লেখা হতো, কাজী লেখা হতো কখনো, কখনো) এর 'প্রশস্তি' শীর্ষক নিম্নোক্ত কবিতাটি ছাপা হয় :

অসহায় এই অবণী তলে
বিবাদ কলহ উৎপীড়নের রাজ্য চলে।
আছে নিপীড়িত জনগণ চেয়ে হতাশ প্রাণে
ফরিয়াদ ওঠে ধুমায়িত হয়ে উর্দ্ধপাণে।
নয়া জামানার নিশান ধরিয়া ইহারি মাঝে
তুমি এস নওজোয়ান অগ্রপথিক সাজে।

www.pathagar.com

তরুণ অরুণ রশ্মির সম তোমার বাণী
আনুক জীবন তিমির বিদার শায়ন হানি।
পীড়িতের প্রাণে নব-সান্ত্বনা চেতনা লয়ে
তুমি এস সর্দ্দার তাহাদের মুজ্‌দা বয়ে।'[২]

প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় ও তাঁর কৃষকের গান (মোরা বাস করি এই মাঠের বুকে/ চাষ করি এই মাটি। /যে মাটির বুকে বহে পাকা ধানের সোনার কাঠি।) ছাপা হয়।[৩]

প্রথম সংখ্যায় মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্ 'আলেমের সম্মান' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন। নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গল্প লেখেন 'স্মৃতির দান'। মহবুব কবিতা লেখেন 'পরের ছেলে' নামে। বেলায়েত হোসেন সিরাজীর প্রবন্ধ 'হাদিছের উপদেশ'। আসাদউদ্দৌলা সিরাজী 'আমাদের তপস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলমান সমাজের প্রেক্ষিতে বলেন,

'ডিগ্রী ডিপ্লোমাধারীদের সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে—উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, মন্ত্রী, মেম্বর, মুন্সী, মৌলভী তো কম নাই। কিন্তু দুঃখের রাত্রিতো প্রভাত হইল না। কতজনের নামে কত জিন্দাবাদ কত জয়ধ্বনি তো উঠিল কিন্তু জয় হইল কোথায়? অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা ও পীড়নের মাত্রা কিছু কমিল কি?'

ধর্মের পথে গেলে মুক্তি আসবে, সেই পরামর্শ দিয়ে তিনি শেষে বলেন—'আমাদিগকে কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।'[৪]

জসীমউদ্‌দীন এর গান 'আর কি জাতি আছে/ কুলের গরব, শীলের গরব/প্যাটের জ্বালায় পুইড়্যা গ্যাছে।'[৫]

এবং মোহাম্মদ সেরাজউদ্দৌলার কবিতা-'যদি বাঁচতে চাও, ঘাস খাও', আর মোহাম্মদ নূরুল হুদার গল্প 'প্রতীক্ষায়', কাছিমউদ্দীন আহমদ এর প্রবন্ধ 'ইসলাম প্রচার' ; ইজাবউদ্দীন আহমদ এর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'অতীতের স্মৃতি মূলে', স্যার এফ. রহমান এম. এস. সি-র প্রবন্ধ 'আঁখির ফাঁকি, (তিনি নয়া জামানায় আরও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক-প্রবন্ধ লেখেন, যেমন 'গ্রামোফোন' ১/২) ; এম. ডি. মাজেদা খাতুন-এর প্রবন্ধ—'সাহিত্য প্রসঙ্গ' ছিল।

মাজেদা খাতুনের প্রবন্ধে সাহিত্যকে বাস্তব এবং গণমুখী করার আবেদন রয়েছে। সম্পাদকীয় বক্তব্যে বলা হয়েছে যে, ইসলাম প্রচার করতে হলে আর্থিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে হবে। সম্মান দিতে হবে। তা না হলে ইসলাম বিস্তৃত হবে না। বলা হয়,— সকলের কাজের ও শ্রমের বিনিময়ে বেতন বা মজুরী লাভ করেন, ফিস পান, কিন্তু ইসলামের প্রচারক-খেদমৎকারগণ কি করে চলবেন, তাঁরা যদি বিনামূল্যে প্রচারকার্য চালিয়ে যান?[৬]

শিখা-গোষ্ঠীর অন্যতম চিন্তক, মনীষী আবুল হুসেনের মৃত্যুতে (১৯৩৮) 'আমাদের শোক' কলামে বলা হয় : 'আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু আবুল হুসেন এম. এ. সাহেব অকালে ইহলোকে ত্যাগ করিলেন।... তাঁর সতেজ চিন্তা স্বজাতির হিতকল্পে নিয়োজিত ছিল। এজন্য নিগ্রহ লাঞ্ছনা কম ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁর বিয়োগ-ব্যথিত পরিজনের সঙ্গে গভীর সমবেদনা...প্রকাশ করিতেছি।'[৭]

মওলানা শওকত আলীও তখন ইন্তেকাল করেন। তাঁর প্রতিও শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশ করা হয়। নয়া-জামানায় মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রগতিশীল নেতা কামাল আতাতুর্ক-এর মৃত্যুতে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় (১/২)।

www.pathagar.com

এম. সেরাজুল হক 'খোৎবা-সমস্যা' শীর্ষক আলোচনায় বলেন, বাঙলা ভাষায় নামাজ, দরুদ ও খোৎবা পাঠের পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করা উচিত। সুধীর মজুমদার 'এলুমিনিয়াম ধাতু'র ওপর আলোচনা করেন। 'আলেমের সম্মান' বিষয়ে লেখেন মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। বেলায়েত হোসেন সিরাজীর প্রবন্ধ 'হাসীদের উপদেশ' ; ডাক্তার মফিজউদ্দিন আহমদ (এম.এল. এ.) এর প্রবন্ধ 'দেশের কল্যাণ' ; এম. রজব আলী বি.এল. এর প্রবন্ধ— 'ইউসুফ জোলায়খার আদর্শ' নয়া-জামানার ভালো গদ্যালোচনা।

মরহুমা মাজেদা খাতুনের ওপর আলোচনা করেন ইজাবউদ্দীন আহমদ। মাজেদা খাতুন সম্পাদকের স্ত্রী, ২২ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তাঁর কিছু অপ্রকাশিত গল্প, রচনা এতে প্রকাশিত হয়।

সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা সিরাজীর আলোচনাগুলো নীতিবাদীর, আবার তা মুক্তবুদ্ধির পরিচায়ক। আবুল হুসেনের মৃত্যুতে তাঁর মন্তব্য স্মরণীয়। নজরুল ও জসীমউদ্দীন ছাড়া কোনো বিখ্যাত কবির কবিতা বিশেষ চোখে পড়ে না নয়া জামানা'র প্রাপ্ত সংখ্যায়। অবশ্য মোহাম্মদ মুছা খান, ছোলায়মান আহমদ, আব্বাছ আলী, মোহাম্মদ মকবুল আলী, মকসেদ আলী—এঁরা কবিতা লিখতেন।

গল্প লিখেছেন নূরুল হক, এ.কে. আজীজুল হক, মোহাম্মদ হারুনার রশিদ, ফজলুর রহমান এম. এস. সি প্রমুখ। ইজাবউদ্দীন আহমদ-এর নাটিকা 'ঈশা খাঁ-মানসিংহ' (১/২) সহ এর রচনাগুলো সাহিত্যগুণ সম্পন্ন, পঠনোপযোগী ছিল।

নয়া-জামানায় যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়, তা পাঠ করলে মাত্র ৬০ বছর আগে বাঙলার মুসলমানের সামাজিক চিন্তাচেতনার অবস্থা কি ছিল—তা যেমন বুঝা যায়, তেমনি পত্রিকার লক্ষ্য আদর্শ সম্পর্কেও উপলব্ধিতে আসে।

বলাবাহুল্য, 'নয়া-জামানা' ব্যবসায়িকভাবে সফল সাহিত্য পত্রিকা বা 'মাসিক' ছিল না। 'মসজিদ সংগঠন', 'দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য' প্রভৃতি শিরোনামে এতে যে সব আলোচনা করা হয়েছে, সত্যি বলতে কি আজও পড়তে ইচ্ছে করে। মুসলমানদের তথা, আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যে এখনও এমনি প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা দরকার।

একটি সম্পাদকীয় আলোচনায় মাড়োয়ারীদের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের আর্থিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

> মাড়োয়ারীরা কোন ডিগ্রী ডিপ্লোমার ধার ধারে না—অথচ বাংলাদেশের ব্যবসাকেন্দ্র তাহাদের অধিকারে। বহু এম. এ.বি.এ. পাশ করা যুবক মূর্খ মাড়োয়ারীর দুয়ারে ধর্ণা দিতেছে। বাংলাদেশের সরকারী, বেসরকারী সমস্ত চাকুরীতে যদি মুসলমান নিয়োগ করা হয়, তথাপি মুসলমান জাতির আর্থিক সমস্যার শতভাগের এক ভাগেরও সমাধান হইবে না। অথচ দেশের যুবকদিগকে কৌশল করিয়া চাকুরীর নেশায় পাগল করিয়া তোলা হইতেছে। যাহারা সময় থাকিতে সাবধান না হইয়া ঠকিয়া শিখিতে চায়—তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করা বিড়ম্বনা মাত্র বাঙলা-আসামের মুসলমানেরা আজ পর্য্যন্ত একটা কাপড়ের মিল গড়িয়া তুলিতে পারিল না—কোন শিল্প কেন্দ্র স্থাপন করিল না অন্তর্বাণিজ্য বা বহির্বাণিজ্য—কোথাও ইহারা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিল না। শহর নগরে পান সিগারেটের দোকান হইতে বড় বড় ষ্টেশনারী দোকান সমস্তই ভিন্ন জাতির অধিকারে।[৮]

www.pathagar.com

'নবযুগ—ঐ এলো ঐ'—শীর্ষক অপর একটি আলোচনায় বলা হয় : দুর্যোগের ঘন অন্ধকার ভেদ করে জীবনের নবীন সূর্য বিশ্বের আকাশে কিরণ ছড়াচ্ছে। সেই আলোকের পথ বেয়ে সকল দেশের সকল মানুষ সৌভাগ্য ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হচ্ছে। দেশ কাল ও সমাজবন্ধনের গণ্ডি অতিক্রম করে মানুষ আজ মানবতীর্থে মিলিত হবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। ভারতবর্ষেও আজ জাগরণের বাণী পরিশ্রুত হচ্ছে। সকলে মিলে এ আহ্বানে সাড়া দিলে তবে জাতীয় কল্যাণ সূচিত হবে। লেখক বলেন,

> শক্তি ও সংগ্রাম ব্যতিরেকে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবেদন নিবেদনের ডালা বাহিয়া—ভিক্ষা করিয়া জাতি বাঁচে না—মৃত্যু সাগরের বেলাভূমি হইতে নবজীবনের সৈকতভূমে জাতীয় জীবনতরী পৌঁছাইতে হইলে ত্যাগ চাই—সাহস চাই—শক্তি চাই। মৃত্যু সাগরের তরঙ্গ সঙ্কুল বক্ষে তরী ভাসাইতে হইলে ঘরের মায়া কাটাইতে হইবে। উপাধি, ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, খেতাব ও পদবীর আশা চিরতরে বিসর্জন দিতে হইবে।
>
> ...পৃথিবীতে জাতির মুক্তি যাঁহারা সাধন করিয়াছেন, গোলামীর তকমা পরিয়া তাহারা জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়ান নাই। রাজপ্রাসাদের সোনার পালঙ্কে সোনার চামচ মুখে লইয়া তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন নাই। চায়ের বৈঠকে প্রস্তাবের খসড়া করিয়া জাতির মুক্তি সাধনের চিন্তা তাঁহারা করেন নাই।
>
> ...গোলামের জীবনে, ক্রীতদাসের জীবনে গৌবর কি? সম্মান কি? লাভ কি? যদি বাঁচিতে হয় মুক্ত আকাশের নীচে—মুক্ত হইয়াই আমাদিগকে থাকিতে হইবে। মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর শোষণের হস্ত হইতে—সকলকে মুক্ত করিতে হইবে।
>
> নবযুগের নব আহ্বানে এই মন্ত্রই আজ ধ্বনিত হইতেছে। আমাদের চিন্তায় কর্ম্মে ধ্যানে তপস্যায় সাধনায় ও সাহিত্যে মানবকল্যাণের মহতী উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হউক।[৯]

ডাক্তার মফিজউদ্দীন আহমদ ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং তিনি প্রজাস্বার্থের অনুকূল চিন্তা করতেন। ১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্রের সমালোচনাপূর্বক কৃষকদের রক্ষা করার জন্য তিনি 'দেশের কল্যাণ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বলেন : দেশের কল্যাণ বলতে কৃষক-প্রজার মঙ্গল বুঝায়, 'অতএব দেশকে বড় করিতে হইলে দেশের কৃষক প্রজার আর্থিক উন্নতি সাধন একান্ত অপরিহার্য এবং অবশ্য কর্তব্য।'

কিন্তু আজও কৃষক-প্রজার আর্থিক উন্নতির পথে বহু অন্তরায় রয়েছে। নতুন শাসন সংস্কারে দেশের লোকের হাতে কিছু ক্ষমতা এলেও তাতে কৃষক-প্রজার স্বার্থবিরুদ্ধ অনেক আইন রয়েছে। 'বাঙলার আইন সভায় কৃষক প্রজার প্রতিনিধি অনেক কম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার দুইজন সহকর্মী ব্যতীত আর সকলে কম বেশি বিরুদ্ধস্বার্থের প্রতিনিধি... সুতরাং মন্ত্রীসভায় তাঁহাদের আসন সুদৃঢ় ও তাঁহাদের মতকে প্রবলতর করিতে গেলে কৃষক-প্রজার আন্দোলনকে বলিষ্ঠতর করিতে হইবে এবং এই আন্দোলন চালাইবার গুরু দায়িত্ব শিক্ষিত ও স্বার্থলেশহীন কর্মীকে বহন করিতে হইবে এবং উহাই সত্যিকার দেশসেবা বলিয়া কৃষক প্রজা মনে করিবে।"

তাঁর প্রবন্ধে শাসনতন্ত্রের বহুমাত্রিক সমালোচনা করা হয়। তিনি বলেন, 'বর্তমান শাসনতন্ত্রে বাঙলা গভর্ণমেন্টকে আর্থিক হিসাবে কতকটা পঙ্গু করিয়া রাখা হইয়াছে। বাঙলা গভর্ণমেন্টের আয়ের মোটা অংশ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টে চলিয়া যায়, সুতরাং অর্থের অভাবে

www.pathagar.com

বাঙলা গভর্ণমেন্ট কৃষক-প্রজার প্রকৃত উন্নতি বিধায়ক ও গঠনমূলক কোন কর্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। অতএব কৃষক-প্রজার স্বার্তের জন্য এই অবস্থার বিরুদ্ধেও প্রবল জনমত গঠন করা একান্ত অপরিহার্য্য... ।'

বর্তমান ভূমিব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথা লুপ্ত না হলে যে বাঙলার কৃষক-প্রজার উন্নতি হতে পারে না সে বিষয়ে সকলেই একমত। জমিদারী ব্যবস্থার ফলে বাঙলার কৃষক সমাজ সবদিক দিয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে।[১০]

ইত্যকার বিষয়ে রচিত তাঁর ধারাবাহিক রচনাটি গুরুত্বপূর্ণ।

'নয়া-জামানা' পাঠ করে মওলানা মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী, শ্রী হেমন্তকুমার সরকার (কৃষ্ণনগর থেকে ৪/১/৩৯ তারিখে), খানবাহাদুর হাশেম আলী খাঁ (এম. এল. এ., চেয়ারম্যান, বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড), মৌলবী গিয়াসউদ্দীন আহমদ (এম. এল. এ., জামালপুর থেকে, ৪/১/৩৯ তারিখে) প্রমুখ প্রশংসাত্মক এবং সমালোচনামূলক পত্র প্রেরণ করেন।

মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী লিখেছিলেন—"নয়া-জামানা পাঠ করিয়া খুশি হইয়াছি। সম্পাদকীয় নোটগুলি চিন্তাপূর্ণ ও মূল্যবান। এত অল্পমূল্যে নিয়মিতভাবে এরূপ একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করা সত্যই প্রশংসার বিষয়।"[১১]

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রিয়-শিষ্য ও সহকর্মী, বঙ্গের গণ-আন্দোলনের অন্যতম নেতৃ-পুরুষ, বিখ্যাত সাংবাদিক ও সুলেখক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার লিখেছিলেন :

> ভাই সিরাজী, তোমার 'নয়া-জামানা' পেয়ে বড় খুশি হলাম। তোমার পিতা বাণীকুঞ্জের সাধক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যে মনোভাব তোমার সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশ পেয়েছে, তা নিছক সত্যের এবং মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী বড়লোকের হাতে যতদিন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থাকিবে ততদিন জনসাধারণের সম্পূর্ণ কল্যাণের আশা বাতুলের পক্ষেই সম্ভব—এই কথা খুবই সত্যি।
>
> ...দেশ-সেবার নামে যেসব পাণ্ডারা শ্রেণীস্বার্থ ও নিজের পদ-সম্মান বৃদ্ধিতে নিযুক্ত আছে, যত শীঘ্র জনসাধারণ তাদের চিনতে পারে, সেজন্য প্রকৃত দেশ-সেবকদের অবিরত প্রচার করা দরকার। কংগ্রেস হোক, লীগ হোক, কৃষক প্রজা পার্টি হোক, সর্বত্রই আজ ধনিক ও তাদের অনুচরগণের প্রাধান্য। কৃষক দেশের মেরুদণ্ড, তার দুঃখ-দুর্দ্দশার কিছুমাত্র লাঘব হয়নি... হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের স্বার্থ এক।
>
> খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে যেসব সমস্যার কথা বাহির হয়, সেগুলি জাতির সমস্যা নয়, শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ সমস্যা। এই শ্রেণীস্বার্থকে ভেঙে দিয়ে গণ-স্বার্থকে বড় করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জনগণ নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হলে কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না।[১২]

হেমন্তকুমার সরকার এবং মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী 'নয়া-জামানা'র সম্পাদকীয় নোট-এর প্রশংসা করেছিলেন। 'কর্মীর সমান' শীর্ষক এক ধরনের একটি ছোট্ট নোট উদ্ধৃত করছি—

> যাহারা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া—সকল প্রকার জন-কল্যাণের আন্দোলন পরিচালনা করেন—নিজেদের সংসার স্ত্রী-পুত্র ভাসাইয়া দিয়া বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারীর সময় দেশবাসীর সেবায়

ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করে—সেই সমস্ত মহাপ্রাণ ত্যাগব্রতী কর্মীদিগের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শিত হয় না—ইহা সমাজমনের দুর্বলতা।

সুখের বিষয় হিন্দু-সমাজ বড়লোকের মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছেন,—কিন্তু মুসলমান সমাজ আজও অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে। অন্য দেশের কথা না জানিলেও প্রতিবেশী সম্প্রদায় যে-সমস্ত সদ্‌গুণের ফলে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা শিক্ষা করিলে দোষ কী? কিন্তু সে কথা আজ কে বলিবে? বাঙলার জাগ্রত প্রাণ কর্মীদের দৃষ্টি আমরা এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। চরিত্র আদর্শ ও নীতিভ্রষ্ট হইয়া জাতি কখনও বাঁচে না।[১৩]

মাসিক 'নয়া-জামানা'য় 'অহিংসার নতুন ব্যাখ্যা', 'কৃষক-প্রজা সমস্যা', 'সমাজ ও সম্পর্ক', 'আইন পরিষদের প্রতিনিধি', 'নারী শিক্ষার ধারা', 'সিনেমা', 'লীগ ও আমরা' প্রভৃতি শিরোনামে আলোচনা করেছে। ফলে পত্রিকাটির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক দায়বদ্ধতা ছিল।

তথ্যনির্দেশ

১. 'মোনাজাত' (যাত্রারম্ভ বা নিবেদন), নয়া-জামানা, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫।

২ নজরুল ইসলাম, প্রশস্তি (কবিতা), উপরিউক্ত।

৩. উপরিউক্ত, নয়া-জামানা, ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৫।

৪. সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা সিরাজী, আমাদের তপস্যা, নয়া-জামানা, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫।

৫. জসীমউদ্‌দীন, গান, উপরিউক্ত।

৬. সম্পাদকীয়, উপরিউক্ত।

৭. উপরিউক্ত ('আমাদের শোক')।

৮. উপরিউক্ত।

৯. নবযুগ ঐ এলো ঐ (একটি সম্পাদকীয় বক্তব্য), নয়া-জামানা, ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৫।

১০. ডা. মফিজউদ্দীন আহমদ, দেশের কল্যাণ (প্রবন্ধ), নয়া-জামানা, ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৫, পৃ. ৫৬।

১১. মওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদীর পত্র, উপরিউক্ত, পৃ. ৭১।

১২. হেমন্তকুমার সরকারের পত্র, উপরিউক্ত।

১৩. সম্পাদকীয়, উপরিউক্ত।

www.pathagar.com

৪ ঘ. শিশু-কিশোরদের পত্রিকা

২৯. শিশু-সওগাত

(কলকাতা ১৩৪৪-৫৪)

সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটেই বলতে হয়—সওগাত-গ্রুপের প্রকাশনাগুলো প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য সাহিত্য-সম্ভার উপহার দেয়ায় বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ আসন দখল করে রেখেছে। মুসলমান সমাজে শিশু-কিশোরদের জন্য সাহিত্যপত্রিকা আগেও বের হয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) সম্পাদিত আঙ্গুর বের হয়েছিল ১৯২০ সালে। তবে এসব পত্রিকা সমগ্র বঙ্গের সকল বাড়ির শিশুর কাছে পৌঁছেছিল কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'শিশু-সওগাত' সমগ্র বঙ্গের বিদ্যালয় ও লাইব্রেরিসমূহের জন্য সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত পত্রিকা ছিল।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের মোসলেম পাবলিসিং হাউস, মাসিক সওগাত, বার্ষিক সওগাত, মহিলাসংখ্যা সওগাত, যুদ্ধসংখ্যা সওগাত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের লোকের কাছেই পৌঁছেছিল এবং সত্যিই অসংখ্য পাঠকও ছিল। এর বিস্তৃত লেখকসূচি এবং বিষয়বস্তুই প্রমাণ করে এই পত্রিকার কদর ছিল।

নাসিরউদ্দীন সাহেব পত্রিকার ব্যবসাও বুঝতেন। সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনের কৌশল ও দক্ষতাও অর্জন করেছিলেন তিনি। সরকারের প্রশাসনের বা সমাজের এলিটদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে তিনি কাজ চালাতেন সফলভাবে।

'শিশু-সওগাত' এর প্রচ্ছদে শেরে বাঙলা এ.কে. ফজলুল হকের ছবি দিয়ে লেখা থাকতো 'অভিভাবক'। তখন তিনি বাঙলার প্রধানমন্ত্রী। আরও লেখা থাকতো 'গভর্নমেন্ট কর্তৃক সমগ্র বঙ্গের বিদ্যালয় ও লাইব্রেরিসমূহের জন্যে অনুমোদিত ও পৃষ্ঠপোষিত'।

তাঁর সাপ্তাহিক সওগাতকে সাপ্তাহিক 'দেশের কথা'রূপে রূপান্তরের মধ্যেই এই বৈচিত্র্যসাধন ও স্বদেশী, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রস্ফুটনের প্রয়াস বিধৃত।

শিশু সওগাতের প্রথম সংখ্যা বের হয়েছিল বৈশাখ ১৩৪৪ সনে। ১৩৫৫ সনের মাঘ মাসে, ১১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকেই। পাকিস্তান হবার সময় বাজারে কিছুদিন অনিয়মিত ছিল। ঠিকানা ১১, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, কলকাতা। 'হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণের সমবেত চেষ্টায় সকল সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের পড়িবার উপযোগী করিয়া' 'শিশু-সওগাত' প্রকাশিত হয়। এর 'শিশু মহল' যখন প্রতিষ্ঠিত হয় (শ্রাবণ, ১৩৫২) তখন বলা হয়, 'যে কোনো জাতির ছেলেমেয়ে এর সভ্য হতে পারবে।'

শিশুদের চিত্তের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য সামনে নিয়ে এর যাবতীয় রচনা নির্বাচিত হতো।

'মানুষের গৌরব' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় বক্তব্যের মূল কথা ছিল : "চিত্তের সৌন্দর্যই মানুষকে বড় করে, দেহের সৌন্দর্য নয়। মানুষকে ভালবেসে, মানুষের সেবা করে, মানুষের গৌরব অর্জন করো।'[১]

www.pathagar.com

১৩৫৪ অর্থাৎ ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বরে 'অহিংসা' শীর্ষক একটি আলোচনায় সওগাত এর শিশু–কিশোর পাঠকদের উদ্দেশ্য করে বলা হয় :

> "হিংসা মানব জীবনকে ধ্বংস করে। হিংসা মানুষের আত্মাকে কলুষিত করে, তাকে শয়তানের পর্যায়ে নামিয়ে আনে। হিংসায় পরিবার ধ্বংস হয়, সমাজ ধ্বংস হয়—হিংসায় দেশ তার সভ্যতা ও স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। আজ সম্প্রদায়ে–সম্প্রদায়ে জাতিতে–জাতিতে দেশে–দেশে হিংসায় তাণ্ডব লীলা চলছে।..."[২]

'সত্যনিষ্ঠা' সম্পর্কে বলা হয় : 'তোমাদের সকলেরই সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। ছোটবেলা থেকে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে তোমরাও জীবনে উন্নতি করতে পারবে।'[৩]

বিশ্বভ্রাতৃত্বের আহ্বান জানিয়ে শিশু সওগাতের নিবেদন ছিল, 'পৃথিবীর সব ধর্মের সব জাতির মানুষকে নিজের ভাইয়ের মত মনে করো। যুগে যুগে মহাপুরুষরা এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন মানুষকে। প্রত্যেকটি মহৎ ধর্মের, বিশেষত ইসলামের এই শিক্ষাই হলো প্রধানতম। কিন্তু আজো কি মানুষ চলছে মহাপুরুষদের উপদেশ মতো? মেনে নিয়েছে কি তারা ধর্মের নির্দেশ? না। বিশ্বের মানুষকে ভাই বলে বুকে টেনে নেয়া দূরের কথা, প্রতিবেশীর সঙ্গেও তার হানাহানির অন্ত নই, নিজের ভাইয়ের খুনে নিজের হাতকে কলঙ্কিত করতেও আফ্‌সোস জাগে না তার মনে। এর জন্য দায়ী কে? দায়ী কুশিক্ষা, স্বার্থপরতা এবং ধর্মের নামে গোঁড়ামি।'

শিশুদের উদ্দেশ্য করে তাই বলা হয়, 'আজকের ছোট ছোট শিশুরা, তোমরাই তো ভাবীকালের পূর্ণ মানুষ। বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শকে যদি সার্থক করতে চাও, তাহলে তৈরি হও এখন থেকে ; নিজেকে শিক্ষিত করো, মনকে মুক্ত করো; অন্ধ গোঁড়ামি থেকে, আপন স্বার্থের কথা না ভেবে উদার হৃদয়ে হাত মেলাও প্রথম নিজের ভাই–এর সঙ্গে, তারপর দেশ... এমনি করে সারা পৃথিবীর সঙ্গে।[৪]

'নবযুগের সূচনা' শীর্ষক একটি রচনা শিশুদের উদ্দেশ্য করে লেখা হলেও যে–কোনো পাঠকেরই পড়তে ভালো লাগে—

> ...তাকিয়ে দেখ একবার চারদিকে। দেখতে কি পাও আমাদের দেশে সবাই সুখী—সবাই দু'বেলা খেতে পায়, রোগে সুচিকিৎসা পায়, পরিধানের জন্য যথেষ্ট বস্ত্র পায়? —না। কিন্তু কেন? কোনো উন্নত দেশের অধিবাসীই তো এরূপ গরীব–দুঃখী নয়। তবে আমাদের দেশের অধিবাসীরা এত গরীব–দুঃখী কেন? এর কারণ অনেক—তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে কতকগুলো লোকের স্বার্থপরতা। এসব লোক চেয়েছে কেবল নিজেদের সুখ–সুবিধা, অন্যের দুঃখ দুর্দশার দিকে তারা ভ্রুক্ষেপও করেনি।
>
> এমনকি, অন্যকে শোষণ করেও তারা বড় লোক হতে চেয়েছে। ধীরে ধীরে এখন সে মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে। আজ সবাই বুঝতে পারছে যে, কোনো দেশের সকলেই যদি সুখী না হয় তবে সে দেশকে উন্নত বলা যেতে পারে না। আজ তাই সকলের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য সর্বত্র চেষ্টা চলছে। মানুষকে দিতে হবে স্বচ্ছল জীবন যাত্রার অধিকার—এই সংকল্প জাগছে আজ সকলের মনে। ইহাই নবযুগের সূচনার লক্ষণ। এই নবযুগকে সার্থক করে তুলবে তোমরাই।[৫]

ভালো ব্যবহার করার জন্য উন্নত জীবনের স্বপ্ন সৃষ্টির লক্ষ্যে শিশু–সওগাত নানাভাবে অনবরত নির্বাচিত রচনাবলি প্রকাশ করে সেকালে একটি উন্নতমানের পত্রিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। শিশুদেরকে একঘেঁয়ে ন্যাকামী ও বোকামীর গল্প

www.pathagar.com

শুনিয়ে হাসাতে চায়নি কেবল শিশু-সওগাত। এঁদের ধাঁধাসমূহের মধ্যেও বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ধরা পড়েছে।

'আজব দুনিয়া' নামে বিশ্বের বিচিত্র খবরাখবর, আন্তর্জাতিক সংবাদ, প্রচার মাধ্যমে ও পুস্তক-পুস্তিকা থেকে সংগ্রহ ও সংকলিত করে সচিত্র ফিচার রূপে উপস্থাপন করা হতো। এই ছবিগুলির সঙ্গে সংযোজনীটুকু এখনও যেকোনো বয়সের পাঠকের দৃষ্টি টেনে নিয়ে যায়। 'জেনে রাখো', 'শিশু মহল', 'নতুন ধাঁধাঁ', 'বিচিত্র সংবাদ', 'একটুখানি হাসো', 'মজার প্রশ্ন ও জবাব', 'দাদুভাইয়ের চিঠি',—এসবের মাধ্যমে যে চেতনা সৃষ্টি ও প্রচার করতে চেয়েছে শিশু-সওগাত—মোটামুটিভাবে তাহলো : 'সত্যিকারের মানুষ কে? মানুষ হয়ে জন্মালেই সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায় না। সত্যিকারের মানুষ হতে হলে চাই কঠোর তপস্যা। ফাঁকি দিয়ে কিছু হয় না। তপস্যার সঙ্গে চাই দেশপ্রেম।'[৬]

'দেশপ্রেম' শিরোনামের স্বতন্ত্র একটি আলোচনায় এভাবে বলা হতো :

> যে দেশের মাটিতে আমাদের জন্ম, যে-দেশের বাতাস থেকে আমরা জীবনের প্রথম নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছি, যে-দেশের অন্ন-জলে আমাদের এ-দেহ পুষ্ট, যে-দেশের পথের ধূলায় পুণ্য পদচিহ্ন রেখে গেছেন পিতৃ-পুরুষেরা, যুগ-যুগ ধরে যে-দেশের বুকে গড়ে উঠেছে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি—তাহজিব ও তমদ্দুনের আসমান-স্পর্শী মিনার—সেই পবিত্র দেশ আমাদের জন্মভূমি (বাংলাদেশ)।

মানবিক অধিকার সম্পর্কেও সচেতন করেছে পত্রিকাটি :

> 'নিজ জন্ম ভূমিতে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যেক মানুষের জন্মগত, শিক্ষায়-দীক্ষায় সাহসে-বীর্যে, নিজেকে উপযুক্ত মানুষ করে তুলে দুনিয়ার দরবারে জন্মভূমির ইজ্জত বাড়ানো প্রত্যেকটি মানুষের জন্য ফরজ। তাই প্রত্যেকটি শিশুকে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে। প্রস্তুত থাকতে হবে জন্মভূমির মঙ্গলের জন্যে নিজেদের সবরকম ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ করতে। কারণ জন্মভূমির জন্যে জান কোরবান করে যে-মানুষ, তার মৃত্যু নেই। চিরকালের ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে লেখা থাকে সেই শহীদের নাম।'[৭]

স্বাধীনতার পূর্বক্ষণে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ফলে সাম্যবাদের প্রভাব স্বীকার করেছে শিশু-সওগাত। 'সাম্য' সম্পর্কে তাঁরা বক্তব্য রেখেছেন এতে—'অনেক অনেক দিন আগে সত্যিকারের সাম্য ছিল সমাজে। আজকের মত সভ্যতার আলোক সেদিনের মানুষেরা পায়নি। সেই জন্য তাঁদের হয়তো আমরা বলতে পারি অসভ্য-বর্বর। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই সমান হয়ে বেঁচে থাকতো, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রত্যেকেই করতো জীবিকা নির্বাহ। আর আজ?

একদল মানুষ আজ সশরীরের রক্ত জল করে সারাদিন প্রাণ ফাটা পরিশ্রম করেও দুমুঠো ভাত জোটাতে পারে না,—আরেক দল দিব্যি আরামে শুয়ে-বসে থেকে পোলাও-কোপ্তা ওড়ায়। এই অসাম্যের জন্যেই তো দিনকে দিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সমাজ, দুনিয়ার সব অশান্তির মূলও এই অসাম্য।'

'একি তবে খোদার বিধান?' না, খোদাতায়ালার কাছে সব মানুষ সমান। এই কি ইসলামের শিক্ষা? মিথ্যা কথা, মানুষে মানুষে সাম্যের উদার নীতিই ঘোষণা করে ইসলাম'। তবে দায়ী কে? —'দায়ী আমাদেরই দুর্বলতা যার সুযোগে একদল স্বার্থপর মানুষ এই ব্যবস্থা কায়েম করেছে সমাজে।' শিশুদেরকে সাম্যবাদের প্রতি আগ্রহী, উদ্যোগী-কর্মী করে তোলার

www.pathagar.com

জন্য প্রত্যক্ষ আহ্বান জানিয়েছে শিশু–সওগাত এই বলে যে, 'কাদের হাতে দুনিয়ায় আবার সাম্যের যুগ ফিরাইয়া আনার দায়িত্ব? —হে আমার শিশু ভাইবোনেরা জবাব দাও।'[৮]

শিশু–সওগাত এর সংগঠন 'শিশু–মহল' এর নিয়মে ছিল, যে–কোনো জাতির ছেলেমেয়ে ওর সভ্য হতে পারে। এর লেখক–সূচিও বলে যে, হিন্দু ও মুসলমান শিশু–সওগাতের পাতা সমান হারে, সমান মমতায় দখল করেছিলেন। এইপত্রে দশ–এগারো বছরে একশ বিশ–পঁচিশটি সংখ্যায় ১৩৪৪ থেকে ১৩৫৫ পর্যন্ত লিখেছেন কয়েকশ লেখক, এঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে—

সুনির্মল বসু, এ.কে.এস. নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ, আহসান হাবীব, সৈয়দ নূরুল আলম ; আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পারুল নন্দী বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুর রহমান, বেগম নূর মহল, হোসেন আলী, গোলাম রসুল, আজিজুর রহমান, শ্রী ইন্দিরা বেদী, জাহানারা বেগম, শ্রী অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সৈয়দ আবদুল মান্নান, সৈয়দ আলী আহমদ, চিত্রলেখা দেবী, সিরাজুদ্দীন আহমদ, কুমারী সুলতানা রাজিয়া, মওলানা গোলাম রব্বানী, নূরজাহান বেগম, শান্তি দেবী, ফজলুর রহমান, এম. আবদুর রহমান, নিখিল গুপ্ত, আতাউল হক, বেগম নওশেরুন্নেসা।

ইব্রাহীম খাঁ, ডা: আমিন আহমদ, সৈয়দ আনওয়ারুল হাফিজ, বেগম ছখিনা হোসায়েন, মোহাম্মদ নাসির আলী, কে.এম. নাজমুল আলম, দেলওয়ার হোসেন, কুমারী বীণা সেন, স্যামুয়েল জনসন, মীজানুর রহমান, হাসান আলী, আশরাফ সিদ্দিকী, মো: দিলওয়ার আহমদ চৌধুরী, মকবুল হোসেন, শেখ আমজাদ আলী, সৈয়দ আবদুল হামিদ, শ্রী রণজিৎ কুমার সিকদার, এম. আকরব আলি, আনোয়ারা রহমান, ডা. সৈয়দ আমির হোসেন, সুবিমল চৌধুরী, হাবীবুর রহমান, সৈয়দ রফিক আহমদ, এ.কে. জয়নাল আবেদীন, পরিমলেন্দু ঘোষ, মহেন্দ্রচন্দ্র বর্মণ,

ফয়েজ আহমদ, শেখ মোজাফফর হোসেন, মুরতাজা খান মজলিস, আফতাবুন্নেসা, মোহাম্মদ আবদুল হক, মোহাম্মদ হাসান জান, সৈয়দ আবদুস সুলতান, এম. খায়রুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবদুর রহিম, রসবালা বর্ম্মণ, এস. ওয়াজেদ আলি, আবদুল হালিম চৌধুরী, এম. নূরুল ইসলাম, গোলাম রহমান, হিরণকুমার গুপ্ত, এম. আতীকুল্লাহ, মোহাম্মদ মোসলেম মিঞা, মোহাম্মদ আবদুল খালেক মজুমদার, মোহাম্মদ নূরউদ্দীন, নাজিমউদ্দীন আহমদ, রওশন জাহান বেগম, মোহাম্মদ আজিজুল হক, শ্রী অরবিন্দ গুহ, নূরুন্নাহার, আমিন আহমদ, অধীর দাস, বদরুল হাসান, নাজিমউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ আহসানুল হক ; শ্রী মুরারীমোহন বিশ্বাস,

রোকনুজ্জামান, কাজী আবুল হোসেন, মজহারউদ্দীন ভূঁইয়া, বেগম সালেহা খাতুন, শ্রী নীলরতন দাস, ছৈয়দ মোহাম্মদ মকসুদ আলি, আবদুল মজিদ, জোবেদা রহিম, হেমন্তকুমার সেন, সৈয়দ ফজলুল করিম, ইজাবউদ্দীন আহমদ, সুধাংসুশেখর চৌধুরী, বেগম জেবু আহমদ, মোহাম্মদ বজলুর রশীদ, শওকত ওসমান, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কাজী নূরুল হক, ফররুখ আহমদ, মশ্‌উদুর রহমান, কাজী শামসুল ইসলাম, মুফাখখারুল ইসলাম, আবদুর রশীদ, সেলিনা পন্নী, আবদুল গফফার চৌধুরী, খালেকদাদ চৌধুরী, কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ, বেগম সুফিয়া কামাল, মবিনউদ্দীন আহমদ, মনসুর আহমদ, বজলুর রহমান, আবদুর রশীদ খান, আলতাফ হোসেন, একরামুল হক, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নীলিমা বসু, মাহমুদা খাতুন, সুলতান আহমদ, ইলা মজুমদার, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবুল কাসেম, আশরাফ আলি, শেখ হবিবর রহমান, মঈনুদ্দীন, আনোয়ারা

www.pathagar.com

চৌধুরী, আবুল হোসেন, কল্পনা সরকার, মোহাম্মদ জসীমউদ্দীন, আনোয়ার হোসেন, জাহানারা হায়দার, কল্যাণী ঘোষ, বেলায়েত হোসেন, কে.এম. শমসের আলি, আবদুল করিম, আশালতা বসু, আনোয়ারা বেগম, আতাউর রহমান, শ্রী নীহারকান্তি ঘোষ, শামসুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ মাহবুবউল হোসেন, রমেন রায়চৌধুরী, মুহম্মদ ওয়াজেদ আলী, শ্রী সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, লুৎফর রহমান,

সরদার ফজলুল করিম, সুশীল রায়, শ্রী অমল সেন, মামুন আহমদ, আকরম হোসেন, লায়লা খানম, গীতা দাশগুপ্ত, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, কামাল চৌধুরী, আবদুল্লাহ ফারুক, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষারকণা মিত্র, আবদুল কাদের, যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সুষমা মিত্র, রাবেয়া আলম, মোহাম্মদ মতিয়র রহমান এর নাম।

প্রধান লেখক ও কবি সুনির্মল বসু, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান, হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ নাসির আলি, কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ, এম. আকবর আলি প্রমুখ প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই লিখেছেন। এর কবিতা, ছড়া, গল্প শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে। আহসান হাবীবের এই কবিতাটি বাঙলা-পাঠ্য বইয়ে বছরের পর বছর পড়েছে শিশুরা— 'আমাদের গ্রামখানি/ছবির মতন।/ মাটির তলায় এর ছড়ানো রতন।...'[৯]

আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছিলেন—'নিমন্ত্রণ'—(জসীমউদ্‌দীনের প্রভাবে?) :

শহরবাসী! শহর বাসী, ভাইবোনেরা মোর—/তোদের কথাই ভাবছি বসে দিবস-নিশি ভোর!/ টুপটুপটুপ শালের বনে বৃষ্টি যখন ঝরে/ তোদের কথাই স্বপন দেখি মার বিছানার পরে।[১০]

সুনির্মল বসুর অনেক অনেক কবিতা শিশু-সওগাতের পাতাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর 'ষোল আনাই ফাঁকি' কবিতাটি বাঙলার শিশুরা যে পড়েছে যুগের পর যুগ—"পূজার ছুটির শেষে/বিজনবাবু নদীর পথে চলেছিলেন দেশে।'

তাঁরপর সাঁতার জানেনা বলে মাঝি বলেছিল যে তাঁর জীবনটার ষোল আনাই মিছে, অথচ এতক্ষণ বিজনবাবু নানা ভাবে এটা জানো না, ওটা পারো না বলে মাঝির জীবনটা আনায়-আনায় সবটা ফাঁকিতে পুরে রয়েছে বলেছিলেন। সেই ব্যঙ্গ-কবিতাটিসহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮০তম জন্মদিনে কিশোর-বঙ্গ রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে পঠিত 'শিশু রবির প্রতি শিশু মহল' শীর্ষক কবিতাটি ১৩৪৮ এর আষাঢ় সংখ্যায় ছাপা হয় :

বন্ধু রবি, তোমার নাকি বয়স হলো আশি?
বাংলাদেশের আমরা শিশু তোমায় ভালবাসি।
মোদের যত অভিভাবক, বাবা জ্যাঠা খুড়ো,
পাকা দাড়ির বহর দেখে তোমায় ভাবে বুড়ো,
কিন্তু মোদের নজরেতে পড়লে ঠিকই ধরা,
আসল বুড়ো নয়ক, তুমি, বুড়োর মুখোস পরা।[১১]

তথ্যনির্দেশ

১. মানুষের গৌরব (সম্পাদকীয়), শিশু-সওগাত, ১০ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪।

২ অহিংসা, উপরিউক্ত, ১ বর্ষ, মাঘ ১৩৫৪।

৩. সত্যনিষ্ঠা, উপরিউক্ত, পৌষ ১৩৫৪।

www.pathagar.com

৪. বিশ্বভ্রাতৃত্ব, উপরিউক্ত, ৯ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৫৩।
৫. নবযুগের সূচনা, উপরিউক্ত, ফাল্গুন ১৩৫৩।
৬. মানুষ, সম্পাদকীয়–আলোচনা, উপরিউক্ত, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩।
৭. দেশপ্রেম, উপরিউক্ত, আষাঢ় ১৩৫৩।
৮. সাম্য, উপরিউক্ত, আশ্বিন ১৩৫৩।
৯. আহসান হাবীব, আমাদের গ্রাম (কবিতা), শিশু–সওগাত, ৫ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৯।
১০. আশরাফ সিদ্দিকী, নিমন্ত্রণ, উপরিউক্ত, ৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫২।
১১. সুনির্মল বসু, শিশু রবির প্রতি শিশু মহল (কবিতা), উপরিউক্ত, ৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৮।

www.pathagar.com

৩০. গুল্‌-বাগিচা
(কলকাতা, ১৩৫০-৫৪)৬

এটি প্যাকিস্তান-পন্থী, কিন্তু 'ছোটদের সচিত্র মাসিক' পত্রিকা। 'গুলবাগিচা'র তৃতীয় বর্ষের কয়েকটি সংখ্যা পাওয়া গেছে। ফলে জানা যাচ্ছে যে ১৩৫০ থেকে (১৯৪৩) সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ বা স্বাধীনতাপূর্ব পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়—যার সম্পাদক ছিলেন আবদুল ওহাব সিদ্দিকী। ম্যানেজার ছিলেন গাজী মঈনুদ্দীন আহমদ।

অফিসের ঠিকানা : ১৭, হায়াৎ খাঁ লেন, কলকাতা। প্রাপ্ত তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫২, তৃতীয় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫২ এবং চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৩ চিহ্নিত। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন সম্পাদক নিজে। মণ্ডল প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন, কলকাতা থেকে ছাপা হয়।

এর বৈশিষ্ট্য হলো : জিন্নার পরিবর্তে, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ছবি ছেপে তাঁকে 'গুল্‌-বাগিচা'র 'নেগাহবান' (পৃষ্ঠপোষক?) বলা হয়েছে। বার্ষিক মূল্য ছিল আড়াই টাকা। প্রতি সংখ্যা চার আনা।[১]

তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩৫২) মঈনুদ্দীন এর 'মোরা বীর শিশু-মুসলমান' কবিতা—'গুলবাগিচার বুলবুলি আমি সুবিহ্‌-উমিদের গাহিয়া গান/ফুলের গেলাসে মধু ভরি নিতি সোনা-মণিদের করাই পান"...ছাপা হয়। অন্যান্য লেখক হলেন বেগম জেবু আহমদ (কবিতা—বাঙলার গ্রাম) ; আবদুল করীম (গল্প, শাহজাদার শিক্ষক, ইতিহাসের কথা) ; সিকান্‌দার আবু জাফর (ছোটদের উপন্যাস, নরমাংসের দোকান, ধারাবাহিক রচনা) ; মজহারউদ্দীন ভূঁইয়া (গল্প, মুদীবৌ) ; আবুল মিসবাহ (প্রবন্ধ, মুর্শিদাবাদের সেকাল ও একাল) ; সুধাংশুরঞ্জন চক্রবর্তী (জ্ঞানের কথা, জেনে রাখা ভাল) ; এস. করীম (গল্প, জ্ঞানের বাহাদুরী) ; এবং মুসাফির (সংবাদিকা, এ-মাসের কলকাতা)। 'আরব দেশের ছেলেমেয়ে' এবং 'বাগিচা মজলিসে' বিভিন্ন শিশু সংগঠনের (বাগিচার) পরিচয় দেয়া হয়েছে।

মুসলিম বাঙলার একজন প্রধান চিন্তক আবদুল মওদুদের (এম. এ. বি.এল., তিনি পাকিস্তানের একজন বিচারপতি ছিলেন) একটি উপদেশাত্মক গল্প 'মরণ কেউ বরণ করতে চায় না' গুলবাগিচায় (৩/২) ছাপা হয়েছিল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জীবন-কথা ছাপা হয়েছিল 'ধূলায় যাঁরা গড়েছেন তাজ' শিরোনামের নিচে। টুকরো হাসি, ডাকের বাক্স, সম্পাদকের কথা প্রভৃতিও অন্যান্য মাসিকপত্রের ন্যায় ছাপা হতো।

প্রাপ্ত তিনটির দুটি সংখ্যায়ই ফররুখ আহমদের কবিতা আছে, যেমন—"কোন্‌টা আসল কোন্‌টা মেকী;

কোন্‌টা মুগুর কোন্‌টা ঢেঁকী
জানিস তা কি জানিস তা কি?
দেখছি যখন জানি সবই
জানে হাবা পচা ববি
জানতে কিছু নাইকো বাকী।"[২]

এবং 'বুলবুলিদের কণ্ঠে যেমন নতুন সুরের জোয়ার ওঠে,...'[৩]

www.pathagar.com

সিকান্‌দার আবু জাফরের 'নর মাংসের দোকানে'র বাকী অংশ ছাপা হয় ৩ বর্ষ, ৩ সংখ্যায়। আবদুল আলীম রাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (গল্প, এক লাখ টাকা এত কম?) ; একরামুল হক (প্রবন্ধ, কলের গাড়ীর কথা) ; আশরাফ সিদ্দিকী (কবিতা, এক যে ছিলো রূপকথারই পুরী) ; গোলাম রহমান (গল্প, বোকামির ফল) ; জয়নাব আখতার (গল্প, যখন আমরা আদরের জিনিস হারাই) ; মুফাখ্‌খারুল ইসলাম (কবিতা, ওদের সাথে আড়ি) ; আহসানউল্লাহ এম.এ. (কবিতা, কে তাদের তেল আর জল) গুলবাগিচার প্রাপ্ত অন্য দুটি সংখ্যার লেখক।

শিরোনাম থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, শিশু-কিশোরদের পত্রিকায়ও মুসলিম সাহিত্যিকগণ পাকিস্তান আন্দোলনের সাহিত্যিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আবদুল মওদুদ 'হক-ইন্‌সাফ' নামে গল্প লিখেছেন—যার চেতনা রাজনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়-বিচার। বাঙলার মন্ত্রীসভার ওপর আলোচনা প্রভৃতিও হতো। শিশুদের পত্রিকার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিশুদের সংগঠন গড়ে তোলার কাজ 'আজাদের' বাগবান (মোহাম্মদ মোদাব্বের পরিচালিত) এর আদর্শে করা হচ্ছিলো। মুসলিম সম্পাদকদের কিশোরদের পত্রিকা-প্রয়াস সাতচল্লিশের অনেক পূর্বেই দেখা দিয়েছিল। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (পরে ডক্টর) সম্পাদিত 'আঙ্গুর' (১৯২০) এবং এ.কে. ফজলুল হক সম্পাদিত ১৯০১ সনে বরিশাল থেকে প্রকাশিত 'বালক' (সাপ্তাহিক)-এর কথা এখানে স্মরণীয়। ফজলুল হকের 'বালক' নামকরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের (ঠাকুর পরিবারের) 'বালক' এর প্রভাব থাকা অসঙ্গত নয়।

সে যাহোক, 'শিশু-সওগাত', 'গুলবাগিচা', সিলেটের 'সবুজ পতাকা', আজাদ' এবং 'গুলিস্তাঁ', মোহাম্মদীর শিশু-কিশোরদের বিভাগ প্রভৃতি অপরাপর পত্রিকা শিশুদের সাহিত্যিকভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলার ব্রত গ্রহণ করে যে—গুলবাগিচা তাঁদেরই সহযাত্রী ছিল।

তথ্যনির্দেশ

১. 'গুলবাগিচা'র কয়েকটি সংখ্যা ঢাকার বাংলা একাডেমী-র শহীদুল্লাহ গবেষণা কক্ষে রক্ষিত আছে।

২. মঈনুদ্দীন, মোরা বীর-শিশু মুসলমান (কবিতা), ফাল্গুন ১৩৫২।

৩. ফররুখ আহ্‌মদ, আসল ও মেকী (কবিতা), ৩ বর্ষ, ৩ ও ৪ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫২ ও বৈশাখ, ১৩৫৩।

www.pathagar.com

•

৩১. সবুজ-পতাকা

(সিলেট, ১৩৪৯—)

'সিল্‌হেট মুকুল মেলার মুখপত্র' ঈদ সংখ্যা সবুজ-পতাকা নজরুলের জনপ্রিয় ও মুসলমানদের আবেগমথিত গান—'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ' প্রচ্ছদে নিয়ে প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৯৪২, আশ্বিন ১৩৪৯, হিজরী ১৩৬১ তে। সম্পাদক : এমাদউদ্দীন আহমদ। দর্শনী ছয় আনা। মোঃ আবদুস সাত্তার কর্তৃক সিলেটের শক্তি প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।[১] এটিও কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নার ১০ জুলাই ১৯৪২ তারিখের শুভেচ্ছাবার্তা নিয়ে প্রকাশিত হয়। জিন্না তাঁর শুভেচ্ছাবাণীতে বলেন,

> I am glad to the young muslim students of sylhet have started a magazin– "Sabuj-Pataka". I hope that 'Sabuj-Pataka' will serve as a good midium not only for supplimenting the education of our young friends but also for the expression of their opinion in support of our national programme, national cread and national outlook–Pakistan.
>
> I wish its venture every success.

আরও শুভেচ্ছা জানান আবদুল মতিন চৌধুরী, সদস্য, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, ওয়ার্কিং কমিটি ও আসাম সরকারের অর্থসচিব। মুদব্বির হোসেন চৌধুরী, সেক্রেটারি, আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও আসাম সরকারের বেসামরিক দেশরক্ষা সচিব। মুনাওর আলী, আসাম সরকারের রাজস্ব-সচিব। 'বাগবান' (মোহাম্মদ মোদাব্বের, পরিচালক, মুকুলের মহফিল, দৈনিক আজাদ, কলকাতা) ও প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ এবং দৈনিক আজাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও মুজীবুর রহমান খাঁ, সহকারী-সম্পাদক, দৈনিক আজাদ। আরও অনেকে শুভেচ্ছা পাঠান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট-এর তৎকালীন সদস্য আলহাজ্ব দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী বি. এ. বিদ্যাবিনোদের শুভেচ্ছা বাণীটি ছিল নিম্নরূপ :

> 'সবুজ-পতাকা' পাকিস্তান-আদর্শের সমর্থক বলিয়া আমি তাহাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাইতেছি। কিন্তু কেবল রাজনৈতিক মতবাদে পাকিস্তানী হইলে চলিবে না। আমাদের মজহব, লেবাছ-পোষাক, ভাষা ও কালচার সর্বত্র পাকিস্তান-আদর্শ কায়েম করিতে হইবে। মুসলিম তরুণেরা রাজনীতির সঙ্গে যখন নামাজ ও রোজার পাবন্দ হইয়া হজরত রসুলুল্লাহ্ (দঃ) ও হজরতে ছাহাবা কেরামের (রঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে, তখনই প্রকৃত পাকিস্তান সার্থক হইবে। আবার আমাদের লুপ্ত বাদশাহাৎ ও শানশৌকত্ ফিরিয়া আসুক, ইহাই আল্লাহর দরগায় দোয়া করিতেছি! আমীন।[২]

সবুজ-পতাকায় কবিতা লিখেছিলেন—জসীমউদ্‌দীন, আবদুর রাজ্জাক, মকবুল আহমদ খান, বেগম রিজিয়া খাতুন, আবদুল গফফার চৌধুরী, উস্তায়ারউদ্দীন আহমদ, এস. এম. মফিজ, সায়েমা খানম চৌধুরী, এস. এম. ছেরাজুল হক ও মোহাম্মদ আবদুল বারী।

গল্প লিখেছিলেন—এম. শওকত আলী, বেগম সেলিমা পন্নী, সৈয়দ শাহাদাৎ হোসেন, আবু ইমাম ও রওশন আরা বেগম। গদ্য-প্রবন্ধকারগণ হচ্ছেন আবুল কালাম চৌধুরী,

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আজিজুস সামাদ, মৌ: মুহম্মদ নূরুল হক, বেগজাদী মাহমুদা নাছীর, আবদুস সালাম চৌধুরী ও ছাজিদুল রব চৌধুরী।

এঁরা ঈদের চাঁদের বৈশিষ্ট্য ; মুসলমান সমাজে বিদ্যমান কুসংস্কার প্রভৃতির ক্ষতিকর প্রভাব ; পাকিস্তানের আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর একাঙ্ক নাটক—'মুছাফির খানা' সবুজ-পতাকায় ছাপা হয়। পত্রিকাটি শিশু-সাহিত্যের বিবেচনায় বিশেষত মুসলমান সমাজে, ভালো মানের বিবেচিত হয়েছিল।

তথ্যনির্দেশ

১. একটি তথ্য উল্লেখ বাঞ্ছনীয় : আলোচ্যকালের অধিকাংশ বাঙলা পত্রিকায় প্রেসের নাম ঠিকানা, মুদ্রক, প্রকাশক প্রভৃতি প্রিন্টার্স লাইনে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করা হতো।

২ দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরীর শুভেচ্ছাবাণী, সবুজ-পতাকা, ঈদ-সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৯।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুসলিম-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষীর ধারায় এবং রাজশেখর বসু, মোহিতলাল মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের সঙ্গে সম্মিলিত সাধনায় বিশ শতকের বাঙালির ভাবনা-চিন্তায় যুগান্তর সাধন ও নতুন সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন।

এরই ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এমন উৎকর্ষ ঘটে যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকের মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের বিচারে কয়েকটি ভাষা সাহিত্যের সমকক্ষ না হতে পারলেও ভারতের সকল ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতো বটেই, জাপান, চীন, ইন্দোচীন, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সাহিত্যের থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।

এদেশে ইংরেজ শাসন ও সে সুবাদে ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাবেই তা হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ইংরেজ শাসনের প্রভাব তো বিশ্বের আরো বহু দেশেই পড়েছিল। তাই না মেনে উপায় নেই, বাঙালির সাধনার ঐকান্তিকতায় এবং মেধার কৌলিণ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (এমনকি নোবেল প্রাইজ লাভের সৌভাগ্যও বাংলার হয়েছিল)।

বিষয় চিন্তা ও প্রকরণগত দিক থেকে বিশ্বসাহিত্যের প্রায় সর্বপ্রকারের নিদর্শন উজ্জ্বল না-হলেও বাংলায় পাওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। তখন কলকাতাই ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র। সমাজে এই সাহিত্যের প্রভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কিংবা আর্থিক নিশ্চয়তার যে দাবি সোচ্চার হয়েছিল, তার প্রভাবে মুসলিম সাহিত্যসমাজে তথা মুসলিম সম্পাদিত সাহিত্য ও সংবাদ-সাময়িকপত্রেও নবজাগরণের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

মুসলিম রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষগণ ইউরোপীয় রেনেসাঁস এবং বেঙ্গল রেনেসাঁসের মূলমন্ত্র 'বুদ্ধির মুক্তি' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'ধর্ম' কি আর 'অধর্ম' অথবা 'মনুষ্যত্বহীনতা' কাকে বলে কিংবা মানুষের কাছে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা কী হওয়া উচিত—এসব নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

অবশ্যই তাঁরা তা নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন 'মানবতাবাদ' ও 'মানববাদ'—আর মানবিক চাহিদার বিচারের ভিত্তিতে, বাস্তবজগতের সহায়ক দার্শনিক-চিন্তার ও বিবেচনার কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে। ফলে এইসব সাহিত্যিক-দার্শনিকদের রচনাবলিতে মানবতাবাদী চিন্তা রূপায়িত হয়ে 'বাঙলার নবজাগরণ' বাঙলা-সাহিত্যে এবং বাঙালি-সমাজে গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

কারণ ইসলাম ধর্মের অনুশাসনের কঠোর শৃঙ্খলে উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে মানুষের ও মানবতার উপরে ঠাঁই হয়েছিল ধর্মের। মানুষের কল্যাণের জন্য ইসলাম, নাকি ইসলাম ধর্মের সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য মানুষ—এই বিবেচনায় প্রাধান্য পেয়েছিল ইসলামের জন্য 'শাহাদৎ' বরণের মাহাত্ম্য। 'শহীদ' হয়েও বিবেচনাহীন কঠোর সাধনার নামে ধর্মকে রক্ষা করতে হবে, ধর্মের অনুশাসন মানতে গিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলেও আফসোসের কারণ ঘটবে না,—এই চিন্তা মানুষকে, মনুষ্যত্বকে গ্রাস করে ফেলেছিল। বিশেষ করে ওহাবী আন্দোলনের প্রভাবে মানুষ বাধা পড়েছিল ধর্মের অলঙ্ঘনীয় কঠোর নিগড়ে।

মানুষকে, মনুষ্যত্বকে এবং মানবের আত্মাকে ধর্মের কারাভ্যন্তর থেকে মুক্তিদানের জন্য এইসব বাঙালি মুসলমান মনীষী তাই তাঁদের পত্রিকাগুলোকে অবলম্বন করে সাহিত্যকর্মে উৎসর্গ করেছিলেন আপন জীবনকে ; জ্ঞানের সাধনায় তাঁরা অনেকটা সন্ন্যাসধর্ম বরণ করেছিলেন। ফলে বাংলা সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডারে এইসব লেখক রচিত সাহিত্য স্বতন্ত্র ঔজ্জ্বল্যে আলোকিত এক মূল্যবান সম্পদরূপে সংযোজিত হয়েছিল। এঁদের বাহন হয়েছিল একালের সকল প্রধান বাংলা সাহিত্যপত্রিকাই।

কিন্তু একান্তভাবে মুসলমানদের দ্বারাই সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাগুলোকে অবলম্বন করে অল্প-শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত, সাধারণ লেখক ও নতুনের উদ্ভাবক মনীষী-ভাবুক সকল মুসলমান লেখক একযোগে যে কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার ফল ভালোই হয়েছিল দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই 'ভালো' বা কল্যাণকর ভূমিকার বিষয়টি বহুমুখী জটিল আলোচনা এবং বিতর্কের মধ্যে নিমজ্জিত আছে। কারণ, মুসলিম-রচিত সাহিত্য বা মুসলিম সাহিত্য যখন বাংলা সাহিত্যের মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হলো, তখন নতুন এক উপসর্গও সৃষ্টি হলো—তাহলো মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী, উগ্র ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী চিন্তাধারার সমর্থক রাজনৈতিক কর্মাবলি এবং তার বিপরীতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই উপসর্গ থেকেই পাকিস্তানের সৃষ্টি, বাঙলার বিভক্তি এবং হিন্দু-মুসলিমের জীবনে নতুন আনন্দ বেদনাপূর্ণ অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি।

আলোচ্য সময়কালে বা বিশ-ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে প্রকাশিত প্রধান মুসলিম-পত্রিকাগুলোর দ্বারা বাঙালি মুসলমান সমাজে 'শিখা'র রেনেসাঁসপন্থী চিন্তা-চেতনার যে সর্বব্যাপী প্রভাব পড়া উচিত ছিল, অর্থাৎ নব্যশিক্ষিত আলোকপন্থী মুসলমান লেখকেরা যেসব বাণী প্রচার করতে চেয়েছিলেন, একালের সাধারণ মাপের মুসলমান লেখক ও পাঠক মুসলমানেরা বিদ্যা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির (আউটলুক) অভাবে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। মোহাম্মদী, আল্-ইসলাহ্, প্রভাতী, আল-আমান প্রভৃতি পত্রিকা তার প্রমাণ।

মুসলিম রচিত সাহিত্যপাঠ ও আলোচনা এবং মূল্যায়নকালে বিশেষভাবে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হয় যে, মুসলমান সমাজে দ্বিতীয় প্রজন্মের শিক্ষিতের সংখ্যা যখন

www.pathagar.com

বাড়ছিল, তখন তাঁদের উপর আধুনিক শিক্ষা ও বাঙলার রেনেসাঁসের প্রভাব পড়তে পারতো। কিন্তু তাঁদের মনোযোগ রাজনৈতিক কারণে, ১৯৩০, ৩১ ও ৩২ সনের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের সিদ্ধান্তের ফলে ব্রিটিশ ও হিন্দুদের থেকে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পরিণত হল এবং শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান ১৯৩৫ সনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আইনের খবরে নিশ্চিতভাবে বুঝলো যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের দরুন তাঁরাই বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা পাবে ১৯৩৭ থেকে।

লক্ষণীয়, ঠিক এই সময়েই (১৯৩৭, তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা) 'মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব' পর পর চার বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। এতে নব্যশিক্ষিত মুসলিম-সমাজ স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠলো। অবশ্য এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৩০ এর আগেই। স্বদেশী-আন্দোলন এবং ১৯০৬ এ মুসলিম-লীগ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কালের বাঙলার রাজনৈতিক ঘটনাবলির আলোচনা (অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) স্মরণে রেখে ১৯২৮ এর প্রজাস্বত্ব আইন পাশ, মোহাম্মদীর 'শ্রী ও পদ্ম' প্রতীক (মনোগ্রাম) অপসারণের আন্দোলন, বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে মুসলমানদের জন্য অপমানজনক ও আপত্তিকর অংশ প্রত্যাহারের দাবি, ঋণ-শালিসী বোর্ড স্থাপন প্রভৃতির পরিণতিতে ১৯৪০ নাগাদ 'পাকিস্তান' আদায়ের জন্য জঙ্গী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যে এর সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। মানবতাবাদী, উদারনৈতিক প্রগতিশীল চেতনাধারা তখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অন্তত ১৯৪৭ নাগাদ তা স্তিমিত হয়েই ছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রাপ্তির পর মুসলমানদের মধ্যে সুপ্ত প্রগতিশীল যুক্তিবাদী ঐহিক ভাবনার বিকাশ আবার লক্ষ্য করা গেল ভাষা-আন্দোলনের সময়ে, পাকিস্তানের প্রতি মোহভঙ্গের মধ্য দিয়ে।

উল্লেখ্য, অশিক্ষিত মুসলমানদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রে ইসলামি মনোভাব প্রকাশের কোনো সুযোগ ইতিপূর্বে তেমন ছিল না। গাঁয়ে গাঁয়ে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে মুসলমানের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষা যখন থেকে শুরু হলো তখনকার শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান লেখকেরা ১৮৯০ এর পরে জন্মগ্রহণকারী। এঁরা ১৯২৫-২৬ পর্যন্ত শিক্ষিত হন। এঁদের লেখাপড়ায় সাফল্যের খবর পত্রপত্রিকায় ছবি দিয়ে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে এ সময়েই। হুমায়ুন কবির, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের বিষয়ে অনেক আলোচনা ঐকালের পত্রিকায় পাওয়া যায়।

যাহোক, একালে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা দ্রুত কিভাবে বাড়তে থাকে, তার কারণ ভূমিকাংশে ব্যাখ্যা করা আছে। প্রতিবাদী হতে হলে যে শিক্ষাদীক্ষার দরকার, তা অর্জনের পর তাঁরা নিজেদের সংস্কৃতি ঈমান এবং আকিদার বিরুদ্ধে, সোচ্চার আন্দোলন আরম্ভ করলেন। ১৯৩৭ সনে এক কালের 'প্রজা'রা জমিদার মহাজন ঠাকুরেদের প্রভু হয়ে দাঁড়ালেন। চিরকালের নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র নিরক্ষর প্রজাকূল মুসলমানদের তখন আনন্দ গৌরব গর্ব ও উত্তেজনার সীমা পরিসীমা ছিল না। আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো তাঁদের জাতীয় জীবনে। ফলে বাংলা সাহিত্য মুসলমানদের আত্মপ্রত্যয় আত্মবিশ্বাস গৌরব গর্ব আনন্দ ও উত্তেজনাপূর্ণ নতুন মনমেজাজ চিন্তাচেতনার লৈখিকরূপের ধারক-বাহক হলো যেমন, তেমনি হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ মানবিকতাবিরোধী ধ্যান-ধারণারও আধার হয়েছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু ভালোর সঙ্গে মন্দ সব সময়ই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। মন্দের সঙ্গে ভালোকে সব সময়ই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে জয়ী হতে হয়। বাংলা সাহিত্য তার মন্দ অংশকে সব সময় পরিহার প্রত্যাহার করে, ভালো অংশের চর্চায় ভাবীকালের পাঠককে আবাহন জানিয়ে এসেছে। আসছে এবং আসবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলিম অবদানের মন্দ অংশ হারিয়ে যাবে, টিকে থাকবে মানবতাবাদী আধুনিক-মনস্ক শৈল্পিক ভাবনায় সমৃদ্ধ অংশ। তাতে একালের মুসলমান কবি সাহিত্যিক সম্পাদক ও সাময়িকপত্রসেবীদের অবদান উজ্জ্বল হয়েই শোভা বর্ধন করবে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ক

নির্বাচিত গ্রন্থ প্রবন্ধ ও পত্রিকা-পঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

অন্নদাশংকর রায়—সংহতির সংকট, কলকাতা, ১৯৮৪।

অমলেন্দু দে—বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলকাতা, ১৯৭৪।

পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলকাতা ১৯৭৩।

স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা প্রয়াস ও পরিণতি, কলকাতা ১৯৭৯।

অজিত কুমার ঘোষ—বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, কলকাতা, ১৯৬৮।

অতুল সুর—৩০০ বছরের কলকাতা : পটভূমি ও ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯১।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কল্লোলযুগ, কলকাতা, ১ম সংস্করণ ১৩৫৭, ৭ম প্রকাশ ১৩৯৫।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—বীরবল ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৯৮৫।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য—বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন, কলকাতা, ১৯৭১ (১৩৭৮)।

অসিতকুমার রায়—ভারত ছাড়ো আন্দোলন : কয়েকটি বিতর্কিত প্রশ্ন, কলকাতা, ১৯৯৩।

অশোককুমার কুণ্ডু—পত্রিকাপঞ্জী, কলকাতা, ১৩৮৯।

আশু চট্টোপাধ্যায়—কল্লোল যুগের পরে, কলকাতা, ১৯৯৩।

আহমদ শরীফ— বিচিত চিন্তা, ঢাকা ১৯৭৫ (২য় সং) ; বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ ও ২ খণ্ড), ঢাকা, ১৯৭৫ ও ১৯৮৩ ; মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা (মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে) ৪র্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৮৩ ; আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ঢাকা, ১৯৮৭ ; বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি, কর্নেল তাহের সংসদ, ঢাকা, ১৯৮৯ ; শিক্ষা : সেকালে ও একালে (নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা) ঢা. বি. ১৯৯০।

আনিসুজ্জামান—মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪ ; মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, ঢাকা, ১৯৬৯ ; স্বরূপের সন্ধানে, ১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৭৬।

আবুল কাসেম ফজলুল হক—উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৭৯ ; আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে, ঢাকা, ১৯৯৩।

আমিনুল ইসলাম—বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪।

আবদুল করিম—বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল (২য় সং, ১৯৯৪), ঢাকা, ১৯৮৭।

আহমদ ছফা—বাঙালী মুসলমানের মন, ঢাকা, ১৯৮১।

আতোয়ার রহমান—বাংলাদেশের শিশু-পত্রিকা, ঢাকা, ১৯৭৭।

আনন্দবাজার প্রকাশন—আনন্দসঙ্গী, ২য় সং, কলকাতা, ১৯৭৫।

www.pathagar.com

আবদুল হক—সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ (২য় সং), ঢাকা, ১৯৭৬ ; নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৮৪ ; ভাষা-আন্দোলনের আদি পর্ব, ঢাকা (২য় সং), ১৯৮৪।

আবুল কালাম আজাদ—ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, বাংলা সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৪।

আবদুল কাদির (সম্পাদনা)—রোকেয়া-রচনাবলী, (২য় মুদ্রণ), ঢাকা, ১৯৮৪ ; মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী, ঢাকা, ১৯৬৩।

আবুল হুসেন—বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা, ঢাকা, ১৯২৬।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী—মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য, ১৯২২ (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত)।

আহসানউল্লাহ (খানবাহাদুর)—বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য, যশোর, ১৯১৮ ; শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান, কলকাতা, ১৯৩০।

আবুল হাশেম খান চৌধুরী—শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদিগের দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকারের উপায়, চট্টগ্রাম, ১৯৩০।

আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী—স্ত্রী-শিক্ষা, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯১৪।

আবুল হোসেন (সৈয়দ, ডাক্তার)—বঙ্কিম-সমালোচনা, কলকাতা ১৯২২/২৭ (৬টি স্বতন্ত্র বইয়ে বঙ্কিমের বিভিন্ন উপন্যাসের সমালোচনা করেন তিনি)।

আবুল মনসুর আহমদ—আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ১৯৬৪।

আবুল ফজল—নির্বাচিত প্রবন্ধ, ঢাকা, ১৯৮১ ; সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী, ঢাকা, ১৯৮০।

আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য—বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা (২য় সং), ১৯৮১।

আবু জাফর—মওলানা আকরম খাঁ, ঢাকা, ১৯৮৬।

ইন্দু মিত্র—ইতিহাসে আনন্দবাজার, কলকাতা, ১৯৭৫।

উইলিয়াম হান্টার—দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস (আবদুল মওদুদ অনূদিত), ঢাকা, ১৯৬৪।

ওয়াকিল আহমদ—উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা (১-২ খণ্ড), ঢাকা, ১৯৮৩ ; মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা, ঢাকা, ১৯৯৪ ; বাঙলীর চিন্তাধারা : আধুনিক যুগ (সম্পাদনা) ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০ ; বাঙলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ২য় সং, ঢাকা, ১৯৮৭ ; সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৮ ; বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, ঢাকা, ১৯৮৯ ; বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত (১-২ খণ্ড), ঢাকা, ১৯৭৪ ও ১৯৯২।

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র : সঞ্জীবনী (সংকলন ও সম্পাদনা), কলকাতা, ১৯৮৯।

কাজী আবদুল মান্নান—আধুনিক সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, ১৯৬১/১৯৬৯।

কাজী আবদুল ওদুদ—বাংলার জাগরণ, কলকাতা, ১৯৫৬ ; শাশ্বত বঙ্গ (২য় সং), ঢাকা, ১৯৮৩।

কেদারনাথ মজুমদার—বাংলা সাময়িক সাহিত্য, ময়মনসিংহ, ১৯১৭।

কে.এম. আবদুল আলীম—ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৬।

কাজী দীন মুহম্মদ—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১-৪ খণ্ড), ঢাকা, ১৯৬৮-৭০।

খোন্দকার সিরাজুল হক—মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, ঢাকা, ১৯৮৪।

গোপাল হালদার—বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (১-২ খণ্ড), বাংলাদেশী সং, ১৯৮৭।

গৌতম ভট্টাচার্য—বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৯৯৩।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত)—সংহতি লাঙল গণবাণী, কলকাতা, ১৯৯২।

www.pathagar.com

চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য—মুক্তির সংগ্রামে ভারত, কলকাতা, ১৯৮৯ (২য় সং)।
জীবেন্দ্রসিংহ রায়—কল্লোলের কাল, কলকাতা, ১ম সং, ১৯৭৩ ; দে'জ সং, ১৯৮৭।
প্রমথ চৌধুরী (সবুজপত্রের ইতিহাস)—কলকাতা, ১ম সং, ১৯৫৪ ; ব্যবহৃত সংস্করণ ১৯৮৬।
তারাপদ পাল—ভারতের সংবাদপত্র, কলকাতা, ১৯৭২।
দিলওয়ার হোসেন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) —মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ, ঢাকা, ১৯৯৪।
নাজমা জেসমিন চৌধুরী—বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, ঢাকা, ১৯৮০।
নন্দরানী চৌধুরী—সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : শান্তিনিকেতন ১৯৮১।
নরহরি কবিরাজ—উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগরণ : তর্ক-বিতর্ক (সম্পাদনা), কলকাতা, ১৯৮৪ ; স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা, কলকাতা, ১৯৬১।
নির্মলেন্দু ভৌমিক—সাহিত্য পত্রিকার পরিচয় ও রচনাপঞ্জী, কলকাতা, ১৯৮৩।
নীরদচন্দ্র চৌধুরী—আত্মঘাতী বাঙালী, ২য় মুদ্রণ কলকাতা, ১৯৮৯।
নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (১-২ খণ্ড), ৩য় সং, কলকাতা, ১৯৮০।
প্রমথ চৌধুরী—বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪ ; প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৯০।
প্রভাত কুমার দাস—কবিতা পত্রিকা : সূচিগত ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৯।
প্রাণকৃষ্ণ দত্ত—কলিকাতার ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৯৮১।
পার্থ চট্টোপাধ্যায়—বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৫), কলকাতা, ১৯৭৭।
পাকিস্তান পাবলিকেশন্স প্রকাশিত—মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, ঢাকা, ১৯৬৬।
বিনয় ঘোষ—সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১-৫ খণ্ড, কলকাতা ; বাংলার নবজাগৃতি, কলকাতা, (২য় সং) ১৩৯১ ; বাংলার বিদ্বৎসমাজ, কলকাতা, ১৯৮৭ (৩য় মুদ্রণ)।
বাংলা একাডেমী প্রকাশিত—বাংলাদেশের সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৮৮।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম রচনাবলী, নবম মুদ্রণ, কলকাতা (সাহিত্য সংসদ), ১৩৯২।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িকপত্র, কলকাতা, ১ম খণ্ড, ১৩৪৬ ২য় খণ্ড, ১৩৫৮।
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, কলকাতা, ১ম খণ্ড, ১৩৩৯, ২য় খণ্ড, ১৩৪০।
সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গ-নারী, কলকাতা, ১৩৫৭।
ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, কলকাতা, ১৯৮২।
ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক-প্রবন্ধ (ভূদেব রচনাসংগ্রহ), জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮১।
মীনাক্ষী দত্ত—'কবিতা' (তিন খণ্ডে সংকলন ও সম্পাদনা), কলকাতা, ১৯৮৭, ৮৮ ও ৮৯।
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম—সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা, ১৯৭৭ ; আমাদের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৮৪।
মুনতাসীর মামুন—উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র (১-৭ খণ্ড), ঢাকা, ১৯৮৫-৯৭।
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম—সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক-প্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৯০।
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান—সাময়িকপত্রে সাহিত্য-চিন্তা : সওগাত, ঢাকা, ১৯৮১।
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন—বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকা, ১৯৮১।
মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া—বাংলাদেশের গবেষণা-পত্রিকা, ঢাকা, ১৯৯২।
মুহম্মদ ইদরিস আলী—বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে মধ্যবিত্তশ্রেণী, ঢাকা, ১৯৮৫।

www.pathagar.com

মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক—বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা : ত্রিশ বছরের প্রবন্ধপঞ্জী, ঢাকা, ১৯৮৯।
মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৬৪।
মুহম্মদ জাহাঙ্গীর—মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ঢাকা, ১৯৮৭।
মোতাহের হোসেন চৌধুরী—সংস্কৃতি-কথা, ঢাকা, ১৩৬৫।
রথীন্দ্রনাথ রায়—বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী, কলকাতা, ১৯৫৮।
রেজাউল করিম—পাকিস্তানের বিচার, কলকাতা, ১৯৪২ ; জাতীয়তার পথে, কলকাতা, ১৯৩৯ ; নয়া ভারতের ভিত্তি, কলকাতা, ১৯৩৫, বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, ১ম ও ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৪৪ ও ১৯৫৪।
রমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে সাম্যচিন্তা, কলকাতা, ১৯৮২।
রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, ১-৪ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৭।
রবিন পাল—কল্লোলিত ছোটগল্প, কলকাতা, ১৯৮৮ ; কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা, ১৯৮০।
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৮ (দে'জ সংস্করণ)।
রশীদ-আল ফারুকী—মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া, ঢাকা, ১৯৮৭ (২য় সং)।
রাখালচন্দ্র নাথ—উনিশ শতক : ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৮।
রাধারমণ মিত্র—কলিকাতা দর্পণ, কলকাতা, ১৯৮০/১৯৮৮।
লায়লা জামান—সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৮৯।
শাহরিয়ার ইকবাল—হুমায়ুন কবির, ঢাকা, ১৯৮৮।
শামসুজ্জামান খান (সেলিনা হোসেন সহযোগে) সম্পাদিত—চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।
শামসুল হক—বাংলা সাময়িকপত্র (দুই খণ্ড), ঢাকা, ১৯৭৩ ও ৮৪।
শশিভূষণ দাশগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের একদিক, কলকাতা, ১৯৬০ (৩য় সং) ; বাংলা সাহিত্যে নবযুগ, কলকাতা, ১৯৬২, ৬ষ্ঠ সংস্করণ।
শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ—পরিচয় এর আড্ডা, কলকাতা, ১৯৯০।
সত্যনারায়ণ দাশ—বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন-সাধনা, কলকাতা, ১৯৭৪।
সোনামণি চক্রবর্তী—শনিবারের চিঠি ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯২।
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত—ভারতের সাম্যবাদ (২য় সং), কলকাতা, ১৯৩১।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭৬।
সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১-৪ খণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০১-৩ ; ইসলামি বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৪০০।
সুনীল দাস—ভারতী : ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী, কলকাতা, ১৯৮৪ ; জয়শ্রী : সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ, কলকাতা, ১৯৮৩ (সম্পাদিত)।
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা (দুইখণ্ড), কলকাতা, ১৯৯০-৯১।
সৌম্যেন্দ্রনাথ বসু—বিদেশী ভারত সাধক, কলকাতা, ১৩৬৮।
সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৬০।
সৈয়দ আবদুর রব—নজরুল-নামা, ফরিদপুর, ১৯৮২।
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাদক)—বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৬।

www.pathagar.com

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী—উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ, ঢাকা, ১৯৮২।
সুখময় মুখোপাধ্যায়—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, কলকাতা, ১৯৫৮।
হরিপদ ভৌমিক—সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৭ ও ১৯৮৮।
হিরণকুমার স্যান্নাল—'পরিচয়' এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, কলকাতা, ১৯৭৮।
হুমায়ুন কবির—বাংলার কাব্য, ঢাকাই সংস্করণ, ১৯৭০ ; মোসলেম রাজনীতি, কলকাতা, ১৯৪৩।

প্রবন্ধপঞ্জি

নির্মল দাশ—একটি জোলো প্রসঙ্গ, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২ বর্ষ, ১৯৮১।
সৈয়দ খালেদ নৌমান—প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের মুসলিম-সম্পাদিত সাময়িকী, শারদীয় পরিবর্তন, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ ; সম্পাদক : অশোক চৌধুরী।

পত্রিকাপঞ্জি

অগ্রগতি—সম্পাদক : আশু চট্টোপাধ্যায়, ৩ বর্ষ, ১-৩৪ সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৪২।
ক্লিও—জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগের পত্রিকা, জুন, ১৯৮৮।
চাবুক (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : বঙ্কিমচন্দ্র সাহা, ঢাকা ১৯৩৩-৪৯ এর কয়েকটি সংখ্যা।
দেশ—সাহিত্য সংখ্যা, সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ, কলকাতা, ১৩৯৭।
দৈনিক আজাদ—ঈদ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৪৫।
নারী-শক্তি—সম্পাদক : ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, কলকাতা, (১৩২৯)।
পরিক্রম (মাসিক, ঢাকা)—৪ বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যা, সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম, ঢাকা, ১৩৭৪।
প্রাচী—সম্পাদক : সুচরিত চৌধুরী ও ওয়ালী আহমেদ, চট্টগ্রাম, ১৯৫৭।
প্রবাসী—৩০ ভাগ, ১ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৩৭।
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা—সম্পাদক : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, কলকাতা, ১৩২৫-২৮।
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা—সম্পাদক : ওয়াকিল আহমদ, ঢাকা, ১২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, জুন ১৯৯৪।
বিচিত্রা (সাপ্তাহিক, ঢাকা)—১৫ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ (মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের ওপর প্রচ্ছদ-কাহিনীর জন্যে)।
সওগাত (মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন জাতীয় সম্বর্ধনা সংখ্যা)—অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৮৬, সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।
সাহিত্য পত্রিকা (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ২ বর্ষ, শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ এবং ২৪ ও ৩১ বর্ষের (১৩৮৭ ও ১৩৯৪) সংখ্যাগুলো।
সুন্দরম—সম্পাদক : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ঢাকা, ১৯৮৮ (২ ও ৩ বর্ষের সংখ্যাগুলো)।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট খ

অবিভক্ত বাঙলার সাময়িকপত্র

(১৯০১–৪৭)

একটি অসম্পূর্ণ তালিকা

১৩০৬ আরতি (মাসিক)—সম্পাদক : উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৩০৭–০৮) ; সারদাচরণ ঘোষ (১৩০৮–১৬)।

নবপ্রভা (মাসিক)—সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায়।

সখী (মাসিক)—সম্পাদক : বৈকুণ্ঠনাথ দাস।

সাহিত্য সংহিতা (মাসিক)—সম্পাদক : নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় (১৩০৭–) ; কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৩১১–) ; নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় (১৩১২–) ; নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় ও সুবলচন্দ্র চিত্র (১৩১৪–) ; সুবলচন্দ্র মিত্র (১৩১৫–) ; গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৩১৬–) ; নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় (১৩১৯–) ; শ্যামাচরণ কবিরত্ন (১৩২০–) ; প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৩২৪–)। (১৩১৯ থেকে 'নবপর্যায়' শুরু)

১৩০৭ ব্রহ্মবাদী (মাসিক, ৩৮ বর্ষ ১৩৪৪ সনে বের হয়। সে হিসাবে...—সম্পাদক : (?)

১৩০৮ সমালোচনী (মাসিক)—সম্পাদক : শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

সুধা (মাসিক)—সম্পাদক : কেদারনাথ কাব্যতর্কতীর্থ ও কালীপ্রসন্ন গুপ্ত।

নূরল ইসলাম (বার্ষিকপত্র)—সম্পাদক : মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, যশোর।

সোলতান (মাসিকপত্র)—সম্পাদক : এম. নাজিরুদ্দীন আহমদ, সিরাজগঞ্জ।

ভারত-সুহৃদ (মাসিক)—সম্পাদক : এ.কে. ফজলুল হক ও নিবারণচন্দ্র দাস, বরিশাল।

বালক (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : এ.কে. ফজলুল হক (বরিশাল)।

নবপ্রতিভা (মাসিক)—সম্পাদক : মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নব্যবঙ্গ (মাসিক)—সম্পাদক : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি রায়।

প্রবাসী (মাসিক)—সম্পাদক : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৩০৮–) ; কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩৫০) ; অশোক চট্টোপাধ্যায় (১৩৭২)।

বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)—(মাসিক) সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩০৮–) ; শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (১৩১৩–)।

বসুধা (মাসিক)—সম্পাদক : রাজকৃষ্ণ তর্কবাগীশ (১৩০৯–) ; অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল (১৩১০–) ; বঙ্কুবিহারী ধর (১৩১২–)।

রঙ্গালয় (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্প ও সাহিত্য (মাসিক)—সম্পাদক : মন্মথনাথ চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্র মিত্র।

সঙ্গীত প্রকাশিকা (মাসিক)—সম্পাদক : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বান্ধব (নবপর্যায়, মাসিক)—সম্পাদক : কালীপ্রসন্ন ঘোষ (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত)।

www.pathagar.com

১৩০৯ আশা (মাসিক)—সম্পাদক : হেমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৩১৪)।

সোলতান (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, কলকাতা।

১৩১০ অর্চনা (মাসিক)—সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৩১০) ; কেশবচন্দ্র গুপ্ত (১৩১৫) ; কেশবচন্দ্র গুপ্ত ও কৃষ্ণদাস চন্দ্র (১৩১৮–) ; কেশবচন্দ্র গুপ্ত (১৩১৯–) ; কেশবচন্দ্র গুপ্ত ও কৃষ্ণদাস চন্দ্র (১৩২৫–) ; চিত্রিতা দেবী ও রণজিৎচন্দ্র (১৩১৫)।

নবনূর (মাসিক)—সম্পাদক : সৈয়দ এমদাদ আলী (কলকাতা)।

মোহাম্মদী (মাসিক)—সম্পাদক : মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (স্বল্পায়ু, কলকাতা)।

হানিফি (ধর্ম বিষয়ক মাসিকপত্র)—সম্পাদক : এম. এস. নূরুল হোসেন কাশিমপুরী (স্বল্পায়ু, ময়মনসিংহ)।

গৃহস্থ (মাসিক, ১৯০৩–১৬)—কলকাতা ইণ্ডিয়া প্রেস (সূত্র : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়)।

ধূমকেতু (মাসিক)—সম্পাদক : নীরদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

যমুনা (মাসিক)—সম্পাদক : ধীরেন্দ্রনাথ পাল (১৩১০) ; ধীরেন্দ্রনাথ পাল, সতীশচন্দ্র মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, গুরুদাস আদক ও যতীন্দ্রনাথ পাল (১৩১৭–) ; ফণীন্দ্রনাথ পাল (১৩১৯–) ; ফণীন্দ্রনাথ পাল ও চারুচন্দ্র মিত্র (১৩৩০–)।

সুহৃদ (১৯০৪, মাসিক)—সম্পাদক : এ.ডি. খান, উড়িষ্যা।

১৩১১ উপাসনা (মাসিক)—সম্পাদক : চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৩১১–) ; যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩১৯–) ; রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৩২৩–) ; রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৩৩৫–)।

জাহ্নবী (মাসিক)—সম্পাদক : নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (১৩১১–) ; গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী (১৩১৪–)।

যোগীসখা (মাসিক)—অধরচন্দ্র নাথ (১৩১১–) ; ভূষণচন্দ্র নাথ (১৩২১–) ; অম্বিকাচরণ নাথ (১৩২৫–) ; ইন্দুভূষণ নাথ (১৩৩০) ; প্রমথনাথ নাথ (১৩৩৩–) ; গোষ্ঠবিহারী দেবনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ন (১৩৮৫–)।

১৩১২ ইন্দিরা (মাসিক)—সম্পাদক : বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

বাণী (মাসিক)—সম্পাদক : অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

ভাণ্ডার (মাসিক)—সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারত মহিলা (মাসিক)—সম্পাদক : সরযূবালা দত্ত।

স্বদেশী (মাসিক)—সম্পাদক : দেবেন্দ্রনাথ ঘোষাল (১৩১২–) ; নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ (১৩১৩–)।

১৩১৩ অঙ্কুর (মাসিক)—সম্পাদক : কালীবর বেদান্তবাগীশ।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক পঞ্চানন সরকার (১৩১৩–) ; ভবাণীপ্রসন্ন লাহিড়ী (১৩২০–) ; নগেন্দ্রনাথ সেন (১৩৩১–) ; সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী (১৩৩৭–)।

ইসলাম–সুহৃদ (মাসিক, ১৯০৬)—সম্পাদক : সেখ আবদুস সোবাহান (ঢাকা)।

মোসলেম–সুহৃদ (সাপ্তাহিক, পাংসা, ফরিদপুর)—সম্পাদক : এম. নাজিরউদ্দীন আহমদ (সূত্র : বাংলা একাডেমী ঢাকা শহীদুল্লাহ গবেষণাকক্ষ)।

১৩১৪ অবসর (মাসিক)—সম্পাদক : নবকুমার দত্ত (১৩১৪–১৭) ; সুরেনচণ্ডী দত্ত (১৩১৭–২১) ; লালবিহারী দত্ত ও শরচ্চন্দ্র ঘোষ (১৩২১–২২) ; শরচ্চন্দ্র ঘোষ (১৩২২–২৩)।

www.pathagar.com

পথিক (মাসিক)—সম্পাদক : শচীশচন্দ্র ঘোষ।

সুপ্রভাত (মাসিক)—সম্পাদক : কুমুদিনী মিত্র।

মোসলেম-প্রতিভা (মাসিক)—সম্পাদক : শেখ আবদুর রহিম ও মোজাম্মেল হক (কলকাতা)।

১৩১৫ আর্যদর্পণ (মাসিক)—সম্পাদক : স্বামী নিগমানন্দ স্বরস্বতী (১৩১৫-২৯) ; বরদা ব্রহ্মচারী (১৩৩০-৩৩) ; স্বামী নির্বাণানন্দ স্বরস্বতী (১৩৩৪-৩৯) ; স্বামী সিদ্ধানন্দ স্বরস্বতী (১৩৮৫-)।

মানসী (মাসিক)—সম্পাদক : ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরতন মিত্র, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৩১৫) ; ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩১৬); মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৩২০-) ; মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩২২-) ; (১৩২২ সাল থেকে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামে প্রকাশিত হয়)।

হিন্দু-সখা (মাসিক)—সম্পাদক : কালীপদ মিত্র (১৩১৬-) ; অম্বিকাচরণ গুপ্ত (১৩১৭-); রাজকুমার বেদতীর্থ ও হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩১৮-) ; রাজকুমার বেদতীর্থ, মাধবদাস ভট্টাচার্য ও উপেন্দ্রনাথ সেন (১৩২০-) ; রাজকুমার বেদতীর্থ ও হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩২১-)।

বাসনা (মাসিক)—সম্পাদক : শেখ ফজলুল করিম (রংপুর)।

মোহাম্মদী (সাপ্তাহিক ১৯০৮)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পরে নাজির আহমদ চৌধুরী ও মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ (দীর্ঘদিন চলে, ১৯৪৭ সনের পরও...)।

১৩১৬ অলৌকিক-রহস্য (মাসিক)—সম্পাদক : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

ত্রিশূল (মাসিক)—সম্পাদক : ভোলানাথ ভট্টাচার্য (১৩১৯-) ; শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা (১৩২৭-) ; শ্রীশচন্দ্র শর্মা (১৩৩০-) ; ভোলানাথ ভট্টাচার্য (১৩৩৩-) ; ভোলানাথ ভট্টাচার্য ও অনন্তদেব তর্করত্ন (১৩৩৫-) (১৩৩৩ থেকে নবপর্যায় শুরু হয়)।

দেবালয় (মাসিক)—সম্পাদক : নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৩১৬-) ; সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও বিপিনবিহারী চক্রবর্তী (১৩১৭) ; গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী ও সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (১৩১৮-)।

নবদর্শন (মাসিক)—সম্পাদক : অমূল্যচরণ সেন।

নির্মাল্য (মাসিক)—সম্পাদক : বসন্তকুমার বসু।

নৈবেদ্য (মাসিক)—সম্পাদক : উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

পল্লীচিত্র (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : বিধূভূষণ বসু।

প্রজাপতি (মাসিক)—সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

১৩১৭ অর্ঘ্য (মাসিক)—সম্পাদক : অমূল্যচরণ সেন (১৩১৭-২২) ; সুরেশচন্দ্র পালিত (১৩২২-)।

আর্যাবর্ত (মাসিক)—সম্পাদক : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

নাট্যমন্দির (মাসিক)—সম্পাদক : অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পথ (মাসিক)—সম্পাদক : ধীরেন্দ্রনাথ দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, প্রশান্ত কুমার মহালনবীশ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বীরভূমি (নবপর্যায়, মাসিক)—সম্পাদক : ফুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

রঙ্গমঞ্চ (মাসিক)—সম্পাদক : মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

www.pathagar.com

১৩১৮ মোসলেম হিতৈষী সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : শেখ আবদুর রহিম।
জাহ্নবী (মাসিক)—সম্পাদক : সুধাকৃষ্ণ বাগচী (১৩১৮–) ; যতীন্দ্রনাথ পাল (১৩২৬–)।
ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (মাসিক)—সম্পাদক : বিধূভূষণ গোস্বামী ও সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র।
পতাকা (মাসিক)—সম্পাদক : হরিচরণ দাস।
প্রতিবাসী (মাসিক)—সম্পাদক : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৩১৮–) ; সত্যচরণ মিত্র (১৩১৯–)।
প্রতিভা (ঢাকা, মাসিক)—সম্পাদক : ধীরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৩১৮–) ; অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (১৩১৯–) ; উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৩২৪–) অনুকূলচন্দ্র সরকার (১৩২৬–) নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও নিশিকান্ত চক্রবর্তী (১৩৩৪–)।
বিজয়া (মাসিক)—সম্পাদক : কুমার বিপ্রনারায়ণ (১৩১৮–) ; মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (১৩২০–)।
সাহিত্য সংবাদ (মাসিক)—সম্পাদক : প্রমথনাথ সান্যাল (১৩১৮–) ; প্রমথনাথ সান্যাল ও জগদিন্দ্রনাথ লাহিড়ী (১৩৩২–) ; প্রমথনাথ সান্যাল, জগদিন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও বিভূতিভূষণ লাহিড়ী (১৩৩৬–)।
প্রভাকর (ধর্মবিষয়ক মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আইয়ুব খান (হুগলী)।

১৩১৯ অতিথি (মাসিক)—সম্পাদক : সত্যসাধন চেল ও ভবতারণ দাস।
কাদম্বরী (মাসিক)—সম্পাদক : মন্মথনাথ নাগ।
গল্প-লহরী (মাসিক)—সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু (১৩১৯–২০) ; ফণীন্দ্রনাথ পাল (১৩৩২–) ; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৩৩৮–) (১৩৩২ থেকে নবপর্যায় আরম্ভ)।
নন্দিনী (মাসিক)—সম্পাদক : যুগলকিশোর মজুমদার (১৩১৯–) ; আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ (১৩২০–)।
পথিক (মাসিক)—সম্পাদক : শিরিষচন্দ্র কামদেব।
প্রভাত (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : নবীনচন্দ্র দাস (চট্টগ্রাম)।
বালক (মাসিক)—সম্পাদক : সম্পাদক জে.এম. বি. ডন্‌ক্যান (১৩১৯–) ; সি. এস. প্যাটারসন (১৩২৩–) ; সি.এস. প্যাটারসন, ডব্লিউ এ্যালেকজাণ্ডার ও লোলিতলোচন দত্ত (১৩২৫–) ; জে. এইচ. ব্রাউন ও লোলিতলোচন দত্ত (১৩২৬)।
সৌরভ (মাসিক)—সম্পাদক : কেদারনাথ মজুমদার (১৩৩৪–)।
হাবলুল মতিন (সাপ্তাহিক, কলকাতা, ১৯১২)—সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী।
ইসলাম-আভা (মাসিক, ময়মনসিংহ)—সম্পাদক : সেখ আবদুল মজিদ।

১৩২০ কল্যাণী (মাসিক)—সম্পাদক : শশীকান্ত ভট্টাচার্য।
নাট্য-পত্রিকা (মাসিক)—সম্পাদক : নারায়ণচন্দ্র সেন।
প্রবাহিনী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্রনাথ রায়।
বিদূষক (মাসিক)—সম্পাদক : ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিক্রমপুর (মাসিক, সচিত্র)—সম্পাদক : শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (দ্র. ঢা.বি. গ্রন্থাগার)।
ভারতবর্ষ (মাসিক) সম্পাদক : অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেন (১৩২০–) ; জলধর সেন ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩২১–) ; জলধর সেন (১৩২৩–) ; ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় (১৩৪৫–) ; শৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৩৫৯) ; শৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৩৬৩–)।

www.pathagar.com

শাশ্বতী (মাসিক)—সম্পাদক : নিখিলনাথ রায়।
হাকিম (মাসিক)—হাকিম মসিহর রহমান (কলকাতা)।
সন্দেশ (কিশোর-সাহিত্য, মাসিক) —উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত, সম্পাদক : সুকুমার রায়, পরে সত্যজিৎ রায় (এখনও চালু....)।
১৩২১ অঞ্জলি (মাসিক)—সম্পাদক : কৃষ্ণবিহারী দত্ত।
গম্ভীরা (মাসিক)—সম্পাদক : কৃষ্ণচরণ সরকার।
নারায়ণ (মাসিক)—সম্পাদক : চিত্তরঞ্জন দাশ।
ভারত-নারী (মাসিক)—সম্পাদক : আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত ও প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত।
সংকল্প (মাসিক)—সম্পাদক : অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও চারুচন্দ্র মিত্র।
সবুজপত্র (মাসিক)—সম্পাদক : প্রমথ চৌধুরী।
১৩২২ গল্প-ভারতী (মাসিক)—সম্পাদক : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
ঝঙ্কার (মাসিক)—যতীন্দ্রনাথ পাল ও সত্যচরণ চক্রবর্তী।
নৈবেদ্য (মাসিক)—সম্পাদক : প্রকাশচন্দ্র প্রধান।
প্রতিধ্বনি (মাসিক)—সম্পাদক : জগন্নাথ মজুমদার।
প্রবর্তক (মাসিক)—সম্পাদক : মণীন্দ্রনাথ নায়েক (১৩২২-) ; মতিলাল রায় (১৩২৮-) ; রাধারমণ চৌধুরী (১৩৪৬-) ; (১৩৩২ থেকে 'নবপর্যায়' শুরু)।
বাঁশরী (মাসিক)—সম্পাদক : তপনকুমার দাস ; হরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ও সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়।
বীণা (মাসিক)—সুধীরচন্দ্র সেন রায় ও উপেন্দ্রনাথ সরকার।
মর্ম্মবাণী (সাপ্তাহিক)—জগদিন্দ্রনাথ রায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।
শিল্প ও সাহিত্য (নব-পর্যায়, মাসিক)—সম্পাদক : মন্মথনাথ চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্র মিত্র।
আল-এস্‌লাম (মাসিক)—সম্পাদক : মোহম্মদ আকরম খাঁ, পরে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী।
আহলে-হাদিস (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ বাবর আলী।
ইসলাম-দর্শন (মাসিক)—সম্পাদক : শেখ আবদুর রহিম (কলকাতা)।
নোয়াখালী (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : (কার্যাধ্যক্ষ নামে) সুরেন্দ্রমোহন বসু।
১৩২৩ সুনীতি (সাপ্তাহিক, চট্টগ্রাম)—সম্পাদক : খানবাহাদুর আমান আলী, পরে খানবাহাদুর মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজিম ও অন্যান্য।
অনাথ বন্ধু (মাসিক)—সম্পাদক : শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
নোয়াখালী (মাসিক)—সম্পাদক : শ্রী অরুণ চন্দ্র সিংহ (কলকাতা)।
১৩২৪ ত্রিবেণী (মাসিক)—সম্পাদক : সুরেন্দ্রনাথ রায়।
নববাণী (মাসিক)—সম্পাদক : অনুপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি (বার্ষিক)—সম্পাদক : জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মসজেদ (মাসিক)—সম্পাদক : আহমদ সোবহান।
১৩২৫ নাট্য-প্রতিভা (মাসিক)—সম্পাদক : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
পল্লীবাণী (মাসিক)—সম্পাদক : ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী (১৩২৫-) ; নিখিলনাথ রায় (১৩২৭-) ; সরোজনাথ ঘোষ ও নগেন্দ্রনাথ বসু (১৩২৯-)।

www.pathagar.com

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যপত্রিকা (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোজাম্মেল হক (১৩২৫–) ; মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৩২৮–)।

ভাণ্ডার (মাসিক, ১৩২৫–৪১)—সম্পাদক : তারকচন্দ্র রায় (১৩২৫–) ; তারকচন্দ্র রায় ও তারকনাথ মৈত্র (১৩২৯–)।

ভূমি-লক্ষ্মী (মাসিক)—সম্পাদক : শক্তিশরণ সিংহ (১৩২৫–) ; ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩২৮–) ; ফণীন্দ্রনাথ বসু ও সন্তোষবিহারী বসু (১৩৩১–)।

সওগাত (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, পরে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।

১৩২৬ আগমনী (বার্ষিক)—সম্পাদক : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

বঙ্গনূর (মাসিক)—সম্পাদক : শেখ হবিবর রহমান।

শান্তিনিকেতন (মাসিক)—সম্পাদক : সন্তোষকুমার মজুমদার (১৩২৮–) ; বিভূতিভূষণ গুপ্ত (১৩২৯–) ; প্রমথনাথ বিশী (১৩৩০)।

সাধনা (মাসিক)—সম্পাদক : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আবদুর রশীদ সিদ্দিকী।

মুসলমান শিক্ষা সমবায় (চতুর্মাসিক)—সম্পাদক : মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী।

আল-হক (দ্বি-মাসিক)—সম্পাদক : মনিরুদ্দীন আহমদ।

বিকাশ (মাসিক)—সম্পাদক : বন্দে আলী মিয়া ও পূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

মধুমিঞা (মাসিক)—সম্পাদক : ময়েজউদ্দিন আহমদ।

নূর (মাসিক)—সম্পাদক : ইসমাইল হোসেন সিরাজী।

১৩২৭ আঙুর (মাসিক)—সম্পাদক : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

আমার দেশ (মাসিক)—সম্পাদক : শিশিরকুমার মিত্র।

নবযুগ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

প্রভাতী (দ্বি-মাসিক)—নলিনীমোহন রায়চৌধুরী (১৩২৯ সাল থেকে মাসিক হয়)।

বিজলী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : নলিনীকান্ত সরকার (১৩২৭–) ; বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৩২৯–) ; অরুণ সিংহ ও দীনেশরঞ্জন দাশ (১৩৩২–)।

বাসন্তী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : বিজয়রত্ন মজুমদার ও জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী।

ব্যবসা ও বাণিজ্য (মাসিক)—সম্পাদক : শ্রী শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু (কলকাতা, ১৯৪৭ পর্যন্ত বের হয়)।

মোসলেম ভারত (মাসিক)—সম্পাদক : মোজাম্মেল হক।

সারথি (মাসিক)—সম্পাদক : অমরেন্দ্রনাথ রায়।

ইসলাম-দর্শন (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও নূর আহমদ।

ভাস্কর (মাসিক)—সম্পাদক : নূরুল হোসেন কাশিমপুরী।

শিক্ষক (মাসিক)—সম্পাদক : কাজী ইমদাদুল হক।

নবযুগ (দৈনিক সংবাদপত্র)—সম্পাদক : কাজী নজরুল ইসলাম ও মোজাফফর আহমদ (মুসলমানদের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত প্রথম বাঙলা দৈনিক পত্রিকা। মুসলমানদের প্রথম প্রয়াস হিসাবে 'নবযুগ' উল্লেখযোগ্য নানা কারণে)।

বকুল (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : ওয়ারেসউদ্দীন।

দেবর্ষি-দরবার (মাসিক)—সম্পাদক : সৈয়দ আবুল হোসেন এম. ডি.।

ধ্রুবতারা (ষান্মাসিক, যশোর)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ।

আল বুশ্‌রা (১৯২১, ধর্মবিষয়ক ত্রৈমাসিক) সম্পাদক : সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ।

www.pathagar.com

মৌচাক (মাসিক) ?

১৩২৮ অলকা (মাসিক)—সম্পাদক : সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও সুরেশ চক্রবর্তী (১৩২৮–২৯) ; সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৩২৯–) ; প্রমথ চৌধুরী, সজনীকান্ত দাস ও পরিমল গোস্বামী (১৩৪৫–৪৬)।

আত্মশক্তি (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিহাস ও আলোচনা (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : অরুণচন্দ্র সেন।

ঐতিহাসিক (মাসিক)—সম্পাদক : অরুণচন্দ্র সেন, প্রমথনাথ সরকার ও বিনয়চন্দ্র সেন।

কর্মী (মাসিক)—সম্পাদক : ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার।

তরুণ ভারত (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন।

দীপক (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : সুবর্ণময়ী গুহ।

নবজীবন (মাসিক)—সম্পাদক : কুঞ্জবিহারী দেব।

প্রবাস জ্যোতি (মাসিক)—সম্পাদক : মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গবাণী (মাসিক)—সম্পাদক : বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও চীনেশচন্দ্র সেন (১৩২৮–) ; বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৩৩০–)।

বাঙ্গালার কথা (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : চিত্তরঞ্জন দাশ ও বাসন্তী দেবী।

বাণী (দ্বিমাসিক)—সম্পাদক : কুঞ্জবিহারী চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র রায় ও সুশীল কুমার।

আন্নেসা (মাসিকপত্র)—সম্পাদিকা : বেগম সফিয়া খাতুন (আন্নেসা মুসলমান মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র। পত্রিকার উদ্দেশ্য—স্ত্রী–শিক্ষার প্রসার, বিবাহ ও পর্দা–প্রথার সংস্কার, নারী–জাতির জন্য অধিকার অর্জন ইত্যাদি। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। পরে কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। দুই বৎসর চালু ছিল। দ্রষ্টব্য : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, (১৯৭৭)।

সহচর (মাসিক)—সম্পাদক : সৈয়দ নওশের আলী, পরে শাহাদাৎ হোসেন, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ও ইমদাদ আলী খান।

১৩২৯ আলোক (মাসিক)—সম্পাদক : সুধাংশুকুমার ঘোষাল ও সুশীল কুমার রায়।

একতা (মাসিক)—সম্পাদক : প্রমোদকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩২৯–) ; দীপ্তেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩১৫–) ; তুষার চট্টোপাধ্যায় (১৩৬৮–)।

ধূমকেতু (পাক্ষিক)—সম্পাদক : কাজী নজরুল ইসলাম।

পল্লীশ্রী (মাসিক)—সম্পাদক : প্রমথনাথ সান্যাল ও সুরেশচন্দ্র গুহ (১৩২৯–) ; সুরেশচন্দ্র গুহ (১৩৩০)।

পল্লী–সখা (মাসিক)—সম্পাদক : কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গ–সাহিত্য (মাসিক)—সম্পাদক : প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বাসন্তিকা (ঢাকা, বার্ষিকী)—সম্পাদক : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৩২৯–৩০) ; রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৩৩২–) ; পরে অন্যান্য (এখনও চলছে. তবে সাতচল্লিশ পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের ছাত্রদের সাহিত্যিক মুখপত্র)।

বিদূষক (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

www.pathagar.com

বুধবার (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : বিভূতিভূষণ গুপ্ত ও প্রমথনাথ বিশী।
বেপরোয়া (মাসিক)—সম্পাদক : বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য।
বৈঠক (পাক্ষিক)—সম্পাদক : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।
মাধবী (মাসিক)—সম্পাদক : মনীষীনাথ বসু স্বরস্বতী।
বসুমতী (মাসিক)—সম্পাদক : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৩২৯) ; হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৩৩১-) ; সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রকুমার বসু (১৩৩১-) ; সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৩৪১-) ; যামিনীমোহন কর ও প্রাণতোষ ঘটক (১৩৫১)।
শিশির (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : শিশির কুমার মিত্র।
সেবক (দৈনিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ (মুসলমান-সম্পাদিত দ্বিতীয় বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র)।
নারী-শক্তি (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (ডাক্তার)।
আহমদীয়া বুলেটীন (মাসিক)—সম্পাদক : (?), আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মুখপত্র।
শিশু-সওগাত (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। দীর্ঘদিন চলে।
ধূমকেতু (অর্ধ-সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : কাজী নজরুল ইসলাম।
মুসমিল জগৎ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : আবদুর রশীদ সিদ্দিকী।
মোহাম্মদী (দৈনিক সংবাদপত্র)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ (মওলানা আকরম খাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত দ্বিতীয় এবং মুসলমান সমাজের তৃতীয় দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র)।
শিশু-সাথী (মাসিক)—সম্পাদক : শ্রী আশুতোষ ধর (কলকাতা)।
১৩৩০ ছোলতান (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী।
আইনুল-ইসলাম (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : চৌধুরী জাহেদুল হক।
সাম্যবাদী (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, পরে খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন ও আলী আহমদ ওলী এছলামবাদী।
কল্লোল (মাসিক)—সম্পাদক : দীনেশরঞ্জন দাশ।
খোকাখুকু (মাসিক)—সম্পাদক : সত্যচরণ চক্রবর্তী ও কালিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত (১৩৩০-) ; নিশিকান্ত সেন (১৩৩১) ; সুকোমল বসু (১৩৪০)।
জনসেবক (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : শৈলেশনাথ বিশী।
তরুণ (মাসিক)—সম্পাদক : সুকুমার দত্ত ও হীরালাল দাশগুপ্ত।
দীপালী (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : পরেশচন্দ্র দেব।
প্রাচী (মাসিক)—সম্পাদক : সুশীলচন্দ্র বসু।
বাঁশরী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : নরেন্দ্রনাথ বসু (১৩৩০-) ; নরেন্দ্রনাথ বসু ও নীহাররঞ্জন সিংহ (১৩৩৩-) ; নীহাররঞ্জন সিংহ (১৩৩৪-) (১৩৩১ থেমে মাসিকরূপে প্রকাশ)।
মাতৃমন্দির (মাসিক)—সম্পাদক : অক্ষয়কুমার নন্দী ও সরযুবালা দত্ত (১৩৩০-) ; অক্ষয়কুমার নন্দী ও সুশীলা নন্দী (১৩৩৫-)।
শতদল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা হলের ছাত্রদের বার্ষিকী)—সম্পাদক : শ্রী পরেশচন্দ্র নন্দী (১৩৩১) ; শ্রী প্রতাপচন্দ্র গুহ (১৩৩২) ; শ্রী ধীরেন্দ্র লাল দাস (১৩৩৩) ;

www.pathagar.com

সুরপতি চক্রবর্তী ১৩৩৪) ; হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় (১৩৩৫) ; যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৩৩৬) ; শ্রীশচন্দ্র দাস (১৩৩৭) ; সুরেন্দ্রনাথ শীল (১৩৩৮ ইত্যাদি।

সংহতি (মাসিক)—সম্পাদক : শ্রী জ্ঞানাঞ্জন পাল ও শ্রী মুরলীধর বসু।

সচিত্র-শিশির (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : বিজয়রত্ন মজুমদার (১৩৩০) ; শিশিরকুমার মিশ্র (১৩৩১)।

সেবা ও সাধনা (মাসিক)—সম্পাদক : জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দুনিভা দাস (১৩৩০–) ; ইন্দুনিভা দাস ও যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৩১–) ; যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৩৩–)।

সোনার বাংলা (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপীনচন্দ্র পাল ও গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৩৩২–) ; গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও চিত্তসুখ সান্যাল (১৩৩৭–) (৩৩২ থেকে 'নবপর্যায়' আরম্ভ হয়)।

সোনার ভারত (দ্বিমাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ জোবেদ আলী।

বাহাদুর (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন ও মোহাম্মদ কসিমুদ্দীন বশিরী।

ইছলাম জগৎ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : (?)।

১৩৩১ আরতি (দ্বিমাসিক)—সম্পাদক : রাধাচরণ দাস।

আরাধনা (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : পুলিনবিহারী বসু (১৩৩১) ; সৈয়দ আহমদ আলী (১৩৩২–৩৪) : অক্ষয়কুমার রায় চৌধুরী (১৩৩৫–৩৭)।

দীপিকা (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : পরিমলকুমার ঘোষ (১৩৩৩ থেকে দ্বিমাসিক। ১৩৩৪ থেকে মাসিক)।

নবযুগ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৩৫ থেকে মাসিক রূপে প্রকাশ)।

নাচঘর (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : হেমেন্দ্রকুমার রায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থি (১৩৩১–) ; হেমেন্দ্রকুমার রায় ও নলিনীমোহন রায় চৌধুরী (১৩৩৪–) ; হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৩৩৯)।

প্রকৃতি (দ্বিমাসিক)—সম্পাদক : সত্যচরণ লাহা।

শনিবারের চিঠি (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : যোগানন্দ দাস (১৩৩১–) ; নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৩৩৫–) ; সজনীকান্ত দাস (১৩৩৫–) ;সজনীকান্ত দাস (১৩৩৮–) ; পরিমল গোস্বামী (১৩৩৯–) ; সজনীকান্ত দাস (১৩৪৫–) ; রঞ্জনদাস (১৩৬২–১৩৮৯) (১৩৩৬ সনে বন্ধ হয়ে যায়। পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সনে)।

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (মাসিক)—সম্পাদক : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৩৩১–) ; গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কালীদাস নাগ (১৩৩৫–) ; গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কালিদাস নাগ (১৩৩৬–)।

সারদা (মাসিক)—সম্পাদক : ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শরিয়ত (মাসিক)—সম্পাদক : আহমদ আলী এনায়েতপুরী।

সংসারী (মাসিক)—সম্পাদক : সৈয়দ আবদুল করিম।

রওশন হেদায়াৎ (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

দেশের কথা (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : নূরুল হোসেন কাশিমপুরী, বগুড়া।

www.pathagar.com

হাফেজ-শক্তি (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : হাফেজ খোন্দকার তাহেরউদ্দীন ও হাফেজ ফজলুর রহমান।

মোসাফির (মাসিক)—সম্পাদক : শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী।

সত্যাগ্রহী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী।

সম্মিলনী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : আবদুল মোনেম, পরে দিদারুল আলম।

যুগবাণী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মকবুল হোসেন চৌধুরী (সিলেটের মকবুল হোসেন চৌধুরী সংবাদপত্রসেবী হিসাবে প্রশংসা অর্জন করেন)।

১৩৩২ যুগের আলো (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : দিদারুল আলম।

আহমদী (মাসিক)—সম্পাদক : গোলাম ছামদানী (১৩৩২) ; গোলাম ছামদানী ও দৌলত আহমদ খান।

উত্তরা (মাসিক)—সম্পাদক : অতুলপ্রসাদ সেন, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

কালিয়া (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : নিকুঞ্জবিহারী দাস ও ভূপেশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

চন্দ্রিলা (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : ক্ষীরোদচন্দ্র শীলদাস (১৩৩৩) ; ক্ষীরোদচন্দ্র শীলদাস ও হারাণচন্দ্র কাব্যতীর্থ (১৩৩৪) ; ক্ষীরোদচন্দ্র শীলদাস (১৩৩৫)।

তরুণলিপি (মাসিক)—সম্পাদক : অমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

দুমুখ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ।

পথিক (মাসিক)—সম্পাদক : অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

বঙ্গলক্ষ্মী (মাসিক)—সম্পাদক : কুমুদিনী বসু (১৩৩২-) ; কুমুদিনী বসু ও লতিকা বসু (১৩৩৩-) ; হেমলতা দেবী (১৩৩৪-)।

মুকুল (মাসিক)—সম্পাদক : প্রভাংসুকুমার গুপ্ত।

মোসলেম-দর্পণ (মাসিক)—সম্পাদক : হাকিম মসিয়র রহমান কোরায়শী (১৯৩১ সাল পর্যন্ত চালু ছিল বলে জানা যায়। দ্র. মু নু ই)।

তরুণপত্র (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ ফজলুল করিম মল্লিক ও আহমদ হোসেন।

সৌরভ (মাসিক)—সম্পাদক : রেজাউল করিম।

লাঙল (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (কাজী নজরুল ইসলাম প্রধান পরিচালক)।

নকীব (মাসিক)—সম্পাদক : নূর আহমদ, বরিশাল)।

ইসলাম নূর (মাসিক)—সম্পাদক : এ. এম. ফয়েজুল্লাহ্ আহমদ।

শরীয়তে এসলাম (মাসিক)—সম্পাদক : মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী।

শান্তি (মাসিক)—সম্পাদক : শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস।

সবুজ-পল্লী (মাসিক)—সম্পাদক : মৌলবী মোহাম্মদ জাফর আলী, ঢাকা।

১৩৩৩ অস্ফুট (বার্ষিক)—সম্পাদক : ভূপেন্দ্রনাথ দে ও আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী (১৩৩৩-) ; আশুতোষ ভট্টাচার্য ও আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ (১৩৩৪)।

আবাদ (মাসিক)—সম্পাদক : চারুচন্দ্র সান্যাল।

আরতি (মাসিক)—সম্পাদক : ভূপেন্দ্রলাল সেন চৌধুরী।

উড়ো খৈ (মাসিক)—সম্পাদক : যোগেশচন্দ্র ঘোষ।

কালি-কলম (মাসিক)—সম্পাদক : মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৩৩৩) ; মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৩৩৪-) ; মুরলীধর বসু (১৩৩৪-৫)।

www.pathagar.com

ঝরণা (মাসিক)—সম্পাদক : কৃষ্ণমোহন চক্রবর্তী (১৩৩৩-) ; কৃষ্ণমোহন চক্রবর্তী ও প্রভাতনাথ সেন (১৩৩৭-)।

ডাকগাড়ী (মাসিক)—সম্পাদক : রমেশচন্দ্র পাল ও ধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার।

নটরাজ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

পল্লী (মাসিক)—সম্পাদক : নিত্যগোপাল বসু।

পল্লী-প্রদীপ (মাসিক)—সম্পাদক : নিত্যগোপাল বসু।

পূর্ণিমা (মাসিক)—সম্পাদক : নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফুলের রেণু (মাসিক)—সম্পাদক : প্রভাতকুমার বসু, গণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শিশিরচন্দ্র বসু ও সুধীন্দ্রকুমার দেব।

রঙ্গ-রঙ্গালয় (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বিজলী (পাক্ষিক)—সম্পাদক : বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

বেণু (মাসিক)—সম্পাদক : ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় (১৩৩৩-) প্রফুল্লকুমার পাল (১৩৩৮-)।

বার্ষিক-সওগাত (বার্ষিকী)—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।

সজ্জন সেবক (মাসিক)—সম্পাদক : সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্যিক (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ও গোলাম মোস্তফা।

হিন্দু (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৩৩৩-) ; ভবতোষ রায় (১৩৩৮); চিত্ততোষ রায় (১৩৭০)।

শিখা (বার্ষিকী, ঢাকা)—সম্পাদক : আবুল হুসেন (১৩৩৩) ; কাজী মোতাহার হোসেন (১৩৩৪) ; আবুল ফজল (১৩৩৮)।

খাদেম (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মুজিবর রহমান (প্রখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' এর সম্পাদক, কলকাতা থেকে প্রকাশিত)।

দরদী (সাপ্তাহিক, ঢাকা)—সম্পাদক : সৈয়দ জাহেদুল হক চৌধুরী (ঢাকার এই সাপ্তাহিক পত্রটি ১৯২৬ সন থেকে অন্তত ১৯৪৮-৪৯ সন পর্যন্ত নিয়মিত চালু ছিল।)

সওগাত (নবপর্যায়, মাসিকপত্র)—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।

হিন্দু-মুসলমান (মাসিক)—সম্পাদক : সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক ও পান্নালাল দে।

অভিযান (মাসিক, ঢাকা)—সম্পাদক : মোহাম্মদ কাসেম (ঢাকা থেকে প্রকাশিত)।

গণবাণী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : কমরেড মুজফফর আহমদ।

নাজাত (পাক্ষিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ সেকান্দর আলী।

এসলাম (মাসিক)—সম্পাদক : আবদুল মোনেম।

জনমত (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : আবদুল মোনেম।

দৈনিক সোলতান (দৈনিক)—সম্পাদক : মওলানা মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী।

দৈনিক তরক্কী (দৈনিকপত্র)—সম্পাদক : কোরবান আলী (মুসলমান সমাজ থেকে প্রকাশিত এই দুটি ৪র্থ ও ৫ম দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র, কিন্তু টিকে থাকতে পারছে না। পাঠকও পাচ্ছে না। অবশ্য নিজেদের গণ্ডিতে পাঠক ছিল, বলাই বাহুল্য।)

মোসলেম বাণী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : আবুল কাসেম।

রায়তবন্ধু (মাসিক)—সম্পাদক : মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ

হানাফী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন, পরে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও চৌধুরী শামসুর রহমান (দীর্ঘ দিন হানাফী চলেছিল।)

www.pathagar.com

হানাফী জামায়েত (দৈনিক সংবাদপত্র)—সম্পাদক : শেখ হবিবুর রহমান (এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে বলে জানা যায় না। সমকালীন পত্র পত্রিকায়ও তেমন উল্লেখ নেই)।

হেলাল (মাসিকপত্র)—সম্পাদক : মোহাম্মদ শামসুর রহমান ও দেলোয়ার হোসেন।

নিশান (সাপ্তাহিক, জলপাইগুড়ি)—সম্পাদক : মৌঃ আবদুল খালেক।

১৩৩৪ মাসিক মোহাম্মদী (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

অধিকার (মাসিক)—সম্পাদক : যোগেন্দ্রনাথ সরকার।

গল্পগুচ্ছ (মাসিক)—সম্পাদক : অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৩৩৪) ; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (১৩৩৬)।

গ্রামের ডাক (দ্বিমাসিক)—সম্পাদক : রাজেন্দ্রনাথ সোম।

ধূপছায়া (মাসিক)—সম্পাদক : রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

পাততাড়ি (মাসিক)—সম্পাদক : বীরেন্দ্রনাথ রায় (১৩৩৪–) ; মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ রায় (১৩৩৫–)।

পাপিয়া (মাসিক)—সম্পাদক : বিভাবতী সেন।

পুষ্পপাত্র (মাসিক)—সম্পাদক : ফকিরচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মিত্র (১৩৩৪–) ; সতীশচন্দ্র মিত্র ও চারুচন্দ্র মিত্র (১৩৩৫–) চারুচন্দ্র মিত্র ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৩৩৬–)।

পূর্ণিমা (মাসিক)—সম্পাদক : শশিভূষণ হোম চৌধুরী।

প্রগতি (মাসিক, ঢাকা)—সম্পাদক : অজিতকুমার দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু।

বঙ্গসাহিত্য (মাসিক)—সম্পাদক : শিশির কুমার মিত্র।

বিচিত্রা (মাসিক)—সম্পাদক : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

যাদুঘর (মাসিক)—সম্পাদক : গিরিজাকুমার বসু ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

তবলীগ (মাসিক)—সম্পাদক : শেখ মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান।

নওরোজ (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আফজাল-উল হক।

ইসলামাবাদ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মওলানা ফররোখ আহমদ নেজামপুরী।

আলকাদেরী (মাসিক) ?

তাইদে এছলাম (মাসিক)—সম্পাদক : শাহ্ সৈয়দ আবুল কাছেম হানাফী আল কাদেরী।

১৩৩৫ চতুরঙ্গ (মাসিক)—সম্পাদক : ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে তাঁর নাম হয় সুভো ঠাকুর)।

চৈতালী (মাসিক)—সম্পাদক : বিভূতিভূষণ চৌধুরী।

তরুণশক্তি (পাক্ষিক)—সম্পাদক : অন্নদাকুমার চক্রবর্তী।

পঞ্চপুষ্প (মাসিক)—সম্পাদক : অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

পুষ্পপাত্র (মাসিক)—সম্পাদক : খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

বর্তমান (মাসিক)—সম্পাদক : প্রভাসচন্দ্র নন্দী।

বসুধারা (মাসিক)—সম্পাদক : কালিদাস রায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী।

মাস-পয়লা (মাসিক)—সম্পাদক : ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অখিল নিয়োগী (১৩৩৫–) ; ক্ষিতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৩৩৭–)।

বার্ষিক মোহাম্মদী (বার্ষিকী)—সম্পাদক : মোহাম্মদ ফায়রুল আনাম খাঁ।

www.pathagar.com

মুকুল (মাসিক)—সম্পাদক : সকুন্তলা দেবী (১৩৩৫–) ; বাসন্তী চক্রবর্তী (১৩৩৭–)।
সুদর্শন (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : অমরেন্দ্রনাথ রায়।
স্বদেশী-বাজার (মাসিক)—সম্পাদক : গদাধর চক্রবর্তী।
ভাবীকাল (পাক্ষিক)—সম্পাদক : মওলানা আলী আহমদ ওলী এছলামাবাদী।
জাগরণ (মাসিক)—সম্পাদক : এম. আহমদ আলী।
মোয়াজ্জিন (মাসিক)—সম্পাদক : সৈয়দ আবদুর রব (পরে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। —সম্পাদক, ঐ)।
সাপ্তাহিক সওগাত (সাপ্তাহিক—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।
সেবক (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : এম. এস. উদ্দীন ও জোৎস্নাময় সরকার।
তরুণ (দ্বিমাসিক)—সম্পাদক : এম. মেছের আলী।
সঞ্চয় (মাসিক)—সম্পাদক : কে. এম. আবদুর রহমান।
আল্-মুসলিম (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : ফজলুল হক সেলবর্ষী।
পল্লী-বান্ধব (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : এস. এ. হোসেন (রাজশাহী থেকে প্রকাশিত ১৯৪৭ সন পর্যন্ত চলে।)
পয়গাম (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : আবু লোহানী।
বিশ্ববাণী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : আবু লোহানী।
রক্তকেতু (কলকাতা, সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মৌলবী আবদুর রশীদ সিদ্দিকী।
আমান (ঢাকা, সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ তফাজ্জল হোসেন (১৩৩৫ থেকে ১৩৪৭ পর্যন্ত চলেছে বলে অনুমান করা হয়। ১৯৪২ সনেও প্রকাশিত হচ্ছে বলে বলা হয়, সূত্র : এম. আবদুর রহমান)।
অস্ফুট (ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত বার্ষিকী) সম্পাদক : কর্তৃক প্রকাশিত।
রাজভোগ (শিশুদের, ঢাকার পত্রিকা, সূত্র : মাসিক 'প্রগতি', অজিতদত্ত ও বু-ব সম্পাদিত)।
আল-বালাগ ও আল-আমান (মাসিক, সিলেট) সম্পাদক : মৌলবী আবদুর রহমান সিংকাপনী।
১৩৩৬ গল্পগাথা (মাসিক)—সম্পাদক : ললিতকুমার ঘোষ।
তরুণ (মাসিক)—সম্পাদক : সুধীরচন্দ্র সরকার।
দীনদুনিয়া (মাসিক)—সম্পাদক : আবুল মওলানা মুহাম্মদ সামছুল হুদা।
দীপালী (সাপ্তাহিক—সম্পাদক : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও আশুতোষ সান্যাল (১৩৩৬–) ; সুধীরেন্দ্রনাথ সান্যাল (১৩৪০–) ; হেমেন্দ্রকুমার রায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৩৪৬)।
ধারা (মাসিক)—সম্পাদক : সৌরাংশু বসু ও প্রমথ মিত্র।
নবশক্তি (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৩৩৬–) ; তারানাথ রায় (১৩৩৮–) ; সরোজকুমার রায় চৌধুরী (১৩৩৯)।
প্রতিষ্ঠা (মাসিক)—সম্পাদক : কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।
রবিবারের লাঠি (মাসিক)—সম্পাদক : কেশবচন্দ্র সেন।
শান্তিপুর (মাসিক)—সম্পাদক : করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরনাথ প্রামাণিক (১৩৩৬–)।

www.pathagar.com

নওজোয়ান (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : নাসিরউদ্দীণ আহমদ। (জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত ছাত্রদের মুখপত্র। সওগাতের নাসিরউদ্দীন নন।)

আল-হক ম্যাগাজিন (বার্ষিক)—সম্পাদক : মহিউদ্দীন আহমদ।

দৈনিক আমির (দৈনিক সংবাদপত্র) পৃষ্ঠপোষক : শেরে বাঙলা এ. কে. ফজলুল হক, কলকাতা ; সম্পাদক : মওলানা আলী আহমদ ওলী এছলামাবাদী।

বাংলা গেজেট (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : ফররোখ আহমদ নেজামপুরী, পরে খোরশেদ আলম চৌধুরী (১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত রেঙ্গুন থেকে প্রকাশিত হয়।)

১৩৩৭ অতিথি (মাসিক)—সম্পাদক : প্রমথনাথ মিত্র।

ঊষা (মাসিক)—সম্পাদক : সত্যপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (১৩৩৭-) ; বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ বসু (১৩৫৩-)।

চিত্রলেখা (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তরুণ আলো (মাসিক)—সম্পাদক : বরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নব আলোক (মাসিক)—সম্পাদক : পূর্ণচন্দ্র দাস।

বর্তমান জগৎ (মাসিক)—সম্পাদক : বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

বায়োস্কোপ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

মুক্ত (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

মাদ্রাছা ম্যাগাজিন (দ্বিমাসিক)—সম্পাদক : আবুল মওলা মোহাম্মদ শামছুল হুদা।

দৈনিক রাষ্ট্রবার্তা (দৈনিক সংবাদপত্র, চট্টগ্রাম)—সম্পাদক : লোকমান খান শেরোয়ানী।

জয়তী (মাসিক)—সম্পাদক : আবদুল কাদের (পরে কাদির)।

মক্তব (মাসিক)—সম্পাদক : সাখাওয়াৎ হোসেন।

সেবকের বাণী (মাসিক)—সম্পাদক : কাজী নূরুল ওসমান, যশোর।

জমজম (মাসিক)—সম্পাদক : মঈনুদ্দীন হোসেন।

প্রাতিকা (বার্ষিক)—সম্পাদক : হবীবুল্লাহ বাহার ও অন্যান্য।

বেদুঈন (অর্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদপত্র)—সম্পাদক : আশরাফ আলী খান (কলকাতা, কয়েক বৎসর চলে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে 'সাপ্তাহিক' হিসেবে চলছে। ঢাকায় অফিস ছিলো। ১৩৪০ এর 'অভিযান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আছে।)

তরুণের ডাণ্ডা ও এছলামের ঝাণ্ডা (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক (?), ফুরফুরার পীর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১৩৩৮ আল-কেরামত (ঢাকা, মাসিক, পরে সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মৌঃ আবদুল আজীজ।

নয়া বাংলা (সাপ্তাহিক, কলকাতা)—সম্পাদক : মৌঃ আশরাফুদ্দীন আহমদ চৌধুরী।

মুকুর (সচিত্র-মাসিকপত্র)—সম্পাদক : ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান শরীফ (কলকাতা, সূত্র : সৈয়দ খালেদ নৌমান)।

অঙ্কুর (মাসিক)—সম্পাদক : সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ।

আগতা (মাসিক)—সম্পাদক : নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

ইঙ্গিত (মাসিক)—সম্পাদক : শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এম. এ. (মেহেরপুর, যশোর)।

আজকাল (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : জ্ঞানদাচরণ দাস।

দুন্দুভি (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : কে. বসু।

ধূমকেতু (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিক।

www.pathagar.com

নিবেদিতা (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : নির্মলেন্দু দত্ত মজুমদার (১৩৩৯ থেকে মাসিক)।
বহুরূপী (পাক্ষিক)—সম্পাদক : এন. সি. বড়ুয়া।
বাতায়ন (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : অবিনাশ ঘোষাল।
স্বদেশ (মাসিক)—সম্পাদক : প্রবোধকুমার সান্যাল।
পরিচয় (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (এখনও চলছে)।
আহমদী (মাসিক, ঢাকা)—সম্পাদক : আবদুর রহমান খাঁ বি.এ. বি.এল (বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া আন্দোলনের মুখপত্র, ঢাকা, দীর্ঘদিন চলে ১৯৬২ সনের পরও)।
ইসলাম জ্যোতি : (মাসিক, বহরমপুর)—সম্পাদক : মৌলভী আবদুল বারী।
যুগভেরী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মকবুল হোসেন চৌধুরী, পরে অন্যান্য (দীর্ঘজীবী পত্রিকা)।

১৩৩৯ আল্-ইস্লাহ্ (মাসিক)—সম্পাদক : মৌলভী মুহম্মদ নূরুল হক দশঘরী।
ছোটগল্প (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।
দীপক (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমন্তকুমার গুপ্ত।
পূর্বাশা (মাসিক)—সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য।
প্রদীপ (মাসিক)—সম্পাদক : মৃণালকান্তি বসু ও অতুলকৃষ্ণ ঘোষ।
বঙ্গশ্রী (মাসিক)—সম্পাদক : সজনীকান্ত দাস, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বিজয়রত্ন মজুমদার, কিরণকুমার রায়, রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য ও হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।
বাঙলা (শারদীয়া সংখ্যা)—সম্পাদক : বিজয়রত্ন মজুমদার।
রূপ-রেখা (সচিত্র বার্ষিকী)—সম্পাদক : বেগম জাহানআরা চৌধুরী (কলকাতা)।
গুলিস্তাঁ (মাসিক)—সম্পাদক : এস. সমশের আলী ও শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী ; পরে এস. এম মুফাখ্খারুল ইসলাম।
চাবুক (সাপ্তাহিক, ঢাকা)—সম্পাদক : শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র সাহা।
জয়শ্রী (প্রথমে ঢাকায় প্রকাশিত হয়, পরে কলকাতায় স্থানান্তরিত, এখনও প্রকাশিত হয়)—সম্পাদক : লীলাবতী নাগ (বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন)।
নব্য-বাংলা (মাসিক)—মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকা হবে। (সম্পাদকের নাম জানতে পারা যায়নি, পত্রিকার মলাট নেই বলে)।
আজাদ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : ডা. ফজলুর রহমান।
তবলীগ (নবপর্যায়, মাসিক)—সম্পাদক : চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান ও মোহাম্মদ আবদুল হক এম. এ. (কলকাতা থেকে প্রকাশিত)।

১৩৪০ দোতারা (মাসিক)—সম্পাদক : দেবব্রত সিংহ ও জানকী রায়।
বিজলী (মাসিক)—সম্পাদক : বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।
অভিযান (মাসিক, ঢাকা)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ বি.এ.।
দেশ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ (বর্তমানেও চালু, বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক সাপ্তাহিক পত্রিকা)।
নয়াবাংলা (সাপ্তাহিক, কংসগ্রসী মুসলমানদের মুখপত্র, কলকাতা)—সম্পাদক : আশরাফউদ্দীন আহমদ চৌধুরী ও আলী আহমদ ওলী এছলামাবাদী (অন্তত দশ বছর চলে বলে জানা যায়)।
বুলবুল (ত্রৈমাসিক, পরে মাসিক)—সম্পাদক : মুহম্মদ হবীবুল্লাহ (বাহার) ও শামসুন্নাহার (মাহমুদ)।

www.pathagar.com

দেশের কথা (সাপ্তাহিক, কলকাতা)—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সাপ্তাহিক সওগাতের পরিবর্তিত নাম, সাপ্তাহিক সওগাতের পরিবর্তে সওগাত কার্যালয় থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র)।

সোপান (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : শ্রী নলিনীকিশোর গুহ (ঢা. বি.গ্র. দ্র.)।

সেবক (মাসিক)—সম্পাদক : আবুল মনসুর এলাহী বক্স (সিরাজগঞ্জ)।

বর্ষবাণী (বার্ষিকী)—সম্পাদক : বেগম জাহানআরা চৌধুরী, কলকাতা।

দূরবীণ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : রেজাউল করিম (?)

তরুণ মালদা (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মৌলভী রইসউদ্দীন আহমদ (উকিল)।

ছায়াবীথি (মাসিক)—সম্পাদক : নাজিরুল ইসলাম এম. এ. বিটি (কলকাতা)।

১৩৪১ ভবিষ্যৎ (মাসিক)—সম্পাদক : সুভো ঠাকুর।

শতাব্দী (মাসিক)—সম্পাদক : বিরাম মুখোপাধ্যায়।

ছুন্নত-অল জামায়াত (ধর্মবিষয়ক মাসিক)—সম্পাদক : মৌলানা রুহুল আমিন (কলকাতা)।

সোনার বাংলা (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : নলিনীকিশোর গুহ (ঢা. বি.গ্র. দ্র.)।

যুগের জ্যোতি (রেঙ্গুন, মাসিক)—সম্পাদক : ধীরেন মজুমদার ও সৈয়দুর রহমান।

মোসলেম (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মৌঃ আব্দুল হাকিম ; পরিচালক : মওলানা মোঃ রুহুল আমিন।

সবুজ বাঙলা (মাসিক, নারায়ণগঞ্জ)—সম্পাদক : এম. ওসমান আলী।

শিলং (বার্ষিকী)—সম্পাদক : আবদুল মালিক চৌধুরী।

ইসলাম প্রচার (ইসলাম ধর্মবিষয়ক মাসিক)—সম্পাদক : (?)

[১৩৪২ সনের ভাদ্র সংখ্যা মাসিক মোয়াজ্জিন পত্রিকার কভারে বিজ্ঞাপনে বলা হয় : 'ইসলাম প্রচার মাসিক পত্রিকা,—এই ধর্মনৈতিক দুর্দিনে সমাজের কুসংস্কার দূর করিয়া ইসলামের বিমলজ্যোতি বিচ্ছুরিত করিবার দায়িত্ব লইয়াই..প্রকাশিত হইয়াছে। বৎসরে দ্বাদশ বার প্রকাশিত হয়। গ্রাহক হইয়া তবলীগে-ইসলামের সাহায্য করুন। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷৷. টাকা, ম্যানেজার : ইসলাম প্রচার, চাঁদমিয়া লেন, চট্টগ্রাম।]

১৩৪২ দৈনিক মোজাহেদ (দৈনিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আলী আজম (৪৭নং রিপন স্ট্রিট কলকাতা)।

কবিতা (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : সমর সেন ও বুদ্ধদেব বসু (১৩৪২) ; বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৩৪৩) ; বুদ্ধদেব বসু (১৩৪৪)।

নূতন পত্রিকা (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও সজনীকান্ত দাস।

অগ্রগতি (সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্র)—সম্পাদক : আশু চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিভা (মাসিক, চট্টগ্রাম)—সম্পাদক : আবদুস সালাম।

হেদায়াত (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ মোয়েজুদ্দীন হামিদী, খুলনা।

১৩৪৩ শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী।

পল্লীপ্রদীপ (পাবনা, সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : এ. এম. জহুরুল ইসলাম এম. এ.।

কৃষক-বাণী (নোয়াখালী, সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মৌলভী গালাম সরওয়ার।

www.pathagar.com

কৃষক-হিতৈষী (সাপ্তাহিক, নোয়াখালী,)—সম্পাদক : মৌলভী রশীদ আহমদ।

কিশলয় (মাসিক, কলকাতা)—প্রকাশক মুদ্রক ও সম্পাদক (?) : শশিভূষণ দত্ত।

পূরবী (মাসিক, চট্টগ্রাম)—সম্পাদক : ওহীদুল আলম ও আশুতোষ চৌধুরী।

চাষী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মুজিবুর রহমান ফুলপুরী (ময়মনসিংহ, কৃষক চাষী-আন্দোলনের মুখপত্র, পরে পাকিস্তান আমলে দৈনিক হয়, সন্ধ্যায় বের হতো)।

জনমত (সাপ্তাহিক, চট্টগ্রাম)—সম্পাদক : মৌলবী আবদুল মুনএম।

খাদেম বাহক (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মৌলবী হিফজুর রহমান।

হেলাল (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মৌঃ আবদুর রহমান খান, ময়মনসিংহ।

আজাদ (দৈনিক)—সম্পাদক : মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

তকবীর (দৈনিক)—সম্পাদক : ফজলুল হক সেলবর্সী।

বঙ্গনূর (দৈনিক)—সম্পাদক : (?) (কলকাতার ৪৭নং রিপন স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হতো, মুসলিম সম্পাদিত, স্বল্পায়ু)।

১৩৪৪ সিরাজ (ত্রৈমাসিক, ফরিদপুর)—সম্পাদক : মোহাম্মদ সাদত আলী খান।

ময়মনসিংহবাসী (মাসিক)—সম্পাদক : হেমেন্দ্রনাথ দত্ত (দুই বৎসরের মাথায় নাম পরিবর্তন করে 'মাতৃভূমি' রাখা হয়)।

বঙ্গভূমি (মাসিক, ঢাকা)—সম্পাদক : চৌধুরী মোয়াজ্জম হোসেন।

আর্য যমুনা (নবপর্য্যায়, গল্প-পত্রিকা)—সম্পাদক : ফণীন্দ্রনাথ পাল (কলকাতা থেকে বের হতো। ঢাকার বাংলা একাডেমীর শহীদুল্লাহ গবেষণা কক্ষ দ্রষ্টব্য)।

লাঙ্গল (পাক্ষিক)—সম্পাদক : ডা. এ. কে. সিরাজউদ্দিন আহমদ (ফরিদপুর, সূত্র : আল্-ইস্‌লাহ, ৪/৭, চৈত্র ১৩৪৪)।

শিশু-সওগাত (নবপর্যায়, মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।

১৩৪৫ খাতক (সাপ্তাহিক, পাংসা, ফরিদপুর)—সম্পাদকের নাম জানা যায়নি।

চতুরঙ্গ (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু, হুমায়ুন কবির (পরে হুমায়ুন কবির)।

শ্রীভারতী (মাসিক)—সম্পাদক : অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

মন্দিরা (মাসিক)—সম্পাদক : কমলা চট্টোপাধ্যায়।

পাঠশালা (মাসিক)—সম্পাদক : নরেন্দ্র দেব।

মাতৃভূমি (মাসিক)—সম্পাদক : হেমেন্দ্রনাথ দত্ত।

নেয়ামত (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুস সালাম (১৯৬০ পর্যন্ত চলে, দ্রষ্টব্য বাংলা একাডেমী, ঢাকার শহীদুল্লাহ গবেষণা কক্ষ)।

কৃষক (সাপ্তাহিক) প্রধান পরিচালক : মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ ; সম্পাদক : আহমদ আলী (কলকাতা, নিখিল বঙ্গ কৃষকপ্রজা সমিতির মুখপত্র)।

নয়া-জামানা (মাসিক পত্রিকা)—সম্পাদক : সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা সিরাজী (সিরাজগঞ্জ)।

নকীব (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ ছনাওর আলী, সিলেট।

জাগরণ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, সিলেট।

কৃষক (দৈনিক)—সম্পাদক : মৌলবী আবুল মনসুর আহমদ।

১৩৪৬ অরণি (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শীশ্-মহল (মাসিক)—সম্পাদক : রকিবুস সুলতান।

মোজাহেদ (সাপ্তাহিক, আসাম)—সম্পাদক : আবদুল লতীফ।

www.pathagar.com

১৩৪৭ নিরুক্ত (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য।
সমসাময়িক (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : নীরদচন্দ্র চৌধুরী।
আল-জালাল (সাপ্তাহিক ; সিলেট)—সম্পাদক : মোহাম্মদ সিকান্দার আলী।
রূপায়ন (মাসিক)—সম্পাদক : আবু সাঈদ চৌধুরী, কলকাতা।

১৩৪৮ প্রভাতী (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ রজিউর রহমান, সিলেট।
নওরোজ (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন।
জাগরণ (সাহিত্য-পাক্ষিক)—সম্পাদক : মীজানুর রহমান, পশ্চিমবঙ্গ, বনগাঁ।
একক (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : শুদ্ধসত্ত্ব বসু।
ত্রিকাল (বার্ষিকী)—সম্পাদক : আতাউর রহমান ও অন্যান্য।
নবযুগ (দৈনিক, নবপর্যায়ে)—সম্পাদক : কাজী নজরুল ইসলাম (এ.কে. ফজলুল হক পৃষ্ঠপোষিত, আতাউর রহমান এবং অনেকে এতে কাজ করতেন)।
মৃত্তিকা (দ্বিমাসিক)—সম্পাদক : কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ (কলকাতা ১৩৫৫–৫৬ বা ১৯৪৭–৪৮ সন পর্যন্ত চলে)।
কিশোর বাংলা (কিশোর মাসিক, কলকাতা)—সম্পাদক : অরূপ চৌধুরী, সহ-সম্পাদক : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় (২৫ বলরাম দে স্ট্রীট থেকে স্বামী প্রেমঘনানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত)।
আজান (মাসিক)—সম্পাদক : সালাহুদ্দীন ইউসুফ।
সাহিত্য (ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা)—সম্পাদক : মৌলবী মোহাম্মদ আমীনুল হক (আসাম মুসলিম লিটারেরি এসোসিয়েশন-এর মুখপত্র, শিলং)।
ইমাম (মাসিক, ধর্মবিষয়ক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ এসহাক (কলীমবাগ, যশোর)।

১৩৪৯ সম্প্রতি (বার্ষিকী)—সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অন্যান্য।
বহুরূপী (মাসিক)—সম্পাদক : অমর গঙ্গোপাধ্যায় ও গঙ্গাপদ বসু।
সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল বার্ষিকী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী)—সম্পাদক : সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন।
আল-আমান (মাসিক, সিলেট)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার।
আর্থিক-জগৎ (সাপ্তাহিক) পাকিস্তান আন্দোলনকালে দেশের আর্থিক প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আছে। অনেক মুসলিম লেখকের রচনা আছে। বিশেষ করে ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষ ও দেশভাগের সময়কার রচনাগুলো এর মূল্যবান।)
'পাক্ষিক পাকিস্তান' (পাক্ষিক)—সম্পাদক : নজীর আহমদ (পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, ঢাকা ১৯৪২, এর মুখপত্র)।
সবুজ পতাকা (মাসিক, সিলেট মুকুল মেলার মুখপত্র)—সম্পাদক : এমাদউদ্দীন আহমদ চৌধুরী।

১৩৫০ রূপ-মঞ্চ (মাসিক)—সম্পাদক : কালীশ মুখোপাধ্যায়।
দিগন্ত (বার্ষিকী)—সম্পাদক : অজিত দত্ত (চতুরঙ্গে সমালোচনা আছে)।
গুল-বাগিচা (সচিত্র মাসিক)—সম্পাদক : আবদুল ওহাব সিদ্দীকী (কলকাতা, কিশোর-পত্রিকা)।
নেদায়ে ইসলাম (মাসিক)—সম্পাদক : ডা: আমীর আলী (কলকাতা)।

১৩৫১ দর্শন (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত (১৩৬১–)। পরবর্তীকালে অন্যান্য।
নাট্য-ভারতী (মাসিক)—সম্পাদক : মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

www.pathagar.com

দি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ম্যাগাজিন (১৯৪৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)—সম্পাদক : এ. কে. এম. কবির (সওগাত, চৈত্র ১৩৫১ সংখ্যায় আলোচনা আছে।)

নিবেদন (সাপ্তাহিক, কলকাতা)–এর প্রথম লেখা বেগম সুফিয়া কামালের। এফ. রহমানের একটি প্রবন্ধ আছে—শহীদুল্লাহ গবেষণা কক্ষ, বাংলা একাডেমী দ্রষ্টব্য। ১৩৫১–এর আগেই বের হয় বলে অনুমান, পূর্ববঙ্গের পত্রিকা, ফেণীর?

১৩৫২ মিল্লাত (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : আবুল হাশিম, কলকাতা।

১৩৫৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী (১৩৫২–৫৩)—সম্পাদক : নূরুল ইসলাম চৌধুরী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সম্পাদিত এই নামের প্রথম পত্রিকা। সওগাতের জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ সংখ্যায় আলোচনা আছে)।

ফজলুল হক মুসলিম হল বার্ষিকী (১৩৫৩)—সম্পাদক : আবদুল জব্বার খান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সম্পাদিত। সওগাতের জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ সংখ্যায় আলোচনা আছে)।

ইত্তেহাদ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : আবুল মনসুর আহমদ।

১৩৫৪ অগ্রণী (মাসিক)—সম্পাদক : প্রফুল্ল রায় ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।

উজ্জ্বল ভারত (মাসিক)—সম্পাদক : রেণু মিত্র।

দ্বন্দ্ব (মাসিক)—সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও সুহৃদ রুদ্র।

পরাগ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য ; পরে মাসিক রূপে প্রকাশিত হয়।

মহিলা (মাসিক)—সম্পাদক : আশা দেবী (মহিলা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০২ সনে। তখন গিরিশচন্দ্র সেন। (১৩০৩) ; ব্রজগোপাল নিয়োগী (১৩৩৭–) সম্পাদক ছিলেন।

সাহিত্যপত্র (মাসিক)—সম্পাদক : চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, নবযুগ আচার্য, আশীষ বর্মণ ও শান্তিদেব বসু (১৩৫৪–) ; অসীম রায়, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য (১৩৭২–)।

সীমান্ত (মাসিক)—সম্পাদক : মাহবুবউল আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরী, চট্টগ্রাম।

কৃষ্টি (মাসিক)—সম্পাদক : সুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার প্রমুখ, ঢাকা।

কাফেলা (মাসিক)—সম্পাদক : কাজী নাজমুল হক প্রমুখ (ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে)।

জিন্দেগী (অর্ধ-সাপ্তাহিক, পরে দৈনিক)—সম্পাদক : কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ (বস্তুতপক্ষে ১৩৫৪ সনের শ্রাবণ–ভাদ্র, আগস্ট ১৯৪৭ মাসেই বাঙলাদেশ বিভক্ত হয়ে যায়। এই সময়ে দুই বাঙলা থেকেই স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান এর পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এই বছরে অসংখ্য পত্রিকা দুই দেশ থেকে প্রকাশিত হয়।)

ইনকেলাব (সাপ্তাহিক, কলকাতা)—সম্পাদক : শাহ আজিজুর রহমান, বি. এ. (অনার্স)।

(১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ৫ আষাঢ় ১৩৫৪, ২০/৬/১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ৪৯ বেনিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা–১৪ থেকে প্রকাশিত হয়। পরে প্রধান সম্পাদক হন গুলিস্তাঁ–সম্পাদক ফখরুল ইসলাম। ১৯৪৭ পরবর্তীকালে তিনি গুলিস্তাঁ আবার প্রকাশ করেন বরিশাল থেকে। কিন্তু ওগুলো তখন আর লোকেরা ছুঁয়ে দেখতো বলে মনে হয় না। মান ছিলো না। যুগও পরিবর্তিত তখন।)

www.pathagar.com

বেগম (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : বেগম সুফিয়া কামাল ও নূরজাহান বেগম।

মিনার (কিশোর-মাসিক)—বেগম ফওজিয়া সামাদ (ঢাকা)।

নয়া-জামানা (সাপ্তাহিক, রাজশাহী) (সম্পাদক: ?) (দিনাজপুরের 'নওরোজ'-এর বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়)।

নও-বেলাল (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ।

আনসার (পাক্ষিক)—সম্পাদক : মওলানা সখাওতুল আম্বিয়া। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা, ১৯৭৭।

আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, ঢাকা, ১৯৬৯।

মুহম্মদ নূরুল হক, সংবাদপত্র-সেবায় সিল্‌হেটের মুসলমান, সিলেট, ১৯৬৯।

জেলা পরিক্রমা : সিলেট, জেলা তথ্য অফিস, সিলেট, ১৯৯১-৯২।

দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৭, কলকাতা। সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ।

এম. আবদুর রহমান, 'মুসলিম সাময়িকপত্রের ইতিহাস', মাসিক মোহাম্মদী, ৫ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৯। মাসিক সওগাত, ২২ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ ; ২২ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৭ ; এবং ২২ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৭।

সৈয়দ খালেদ নৌমান, 'প্রাক-স্বাধীনতাযুগের মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্রিকা', শারদীয় পরিবর্তন, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, কলকাতা।

এছাড়া বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ এর অন্তর্গত খোসাবাসপুর গ্রাম নিবাসী জনাব সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার এবং ঢাকার বাংলা একাডেমীর সংগ্রহশালা (শহীদুল্লাহ গবেষণা কক্ষ) ও গ্রন্থাগার ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, প্রভৃতিতে সংগৃহীত তথ্য ও নমুনা ব্যবহার করেছি।

বলাবাহুল্য, এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়। তবে হিন্দু ও মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার সম্ভবমতো পূর্ণাঙ্গ একটি তালিকা প্রস্তুত করলে কেমন দেখা যাবে—এ থেকে তা অনুমান করা যায়। এই তালিকা করার জন্য দীর্ঘ সময়ের কর্মসূচি দরকার।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট গ

১৯৩১-৪৭ পর্বে প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত পত্রপত্রিকার তালিকা

(১৯৩১-৪৭)

একটি অসম্পূর্ণ তালিকা

[১৯৩১-৪৭ সময়কালে প্রচলিত সাময়িকপত্রগুলোর মধ্যে কয়েকটি নাম পাওয়া যায় যেগুলো ১৯৩১-এর আগেই প্রকাশিত হয়। যেমন ১. হাকিম মসিয়র রহমান কোরায়সী সম্পাদিত মাসিক 'মোসলেম দর্পণ' ; ২. 'শরিয়তে এসলাম', ধর্ম বিষয়ক মাসিক পত্র। এটি মাঘ ১৩৩২ সনে প্রকাশিত হয় ৫/২৩ গ্রীণ স্ট্রীট, চাঁদনী কলকাতা থেকে। সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সমর্থন করতো না পত্রিকাটি। হিন্দু লেখকেরাও এতে লিখতেন। ৩. ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আহলে হাদীস' ১৯৪৮ নাগাদ চলে। ৪. ঢাকার 'দরদী'ও জনপ্রিয়তার সঙ্গে ১৯৪৭ পর্যন্ত চলে। কিন্তু পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির ফাইল সংরক্ষিত নয়। বাঙলা একাডেমী (ঢাকা) তে কয়েক সংখ্যা রয়েছে। ৫. সওগাত ১৯১৮ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত বিরতি দিয়ে কয়েক পর্বে প্রকাশিত হয়েছে। সওগাতের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম ছিল। ৬. 'মোহাম্মদী'ও বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা নিয়ে ১৯৭০ পর্যন্ত সচল ছিল। ৭. শিখার প্রথম সংখ্যা ১৯২৭ এ প্রকাশিত হলেও শেষ সংখ্যা ১৯৩১ এ বের হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। ৮. 'জয়তী' ১৯৩১-এর কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রকাশিত হলেও আলোচ্যকালেরই পত্রিকা। তাছাড়া কলকাতা থেকে ১৯২৭-এ প্রকাশিত ৯. 'তবলীগ' ১৯৪৭ পর্যন্ত চালু ছিল। জনপ্রিয়তার কারণেই তা সম্ভব হয়। ১০. 'মোয়াজ্জিন'ও ১৯৩১ এর আগের পত্রিকা। কিন্তু ১৯৪২ নাগাদ চলে বলে একালেরই প্রধান পত্রিকা এটি। ১৯৩১ এর পূর্বে প্রকাশিত রেঙ্গুনের ১১. 'বাংলা গেজেট' ও ১২. 'যুগভেরী' আলোচ্যকালেই খ্যাতি অর্জন করে। আলোচ্যপর্বের পূর্বে প্রকাশিত কলকাতার ১৩. 'হানাফী'ও ১৯৪০ সন পর্যন্ত চালু ছিল। ১৯১৬ তে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ১৪. 'সুনীতি' ১৯৩৫ পর্যন্ত চালু ছিল বলে মোয়াজ্জিনের একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়। ফজলুল হক সেলবর্ষীর ১৫. 'আল-মুসলিম'ও ১৯৩১ এর দিকে চালু ছিল। ১৬. 'পল্লী-বান্ধব' ১৯৩১ এর পরেই জনপ্রিয় হয়। ১৭. 'আমান'ও অনুরূপ।]

শিখা (বার্ষিকী, ঢাকা)—সম্পাদক : আবুল হুসেন (১৩৩৩) ; কাজী মোতাহার হোসেন (১৩৩৪) ; আবুল ফজল (১৩৩৮)

খাদেম (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মুজিবর রহমান (প্রখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' এর সম্পাদক, কলকাতা থেকে প্রকাশিত)।

www.pathagar.com

দরদী (সাপ্তাহিক, ঢাকা)—সম্পাদক : সৈয়দ জাহেদুল হক চৌধুরী (ঢাকার এই সাপ্তাহিক পত্রটি ১৯২৬ সন থেকে অন্তত ১৯৪৮–৪৯ সন পর্যন্ত নিয়মিত চালু ছিল।)

সওগাত (নবপর্যায়, মাসিকপত্র)—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।

হানাফী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন, পরে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও চৌধুরী শামসুর রহমান (দীর্ঘ দিন হানাফী চলেছিল।)

১৩৩৪ মাসিক মোহাম্মদী (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

তবলীগ (মাসিক)—সম্পাদক : শেখ মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান।

মোয়াজ্জিন (মাসিক)—সম্পাদক : সৈয়দ আবদুর রব (পরে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। —সম্পাদক, ঐ)।

সাপ্তাহিক সওগাত (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।

আল্-মুসলিম (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : ফজলুল হক সেলবর্ষী।

পল্লী–বন্ধব(সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : এস. এ. হোসেন (রাজশাহী থেকে প্রকাশিত ১৯৪৭ সন পর্যন্ত চলে।)

আমান (ঢাকা, সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ তফাজ্জল হোসেন (১৩৩৫ থেকে ১৩৪৭ পর্যন্ত চলেছে বলে অনুমান করা হয়। ১৯৪২ সনেও প্রকাশিত হচ্ছে বলে বলা হয়, সূত্র : এম. আবদুর রহমান)।

বাংলা গেজেট (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : ফররোখ আহমদ নেজামপুরী, পরে খোরশেদ আলম চৌধুরী (১৯৩৫–৩৬ সাল পর্যন্ত রেঙ্গুন থেকে প্রকাশিত হয়।)

১৩৩৭ জয়তী (মাসিক)—সম্পাদক : আবদুল কাদের (পরে কাদির)।

সেবকের বাণী (মাসিক)—সম্পাদক : কাজী নূরুল ওসমান, যশোর।

জমজম (মাসিক)—সম্পাদক : মঈনুদ্দীন হোসেন।

প্রাতিকা (বার্ষিক)—সম্পাদক : হবীবুল্লাহ বাহার ও অন্যান্য।

বেদুঈন (অর্ধ–সাপ্তাহিক সংবাদপত্র)—সম্পাদক : আশরাফ আলী খান (কলকাতা, কয়েক বৎসর চলে। পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে 'সাপ্তাহিক' হিসেবে চলছে। ঢাকায় অফিস ছিলো। ১৩৪০ এর 'অভিযান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আছে।)

তরুণের ডাণ্ডা ও এছলামের ঝাণ্ডা (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : (?), ফুরফুরার পীর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১৩৩৮ আল–কেরামত (ঢাকা, মাসিক, পরে সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মৌঃ আবদুল আজীজ।

নয়া বাংলা (সাপ্তাহিক, কলকাতা)—সম্পাদক : মৌঃ আশরাফুদ্দীন আহমদ চৌধুরী।

মুকুর (সচিত্র–মাসিকপত্র)—সম্পাদক : ডা. মোস্তাফিজুর রহমান শরীফ (কলকাতা, সূত্র : সৈয়দ খালেদ নৌমান)।

আহমদী (মাসিক, ঢাকা)—সম্পাদক : আবদুর রহমান খাঁ বি.এ. বি.এল (বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া আন্দোলনের মুখপত্র, ঢাকা, দীর্ঘদিন চলে ১৯৬২ সনের পরও)।

ইসলাম জ্যোতি (মাসিক, বহরমপুর)—সম্পাদক : মৌলভী আবদুল বারী।

যুগভেরী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মকবুল হোসেন চৌধুরী, পরে অন্যান্য (দীর্ঘজীবী পত্রিকা)।

www.pathagar.com

১৩৩৯ আল্-ইস্‌লাহ্ (মাসিক)—সম্পাদক : মৌলভী মুহম্মদ নূরুল হক দশঘরী।

রূপ রেখা (সচিত্র বার্ষিকী)—সম্পাদক : বেগম জাহানআরা চৌধুরী, কলকাতা।

গুলিস্তাঁ (মাসিক)—সম্পাদক : এস. সমশের আলী ও শেখ মোহাম্মদ উদ্রিস আলী ; পরে এস. এম মুফাখ্‌খারুল ইসলাম।

নব্য-বাংলা (মাসিক)—মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকা হবে। (সম্পাদকের নাম জানতে পারা যায়নি, পত্রিকার মলাট নেই বলে)।

আজ্জাদ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : ডা. ফজলুর রহমান।

তবলীগ (নবপর্যায়, মাসিক)—সম্পাদক : চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান ও মোহাম্মদ আবদুল হক এম. এ. (কলকাতা থেকে প্রকাশিত)।

১৩৪০ অভিযান (মাসিক, ঢাকা)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ বি. এ.।

নয়া-বাংলা (সাপ্তাহিক, কংগ্রেসী মুসলমানদের মুখপত্র, কলকাতা)—সম্পাদক : আশরাফউদ্দীন আহমদ চৌধুরী ও আলী আহমদ ওলী এছলামাবাদী (অন্তত দশ বছর চলে বলে জানা যায়)।

বুলবুল (ত্রৈমাসিক, পরে মাসিক)—সম্পাদক : মুহম্মদ হবীবুল্লাহ (বাহার) ও শামসুন্নাহার (মাহমুদ)।

দেশের কথা (সাপ্তাহিক, কলকাতা)—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন (সাপ্তাহিক সওগাতের পরিবর্তিত নাম, সাপ্তাহিক সওগাতের পরিবর্তে সওগাত কার্যালয় থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র)।

সেবক (মাসিক)—সম্পাদক : আবুল মনসুর এলাহী বক্স, সিরাজগঞ্জ।

বর্ষবাণী (বার্ষিকী)—সম্পাদক : বেগম জাহান আরা চৌধুরী, কলকাতা।

দূরবীণ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : রেজাউল করিম (?)

তরুণ মালদা (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মৌলভী রইসউদ্দীন আহমদ (উকিল)।

ছায়াবীথি (মাসিক)—সম্পাদক : নাজিরুল ইসলাম এম. এ. বিটি (কলকাতা)।

১৩৪১ ছুন্নত-অল জামায়াত (ধর্মবিষয়ক মাসিক)—সম্পাদক : মৌলানা রুহুল আমিন (কলকাতা)।

যুগের জ্যোতি (রেঙ্গুন, মাসিক)—সম্পাদক : ধীরেন মজুমদার ও সৈয়দর রহমান।

মোসলেম (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মৌঃ আব্দুল হাকিম ; পরিচালক ; মওলানা মোঃ রুহুল আমিন।

সবুজ বাঙলা (মাসিক, নারায়ণগঞ্জ)—সম্পাদক : এম, ওসমান আলী।

শিলং বার্ষিকী—সম্পাদক : আবদুল মালিক চৌধুরী।

ইসলাম প্রচার, ইসলাম ধর্মবিষয়ক মাসিক

[১৩৪২ সনের ভাদ্র সংখ্যা মাসিক মোয়াজ্জিন পত্রিকার কভারে বিজ্ঞাপনে বলা হয় : 'ইসলাম প্রচার মাসিক পত্রিকা,—এই ধর্মনৈতিক দুর্দিনে সমাজের কুসংস্কার দূর করিয়া ইসলামের বিমলজ্যোতি বিচ্ছুরিত করিবার দায়িত্ব লইয়াই..প্রকাশিত হইয়াছে। বৎসরে দ্বাদশ বার প্রকাশিত হয়। গ্রাহক হইয়া তবলীগে-ইসলামের সাহায্য করুন। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷৷. টাকা, ম্যানেজার : ইসলাম প্রচার, চাঁদমিয়া লেন, চট্টগ্রাম।]

১৩৪২ দৈনিক মোজাহেদ (দৈনিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আলী আজম (৪৭নং রিপন স্ট্রিট কলকাতা)।

www.pathagar.com

প্রতিভা (মাসিক, চট্টগ্রাম)—সম্পাদক : আবদুস সালাম।

হেদায়াত (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ মোয়েজুদ্দীন হামিদী, খুলনা।

১৩৪৩ পল্লীপ্রদীপ (পাবনা, সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : এ.এম. জহুরুল ইসলাম এম. এ.।

কৃষক-বাণী (নোয়াখালি, সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মৌলভী গোলাম সরওয়ার।

কৃষক-হিতৈষী (সাপ্তাহিক, নোয়াখালি)—সম্পাদক : মৌলভী রশীদ আহমদ।

পূরবী (মাসিক, চট্টগ্রাম)—সম্পাদক : ওহীদুল আলম ও আশুতোষ চৌধুরী।

চাষী (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মুজিবুর রহমান, ফুলপুরী (ময়মনসিংহ, কৃষক চাষী-আন্দোলনের মুখপত্র, পরে পাকিস্তান আমলে দৈনিক হয়, সন্ধ্যায় বের হতো)।

জনমত (সাপ্তাহিক, চট্টগ্রাম)—সম্পাদক : মৌলবী আবদুল মুনএম।

খাদেম বাহক (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মৌলবী হিফজুর রহমান।

হেলাল (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মৌঃ আবদুর রহমান খান (ময়মনসিংহ)।

আজাদ (দৈনিক)—সম্পাদক : মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

তকবীর (দৈনিক)—সম্পাদক : ফজলুল হক সেলবর্সী।

বঙ্গনূর (দৈনিক)—সম্পাদক : (?) (কলকাতার ৪৭নং রিপম স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হতো, মুসলিম সম্পাদিত, স্বল্পায়ু)।

১৩৪৪ সিরাজ (ত্রৈমাসিক, ফরিদপুর)—সম্পাদক : মোহাম্মদ সাদত আলী খান।

বঙ্গভূমি (মাসিক, ঢাকা)—সম্পাদক : চৌধুরী মোয়াজ্জম হোসেন।

লাঙ্গল (পাক্ষিক)—সম্পাদক : ডাঃ এ. কে. সিরাজউদ্দিন আহমদ (ফরিদপুর, সূত্র : আল্-ইস্লাহ্, ৪/৭, চৈত্র ১৩৪৪)।

শিশু-সওগাত (নবপর্যায়, মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।

১৩৪৫ খাতক (সাপ্তাহিক, পাংসা ফরিদপুর)—সম্পাদকের নাম জানা যায়নি।

চতুরঙ্গ (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু, হুমায়ুন কবির (পরে হুমায়ুন কবির)।

নেয়ামত (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুস সালাম (১৯৬০ পর্যন্ত চলে, দ্রষ্টব্য বাংলা একাডেমী, ঢাকার শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ)।

কৃষক (সাপ্তাহিক) প্রধান পরিচালক : মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ ; সম্পাদক : আহমদ আলী (কলকাতা, নিখিল বঙ্গ কৃষকপ্রজা সমিতির মুখপত্র)।

নয়া-জামানা (মাসিক পত্রিকা)—সম্পাদক : সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা সিরাজী (সিরাজগঞ্জ)।

নকীব (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ ছনাওর আলী (সিলেট)।

জাগরণ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আজিজুর রহমান (সিলেট)।

কৃষক (দৈনিক)—সম্পাদক : মৌলবী আবুল মনসুর আহমদ।

১৩৪৬ শীশ্-মহল (মাসিক)—সম্পাদক : রকিবুস সুলতান।

মোজাহেদ (সাপ্তাহিক, আসাম)—সম্পাদক : আবদুল লতীফ।

১৩৪৭ আল-জালাল (সাপ্তাহিক ; সিলেট)—সম্পাদক : মোহাম্মদ সিকান্দার আলী।

রূপায়ন (মাসিক)—সম্পাদক : আবু সাঈদ চৌধুরী, কলকাতা।

১৩৪৮ প্রভাতী (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ রজিউর রহমান, সিলেট।

নওরোজ (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, দিনাজপুর।

জাগরণ (সাহিত্য-পাক্ষিক)—সম্পাদক : মীজানুর রহমান, পশ্চিমবঙ্গ, বনগাঁ।

www.pathagar.com

ত্রিকাল (বার্ষিকী)—সম্পাদক : আতাউর রহমান ও অন্যান্য।

নবযুগ (দৈনিক, নবপর্যায়ে)—সম্পাদক : কাজী নজরুল ইসলাম (এ. কে. ফজলুল হক পৃষ্ঠপোষিত, আতাউর রহমান এবং অনেকে এতে কাজ করতেন)।

মৃত্তিকা (দ্বিমাসিক)—সম্পাদক : কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ (কলকাতা ১৩৫৫–৫৬ বা ১৯৪৭–৪৮ সন পর্যন্ত চলে)।

আজান (মাসিক)—সম্পাদক : সালাহুদ্দীন ইউসুফ।

সাহিত্য (ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা)–সম্পাদক : মৌলবী মোহাম্মদ আমীনুল হক (আসাম –মুসলিম লিটারেরি এসোসিয়েশন–এর মুখপত্র, শিলং)।

ইমাম (মাসিক, ধর্মবিষয়ক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ এসহাক (কলীমবাগ, যশোর)।

১৩৪৯ সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল বার্ষিকী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী)—সম্পাদক : সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন।

আল–আমান (মাসিক, সিলেট)—সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার।

'পাক্ষিক পাকিস্তান' (পাক্ষিক)—সম্পাদক : নজীর আহমদ (পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, ঢাকা ১৯৪২, এর মুখপত্র)।

সবুজ পতাকা (মাসিক, সিলেট মুকুল মেলার মুখপত্র)—সম্পাদক : এমাদউদ্দীন আহমদ চৌধুরী।

১৩৫০ গুল–বাগিচা (সচিত্র মাসিক)—সম্পাদক : আবদুল ওহাব সিদ্দিকী (কলকাতা, কিশোর–পত্রিকা)।

নেদায়ে ইসলাম (মাসিক)—সম্পাদক : ডাঃ আমীর আলী, কলকাতা।

১৩৫১ দি সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল ম্যাগাজিন (১৯৪৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) সম্পাদক : এ. কে. এম. কবির (সওগাত, চৈত্র ১৩৫১ সংখ্যায় আলোচনা আছে।)

নিবেদন (সাপ্তাহিক, কলকাতা)–এর প্রথম লেখা বেগম সুফিয়া কামালের। এফ. রহমানের একটি প্রবন্ধ আছে—শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ, বাংলা একাডেমী দ্রষ্টব্য। ১৩৫১–এর আগেই বের হয় বলে অনুমান, পূর্ববঙ্গের পত্রিকা, ফেণীর?

১৩৫২ মিল্লাত (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : আবুল হাশিম, কলকাতা।

১৩৫৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী (১৩৫২–৫৩)—সম্পাদক : নূরুল ইসলাম চৌধুরী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সম্পাদিত এই নামের প্রথম পত্রিকা। সওগাতের জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ সংখ্যায় আলোচনা আছে)।

ইত্তেহাদ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : আবুল মনসুর আহমদ।

১৩৫৪ সীমান্ত (মাসিক)—সম্পাদক : মাহবুবউল আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরী (চট্টগ্রাম)।

কাফেলা (মাসিক)—সম্পাদক : কাজী নাজমুল হক প্রমুখ (ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে)।

জিন্দেগী (অর্ধ–সাপ্তাহিক,পরে দৈনিক)—সম্পাদক : কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ (বস্তুতপক্ষে ১৩৫৪ সনের শ্রাবণ–ভাদ্র, আগস্ট ১৯৪৭ মাসেই বাঙলাদেশ বিভক্ত হয়ে যায়। এই সময়ে দুই বাঙলা থেকেই স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান এর পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এই বছরে অসংখ্য পত্রিকা দুই দেশ থেকে প্রকাশিত হয়।)

ইনকেলাব (সাপ্তাহিক, কলকাতা)—সম্পাদক : শাহ্ আজিজুর রহমান, বি.এ. (অনার্স)। (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ৫ আষাঢ় ১৩৫৪, ২০/৬/১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ৪৯ বেনিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা–১৪ থেকে প্রকাশিত হয়। পরে প্রধান সম্পাদক হন গুলিস্তাঁ–সম্পাদক

www.pathagar.com

ফখরুল ইসলাম। ১৯৪৭ পরবর্তীকালে তিনি গুলিস্তাঁ আবার প্রকাশ করেন বরিশাল থেকে। কিন্তু ওগুলো তখন আর লোকেরা ছুঁয়ে দেখতো বলে মনে হয় না। মান ছিলো না। যুগও পরিবর্তিত তখন।)

বেগম (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : বেগম সুফিয়া কামাল ও নূরজাহান বেগম।

মিনার (কিশোর-মাসিক)—সম্পাদক : বেগম ফওজিয়া সামাদ (ঢাকা)।

নয়া-জামানা (সাপ্তাহিক, রাজশাহী)—সম্পাদক : (?) (দিনাজপুরের 'নওরোজ'-এর বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়)।

নও-বেলাল (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ।

আনসার (পাক্ষিক)—সম্পাদক : মওলানা সখাওতুল আম্বিয়া। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরপর স্বাধীন দেশে বাঙলার দুই অঞ্চল থেকেই নতুন মেজাজে অসংখ্য সাহিত্য ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে।

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

অ
অল গজ্জালী ৫
অষ্টাদশ পুরাণাণি ১১
অষ্টাদশী ১৭২
অন্নদামঙ্গল ১৩
অন্নদাশংকর রায় ১৪০, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৮, ১৭৪, ১৮৯, ১৯৬, ১৯৮, ২২৯, ২৬৩, ৩৫৭, ৩৮২
অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল ৩৮৭
অনন্ত দাস ১৭
অনন্ত মিশ্র ১৮
অকিঞ্চন চক্রবর্তী ১৮
অক্ষদকুমার দত্ত ৩১
অক্ষদকুমার নন্দী ৩০৭
অন্নদাকুমার চক্রবর্তী ৩৯৮
অকিন ৮২, ২৬৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ৩৯৭
অন্ধ্র ১৬৮
অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ১৬৭
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৬৭
অর্চনা ৪২, ৩৮৮
অবসর ৩৮৮
অঙ্কুর ৩৮৮, ৪০০
অর্ঘ্য ৩৮৯
অতিথি ৩৯০, ৪০০
অঞ্জলি ৩৯১
অলকা ৩৯৩
অলৌকিক রহস্য ৩৮৯
অলকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩৬০
অস্ফুট ৩৯৬, ৩৯৯
অধিকার ৩৯৮
অর্থনীতি ৫৬
অগাষ্টস ১২১
অযোধ্যারাম ১৮
অগ্রগতি ৪৬, ১৩৮, ১৬৫, ৩৮৬
অজিতকুমার ঘোষ ৪৪, ৪৮, ৩৮২
অজিত কৃষ্ণ বসু ১০৩, ১০৬
অজিত দত্ত ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৮১, ১৮৮, ১৯৯, ৩৯৯
অজিতকুমার গুহ ১৭৬
অজিতকুমার দত্ত ৩৯৮
অমৃতলাল বসু ৪২, ৪৩
অমিয়ভূষণ মজুমদার ১৬৬
অমিয় চক্রবর্তী ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৯৯
অমিয়কুমার স্যান্যাল ১৭৭
অমিয় রায় চৌধুরী ২২৪
অমিয় দাশগুপ্ত ৩৪১
অমিয় কুমার সেন ৩৫৪
অমিয় সেন ১৯৫
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ৪৩, ৩৮৯
অমল দত্ত ১৭৬, ১৭৭
অমর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৬
অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৬
অমলেন্দু গুপ্ত ২৫৩
অমলেন্দু দে ৩৮২
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ৩৮২
অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৮
অম্বিকাচরণ গুপ্ত ৩৮৯
অমূল্যচরণ সেন ৩৮৯
অমরেন্দ্রনাথ রায় ৩৯২, ৩৯৯
অমরনাথ প্রামাণিক ২৯৯
অমলেশ ত্রিপাঠী ৬৫
অরবিন্দ পোদ্দার ৩৩
অরবিন্দ ঘোষ ৪৩
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১৭৪, ৩৮২
অরুণকুমার মিত্র ১৭৫
অরুণ ভট্টাচার্য ১৭৭
অরুণ মিত্র ১৯৮, ১৯৯
অতুলপ্রসাদ সেন ৪৩
অতুলচন্দ্র গুপ্ত ৫৮, ১৭২, ১৭৬
অতুলানন্দ চক্রবর্তী ২৭৩
অতুল সুর ৩৮২
অনবদ্য ভূমিকা ৪৯

www.pathagar.com

অনিল আচার্য ১৭৬
অনিল চক্রবর্তী ১৭৭
অনুরূপা দেবী ২৭৩
অনাথ বন্ধু ৩৯১
অনুপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯১
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১২৪, ১৭৫, ১৯৮, ১৯৯, ৩৮২
অচ্যুত গোস্বামী ১৭৪
'অন দি সোভিয়েট কন্সটিটিউশন' ১৮৫
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩, ৩৮২
অসিত মুখোপাধ্যায় ৩০৭
অসিতকুমার রায় ৩৮২
অসহযোগ আন্দোলন ৬৫
অশোক মিত্র ১৭২, ১৭৭
অশোক চট্টোপাধ্যায় ২৭১
অশোক কুমার কুণ্ডু ৩৮২
অশ্বিনীকুমার সেন ৩৫৪
অধীর দে ৪৬
অধর দাস ৩৭১
অধরচন্দ্র নাথ ৩৮৮
অদ্বৈত মল্লবর্মণ ২৪৪, ৩০৬
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭০, ২৭২, ২৭৩, ২৭৬
'অবাঞ্ছিত ব্যবধান' ৩৫৭
অবিনাশচন্দ্র সেন ৩৬০
অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৩৬০, ৩৭১
অখিল নিয়োগী ৩৯৮

আ
আইনুল হক খাঁ ১৩৭, ১৪৫
আইনুদ্দীন ১৮
আইনুল ইসলাম ৩৯৪
আকবর ১৭
'আইয়ামে জাহেলিয়াত' ৮৪
আকবর আলি এম.এস.সি ১০৫
আকলিমা খাতুন ১০৬
আকবর কবির ১৭৭
আকবরউদ্দীন আহমদ ২১২
আকবরউদ্দীন ৩০৬, ৪৭
আকমল হুসেন ৩৩২
আকরম খাঁ, মৌলানা মোহাম্মদ ৪৭, ৫১, ৫২, ৬৩, ৭০, ৭২, ৮৯, ৯২, ১০৫, ১৩০, ২১৬, ২৮৩, ২৯১, ২৯৩, ৩০৯, ৩১৮, ৩২১
আকরম হোসেন ৩৭২
আকিল ১৭, ১৮
আখবারে এসলামীয়া ৫০
আখতার হুসেন ১০৬
আগা খাঁ ১৩৬
আগতা ৪০০
আঙ্গুর ৫২, ৩৬৮, ৩৭৫, ৩৯২
আচার্য যদুনাথ সরকার ১৪০, ১৪৬, ১৫৭
আছিয়া খাতুন ১০৬
'আজাদ পাকিস্তান' ১৩৬
আজলাফ ৫
আজকাল ৪০০
'আজাদ' ৩৭৫
আজহার ৩১০
আজমতউল্লাহ ১৮
আজহারুল ইসলাম ১০৫, ২৫৭, ২৫৯
আজিজুন নেহার ৪৯
আজহারউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী ৩২৯
আজিজুর রহমান ১০০, ১০৪, ১৪৩, ৩৭১
আজিজুল হাকিম ১৪৫, ২১১, ২৩৬, ২৩৭, ২২৫, ৩২৯
আজিজুল হক ৩৫৯
আতাউর রহমান ১৬৫, ১৬৬, ১৭২, ১৮৭, ১৯৭, ৩৭২
'আদুভাই' ১৭১
'আদম শুমারী' ১৪
আদিময়ূরভট্ট ১৭
আদেলা খানম ১৪১
আতরাফ' ৫
আর্থ-সামাজিক ঘটনাবলি ৬৬
আতোয়ার রহমান ৩৮২
আধুনিক সাহিত্য ৩৩
'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' ২২, ৩৩, ৪৭
আধুনিকতাউত্তর কবি সাহিত্যিক ১৯
'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' ২৫, ৩৩
'আনন্দমঠ' ৫, ৩৬
আনন্দ ও মুসলমান গৃহ ১০৯
'আনন্দমঠের বহ্নুৎসব' ৭০
আনন্দবাজার প্রকাশন ৩৮২
'আনন্দবাজার' ৫২, ৭০
আ.নাম. বজলুর রশীদ ১০৬
আনিসুজ্জামান ৩৩, ৪০, ৪৬, ৪৯, ৫৪, ১০৮, ১২০, ১২৫, ৩৮২
আনোয়ার হোসেন ১০৪, ১০৫, ২১২, ২৬৬, ৩৭২
আনোয়ার পাশা ১৪২
আনোয়ারা রহমান ৩৭১

www.pathagar.com

আনোয়ারা চৌধুরী ১০৬, ৩৭২
আনোয়ারী এম রহমান ৩৫৯
আনওয়ারউল কাদির ১৪৭
আঞ্জুমনে ওলামায়ে বাঙ্গালা ৬৭, ২৯২
আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম ৬৭
আনর আলী ৩২৯
আনসার আহমদ ৩৫৩
আনোয়ারা বেগম ৩৫৩
আনীসুদ্দীন আহমদ ২৫৯
আফজাল আলী ১৩, ১৮
আফতাব উদ্দিন আহমদ ১০৪
আফতাব আলী ৩২৯
আফসারউদ্দীন আহমদ ২১২
আফিয়া খাতুন ৩৩২
'আবওয়াব' ২৪
আবদুজ্জাহের ৩২৯
আবাদ ৩৯৬
আব্বাসউদ্দীন আহমদ ৭২, ১২৬, ২২৬
আবদুর রাজ্জাক ১৮, ৩৩২, ৩৪১, ৩৪৭, ৩৫৩, ২১২, ৩২৮, ৩৭৬
আবদুর রহিম ১০৫
আবদুর রাজ্জাক (কবি) ৩২৯
আবদুর রশীদ ১১৮, ১২৭, ৩৭১
আবদুর রশীদ খান ৩৭১
আবদুর রউফ ২১৬
আবদুর রহমান ৩৭১, ৩২৩
আবদুর রব চৌধুরী ৩৪৭, ১১৩
আবদুর রকিব ৩৫৩
আবদুর রশিদ সিদ্দিকী ৩৯২
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১৪, ২০, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৬৮, ৮৮, ৯৩, ১০৩, ১৩৬, ১৪০, ১৪১, ১৪৭, ২৯০, ৩১৪, ৩২৯, ৩৯২
আবদুল করিম ৩৮, ৩৮২, ৩২৯, ৩৫৪, ৩৭২, ৩৭৪
আবদুল করিম খোন্দকার ১৮
আবদুল হামিদ ১৮
আবদুল কাদির ৪৭, ৭৪, ৭৯, ১০৫, ১০৬, ১১৫, ১১৯, ১২৫, ১২৬, ১৪৩, ১৬০, ২১১, ২১২, ২২০, ২২৯, ২৪৯, ২৫২, ২৬২, ২৬৬, ৩০১, ৩০২, ৩১৩, ৩১৫, ৩৮৩
আবদুল মওদুদ ৬৫, ২২৯
আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী ৮৮, ১০৮
আবদুল হাই মাশরেকী ১০১
আবদুল গণি হাজারী ১০১
আবদুল ওয়াহেদ ১০৩
আবদুল আলি ১০৫, ১১৭
আবদুল আলীম চৌধুরী ১০৫
আবদুল হাই ১০৬
আবদুল কাদের খান ২৩৭
আবদুল আজিজ তালুকদার ১১১
আবদুল খালেক ১২৬
আবদুল মালেক ১৭৭
আবদুল মজিদ ২১২, ২২৪, ২৩৭, ৩৭১
আবদুল হক ২১৫, ৩০১, ৩৮২
আবদুল গফুর সিদ্দিকী ৪৭, ৯৩, ১০৪, ৩৮৩
আবদুল বাসেত ২২৪
আবদুল গফফার চৌধুরী ২২৪, ৩২৬, ৩২৯, ৩৩২, ৩৫৩, ৩৭১, ৩৭৬
আবদুল করিম খান ফারুকী ২২৪
আবদুল কাইয়ুম ২৩৭
আবদুল কুদ্দুস ২৫৩
আবদুল আজিজ ২৭৯, ৩২৯
আবদুল মা'বুদ ৩১০
আবদুল লতীফ ৩২৯
আবদুল হান্নান ৩৩২
আবদুল জব্বার ৩৪৭
আবদুল কাদের বি.এ. ৩৫৯
আবদুল ওহাব সিদ্দিকী ১১৩, ৩৫৯, ৩৭৪
আবদুল হালিম চৌধুরী ৩৭১
আবদুল মান্নান সৈয়দ ৩৭১
আবদুল মতিন চৌধুরী ৩৭৬
আবদুল নবী ১৭
আবদুল আল রাজী ৩৭৫
আবদুল মমিন চৌধুরী ৩৮৩
আবদুল্লাহ সুরাবর্দী ১৬১
আবদুল মোনেম ৩৯৬, ৩৯৭
আবদুল্লাহ রসুল ৪০, ৬৫, ১৩৭
আবদুল্লাহ ফারুক ৩৭২
আবদুল্লাহ আল মুতী ৩৫৯
আবদুস শুকুর মুহম্মদ ১৮
আবদুস সালাম ২৩৭, ২৫২, ২৫৩, ২৬৬, ৩৫৩
আবদুস সুবহান চৌধুরী ৩২৫, ৩২৯
আবদুস সালাম চৌধুরী ৩৭৭
আবু রুশদ ৫, ৭৫, ১০৩, ১৩৭, ১৪৫, ১৬৭, ১৭৫, ১৭৭, ১৯৪, ১৯৫, ২৯০, ৩০২, ৩০৬
আবু মহামেদ হাবীবুল্লাহ ৯, ১০৩, ১০৭, ১৭৩, ১৭৬
আবুজোহানূর আহমদ ১১৩

আবু আহমদ ফজলুল করিম ১৪৫
আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৬১
আবু নাসের ১৭৫
আবু সয়ীদ আইয়ুব ১৭৩
আবু সাঈদ চৌধুরী ১৮৯, ১৯০, ১৯৬
আবু ইউছুফ ১৯৪
আবু তামাম আল্লামা জমশখরী ২১২
আবু নূর ২২৪
আবু জাফর শামসুদ্দীন ৩০৬
আবু মুকতাদির ৩২৫
আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৩৮৩
আবু জাফর ৩৮৩
আবু ইমাম ৩৭৬
আবুল কাসেম ফজলুল হক ৩৩, ৪০, ৪৮, ১৯৭, ৩৪৮, ৩৮২
আবুল কালাম শামসুদ্দীন ৪৭, ৭৫, ৭৬, ৯৩, ১২৬, ১২৭, ১৩৩, ১৩২, ১৪৫, ১৪৭, ২১২, ২১৬, ৩০৬, ৩১৫, ৩৭১, ৩৭৬
আবুল মনসুর আহমদ ৪৭, ৭৫, ৭৬, ৯৩, ৯৯, ১০৩, ১৩০, ১৪০, ১৪১, ১৪৫, ১৭১, ১৭৩, ১৮৩, ১৯৪, ৩১৮, ৩৮৩
আবুল ফজল ৪৭, ৭৫, ৭৬, ৮৩, ৯৯, ১০৩, ১১২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১৪০, ১৪৫, ২৪৯, ২৫০, ২৫২, ২৬৩, ২৬৬, ২৯০, ৩০১, ৩০৬, ৩১৪, ৩৩২, ৩৩৫, ৩৪১, ৩৮৩
আবুল হুসেন ৪৪, ৪৭, ৬৮, ৭৫, ৯২, ১০১, ১১০, ১১২, ১১৭, ১১৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৭, ১৪৯, ২৬৮, ৩১৫, ৩১৮, ৩৬৩, ৩৮৩
আবুল হোসেন ৭৫, ১০০, ১০৫, ১৩৭, ১৬১, ১৬৮, ১৭৫, ১৭৬, ১৯০, ১৯২, ১৯৩, ১৯৯, ৩০২, ৩৩২, ৩৭২, ৩৮৩
আবুল হাশিম ৬৩, ৩৩৩
আবুল হাসানাৎ ১৪৫, ২৩৭, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৫৯
আবুল ফতিহ ১৭৭
আবুল কালাম আজাদ ২৩১, ৩৮২
আবুল হাসান ২৯০
আবুল কালাম চৌধুরী ৩৩২, ৩৭৬
আবুল কাসেম ৩৭১
আবুল হাশেম খান চৌধুরী ৩৮৩
আবুল আহসান ২২৫
আভা দেবী ২২৬
আমজাদ হোসেন ৪৮
আমেরিকা ১২
'আমরণ অনশনব্রত' ৫৭
'আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা' ৭৩, ৭৯
আমার দেশ ৩৯২
'আমাদের কাজ' ৯৪
আমাদের সাহিত্য ১৩৬
আমিনউদ্দীন আহমদ ১০৫, ২৫৭, ৩১০
আম্মালামাই বিশ্ববিদ্যালয় ১৬৭
আমিনুল হক চৌধুরী ৩২৯
আমিনুল ইসলাম ২৩৭
আমেনা খাতুন ৩৩২
আমিন আহমদ ৩৭১
'আর্যসঙ্গীত সমিতি' ২৪৮
আর্য দর্পণ ৩৮৯
'আরজল' ৫
আরতী ৪২
আর রহমান ৩৩২
আরাধনা ৩৯৫
'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' ১৬০
আল এসলাম ৫২, ৫৩, ৭৩, ৭৯, ২৯২, ৩৯১
'আল মামুন ক্লাব' ৬৮, ১২১
আল-ইসলাহ ৮২, ৩২৪, ৩৪৭, ৩৭৯
আল মুসলিম ১০৭, ৩৯৯
আল মা'আরী ২৫৮
আল ফারুক ৩১০
আল হক ৩৯২, ৪০০
আল কাদেরী ৩৯৮
আল্ বালাগ ৩৯৯
আল আমান ৮২, ৩৯৯
আল কেরামত ৪০০
অ্যালবার্ট হল ৪৯
আলাউল ১৭, ১৯
আলতাফ চৌধুরী ২৭০, ২৭২, ২৭৩
আলম রওশনবানু চৌধুরী ৩৪১, ৩৪৭
আলাউদ্দীন আল আজাদ ২৯০
আল্লামা একবাল ৩৪৯
আলতাফ হোসেন ৩৭১
আলী মুহম্মদ ১৮
আলীগড় কলেজ ৬৭
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ৬৭, ১৬৭
আলী আশরাফ চৌধুরী ১০৬
আলী নূর ১১৩
আলী আশরাফ ১৭২
আলিমুজ্জামান চৌধুরী ২০৬
আলী হায়দার ৩১০
আলী আহমদ ৩১০

www.pathagar.com

'আশরাফ' ৫, ১৭
আশরাফ সিদ্দিকী ১০১, ১৭৫, ৩৫৯, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৫
আশরাফুজ্জামান খাঁ ১৩৭, ১৪৫
আশরাফউদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী ১৩৭, ৩২৫
আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন ১০১, ৩২৮, ৩২৯, ৩৪৭
আশা ৩৮৮
আশরাফ আলি ৩৭১
আশরাফ আলি খান ২২৪, ২৩৭, ৩৭১
আশু চট্টোপাধ্যায় ৪৮
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৩৮৭
আশাপূর্ণা দেবী ১০৩
আশুতোষ ভট্টাচার্য ২৮১
আশুতোষ চৌধুরী ২৪৮, ২৫২, ২৫৩, ২৬৬
আসাম ৬৯
'আসাম বাঙলা ছাত্র ফেডারেশন' ৬৯
আসিয়া খাতুন ১৩৪
আহমদ শরীফ ৫, ৭, ১১, ২০, ২১, ৩৩, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ১৫৬, ৩৮২
আহমদী ৫০, ৩৯৬
আহমদীয়া বুলেটিন ৩৯৪
আহলে হাদীস ৫২, ২৯১, ৩৯১
'আহলে সুন্নত' ১৪১
আহমদ ছফা ৩৮২
আহসান হাবীব ৭৫, ১০৩, ১৩৭, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৯০, ১৯৩ ২২৮, ২৪৫, ২৯০, ৩৭১, ৩৭২
আহমদুর রহমান ১০৫
আহমদ মনির ১৬০
আহমদ ফজলুর রহমান ৩৬০
আহম্মদ হোসেন ২২৪
আহমদুর রহমান ২৫৩
আহদ্দর আলী ৩২৯
আহমদ হুসেইন ৩৪১
আহমদ খাঁ ৩৫৯
আহসানউল্লাহ (খান বাহাদুর) ৪৭, ৩৮৩
আহসানউল্লাহ এম.এ ৩৭৫
আহমদ সোবহান ৩৯১
আহমদ আলী এনায়েতপুরী ৩৯৫
'আয়া সোফিয়া' ৯২
আয়েষা আহমেদ ১০৮
আয়না ৯৩

ই

'ইউসুফ জোলেখা' ১৫, ১৬, ১৭, ১৯
ইউরোপীয় রেনেসাঁস ৩২
ইউসুফ আলী ১০৫
ইউসুফ মেহের আলী ১৭৩
ইউনুছউদ্দীন আহমদ ২১২
'ইউনিভার্সিটি সংখ্যা' ৩০৯
ইকবাল ১০৫, ৩৫১
ইকবাল হোসেন ৩২৫
ইছলাম জগৎ ৩৯৫
ইজারাদার ২৪
ইজাবউদ্দীন আহমদ ৩৬২, ৩৬৪, ৩৭১
ইঙ্গিত ৪০০
'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' ৩২
ইণ্ডিয়ান মুসলমান এ্যাসোসিয়েশন ৬৭
ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩, ৩৮৯
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ২৭৩, ৩৭১
ইন্দু মিত্র ৩৮৩
ইবরাহীম খাঁ, অধ্যক্ষ ১০৫, ৩৩৪, ৩৭১
ইবনে বতুতা ১৭৬, ১৮৮
ইবনে মুসা ১০৩
ইংরেজ কোম্পানি শাসন ২৫
ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলিম মনোভাব ২৮
ইমাউল হক ১০১, ১৬০, ১৬১, ১৬৪
ইংরেজি স্কুল ৬৮
ইলবার্ট বিল ৩৫
ইলা সেন ১০৬
ইলা দাশগুপ্তা ২২৬
ইলা মজুমদার ৩৭১
ইশান নাগর ১৭
ইসলাম প্রচারক ৫০
ইসরাৎ হোসেন জুবেরী ১৭১
ইসলাম আভা ৫২, ৩৯০
ইসলাম দর্শন ৫২, ৩৯১, ৩৯২
ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৪৫, ৪৬, ৭৩, ৭৫, ৭৯, ৮৭, ১০৩, ২৯২
ইসলাম সুহৃদ ৩৮৮
ইসলামাবাদ ৩৯৮
ইসলাম রবি ৫০
ইংলণ্ড ১২

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩১, ৩৭৮
ঈদ উৎসব ৭১

www.pathagar.com

ঈদ সংখ্যা ৮১
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২৯০

উ
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ৬৫
উত্তরা ৩৯৬
উত্তরাধিকার ১৩৬
উড়িষ্যা ৪৯, ৬৯
'উদ্বাস্তু' ৬৫
উপাসনা ৩৮৮
উজির আলি ১৮
উমর খৈয়াম ২৫৭
উমা পাণ্ডুজিনী বসু ৯৪
'উদয় শংকর' ১৯৪
উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৩৮৭
উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ৩৯১
উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯০, ৩৯৩
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৯১
উপেন্দ্রনাথ সরকার ৩৯১
উপেন্দ্রচন্দ্র দাস ৩২৯
উপেন্দ্রমোহন দাস ২৬৮
উস্তায়ারউদ্দীন আহমদ ৩৭৬
উড়ো খৈ ৩৯৬

ঊ
ঊষা ৪০০

ঋ
'ঋণ-শালিসী বোর্ড' ৬০
ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৯৫, ৩৯৮

এ
একতা ৩৯৩
একলিমুর রাজা চৌধুরী ৩২৬
এতিম আলম ১৮
এবনে গোলাম নবী ২৬৩
'একটি সভার রিপোর্ট' ৯৩
'একবাল সোসাইটির মুখপত্র' ৩৪৯
একরামুল হক ৩৭১, ৩৭৫
'এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল' ৬৪
এনামুল হক ৩৩৬
এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয় ১৬৭
'এছলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা' ২০৯
এডওয়ার্ড কলেজ ১৬৬
এয়াকুব আলী চৌধুরী ১০৪
এহছান আলী বি.এ ২১২
এ কে এম কমরউদ্দীন ২৬৬
এ কে আজীজুল হক ৩৬৪
এ কে জয়নাল আবেদীন ৩৭১
এ কে এস নূর মোহাম্মদ ৩৫২
এ কে ফজলুল হক (শেরেবাংলা) ৩৯, ৫৯, ৬০, ৬৪, ১৩৭, ১৯৮ ২০৫, ২৬৩, ৩৬৮, ৩৮৬
এ কে এম নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ ১০১, ৩৭১
এ কে শামসুল আলম ১০৬
এ কে আহমদ খাঁ ১১২
এ কে এম শামসুল হক ২২৪
এ এইচ সৈয়দ ২৫৫
এ এম বসির ১০১
এ এফ এম আবদুল জলীল ৩৫৩
এ কাছেম কেশরী ৩৫৩
এ সবুর ১৬০
এম আকবর আলি ২৬৩, ৩৫৩, ৩৭১
এম আবদুর রউফ ২৬৬
এম সুলতান ৩৩২
এম ময়ীদুল হক চৌধুরী ৩৩২
এম মফিজ আহমেদ ৩৫৩, ৩৫৪
এম আলতাফ হোসেন ৩৫৩
এম খায়রুল ইসলাম ৩৭১
এম, নূরুল ইসলাম ৩৭১
এম. আতীকুল্লাহ ৩৭১
এম নাজিরুদ্দীন আহমদ ৩৮৬
এম. আহমদ আলী ৩৩২, ৩৯৯
এম মেছের আলী ৩৯৯
এম এন রায় ৫৮
এম এস উদ্দীন ৩৯৯
এম এস নূরুল হোসেন কাশিমপুরী ৩৮৮
এম সিরাজুদ্দীন চৌধুরী সাহিত্যরত্ন ১০০
এম আবদুর রহমান ১০৫, ২১২, ২২৪, ৩৪৭
এম এ ওয়াহিদ ২১১
এম. আনোয়ারা বেগম ২২৪
এম এ আজম ২২৪
এম ওসমান আলী ১০৪, ২৩২
এম জেসারত আলী ২১২
এম, ফরহাদ ২১২
এমাদউদ্দীন আহমদ ৩৭৬
এ জেড নূর আহমদ ২৫৭
এ জেড আবদুল্লাহ ৩২৫, ৩২৯, ৩৪৭
এস এ খালেক ৩৩২

www.pathagar.com

এস কে জামাইয়াতুল্লাহ ৩৫৩
এস. এম. ছেরাজুল হক ৩৭১
এ বি এম মাহমুদ ৬৫
এইচ জে নূর আহমদ ১০৩
এস মাহমুদুর রহমান ১০৪
এস এ হামিদ ১০৫
এ এস এম আবদুর রউফ ১৮৯
এইচ এল ব্রেলসফোর্ড ১৯৯
এস শমসের আলী ২২১
এস মানিক বখশ ২২৪
এস এম. খাদেম আলী ২২৫
এ এফ রহমান ২২৯, ৩৫৩
এস এ হোসেন ৩৯৯
এস এ এনছান আলী ২১৬
এস এম বজলুল হক ২৩৯

ও
ওবায়দুল্লাহ রওশনাবাদী ১০৬
'ওমর উন্মিয়ার খেয়ালাত' ২২১
ওমর খৈয়াম ১৩৬, ২৫৭, ৩১১
ওমর ফারুক ১৩৬
ওমরাতুল ফজল ২৫০
ওয়াকিল আহমদ ৫, ৭, ৩৩, ৪০, ৪৬, ৪৭
ওয়াজিদ খান ১৯
ওমদাতন্নেসা খাতুন ৯৪
'ওরিয়েন্টাল সিকিউরিটি লাইফ ইন্সিওরেন্স' ১০৭
ওহীদুল আলম ৪৭, ২৪৯, ২৫০, ২৫৩, ২৬৬
ওয়াহেদুল হক ২২৪
ওয়ারেসউদ্দীন ৩৯২
ওয়াভেল নির্বাচন ৬৪

ক
কল্লোল ৪৪, ৪৫, ৪৯, ৭৫, ৯৮, ১৬৫
কবিচন্দ্র ১৮
কবীন্দ্র পরমেশ্বর ১৭
কল্যাণ দেব ১৮
কমলাকান্ত রামতনু ১৮
কমিউনিজম ৪৩
'কমরেড' ৬৩, ২৯০
কল্পনা সরকার ৩৭২
কল্যাণী ঘোষ ৩৭২
কবিন্দ্র মদন দত্ত ১৮
কবিশেখর রায় ১৭, ১০০, ২২৪, ২৬৩, ২৭৬, ৩৫৪
কলকাতা ১৬৭
কলিকাতা মাদ্রাসা ২৩, ২৯
কংগ্রেস ৩৫, ৪০, ৬৯
কংগ্রেস স্থাপনা ২৫
কলকাতা সর্বদলীয় কনভেশন ৪০
কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি ৩৯
কমিউনিস্ট কার্যাবলি ৫৬
'কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টি' ৫৭
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৬৯
কলকাতা কর্পোরেশন ৭০
কমল মজুমদার ১৭৫
করালীকান্ত বিশ্বাস ১৭৭
কমিউনিস্ট পার্টি ৩৪, ৩৯, ৪৩, ৫৫, ৬৩
কলিমউদ্দীন আহমদ ২৬৬
কাজী আবদুল ওদুদ ৪, ২২, ২৭, ৩৩, ৪০, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭৫, ১০১, ১০৫, ১১০, ১১২, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২১, ১২৩, ১২৫, ১২৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৭, ১৬০, ২০৯, ২২৯, ২৩২, ২৪৪, ২৪৯, ২৬৩, ২৬৮, ৩১৭, ৩৪২, ৩৮৩
কাজী ইমদাদুল হক ৪৭, ৫১, ৭৫, ১২৯, ৩১৪, ৩১৫, ৩২১
কাজী আকরম হোসেন ১০১, ১১৩, ১০৫, ৩১৪
কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ ১০৩, ২৩৯, ২৪৫, ৩০২, ৩০৬, ৩৭১, ৩৭২
কাজী আজমল হক ২২৫
কাজী আবদুল খালেক ৩৫৯
কাজী আবুল হোসেন ১০৪, ৩৭১
কাজী আবদুল মান্নান ৫, ২৫, ৪৬, ৩৮৩
কাজী দীন মুহম্মদ ৫, ৪৬, ৩৮৩
কাজী দৌলত ১৭, ১৯
কাজী বদিউদ্দীন ১৮
কাজী দানিশ ১৮
কাজী নজরুল ইসলাম ১৯, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৯, ৫১, ৫৮, ৬৮, ৭২, ৭৪, ৯২, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১১২, ১১৯, ১২১, ১২৬, ১২৯, ১৩১, ১৩৩, ১৪০, ১৬০, ১৭৫, ১৯০, ১৯২, ১৯৫, ২০৬, ২১০, ২২৪, ২২৯, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৮, ২৯৮, ৩০১, ৩১৪, ৩১৭, ৩৩৩ ৩৩৫, ৩৪৬, ৩৮৩, ৩৯৩
কাজী মোতাহার হোসেন ৪৭, ৭০, ১০১, ১০৪, ১০৯, ১১১, ১১২, ১৪০, ১৪৭ ২০৯, ২১১, ২১৩, ২১৯, ২৬৩, ৩৯৭
কাজী আবদুর রশিদ ১০৫, ১০৬
কাজী সিরাজুল ইসলাম ১০৫

www.pathagar.com

কাজী আতিকুর রহমান ১০৫
কাজী মুজিবর রহমান ১০৫
কাজী হাশমৎউল্লাহ ১০৬
কাজী আনোয়ারুল কাদির ১১০, ১১৫, ১১৬, ১৪০
কাজী কাদের নওয়াজ ১২৭, ১৬০, ২৬৩
কাজী ওবায়দুল বারি ১৩৭
কাজী আবুল কাসেম ২১১
কাজী আবদুল মতিন ২২৪
কাজী হবিবুর রহমান ২৫৮
কাজী ফকির ৩৫৩
কাজী নূরুল হক ৩৭০
কাজী শামসুন ইসলাম ৩৭১
কালিকামঙ্গল ১৯
'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' ২৬
কালী দাস ২৭
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় ৪০
কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত ৪৩
কার্লমার্কস ৪৩
কালিকলম ৪৪, ৪৫, ১৬৫
কামিনী রায় ৯৩, ১০০, ৩৩২, ৩৩৫
কামাল চৌধুরী ১০১, ১৯৪
কাজেমউদ্দীন আহমদ ১০৪
কামালউদ্দীন ১০৬, ১৪৫, ২১৩, ২৬৮
কালিকারঞ্জন কানুনগো ১১৩
কালিয়া ৩৯৬
কালিদাস নাগ ১৭৭
কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৩
কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ৩৩১, ৩৩৩, ৩৪৪
কামাল আতার্তুক ৩৬৩
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৩৮৭
কালীবর বেদান্তবাগীশ ৩৮৮
ক্লাইভ বেল ১০৪
কাশীরাম দাস ১৮
কায়কোবাদ ৪৭, ১০০, ১৪১, ২৯০, ৩১৪
'ক্যাবিনেট মিশন' ৬৪
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৭৫, ১৭৭
কানাইলাল ৩৫৪
কালীপদ মিত্র ৩৮৭
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ১০১, ১৭৫, ১৭৭, ২৬৩
কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪৩
কুমুদরঞ্জন মল্লিক ৮৭
কুমারী মলিনা হালদার ৯৩, ১০০
কুমারী লীলা বসু ২২৫
কুমারী হাবিব শেখ ২২৫
কুমারী জাপানী সিংহ ৩৫৪
কুমারী বীণা সেন ৩৭১
কুমারী সুলতানা রাজিয়া ৩৭১
কুমার বিপ্রনারায়ণ ৩৯০
কুমুদিনী মিত্র ৩৮৯
কুঞ্জ বিহারী চৌধুরী ৩৯৩
কুমুদিনী বসু ৩৯৬
কৃষ্ণানন্দ বসু ১৮
কৃষ্ণরাম দাস ১৮
কৃষ্ণচরণ দাস ১৮
কৃষ্ণকান্ত ১৯
'কৃষক ও শ্রমিক দল' ৩৯
কৃষক সমিতি ৩৯
কৃষক প্রজা মন্ত্রীসভা ৩৯
কৃষক প্রজা পার্টি ৬০
'কৃষাণীর ঘর' ১৪৩
কিরণকুমার রায় ২৭৩
ক্লিও ৩৮৬
কৃষ্ণচরণ সরকার ৩৯১
কৃষ্ণবিহারী দত্ত ৩৯১
'কেশরি' ৩৭
কেন্দ্রীয় বিধান সভা ৫৮
'কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ' ৬৯
কেশবচন্দ্র গুপ্ত ২২৪, ৩৮৮
কে.এম. আবদুল আলীম ৩৮৩
কেদারনাথ মজুমদার ৩৮৩, ৩৯০
কেদারনাথ কাব্যতর্কতীর্থ ৩৮৭
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২
কেশবচন্দ্র সেন ৩১
কোহিনূর ৫৩

খ

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ৩৬০, ৩৯৮
খলিফা আল মামুন ১২১
খলিল জিবরান ১৪৩
খাজা নাজিমুদ্দীন ৬১
'খানদান' ৫
খান বাহাদুর কবিরউদ্দিন ১৬৬
খাদেম ৩৯৭
খাদেমুল এনছান সমিতি ৬৯, ২০৪
খালেকদাদ চৌধুরী ২২৪, ২৩৭
খালেদা এদিব খানম ১৪৫
খায়রুল বশর ৩৫৮

www.pathagar.com

'খিদিরপুর ইয়ং মোসলেম এ্যাসোসিয়েশন' ১২৬
খিলাফত ৩৮, ২৯২
খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার ১২
'খ্রীষ্টান নলেজ সোসাইটি' ২৬
খেলারাম ১৭
'খেলাধুলায় নারী' ৯৪
খোন্দকার আবুল কাশেম ২৩৭
খোন্দকার আবদুল হামিদ বি.এ. ২২৫
খোন্দকার কেরামত আলী ৩১০
খোন্দকার গোলাম আহমদ ১০৩
খোন্দকার লোত্ফর রহমান ২১২
খোন্দকার সিরাজুল হক ৪৭, ১৫৯
খোদেজা খাতুন ১০৬
খোকাখুকু ৩৯৪

গ
গণতন্ত্র ৪৫
গম্ভীর ৩৯১
গরীবুল্লাহ ১৮
গঙ্গারাম ১৮
গঙ্গাচরণ দাশপুপ্ত ৪৩
গঙ্গাচরণ নাগ ৪৩
গণবাণী ৫৩
গয়াস খান ১৭
গল্প ভারতী ৩৯১
গল্প গাথা ৩৯৯
গণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৯৭
গবর্নমেন্ট প্রেসিডেন্সী কলেজ ২৯
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭০
গগনচন্দ্র ধর ৩২৯
গান্ধী-আরউইন চুক্তি ৫৭
গান্ধী-নেহেরু ৬৪
গাজী-বিজয় ১৩
গাজী মঈনুদ্দীন আহমদ ৩৭৪
গ্রামের ডাক ৩৯৮
গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী ৪৩, ৯৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৪২, ৪৩
গীতা দাশগুপ্ত ৩৭২
গুরুচরণ ৫০
গুলেবকাওলী ১৩
'গুপ্ত আন্দোলন' ৩৬
গুলবাগিচা ৮২
গুলিস্তাঁ ৮২, ১৩৬, ২১৮, ৩৭৫
গৃহস্থ ৩৮৮
গোকুলানন্দ ১৮
গোপাল হালদার ৩৩, ৩৮৩
গোপালচন্দ্র বটব্যাল ২১১, ২২৪
গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য ৩৫৪, ৩৯৫
গোবিন্দ ১৭
গোবিন্দ দাস ১৭
গোবিন্দ চন্দ্ররায় ৩৫৪
গৌতম ভট্টাচার্য ৩৮৩
গৌতম চট্টোপাধ্যায় ৩৮৩
গোলটেবিল বৈঠক ৫৬
গোলাম কাসেম ৯২, ১০৩, ১০৫
গোলাম কুদ্দুস ১০০, ১০৩, ১০৬, ১৭৫, ১৯৪, ১৯৫
গোলাম মোরতাজা ৩১০
গোলাম রব্বানী ৩৭১
গোলাম রসুল ৩৭১
গোলাম রহমান ৩৭১, ৩৭৫
গোলাম সোলায়মান ১০১, ৩৫৯
গোলাম মোস্তফা ৪৭, ৫১, ৮৯, ১০০, ১০৩, ২২৪, ২৭৩, ৩১৪, ৩৩২, ৩৯৭
জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী ৩৯২
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ৩৯০
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চ
চর্যাপদ ১৩
চর্যাগীতি ১৩
চণ্ডীদাস ৯, ১৭, ১৮
চণ্ডীচরণ মিত্র ৮৭, ১০০
চণ্ডীরচণ ভঞ্জ ২২৪
চন্দ্রিলা ৩৯৬
চঞ্চল দাস ২৩৭
চতুরঙ্গ ২৭, ৭৫, ৮১, ১৪৪, ২৬১, ২৮৭, ৩৯৮
চাবুক ৩৮৬
চাঁদপুর ৬৮
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৯
চারুচন্দ্র মিত্র ৩৮৮
চিত্তরঞ্জন দাশ ২৯২, ২৯৪, ৩৯১, ৩৯৩
চিত্রিতা দেবী ৩৮৮
চিদানন্দ দাশগুপ্ত ১৭৬
চিন্মোহন সেহানবীশ ও অন্যান্য ৩৮৪
চিত্রলেখা ৪০০
'চুড়িহাট্টা মুসলিম যুবক সমিতি' ৬৯
চূড়ামণি দাস ১৭

www.pathagar.com

'চোরাবালি' ১৭২
চৈতালী ৩৯৮
'চট্টগ্রাম জেলা সাহিত্য সম্মিলনী' ৬৮
'চট্টগ্রাম বুলবুল সোসাইটি' ৬৮
চৌধুরী ওসমান ১০১
চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান ১০৪
চৌধুরী রহমত আলী ১৪১

ছ
ছঈদ আলী ৩২৯
ছাজিদুল রব চৌধুরী ৩৭৭
ছৈয়দ মোহাম্মদ মকসুদ আলি ৩৭১
ছৈয়দ শামসুল ইসলাম ৩২৯

জ
জগদানন্দ ১৮
জগন্নাথ ১৮
জগৎরাম ১৮
জগজ্জীবন ঘোষাল ১৮
'জগাদুদ্দীপক ভাস্কর' ৫০
জগদীশচন্দ্র ১৪৩
জগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার ২৩৭
জগলুল পাশা ১৪২
জগদীশচন্দ্র বসু ৩০৭
জগদিন্দ্রনাথ লাহিড়ী ৩৯০
জগদিন্দ্রনাথ রায় ৩৯১
জগন্নাথ চক্রবর্তী ৩৭১
জগন্নাথ মজুমদার ৩৯১
জলধর সেন ৮৭
জসীমউদ্‌দীন ১০০, ১০৪, ১৪০, ১৪৩, ১৫৭, ১৬০, ১৯০, ২১১, ২২৪, ২২৯, ২৫৩, ২৭৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩৬৩, ৩৭৬
'জসীম' ১৪৫
জনার্দন ১৯
জনসেবক ৩৯৪
জড়ভরত ১৭৬
জহুর হোসেন বি.এ. ১০৫
জহুরুল ইসলাম ১৪১
জহিরুল হক ১০৬
জহিরউদ্দিন আহমদ ১৭৭, ২০২
জয়তী ৫৩, ৭৫, ৮১, ১৪২, ২১৭, ৪০০
জয়নুদ্দীন ১৭
জয়ানন্দ ১৭
জঙ্গনামা ১৭
জয়দেব ২৭, ৪৪
জয়ন্তী ব্যানার্জী ৩৩২
জাগরণ ৮২
জালালুদ্দীন ১২
'জামানা' ২৯০, ২৯২
জার্মানী ৬৭
জামালুদ্দীন আফগানী ৩১৭
জাহ্নবী ৩৮৮, ৩৯০
জাহানআরা আরজু ১০১
জাহানআরা চৌধুরী ২৭১
জাহানআরা বেগম ২৬৩, ৩৭১
জাহানআরা বেগম চৌধুরী ৯৩, ১০৩, ২২৫
জাহানারা হায়দার ৩৭২
জাহেরুল ইসলাম ২২৪
জিয়াউদ্দিন আহমদ ২৩৭
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯৫
'জিঞ্জির' ৯২
'জীবন তীর্থ' ১৪৫
'জীবন পথের যাত্রী' ১৪৫
'জীবন ক্ষুধা' ১৪৫
জীবনানন্দ দাশ ১৭৭, ১৯৭
জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ৪৩, ৮৭, ১০০
জীতেন্দ্রনাথ সেন ২২৪
জীবেন্দ্র সিংহরায় ৩৮৪
জুলফিকার হায়দার ১০৪
জেবুন্নিসা বেগম ২২৪
জেবুন্নেসা খানম ৩৩২
জে এইচ ব্রাউন ৩৯০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৩
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ১৭৫, ১৭৭
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৭৫
জ্যোতির্ময় রায় ১৭৫
জ্যোতির্ময় দে ২৩৭
জ্যোতিমালা দেবী ১৪৩
জোবেদা রহিম ৩৭১
জোবেদা ফররোখ ১০৬
জোহরার প্রতীক্ষা ২৫০
জোয়ারদার রহিম জাবেদ ২২৪
জৈনুদ্দীন ১২

ঝ
ঝংকার ৩৯১
ঝরণা ৩৯৭

www.pathagar.com

ট
টাঙ্গাইল হিতকরী ৫০
টেনিসন ২৯৯

ড
'ডন সোসাইটী' ৩৫
ডাকগাড়ী ৩৯৭
ডা. আবদুল গণি ২২৫
ডা. আমিন আহমদ ৩৭১
ডা. আর আহমেদ ২৭৩
ডা. এন জেড খান ১৪৫
ডা. এস. আমজেদ আলী ২২৪
ডা. কে এন খানম ৩২৯
ডা. মফিজউদ্দীন আহমদ ৩৬৫
ডা. মো. আবুল কাসেম ২২৪
ডা. ফজলুর রহমান খানসুর ১০৪
ডা. সাখাওয়াৎউল্লাহ ২২৪
ডা. সৈয়দ আবুল হোসেন ৪৬
ডা. সৈয়দ আমির হোসেন ৩৭১
'ডিভাইড এণ্ড রুল' ২৩, ৬০
'ডিরোজিওপন্থী ইয়ংবেঙ্গল দল' ৩১

ঢ
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ১১৪
ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট মুসলিম এ্যাসোসিয়েশন ৬৭
'ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট মুসলিম ফেডারেশন' ৬৭
'ঢাকায় নবী দিবস' ৬৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৭, ৬৮, ১৫৯, ১৮৯
'ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি' ২২
ঢাকা মুসলিম হল ১২১
'ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ৬৭

ত
তপন কুমার দাস ৩৯১
তবলীগ ৩৯৮
তরুণ ৫৩, ৩৯৪, ৩৯৯
তরুণ আলো ৪০০
তরুণপত্র ৩৯৬
তরুণ লিপি ৩৯৬
তরুণ শক্তি ৩৯৮
তরিকুল আলম ১০৪
তহমিনা হক ১০৬
তমিজউদ্দিন খান ২০৬
তত্ত্ববোধিনী ১৩৮
তত্ত্ববোধিনী সভা ৩১
তাইদে এছলাম ৩৯৮
'তানজীম' ৩৯
'তাবলীগ' ৩৯, ২৯৪
তারকচন্দ্র রায় ৩৯২
তারকনাথ মৈত্র ৩৯২
তারানাথ রায় ৩৯৯
তারাপদ পাল ৩৮৪
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৫, ১৯৮, ২২৬, ৩৭৮
তারুণ্য ৯৭
তারেক ৩১০
তালিম হোসেন ১০৩
তাহজিব তমদ্দুন ৮৯
তাহির মাহমুদ ১৮
তিমির বরণ ১৭৬
তিলক ৩৭
'তিমির বিদারী অলঘ–বিহারী কৃষ্ণকুমারী আগত ঐ' ১২২
তুষার চট্টোপাধ্যায় ৩৯৩
তোফায়েল আহমদ ২৫৩
'তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ' ১৪০
ত্রিকাল ৮১, ১৬৫
ত্রিশূল ৩৮৯

দ
দরদী ৩৯৭
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১০০
'দারুল ইসলাম' ৩০
'দারুল হরব' ২৯, ৩০
দ্বিজ ১৭
দ্বিজ কালিদাস ১৮
দ্বিজ তুলসী ১৮
দ্বিজ নরোত্তম ১৯
দ্বিজ পশুপতি ১৮
দ্বিজ বানেশ্বর ১৮
দ্বিজ বংশীবদন ১৮
দ্বিজ মণিরাম ১৮
দ্বিজ মাধব ১৭
দ্বিজ মাধবচন্দ্র ১৮
দ্বিজ রামচন্দ্র ১৮
দ্বিজ রামদেব ১৮
দ্বিজ রামেশ্বর ১৮
দ্বিজ হরিদেব ১৮
'দি পীস' ৫২

www.pathagar.com

দিলওয়ার হোসেন ১০১, ৩৮৪
দিনাজপুর অধিবেশন ৬৯
'দি মুসলমান' ৫২, ৯২
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৯৫
দীন চণ্ডিদাস ১৮
দীন দুনিয়া ৩৯৯
দীপালী ৩৯৯
দুন্দুভি ৪০০
দুর্লভ মল্লিক ১৮
দুর্গেশনন্দিনী ৪৬
দেওয়ান অহিদুর রাজা চৌধুরী ৩২৫
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ৩২৫, ৩২৯
দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী ৩৭৭
দেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যক্ষ ৩৫৪
দেবর্ষি দরবার ৫৩
দেশ ৭৫, ২৩৮, ২৯০
'দৈনিক আজাদ' ৪৬, ৭১, ৭৬
দৈনিক আমির ৫২, ৪০০
দৈনিক তরক্কী ৫২, ৩৯৭
দৈনিক মোহাম্মদী ৫২
দৈনিক বসুমতী ৯৬
দৈনিক রাষ্ট্রবার্তা ৫২, ৪০০
দৈনিক সেবক ২৯২
দৈনিক সোলতান ৫২, ২৯৭

ধ
ধর্ম্ম মঙ্গল ১৯
'ধর্ম সম্বন্ধ' ১৫১
'ধর্ম্মত নৈতিকতা' ১৬১
ধারা ৩৯৯
ধ্যানচন্দ্র সেন ২৫২
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৭
ধীরেন্দ্রনাথ রায় ৩৯৮
ধীরেন্দ্রলাল দাস ৩৯৪
ধ্রুবতারা ৩৯২
ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১১৯, ১২৫, ২৪১, ২৪৭
ধূপছায়া ৪৪, ১৬৫, ৩৯৮
ধূমকেতু ৪৪, ৫৩, ৫৮, ৩০৩, ৩৯৪, ৪০০

ন
নওরোজ ৮২
নবী বংশ ১৩
নরোত্তম ১৮
'নবনূর' ৪৭, ৫০, ৫৩, ৯১, ৩৮৮
নবসুধাকর ৫০
নবযুগ ৫২, ৫৩, ৩৯২
নবাব আবদুল লতীফ ২৮, ২৯, ৩২
নবাব সলিমুল্লাহ ৬৭
নবাব সিরাজউদ্দৌলা ৬৯, ৩০৯
নবাবজাদা হাসান আলী ১৩৭
নবগোপাল দাস ১৯৮
নবদর্শন ৩৮৯
নরহরি সরকার ১৭
নওয়াজিস খান ১৭
নসরুল্লাহ খোন্দকার ১৭
নন্দরাম দাস ১৮
নরসিংহ বসু ১৮
নব্যপন্থী ইংরেজ ২৫
নব্য বাংলা ৮২, ২১৭
নব্য ভারত ৪২
নজীবর রহমান ৪৭
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ৫৮
নয়া জামানা ৮২
নলিনীকিশোর গুহ ৯৮
নরেশচন্দ্র ১০০
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৬৬, ১৭৬
নবেন্দু বসু ১৭৪
নরেশ গুহ ১৭৭
ননীলাল ভট্টাচার্য ২২৪
নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৪
নলিনীকান্ত ভট্টশালী ২২৯
ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ৩৮৮
নজির আহমদ চৌধুরী ২৯৮
নরেন্দ্রনাথ সেন ৩০৭
নজিবুল্লাহ ৩২৯
নরেন দাস ৩৫৪
নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৬৩
নন্দরানী চৌধুরী ৩৮৪
নরহরি কবিরাজ ৩৮৪
নরেনন্দ্রনাথ সেন ৩৮৮
নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৩৮৯
নগেন্দ্রনাথ বসু ৩৯১
নন্দিনী ৩৯০
নববাণী ৩৯১
নরেন্দ্রনাথ বসু ৩৯৪
নারায়ণ ৩৯১
নারায়ণ দেব ১৭
নারায়ণ ভট্টাচার্য ৪৩, ৩৮৮

www.pathagar.com

নারায়ণ চৌধুরী ১৭৬
নাট্যমন্দির ৩৮৯
নাট্যপত্রিকা ৩৯০
নাট্য প্রতিভা ৩৯১
'নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ' ১১৭
'নারী জগৎ' ২২৫
নারী জাগরণ ৩২
'নারী জাগরণী' ৯২
'নারী প্রগতি' ২২৩, ২৫৯
'নারী মুক্তি' ৩২
নারীশক্তি ৫৩, ৩৯৪
নাসিরউদ্দীন নসরত শাহ ১৩
নাজিমুদ্দীন ৬২
নাজিমউদ্দীন মুসলিম হল ৩৫৩
নাজিমউদ্দীন হল সোসাইটি ৬৯
নাজিরুল ইসলাম ১১৩, ১২৬, ১২৭, ৩১৪
নাজিমউদ্দীন আহমদ ৩৭১
নাজমা জেসমিন চৌধুরী ৩৮৪
ন্যাশনাল লাইব্রেরী ৪৮
ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন ২৯
নিত্যানন্দ ১৮
নিত্যানন্দ ঘোষ ১৮
নিধিরাম ১৮
নিধিরাম আচার্য ১৮
'নিখিল বঙ্গপ্রজা সমিতি' ৩৯
নিখিলনাথ রায় ৪৩, ৩৯১
নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ৪৬
'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মিলনী' ৬৮
নিখিল চক্রবর্তী ১৭৪, ১৯৭
নিখিল গুপ্ত ৩৭১
'নিউ ইণ্ডিয়া' ৪২
নিউ মুসলিম মজলিশ ৫৯
নির্মল দাশ ৩৫৪
নির্মল কুমার রায় ৩৫৪
নির্মল ঘোষ দস্তিদার ৪৬
নির্মলেন্দু ঘোষ ১০০
নির্মলেন্দু ভৌমিক ৩৮৪
নিবারণ চক্রবর্তী ২১২, ২২৪
নিরুপমা বর্ষস্মৃতি ৩৯১
নিশীকান্ত রায় চৌধুরী ১৪৩
নিরঞ্জন সেন ২৩৭
নিশান ৩৯৮
নির্মাল্য ৩৮৯
'নীল দর্পণ' ৩১, ৩২
নীলিমা দেবী ১৭৪, ১৭৬, ১৯৭
নীলিমাময়ী সেন ২৩৭
নীহারকান্তি ঘোষ ৩৭২
নীহাররঞ্জন চক্রবর্তী ১৮৭
নীহাররঞ্জণ রায় ৩, ৭, ১৭৪, ১৭৭, ৩৮৪
নীরা রহমান ১৮৭
নীরদচন্দ্র চৌধুরী ৩৮, ৩৯৫
নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত ২২৪
নীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২২৪
নীহাররঞ্জন সিংহ ৩৯৪
নূর ৫২, ৩৯১
নূর অল ঈমান ৫০
নূরউদ্দীন মাহমুদ ১০১, ২২৬
নূর মোহাম্মদ ২৫৩
নূরুর রহমান ৩৩২
নূরুল হক ৩৬৪
নুরুন্নেহার খাতুন ১০৪
নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ৪৭
নূরুল আলম চৌধুরী ১০৬
নেলী সেনগুপ্তা ২৫২
নোবেল প্রাইজ ২৮৯
নোয়াখালী ৩৯১
'নৈবেদ্য' ৪২, ৩৮৯, ৩৯১
নৃপেন্দ্র সান্যাল ১৬৬
নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৭৫
নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় ৩৮৭

প

পরমেশ্বর ১৭
পরমানন্দ ১৭
পঞ্চানন সরকার ৩৮৮
পঞ্চানন চক্রবর্তী ১৭৪
পরিচয় ৪৪, ৪৫, ৭৫, ১৬৫, ১৬৬, ২৯০
পঞ্চপুষ্প ৩৯৮
পশ্চিম পাঞ্জাব ৬৫
পথিক ৩৯০
'পথের সাথী' ৮৭
'পর্দাপ্রথার উৎপত্তি' ১০৫
পরাণ বন্ধু ১৪৩
পদ্মনাথন ১৭২
পরিমল কুমার ঘোষ ২৩৭
পরিমল মুখোপাধ্যায় ২৬৩
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ২৬৩
পরিমলেন্দু ঘোষ ৩৭১

www.pathagar.com

পতাকা ৩৯০
পল্লী ৩৯৭
পল্লীবাণী ৩৯১
পল্লী প্রদীপ ৩৯৭
পল্লীশ্রী ৩৯৩
পল্লী সখা ৩৯৩
পাগল শংকর ১৮
পাকিস্তান ৪০, ৬৪, ৬৯, ৯৯, ১৩৬, ২৯২
পাকিস্তানের বীজ ৬৮
পাকিস্তান পাবলিকেশন্স ৩৮৪
'পারিল বার্ত্তাবহ' ৫০
পাঞ্জাব ৬৪
পাঁচুলাল ঘোষ ৮৭
পারুলনন্দী বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭১
পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৩৮৪
পাঞ্চজিনী বসু ৯৪
পাততাড়ি ৩৯৮
পাপিয়া ৩৯৮
প্যারিচাঁদ মিত্র ৩১
প্রিয়লাল দাস ৩৫৪
পীতাম্বর রঘুনাথ ১৭
পীর মুহম্মদ ১৮
পুরন্দর ১৮
পুলিন বিহারী বসু ৩৯৫
পুলিন বিহারী গুণ ২৩৭
পুষ্পপাত্র ৩৯৮
পূরবী ৮২, ২৪৮, ২৫৯
'পূরবী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' ৬৯
'পূরবী সাহিত্য সম্মেলন' ২৫২
'পূরবী সাহিত্য গোষ্ঠী' ২৪৮, ২৫২
পূর্ণেন্দু গুহ ১৭৭
পূর্ণেন্দু সেন ১৭৭
পূর্ণেন্দু নন্দী ৩৫৪
পূর্ণচন্দ্র দাস ৪০০
পূর্ণিমা ৩২৭, ৩৯৮
'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' ৬৭
'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' ৬৭
'পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজ' ৬৮
প্রবাসী ৪২, ৫১, ৮৯, ১১৯, ২৩৮, ২৯০, ৩১০, ৩৮৭
প্রগতি ৪৪, ৪৫, ৭৫, ৯৭, ১০০, ১৬৫, ৩৯৮, ৩৯৯
প্রচারক ৫০
প্রভাত ৩৯০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪৩
প্রভাকর ৩৯০
প্রবাহিনী ৩৯০
প্রভাতী ৬৯, ৮২, ৩৭৯, ৩৯২
প্রতিভা ৮২, ২৪৮, ৩৯০
প্রতিভা সেন বি.এ. ৯৩, ১০৩
প্রতিভা বসু ১৭৬
প্রতিভা সোম রানু ২৩৭
প্রভাতকুমার দাস ৩৮৪
প্রতিবাসী ৩৯০
প্রতিধ্বনি ৩৯১
প্রবর্তক ৩৯১
প্রকৃতি ৩৯৫
প্রতিষ্ঠা ৩৯৯
প্রভুরাম ১৮
প্রমথ চৌধুরী ৪৪, ৭৭, ৭৯, ৯৯, ১১৯, ১২৫, ১৩০, ১৪০, ১৪২, ১৪৭, ১৪৮, ২১৫, ২৯০, ৩৮৪
প্রমথনাথ রায় ৪৩
প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ১৯০
প্রমথনাথ নাথ ৩৮৮
প্রমথনাথ সান্যাল ৩৯০
প্রমথনাথ তর্কভূষণ ৩৮৭, ৩৯৩
প্রমথনাথ সরকার ৩৯৩
প্রমথনাথ বিশী ১৯৪, ২২৬, ২৬৩
'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' ৬১
প্রগতিশীল নেতা ৬৩
'প্রগতি ও সাহিত্য' ১৯৩
প্রজাস্বত্ব আইন ৬০
প্রজাপতি ৩৮৯
'প্রগতি লেখক সংঘ' ৬৭
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ৭৮
প্রফুল্ল ৯৯
প্রফুল্লকুমার মিত্র ১০৫
প্রফুল্লকুমার গুহ ২৩৭
প্রফুল্লকুমার পাল ৩৯৭
প্রফুল্ল চক্রবর্তী ১৭৭
প্রফুল্ল দে ২৩৭
প্রবোধকুমার সান্যাল ১২৪, ১৯৮
প্রণব রায় ১২৫, ১৪৩
প্রফুল্লকুমার মণ্ডল ২২৪
প্রবাস জ্যোতি ৩৯৩
প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ৫৬
প্রবোধচন্দ্র সেন ১৭৭

www.pathagar.com

প্রবোধেন্দু ঠাকুর ১৭২
প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৪
প্রভাবতীদেবী স্বরস্বতী ৩০৭
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৩৫৪
প্রতাপচন্দ্র গুহ ৩৯৪
প্রশান্তকুমার মহালনবীশ ৩৮৯
প্রাণরাম ১৮
প্রাণবল্লভ ১৮
প্রাতিকা ৭৫, ৮১, ৪০০
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ১০৫, ২১১
প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ৩৮৪
প্রাচী ৩৯৪
প্রেমদাস ১৮
প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪২, ১০৩, ১২৫, ১৬৫, ১৭৭, ১৯৮, ২২৭, ৩০৭, ৩৯৬
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ৩৯৪, ৩৯৫

ফ
ফকির রাম ১৮, ১৯
ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৮৯
ফজলুল করিম ১০৫, ১৭৭
ফজলুর রহমান ১০০, ১০৫, ১২৭
ফজলুর রহীম চৌধুরী ৪৭, ৮৭, ১০০, ১০৩
ফজলুল হক ১৭৬
ফসিউল আলম ২৫৩
ফজলুল হক সেলবর্ষী ২২৪, ৩৩২
ফজিলাতুন্নেসা ৯৪
ফতেহ লোহানী ১০১
ফররুখ আহমদ ১০২, ২৯০, ৩০২, ৩৭৪
ফররোখ আহমদ নেজামপুরী ৪০০
ফরাসি সাহিত্যের সমালোচনা ১৭২
ফসিহ ১১৩
ফণিভূষণ সিংহে ২২৪
ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৩৯৬
ফনীন্দ্রনাথ পাল ৩৮৮, ৩৯০
ফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৯০
ফনীন্দ্রচন্দ্র দাস ৩২৯
ফরওয়ার্ড ব্লক ৬২, ৬৩
ফয়েজ ৩৫৯
ফয়েজ আহমদ ৩৭১
ফাজিল নাসির মাহমুদ ১৮
'ফাতেমা খানম ১০৪
ফাতেমা মুহিবুস সামাদ ১০৬
ফাহমিদা খাতুন ৩৩২
ফিরোজ কবির ১৭৭
ফিরিসতা ১৭৭
ফিরোজ শাহের রাজনীতি ১০৫
ফিরোজা খাতুন ৩৫৩
ফুলদাপ্রসাদ মল্লিক ৩৮৯
ফুলের রেণু ৩৯৭
ফেরদৌসী ৩১১
'ফেরদৌসী বন্দনা' ১৪৪

ব
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২, ৩১, ৩২, ৪৩, ৪৪, ৪৯ ৭৪, ১২৮, ১৩০, ২৯০, ২৯৪, ৩৮৪, ৩৯৯
বঙ্কিম–সাহিত্য ৪৫
বঙ্কিম–বিরোধিতা ৪৫
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা ৪৫
বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ ৪৬, ৭০
'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' ৪৬
বঙ্কিম দেওয়ান ২৫৩
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ১২, ৫২
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ৩৭, ৫৯
'বঙ্গদর্শন' ৪২, ৪৯, ৫১, ৮৮, ১৩৩, ১৩৮
বঙ্গনূর ৫২, ৩৯২
বঙ্গীয় কৃষক সভা ৫৫
বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি ৬৭
'বঙ্গীয় লেখক সংঘ' ৬৭
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ৪৪, ৫২, ৫৩, ৭৩ ৮৫, ৯৩, ৩৯২
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ৭৪, ১৪১, ১৪২
'বঙ্গভূমি' ৬৮
'বঙ্গ মুসলিম পল্লী নারী' ৯৪
'বঙ্গবাণী' ১০০, ৩৯৩
'বঙ্গ–সাহিত্য সংসদ' ১২৬, ১৩২
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ২৫৫
বঙ্কুবিহারী ধর ৩৮৭
বঙ্গ সাহিত্য ৩৯৩, ৩৯৮
বঙ্গলক্ষ্মী ৩৯৬
বল্লাল সেন ৩
বলরাম দাস ১৭
বলরাম চক্রবর্তী ১৮
বলাক ফকির ১৮
বলকান যুদ্ধ ৩৮
'বয়কট' ৪০
বসুধা ৪২, ৩৮৭
বন্দে মাতরম ৩৬, ৬৯, ৯৫

www.pathagar.com

বন্দে আলী মিয়া ৪৭,১০০, ১২৭, ১৬০, ২১১, ২২৪, ২৫৩, ২৬৩, ৩১৪ম ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৪
বর্ষবাণী ৮২, ২১৭
ব্রজমোহন দাস ৮৭
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৭, ৩৮৪
বজলুর রহমান ১০৩
বর্ধমান হাউস ২১২
'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' ১২৯
বন্দীবীর ১৩৬
বটকৃষ্ণ বসু ১৭৪
বদিউস সালাম ২৫৯
বনফুল ২৭৩
বসুমতী ৩৯৪
ব্রহ্মবাদী ৩৮৭
বকুল ৩৯২
বরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪০০
বর্তমান জগৎ ৪০০
বসন্তকুমার কানুনগো ২৫৩
বংশীবদন ১৭
বাঙলার মুসলমানের সংখ্যা ৪
'বাঙলাদেশের ইতিহাস' ১০, ২০, ২১, ৩৭, ৭৯
'বাঙলার নবজাগরণ' ১১, ২২
'বাঙলার বলশী' ৪৪
'বাঙালীর চিন্তাধারা' ৪৭
বাঙলা সাময়িকপত্রে রুশ-বিপ্লব ৪৮
বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন ৪৮
'বাঙলা কৃষক ও শ্রমিক সমিতি' ৫৮
'বাঙলা জাতীয় দল' ৫৮
বাঙলার বাণী ৪৪
'বাঙালী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা' ১১৫
বাঙলা উপন্যাসের ভূমিকা ১৭৪
'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১২
বাঙ্গালার দেশপ্রেম ৪৩
'বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা' ৬৮
'বাঙ্গালীর ভক্তি-সংকট' ১০১
'বাঙ্গালা সাহিত্য ও মুক্তবুদ্ধি' ১৩১
'বাঙ্গালা সাহিত্য ও মুছলমান' ৩০০
'বাংলা সাহিত্য' ২০
বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত ২১
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা ৭৯
বাংলা একাডেমী ৯২, ৩৮৪
'বাংলা শিশু সাহিত্য' ১৮১
বাংলা গেজেট ৪০০
'বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ' ১২৭
বাসুদেব ১৭
বাণী রামধর ১৮
'বার্লিন কমিটি' ৪৩
বাহাদুর ৫৩
'বার্ষিক সওগাত' ৯২, ৯৫, ৩৯৭
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১২১, ৩৯২, ৩৯৭
বার্ট্রাণ্ড রাসেল ১৫২
বালক ৩৭৫, ৩৮৭
বান্ধব ৩৮৭
বাসনা ৩৮৯
বাসন্তী ৩৯২
বাসন্তী চক্রবর্তী ৩৯৯
বাণী ৩৯৩
বাসন্তিকা ৩৯৩
বাঁশরী ৩৯৪
বার্ষিক মোহাম্মদী ৩৯৮
বায়োস্কোপ ৪০০
বিপ্রদাস পিপিলাই ৯, ১৩
'বিদ্যাসুন্দর' ১৩, ১৭
বিনয় লক্ষণ ১৮
বিকল চট্টোপাধ্যায় ১৯
বিপীনচন্দ্র পাল ১৯
বিদ্যাসাগর ৩১, ৩২
'বিষাদ সিন্ধু' ৩২, ৩৩
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৪২
বিবেকানন্দ ৪৩, ১২৮
বিজলী ৪৪, ৮৯, ৩৯২, ৩৯৭
বিষবৃক্ষ ৪৬
বিয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮, ১৭৪
বিধানচন্দ্র রায় ৫৭
বিধানসভা ৫৭
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৮
বিদ্রোহী ৮৯
'বিলাতী বর্জন ও মুসলিম সামাজ' ৯৮
'বিচিত্রা' ৯৯, ৩৯৮
বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় ১০৩
বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায় ১০৪
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৫, ১৭৬, ২১১, ৪০০
বিষ্ণু দে ১৪৬, ১৭৫
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৬৭
বিমলচন্দ্র সিংহ ১৭৪
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৭৭
বিশু মুখোপাধ্যায় ১৭৭
বিশ্বসাহিত্য ১৮৩

www.pathagar.com

বিনয়কুমার সরকার ২৬৩
বিনয় ঘোষ ৩৮৪
বিভূতিভূষণ লাহিড়ী ৩৯০
বিদূষক ৩৯০, ৩৯৩
বিক্রমপুর ৩৯০
বিভূতিভূষণ গুপ্ত ৩৯২
বিজয়রত্ন মজুমদার ৩৯৪
বিভূতিভূষণ চৌধুরী ৩৯৮
বিশ্বপতি ৩৯৮
বিশ্ববাণী ৩৯৯
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ৪০০
বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০০
'বিংশ শতাব্দী' ১২৩
বীরেন্দ্রকুমার মিত্র ১৭৫
বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৭৬
বীরভূমি ৩৮৯
বীরেন্দ্রনাথ রায় ৩৯৮
বুলবুল ৪৫, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৮১, ৩২৩
'বুলবুল পাবলিশিং হাউস' ১৩৫
বুদ্ধির মুক্তি ১৪২
'বুলবুলের সাহিত্যিক আড্ডা' ১৪২
বুদ্ধদেব বসু ১৪৬, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৮১, ১৯৮, ১৯৯, ২২৭
বুধবার ৩৯৪
বেথুন বালিকা বিদ্যালয় ৩২
বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ৩৭
বেনজীর আহমদ ৪৭, ১৭৫, ১৮৫, ২৫৩, ২৭৩, ৩৩২
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ৫১
বেলায়েত আলী খাঁ ১১৩
বেনাভাতে ১২৯
বেনে আব্বাস ৩১০
বেপরোয়া ৩৯৪
বেণু ৩৯৭
বেদুঈন ২৭৯, ৪০০
'বৈষ্ণবপদ' ১৩
বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণ তীর্থ ৩০২
বৈঠক ৩৯৪
বৌদ্ধধর্ম ৩
'ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি' ২৬
ব্যারিস্টার আবদুর রসুল ৫১
ব্যবসা ও বাণিজ্য ৩৯২
বৃন্দাবন দাস ১৭
বৃটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন ৩১

ভ.
ভবতোষ রায় ৩৯৭
ভবানন্দ ১৮
ভবানীনাথ ১৮
ভবানীপ্রসাদ ১৮
ভবানীশংকর ১৮
ভবিষ্যৎ ১৬৫
ভাগবত ১৯
ভাবীকাল ৩৯৯
ভাণ্ডার ৪২, ৩৮৮, ৩৯২
ভারত ২৯২
ভারতচন্দ্র রায় ১৮, ৪৪
'ভারত ছাড়' ১৮
ভারত নারী ৩৯১
ভারতবর্ষ ২৯০, ৩৯০
ভারতবর্ষে মুসলিম জাগরণ ৫৯
ভারতবাসীর ঐক্যসাধন ৫৩
ভারত মহিলা ৩৮৮
ভারত শাসন আইন ৫৯
ভারতী ৪২, ৫১, ২৯০
ভারতী সারভাই ১৭৪
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ৫১, ৫২
ভাস্কর ৩৯২
ভিকন ১৭
ভিষক দর্পণ ৫০
ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী ৮৭, ১০০, ৩০৭ ৩৯১
ভূদেব চৌধুরী ৪৬, ৩৮৮
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১২, ১২৮, ৩৮৪
ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় ৩৯৭
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১২৫
ভূপেন্দ্রনাথ দে ৩৯৬
ভূপেন্দ্রলাল সেন চৌধুরী ৩৯৬
ভূমি লক্ষ্মী ৩৯২
ভৈরবচন্দ্র ১৯
ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯২
ভোলানাথ ভট্টাচার্য ৩৮৯

ম
'মনসা বিজয়' ১৩
মঙ্গলকাব্য ১৩
মঙ্গলচাঁদ ১৭
মহাভারত ১৩, ১৯
মনসা মঙ্গল ১৩, ১৯
মনসুর মুসা ১৭

www.pathagar.com

মরদন ১৭
মত্তালিব ১৭
মধুমালতী ১৯
মধু মিঞা ৩৯২
'মধ্যশ্রেণীর সাহিত্য' ২২
মহসিন ফাণ্ড ২৯
মওলানা মোহাম্মদ আলী ২১২
মওলানা মোহাম্মদ হোসেন আজাদ ২৮১
মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী ২৯১
মওলবী কাজী নওয়াজ খোদা ২৯৩
মওলানা মসন্দর আলী ৩২৬
'মহাজনী' ৩০
মহেশচন্দ্র ঘোষ ৩১
মধুসূদন ৩১, ৪৪
মর্লে মিন্টো ৩৮
মহাত্মাগান্ধী ৩৮, ৪০, ৫৬, ৫৭, ৬১
মতিলাল নেহেরু ৩৮, ৫৬
মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার ৩৮
'মহদ্দসে হালী' ১৪৩
'মন্ত্রী মিশন' ৬৪
মডার্ণ ও আল্ট্রামর্ডান বিশ্ব ৭৯
মওলা নওয়াজ ১০৩
মতিনউদ্দীন আহমদ ১০৩, ৩২৯
মমতাজউদ্দীন আহমদ ১১৩
মহীউদ্দীন ১২৭, ১৪৫, ২১১
মরু-ভাস্কর ১৩৬
মহেঞ্জোদারো ১৫৪, ১৯০
মডার্ণ আর্ট প্রেস ১৬৫
মনীন্দ্র রায় ১৭৫, ১৭৬
মনোজ বসু ১৭৬, ১৯৯
মতিয়ার রহমান খান ২২৪
মতিউল ইসলাম ২২৫, ৩২৯
মঈনুদ্দীন ২৩৭, ৩৫৪
মনীন্দ্রকুমার পাত্র ২৫৮
মবিনউদ্দিন আহমদ ২৬৩
মধুসূদন দত্ত ৩০০, ৩৭৮
মনীন্দ্রনাথ রায় ৩০৭
মকবুল আহমদ খান ৩৩২, ৩৭৬
মহিউস সরিয়ত ৩৩২
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮৭
মাহবুব জামাল জাহেদী ৩৫৩, ৩৫৭
মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ২১১, ২১৩, ২২৪, ২৬৩, ২৭৩, ২৯৭, ৩২৯
মানসী ও মর্ম্মবাণী ৩৮৯
মালাধর বসু ৯
মানিকরাম ১৭
মাধব কন্দলী ১৭
মাধব দেব ১৭
মাধবাচার্য ১৭
মানিক দত্ত ১৭
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৫, ১৭১, ১৭৬, ১৯৫
'মাল মমিন' ২৩
মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৭৪
মাইনুটস ২৬
মার্কসের মূলনীতি ৪৪
মার্কসবাদী ধারা ৪৫
মার্কসবাদী কবি ১৮৫
মাহবুব উল আলম ৪৭
মানকুমারী বসু ৮৭
মাসিক বসুমতী ৯৫
মাহফুজুর রহমান খান ২১৩
মাখনলাল মুখোপাধ্যায় ২২৪
মাগন ঠাকুর ১৭
'মাদ্রাসী বাঙলা' ২৩৫
ম্যাক্সিম গোর্কী ১৪৬
'মাসিক জাগরণ' ২৬৮
মিশনারী স্কুল ২৬
মিহির ৫০
মিহির ও সুধাকর ৫০
মিজানুর রহমান ২২৪
মিসেস এম. রহমান ১০৩
মি. মাহমুদ হাসান ১০২
মিশর বিজয় ১৩৬
মিনতি দেবী ১৭৬
মিনু মাসানী ১৯৯
মিস জয়নাব রহমান ২২৪
মিস ফজিলাতুন্নেসা ২১৩
মিসেস আর এস. হোসেন ২২৪
মিসেস গোলাম মহিউদ্দীন ২২৪
মিসেস রাবেয়া সাঈদ ২২৪
মিসেস এ. লতিফ ২২৫
মীর মুহম্মদ সুফী ১৭
মীর্জা কাঙালী ১৮
মীজানুর রহমান ৩৫২
মীর আজিজুর রহমান ৩৫৩
মীর মশাররফ হোসেন ১৯, ৪৬
মুহম্মদ বিন কাসেম ২
মুহম্মদ এনামুল হক ৪, ১৫, ৪৬, ৪৭, ৭৪, ৭৫

www.pathagar.com

মুহম্মদ আবদুল হাই ৫, ৪৬, ১০৬, ২৯০, ৩৮৫
মুহাম্মদ বিন ইয়াজান বখস ১৩
মুহম্মদ বুদাই উর্ফ সৈয়দ মীর আলওয়ী হুসেনশাহ ১৩
মুহম্মদ কবীর ১৭, ১৯
মুজম্মিল ১৭
মুজম্মিল আহমদ ৫১, ৫৮, ৭৩, ৮৯, ৩৯৭
মুহম্মদ খান ১৭
মুহম্মদ বরকতউল্লাহ ৪৭, ৯২, ১০৪, ২১৩
মুহম্মদ জীবন ১৮
মুহম্মদ দানিশ ১৮
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৪৬, ৪৭, ৫১, ৭০, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৯, ১০০, ১১৩, ২০৭, ২১৩, ২২৯, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, ২৯২, ৩৭৫, ৩৮০
মুহম্মদ হেদায়েতউল্লাহ ৪৭
মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার ৪৭, ৭৫, ১২৬, ১৩৩, ১৩৬, ১০৫, ১৪৭, ১৯৪, ২১৩, ২৯৩, ৩২৯
মুহম্মদ মহসিন ১৩৬
মুহম্মদ আলী ১৮, ১৩৬
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ২১, ৪৭, ২২৯, ২৩৩, ২৩৪
মুহম্মদ ইদরিস আলী ২২৪, ৩২৪
মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম ২৫২
মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা ১০৫, ১৪১, ২৬৩, ২৭৩, ৩১৭
মুহাম্মদী আখবার ৫০, ২৯১
মুজীবুর রহমান খাঁ ৩০১
মুহম্মদ নূরুল হক ২৫৫, ৩২৫, ৩৭৭
মুহম্মদ আবদুস সালাম ১৪৫
মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী ৩২৯
মুহম্মদ আবদুল বারী ৩৩৭
মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া ৩৮৪
মুহম্মদ জাহাঙ্গীর ৩৮৫
মুকুন্দ ১৮
মুকুন্দরাম ১৭
মুতাহির আলী ৩৩২
মুফজ্জিল আলী ৩৩২
মুসলিম বাউল গান ২২
মুর্শিদকুলী খাঁ ২৩
'মুসলিম তোষণ নীতি' ৩৫
'মুসলিম লীগ' ৩৬, ৩৯, ৬১, ৬৪, ২৮৭, ২৯৬
মুসলিম মধ্যবিত্ত ৩৮
'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ৪৭
'মুসলিম বাঙলার সাময়িকপত্র' ৮৮
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ৪৯, ৫৪, ৩৮৪
মুসলমান ৫০
মুসলমান বন্ধু ৫০
মুসলমান রাজ্য ৫৮
মুক্তবুদ্ধি চর্চা ৬৮
'মুসলিম যুবক সমিতি' ৬৮
'মুসলিম লীগের অধিবেশন' ৫৮
'মুসলিম সাহিত্য সমাজ : চিন্তা ও কর্ম' ৭৯
মুসলিম সাহিত্য সমাজ ১৩৮
'মুসলিম সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পরিচয়' ৯৩
মুসলিম নারীর মুক্তি ৯৪
মুখখারুল ইসলাম ১০১, ৩৫৩
মুনীর চৌধুরী ১০৩
মুন্সী হাবিবুল্লা ১১২
মুক্তবুদ্ধি সাধনা ১৩৮
মুসলমান সাহিত্যিক ১৮৩
'মুসলমান মন্ত্রী সভা' ৬২
মুনতাসীর মামুন ৩৮৪
মুসলিম ধর্ম-সাহিত্য ১৮
মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ১৮৮, ৩০৭
মৃত্তিকা ৮২, ২১৭, ২৪৪
'মেয়েদের শিক্ষা ও অধিকার' ৯৪
'মুসলিম বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্র' ২১৮
মেহেরাব আলী মুফতী ৩৫৩
মেকলে ২৬
মোজাফফর ১৮
মোহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন ৬৭
মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি ২৯, ৩০, ৬৭
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ৪৭, ৫১, ৫২, ৮৭, ২৯০, ৩২১, ৩৬৬
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ৪৭, ৫৪, ২১৩, ৩১৪
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ৪৭, ৫১
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ৪৭, ৯২, ১০৪, ১০৫, ১২৭, ১৩৭, ১৪০, ১৪১, ১৫০, ২১৩
মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ৪৭, ৪৯, ৫১, ৭৫, ১০৩, ১০৪, ১৬১, ২৮৪, ২০৯, ২১০, ২১৩, ২৯০, ৩০২, ৩২১
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ১৮, ৫১, ৭৩, ৮৩, ৮৫, ৮৮, ৯০, ১০৩, ১০৭ ২৯০, ৩৮৪
মোহাম্মদ সানাউল্লা ৯২
মোহাম্মদ আবদুল হক ১০১
মোহাম্মদ চরিত্রের মূল্য ১০৪
মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেন ১০৪
মোহাম্মদ শামসুর রহমান ১০৪

www.pathagar.com

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ১০৫
মোহাম্মদ আকবর উদ্দীন ১০৫
মোহাম্মদ মকসুদ আলী ১০৫
মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ ১০৫
মোহাম্মদ আফতাব হোসেন ১০৫
মোহাম্মদ মতিয়র রহমান ১০৬
মোহাম্মদ আবদুর রশীদ ২০৬, ২১২
মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ চৌধুরী ১৩৪
মোহাম্মদ মোদাব্বের ১৪৫
মোহাম্মদ সিদ্দিক খান ১৪৫
মোহাম্মদ আজরফ ১৬০
মোহাম্মদ ইউসুফ আলী চৌধুরী ২০৬
মোহাম্মদ ইসমাইল ২০৬, ২১৩
মোহাম্মদ আবদুল বারী ২০৮, ২১৩, ৩৭৬
মোহাম্মদ আবদুল আলী ২১১, ২১৩
মোহাম্মদ ফজলুর রহমান ২১৩
মোহাম্মদ লোকমান আলী ২১৩
মোহাম্মদ আবদুল খালেক ২১৩
মোহাম্মদ জেয়াদুল করিম ২২০
মোহাম্মদ লোকমান খান ২২৪
মোহাম্মদ কাসেম ১১৩, ২২৪, ২৭৯
মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন চৌধুরী ২২৪
মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান ২২৪
মোহাম্মদ হাফিজউল্লাহ খাঁ ২২৪
মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ২২৫
মোহাম্মদ মোলতাজী ২৩৭, ২৫৩
মোহাম্মদ হানিফ ২৩৭
মোহাম্মদ ফজলুস সালাম ২৩৭
মোহাম্মদ আবদুল খালেক (হিঞ্জি) ২৫২
মোহাম্মদ ওসমান গণি ২৫২
মোহাম্মদ ছাইফুল ইসলাম ২৫৩
মোহাম্মদ দন্ত স ২৬৬
মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ ১০১, ১১৩, ২৭৯
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ ২৯২
মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী ২৯৬, ৩২৯
মোহাম্মদ গোলাম জিলানী ৩০৬
মোহাম্মদ মোল্লা ৩১০
মোহাম্মদ আবুল খায়ের ৩১০
মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ ৩১৪
মোহাম্মদ মকবুল হোসেন ৩২৩
মোহাম্মদ হুরমত আলী লস্কর ৩২৬
মোহাম্মদ কে চাঁদ ৮৭
মোহাম্মদ ছানাওর ৩২৬, ৩২৯
মোহাম্মদ মোর্তজা চৌধুরী ৩২৯
মোহাম্মদ মুজফফর হোসেন ৩২৯
মোহাম্মদ আবদুর রব ৩২৯
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ৩৩২
মোহাম্মদ আজরফ ৩৩২, ৩৩৭
মোহাম্মদ তৈমুর ৩৫৩
মোহাম্মদ খুরশেদ আলী ৩৫৩
মোহাম্মদ মোকাররম হোসেন ৩৫৩
মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ৩৫৩
মোহাম্মদ সানাউল্লাহ ৩৬৩
মোহাম্মদ মোদাব্বের ৩৭৬
মোহাম্মদ আজিজুস সামাদ ৩৭৭
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ৩৮৪
মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ৩৮৭
মোজাফফর ১৮
মোসলেম ভারত ৫২, ৫৩
মোহাম্মদী ৫৩, ৭০, ৭৯, ৮২, ৮৯, ৯৩, ১১০, ১৩৭, ১৪২, ২১৬, ২৬০, ২৮৫, ২৮৬, ৩১৩, ২৭৯
'মোহাজের' ৬৫
মোয়াজ্জিন ৮২, ২০৪, ৩২৩
'মোসলেম সাহিত্য সমিতি' ৮৫
মোজাম্মেল হক ১০৪, ১৩৭
মোক্তার আহমদ সিদ্দিকী ১০৫
মোসলেমউদ্দীন আহমদ ১০৫, ১২৬
মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১০৪, ১১৩, ১৪০, ১৪৪, ১৯০, ১৯৩, ২৪৯, ২৬২, ২৬৪, ২৯০, ৩৩৫, ৩৮৫
মোসলেমউদ্দীন খাঁ ১১৩
মোমেনের জবানবন্দি ১৪৪, ২৯৮
মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী ২০৬
মোয়াহেদ বখত চৌধুরী ২১১
মোজাফফর আহমদ ২১৩
মোল্লা নাসিরুল হক ২২৪
মোমেন চৌধুরী ২৩৮
'মোহাম্মদ পাবলিশিং হাউস' ২৮৮
'মোস্তফা চরিত' ২৯৫
মোজাম্মেল হক ৩১৪
মোঃ আবদুস সাত্তার ৩৭৬
মোঃ আবদুল বারী চৌধুরী ৩২৫, ৩২৬
মোহাঃ ছিকান্দর আলী ৩২৯
মৌলবী গিয়াসউদ্দীন আহমদ ৩৬৩
মৌলবী আবদুর রশীদ সিদ্দিকী ৩৯৯
মৌলভী ফজলুর রহমান ৩৬২
মৌলানা কেরামত আলী ৩০

www.pathagar.com

য
যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯৫
যতীন্দ্রমোহন বাগচী ২৩৭
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ৩২৯
যতীন্দ্রমোহন সিংহ ২১২
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ৫৭
যতীন্দ্রনাথ মজুমদার ৩৭২
যদুনন্দন ১৭
যশচন্দ্র ১৮
যশোধর ১৩
যাদুঘর ৩৯৮
যাদবনাথ ১৮
যুগবাণী ৩৯৬
যুগভেরী ৩২৩
যুগের আলো ৩৯৬
যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ৩৫০
যোগেন্দ্রনাথ সরকার ৩৯৮
যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ৩১৫
যোগেশচন্দ্র রায় ২৫৭
যোগেশচন্দ্র ঘোষ ৩৯৬
যোহান বোয়ার ৯৯, ১২৯
যৌনশিক্ষার আবশ্যকতা ৩৫৪

র
রওশন ৩৯৫
রওশন হোদায়াৎ ৩৯৫
রকনউদ্দীন বারবকশাহ ১২
রক্তকেতু ৩৯৯
রসুল বিজয় ১৩, ১৭
রণজিৎচন্দ্র ৩৮৮
রঙ্গমঞ্চ ৩৮৯
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৩৮৮
রঞ্জন দাস ৩৯৫
রঙ্গলাল ৩১
রবিবারের পীবি ৩৯৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২, ৩৬, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১১১, ১১৯, ১২২, ১২৮, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০, ১৪১, ১৪৬, ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, ১৮০, ১৮৭, ২২৯, ২৩৮, ২৪৭, ২৭২, ২৭৯, ২৯০
'রবীন্দ্রকাব্য পাঠের ভূমিকা' ১২২
রবীন্দ্র রচনাবলি ১৮০
'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান' ২৬৪
রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ অর্জন ৪৯
রবীন্দ্রযুগ ২৯৯
রশীদ আল ফারুকী ৪১, ৩৮৫
রমণীমোহন ঘোষ ৪৩
রজনীকান্ত সেন ৪২
রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ৪৩
'রত্নবতী' ৪৬
রসময় লাহা ৮৭, ১০০
রমেন্দ্ররায় চৌধুরী ১০৫
রমা রোঁলা ১১১
রকিবউদ্দীন আহমদ ১১৫
রসবালা বর্মণ ৩৭১
রমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত ৩৮৫
রমাপদ চৌধুরী ১৭৬, ১৭৭
রঞ্জন মজুমদার ১৭৬
রমেশ আচার্য ১৭৬
রমেশ শর্মা ৩০৭
রজত সেন ১৭৭
রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী ১৯০, ১৯৩
রবিদাস সাহা রায় ২৩৭
রকিবুস সুলতান বি.এ. ২৬৫
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ২৭৩
রজিউর রহমান ৩৩২
রথীন্দ্রনাথ রায় ৩৮৫
রবিন পাল ৩৮৫
রঙ্গালয় ৩৮৭
রমেশচন্দ্র মজুমদার ৫, ৮, ৯, ২০, ২১, ৩৭, ৪১, ৫৬, ৫৮, ৬৫, ৬৮, ৩৮৫, ৩৯৩
রমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত ৩৮৫
রমেশচন্দ্র দাস ৩২৯
রামায়ণ ৯, ১২, ১৩
রামচরণ ১৭
রামচন্দ্র ১৮
রামচন্দ্র খান ১৭
রাম স্বরস্বতী ১৭
রামদাস আদক ১৮
রামনারায়ণ ১৮
রামকৃষ্ণ রায় ১৮
রামরাজা ১৮
রামকান্ত ১৮
রামজী দাস ১৮
রামপ্রসাদ রায় ১৮
রাম শংকর ১৮
রাম হাজরা ১৮
রাম গোবিন্দ ১৮

www.pathagar.com

রামতনু ১৮
রামপ্রসাদ সেন ১৮
রামানন্দ বসু ১৭
রামেশ্বর নন্দী ১৮
রামানন্দ যতী ১৮
রামানন্দ ঘোষ ১৮
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৪৩, ২৮৬, ২৯০, ৩৮৭
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৮
রাধাকমল চট্টোপাধ্যায় ৩৮৮
রাধাচরণ দাস ৩৯৫
রামরত্ন ১৮
রামশরণ ১৮
রামজীবন ১৮
রামেশ্বর ভট্টাচার্য ১৮
রামমোহন ২২, ২৬, ৩০, ৩১, ৩২, ৪৭, ১১০, ১১১, ১২৮, ১৪৯, ২৩১, ৩৭৮
রাজনারায়ণ বসু ৩১, ৩৬
রাজশেখর বসু ২৭৬
রাধানাথ শিকদার ৩১
রামতনু লাহিড়ী ৩১
রাউলাট আইন পাশ ৩৮
রাশিয়া ৩৮
রাজিবউদ্দিন তরফদার ৩৯
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৪৩
'রাশিয়ার চিঠি' ৪৪
'রাশিয়ার আধুনিক নারী' ৯৪
রাজসিংহ ৪৬
'রায়নন্দিনী' ৪৬
রামশ্যাম গোপাল ৭৬
রাধাকমল বাবু ৯৯
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ৯৯
রাবেয়া খাতুন ১০০
'রাক্ষুসী' ১০২
রাধাচরণ দাস ১০৩
রাবেয়া হায়দার ১০৬
রাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১০৬
রামেন্দু দত্ত ১২৫
রামকৃষ্ণ ১২৮
রাসবিহারী দাস ১৭৭
রাসবিহারী লাল ১৭৬
রাইহানা তায়েবজী ২৩৭
রায়বাহাদুর জলধর সেন ৩০৭
রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন ৩০৭ .
রামনাথ বিশ্বাস ৩৫৪
রাখালচন্দ্র নাথ ৩৮৫
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮৫
রাধারমণ মিত্র ৩৮৫
রাজভোগ ৩৯৯
রিজাউল করিম ২১২
রিজিয়া বেগম রশিদা ২১৩
রিয়াজউদ্দীন চৌধুরী ২৩৭
রুশ বিপ্লব ৩৯
রূপায়ন ৮১, ২১৭
রূপরেখা ৮২, ২১৭
রেজোয়ান সিদ্দিকী ৪৭
রেজাউল করিম ৭০, ৭৫, ২২৪, ৩৮৫
রেণুভূষণ গাঙ্গুলি ২৪৪, ২৬৩, ৩০৬

ল
লণ্ডন ৫৬
লবণী দাস ১৮
লতিকা বসু ৩৯৬
লহরী ৫০
লক্ষণ সেন ৩
লক্ষ্ণৌ চুক্তি ৩৮
লর্ড কার্জন ৩৫
লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ৬৫
লালা জয়নারায়ণ সেন ১৮
লাঙ্গল ৪৪, ৩৯৬
লাহোর কংগ্রেস ৫৬
'লাহোর প্রস্তাব' ৬০
লায়লা হক ৩৫৩
লায়লা জামান ৩৮৫
'লায়লী মজনু' ১৩, ১৯
নীলা মজুমদার ১৭৪
লীলাময় রায় ১০৫, ২৩০, ২৬৪
লুইসয় লরা ১৭৪
লুৎফর রহমান ২৫২
লুৎফুন্নেসা ২২৫
লোচন দাস ১৭
লোকনাথ দাস ১৭
লোকসাহিত্য ১৯
লোকানন্দ মজুমদার ৩৫৪
লোলিতলোচন দত্ত ৩৯০
লৌকিক দেবতা বিষয়ক পাঁচালী ১৭
শতদল ৩৯৪
শঙ্কর ১৮, ১৯
শঙ্কর চক্রবর্তী ১৮

www.pathagar.com

শশিশেখর ১৮
শচীনন্দন ১৮
শশীভূষণ দাশগুপ্ত ৩৩, ৪১, ৪৬, ১৭৬, ৩৮৫
শনিবারের চিঠি ৩৯৫
শরিয়ত ৩৯৫
শরীয়তে এসলাম ৩৯৬
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৪০, ১৪৩, ১৪৬, ১৫০, ১৭৩, ২৪৪, ২৭৬, ২৮৮, ৩৭৮, ৩৯০, ৩৯৫
শহীদুদ্দীন মোহাম্মদ ১৩৭
শওকত আলী ২৯৬
শওকত ওসমান ১৪৩, ১৭৬, ১৯৪, ১৯৭, ২৯৪, ৩০১, ৩০৬, ৩৫৯, ৩৭১
শচীন সেন রায় ১৭৭, ২৩৭
শরদিন্দুনারায়ণ রায় ৩৫১
শশিভূষণহোম চৌধুরী ৩৯৮
শরচ্চন্দ্র ঘোষ ৩৮৮
শচীশচন্দ্র ঘোষ ৩৮৯
শশীকান্ত চট্টাচার্য ৩৯০
শক্তিশরণ সিংহ ৩৯২
শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত ৩৯৩
শশাঙ্ক শেখর বাগচী ১৯০, ১৯৩
শচীন্দ্রমোহন সরকার ২২৪
শাহ মুহম্মদ সগীর ১২, ১৯
শাহ বারীদ খান ১৯
শাহ্ আবুল হাছানাৎ ২১৩
শাহ্ আবদুল খালেক চৌধুরী ২২৪
শাহ্ মফিজউদ্দীন ৩৩২
শাহাদাৎ হোসেন ৪৭, ১৪৩, ২২৪, ২৯৩, ৩৯৩
শাহাদাৎ আলী খাঁ ২১৩
শাহেদ আলী ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫
শাকের মাহমুদ ১৮
শাশ্বত বঙ্গ ৩৩, ৪৬
শান্তি দেবী ৩৭১, ৩৯৬
শামসুন্নাহার মাহমুদ ৪৭, ৫১, ১৩৬, ১৪১, ১৪৫, ১৪৭, ১৫৭, ১৯৫, ৩১৬, ৩৫৩
শামসুন্নাহার হল ১৩৩
শামসুদ্দীন আহমদ ১৩৭, ৩৩২, ৩৫৩, ৩৫৯
শামসুল হুদা ১৪৩
শামসুর রাহমান ১৬১, ২৯০
শামসুন্নেহার ইউসুফ ২২৪
শান্তি কবির ১৯৭
শান্তিদেব ঘোষ ১৯৭
শামসের আল আজাদ ২৬৬
শান্তিনিকেতন ২৭৫
শামসুননেসা ৩৫৩
শান্তিময়ী পাঠক ৩৬০
শাহরিয়ার ইকবাল ৩৮৫
শামসুজ্জামান খান ৩৮৫
শামসুল হক ৩৮৫
শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৬১, ৬২
'শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা' ৬১, ৬২
শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ১৭৪, ৩৮৫
শ্যামচরণ কবিরত্ন ৩৮৭
শিবচন্দ্র ১৮
শিবচন্দ্র দেব ৩১
শিক্ষক ৫২, ৩৯২
'শিখা' ৫৩, ৮১, ১১৩, ১৩৮, ১৪২, ২১৭, ২৮৭
'শিখা-গোষ্ঠী' ১১৫, ২৮৪
'শিক্ষা-সমস্যা' ১১৭
শিবরাম চক্রবর্তী ২৩৭
শিরিণ চৌধুরী ৩৩২
শিবপ্রসাদ কর ৩৫৪
শিল্প ও সাহিত্য ৩৮৭
শিবরতন মিত্র ৩৮৯
শিরিষচন্দ্র কামদেব ৩৯০
শিশির ৩৯৪
শিশির কুমার মিত্র ৩৯৪
শিশিরচন্দ্র বসু ৩৯৭
শিশু সওগাত ৩৯৪
শিশু সাথী ৩৯৪
'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' ১২
শ্রীকর নন্দী ১৭
শ্রীরামপুর কলেজ ২৬
শ্রীহট্ট ৬৫
শ্রীচন্দ্র সেন ১৭৪
শ্রীকমল রায় চৌধুরী ১৯৪
শ্রী মন্মথ রায় ২১১
শ্রী সুরেশ বিশ্বাস ২১১
শ্রী অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২১১
শ্রী ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২২৬
শ্রী অনুরূপা দেবী ২২৬, ২৭৩
শ্রী হাসিরাশি দেবী ২২৬, ২৭৩, ৩০৭
শ্রী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ২২৬
শ্রী বিশ্বনাথ রায় ২২৬
শ্রী প্রভাবতীদেবী স্বরস্বতী ২২৬
শ্রী প্রমথনাথ বিশী ২২৬
শ্রীশচন্দ্র সাহা ২৩৭

www.pathagar.com

শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন ২৫৭, ২৬১, ৩১০, ৩১১
'শ্রী ও পদ্ম' ৩০৯
শ্রী হরদয়াল নাগ ৩২৯
শ্রী বটন্তিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৩২
শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তী ৩৪৭
শ্রী সমরেন্দ্র দাশগুপ্ত ৩৪৭
শ্রী বরেন্দ্র কুমার মজুমদার ৩৫৪
শ্রী রণজিৎ কুমার সিকদার ৩৭১
শ্রী অরবিন্দ গুহ ৩৭১
শ্রী মুরারীমোহন বিশ্বাস ৩৭১
শ্রী অরবিন্দ গুহ ৩৭১
শ্রী তন্ময় বাগচী ৩৬০
শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৫৪
শ্রীমতী অরুণা বসু ২২৫
শ্রীমতী নীলিমা দেবী ২৫৩
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ২০২
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ ৩৯৬
শুদ্ধসত্ত্ব বসু ২৬৩
শেখ মনোহর ১৮
শুভোদয়া ৩
শেখ মনসুর ১৮
শেখ জেব ১৮
শেখ সাদী ১৮
শেখ আবদুর রহিম ৪৭, ৫০, ৩১৪, ৩২৯, ৩৩২, ৩৮৯, ৩৯১
শেখ ফজলুল করিম ৪৭, ৩১৪, ৩৮৯
শেখ হবিবর রহমান ৪৭, ২১৩, ৩৭১, ৩৯২
শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ৫১, ২২৪, ৩১৫
শেখ মুহম্মদ ইদ্রিস আলী ৪৭, ২১৭, ২২৪
শেখ আবদুল জব্বার ৪৭
শেখ মজহারউদ্দিন ভূঁইয়া ২২৪
শেখ শাহনূর আহমদ ২৫৩
শেখ নূর আহম্মদ শাহ ২৫৩
শেখ মোঃ সেকান্দার আলি ৩২৫
শেখ আমজাদ আলী ৩৭১
শেখ মোজাফফর হোসেন ৩৭১
শৈলজানন্দ ১৯৮
শৈলবালা ঘোষজায়া ২৬৩, ৩৬০
শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ৩৮৭
শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ৩৯৭
শৈলেশনাথ বিশী ৩৯৪
শৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৯০

স
সহজিয়া বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধকাব্য ১৩
সহদেব চক্রবর্তী ১৮
সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল ১৯
সতীময়না লোর চন্দ্রানী ১৯
সপ্তপয়কর ১৯
'সমাচার চন্দ্রিকা' ২৬
'সমাচার দর্পণ' ২৬
স্বদেশী ৩৭, ৪২, ৩৮৮
স্বদেশী আন্দোলন ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪৩, ৯৮
'স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ' ৩৫
স্বদেশী আন্দোলন ও বাঙলা সাহিত্য ৪১
স্বদেশী ও বিদেশী ৪১
স্বদেশী বাজার ৩৯৯
সর্বানী নন্দন ১৮
সনাতন বিদ্যাবাগীশ ১৮
সংস্কৃত কলেজ ২৩
'সঞ্জিবনী' ৩৫, ৪২
'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন' ৩৫, ৩৮
'স্বরাজ্য দল' ৩৮
সমাজতান্ত্রিক চেতনা ৩৯
'সন্ধ্যা' ৪২
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৪৩, ৮৭, ১০০, ৩৩২, ৩৭৮
সখারাম গণেশ দেউস্কর ৪৩
সৎসঙ্গী ৪৪
সংহতি ৪৪, ৫৮, ৩৯৫
'সবুজপত্র' ৪৪, ৪৫, ৪৯, ১৬৫, ৩৯১
'সবুজ বাঙলা' ৭৭, ৮২, ২৪৯
'সবুজ পতাকা' ৮২, ৩৭৫
সবুজ পল্লী ৩৯৬
সমাজতন্ত্র ৪৫
সওগাত ৪৫, ৪৯, ৫২,৫৩, ৭৫, ৮১, ৯৩, ৯৫, ১০০, ১০৩, ১৪২, ২১৭, ২৬১, ২৬৮, ২৭৬, ২৮৭, ৩৮৬, ৩৯২, ৩৯৭
'সচিত্র মাসিকপত্র সওগাত' ৮৩
'সওগাত সাহিত্য মজলিশ' ৮৩, ৮৫, ১৪২
সচিত্র শিশির ৩৯৫
সজনীকান্ত দাস ৪৭, ২১১, ৩৯৩
'সমাচার সভারাজেন্দ্র' ৫০
সত্যাগ্রহী ৫৩, ৩৯৬
সঞ্চয় ৫৩, ৩৯৯
সংবাদপত্র সেবী ৬৩
সলিমুল্লাহ হল ৬৭, ১১৪
সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ৭৭

সমানাধিকারবাদ ৭৭
সরোজকুমারী দেবী ৯৪
স্বর্ণকুমারী দেবী ৯৪, ১০০
'সর্বহারা' ৯৬
সরসীবালা বসু ১০০
সদরুদ্দীন ১০০
সরদার ফজলুল করিম ১০৩, ১০৬
সফুরা আহমদ ১০৩
সকিনা কেরামত ১০৫
সতী গঙ্গোপাধ্যায় ১০৬
সবিতা গুহ ১০৬
'সম্মোহিত মুসলমান' ১১২
সঞ্জয় ভট্টাচার্য ১৬৬, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৯৯
সন্তোষকুমার ১৭৪
সমর সেন ১৭৫, ১৭৭, ১৯৯
সরোজকুমার রায় চৌধুরী ১৭৬
সন্তোষকুমার ঘোষ ১৭৬
সমশের আলি ১৭৭
সত্য দত্ত ১৭৭
সন্দেশ ৩৯১
সংকল্প ৩৯১
'সমকালীন দুর্ভিক্ষ দুর্নীতি' ১৮৫
সতিশচন্দ্র মিত্র ২১৩
সতীশরঞ্জন খাস্তগীর ২২৯, ২৩৭
সতীশচন্দ্র দত্ত বিদ্যারঞ্জন ২৫৩
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ৩৮৫
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩৯৪
সত্যেন্দ্র গোপাল চক্রবর্তী ৩৬০
সত্যনারায়ণ দাশ ৩৮৫
সত্যেন্দ্রকুমার বসু ৩৯৪
সখী ৩৮৭
সমালোচনী ৩৮৭
সহচর ৩৯৩
সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা ৩৯৫
সম্মিলনী ৩৯৬
সজ্জন ৩৯৭
'সামাজিক প্রবন্ধ' ৮
'সামাজিক গলদ' ১১৬
সাধনা ২৬, ৫২, ৩৯২
'সাইমন কমিশন' ৩৯
সাহিত্য ৪২
সাহিত্য পত্রিকা ৫৩, ১১৩, ৩৮৬
'সাহিত্যের নব-কলেবর' ৯৯
'সাহিত্য ধর্ম' ১০০
সাহিত্যিক ৫৩
সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ৫০
সাম্যবাদী ৫৩
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ৬২
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৩৬
সাম্প্রতিক কবিতার ঢঙ' ১৮২
সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন ৬৪
স্বাধীন বঙ্গদেশ গঠন ৬৫
সানাউল হক ১০১, ৩০১
সাদত আলী আখন্দ ১০৪, ১২৭, ১৪১, ১৪৭, ২৫৩, ২৬৬, ৩৫৪
সাহেরা খাতুন ১০৬
সাজেদা খাতুন ১৬৭
সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১২৪, ১৭৪, ১৭৫
সাহিত্য সমিতির কথা ১৩৬
সাহিত্য সমিতির ইতিহাস ১৩৬
'সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা' ১৪১
'সাহিত্যের স্বরূপ' ১৪৩
সালমা রওশন জাহান ১৫০
'সাহিত্যপত্র' ১৬৬
স্বামী নিগমানন্দ স্বরস্বতী ৩৮৯
স্বামী নির্বাণানন্দ স্বরস্বতী ৩৮৯
স্বামী সিদ্ধানন্দ স্বরস্বতী ৩৮৯
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ২৯৪
সাহিত্য সংবাদ ৩৯০
সাহিত্য সংহিতা ৩৮৭
সালেমা খাতুন ২৩৭
সারদাচরণ মিত্র ২৪৮
সায়েফউদ্দিন খালেদ ২৫৩
সালামত আলী দেওয়ান ২৫৩
সায়েমা খানম চৌধুরী ৩৭৬
সারদাচরণ ঘোষ ৩৮৭
স্বাম্যবাদী ৩৯৪
সারদা ৩৯৫
সাপ্তাহিক সওগাত ৩৯৯
সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্মেলন ৬৬
সিন্ধু ৬১, ৬৫
সিমলা ৬৪
সিদ্দিক আহমদ খান ১০১
সিকানদার আবু জাফর ২৯০
সিরাজুদ্দীন আহমদ ৩৭১
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ৩৮৬
সীমান্ত প্রদেশ ৬৫
সীতারাম ৪৬

www.pathagar.com

সীতারাম দাস ১৮
সীতাসুত ১৮
স্ত্রী শিক্ষা ১০৪
সীতাংশু আচার্য ১৭৭
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৭, ৪১, ৭৮, ৭৯, ১৪০, ১৫১, ৩৫৪, ৩৮৫
সুখময় মুখোপাধ্যায় ১০, ১৫, ১৬, ৩৮৬
সুফী পদ ১৩
'সুফী হাসিম' ৯২
সুফী মোতাহের হোসেন ২২৫
সুলায়মান ১৮
সুশীল মিশ্র ১৮
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ৩২
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ৪৩
সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ১০০, ১৯০, ১৯৩, ১৯৪, ২৩৭, ২৬৩, ৩০৭, ১১১, ১১৩
সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ১৭৭
সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২১২
সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী ২৫২
সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৩৯২, ৩৯৩
সুভাষচন্দ্র বসু ৩৮, ৫৭, ৬১
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৭৭, ১৯৮, ২২৫
সুকুমার সেন ৪১, ৪৬, ৩৮৫
সুকুমার বিশ্বাস ১৫৬
সুকুমার দত্ত ১৭৭
সুকুমার সরকার ২১১
সুকুমার মজুমদার ২৩৭
সুকুমার হালদার ২৩৭
সুপ্রভাত ৪২
সুধাকর ৫০
সুষমা দেবী ৯৩
সুফিয়া এন হোসেন ১০০, ১০৩, ১২৭, ১৬০, ২১১, ২২৪, ২৫৭, ২৭৬, ৩০২
সুজাতা ঘোষ ১০০
সুধীন দত্ত ১৪৬, ২২৭, ৩৭৮
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৭৪, ১৭৫, ১৮৭
সুধীরকুমার চৌধুরী ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৯৮
সুধীন্দ্র প্রামাণিক ১৭৬
সুধীরকুমার মিত্র ২১৩
সুশোভন সরকার ১৪৭, ১৬৮, ১৭৪
সুবোধ ঘোষ ১৬৫, ১৭৪, ১৯৯
সুপ্রভা রায় ১৭৪, ১৭৫
সুধীন্দ্রনাথ মিত্র ২১১
সুপ্রতিম মিত্র ১৭৫
সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭৭
সুধাংশু আচার্য ১৭৭
সুধাময় ভট্টাচার্য ১৭৭
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৯০
সুধাময় রায় ১৭৭
সুপ্রভাত ৩৮৯
সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮৯
সুবহান আহমদ ২১২
সুকোমল বসু ২১৩
সুহৃদ ৩৮৮
সুহৃদকুমার রায় ৩৫৪
সুহৃদকৃষ্ণ বসু ২২৪
সুচরিত চৌধুরী ২৪৯
সুশীলকুমার গুপ্ত ২৫৩
সুনীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৯
সুরেশ্বর শর্মা ৩০৭
সুধাংশকুমার রায় ৩০৭
সুধাংশু কিরণ ঘোষ ৩৫৪
সুবোধবালা বিশ্বাস ৩০৭
সুরেশ্বর কুমার গোস্বামী ৩২৬, ৩২৯
সুধাকর দেবনাথ ৩৩২
সুখচরণ সেনগুপ্ত ৩৫৪
সুনীল ঘোষ ৩৬০
সুনির্মল বসু ৩৬০, ৩৭২
সুধাংশু শেখর চৌধুরী ৩৭১
সুনীল দাস ৩৮৫
সুন্দরম ৩৮৬
সুরেশ চক্রবর্তী ৩৯২
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ৩৯৬
সুবলচন্দ্র মিত্র ৩৮৭
সুরপতি চক্রবর্তী ৩৯৫
সুদর্শন ৩৯৯
সুধা ৩৮৭
সেরবাজ চৌধুরী ১৮
সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন ৬৬
সেকেন্দর চৌধুরী ১৭৩
সেরাজুল ইসলাম ৩৫৬
সেবক ৩৯৪, ৩৯৯
সেবা ও সাধনা ৩৯৫
সৈয়দ মুজতবা আলী ৫, ৭০, ৭৪, ৭৫, ১৭৩, ১৭৫
সৈয়দ আইনুদ্দীন ১৭
সৈয়দ নূরুদ্দীন ১৮
সৈয়দ সুলতান ১৯
সৈয়দ আলী আহসান ৪৬, ১০১, ২৪৬, ৩০২

সৈয়দ আবদুর রব ৭৩, ২০৩, ২১১, ৩৮৫
সৈয়দ এমদাদ আলী ৯১, ১০৩, ১০৮, ১৪০, ১৪১, ১৫০, ২২৪, ২৮৮, ২৯০, ৩১৭, ৩৮৮
সৈয়দ আবুল হুদা ১০১
সৈয়দ আলী আশরাফ ১০১
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১০১, ১০৩, ২৪৫
সৈয়দ আহমদ চৌধুরী ১০৩
সৈয়দ মোকাররম আলী ১০৪
সৈয়দ আবদুল মজিদ ১০৫
সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন ৭১, ১১৩
সৈয়দ ইমামুল হোসেন ১১১
সৈয়দ আমীর আলী ১২৬, ১২৭, ২৪৪
সৈয়দ আহমদ ১৩৬
সৈয়দ নওশের আলী ১৩৭
সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী ১৩৭
সৈয়দ রাশেদুন নবী ২১১
সৈয়দ নূরুল আমিন ২১১
সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসী ২২৪, ২২৭
সৈয়দ আসাদউদদৌলা সিরাজী ২২৪, ৩৬৩, ৩৬৪
সৈয়দ আবুল হোসেন ২২৭
সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ৩০২, ৩৩২
সৈয়দ আমিরুল ইসলাম ৩২৬
সৈয়দ মোস্তফা আলী ৩৩২
সৈয়দ আবদুল মান্নান ৩৫৯, ৩৭১
সৈয়দ আলী আহমদ ৩৭১
সৈয়দ আনওয়ারুল হাফিজ ৩৭১
সৈয়দ সাহাদাৎ হোসেন ৩৭৬
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ৩৮৫
সৈয়দ খালেদ নৌমান ৩৮৬
সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ ৩৯২
সৈয়দ আহমদ আলী ১০৪, ৩৯৫
সৈয়দা জয়নব খাতুন ৯৪
সৈয়দা ফেরদৌস মহল সিরাজী ১০০
সৈয়দা ফাতেমা সাদেক ১০৬
সোভিয়েট সমাজগঠন ৪৪
সোভিয়েট রাশিয়া ৬৭
'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' ৬৭
'সোভিয়েট মেলা' ৬৭
সোলতান ৫০, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯৪
সোলতানুল আলম ২৫২
সোনার ভারত ৫৩, ৩৯৫
সোনার বাংলা ৩৯৫
সোহরাওয়ার্দী ৬৩, ১৭৩
সোফিন চৌধুরী ১০৩
সোমনাথ লাহিড়ী ৫৮
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৫
সোনামণি চক্রবর্তী ৩৮৫
সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৪১, ৩৮৫
সৌরভ ৫৩, ৩৯০, ৩৯৬
সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১৪৫, ২২৪
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৫
সৌরিন্দ্র মিত্র ১৭৭
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৮৫
সৌম্যেন্দ্রনাথ বসু ৩৮৫
স্যার আবদুর রহিম ৩৯, ৭১
স্যার আজিজুল হক ৭১, ৭৪
স্যার অলিভার লজ ১০৪
স্টাফোর্ড ক্রিপস ৬২
'স্টুডেন্টস ফেডারেশন' ৩৯
স্টিভেন স্পেণ্ডর ১৭৪

হ

'হলওয়েল মনুমেন্ট' ৬৯
হরিদাস ১৮
হরিরাম ১৮
হরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ৩৯১
হরেন্দ্রলাল রায় ৩৮৭
'হপ্তম আইন' ২৪
হজরত মুহম্মদের জীবনী ১১১
হজরত মোহাম্মদ ১১১, ১১২
হরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য ২৫২
হবীবর রহমান ২৩৭
হরপ্রসাদ মিত্র ১৭৫, ১৯৭
হরিপ্রসাদ বর্মা ৩০৭
হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮৯
হাজী শরীয়তউল্লাহ ২৮
হাকিম ৩৯১
হাকিম মসিহর রহমান ৩৯১
হাফেজ ৫০
হাসান হাফিজুর রহমান ১০১
হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯৪
হাসান আলী ৩৭১
হাবিবুর রহমান ৩৭১
হানিফি ৩৮৮
হাবলুল মতিন ৩৯০
'হিন্দুমেলা' ৩১, ৩২
'হিন্দু-মুসলমান' ৪৬, ৫০, ৫৩
হিন্দু-মুসলমানের অসম্প্রীতি ৫

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ৩৮
'হিন্দু-নারী অপহরণ' ৩৯
হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ৫৬, ৭০
'হিন্দু-মুসলমান বিতর্ক' ১৪৮
'হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অগ্রদূত' ২১৭
হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম বিদ্বেষ ৭০
হিন্দুদের প্রাধান্য ২৩
হিন্দু জমিদার ২৪
হিন্দু কলেজ ২৫, ২৬, ৬৭
হিন্দুদের ফারসি বা ইংরেজি ভাষাজ্ঞান ১৭
হিন্দু মহাসভা ৩৮
হিন্দুস্থান ১৪৩
'হিন্দুস্থান রিভিউ' ৪৪
হিন্দুত্বের প্রচারক ৪৫
'হিন্দু কমরেড' ৬৫
হিন্দুসখা ৩৮৯
হিতকরী ৫০
হিরণ রেখা ১৩৬
হিরণকুমার গুপ্ত ৩৭১
হীরামণি ১৮
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৮, ১৭৪, ১৭৭
হীরালাল দাশগুপ্ত ১০০, ২৪৪, ২৫২, ৩৯৪
হীরন্ময় দাসগুপ্ত ২৫৩
হুমায়ূন কবির ৪, ২৭, ৭০, ৭৪, ৭৫, ১২৭, ১৫৭, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৫, ১৭৬, ১৯০, ১৯৪, ১৯৭, ১৯৯, ২১১, ২৭৩, ২৭৬, ৩০১, ৩০৭, ৩১৪, ৩৪২, ৩৮৬
হৃদানন্দ ১৮
হেমচন্দ্র বাগচী ১৭৭
হেমায়েত আলী ৩৫৪
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৩৮৯, ৩৯৪
হেমবতী দেবী ৩৫৪
হোমরুল লীগ ৩৮
হেলাল ৩৯৮

www.pathagar.com

মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার প্রচ্ছদ ও প্রতিলিপি

কলকাতা থেকে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত মাসিক সওগাত

www.pathagar.com

কলকাতা থেকে প্রকাশিত মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার

প্রথম বর্ষ   শ্রাবণ, ১৩৩৫   ২য় সংখ্যা

ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ, গবেষণা, কবিতা ও গল্পসম্বলিত

ত্রৈমাসিক মোয়াজ্জিন

(ফরিদপুর খাদেমুল এনছান সমিতির মুখপত্র।)

সম্পাদক ঃ- সৈয়দ আবদুর রব

গ্রন্থাগার
গবেষণা বিভাগ

"যশোহর-মোসলেম-বস্ত্রালয়", ফরিদপুর।

যাবতীয় বোম্বাই, পার্শী, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মটকা, গরদ, ধুতী, শাড়ী, লুঙ্গী, গামছা, চাদর ও থান প্রভৃতি নানারকমের কাপড় পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বদা মজুত থাকে।

কাপড় ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার আমাদের দোকানে আসিয়া দেখিয়া যান। সামান্য মোনাফায় অধিক কাটতিই আমাদের উদ্দেশ্য।

চকবাজার, কাপড়ে পট্টি, ফরিদপুর।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১৲ এক টাকা।   প্রতি সংখ্যা ।৴০ পাঁচ আনা।

ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত সৈয়দ আবদুর রব সম্পাদিত, ফরিদপুর খাদেমুল এনছান সমিতির মুখপত্র ত্রৈমাসিক মোয়াজ্জিন-এর প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদ, ঢাকার বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

জয়তী

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
বৈশাখ—১৩৩৭

সম্পাদক—আব্‌দুল কাদের

কার্য্যালয়—
২৪-বি বুদ্ধু ওস্তাগর লেন,
পোঃ আঃ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৸০ টাকা; প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

Published by Abdul Quader from 24—B, Buddhu Ostager Lane, and
Printed by the same at the Metcalfe Press, 15, Nayanchand Dutt street, Calcutta

কলকাতা থেকে প্রকাশিত কবি আবদল কাদের সম্পাদিত মাসিক জয়তীর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার

www.pathagar.com

ঢাকা থেকে প্রকাশিত মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর কর্ণধার ও শিখার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদক সফী মনীষী আবুল হুসেন-এর ছবি. ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত আবুল হুসেন

www.pathagar.com

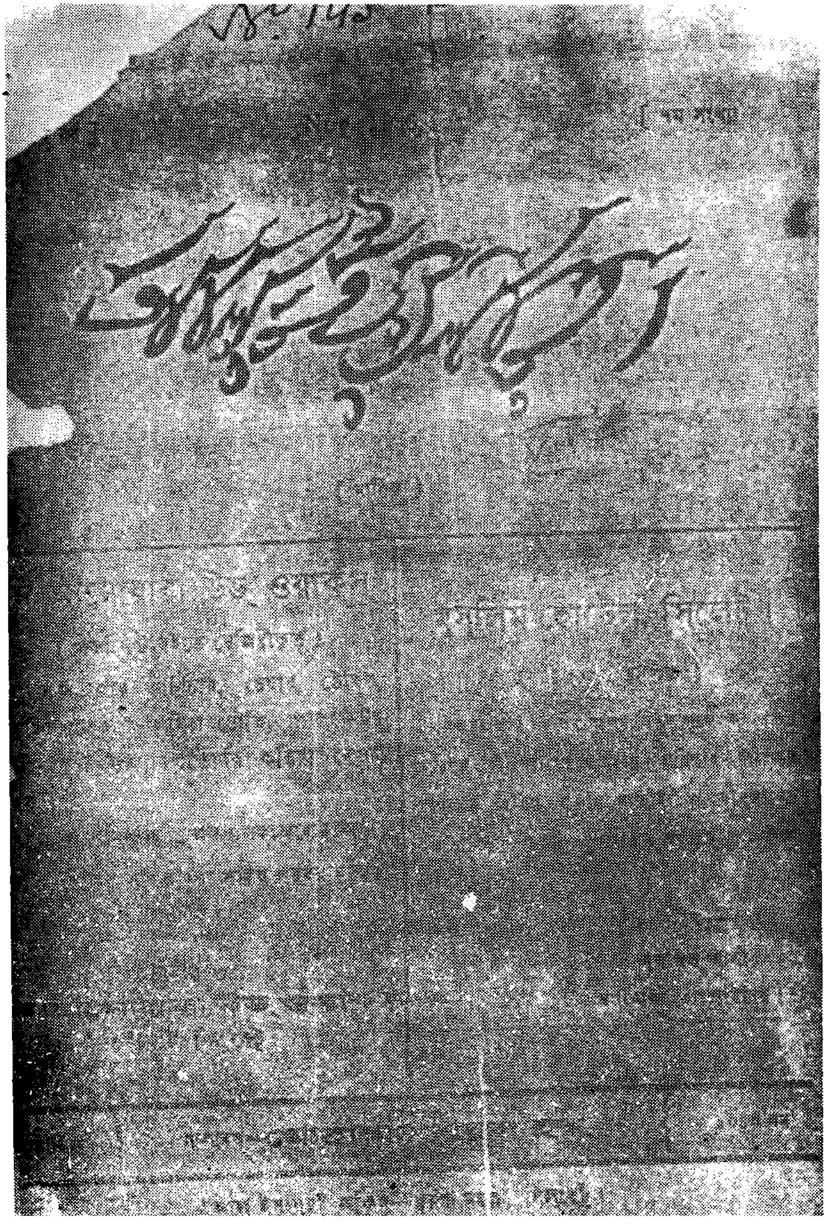

www.pathagar.com

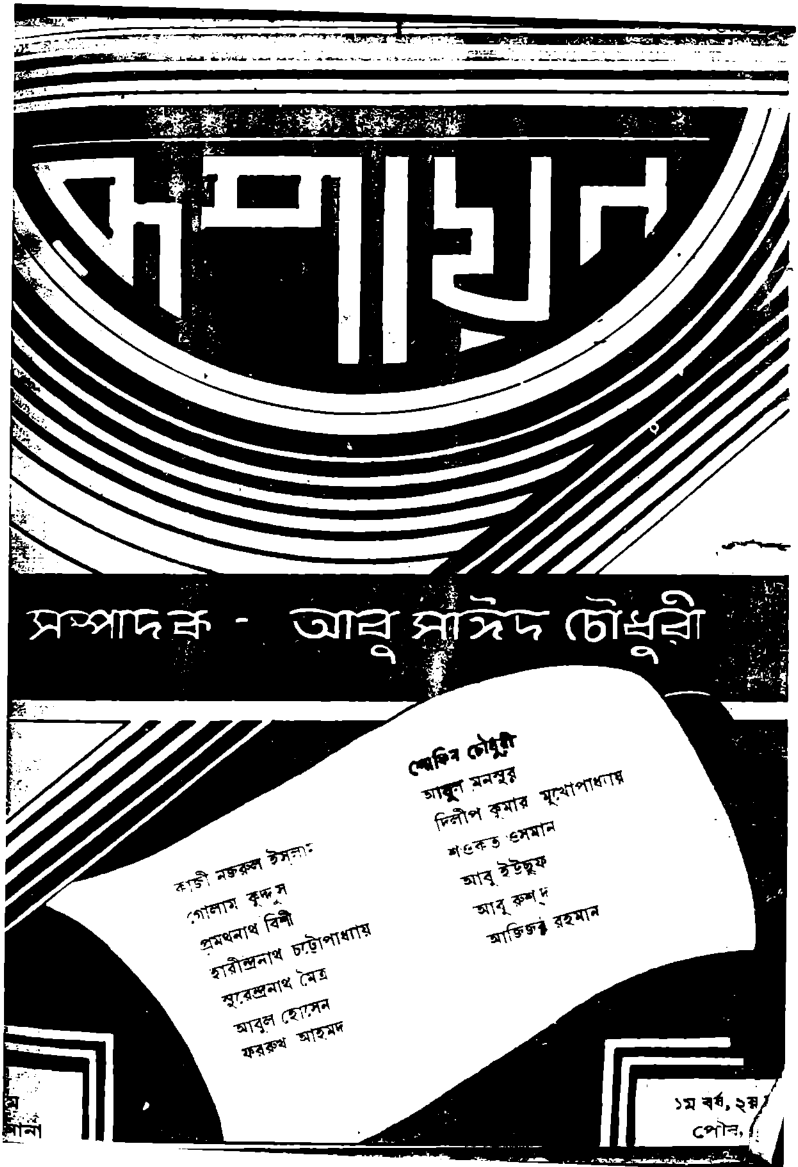

কলকাতা থেকে প্রকাশিত, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক রূপায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদ, সম্পাদকের পুত্র জনাব আবুল কাশেম চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

www.pathagar.com

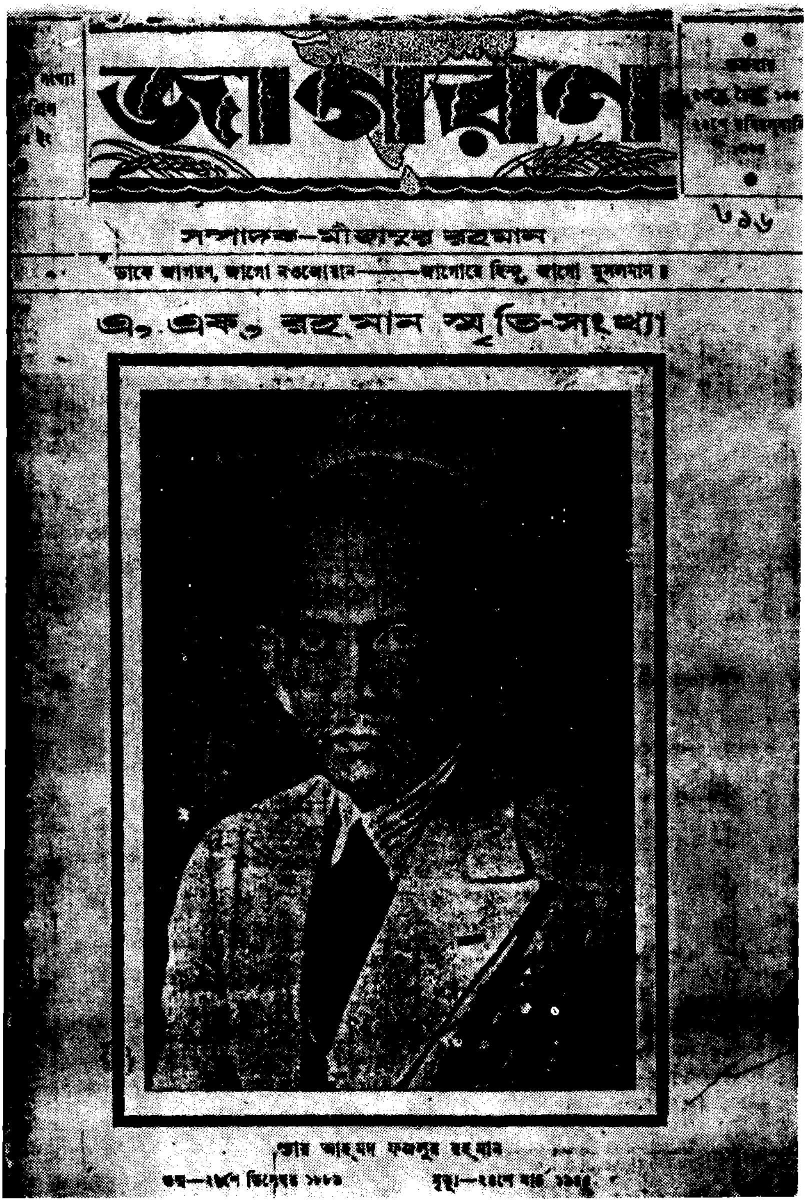

কলকাতা থেকে প্রকাশিত, মীজানুর রহমন সম্পাদিত জাগরণ পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ নবম সংখ্যার প্রচ্ছদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত।